নিজস্বকে জাগাইয়া তোল—লক্ষ্মীলাভ অচিরেই সম্পন্ন হইবে।

এই কর্ম্মের জন্য, অসংখ্য কর্ম্মীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহস্র যুবক যদি জগদ্ধিতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহাদের জীবন রক্ষার স্থায়ী উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। প্রচলিত বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিলেই দেশোদ্ধার হইবে না, কর্ম্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ না করিয়া এইরূপ হঠকারিতার ফলে দুরবস্থার সীমা থাকিবে না—এইজন্য ধীরচিত্তে এই সকল কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

স্বদেশী যুগ হইতে—আমরা এই অর্থ চিন্তায় মনোযোগ দিয়াছি। বিপ্লব যুগের অবসান কাল হইতে এই তিন বৎসরের মধ্যেই আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় এক দল লোকের অন্ন সংস্থান করিয়াছি। ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করিয়া যে সকল যুবক বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন, অতীতের সকল প্রকার বিঘ্নের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের চলিতে হইয়াছে—জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই সকল যুবকই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যা প্রচারের বিপুল আয়োজনে নিযুক্ত আছেন। আমাদের রাজনীতি নাই—অসহযোগিতা নাই—বহির্বিব— আয়ত্ত করিবার জন্য প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধ মায়ের কোলজন আছে বলিয়াই আমাদের ডাকিয়া বলি, এস— বাহিরে এ পর্য্যন্ত সাধারণ —এই মহামিলনের মাঝে কোন পূর্ণতর বিপুল আ—ঐক্যই আমাদের স্বভাব উঠিতে পারি নাই। ষ্ঠান গড়িয়া তুলি।

সকল বিদ্যালয়গুলিতে * *

পাঁচানব্বই জন অশিক্ষিত বাংলার দিগন্তে উষার কনক- শিক্ষাগার নির্ম্মাণ ক—এই নবীন প্রভাতে—পরাৎ- ...নের জন্য বাহ্যরণ করিয়া নূতন যাত্রা আরম্ভ ...জনারই লক্ষণ বাঙালীর কর্ম্মপথে বিঘ্ন নাই— ...তাতীত না—জননীর দিব্য আশীর্ব্বাদে বুক ...ত্রী জাতির গ গিয়াছে—অহমিকার পাষাণ স্তূপ

না কর্ম্ম করিতে করিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা হয়, উহাই জাতির পথনির্দ্দেশের নিখুঁৎ ছবি। আমরা শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন নহি—তবে এক অভিনব উপায়ে উহার বিস্তার সাধনে মনোযোগ দিয়াছি। এ বিপুল দেশে আমাদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নহে, তবে কালে ইহার ফল দেশবাসীর নয়নগোচর হইবে। এই শিক্ষা ব্যাপক ভাবে যাহাতে দেশে প্রচারিত হয়, এই নূতন যুগে তাহার জন্যও আমরা উদ্যোগী হইব।

প্রথম অর্থ প্রতিষ্ঠান—তারপর শিক্ষার ব্যবস্থা— পরিশেষে জাতির জীবন প্রতিষ্ঠা। জাতির প্রাণ এখন অসাড় হইয়া আছে—প্রচুর খাদ্যের অভাবে শরীর যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মনের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে—সর্ব্ব প্রথমেই এই লক্ষ্মীছাড়া জাতির অন্নসংস্থানের উপায় দেখিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনের উন্নতিকল্পে অতি অল্প ব্যয়ে গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও হইল।

আমরা সা... ...র অনুগত হউক—ইহাই

যে... প্রার্থনা—যে সকল কর্ম্মী আজও গোপন জীবন যাপন করিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশ দশ সমাজের সেবা হইতে বঞ্চিত আছেন—তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হউক—যাঁহারা রাজবিধানে আন্দামানে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে যন্ত্রণাময় জীবন অতিবাহন করিতেছেন—তাঁহাদেরও মুক্তি দেওয়া হউক। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যখন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল তখন দেশকর্ম্মীদের অবাধ গতি রুদ্ধ করিয়া বৃথা কলঙ্ক বহন করা রাজকর্তৃপক্ষগণের পক্ষে নীতিসঙ্গত হইবে না। পরাধীন পরাজিত আমরা—কিন্তু জীবন আমাদের সকল দিক দিয়া যাহাতে উন্নত হইয়া উঠিতে পারে— তাহার উৎকৃষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে দেওয়া—রাজধর্ম্মের বিরোধী নহে। আমাদের দেশের মাটী খুঁড়িয়া আমরা অন্নসংস্থান করিব, আমাদের দেশকে আমাদের মত করিয়া শিক্ষা দিব, এইটুকু স্বাধীনতা কেবল

শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে গৃহনির্ম্মাণ ও বেঞ্চ টেবিলের খরচ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। এই সকল কথার বিশেষ আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিব।

এক্ষণে ব্যাপকভাবে দেশের কাজ করিতে হইলে আমাদের মূলধন আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশ বৃহৎ—লোকসংখ্যাও অল্প নয়, কাজের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইলে—অর্থবলও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

আমরা 'প্রবর্ত্তক' পাঠকদিগের ও জনসাধারণকে আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আজ সরল-ভাবে একটা নির্দ্দেশ দিব। যদি ইহা সফল হয়, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি—মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্থায়ী উন্নতি নিঃসন্দেহে হইতে থাকিবে।

আমরা অন্তত: এই বৎসরে হাজার লোকের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা করিয়া কর্জ্জ চাহিতেছি—[illegible] অসমর্থ হইলে প্রতি মাসে ১০৲ [illegible] করিয়াও গচ্ছিত [illegible] হইলে [illegible]

এই মূলধন নষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। এই কয় বৎসর ধরিয়া আমরা নিজেদের অর্থে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহা আর নিষ্ফল হইবার নহে। এবং এই অর্থে যে সকল ব্যবসা চলিবে তাহার লভ্যাংশ শিক্ষা বিস্তারে ব্যয়িত হইবে। দেশে অনেক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান হইতেছে; এবং ভবিষ্যতে হইবে—গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাগারগুলি ভাঙ্গিয়া বিশেষ লাভ নাই—দেশে নিরক্ষরের সংখ্যাই অধিক—শিক্ষা প্রচারের এই নূতন ব্যবস্থার সহায়তাকল্পে দেশবাসীর এইটুকু অনুগ্রহ আমরা অনায়াসেই আশা করিতে পারি।

বিশ্বাস হইবে কি? দেশের দিক্ হইতে সাড়া পাইলে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিব। এই ক্ষেত্রে এই কথা বলিয়া রাখা ভাল—দেশের যুবকগণ দশ পাঁচ জন মিলিয়াও এই এক শত টাকা পূরণ করিতে পারেন—হাজার হাজার দেশভক্তের নিকট দেশের এই নূতন নির্ম্মাণকল্পে এই সামান্য সাহায্য অতি অকিঞ্চিৎকর; ইহা দান নহে—মাত্র ১০০৲ টাকা—জনে জনে কর্জ্জ দিয়া হাজার কর্ম্মীর কর্ম্ম-[illegible]ষ্ঠান গড়িয়া দিউন—অচিরে ইহার উত্তম ফল [illegible]তলগত হইবে।
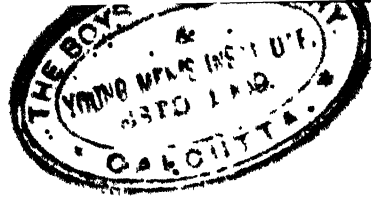
তোমরা অবিচলিত হৃদয়ে পালন করিয়াছ—এস আমরা তোমাদের সাদরে আলিঙ্গন করি।

* * *

এস ফরিদপুরের আশুতোষ কালি, রাইমোহন সেন, এস ঢাকার সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দত্তগুপ্ত, এস কুমিল্লার অতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এস ময়মনসিংহের অমৃতলাল সরকার, এস কলিকাতার প্রভাসচন্দ্র দে, জননীর অঞ্চল-ছাড়া, ইংরাজের কারাগারে তোমরা যে দুর্জ্জয় সাধনা করিয়াছ—যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছ—তাহা দিয়া জননীর যথার্থ সেবার আয়োজন কর। অচল নিষ্ঠা তোমাদের সফল হউক—অব্যর্থ দৃষ্টি দিয়া সত্যকর্ম্ম বাছিয়া লও।

* * *

সহস্রাধিক দেশসেবক—বিধাতার অপ্রতিহত বিধানে এই কয় বর্ষ ধরিয়া যে কঠোর ব্রত সহিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তোমরাই আজ শ্রেষ্ঠ জয়কে অধিকার করিয়া আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছ—অধঃপতিত জাতির মানসিক তেজের পরিচয় দিয়াছ—তোমাদের কি বলিয়া অভিভাষণ করিব—তোমরাও দুঃখিনী মায়ের সন্তান, এক মায়ের কোল-জোড়া ছেলে, ভাই বলিয়াই ডাকিয়া বলি, এস—নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই—এই মহামিলনের মাঝে ভেদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি—ঐক্যই আমাদের স্বভাব ধর্ম্ম—বিরাট ঐক্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলি।

* * *

ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন বাংলার দিগন্তে উষার কনক-ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে—এই নবীন প্রভাতে—পরাৎপর পুরুষের নাম স্মরণ করিয়া নূতন যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। বাঙালীর কর্ম্মপথে বিঘ্ন নাই—থাকিতেও পারে না—জননীর দিব্য আশীর্ব্বাদে বুক আমাদের ভরিয়া গিয়াছে—অহমিকার পাষাণ স্তূপ হইতে মুক্ত সিদ্ধ সন্তানবাহিনী মায়ের জয় দিতে দিতে পথে বাহির হইয়াছে—সাগরগর্জ্জনের মত কোটী-কণ্ঠের প্রণব ঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত—এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে? এস সঙ্কল্পসিদ্ধ মহাকর্ম্মী—অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া—ভবিষ্যতের জন্য নূতন নির্ম্মাণ আরম্ভ করি। বাংলার এই নির্ম্মাণ যুগে—তোমাদের সিদ্ধ হস্ত বরপ্রদ হউক, কল্যাণবিধান করুক—আমাদের আশা "পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।"

* * *

বিপ্লবযুগের ক্ষতচিহ্ন আজও মিলাইল না। কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিয়া দিবার সুযোগ সকলকেই দিতে হইবে। স্বদেশ প্রেমের পূত-প্রবাহে জীবন যাহাদের অবগাহিত—তাহারা দীর্ঘদিন সাধারণ অপরাধীদিগের মত কারাযন্ত্রণা ভোগ করিবে—ভগবানের বিধান ইহা কখনই হইতে পারে না; রাজশক্তি ভাগবত ইচ্ছার অনুগত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা—যে সকল কর্ম্মী আজও গোপন জীবন যাপন করিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশ-দশ-সমাজের সেবা হইতে বঞ্চিত আছেন—তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হউক—যাঁহারা রাজবিধানে আন্দামানে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে যন্ত্রণাময় জীবন অতিবাহন করিতেছেন—তাঁহাদেরও মুক্তি দেওয়া হউক। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যখন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল তখন দেশকর্ম্মীদের অবাধ গতি রুদ্ধ করিয়া বৃথা কলঙ্ক বহন করা রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে নীতিসঙ্গত হইবে না; পরাধীন পরাজিত আমরা—কিন্তু জীবন আমাদের সকল দিক দিয়া যাহাতে উন্নত হইয়া উঠিতে পাবে—তাহার উৎকৃষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে দেওয়া—রাজধর্ম্মের বিরোধী নহে। আমাদের দেশের মাটী খুঁড়িয়া আমরা অন্নসংস্থান করিব, আমাদের দেশকে আমাদের মত করিয়া শিক্ষা দিব, এইটুকু স্বাধীনতা কেবল

চাহিতেছি—দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম হিংসা বিদ্বেষমূলক নহে—অতএব দেশের যে সকল কর্ম্মী এখনও রাজ-বিধির কঠোর শাসনে জীবন্মৃত তাহাদের মুক্তি দাও, একটী দেশসেবকের জীবন যতদিন বেদনাপীড়িত থাকিবে আমাদের হৃদয় ততদিন তৃপ্ত হইবে না। অতীতের বিষাদ স্মৃতি জীবনকে আবার পাছে আচ্ছন্ন করে—সেইজন্য বার বার চীৎকার করিয়া জানাইতেছি—বাংলার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি বিধান যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয় তাহার দিকে রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

* * *

আমরা যে সঙ্ঘ রচনায় জীবন ঢালিয়া দিয়াছি—বাহির হইতে তাহাও যে ব্যর্থ হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার কথা প্রায় আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌছিতেছে এবং এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ—রাজশক্তির প্রতিকুলাচরণ—ভারতে রাজশক্তির হস্তে আমরা পুনঃ পুনঃ যদ্রূপ ব্যবহার পাইয়া আসিতেছি, তাহাতে দেশের বুকে এইরূপ প্রবল বিশ্বাস যে দৃঢ় হইয়া বসিবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন হইতে—সে দিনের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত সকল অভিনয়ই প্রজার প্রাণে রাজশক্তির প্রতি দারুণ সংশয় জাগাইয়া দিয়াছে। আমাদের সঙ্ঘসৃষ্টি কোন্ দিন রাজশাসনের কঠোর চক্রে প্রতিহত হইয়া শক্তিতরঙ্গ কোন্ পথে পরিচালিত হইবে তাহার চিন্তা আজ করিতে পারি না—অতীতের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন হইতে পারে না এরূপ নহে—তবে সব সময় যে উহা হইবেই এমন কথাও নাই। তবে আঘাত পাইলেই প্রতিঘাতের সৃষ্টি স্বাভাবিক হইলেও আমরা অধিকতর সংযমী হইব—সৃষ্টি হউক আমাদের মূল উদ্দেশ্য—নির্ম্মাণই আমাদের কর্ম্ম—ধ্বংস রুদ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া—মঙ্গলময় শিবের শিঙাধ্বনি আমাদের উন্মাদ করিয়াছে। যে সত্য সরল স্পষ্ট পথ পাইয়াছি, এস বাঙ্গালী দলে দলে কাতারে কাতারে আগাইয়া যাই—ভাগবত কর্ম্মে প্রত্যবায় নাই—এই বিশাল পতিত জাতির মেরুদণ্ডে বলসঞ্চয় করাও বড় সহজ কাজ নয়—মৃতকল্প জাতির জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনাও কঠোর তপঃসাপেক্ষ—সে তপঃ সাধনায় নূতন জাতি বিমুখ হইবে না।

* * *

নূতন বন্যা

পঞ্চদশ বর্ষ পরে আবার সাগর তরঙ্গের মত, দেশপ্রেমের প্রবল বন্যায় বাংলা বুঝি ভাসিয়া যায়। বিপিনচন্দ্রের ভৈরব বিষাণ আবার গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের দেশানুরাগ অজস্র ধারায় প্রবাহিত, এই পবিত্র স্বদেশপ্রীতি আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কে আজ জীবন ধন্য করিবে, মায়ের দেউলে জননীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ লইবে—তোমার জীবন, তোমার যশঃ গৌরব, ধন সম্পদ, তোমার জন্য নয়, জননী জন্মভূমির জন্য।

আজ আবার নূতন করিয়া ব্রত গ্রহণের দিন

আসিয়াছে। স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা লইবার এই মাহেন্দ্র-ক্ষণ উত্তীর্ণ হইলে, আবার কত যুগ হয়ত হতাশ দৃষ্টিতে বসিয়া থাকিতে হইবে। প্রাণ যদি জাগিয়া থাকে, হিসাব করিয়া সময় ক্ষেপ করিও না। উঠ, ত্বরিত পদে দেশসেবার তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হও। ভীতি অলসতা নৈরাশ্য সকল জঞ্জাল দূর হইবে। দুর্জ্জয় সাহসে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়। পুরুষোত্তমের অপার করুণায় জয় তোমাদের অবশ্যম্ভাবী।

বাংলার তরুণ প্রাণ আজ যে অমর প্রবাহে বিক্ষুব্ধ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি উত্তেজনার ক্ষণিক আঘাতে ঘাটিয়া থাকে, ইহাতে স্থায়ী ফল কিছুই হইবে না। আর এই জাগরণের মধ্যে যদি মুরারীর তৃতীয় হস্ত বিদ্যমান থাকে, তবে আমরা বলিব, বাংলা দেশ নেতৃগণের উৎসাহে অথবা তাহাদের মুখ চাহিয়া ঘরের বাহির হয় নাই—মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগীতা ব্রত সাধনের জন্যও তাহারা আপনহারা হইয়া ছুটিয়া আসে নাই—বাহিরের অবস্থা রাজনীতির সম্পর্কে সম্বন্ধবিশিষ্ট বোধ হইলেও অন্তরের খাঁটী দেশাত্মবোধই বাংলার যুবকগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। দেশসেবার সত্য সরল পথটী বাছিয়া বাঙ্গালার এই প্রবল শক্তি যদি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর দুর্ণাম রটিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগীতা আন্দোলনে বাংলাদেশ তেমন প্রাণ দিয়া যোগ দিতেছে না দেখিয়া অ-বাঙ্গালীর মধ্যে একটু শ্লেষ বিদ্রূপের ভাব দেখা দিয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীও কিছু মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু একনিষ্ঠ সাধক বাংলার প্রাণ-স্পন্দন নিরীক্ষণ করিবার আশা ছাড়িতে পারেন নাই—তাঁহার নীরব তপস্যা বাঙ্গালীর প্রাণে বিদ্যুৎ হানিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী নাকি বলিয়াছিলেন একটা প্রবল ঝড় তুলিয়া বাঙ্গালীকে আয়ত্ত করিব, তাঁহার সে অভীষ্ট বাঙ্গালী পূরণ করিয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অক্লান্ত পরিশ্রম আজ সার্থক হইল। তিনি বড় ব্যথায় বলিয়াছিলেন—কলিকাতার বিশহাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র শতাধিক জন বিদ্যালয় ছাড়িয়াছে—বাংলায় বুঝি জাতীয় সম্মান ক্ষুন্ন হয়। "ইংলিশম্যান" বিদ্রূপ সহকারে এই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিয়াছিলেন বাঙালী যুবকগণ বুদ্ধিহীন নহে, বাংলায় অসহযোগীতা ব্যর্থ হইবে।

কে জানিত একরাত্রে এমন অঘটন ঘটিবে? কোন্ অজ্ঞাত শক্তি বাংলার তরুণ বুকে অজস্র প্রেরণা ঢালিয়া দিল। সহস্র সহস্র যুবক বিদ্যার মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া দেশমাতৃকার চরণতলে শির নত করিয়া বিজয় হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিল "বন্দে-মাতরম"।

পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে এমনি নূতন বন্যায় বাঙ্গালা একবার ভাসিয়াছিল। সে উৎসাহ পুলক দৃশ্য আজও আমাদের নয়ন সমক্ষে তেমনই জলন্ত ভাবে জাগ্রত রহিয়াছে—তখন দেশযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের মঙ্গল পতাকা স্কন্ধে বহিয়া পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সে স্মৃতি আজ বড় বেদনা-বিজড়িত—বাঙ্গালীর সে সুরেন্দ্রনাথ আর নাই, তিনি যে জীবন্মৃত। চিত্তরঞ্জন দেশপ্রীতির পবিত্র তীর্থে প্রধান পুরোহিত রূপে দাঁড়াইয়াছেন—হে নিঃস্বার্থ দানবীর—উদারপ্রাণ চিত্তরঞ্জন, আমরা তোমায় নমস্কার করি; পঞ্চদশ বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে হলাহল সঞ্চিত ছিল তাহা আমরা আকণ্ঠ পান করিয়া দেশপ্রেম আপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ করিয়াছি—এই পবিত্র যজ্ঞ, তুমি পূর্ণ কর।

জাতীয় জীবনের আন্তরিক ইচ্ছার প্রবল আকর্ষণে চিত্তরঞ্জনকে মায়ের দেউলে টানিয়া আনিয়াছে—চিত্তরঞ্জন গললগ্নীকৃতবাসে দেশমাতৃকার চরণতলে

দেশধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছেন; এইবার সাড়ে চার কোটী বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের গুরুভার বহন করিবার মত সামর্থ্য—যাহাতে তিনি অর্জ্জন করিতে পারেন—তাহার তপস্যা দেশকেই করিতে হইবে। দেশগত-প্রাণ চিত্তরঞ্জনের জীবনবীণায় কোটী কোটী বাঙ্গালীর মর্ম্মগাথা ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে। ওগো দেশবন্ধু, আপনাকে ভুলিয়া দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিয়া ধর—মানুষ যত বড় হউক দেশের ভারকেন্দ্র সহিতে সে পারে না—তুমি মানুষকে ছাড়াইয়া কোটী আত্মার প্রতীক স্বরূপ হও—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দেশের প্রধান কর্ত্তব্য—জাগিয়া থাকা। আজ এই বিরাট উত্তেজনা পরিদর্শন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষীয় নূতন বাংলাকেই আমরা মূর্ত্ত করিয়া দেখিতেছি—যদি জাগিয়াছ—তবে এই আন্দোলন স্রোত যাহাতে সত্য ও মঙ্গল পথে পরিচালিত হয়, তাহার আয়োজন কর। উত্তেজনা উন্মাদনা স্থায়ী হয় না, অপ্রমত্তচিত্ত যুবক যাহারা, ব্যক্তি-বিশেষের মুখ চাহিয়া কালক্ষয় করিও না—ধ্বংস লীলা বাংলার শেষ হইয়াছে—নির্ম্মাণের পথে অগ্রসর হও।

পঞ্চদশবর্ষ ধরিয়া দেশহিতব্রতে জীবনের তিল তিল দিয়া আসিতেছি—নির্ম্মাণ যে কত কঠোর, কত আয়াসসাধ্য তাহা বলিয়া জানাইব কি! দারিদ্র্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া অটুট ধৈর্য্যে যদি কর্ম্মক্ষেত্রে শরীর মন উড়াইয়া উপস্থিত হও তবেই বুঝিবে—ব্রতপূর্ণ করিতে হইলে কিরূপ ঘোরতর তপস্যার প্রয়োজন আছে।

আমাদের এই নিভৃত কর্ম্মশালায় তোমাদের ভৈরব গর্জ্জন প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে, তোমাদের আহ্বান হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছি—নূতন বাংলার জন্মদিন হইতে—তাহার যতকিছু কামনা সাধ্যমত চিরদিন পূরণ করিয়া আসিয়াছি। আজ এই নব উন্মাদনায় জীবনের কতটুকু দিতে হইবে, তাহাও ধীরে ধীরে চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। সত্যই কি তোমরা জাগিয়াছ, অন্তরদেবতার আহ্বান সত্যই কি তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে? আহা, সত্য হউক, চিরনবীন বাঙ্গালী, অতীতের অভিজ্ঞতাটুকু কান পাতিয়া শোন।

ভারতের জাতীয় মহাসভায় দেশনেতৃগণের সর্ব্বসম্মতি ক্রমে দেশের আদর্শ স্থির হইয়াছে—স্বরাজ লাভ করা। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর অধিনায়কত্বে জনসমুদ্র উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—অদূর ভবিষ্যতে স্বরাজ লাভ করিতে হইবে বলিয়া। চাহিয়া যখন স্বরাজ পাওয়া অসম্ভব, তখন জোর করিয়াই উহা গ্রহণ করিতে হইবে। পশুবল নাই, অতএব অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগেই জয়কে করতলগত করিতে হইবে। অবস্থামত ব্যবস্থা দিয়া মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান ভারতের জটিল সমস্যা নিরাকৃত করিয়াছেন। পরাধীন ভারত নতশিরে মহাত্মার জয়গান করিতেছে এবং চিরদিন করিবে।

বাংলাদেশ এ পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। বিগত কলিকাতার মহাসভায় বাংলাদেশ এই অসহযোগীতা প্রস্তাব লইয়া যথেষ্টই আলোচনা করিয়াছিল, ইহার উদ্দেশ্য ও কাল নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর একটা মতবৈশিষ্ট্য ছিল। তার-পর নাগপুর কংগ্রেসে বাংলার যোগ্যতম নেতা চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে পরিগৃহীত হইলে বাঙ্গালী জাতীয় সম্মান রক্ষায় আজ কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাব ব্যাপার অথবা খিলাফৎ লইয়া অসহযোগীতা আন্দোলন উপস্থিত অনুষ্ঠিত হইতেছে না, স্বরাজ লাভই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পবিত্র ব্রত সাধনে যে বাঙ্গালীর প্রাণ আছে সে নীরব হইয়া থাকিবে কেমন করিয়া!

এই আন্দোলনে হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, ইংরাজকে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্পও নাই, এই স্বরাজ যুদ্ধ করিয়া পাইতে হইবে না, চাহিয়াও পাওয়া যাইবে

না—এই স্বরাজ আত্মশক্তি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, আজ যে সহস্র সহস্র যুবক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ, তোমরা বিদ্যালয়গুলি জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে উন্মুখ কেন? তোমরা বিদ্যালয় ছাড়িয়াছ ইংরাজাধিকৃত বিদ্যামন্দিরের ছাঁচ্ বদলাইবার জন্য নহে তো! ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা আছেন, তাঁহার স্থানে চিত্তরঞ্জনকে বসাইলেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? স্বরাজ যদি তোমাদের অভীষ্ট হয়, বাহিরের পরিবর্ত্তন ত তাহার কর্ম্ম নয়; অন্তরকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই এই পবিত্র ব্রত সাধনের মূল উদ্দেশ্য। তোমরা যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবে সেই সরিষার মধ্যেই যে ভূত প্রবিষ্ট হইয়া আছে—একটা বাঁধন ছিঁড়িতে সহস্র বাঁধনের সৃষ্টি করিবে দেখিতেছি।

ভারতের শিক্ষা তপঃপ্রভাবেই সার্থক হইবে। তাহার জন্য কলিকাতার সুরম্য অট্টালিকার প্রয়োজন হইবে না, ঘড়ি ধরিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ক্লাস করিতে হইবে না—সে শিক্ষা মানুষের সত্যরূপ, তাহাকে প্রকাশ করা সাধন সাপেক্ষ। সে সাধনা পাশ্চাত্যের মোহ হইতে একেবারে মুক্তি না পাইলে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যে ভাবে শিক্ষালাভ করিতেছ দেশীয় নামটী বিদ্যামন্দিরগুলির মাথায় লিখিয়া দিলেই যদি তোমরা পরিতৃপ্ত হও—দোহাই তোমাদের বর্ত্তমান পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিও না। ইংরাজের ব্যবস্থা আমাদের অনুকরণ অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল, অনুকরণের দাস হইয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিও না।

তোমাদের জাগরণ মিথ্যা নহে। তোমাদের অন্তর দিয়া যে নূতনই ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তোমাদের জানিতে হইবে, পাইতে হইবে সেই নূতনকে, যাহা দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া প্রকাশ হইবার পথ পাইতেছে না, এই যে আন্দোলন, চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ, ইহা যে তাহারই লক্ষণ মাত্র।

বিপিনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, জাতীয় শিক্ষা অসম্ভব, যদি স্বরাজ না পাওয়া যায়। প্রথম স্বরাজ, তারপর শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষার নেশা যাহাদের আছে, তাহাদের হুজুগ করাই সার হইবে, তবে পাশ্চাত্য-শিক্ষার অনুকরণে যে-সকল জাতীয় নামধারী বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সেগুলি কিছুদিনের জন্য গুছাইয়া উঠিতে পারে।

তারপর স্বরাজ-গঠনের জন্য কর্ম্ম করিতে যাহারা বাহির হইয়াছে তাহাদের কথাই দেশকে ভাবিতে হইবে। দেশনেতৃগণ এই সকল যথার্থ দেশ-প্রেমিকের কর্ম্মনির্দ্দেশ যথাসময়ে দিতে অসমর্থ হইলে, জাগরণের উৎসাহ—তীব্র অবসাদে পরিণত হইবে।

বাংলায় কাজ করিবার অনেক কিছু আছে। কিন্তু কাজ করিব বলিলেই—এমন দুর্ভাগ্য আমাদের—কিছু করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এক কাজ কেবল দেখি যাহা খুবই সহজ, চক্ষু মুদিয়া পারলৌকিক চিন্তা, আর দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ। সে কাজেও বোধ হয় সহস্র সহস্র যুবক লাগিয়া গিয়াছে, বাংলার গ্রামে গ্রামে আশ্রম সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা দরিদ্র, শিক্ষার ক্ষীণ আলোকটুকুও যাহাদের চক্ষে একটি দিনের জন্যও নূতন দর্শন আঁকিয়া ধরে নাই, তাহাদের নিকট যাইতে হইলে যে স্বাস্থ্য যে অর্থ সম্পদের প্রয়োজন, তাহার আয়োজন করিতেই দশটী বৎসর কাটিয়া যাইবে; এমন অসহায় দুর্ব্বল জাতির সব দিকই বন্ধ, কিন্তু আজ এই নবজাগরণের প্রবলশক্তি দিয়া আমাদের জীবনের রুদ্ধ দুয়ারগুলি খুলিয়া ফেলিতে হইবে।

সহস্রাধিক জন দেশভক্ত সম্প্রতি ইংরাজ-শাসনমুক্ত হইয়া বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদিগকে অন্নসংস্থান করিতে হয়, তাঁহাদের দেশ-সেবারূপ পরম ব্রতে কতটুকু সময় দিবার থাকে? এক শত জন যুবক যদি দেশের প্রকৃত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন, অন্ততঃ পাথেয় ও উদরসংস্থানের জন্য প্রতিমাসে দুই হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে—প্রতিজনকে যদি এই টাকা সংগ্রহ করিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে অন্নসংস্থান করিতেই জীবনের সবখানি সময় ব্যয় হইয়া যাইবে, আজ সত্য সত্যই আমাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"।

তবুও পথ আছে। যাঁহারা মানুষ তাঁহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাংলার নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়াছেন। দেশের কাজে কেবল চিত্তরঞ্জনের টাকা দেখিবেন যাঁহারা, তাঁহাদের মত শক্র দুটী নাই। যদি দেশের কাজ করিতে চাও, দেশের মাটী খুঁড়িয়া তোমার রসদ তোমাকেই সংগ্রহ করিতে হইবে আর এই জীবনযাত্রার মাঝেই সহজ ও সরলভাবেই দেশকে তৈয়ার করিয়া তুলিতে হইবে,—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নহে, প্রতি জনের জীবনে নারায়ণকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য। সাড়ে চার কোটী বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা যদি জাগিয়া উঠে, বাংলা আবার দশভুজামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেই—বাঙ্গালীকেই যে নির্ম্মাণ করিতে হইবে স্বরাজ, বাহিরের সকল আশা ছাড়িয়াই অন্তর দিয়া জাতির অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে।

ভারতের জাতীয় মহাসভার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনও আমরা সত্য করিয়া বলিব—ভারতের আদর্শ নিখুঁৎ করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। আজ যে স্বরাজ ব্রত সাধনে সারা দেশ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, ইহার মূলে সত্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিপূর্ণ সত্যকে এখনও কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। মনীষী বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠে মাঝে মাঝে ভারতীয় অমর বীণা ঝঙ্কার দিয়া উঠে, কিন্তু পাশ্চাত্যের গভীর সংস্কার হইতে আমাদের নেতৃগণ এখনও পরিত্রাণ পান নাই।

একবার যদি তোমরা ইউরোপের সম্মোহন হইতে দূরে দাঁড়াইয়া মানসনেত্রে অবলোকন কর, দেখিবে বাংলায় এক নূতন স্বরাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য ভাগবত প্রকৃতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তোমাদের স্বরাজ—যেন ইংরাজহস্ত হইতে শাসনযন্ত্র দেশ-প্রতিনিধিবর্গের হস্তে আসিলেই সম্পন্ন হইবে—এইরূপ আমাদের মনে হয়। আমরা বাংলায় কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আদর্শের অতীত এক নূতন ধরণের স্বরাজ সাধনার চিত্র পাইয়াছি—জানি না ভবিষ্যতে ইংরাজাধিকৃত সমগ্র ভারতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রে শুধু ভারত নয় সমগ্র জগৎ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে; তবে বাংলার স্বরাজ সর্ব্বাগ্রে সাধিত হইবে—এ দৈববাণী আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

তাই বলিয়া সারা ভারতের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে এমন কথা বলিতেছি না, সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ আদর্শ নির্ম্মাণের আদেশপত্র বাংলা পাইয়াছে। বাংলার স্বরাজমূর্ত্তি হইবে জগতের আদর্শ—বর্ত্তমান রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে দূরে দাঁড়াইয়া জননীর বরপুত্র সাধারণের অগোচরে এক নূতন স্বরাজ গড়িয়া তুলিতেছেন। সে গড়া পূর্ণ হইলেই আমাদের মনে হয় ভারতের পাশ্চাত্য মোহ আমূল উৎপাটিত হইবে।

স্বরাজ আমরা পাইয়াছি। এই স্বরাজ পাওয়ার এক প্রকৃষ্ট বিধান আছে। উহাকে প্রকাশ করিয়া তোলাই সাধনসাপেক্ষ। তুমি স্বাধীন মুক্ত এ চৈতন্যে নিজে উদ্বুদ্ধ হও, এবং সেই মুক্ত স্বাধীন আত্মাকে তিল তিল করিয়া প্রকাশ করিতে থাক।

স্বরাজ দিবার নয়, পাইবার নয়। স্বরাজ নির্ম্মাণ করিতে হয়।' তোমাদের স্বরাজ কেহ অমনি লয় নাই যে অমনি প্রত্যর্পণ করিবে—তোমরা 'স্ব'কে হারাইয়াই তোমাদের স্বরাজ হারাইয়া বসিয়াছ ; উহা কালের ঘোর তমোগর্ভে নিমজ্জিত আছে। কমলাকান্ত এই গভীর আঁধার হইতে স্বর্ণপ্রতিমাকে উত্তোলন করিতে বাঙ্গালীকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

এস আমরা জাতির জীবন হইতেই স্বরাজ অধিকার করি। ভারতের মহাযজ্ঞে যে স্বরাজ মন্ত্র দেশের কর্ণে প্রদত্ত হইয়াছে আমরা সে মহাযজ্ঞের প্রদত্ত মন্ত্র উপেক্ষা করিতে পারি না। তবে আমরা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি। আমরা আত্ম-জীবন দিয়াই উহার নির্ম্মাণ পূর্ণ করিয়া তুলিব। স্বরাজের সত্যরূপ খুঁজিয়া পাইয়াছি—এই দৃঢ়জ্ঞানেই আজ তোমাদিগকে আমাদের স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে বলি।

এই নববর্ষে স্বরাজ সাধনার জন্য পর পর তিনটী জিনিষ দেশের বুকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিবার সাধনা করিব,—অর্থ, বিদ্যা, সঙ্ঘ। কে এই স্বরাজ সাধনায় যোগ দিবে ? রাজনীতিক কুহেলিকায় আত্মবিস্মৃত মহাজাতি, আমাদের বাণী তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে কি ?

সন্ন্যাসীর প্রতি

১

হে সন্ন্যাসী রহ তুমি সমাধির মাঝে
আমি চাই দিবানিশি যেই সুর বাজে
বিশ্ব জুড়ি' তাই শুনি কর্ণ দুটী ভরি,—
যেইখানে মহী ওঠে বসন্তে শিহরি',
বর্ষাকাশে যেইখানে পুঞ্জ মেঘে মেঘে
তরুণীর কৃষ্ণ আঁখি-তারা ওঠে জেগে,
যেইখানে দুর্ব্বাদল বৃষ্টি-অনুরাগে
তরুণ স্বপন দেখি ধীরে ধীরে জাগে,
যেইখানে বনে বনে আকুলি ব্যাকুলি
ঠেলা-ঠেলি গুল্মরাজি ওঠে মাথা-তুলি,
পাখী যেথা উড়ে যায় কণ্ঠে কলস্বর,
স্রোতস্বিনী যেথা ছোটে চপল মুখর
সেইখানে—সেইখানে মেলি চক্ষু দুটী
জন্ম ভরি' রব বিশ্বে পুষ্প সম ফুটি'।

২

হে সন্ন্যাসী রহ তুমি একা বনবাসী
আমি চাই দুটী মুখে আনন্দের হাসি
দুটী বক্ষ আলোড়নে ; দুটী হিয়া জুড়ি'
ধীরে ধীরে ফুটি যাবে কমলের কুঁড়ি
প্রণয়ের সমীরণে ; দুটী বাহু ডোরে
চরম নিবিড় সুখ স্বপনের ঘোরে
বদ্ধ হ'য়ে মুক্তি পাবে ; দুটী জোড়া আঁখি
বসন্ত প্রভাতে যাবে সৌন্দর্য্যেতে মাখি'
যাদুকর পরশনে , সহজ সঙ্গীতে
এই দেহ ব্যাপ্ত হবে ঊর্দ্ধের ইঙ্গিতে
অতি সত্য চিরন্তন :—নয়-নয়-নয়
এই দেহ এই প্রাণ নহে পরাজয়
এ যে অতি মানুষের চরম গৌরব
স্বর্গ আর মর্ত্ত্য দুঁহু মিলিত বিভব।

৩

হে সন্ন্যাসী রহ তুমি একেলা একেলা
আমি চাই এই বিশ্বে ঊষা সন্ধ্যা-বেলা
লক্ষ নরনারী সাথে করি' বিনিময়
সুখ দুখ চলি' যাই ; আমার হৃদয়
নহে শুধু আপনার একেলার ধন
যদি তাহে নাহি ওঠে বিশ্বের কম্পন
বিশ্বের ক্রন্দন যদি নাহি তাতে ফোটে
বিশ্বের আনন্দ যদি নাহি তাতে জোটে
মৃত্যুর মন্দির ধীরে মর্ম্মতলে জানি
পাবে নিজ প্রতিষ্ঠান ; অহঙ্কার বাণী
বৈরাগ্যের স্বার্থ ভরা যদি রহে তুলি'
দৃপ্ত আকাঙ্খায় শিব—কণ্ঠ যাবে ভুলি'
সকল আনন্দ গান—নামিবে মরণ
লয়ে মৃত্যুমন্ত্র শুধু শাস্ত্র-আলাপন।

৪

হে সন্ন্যাসী জ্ঞানী যদি—কিন্তু নহ নহ
নহ ত রসিক ; এই বিশ্বে অহরহ
দিকে দিকে ফোটে যেই কৌতুকের রাশি
বুকে বুকে বাজে যেই ইন্দ্রজাল বাঁশি
জীবনের আলোড়নে—হতভাগ্য হায়
বিধি না দানিল তব প্রাণের বীণায়
সে কৌতুক সুর জাগে ; ওরে অরসিক
এই বিশ্ব এই সৃষ্টি লক্ষ গুণাধিক
তোমার কার্পণ্য হ'তে ; তব অস্বীকার
কভু না থামাবে ওই কৌতুক ঝঙ্কার
মহাকবি হাতে যেই মহান্ বীণায়
বাজে অহর্নিশ ; এ বিশ্বের প্রতি রেণুকায়
যে-স্পন্দন যে-ক্রন্দন নিয়েছে আশ্রয়
যুগ যুগান্তরে তার নাহি পরাজয়।

দেব-জাতির কথা

নূতন জগতের নূতন মানবজাতির কথা আমরা বলিতেছি। মানুষ সিদ্ধ-পুরুষ হইবে দেবতা হইবে, মানুষের সমাজ দেব-সঙ্ঘ হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাহার প্রণালী কি, উপায় কি—কঃ পন্থা ? দুই একজন মানুষ সাধনা করিয়া মুক্ত সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত সমাজের পরিবর্ত্তন হইবে কি রকমে ? সাধারণ মানুষের শক্তিও নাই অবসরও নাই যে বড় বড় আদর্শ লইয়া চিন্তা করিতে পারে, সেজন্য তপস্যা করিতে পারে। সাধারণ মানুষ যে কেবল বাহ্যিক জালজঞ্জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা নয় ; ভিতরেও কত প্রাচীন সংস্কারের কত সনাতন প্রাকৃত প্রেরণার বশীভূত সে। সাধারণ মানুষের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইবে কিরূপে ? এক হইতে পারে যদি কোন অবতার বা অবতারকল্প পুরুষ (Superman) আসেন, আর তাঁর স্পর্শে যদি মানুষ সব বদলাইতে থাকে। সাধারণ মানুষের যোগী হইবার সুবিধাও নাই, ইচ্ছাও নাই—তাহাদের মুক্তির একমাত্র উপায় ভগবৎ প্রসাদ।

এ রকম যে না হইতে পারে, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। যে সব অবতার-কল্প মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই ধরা যাউক না।
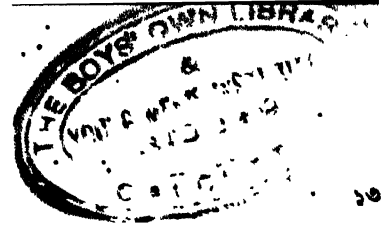
বুদ্ধদেব কি রকমে মানবজাতির একটা বেশ বৃহৎ অংশকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন, তাহাদের মনের একটা বিশেষ গঠন দিয়া গেলেন, জীবনের একটা ছাঁচ গড়িয়া দিলেন। চৈতন্যও তাঁহার ভাবে একটা মানব গোষ্ঠীই তৈয়ার করিয়া লইলেন। মহম্মদের এদিক দিয়া কি রকম শক্তি ছিল, সাধারণ মানুষের মন প্রাণকেই এমন কি দেহটিকে পর্য্যন্ত একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলিবার কি প্রতিভা বা তপোবল ছিল, তাহা এই সুদূর বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লীর ক্ষেতে একটি মুসলমান চাষীকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিব। অবতারদের মহাপুরুষদের এ রকম শক্তি থাকে অসম্ভব তাহা বলা চলে না—শুধু ভবিষ্যতে যে অবতার বা মহাপুরুষ আসিবেন তাঁহার হওয়া দরকার সকলের চেয়ে বড় অবতার, সকলের চেয়ে শক্তিমান মহাপুরুষ; কারণ, তাঁহার কর্ম্ম বিশেষ সঙ্ঘ তৈয়ার করা নয়, কিন্তু সমস্ত মানবজাতিকে এক মহাধর্ম্মে মহাসঙ্ঘে বাঁধিয়া দেওয়া। তাই যদি হয়, তবেই সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণ সম্ভব।

কিন্তু একটা কথা এখানে। যত মহাপুরুষ সব আসিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা মানুষের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন কি ও কতখানি? বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ বা চৈতন্য কয়জন মানুষকে মুক্ত অথবা সিদ্ধ করাইয়াছেন তার ইতিহাস আমাদের জানা নাই; কিন্তু এটা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মোসলমান বা বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া যে মানুষের গোষ্ঠী বর্ত্তমান তাহারা মুক্তও নয়, সিদ্ধও নয়, প্রাকৃত মানুষ হইতে তাহাদের পার্থক্য যে খুব বেশী—তা মনে হয় না। মহাপুরুষ লোকের মনের উপর প্রাণের উপর—এমন কি দেহের উপরও—তাঁহার একটা বিশেষ ছাপ রাখিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তার মূল্য যে কিছু আছে তা ত দেখি না। বরং এই মনে হয় মহাপুরুষ যতখানি লোককে তাঁর কাজে লাগান বা না লাগান, লোকে তার বেশী মহাপুরুষকে তাদের কাজে লাগায়; মহাপুরুষ যতখানি লোককে উঠাইয়া ধরেন বা না ধরেন, লোকে তার বেশী মহাপুরুষকে নামাইয়া ফেলে। যে দিব্য উপলব্ধি মহাপুরুষ লোকের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন, লোকে সেটিকে আপন সহজ প্রাকৃত স্বভাবের মধ্যে বিকৃত করিয়া ফেলিয়া মিশাইয়া ধরে; দিব্য সত্য প্রাকৃত স্বভাবকে আপনার মধ্যে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করিয়া লয় না, প্রাকৃত স্বভাবই দিব্য সত্যকে আপনার স্তরে টানিয়া লইয়া আপনার মত করিয়া লয়। মহাপুরুষেরা কার্য্যতঃ প্রাকৃতলোকের প্রাকৃতস্বভাবের তৃপ্তির জন্য নূতন নূতন বিষয় বা পথ আবিষ্কার করিয়া দেন মাত্র। মহাপুরুষের জীবিতকালে, গোড়ায় যে ধর্ম্ম যত বিশুদ্ধ যত উন্নত যত শক্তিমান থাকুক না কেন, মহাপুরুষের তিরোভাবে, উত্তর কালে, সব ধর্ম্মেই দেখি এই এক পরিণতি।

প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের ভিতরের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় পরিবর্ত্তিত না হয়, তবে মহাপুরুষ আসিয়া কি করিবেন? পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন হইয়াছে, চিরদিন তাহাই হইবে। দুই একজন তরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সমাজের উপায় কি? দিব্য মানুষের সমাজ গড়িতে হইবে, কিন্তু সেজন্য দরকার প্রত্যেক মানুষের দেবতা হওয়া। মানুষের ভিতরে যদি একটা জাগ্রত দেবতা থাকে, সে দেবতা যদি সজ্ঞানে চায় আপনার প্রতিষ্ঠা, তবে মহাপুরুষ অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু ভুলাইয়া, মাতাইয়া ত মানুষকে স্থায়ীভাবে দেবতা করা সম্ভব নয়—সে ত আবু হোসেনের এক রাত্তিরের বাদশাগিরি। সুতরাং মহাপুরুষের উপর সব নির্ভর করা চলে না; নির্ভর যদি করিতে হয় তবে বিশেষভাবে করিতে হইবে মানুষের স্বভাবের উপর, সমাজের

নৈসর্গিক গতির উপর, প্রকৃতির ক্রম পরিণতির টানের উপর।

নূতন মানব, দেব-সমাজ আসিবে কি রকমে তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি যদি পৃথিবীতে নূতন নূতন জীব-শ্রেণী আসিয়াছে কি রকমে তার ইতিহাসটা দেখিয়া লই। প্রাণী-জগতে আছে নানা শ্রেণীর স্তর; নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সে-গুলিকে মোটামুটি এই রকমে সাজাইতে পারি—স্পঞ্জ, ক্রমি, পোকামাকড়, শামুক আর সকলের উপরে মেরুদণ্ড-যুক্ত জীব; এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আছে প্রথমে ডিম্বজাত জীব—যেমন মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, আর তারপর আছে স্তন্যপায়ী যেমন সিংহ ব্যাঘ্রবৎ ইতর জন্তু, বানর ও মানুষ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন এই যে নানা শ্রেণীর নানা জাতির প্রাণী ইহারা সকলেই পৃথিবীতে চিরকাল ছিল না—যে রকমে ইহাদের স্তর বিভাগ করা হইয়াছে সেই রকমে ক্রমে ক্রমে ইহারা আবির্ভূত হইয়াছে। মূলে কিন্তু ইহারা একদিন একই ধরণের জীব ছিল, এই মৌলিক জীবজাতির ক্রম পরিণতি ফলেই স্তরের পর স্তর ফুটিয়া উঠিয়াছে—জীবজগতে এত বৈচিত্র্য ও উন্নতি দেখা দিয়াছে। এখন একটি কথা এইখানে—এক শ্রেণীর জীব আর এক শ্রেণীতে পরিণত উন্নত হয় কি রকমে? প্রথমে বিশ্বাস ছিল (Darwin যেমন বলিতেন) যে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে বদলাইয়া এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর জন্ম দিয়াছে। একটা শ্রেণীর একটি বা কয়েকটি জীবের মধ্যে প্রথমে একটা ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, সেইটি একটা বিশেষ আব-হাওয়ার, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জীবন-ধারণের নিতান্ত উপযোগী হইয়াছে বা হইবার উপক্রম করিয়াছে—তখন সেই জীবটি বা জীবক'টির সন্তান সন্ততিতে সেই পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট হইয়া চলিয়াছে, এবং পরে ইহারা সকলে মিলিয়া একটা বিশিষ্ট নূতন শ্রেণীই গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সমস্যা এই যে এ রকম ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইয়া উঠে কি না? গোড়ার ছোট ছোট পরিবর্ত্তন (variation) একত্র হইয়া ওরকম বৃহৎ একটা ধারার সৃষ্টি করিতে পারে কি না? তারপর এক এক শ্রেণীর জীব আস্তে আস্তে বদলাইয়া যদি আর এক শ্রেণীতে পরিণত হয়, তবে মনের এই আস্তে আস্তে বদলানের কালের জীবশ্রেণী কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? এই missing linkএর চিহ্ন পাইবার জন্য কত যায়গায় ঢোঁড়া খোঁড়া হইতেছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। তাই আজকাল আর একটা বিশ্বাস হইতেছে (De Vries যেমন বলিতেছেন) যে এক জীবশ্রেণী আর এক জীব-শ্রেণীতে পরিণত হয় ছোট ছোট পরিবর্ত্তনের সমাহার ফলে বিবর্ত্তনের স্তর আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া ওঠে না, কিন্তু এ কাণ্ডটা হয় হঠাৎ (sudden mutation) প্রকৃতি চিরদিন গড়াইতে গড়াইতে চলেননা, তিনি মাঝে ঝম্প প্রদান করিতে জানেন(*Per saltum*)। ভিতরে ভিতরে আস্তে আস্তে একটা কি ধীরে ধীরে তৈয়ার হইলেও হইতে পারে কিন্তু তার ইতিহাস আমরা জানি না, আমরা যখন চোখ মেলিয়া চাই তখন দেখি একটা স্তর কোন সময়ে আর একটা স্তরে উঠিয়া পড়িয়াছে।

মানুষের পরে যে একটা নূতন জীবের কথা আমরা বলিতেছি, তাহা আসিবে কি না জড়-বিজ্ঞান সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না। মানুষ পর্য্যন্ত আসিয়াই যে বিবর্ত্তনের ধারা থামিয়া যাইবে তাহাও জড়বিজ্ঞান বলিতেছে না। তবে মানুষের মধ্যে বাছাই করিয়া মানুষকেই মাজিয়া ঘষিয়া এক রকম নূতন মানবজাতি গড়ার চেষ্টা জড়বিজ্ঞানে দেখা যাইতেছে—এইজন্যই নূতন একটা বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে, নাম তার

Eugenics, বাংলায় মাঝে মাঝে তাকে বলা হয় সুপ্রজনন বিদ্যা। কিন্তু এ বিদ্যার দৌড় কতখানি তাহার আলোচনা আমাদেব বর্ত্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। আমরা বিচার করিতেছিলাম মানুষের পরে একটা নূতন জীবশ্রেণী—তাহাকে অতিমানুষ অথবা দেবতা অথবা সিদ্ধ যে নামই দেই না কেন—যদি আবির্ভূত হয়, তবে তাহা হইবে কিরূপে?

মানুষ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া দেবজাতির জন্ম দিতে পারে। কিন্তু আর এক সম্ভাবনাও আমরা দেখিয়াছি। বানর আস্তে আস্তে পবিবর্ত্তিত হইয়া যে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আধুনিকের মীমাংসা যেটি অর্থাৎ একটা হঠাৎ পরিবর্ত্তনেব ফলে বানবজাতি হইতে মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এইটিই বেশী সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মানুষের স্বভাবকে আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন কবিতে হইবে, একটি একটি করিয়া তাহার গলদ বাহির করিতে হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তি ঘোর তপস্যা করিতে থাকিবে, তিলে তিলে পঞ্চাগ্নির মধ্যে আপনাকে পবিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে —এই রকম পথের ধারা যখন ছকিয়া লই তখনই সকল আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। কিন্তু পথটা যে এই রকমই হইবে, জড় বিজ্ঞানও ত তাহা বলিতেছে না।

পথ কতকটা এই রকমও কল্পনা করা যাইতে পারে। মানুষের ভিতরে একটা বিবর্ত্তনের তোড় চলিয়াছে—কোথাও সেটা স্ফুট জাগ্রত, কোথাও গুপ্ত অজ্ঞাত। মানুষের মধ্যে সাধক যাঁহারা, মহাপুরুষ যাঁহারা তাঁহাদেরই মধ্যে প্রকৃতির কল কারখানাব চেহারাটি ফুটিয়া গোচর হইয়া দেখা দিয়াছে, তাঁহাদেরই মধ্যে ধরা পড়িয়াছে প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রণালী, তাহার নিবিড় রহস্য। অন্যত্র কবির মধ্যে, দার্শনিকের মধ্যে, ভাবুকের মধ্যে, চিন্তাশীলের মধ্যেও উহাই আধ আধ দেখা দিয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে সেই কাজই চলিয়াছে কিন্তু গোপনে, তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহাদের মগ্ন চেতনায়। এখন এই ভিতরের গড়া যখন এমন পাকা হইয়া উঠিবে যে তাহাকে আর রাখা যায় না, ধরিত্রীর দশমাস যখন পূর্ণ হইবে তখন হঠাৎ একদিন খোলস ভাঙ্গিয়া পড়িবে, দেখিব কি অপূর্ব্ব প্রজাপতি কোষমুক্ত হইয়া আপন অখণ্ড শ্রীতে বিরাজমান।

অবশ্য এমন কথা বলা চলে না যে মানুষ মাত্রেই সেই দেবজাতিতে পরিণত হইবে। দেবজাতির অন্তরাত্মা যে-মানুষেব মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার বসবাস করিবার স্থান পাইয়াছে সেই সেই মানুষই দেবতা হইবে, অন্ততঃ দেবতার জনক হইবে; সে দেব-অন্তরাত্মা যেখানে বিফল হইয়া ফিরিয়াছে তাহা মানুষই থাকিয়া যাইবে বা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। জীব-বিদ্যা ত স্পষ্টই বলিতেছে যে প্রতি বৎসর না হউক প্রতি দশ বৎসব অন্তব অন্তর একটা না একটা শ্রেণী লোপ পাইতেছে। এটা দুঃখের কথা হইতে পারে, কিন্তু এই রকম হইতেছে ও হইবে। স্তন্যপায়ী জন্তুরা (mammalia) তাদের পূর্ব্বগামী বিপুলকায় সরীসৃপ (Reptilia) দিগকে একঠেসা করিয়া রাখিয়াছে অথবা তাড়াইয়া দিয়াছে (ইহাদের ধ্বংসা-বশেষ এখনও আমাদিগকে চমৎকৃত স্তম্ভিত করিয়া দেয়), সেই রকম মানুষও আসিয়া ক্রমে স্তন্যপায়ী জন্তুকে, অণ্ডজ পক্ষীকেও ধ্বংস করিতে করিতে চলিয়াছে, নিজের কাজে লাগে শুধু সেই গুলিকেই বাঁচাইতেছে। আবার মানুষের পরে আসিবে যাহারা তাহাদের আগমনের ফলে মানুষ থাকিয়া যাইবে যাহারা তাহারা যদি ছায়ায় পড়িয়া যায় বা ক্রমে ক্রমে লোপ পায় তাহাও আশ্চর্য্যের কিছুই নয়।

কিন্তু এ সব পরের কথা। আগে আমাদিগকে নব জীব-শ্রেণীর সৃষ্টির কথা ভাবিতে হইবে, ভিতরে ভিতরে গড়িয়া উঠা ব্যাপারটির উপর দৃষ্টি দিতে হইবে।

কারণ, এ কথা সত্য, এ যাবৎ জীববিভাগে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা হইয়াছে অজ্ঞানতঃ—চতুষ্পদ জন্তু কি রকমে বানরের জন্ম দিল তাহা চতুষ্পদ জন্তু জানে না, বানর কোন্ প্রণালীতে মানুষের জন্য স্থান করিয়া দিল তাহার গুপ্ততত্ত্ব বানরের চেতনায় নাই; প্রকৃতির কোথাও একটা সে চেতনা থাকিতে পারে, কিন্তু পরিস্ফুট হইয়া তাহা কখনও দেখা দেয় নাই, সব কাজটাই হইয়াছে যেন একটা গোপন অন্তরে যবনিকার আড়ালে, জাগ্রত চেতনার বাহিরে। এটা অতীত ইতিহাসের কথা। কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাসও যে তাই বলিয়া এ রকমই হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ, যে মুহূর্ত্তে মানুষ আসিয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই অন্তর পদার্থটা স্বচ্ছ হইয়া দেখা দিয়াছে, যেটা ছিল গোপন মগ্নচেতন অন্তঃসংজ্ঞ সেইটাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে ব্যক্ত সজাগ বহিঃপ্রজ্ঞ; আর সেই উদ্বোধনের আত্মবোধের সাথে ফুটিয়া উঠিয়াছে সজ্ঞান চেষ্টা। ইতর জীবজগতে যে বিবর্ত্তন হইয়াছে সেটা হইয়া গিয়াছে যেন অন্ধ প্রকৃতির চাপে আত্মহারা ভাবে—কিন্তু মানুষে উঠিয়া সেই প্রকৃতি চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে, সেই মানুষের পরে যে বিবর্ত্তন ঘটিবে সেটার মধ্যে একটা সজ্ঞান চেষ্টার বা শক্তি প্রয়োগের ভাগ থাকিবে, তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

মানুষের মধ্যে যুগে যুগে দেবজাতির একটা স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, মানুষ সজ্ঞানে চেষ্টা করিয়াছে পৃথিবীর স্থূল প্রতিষ্ঠানে তাহার একটা রূপ দিতে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘে এই চেষ্টারই একটা নিদর্শন পাই। এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা যে সফল হয় নাই তার অর্থ এমন নয় যে তাহা সফল হইবার জিনিষ নয়। মানুষ পর্য্যন্ত উঠিতে, মানুষের রূপ দিতে প্রকৃতি ত কত ছাঁচ বানাইয়া আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, অথবা এক পাশে ঝাঁট দিয়া পুঞ্জ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই রকম মানুষের মধ্যেও আর একটা জীবকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রকৃতির যে সজ্ঞান চেষ্টা চলিয়াছে তাহার প্রত্যাখ্যাত ভগ্ন নিদর্শন সব রহিয়াছে প্রাচীন ধর্ম্মসঙ্ঘ সমূহের মধ্যে। সে সব চেষ্টা যে একেবারে বিফল হইয়াছে তাহা নয়—প্রত্যেক চেষ্টা এক একটা নূতন উপাদান আনিয়া দিয়াছে, মানুষের মধ্যে সেই দেব-আত্মাকে ধীরে ধীরে পুরুট করিয়া আনিয়াছে। এখন বর্ত্তমান যুগে আবার যে একটা নূতন চেষ্টার ঢেউ দেখিতেছি, তাহা এই রকম একটা মধ্যপথের আংশিক চেষ্টা না পূর্ণ সফলতার জোয়ার তাহা দেখিতে হইবে আমাদের জ্ঞান-দৃষ্টি দিয়া, পরিচয় লইতে হইবে কর্ম্ম দেখিয়া ফল দেখিয়া।

মানুষের মূল কর্ম্মচেষ্টা, তাহার অন্তরাত্মার ধর্ম্ম এই রকমই একটা মহাব্রতে নিযুক্ত হইতেছে ও হইতে চাহে—এই নিয়োগ কোথাও খুবই স্পষ্ট আত্ম-প্রতিষ্ঠ, কোথাও তাহা কিছু আবৃত, সন্দেহদোলায় দুল্যমান। এই ব্রতের অগ্রণী যাঁহারা তাঁহাদেরই মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে ফুটিবে নব জাতির নূতন রূপ। ইহার মুখ গোড়ায় একটা হইবে, কি বহু হইবে, এক অবতারকে অগ্রে লইয়া ইহা বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে, কি বহু মহাপুরুষের চারিদিকে গণ্ডী লইয়া বহুখাত কাটিতে থাকিবে, পরে গণ্ডী সব ভাঙ্গিয়া গিয়া একই মহাসাগর সৃষ্টি করিবে —ঠিক কি ভাবে হইবে সেটা কিন্তু আসল কথা নয়।

আসল কথা ভিতরের আহ্বানটীকে প্রেরণাটীকে ধরা স্পষ্ট করিয়া চেনা। এই আহ্বানকে প্রেরণাকে যাহারা স্বীকার করে, পাইতে চায় তাহারাই নবযুগের সাধক, নবযুগের যোগী, দেবজাতির প্রতিষ্ঠাতা। অন্য ধর্ম্মে অন্যে যাঁহাদের তৃপ্তি নাই, তাঁহারা নিজের ভিতরে দেব-আত্মাকে জাগাইবেন, নিজের ভিতরেই

দেব-জাতিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা ব্যষ্টি ভাবে চাহেন তাঁহারা সেই ভাবেই চলিবেন, যাঁহারা সঙ্ঘ বা চক্র বাঁধিয়া এ সাধনা করিতে চাহেন তাঁহারা তাহাই করিবেন। এই ভিতরটা একবার ঠিক হইলে, ঠিক পথে চলিলে এবং তাহারই সত্যে ও ঋতে কর্ম্ম করিয়া চলিলে বাহিরের আকারে প্রতিষ্ঠানে সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, পূর্ণতা, ঋদ্ধতা আপনা হইতেই আসিবে।
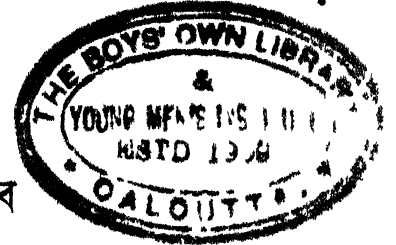
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

বাঙ্গালী জাগিয়াছে। এ জাগরণের মূল যে কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। জাগরণকাল যুগের পর যুগ আসিয়া আমাদিগকে সার্থক ও উজ্জ্বল করিয়া তুলে। কিন্তু সকল হৃদয়ে সকল যুগই স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় না, আবার ইতিহাস একরূপ নিরপেক্ষ ও আলেখ্যস্বরূপ হইলেও অনেক সময়ে তাহার পাতায় সকল চিত্র স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয় না। ইতিহাস লেখে মানুষ, যাঁহাদের হৃদয়ে নূতনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ের অবদানগুলি বহুকষ্টে একত্র করিয়া মানুষে ইতিহাসের জীবনদান করিয়া থাকেন। জীবন্ত ইতিহাসও বিরল, তদুপরি জাতির জীবনবেদস্বরূপ প্রাণময় ইতিহাসেও আমরা জাতীয় জীবনের সকল স্পন্দন অনুভব করিতে পারি না। মানুষের শক্তি সসীম, ইহা তাহার এক প্রধান কারণ, যে-মানুষ নিজের জীবনে জাতীয় জীবনের যে-খেলাটী স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার দ্বারা ইতিহাস লিখিত হইলে জাতীয় জীবনের সেই খেলাটী সামান্য ম্লান হইয়া পড়িবেই। তদ্ভিন্ন জাতীয়-জীবনবিকাশে এমন কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহাদের স্থায়িত্বকাল খুবই অল্প অথচ যাঁহারা গভীর ভাবে জাতীয় জীবনকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়া তুলেন। কাহারও কাহারও প্রভাব এত অধিক যে, জাতির জীবনকে তাঁহারা এক বিশেষ পথে ধাবিত করেন। জাতির মনোজগতে ও অন্তঃস্থলে যাঁহারা কেবল সূক্ষ্মভাবেই কার্য্য করিয়া থাকেন, সকল সময়ে তাঁহাদের প্রভাবের কথা অধিকাংশের নিকট অপরিচিতই থাকিয়া যায়। আবার এমন বিচিত্র লোকও জন্মিয়া থাকেন, যাঁহারা জাতির সাধারণের প্রাণ ও মন লইয়া পুরাদমে 'ডিগবাজী' খেলেন, অথচ তাঁহাদের সূক্ষ্ম সত্তা বিশেষভাবে জাতির চিন্তাবীর জ্ঞান-বীর প্রেমিক ও কবিকে আকণ্ঠ স্বদেশসুধা পান করাইয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশের নূতন পথের পথিক করিয়া তুলেন। এমন লোক নিশ্চয়ই অদ্ভুত, এবং ইঁহাদের জীবনের সকল চিত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া যদি ইতিহাসের প্রদর্শনীতে সাজাইয়া তুলিবার কাহারও সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমরা হৃদয়ের সহিত বরণ করিয়া লই।

আমাদের মতে স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বাঙ্গালার সেইরূপ এক অদ্ভুত পুরুষ। বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের বীজপুরুষ যে কে, তাহা লইয়া মতান্তর থাকিতে পারে—আমরা কিন্তু স্বর্গীয় উপাধ্যায়কে স্বদেশী

যুগের এক মহাপুরুষ বলিয়া জানিয়া আসিতেছি। আমরা তাঁহাকে যেরূপে জানিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার আমাদের শক্তি নাই, তথাপি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনলেখকের আবির্ভাবের আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে অল্প কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। 'সন্ধ্যা'র সম্পাদকরূপে ব্রহ্মবান্ধব আমাদের নিকট পরিচিত, সন্ধ্যার জ্বলন্ত ভাষা আমাদের প্রাণে আগুন ছড়াইয়া দিত। প্রাণের মধ্যে তাঁহার ভাষায় যে তেজ আমরা অনুভব করিতাম, যদি কেবল প্রাণ দিয়াই আমরা তাহা মাপিয়া শেষ করিয়া ফেলি, ব্রহ্মবান্ধবকে জানা আমাদের সার্থক হইবে না। তিনি তাঁহার বিশাল হৃদয় দিয়া মনোজগতে কিরূপ অটুট বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তাঁহার আশ্রমের বালকবৃন্দের মুখে সে-কথা শুনিয়া যদি আমরা তাঁহার পরিচয় শেষ করি, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমাদের যথেষ্ট অন্যায় করা হইবে। তাঁহার বিশাল হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল বাঙ্গালী সাধারণকে জুজুর ভয় হইতে মুক্তি প্রদানে করিতে। বাঙ্গালী যখন সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই তাহাকে বিদেশীর নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে, এভাব লইয়া বাঙ্গালী যখন একেবারে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় পশ্চিমমুখী হইয়া অধঃপাতের পথে চলিতেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তখন বজ্রনির্ঘোষে তাহাকে মুক্তি ও স্বাধীনতার বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন—কিন্তু সে বার্ত্তা বাঙ্গালী সাধারণের নিকট পৌঁছায় নাই। স্বামীজী অতি অল্পদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন, তদ্ভিন্ন তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই ঘোষণা করিয়াছিলেন; ভারতের এই মুক্ত ও স্বাধীনভাবকে অক্ষুণ্ণ ও সদা সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য তিনি আধ্যাত্মিক আলোচনা ও যুগোপযোগী জগৎসেবার এক বিশিষ্ট সাধন-পথ সৃজন করিতেই তাঁহার সকল শ্রম ব্যয়িত হইয়াছিল। সেইজন্য সাধারণকে লইয়া তিনি বিশেষ কিছু করিয়া যান নাই। আবার বোধ হয় সাধারণকে লইয়া সাধারণভাবে কাজ করাও তাঁহার দ্বারা সুসিদ্ধ হইত না।

সাধারণ লোকে ইংরাজকে ভাবিত একটা মস্ত ভয়ের জিনিষ বলিয়া। দেবতাই বল, অসুরই বল, আর যাদুকরই বল, যাহা বলিলে সে তাহার নিকট বৃহৎ অদ্ভুত ও শক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত হইত, ইংরাজ তাহার নিকট সেইরূপ এক অপরূপ জীব বলিয়া গণ্য হইত—সেই ইংরাজের সম্মুখে কাজেই সে জড়সড়। জাতির সাধারণ জীবনে এই জড়ত্ব না ঘুচাইলে জাতির বুকের উপর দাঁড়াইয়া আমরা কিছুতেই আমাদের অমরবীর্য্য প্রকাশ করিতে পারি না—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের হৃদয়ে এইভাব বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য তিনি যেমন একদিন ভারতসভ্যতার অনন্ত প্রসারিণী ভাবময়ী সত্তা লইয়া রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, কুমারকৃষ্ণ প্রভৃতির নিকট এক অতিমানুষরূপে গণ্য হইয়াছিলেন—এবং আমাদের মনে হয় একরূপ তাঁহারই নিকট প্রেরণালাভ করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ একেবারে দেশকে স্বদেশীভাবে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছিলেন—সেইরূপ সন্ধ্যার পাতায় পাতায় আগুন ছড়াইয়া দেশের সাধারণ লোকের সাধারণ মনগুলা ধরিয়া অগ্ন্যুত্তাপে এরূপ তাজা করিয়া দিতেছিলেন —যেন তাহারাই তাঁহার "স্বরাজের" গঠন উপাদানরূপে বিশেষভাবে পরিগণিত হইয়া উঠিবে। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল সন্ধ্যার দ্বারা তিনি বাঙ্গালীর মর্ম্ম হইতে ইংরাজের জুজুর ভয় তাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেই মনকে অতঃপর স্বরাজগঠনের উপাদান সঞ্চয়ে ব্যাপৃত করিতে হইবে—তজ্জন্য তিনি 'স্বরাজ' কাগজ বাহির করিয়াছিলেন—বাঙ্গালীকে দেখাইবার জন্য যে কোথায় তাহার শক্তি নিহিত আছে এবং কিরূপে তাহা বিকশিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহা ভিন্ন তাঁহার আর একটা বিশাল কার্য্যের আভাসও আমরা পাইয়া থাকি। যে বিশাল মনোবৃত্তি আমরা তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি, তিনি সেই-রূপ মনোবৃত্তির অনুশীলন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে যে আশ্রমটী দেখিতাম তাহা দেখিয়া আমরা তাঁহার ঈপ্সিত আশ্র-মের ধারণাই করিতে পারি না। তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা একটা গভীরতর সাধনামূলক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। নিজের ইচ্ছা ছিল তাহাই গঠন করিবার জন্য। সময় পাইলেন না; কিন্তু সে প্রেরণা দেশের মধ্যে থাকিয়াই গিয়াছে। তাঁহার আত্মা ভাবময় প্রদেশে বিচরণ করিয়া যে উজ্জ্বল উজ্জ্বল চিত্র দর্শন করিত, তাহাব একটা কি দুইটা চিত্রের স্পর্শ লাভ করিয়া বাংলার সুধীসমাজ একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের দানের দ্বারা বাঙ্গালার স্বদেশীর মূল পত্তন হইয়া যায়—তাঁহার এ প্রভাব এক এক বিশিষ্ট মনোবৃত্তির উপর কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনোবৃত্তিকে আদর্শ করিয়া বিভিন্ন-মুখে প্রকাশিত হইবার জন্য একটা ক্ষেত্রের, বালক ও যুবকদিগের একটা শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষ আবশ্যকতা তিনি অনুভব করিতেন। কিন্তু পরিব্রাজক উপাধ্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া, ভারতের সাধারণ লোকের জড়ত্বরূপ যে তাহার জীবন বিকাশের একান্ত পরি-পন্থী, ইহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিয়াছিলেন এবং ইংরাজ জুজুর ভয়েই যে তাহাকে এরূপ জড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন; তজ্জন্য সেই জুজুর ভয় ভাঙ্গাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রধান কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি খুব অসময়ে দেহত্যাগ করেন। তথাপি সুধী সমাজের চিন্তাজগতে সাধনমূলক শিক্ষার ও 'স্বরাজ' গঠনের মনোবৃত্তি আনয়নে তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে বিশেষভাবেই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। বাহিরের ইতিহাসের স্থূল পৃষ্ঠায় তাহা স্বীকৃত হইবে কি না জানি না। আমাদের কথা আমরা জানাই-লাম। আমরা দেখিতেছি—আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং বিশ্বের সকল শক্তি আমাদের মধ্যে নিহিত আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া বাঙ্গালী যে নূতন ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছে—ইহাতে স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধবের অমর আত্মার গোপন প্রেরণাই যে প্রকাশ পাইতেছে তাহা অন্ততঃ আমাদের নিকট অস্বীকৃত হইবে না।

মত ও পথ

দুর্গাপুর কৃষি বিদ্যালয়। একই ক্ষুদ্র জমি হইতে বৈজ্ঞা-নিক প্রণালীতে চাষ করিয়া, সারা বৎসরের নানা ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কৃষির সঙ্গে সঙ্গে, গরু, ভেড়া, ছাগল, পশু, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি পক্ষী, রেশম ও লাক্ষাকীট পালন এবং নিজ বাটী ও আমাদের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী ডোবা আদিতে মৎস্যপালন করিয়া স্বাধীনভাবে এবং শান্তি সচ্ছলতার সহিত জীবন যাপন করা যাইতে পারে। কৃষকসন্তান ও মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের উপকারার্থেই প্রধানতঃ এই কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* * * পাহাড় ও সমুদ্র উভয়ই স্কুলের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া উচ্চ, নিম্ন ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের নানাপ্রকারের কৃষি প্রণালী দেখিয়া শিখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। স্কুলের ১০।১৫ মাইলের মধ্যেই আধুনিক প্রণালীতে পরিচালিত কয়েকটী চা বাগান ও ফলের বাগান স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে আখের চাষ ও খড়ের ব্যবসা চলিতেছে, এই সকলে অনেক দেখিবার ও শিখিবার বিষয় আছে। * * * আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নিরসরাই ও জোরারগঞ্জ এই উভয় ষ্টেশনই স্কুল হইতে ৩॥০ মাইল দূরে। ভর্ত্তিব নিয়ম। কৃষিশিক্ষা হাতেকলমে এবং বাংলা পুস্তকের সাহায্যে দেওয়া হয়। ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত যাহারা পড়িয়াছে সাধারণতঃ তাহাদের ভর্ত্তি করা হইবে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্র হইলে বরং সুবিধা হইবে। শিক্ষাপ্রণালী—প্রধানতঃ একজন Sabour Agriculturual College এর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত (L. Ag.) শিক্ষক ও একজন B. Sc. পাশ (Honours in Botany and Chemistry) শিক্ষক দ্বারাই পরিচালিত হইবে। "জ্যোতিঃ।"

আসামের সুরমা বলিতেছেন—"আমরা বলিতে চাই, যাহারা যথার্থ মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির অসীম অনন্ত দুঃখরাশি দূর করিতে বদ্ধপরিকর, আহ্বানটা যাহাদের প্রাণে আসিয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে, শয়নে স্বপনে ভারতজননীর কালিমামাখা মুখখানা যাহাদের নয়নপথে উদিত হয়—আর সর্ব্বোপরি যাহারা দেশের জন্য দশের জন্য কাজ করিতে পূর্ণ সমর্থ, নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া সদর্পে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে,—এমন ছেলেদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ গোলামখানা কলিকাতা ইউনিভারসিটির মোহবর্জ্জন শ্রেয়ঃ সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

আর যাহারা ভেকপ্রবন্ধে স্কুল-কলেজের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াই ধরা অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিবে, আপনার ভোগবিলাসের উৎকট আকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার জন্য পরের গলগ্রহ হইবে, তাহারা গোলামখানায় থাকিবে না ত কি করিবে? তাহারা যে গোলামের অধম গোলাম। নিজের শরীরটার উপর,—মনটার উপর যাহাদের কর্ত্তৃত্ব চলে না, তাহারা আবার দেশোদ্ধার করিবে, অশিক্ষিত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন দেশবাসীর নিকট গিয়া দিব্যজ্ঞান ছড়াইবে, স্বাধীনতার আস্বাদনটা বুঝাইয়া দিবে কেমন করিয়া?

আট দশ বৎসরের ছেলে, শুদ্ধ করিয়া একটা কথা পর্য্যন্ত যে বলিতে পারে না, Slave mentality কি, স্বাধীনতাই বা কি ঈদৃশ দিগ্‌বিদিক জ্ঞান যাহার নাই, তাহারা ভাবের বন্যায় ভাসিয়া হুজুকে মাতিলে যে কি পর্য্যন্ত কাজ হাসিল হইবে, আমরা ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

লাভ এই হইবে যে, অর্ব্বাচীন যুবক-সম্প্রদায় এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ মহাত্মা গান্ধীর মহৎ উদ্দেশ্যটি পণ্ড করিয়া দিবে। সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার বর্জ্জিত অসহযোগীতা অত্যাচার দোষে কলুষিত হইবে। তাহার নমুনা এখনই আমরা পাইতেছি। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। যদি তাহা না হয়, আর যদি কোন প্রকারে অত্যাচার-উৎপীড়নের লেশমাত্রও আসিয়া এই পবিত্র অসহযোগীতামূলক আন্দোলনে সংসৃষ্ট হয় তবে উহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা বিজ্ঞ অভিভাবকবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে আপনারা আর বসিয়া থাকিবেন না। কি করিতে হইবে, সে কথা ত আর আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। যে সমস্ত ছাত্র স্কুল

কলেজ ছাড়িয়াছে, তাহাদের ব্যবস্থা একটা যাহা হয় অচিরে করিয়া লউন।

ছাত্রগণকে বলিতে চাই,—ছাড় সব হুজুগ, ছাড় সব ভেকপ্রলম্ফ, ছাড়—ছাড় সব লোক-দেখান দেশপ্রীতি, ছাড় সব আকাশকুসুম কল্পনা। কর—কাজ। "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং" আমরা চাই না। আমরা চাই খাঁটি কাজ, ধর্ম্মভূমি কর্ম্ম-ভূমি এই পবিত্র ভারতভূমি কর্ম্মছাড়া উঠিবে না, কখনও জাগিবে না।

"ভারতী"তে শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ "মরণ বাঁচনের কথা কহিয়াছেন—নোয়াখালির একজন কৃষক অনাহারে মরিবার সময় বলিয়াছিল "একমুঠা ভাতের অভাবে আজ মরিলাম"—কথাটা শুধু দরিদ্র কৃষকের নহে, উহা যেন সমগ্র দেশের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।" সত্য সত্যই আমাদের দেশে অধি-কাংশ লোকই "দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অনাহারে যাহার দেহের শিরা উপশিরা বিকল সে কেমন করিয়া রোগ রাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা পাইবে?"আমরা তো মরণনদীর তীরে আসিয়া পৌছি-য়াছি—দারিদ্র্যই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? "মিউজিয়মের ঘরে অতীত জীবের কঙ্কাল যেরূপভাবে রাখিয়া দেয় আমাদের অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের নেতারা হাত মুখ নাড়িয়া টাউনহলে যখন লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেন বা মনের সম্মুখে ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের ছবি আঁকেন, তখন আমাদের মন দুঃখে ভরিয়া যায়।"

"এই ধ্বংস হইতে রক্ষার উপায় কি?"

"পরলোকগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জীবতত্ত্বের সমুদ্রমন্থন করিয়া যে সার সত্যের অমৃত তুলিয়া-ছিলেন তাহা এই 'জীবনের মূলই হইতেছে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা আমি বাঁচিবই আমাকে বাঁচিতেই হইবে—ইহাই হইতেছে জীবনের ভিত্তি।' যদি বাঁচিতে হয় তবে এই ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। আমাদের সঙ্কল্প আমরা বাঁচিবই, এই বিরাট বিপুল বিশ্বের প্রাণের লীলা-ক্ষেত্রে আমা-দের নিতান্তই যোগ দিবার প্রয়োজন। তপস্যা দ্বারা জাতীয় আত্মাকে শতদল-পদ্মে এইরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।" সঙ্কল্পদ্বারা দুর্ব্বল বাঙালীর চরিত্রে এইরূপ প্রবল ইচ্ছাও জাগ্রত হউক, ইহাই আমাদের অন্তরতম কামনা।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—"ভারতবর্ষে" আলোচনা বিভাগে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। গোলামখানার বিদ্যা-শিক্ষায় জাতি যে বর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে ইহা এক পক্ষের মত, অপর পক্ষ বলিতে পারেন গোলাম-খানা ছিল বলিয়াই বিশ্বের দরবারে আমরা স্থান পাইয়াছি, সিংহ—লর্ড সিংহ হইতে পারিয়াছেন। তৃতীয় একদল চাহেন—বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে ভাঙিয়া ফেলিতে ইহার পরিবর্ত্তে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইক আর নাই হউক, তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না। এই মতের পোষক কোন নজির—লেখক মহাশয় দেখাইতে পারেন নাই।

তাঁহার প্রশ্ন (১) বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর মূলোচ্ছেদ না করিয়া শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা যায় কি না? (২) জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী ব্যাপারটা কি? তাহার বাহন অর্থাৎ ভাষা কি হইবে? (৩) জাতীয় শিক্ষাপ্রণালীতে কি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে না? সাহিত্য ও দর্শ-নের দর্শন সংস্কৃত পুঁথিতে মিলিলেও, অপরগুলির মধ্যে কয়টা পাওয়া যাইতে পারে? সেগুলার অভ

কি ইংরাজীর সাহায্য লওয়া হইবে? না সে স্কুলায় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আপাততঃ Sine die মুলতুবী থাকিবে? (৪) বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী ভাঙ্গিয়া যদি জাতীয় ভাবেই শিক্ষার বিস্তার করা উদ্দেশ্য হয়, তবে সে কতদিনে হইবে, এবং আদৌ তাহার সম্ভাবনা আছে কিনা? (৫) ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে কে? সে শক্তি অন্ততঃ বাংলা দেশে আছে কিনা? (৬) দেশের শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত, এইমাত্র শতকরা ৫ জনের শিক্ষালাভের সুযোগটুকু না ভাঙ্গিয়া বাকী ৯৫ জনের শিক্ষার রীতি প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা? যেখানে রাজনীতিক মাদকতা আছে—সেখানে এমন বিচার করিয়া চলিবার সুযোগ নাই, জাতীয় শিক্ষা—কাঁঠালের আমসত্বের মত, বঙ্গবাসী অথবা রিপণ কলেজের খোলস বদ্‌লাইলেই যে সার্থক হইবে না এ কথা বলাই বাহুল্য। জাতীয় শিক্ষা মানুষের বুদ্ধির কারখানায় এখনও ঢালাই পেষাই হইতেছে—এই বুদ্ধির কলঘর হইতে দূরে বসিয়া—কঠোর তপস্যায় যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, যদি জাতীয় শিক্ষার আদর্শটিকে মূর্ত্ত করিয়া দেখাইতে পারেন তবেই এই গুরুতর সমস্যার নিষ্পত্তি হইবে। বাঙ্গালায় কি সে ব্রত সাধনের মানুষ জন্মায় নাই আমাদের বিশ্বাস বাংলায় জাতীয় শিক্ষা ব্যাপকভাবে না হইলেও ইহার সাধনা চলিতেছে—সিদ্ধি জাতিগত জীবনে একদিন ছড়াইয়া পড়িবে।

—

আমরা গত বৎসর "প্রবর্ত্তকে" চরকা চালাইয়া দেশের বস্ত্র-সমস্যা দূর করা—কিপ্রকার অসম্ভব এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে ত্রিপুরার কালিকচ্ছ গ্রামের শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়, আমাদের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ উহা পত্রস্থ করা হইল না। তবে তিনি আমাদের কথায় একমত নহেন, তাঁহার নিজ প্রচেষ্টায় প্রায় ৩০।৪০ খানা চরকা চালাইয়া, চরকার সূতায় কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁর প্রচলিত তাঁতগুলি চারি'ট/কায় পাওয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন "ক্ষুদ্রশক্তি একত্র মিলিত করিতে পারিলে ঐ সকল অল্প সংখ্যক বৃহৎ শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হইতে পারে।" মহেন্দ্রবাবু পুরাতন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে অস্মত নহেন, তবে যতদিন উহা না হইতেছে—ততদিন পুরাতন প্রথায় কার্য্য করিতে উৎসাহ দিতে বলেন। আমাদেরও ইহাতে ভিন্নমত নাই কেননা—আমরা নিজেরাই বহুসংখ্যক চরকা চালাইতেছি আমাদের তাঁতশালার দ্রব্যাদি কলিকাতার বাজারে যথেষ্টই বিক্রয় হইতেছে। চরকায় কাটা সূতা—অধুনা "খিলাফৎ ষ্টোর" যাহা সংগ্রহ করিতেছেন তাহার সের ২।৶ হইতে ৩৲ পর্য্যন্ত, উহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পাক এত এলো যে ব্যবসা করিতে হইলে উহার ব্যবহার কার্য্যকরী হইবে না। টানা দিতে যদি শতবার সূতা ছিঁড়িয়া যায়, সখ করিয়া যাহারা তাঁত বুনেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, উহা করিয়া যাঁহাদের উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, তাঁহারা কোনমতেই ঐ সূতা তাঁতে চড়াইতে সম্মত হইবে না। এখন অন্নচিন্তা চমৎকার। যাঁহাদের সময় আছে তাঁহারা চরকা লইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করুন, জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করাই যাঁদের ধর্ম্ম তাঁহাদের উপায়ান্তর দেখিতে হইবে। প্রবর্ত্তকের ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হাওড়ার People association হইতে—আমেরিকার বস্ত্রব্যবসায়ীদের নিকট পত্র প্রেরিত হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এমন যন্ত্র যদি আবিষ্কৃত হয়, যাহা

দিয়া সমানভাবে দশ থাই ভাল পাকের সূতা নির্গত হইতে পারে, তাহার মূল্য ১৫০৲। ২০০৲ হইলেও খরিদ করিতে ক্ষতি নাই, এবং এই কার্য্যের জন্য যদি ১০০০০ টাকা পুরস্কার দিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। যতদিন ইহা না হইতেছে—চরকা যাঁহারা চালাইতেছেন—তাহা বন্ধ করিতে বলি না, তবে ভারতে যে সকল কাপড়ের কল আছে সেইগুলিতে যত অধিক সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার আয়োজন করা হউক। সম্প্রতি বস্ত্র ব্যবসায়ীদের এক সমিতি স্থাপন হইতেছে—ছয়মাস পরে উঁহারা বিলাতি কাপড় আর রাখিবেন না, এরূপ হইলে, হাজার হাজার তাঁতশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তখনও বলিয়াছি, এখনও বলি, প্রচলিত চরকার সাহায্যে কোন মতে উহা সুসিদ্ধ হইবে না, দেশীয় কলের সূতা প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হইবে, এইজন্য দেশনেতৃবৃন্দ এইদিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

"প্রবাসীর" বিবিধ প্রসঙ্গে নিবন্ধে অবগত হইলাম "মহাত্মা গান্ধী একটী অস্পৃশ্য জাতীয়া বালিকাকে পোষ্যকন্যা লইয়া ঠিক নিজের কন্যার মত আদরে মানুষ করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী যাহা বলেন, জীবন দিয়া তাহা অনুসরণ করেন, ভারত আজ খাঁটীর আদর শিখিয়াছে—মহাত্মাজী সারা ভারতের আদর্শ নেতা। হিন্দু সমাজে যতদিন অস্পৃশ্য জাতি থাকিবে ততদিন মুক্তির আশা দুরাশা, তাই তিনি বলেন জাতির অস্পৃশ্যতা দূর করিতে না পারিলে একশত বৎসরেও স্বরাজ লাভ হইবে না।" প্রবাসী বলেন, "এখন বাঙ্গালীর মেয়ে কেরোসিনের সাহায্যে আত্মহত্যা করিতেছে, এই সেদিনেও এক বালিকা বধূকে কেমন করিয়া তাহার স্বামী ও শ্বশুরবাটীর অন্য লোকেরা কামার ডাকিয়া পায়ে বেড়ী ও শিকল দিয়াছিল ও প্রহারাদি করিত, তাহার কাহিনী আদালতে বিবৃত হয়, এই সেদিনও বাঁকুড়া জেলার তিনটী বালিকা কুষ্ঠরোগীর সহিত বিবাহ হওয়ায় আত্মহত্যা করিয়াছে। জাতির জাগরণ সার্থক করিতে হইলে নারী জাতির প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। বাহিরে যতই বক্তৃতা করি, দেশ হিতৈষিণা দেখাই, নারীজাতিকে পুরুষের বিলাসসামগ্রীর মত, চাবী বন্ধ রাখিলে দারুণ অভিসম্পাতে আমাদের সকল বৃহৎ কার্য্য পণ্ড হইবে। নারীজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা যত শীঘ্র করা যায়, ততই মঙ্গল। যাঁহারা জাগিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সঙ্গিনী নারীজাতির জাগরণ যাহাতে সুসিদ্ধ হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।"

অসহযোগীতা সম্বন্ধে প্রবাসী যাহা বলিয়াছেন আমরা উহার পূর্ণ সমর্থন করি। "আমরা সহযোগীতা বর্জ্জন নীতির বিরোধী না হইলেও, উহাই জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র উপায় মনে করি না। আমাদের বিরোধী, উৎপীড়ক ও অপমানকারী যাহারা, তাহাদের সহিত সহযোগীতা বর্জ্জন করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে না। যেমন তাহাদের সহিত সহযোগীতা বর্জ্জন করিতে হইবে, তেমনি নরনারী নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্ম, জাতি, বংশ, শ্রেণী নির্ব্বিশেষে দেশের সমুদয় লোকের সহিত সহযোগীতা করিতে হইবে। যাহাতে সকলেরই কল্যাণ হয়, তাহা করিতে হইবে, যাহাতে সকলেই নিজ নিজ কল্যাণ সাধনের পূর্ণ সুযোগ পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বরাজের মানেই এই যে, রাজ্য ও রাজ্যের কাজ যাহা "স্ব" তাহা করিবে। এখন

ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের হাতে যে কাজের ভার আছে এবং যাহা তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের অবিরোধী যতদূর ও যতটুকু বুঝিতেছে, তাহাই করিতেছে, তাহা ভাল করিয়া আমাদেরই করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত হইতে হইলে দেশের সব লোককে জাগ্রত হইয়া সুস্থ সবল দেহ, জ্ঞান সম্পন্ন দৃঢ় মন এবং প্রীতি ও মৈত্রীতে পূর্ণ উদার হৃদয় লাভ করিতে হইবে। এইজন্য সহযোগীতার প্রয়োজন।"

সহযোগীতা বর্জ্জন সফল করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট অচল হইবে মহাত্মা গান্ধী এই উদ্দেশ্যেই এরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন—বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সহজে ইহা করিতে পারে, চাকুরীজীবী পারে না, এ কথা সত্য নহে—দ্বিতীয়তঃ তাহাদের যায়গায় অন্নের কাঙাল অন্যলোক যাহাতে না জুটে, তাহারও উপায় করিতে হইবে। অর্থাৎ দেশ হইতে দারিদ্র্য ও বেকার অবস্থা উঠাইয়া দিতে হইবে। ইহা বৃহৎ ও কঠিন সমস্যা, তার উপর ভয়ও আছে—"যতদিন গবর্ণমেণ্টের অস্ত্রবল আছে, ততদিন গুলি ও বোমারপ্রভাবে বশীর মত কাজ করিবার লোক সরকারের জুটিবে। সুতরাং জানিওয়ালাবাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"
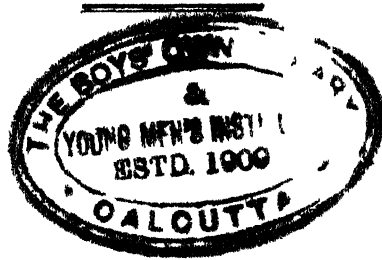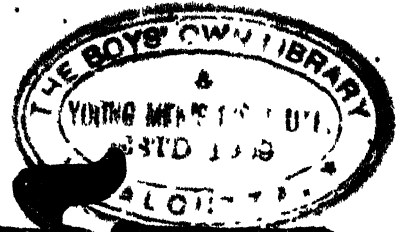
ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই মাঘ, ১৩২৭ [দ্বিতীয় সংখ্যা

শিক্ষামন্ত্র

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার মাটিতে অসহযোগীতা আন্দোলন প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কাজ করিবার মত যাঁহাদের প্রাণ আছে উৎসাহ আছে স্বার্থত্যাগ করিবার সামর্থ্য আছে—সেই নবীনদের মধ্যেই জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে; স্কুল ও কালেজের অধিকাংশ ছাত্রই ইহাতে যোগ দিয়াছে, কেবল মেডিকেল কলেজ ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রগণ এখনও পর্য্যন্ত নেতৃবৃন্দের বহু অনুরোধ সত্বেও এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিলেন না- ইহা বিদ্যার মোহ অথবা তাঁহাদের স্থির বুদ্ধির পরিচয়—সে কথা উপস্থিত বলা বড় সহজ নহে।

আজ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছেন—তাঁহাদের কর্ম্ম সূচনা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হইয়া উঠে নাই; দেশনেতৃগণ তাহার জন্য চিন্তান্বিত আছেন—ছকাছকি চলিতেছে—অনেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতেছেন—ইহাই মঙ্গলের বিষয়, পরিশেষে এই উত্তেজনা স্রোত মন্দীভূত হইলে, অবশিষ্ট কেহ কেহ হয়তো বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন। দেশে যে-সকল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে—তাহাতেও ছাত্রগণের বিদ্যা-সুযোগ কথঞ্চিৎ সফল হইতে পারে, কিন্তু অভিভাবকগণের সহানুভূতি না থাকিলে এই হাজার হাজার ছাত্রগণের খোরাক পোষাক যোগাইয়া জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালন করা বড় সহজ হইবে না।

বেকার ছাত্রগণকে দেশের কাজে লাগাইবার সঙ্কল্প হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রগণ গ্রাম্য-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হইলে, দেশের একটা বড় কাজ হইবে সন্দেহ নাই। তার পর হাজার হাজার চরকা চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন চরকা চালাইলেই স্বরাজ মিলিবে, সাড়ে চারকোটী বাঙ্গালীর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার লোক যদি চরকা চালায়, আর উহা হইতে বর্ত্তমানে যে দশ নম্বর সূতা বাহির হইবে সেই সূতার বস্ত্র যদি বাঙ্গালী পরিধান করিতে আরম্ভ করে—ঠিক স্বরাজ না মিলুক—বাংলায় যে নূতন জীবন আরম্ভ হইবে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই—তপস্বী গান্ধীর এই কৃচ্ছ্রসাধনা বাঙ্গালী গ্রহণ করিলে আমরা আন্তরিক সুখী হইব।

মানুষের মন একদিনে পরিবর্ত্তন হয় না। যাঁহারা দেশের নামে স্বার্থত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইতে-ছেন তাঁহাদের আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু দেশটা কেবল তাঁহাদের লইয়া নাই, কাজেই এ বিপুল কর্ম্মে জনসাধারণের সহায়তা একান্ত আবশ্যক হইবে। ইহারই মধ্যে ব্যবসায়ীগণ অধিক লাভবান হইবার জন্য অতি হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর উৎসাহে বাঙ্গালী যখন চরকার স্তায় মোটা কাপড় পরিধান করিতে প্রস্তুত, তখন পূর্ব্ব হইতেই ব্যবসায়ীগণ দেশের তাঁতগুলিতে বিলাতি ১০ নম্বর স্তা দিয়া কাপড় বুনাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; আমাদের নিকট জনৈক ব্যবসায়ী এই প্রস্তাব উত্থা-পন করেন, বলা বাহুল্য ইহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। কিন্তু দেশে এখনও হাজার হাজার তাঁত চলিতেছে, মিহি কাপড় অপেক্ষা মোটা কাপড় বুনিয়া এই হুজুগে যদি কিছু উপার্জ্জন করিয়া লওয়া যায়, তাহারই লোভে বিলাতি ১০ নম্বর স্তায় কাপড় বুনিয়া চরকায় কাটা স্তার কাপড় হিসাবে বাজারে অবাধে ব্যবসায়ীগণ বিক্রয় করিবে। যাঁহারা পরিধান করিবেন, তাহাদের কিছু সাধনা হইবে বটে—কিন্তু দেশের চরিত্র পরিবর্ত্তন এতদ্বারা সম্ভব হইবে না।

মানুষের মনে যে সব পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার আছে, সেইগুলির একান্ত নিরসন এইরূপ প্রবল আন্দোলনে একেবারেই সম্ভব হয় না—ধীরে ধীরে হইবে, কিন্তু ইহাপেক্ষা আর এক উপায় আছে—উহা শিক্ষা। দেশের লোকগুলিকে গোড়া হইতে সুশিক্ষা দিতে পারিলে—সমাজের সর্ব্বত্র উন্নতমনা মানুষের আবি-র্ভাব হইবে।

রাজনীতিক আন্দোলনে মানুষ এমন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে যে চারিদিক চাহিয়া চলিবার তাহার আর অবসর থাকে না, সেইজন্য স্বদেশীযুগের উত্তেজনা স্রোত খরতর বেগে এমন এক স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়া-ছিল—যেখানে দেশের প্রাণ আর পাওয়া গেল না; বর্ত্তমান আন্দোলনে নবীনের প্রাণস্পন্দন আছে, কিন্তু প্রবীণদের মধ্যে তেমন চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে না, কাজেই আমাদের মনে হয়, উত্তেজনার শেষ ফল যে অবসাদ, তাহা আসিতে বড় বিলম্ব না হইতে পারে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য এই প্লাবনের অবশেষ পলিতে—দেশ অধিকতর উর্ব্বর হইয়া উঠিবে।

মহাত্মা গান্ধী প্রতি কথায় উল্লেখ করেন, শিক্ষিত লোক তাহার অনুগামী না হইলে—তিনি নিঃশঙ্ক, কেননা দেশের জনসাধারণ তাঁহার পক্ষে আছেন। অবাঙালী অশিক্ষিতদের মধ্যে ইহার প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি, কিন্তু বাংলার কৃষক শ্রমজীবীগণ নিরক্ষর হইলেও, তাহাদের প্রকৃতি একটু ভিন্ন প্রকারের; কেবল কথায় তাহারা উদ্বুদ্ধ হইবে না—একটা সত্যের স্পর্শে তাহাদের হৃদয়খানা পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই—সেই সত্য শিক্ষায় হউক, কোন মহাপুরুষের স্পর্শে হউক, যেমন করিয়াই হউক সাধন করিতে হইবে। বাংলার সকল প্রকার আন্দোলন সহর ছাড়াইয়া পল্লীজীবনে আসিয়া বড় পৌঁছায় না, এইবার তাহার একটা আয়ো-জন হইতে পারে বলিয়া আশান্বিত হইয়াছি।

শিক্ষিত সমাজ স্বরাজ পাইলে, অশিক্ষিত সমা-জের স্বরাজ পাওয়া হইবে না—এই কথাটা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। আমার বাড়ীতে যদি এক পশলা বৃষ্টি হয়, আর প্রতিবাসীর প্রাঙ্গন শুষ্ক থাকিলে আমার কথা স্বপ্ন বলিয়া লোকে উড়াইয়া দিবে। স্বরাজ যখন পাওয়া যাইবে, দেশের প্রতি ব্যক্তি যদি বুকে হাত দিয়া বিস্ফারিত লোচনে তাহার স্বীকৃতি দেয়, তবেই জানিবে উহা সত্য সত্যই মিলিয়াছে—এইজন্য এই স্বরাজ দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতেই করিতে হইবে।

আমরা ইহার একমাত্র উপায় দেখিতেছি শিক্ষা। প্রচলিত বিধান বিস্মৃত হইয়া সনাতন প্রণালীতে

দেশের সকল শ্রেণীর লোককে, একভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভবিষ্যতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, তাহার মধ্যে পুরাতনের ময়লা যেন বিন্দু-মাত্র না থাকে—একটা আন্‌কোরা নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে পারিলে, পূর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

দ্বাদশ বর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত যে সকল তরুণ তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, জানিও উহারাই জাতির ভবিষ্যৎ—সংস্কার জর্জ্জরিত, পাকা-মাথা মধ্যবয়স্ক মানুষগুলি, যাহা কিছু করিতে যাইবে তাহার মধ্যেই অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্যের সম্মোহন থাকিয়া যাইবে। আমরা আমাদের "স্ব"কে একে-বারেই হারাইয়াছি, যাহা করি সমস্তই অনুকরণ, খাঁটী সত্য হওয়া সাধন সাপেক্ষ। এই বিদ্যার্জ্জন করিয়া দশজনের একজন হইয়া এখন আর সাধন করা শোভা পায় না, কাজেই শীঘ্র শীঘ্র কিছু করিতে হইবে—এত চঞ্চল ধৈর্য্যহীন যে, তাহার দ্বারা জাতির সত্য প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ হওয়া কোনকালেই সম্ভব হইবে না।

আমরা রাজনীতির কোন সম্পর্কই রাখিব না। আমাদের কাজে—অন্নসংস্থানের স্বাধীন বৃত্তি অব-লম্বন করিয়া প্রতি ব্যক্তি যাহাতে আত্ম নির্ভর হইতে পারে, তাহার সুষ্ঠু পথ আবিষ্কার করা, আর অষ্টম-বর্ষীয় বালক মাত্রকেই অধিকার করিয়া জাতীয় ভাবে যাহাতে সে আত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া।

এই দুইটী ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য দেশের সহস্র কর্ম্মীকে অমরা চিরদিন আহ্বান করিয়া আসিতেছি। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সহজ পন্থার কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার কয়েকটা কথা মোটামুটি বলিয়া রাখি।

প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান-গুলি একেবারেই যে নিরর্থক এমন কথা আমরা বলি না। আজ পর্য্যন্ত আমরা যাহা করিয়াছি তাহা ঐরূপ শিক্ষার পূর্ণ সহায়তায় না হইলেও—উহার অনেকখানি আমাদের কাজে লাগিয়াছে এবং ঐরূপ শিক্ষা না পাইলে বাহিরের দৃষ্টি এতখানি প্রসারিত হইত কিনা—সে বিষয়েও সন্দেহ করি। এখনও পর্য্যন্ত জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী কর্ম্মীর সন্ধান সর্ব্বাগ্রেই করিতে হয়। দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ বাংলায় জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিয়াছে—কৈ এই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে দ্বাদশজন গান্ধীর ভাবে শিক্ষা সমাপন করিয়া দেশের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান নাই তো! অনেকেই বলেন বর্ত্তমান শিক্ষার মোহ দূর না হইলে উহা সম্ভব হইবে না, আমরা এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি না, ভিতরের প্রবল ইচ্ছা যদি সত্যই জাগ্রত হয়, তাহা হইলে অন্তরায় যতই প্রবল হইবে, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতার পরিচয় ততই অধিক পাওয়া যাইবে।

আমাদের ভয় হয়, কিন্তু, বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা হইতে দূরে গিয়া দেশের যুবকগণ একেবারেই না তমঃসাগরে নিমজ্জিত হন। বাংলায় বিদ্যাশিক্ষার প্রথম আহ্বানে হিন্দুবাঙ্গালীগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেইজন্য মুসলমান ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা আমরা অধিক সংখ্যক লোক শিক্ষিত হইয়াছি। পাশ্চাত্য বিদ্যার মোহ হইতে অপসৃত হইতে গিয়া উচ্চ বিদ্যার অনু-শীলন বন্ধ থাকিলে—আমরা খুবই পিছাইয়া পড়িব' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক—বাংলায় প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, আশুতোষ প্রভৃতি মনীষিগণ আছেন, দেশের যুবক-গণ শিক্ষা সম্বন্ধে ইঁহাদের উপদেশ লইয়া চলিলে, এই সমস্যা হইতে তাঁহারা পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন; এই প্রবল আন্দোলনে সার জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের সাড়া না পাইয়া আমরা আরও আশঙ্কিত হইয়াছি।

বাহিরের ঝড় চিরদিনই চলিবে। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দেশে যে সকল বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে তাহা দেশের তুলনায় প্রচুর নহে, এবং ইহার পরিবর্ত্তে আমরা যখন কিছুই নির্ম্মাণ করিতে পারি নাই—তখন এইগুলি না ভাঙ্গিয়া—নূতন ভাবে শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা করাই যোগ্যতার পরিচয়। যাঁহারা জাতীয় শিক্ষা প্রচারের জন্য সাধনা করিতেছেন বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহাদের পক্ষে মস্ত সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই সুযোগে যদি দেশে বহুসংখ্যক শিক্ষাগার নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়—তাহার জন্য দেশহিতৈষীগণ উদাসীন থাকিবেন না ইহা অবধারিত

আমরা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে বাংলায় নূতন প্রণালীতে অন্ততঃ ছয়টী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি—একটীর ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছি, আর একটীতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

আমরা স্থির করিয়াছি অষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীদের একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করিব। ষোড়শ বর্ষ হইতে ঊনবিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ইঁহাদের শিক্ষা সমাপন হইবে।

প্রথম পর্য্যায়ে জানার সাধনা। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জানাকে পাওয়ায় পরিণত করিতে হইবে। ষোড়শ বর্ষীয় যুবক আমাদের বিদ্যালয়ে যাহা জানিবে, ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উহাই পাইবে—তাহার পর জীবন সাধনায় সে স্বাধীনভাবেই বিচরণ করিবে। দেশের কোন যুবকই ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর আর বিদ্যালয়ের অধীন থাকিবে না।

জানার পর্য্যায়ে—সে জানিবে ভারতের প্রচলিত ভাষা সমূহ, সাহিত্য, বিজ্ঞান। ভারতের ভূগোল ইতিহাস, জগতের ভূগোল ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত বিদ্যার্থীগণ শিক্ষকগণের সঙ্গে থাকিবে—তাহারা জানিবে—তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য নহে, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের ভবিষ্যৎ সমুদয়ই নির্ভর করিবে দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য ভগবানের জন্য। তারপর ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাহারা যাহা জানিবে, পরবর্ত্তী বর্ষত্রয়ে তাহার পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে; তাহারা পাইবে তাহাদের আত্মাকে, তাহারা পাইবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়গুলিকে, তাহারা পাইবে দেশ ধর্ম্ম ভগবান—তারপর তাহারা যাহা পাইবে দেওয়ার কাজেই তাহাদের জীবন ব্যয়িত হইবে। দিতে দিতেই মানুষের দিন কাটিয়া যাইবে, এ যে দেওয়ার খেলা—সে খেলা শিখিবার জন্যই তো এই নব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

হায় দেশ! কবে তোমরা ধৈর্য্যশীল হইয়া, বাংলার আত্মা কি চাহিতেছে কান পাতিয়া শুনিবে। কবে তোমরা বুঝিবে—জীবনের আত্মচেষ্টা বিপথগামী হয়, ভগবানের নিকট আত্মোৎসর্গ করিলে, তাঁর পবিত্র উদার পথেই তিনি আমাদের আকর্ষণ করেন।

ভিতরকে নিশ্চেষ্ট কর, স্থির হইয়া অন্তর সমুদ্রের উপর যে শতদলপদ্ম বিকশিত আছে তাহা লক্ষ্য কর, একনিষ্ঠ হইয়া দেখ অন্তরতম পুরুষকে—সেই পুরুষের অমোঘ ইচ্ছাই জীবনের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাধনা। ভারতে এই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদেশ আসিয়াছে—তোমাদের স্বরাজ এই অন্তররূপটীরই বহিঃপ্রকাশ।

আত্মসাধনায় নিজকে অবিকৃত প্রকাশ কর—স্বরাজ তোমার করতলগত হইবে।

বীর-দর্শন
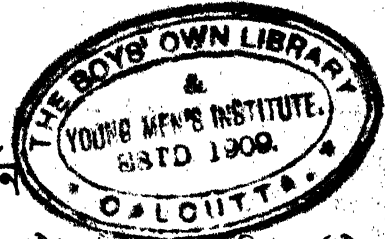
সাময়িক মনস্তত্ত্ব

বাংলার আন্দোলন নূতন নহে। স্বদেশীর পর হইতে আরও কয়েকটী আঘাত দেশের বুকে বাজিয়াছে, এই-মাত্র। সাধারণের মন সেই বাঙ্গালীসুলভ প্রবণতাই ভরা।

এই প্রবণতার উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মাঝে আছে মাত্র অভিজ্ঞতার দু'একটী প্রস্তর স্তূপ। বাঙালী যতদিন স্বাধীনতা বা স্বাধিকার লাভের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের দিকে চাহিবে, ততদিন তাহার স্বরাজলাভ ঘটিবে না। ব্যক্তি-বিশেষ বিশাল এক জাতির উত্থান পতন ঘটাইতে পারে না।

ব্যক্তি জাতিরই একটী অংশ।

বিভূতিও জাতির একটী উত্তম সৃজন।

অবতার জাতির শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ।

বিভূতি ও অবতার জাতির অন্তরাত্মার কথাই বলে।

বিভূতি ও অবতারের গূঢ় শক্তি জাতির ভিতরেই লুক্কায়িত।

যথায় জাতি জাগ্রত হয় নাই, তথায় বিভূতি আসিয়া ভৌতিক উৎপাতই আরম্ভ করে।

যথায় জাতি প্রস্তুত হয় নাই, বিভূতি তথায় ধ্বংস করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয়।

* * *

জনমত বা জনসঙ্ঘই বিভূতির সৃজন করে। জনসঙ্ঘ ("Foule") পরিচালক ব্যতীত চলিতে পারে না।

জনসঙ্ঘের বিচার শক্তি নাই। জনসঙ্ঘ সাময়িক প্রেরণার বশীভূত। জনসঙ্ঘ সমষ্টিগত ধর্ম্মানুসারে চলে। তাহাদের আছে মাত্র সমষ্টিগত আত্মা।

অতি প্রবীণ লোকেও দলে পড়িয়া অর্ব্বাচীনের মত কর্ম্ম করে।

অতি ধীর লোকেও দলে পড়িয়া সহসা উত্তেজিত হয়

অতি সভ্য জাতিও একত্র কর্ম্ম করিবার সময় বর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়।

* * *

সঙ্ঘে ব্যক্তিগত আত্মার অপেক্ষা জাতীয় আত্মার প্রভাবই অধিক।

সঙ্ঘে বিচার অপেক্ষা সংস্কারের প্রাবল্যই প্রকট।

জনসঙ্ঘ পারে ভালবাসিতে বা হত্যা করিতে।

ঘৃণা অথবা পূজা—ইহার মধ্যে তাহার আর কিছু করিবার নাই। সঙ্ঘ ব্যক্তি-বিশেষকে দেবতা করিয়া তুলে, আবার পরক্ষণেই তাহাকে হত্যা করে। জনমতের মানুষ বা সাময়িক দেবতা—তাহাদের জীবন পদ্মপত্রের জল।

এইরূপে কত দেবদেবী অতীতের অন্ধতম কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

যে সকল সাময়িক দেবতার জীবনকাল ফুরাই-য়াছে তাহারাই আজ সদর্পে অগ্রসর হইবে।

* * *

স্বাধীন হইবে মানুষ।

মানুষ গড়িবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালার মানুষ গড়া শেষ হয় নাই। তবুও যাঁরা সাজ সাজ করিতেছেন—হয় তাঁদের আপনি মানুষ হওয়া ফুরাই-য়াছে, নয় তাঁহাদের মানুষ তৈয়ারী হইতে দিবার ধৈর্য্য নাই—কিম্বা তাঁহারা আত্মবিস্মৃত।

* * *

সাময়িক উত্তেজনায় যার সৃষ্টি, তার অস্তিত্ব চির পরিমিত।

'সাময়িক উত্তেজনায় যে জাতিগত পাদক্ষেপ, তার সাফল্য বিকল্পাত্মক। ব্যক্তি কখন কখন সাময়িক উত্তেজনা বশে কোন কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে শীঘ্র সরিয়া পড়ে না।

ব্যক্তির চরিত্র দৃঢ়।

ব্যক্তির মধ্যে আছে বিচার।

জনতা সাময়িক উত্তেজনার দাস হইলেও মোহ ছুটিবার পরেই পথ পরিত্যাগ করে।

জনতার চিত্ত ক্ষণভঙ্গুর।

জনতার বিচার শক্তি নাই।

অত্যদ্ভুত বীরাচারী জনতা পরক্ষণেই হীনতম ভীরুর ন্যায় পলায়ন করে।

* * *

জাতির উত্থান-পতন ব্যক্তি-বিশেষ বা জন সঙ্ঘের উপর নির্ভর করে না। জাতির উত্থান-পতনের বীজ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় সমষ্টির বীজ-বিন্দু।

ব্যষ্টি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য বারম্বার বিফল মনোরথ হইলে তাহার মহত্বই বর্দ্ধিত হয়।

জাতীয় পরাজয় জাতিকে ক্ষুণ্ণ করে। সে অবসাদ দূর করিতে যুগ যুগ সময় লাগে। যে জাতি আপন দোষে উঠিতে উঠিতে পতিত হয়, প্রপীড়িত হয়, আপনার কপোলে করাঘাতই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা।

* * *

কিন্তু দেশের জীবন দেবতা চাহিয়াছেন স্বরাজ্য, অসহযোগীতা দেশের দিক হইতে তাহারই প্রত্যুত্তর।

বৈশিষ্ট্য

যতই রেল কল, টেলিগ্রাফ জাহাজ পৃথিবীতে বাড়িতেছে ততই পৃথিবী হইতে বৈশিষ্ট্য সরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু বৈশিষ্ট্যই জীবন। বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই গতি সম্ভব। বৈশিষ্ট্যই সুন্দর, বৈশিষ্ট্যই চরম—বৈশিষ্ট্যই আদি, বৈশিষ্ট্যই সমাপ্তি।

দুই মেরু, তাই উভয়ের সংযোগে বিদ্যুৎ বিকাশ। দুই স্তর, তাই উভয়ের সংযোগে বারি প্রবাহ।

দুই প্রকৃতি, তাই বিচিত্র সৃষ্টি। বৈশিষ্ট্য মিলনের বিরুদ্ধ নহে, উহার পূর্ণতারই সত্য-মিলন একমাত্র সম্ভব।

বৈশিষ্ট্যহীন মিলন—মানবের অবমাননা। মিলনের প্রত্যবায়—বিরোধের কারণ।

ভবিষ্যতের সঙ্ঘ বা জাতি হইবে বিশিষ্টের মিলনে। বুদ্ধের সহিত শঙ্করের, রামদাসের সহিত নানকের—প্রতাপ ও আকবরে, খৃষ্টে ও মহম্মদে। বহু অহং-শূন্য বিশিষ্ট আত্মার সংযোগেই ভবিষ্য জাতির বীজ নির্ম্মিত হইবে।

ভবিষ্যের লিখন পদ্ধতি হইবে বিশিষ্ট। বিশিষ্ট বিশিষ্ট চিন্তাকণা তথায় বিরাজিত থাকিবে। একে অপরের উপর ভর দিয়া নহে, পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া। তথাপি তাহাদের মিলনে একটী প্রসঙ্গেরই সৃষ্টি করিবে।

প্রাচীন বৈশিষ্ট্য স্থান-প্রভাবে যুক্ত। একটী বীজ যুগ যুগ এক স্থানে পড়িয়াছে, আবার শাখাপত্র প্রসারিত করিয়া অনন্তকে ধরিতে গিয়াছে। আবার পড়িয়াছে, আবার উঠিয়াছে। এইরূপেই বিবিধ বৃক্ষ সৃষ্টি।

একই মানুষ এক দেশে জন্মিয়াছে, মরিয়াছে—আবার জন্মিয়াছে, আবার মরিয়াছে। এইরূপে বিবিধ

জাতি স্থষ্টি—একই ভাব যুগ যুগ বিনা প্রতিরোধে প্রবাহিত হইয়াছে। একই তার প্রেরণা, একই তার প্রেরণা দিবার বস্তু। এইরূপে বিবিধ গীতি ও গীতি-কাব্যের স্থষ্টি।

কিন্তু ভবিষ্যের স্থষ্টি হইবে অধ্যাত্ম নির্ম্মাণ। অনন্ত অনন্ত-ধারাই তথায় স্বতঃ প্রতিভাত হইবে। স্থান কালের সাম্য তখন আব বৈশিষ্ট্য নষ্ট কবিতে পারিবে না। ভবিষ্যের বৈশিষ্ট্য আত্মার অনন্ত-সম্ভাবনীয়তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

একীকরণ মৃত্যুরই সরল পথ, কুৎসিৎ ও অস্বাভাবিক। একীকরণ মানবের বিফল বাসনা—বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির বিজয় মন্ত্র।

একীকবণ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, বৈশিষ্টাই স্বধর্ম্ম। একীকরণ ইউরোপেব সভ্যতা—বৈশিষ্ট্য আশিয়ার সভ্যতা।

একীকরণ ফল, বৈশিষ্ট্য কবিতা।

সকলের প্রাধান্য একীকরণের ফল।

সকলের দাসত্ব একীকরণের ফল।

সকলেব মুক্তি বৈশিষ্ট্যে।

সকলের সমতা বৈশিষ্ট্যে।

জীবন নিরর্থক একীকরণে।

জীবন সার্থক সমতায়।

* * *

ইতিহাস একবার করে একীকরণ, তারপর প্রচার করে বৈশিষ্ট্য-বাদ। একবার বড় বড় কলের সাম্রাজ্য গঠনে কোটী কোটী নরবলি দেয়, আবার তৎপরেই স্ব স্ব প্রাধান্য আনিতে মেদিনী নররক্তে রঞ্জিত করে। বিগত শতাব্দীতে ইউরোপে বৃহদাকার সাম্রাজ্যগুলি সংস্থাপন করিতে যত মহদাত্মার আত্মবলি অবশ্যক হইয়াছিল, আজ সেই সাম্রাজ্যগুলি ভাঙ্গিতে তদপেক্ষা অল্প ক্ষণজন্মা পুরুষের বলি আবশ্যক হইবে না।

ইতিহাস বৈশিষ্ট্য ও একীকরণের ছকে পর্দ্দা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়াছে—বৈশিষ্ট্য সে পায় নাই—সমতা ত দূরের কথা।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

মানুষ সাধনা করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইবার জন্য।

মানুষ সাধনা করে বৈশিষ্ট্যকে পাইবার জন্য।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—ইউরোপের সভ্যতায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

আশিয়ার ধর্ম্মে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দান একটী। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইলে দান অনন্ত।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আপনাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া চলে। বৈশিষ্ট্য আপনাকে হারাইয়া হারাইয়া চলে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য শঙ্কার উপর প্রতিষ্ঠিত, বৈশিষ্ট্য নির্ভীকতার অবদান।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মানুষের ধর্ম্ম।

বৈশিষ্ট্য দেবতার স্বরূপ।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অহঙ্কার।

বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞান।

* * *

আমি ইহা, ইহাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য।

আমি ইহা নহি, ইহাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য।

বাসনা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই বিকৃত ইচ্ছা।

ইষণা দেবতার ইচ্ছা।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাসনা কখন পূর্ণরূপে ফলবতী হয় না।

ইষণা চির ফলবতী।

বাসনার সম্মুখে স্থান ও কালের অনতিক্রম্য ব্যবধান।

ইষণার চতুর্দ্দিকে স্থান ও কালের সহায়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিরোধের কারণ।

বৈশিষ্ট্য মিলনের মন্ত্র।

বৈশিষ্ট্য আত্মার চির সত্য স্বভাব।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাহার অন্তরায় ও আবরণ।

বৈশিষ্ট্য নব নব ক্ষেত্রে আপনাকে আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহা হইতে গড়িয়া উঠে নব নব আনন্দময়েরই বিশিষ্টরূপ।

স্বাতন্ত্র্য আপনাকে রক্ষার্থ যুদ্ধ করে, তথায় বাড়িয়া উঠে অহংকারের বীভৎস স্বরূপ।

বৈশিষ্ট্য নিত্য নূতন।

স্বাতন্ত্র্য এক বিন্দুতেই আবদ্ধ।

বৈশিষ্ট্য মহাসাগর, স্বাতন্ত্র্য অন্ধকূপ।

স্বাতন্ত্র্য ছেদ, বৈশিষ্ট্য প্রবাহ।

স্বাতন্ত্র্য মৃত্যুতে সমাপ্ত। বৈশিষ্ট্য আর ও অনন্ত বিস্তৃত।

স্বাতন্ত্র্য অপরের বিভূতি, বৈশিষ্ট্য পরার প্রকাশ।

স্বাতন্ত্র্যে দুঃখ, বৈশিষ্ট্যে আনন্দ।

স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের অজ্ঞান।

বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা আত্মার অনন্তত্বে।

ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য হারাইলে বৃহৎ বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়া উঠে।

সমতা (Discipline)

প্রিয়তম—

জীবনের শেষ কথা নহে ব্যভিচার।

জীবনের শেষ কথা নহে সংযম।

দেবজীবন সমতায় প্রতিষ্ঠিত।

তরুণী দেখিলে ভোগ করিবার ইচ্ছা কার না হয়? যার যত ভোগেচ্ছা তার ভিতর প্রাণময় দেবতা তত প্রবল ও মূর্ত্ত।

সুখাদ্য, ভোজন করিবার জন্যই। তাহাতে ইচ্ছা, স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

যাহার জীবন আছে, সেই ভোগ করিতে পারে।

অপ্সরী ও অমৃত উভয়ই দেবতার উপভোগ্য।

তরুণীর প্রতি ইষণা, ইহাই ত জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

নারী যে পুরুষের জীবনবিকাশক্ষেত্র॥

* * *

আমি সঙ্ঘের সকলেরই আপনার।

আমি তোমার বিশিষ্ট ভাবে আপনার।

তুমি আমার বিশিষ্ট দেবতা।

তুমি আমার স্বামী।

* * *

ভোগ জীবনের পরিবৃদ্ধি ও পরিব্যাপ্তি।

স্ত্রী সম্ভোগেও জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ।

ভোগের সমাপ্তি নব নব আনন্দ হিল্লোলে।

জীবনের যেথায় বিকাশ নাই, আনন্দ যেথায় ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, যেথা ভিতরের কথা অপেক্ষা বাহিরের কথাই অধিক—সে ভোগ বিনাশের হেতু।

তুমি আজ আসিয়া আমার আত্মার স্পর্শ দাও। তার পর দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া দেহে নামিব। তোমার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ পাতাইব—তুমি হইবে আমার স্ত্রী।

* * *

তোমার নিদারুণ হস্তে অগ্রে আমার দেহ স্পর্শ করিও না। তোমার নিদারুণ হস্তে অগ্রে আমার প্রাণ স্পর্শ করিও না। হৃদয়কে আমার অগ্রে স্পর্শ করিও না। উভয়েই নিরয়গামী হইব।

* * *

নারি! অগ্রে আমার অন্তরে এস। দেখি তোমায় আমার কি সম্বন্ধ। তারপর চল বাহিরে। এই রূপেই আমি তোমার স্বামী হইতে পারিব।

* * *

কামকে তোমার ভর্ৎসনা করি না, সে প্রেমেরই বিকৃত রূপ। উহাই পৃথিবীর আদি সত্য,

উহাই জগৎ সৃষ্টি মন্ত্র। উহাই সোমরস।

* * *

কিন্তু তুমি ত ক্ষুদ্র নহ—তুমি আমাকে যে পাও নাই, তাহাও নহে—আমিই তুমি—তুমি আমার অন্তরেই আছ। তোমার অনন্তত্বকে একবার অনুধ্যান কর। তোমার কাম প্রেমে পরিণত হইবে।

* * *

আমরা ভিন্ন বলিয়া যুক্ত হইব না। আমরা যুক্ত, এই উপলব্ধিই আমাদের বিকশিত করিবে।

আমরা ভিন্ন বলিয়া যুক্ত হইব না। আমরা যুক্ত বলিয়াই আরও নিবিড় ভাবে অনন্ত ভঙ্গীতে—নবীন রূপ ও রাগে মিলিত হইব। এবার নূতন ভাবে বিশিষ্ট নামে তোমার সহিত আমার মিলন।

* * *

এইরূপে আমায় সমতায় থাকিতে দাও। সমতায় আমার ভিত্তি। তারপর তোমার যাহা ইচ্ছা করিও—অনন্ত রূপরাশি অনন্ত তরঙ্গ হিল্লোল আনন্দময়কে যেরূপে পার সৃজন করিও।

* * *

যে ব্যভিচারী, সে ক্ষুদ্র পরাধীন। যে সংযমী, সে আরও ক্ষুদ্র আরও পরাধীন।

যে ব্যভিচারী সে স্বভাব-মানুষ—তার জন্য অনন্ত নিরয়।

যে সংযমী সে কৃত্রিম মানুষ, তার জন্য আরও অন্ধতম অনন্ত নিরয়। নিরয়—অজ্ঞানতা।

* * *

জীবনের সত্যরূপ অন্যান্য প্রকারে সংযমের সহিত এক হইলেও একেবারেই ভিন্ন।

জীবনের সত্যরূপ অন্যান্য প্রকারে ব্যভিচারের সহিত এক হইলেও একেবারেই ভিন্ন। সমতাই জীবনের সত্য নীতি—ধ্রুবম্।

* * *

তিনি বহুবর্ষ ব্যভিচারী ছিলেন।

তিনি বহুবর্ষ সংযমী ছিলেন।

সমতা তাঁরই কথা।

হে দেবজন্ম প্রয়াসী—তাঁর অভয়বাণী মাথায় পাতিয়া লও।

ক্ষেত্র ও বীজ

যে কৃষক একটুও ভূমি পৃথিবীতে পড়িয়া থাকিতে দেননা, তিনিই উত্তম কৃষক।

কুলীনগণ পৃথিবীতে একটীও স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকিতে দিতেন না—তাঁহারা বহু মানব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অসভ্যেরা একটী সুন্দরীকে ধরিয়া আনিতে পারিলে, বিজয়ীর পরিতৃপ্তিসাধনান্তর জাতিগত ভাবে তাহাকে ভোগ করে। ক্ষেত্রের ন্যায় স্ত্রীলোক জাতীয়ধন—তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দিলে জাতিরই ক্ষতি। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, কেহই ক্ষেত্রকে পাইলে সহজে পরিত্যাগ করেনা। বৃক্ষ লতা গুল্ম পরস্পরে জড়াইয়া জড়াইয়া অনন্ত অরণ্যানীর সৃষ্টি করে। অনুপরমাণুরাও এই সত্য অনবগত নহে—সময়ে সময়ে বিকট শব্দ, শীত, তাপ উদ্গার করিয়া—ক্ষেত্র পাইলেই তাহাতে সংযুক্ত হয়, পরস্পরকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

মানুষ কেবল নিজ বুদ্ধি চাতুর্য্যের পরিধি টানিয়া নিজ বংশনাশকর "নীতির" উদ্ভাবন করিয়াছে।

শস্যশ্যামলা অথবা বহুজন হাস্যকলরব মুখরিতা—ইহাই ত ধরার পূর্ণতা।

* * *

যে কৃষক বীজের উৎকর্ষ সাধনে তৎপর, সেই শ্রেষ্ঠ কৃষক। মন্দবীজে মন্দের উৎপত্তি—ক্ষুদ্রের বীজে ক্ষুদ্র—বিরাটের বীজে বিরাট।

মানবের লক্ষ্য নহে উদর পূরণ করিয়া কতকগুলি তৃণ ভক্ষণ—পরন্তু সুখাদ্য ভক্ষণই তাহার লক্ষ্য।
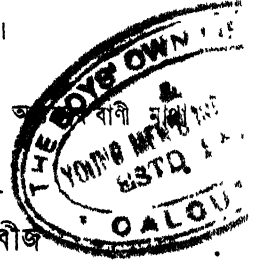
মানবের উদ্দেশ্য নহে, কতকগুলি ছাগ মেষের জন্মদান, পরন্তু তাহার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যের জন্ম দিয়া দেবজন্মকে ক্রমে ক্রমে সম্ভব করিয়া তুলা। আমি কোটী কোটী ছাগ মেষ প্রতিম জনবহুল জাতির অন্তর্গত হইতে কখনই অভিলাষী নহি—কিন্তু নাতি-জনবহুল শ্রেষ্ঠতর মানবসঙ্ঘের একজন হইতে চিরদিনই প্রয়াসী। কতকগুলি পশুর অভাব হইলে আমার কোনই ক্ষতি নাই—লৌহ ও অঙ্গার দ্বারা তাহাদের স্থান পূরণ করাইব। আমি চাই Sparta বা Athensএর একজন হইতে, কোশল বা বিদেহে গিয়া বাস করিতে। আমি চাহিনা অদ্যকার চীন, আমি চাহিনা অদ্যকার ভারতবর্ষ।

* * *

ফরাসীরা শ্রেষ্ঠ বীজ চাহিয়াছিল—তাহারা তাহা পাইয়াছে, কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ বিজাতীয়ের আওতায় সে বীজ বপন করিবার স্থান নাই। ফরাসীর তিরোধান আশ্চর্য্য নহে।

* * *

আরবেরা কেবল ক্ষেত্র কর্ষণে তৎপর—আজ তাহাদের বংশধর অৰ্দ্ধপৃথিবীব্যাপী—কিন্তু তাহাদের মধ্যে সিংহের জন্ম আর সম্ভব হয় নাই। তাহাদের মৃত্যুও অসম্ভব নহে।

* * *

যথায় সুক্ষেত্র মিলে তথায় অধিকতর আয়াস বীজের উৎকর্ষ সাধনেই অর্পিত হইবে। যথায় সুবীজ মিলে তথায় নব নব ক্ষেত্র সৃষ্টিই আবশ্যক হইয়া উঠিবে, কিন্তু ভারতে বীজ ও ক্ষেত্র দুইই দূষিত—দুইই মন্ত্র পূত করিয়া লইতে হইবে।

* * *

অবতারের অপেক্ষা

আজ আমরা দেশবাসীর কানে কানে আমাদের সমস্ত আশা সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত সাহস নিয়ে এই কথা গুলো স্পষ্ট করে' বল্‌ব যে তুমি ক্ষুদ্র নও তুমি তুচ্ছ নও—তুমি মহৎ, তুমি বৃহৎ—তুমি অমৃতের পুত্র। জীবন ভরে' যারা কেবলই স্বপ্ন দেখেছে যে এই যে জগৎ এখানে মানুষকে কেবলই দুঃখ দেবার জন্যে ভয় দেখাবার জন্যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে অমঙ্গলের ভিতরে টেনে নেবার জন্যে কে এক শয়তান তার আশে পাশে সৃষ্টির আদি থেকে হাজার রকম কল পেতে রেখেছে—তারা, তাদের মন্ত্র তাদের পূজো আজ অমানুষের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিক—কিন্তু মানুষ যারা অমৃতের পুত্র যারা চিন্ময়ীর সন্তান যারা আনন্দে বিশ্বাসবান যারা তারা আজ বেরিয়ে আসুক ভয়ের দেয়ালঘেরা মানুষের অতি বেদনাময় সংকীর্ণ জীবন থেকে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যথাভরা স্বার্থ থেকে, তাদের প্রতিদিনের অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস থেকে—দৃপ্ত বৃহৎ বিরাট।

যে-জাত আপনার মধ্যে শক্তির স্পর্দ্ধা নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে, সে-জাত প্রতিপদে আপনার জন্যে যা গেঁথে গেঁথে চলেছে, সে হচ্ছে মৃত্যুর শৃঙ্খল—আনন্দের কণ্ঠমালা নয়। শক্তিহীনতাকে যারা সাত্ত্বিকতা নাম দিতে শিখেছে, আনন্দের অভাবকে যারা শান্তির পুণ্য পরশ বলতে শিখেছে, চেষ্টাহীনের কর্ম্মহীনের সাহসহীনের জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিনের

শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসকে যারা বৈরাগ্য পদবাচ্য করতে শিখেছে, তারা যে যুগ যুগান্তরেও শক্তিমান আনন্দবান হবে না—ঐ মিথ্যার ভিতর দিয়ে আত্ম-প্রতারণার ভিতর দিয়ে যে তারা কোনদিনই অমৃত পাবে না—তা'ত কত শতাব্দী আমাদের চোখের সামনে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এটা যে অস্বীকার কর্‌বে, হয় তার বুদ্ধির গোড়ায় মোটেই হাওয়া লাগে না অর্থাৎ সে বোকা—নয় তার বুদ্ধির গোড়ায় একটু বেশী পরিমাণেই হাওয়া লেগে থাকে—অর্থাৎ সে মতলববাজ।

মুক্তি হোক্ বা আনন্দ হোক একজন আর এক জনকে সত্যিকার করে' পাইয়ে দিতে পারে—এ বিশ্বাস আমাদের নয়। আমাদের বহুকালের অভ্যাস ছিল হাত গুটিয়ে বসে' থাকা আর কারো অপেক্ষা করে'—হয় কোন অবতারের, নয় কোন মহাপুরুষের। আমরা নিজে কিছু কর্‌তে চাইনে সুতরাং করতে পারি নে। অবতার এসে আমাদের যা কিছু দুঃখ যা কিছু কষ্ট যা কিছু অধর্ম্ম ঘুচিয়ে দিয়ে যাবেন। কেননা সংস্কৃতে লেখা স্পষ্ট শ্লোক রয়েছে। তাই, আমরা মানুষ—কিন্তু হলে কি হয়—মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ সবাই আমাদের ওপরে এক এক হাত দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আজ আবার আমরা হাজার দুঃখ হাজার বোধ করে' কল্কীর অপেক্ষায় হুঁকো কল্কী হাতে নিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে কত কত স্বপ্ন দেখ্‌তে বসে' গিয়েছি। এই রকম দিবাস্বপ্নে মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়ে না—যা বাড়ে সেটা হচ্ছে জীবনের ঋণভার, মাতা ধরিত্রীর বুকের ওপরকার অধর্ম্মের ভার, সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির ভাণ্ডারে অক্ষমতার ভার।

এই যে অবতারের জন্যে হাত গুটিয়ে বসে' থাকা এর পিছনে মানুষের একটা মস্ত অমঙ্গল রয়েছে—সেই অমঙ্গলটা হচ্ছে আপন শক্তিতে অবিশ্বাস, আত্ম-প্রত্যয়ের একটা গভীর রকমের অস্বীকার। এই অমঙ্গল নিয়ে, এই নিজের প্রতি আস্থাহীনতা নিয়ে মানুষ কোন্ মঙ্গলকে সত্য করে' পাবে? কোন্ সত্যকে সে চিরন্তন করে' রাখ্‌বে? কোন্ চিরন্তনকে সে আনন্দময় করে' তুল্‌বে? তাকেই না বলি শূদ্র যে পরের প্রসাদে জীবন ধারণ করে' থাকে—যার আপনার শক্তি নেই বুদ্ধি নেই initiative অর্থাৎ নিজের কোন একটা কিছু স্বাধীনভাবে কর্‌বার বা বুঝ্‌বার সামর্থ্য নেই। এই যে অবতারের জন্য বসে' থাকা এটা শুধু এই প্রমাণ করে' যে আজ আমাদের সবার আত্মা হ'য়ে উঠেছে শূদ্রের আত্মা।

আজ আমরা রাজনৈতিক মুক্তি আকাঙ্খা করছি—দেবজাতি গঠন কর্‌তে চাচ্ছি—কিন্তু এ দুটো কাজই কি শূদ্রের জাত দিয়ে হবে? হবে না। কারণ আমি আগেই বলেছি—নিজের শক্তি সামর্থ্যে নিজের গুণে মানুষ কিছু লব্ধ না কর্‌লে পরে তাকে কোন জিনিসই সত্যিকার করে' পাইয়ে দিতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না তা'ও বল্‌ছি।

মানুষের বাইরের যে অবস্থা, সে-অবস্থা তার ভিতরের অবস্থারই ফল—অর্থাৎ বহির্বিকাশ। স্বাধীনতা পদার্থটা যে আমাদের আত্মার সত্য নয় সেটা আমাদের প্রতিদিনের প্রতি কাজে ধরা পড়ে। আমাদের মন স্বাধীন নয়, বুদ্ধি স্বাধীন নয়, প্রাণ মুক্ত নয়। বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারীদের স্বভাবে ও বিলিতি সাহিত্যের প্রভাবে যেটা আমরা আজ লাভ করেছি—সেটা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিতে স্বাধীনতা-লিপ্সা। বুদ্ধিতে এই স্বাধীনতা-লিপ্সা গুণেই আমরা বাহিরকেই খুব বড় করে' দেখ্‌ছি—আত্মার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতার সত্য জাগে নি বলে' আমাদের মনের প্রাণের চতুর্দ্দিকের সহস্র শৃঙ্খলের ভার আমাদের মোটেই নিবিড় যন্ত্রণাদায়ক হ'য়ে ওঠে নি। আমাদের আত্মা—মানুষের আত্মা—যে মানুষ এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—সেই মানুষ আমরা—সেই আমাদের আত্মা আজ বাঁধা পড়ে' আছে একটা অতি ক্ষুদ্র

টিক্‌টিকিটীর খানখেয়ালী 'টিক্‌টিক্'এর কাছে পর্য্যন্ত—অথচ আমরা চাই ঢাল তরোয়াল নিয়ে আমাদের দেহটাকে মুক্ত করতে। বুদ্ধির সত্যে ও আত্মার সত্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। বুদ্ধির সত্যে থাকেনা সেই সত্যের বাহিরের রূপ দেবার সামর্থ্য কিন্তু আত্মায় যে-সত্য সত্য হ'য়ে উঠেছে সে-সত্যের বহিঃপ্রকাশ হবার শক্তি তার সঙ্গে সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে। স্বাধীনতা আমাদের আত্মার সত্যরূপ হ'য়ে ওঠে নি—তাই আমরা একদিন যেমন মহম্মদ ঘোরীকে ডেকেছিলেম, আর একদিন যেমন ক্লাইবকে ডেকেছিলেম—তেম্‌নি আজ জর্ম্মানদের ডাকছি বা জাপানীদের আশায় বসে আছি—যে তারা এসে আমাদের স্বাধীন করে' দিয়ে আমাদের ঘরের দাওয়ায় বসে' পান তামাক খেয়ে শ্রান্তি দূর করে' ঘরের ছেলে সুবোধ বালকের মত ঘরে যাক্—এবং আমরা স্বাধীনতার চুশিকাঠি নিয়ে দিব্যি নির্ব্বিবাদে খেলা করি; আর আমাদের মধ্যে একটু সাত্ত্বিক টিকিওয়ালা যাঁরা তাঁরা আরও সহজ, অবতারের সম্বন্ধে দিবাস্বপ্ন রাতদিন দেখ্‌তে লেগে গেছেন।

ঐ শূদ্রস্বভাব আমাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ করিয়ে দেবে, মানুষকে বিরাট করে' তুলে জাতিকে দেশকে মহৎ করে' তুল্‌বে—ময়ূরের পুচ্ছ লাগিয়ে কাকবাবু ময়ূর মহাশয় হ'য়ে উঠ্‌বে—এই আশা এই বিশ্বাস যতদিন দেশবাসীর থাক্‌বে, ততদিন জীবনের সার্থকতা কোন রকমেই আস্‌বে না—আস্‌তে পারে না—কোন দিন কোনখানে আসে নি। মানুষের আত্মার কথা আত্মার অবস্থা আত্মার সত্য—টাকা পয়সা নয় যে হাতে হাতে দিলুম হাতে হাতে নিলুম। সে সত্যকে নিজের সাধনায় সত্য করে' তুল্‌তে হবে আপনার অন্তরাত্মায়, তখনই আস্‌বে আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তি—আর তখনই তা সত্যিকার সার্থকতা লাভ করবে।

শূদ্রের ধর্ম্ম আজ আমাদের প্রধান ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে বলে' আমাদের দেশে আজ পাঁচ টাকায় ব্রহ্ম-দর্শন লাভের দোকান খোলা সম্ভব হয়—তাই আমরা ভাবেনা শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদোদক খেয়ে সস্তায় কিস্তি মেরে কেবল লাভের আশা করে' বসে' থাকি। দেশে আজ তেমন লোক কোথায়—হাজার লক্ষ কোটী কোটী লোক কোথায়—যারা এই শূদ্র-ধর্ম্মের এতটুকু স্পর্শে নিবিড় যন্ত্রণা বিরাট অপমান অনুভব করে' অদম্য প্রাণের বেগে এককালে এককণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে—কত শতাব্দীর নীচু মাথা এক সঙ্গে উঁচু করে' দাঁড়াবে—তাদের আত্মার এতদিনকার শূদ্রের জরাজীর্ণ কুটীরকে ভস্মসাৎ করে' দেবে মুহূর্ত্তের ফুৎকারে নিমেষের আঁখির পলকে?

কিন্তু দেশবাসীর অন্তরের দিকে দৃষ্টি পড়েছে কই? আমরা আজ আমাদের অন্তরের শূদ্রদেবের গায়ে একটি আঁচড় না লাগে এম্‌নি ভাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণ গড়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। তাই আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মহাত্মারা বাইরে লম্বা-চওড়া স্বাধীনতার বাণী আউড়িয়ে এসে ঘরের হাজার মিথ্যার কাছে মাথা নুইয়ে দিচ্ছেন—যে-মিথ্যা মানুষের চিরকালের শৃঙ্খল—কিন্তু শৃঙ্খলেই যে শূদ্রের সন্তোষ শূদ্রের আরাম।

কিন্তু এই অবস্থাটা কোন দিনই সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে না যে মানুষের আত্মাটা হবে শূদ্রের, আর তার বাহিরের অবস্থাটা হবে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের। মানুষ অন্তরে যা হবে বাইরেও তার তাই-ই সফল হ'য়ে উঠবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—সৃষ্টিতত্ত্বের এ সত্য কোন-দিনই অসত্য হ'য়ে উঠ্‌বে না। আমাদের রাজনৈতিক পাণ্ডাদের খাতিরেও নয়।

সত্যকে আমরা না দেখ্‌লেও সত্য আমাদের প্রতিনিমেষটী দেখে—আমরা অন্ধ সেজে থাক্‌তে

পারি কিন্তু সত্য অন্ধ নয়। এবং সত্যের হিসেব আমাদের মনের খাতায় না থাক্‌লেও সত্যের খাতায় আমাদের হিসেবটার একটা অঙ্কও বাদ পড়ে না।

তাই আজ আমাদের সবার প্রথমে যা দরকার সে হচ্ছে আমাদের অন্তরের দেবতার আসনটীর কাছে ফিরে আসা—ফিরে এসে সেইখানে আমরা যা কর্‌তে চাই যা হতে চাই সেই সত্যকে সুদৃঢ় ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তবেই আমাদের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত অনুষ্ঠান সহজ হবে ও সফল হবে।

যতদিন আমরা অবতারের অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব বা মহাত্মাদের পাছে পাছে ঘুরব ততদিন এই প্রমাণিত হবে যে আমাদের শূদ্রত্ব ঘোচে নি। আর শূদ্র দিয়ে শূদ্রকে নিয়ে এমনকি অবতারেও যা গ'ড়ে তুল্‌বে সেটা হবে শূদ্রের সংসার শূদ্রের সমাজ শূদ্রের জগৎ।

কিন্তু আমরা ত শূদ্রের সমাজ গড়তে চাই নে—আমরা যে মুক্তি চাই স্বাধীনতা চাই—দেবজীবন গ'ড়ে তুল্‌তে চাই। কাজেই অবতার নয়—মহাপুরুষ নয়—আমরা নিজেরাই নিজের শক্তিতে নিজের তৃপ্তিতে নিজের আনন্দে ভাব্‌ব বল্‌ব কর্‌ব। আমাদের নিজের নিজের অন্তর দেবতাকে অদম্য শক্তি দিয়ে চিরন্তনের তারুণ্য দিয়ে অব্যর্থ জ্ঞান দিয়ে ভ'রে তুল্‌ব। তখন আমাদের সত্যের প্রতাপে সকল কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান সার্থক হ'য়ে উঠতে বাধ্য এবং হ'য়ে থাক্‌তে বাধ্য।

মানুষ যখন সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে মনুষ্যত্বের সফলতা তখনই অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে।
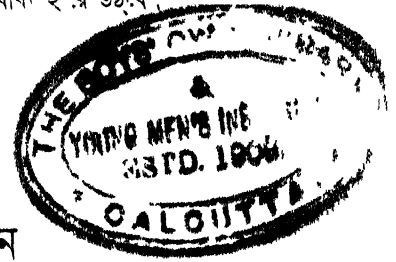
নন্-কো-অপারেশন

দেশে যে নতুন একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে, যে একটা দুর্ব্বার উত্তেজনা সবাইকে মাতিয়ে তুলেছে, যে মন্ত্র এতগুলি প্রাণের মধ্যে এমন ভাবে সাড়া পেয়েছে তাকে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবার মত মায়াবাদী আমরা নই। তাই বলে আবার এর সামর্থ্য ও সার্থকতা খতিয়ে যাচাই করে না দেখে, শুধু অন্ধভাবে এই স্রোতে ভেসে চলে যাওয়াই বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র উপায় ও কর্ত্তব্য তা'ও স্বীকার কর্‌তে আমরা নারাজ। নন্-কো-অপারেশনের একেবারে মূলে যে ভাবটি গোপনে নাড়া দিচ্ছে, দেশের অন্তরাত্মার মধ্যে যে স্পন্দনের ফলে বাইরে এই চাঞ্চল্য ফুটে উঠেছে সে সত্যকে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেটিকে পূর্ণভাবে অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে আমাদের কোনই কষ্ট নাই। কিন্তু সেই ভিতরের অন্তরাত্মার ভাবের সত্যটি জাগ্রত চেতনার যে বিগ্রহের মধ্যে ধরা দিয়েছে—মনে জ্ঞানে, কর্ম্মে অনুরাগে যে ধরণে রূপান্বিত, অনুরঞ্জিত ফলিত হয়েছে তাকে পূর্ণ অনবদ্য বলে ধরে নিতে আমরা পারছি না। আমরা মনে করি, নন্-কো-অপারেশন আপনকার ভিতরের আসল সত্যটিকে অনেকখানি ভেঙ্গে অনেকখানি বিকৃত করে তবে আমাদের চোখের সুমুখে ধরেছে। এই আধা সত্য এই সত্যাভাসেরও প্রয়োজন ও সার্থকতা থাক্‌তে পারে—থাক্‌তে পারে কি, আছে—কিন্তু সেটি হল প্রকৃতির সহজ খেলার কল, মানুষের কাজ—প্রকৃতির দানকে শোধন করে পূর্ণ করে খাঁটি করে তোলা। যা হয় তাই ভাল বটে,

কিন্তু তাই শ্রেষ্ঠ নয়।

আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হয়েছে স্বদেশী হওয়া—অন্তরাত্মায় এই সাড়া পড়েছে, প্রাণে এই ঢেউ দিয়েছে, মুখেও তাই এই কথা ফুটেছে। কিন্তু আসল কথা এইটি হলেও, কার্য্যত তা হচ্ছে না। কারণ, কার্য্যগতিকে অবস্থাগতিকে, স্বদেশী হওয়া অর্থ আমরা বুঝে নিয়েছি, বিদেশী না-হওয়া। স্বদেশী হওয়াটা আমাদের পক্ষে ভাব জগতের কথা, সেটা আছে হাওয়ায় হাওয়ায়; বিদেশী না-হওয়াটাই দাঁড়িয়েছে আমাদের বস্তু জগতের কথা, এ জিনিষটিই যেন স্পষ্ট নিরেট, একেই শুধু আমরা ছুঁতে পাই, ধরতে পাই। কিন্তু কিছু না-হওয়ার চেষ্টা যে তার উল্টা কিছু হওয়াইয়ে দেয় এমন কথা শাস্ত্রেও বলে না, অভিজ্ঞতাতেও বলে না। বিদেশী হব না যখন কেবল বলতে থাকি, তখন বিদেশী জিনিষটাই আমার সুমুখে সর্ব্বদা জেগে থাকে, যা কিছু স্বদেশী বলে সৃষ্টি করতে যাই তাতে ঐ বিদেশীরই সোজা হোক উল্টা হোক একটা ছাপ থেকে যায়। একথাটা বুঝতে বেশী দূর যাওয়ার দরকার নাই।

আমাদের 'নন্‌কো-অপারেশন' নামটি বিলাতি আর এ নামের পিছনে যে বস্তুটি আছে সেটিও বিলাতি; এর সারা গায়ে, শুধু গায়ে কেন, এর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত লেগে আছে বিলাতির বোঁটকা গন্ধ। প্রমাণ, স্কুল কলেজ থেকে ছেলেদেরকে আমরা ছাড়িয়ে নিচ্ছি স্কুল কলেজেই তাদেরকে বাঁধবার জন্যে; ছেলেদেরকে সেই একই এগ্‌জামিনের ফাঁসি কাঠে ঝুলাব, তবে ফাঁসুড়ে নাকি স্বদেশী আর ফাঁসি কাঠটিও বিলেত থেকে আমদানি নয়, একেবারে সুন্দরবনের তক্‌তকে তাজা গাছ দিয়ে তৈরি। আমরা আমাদের নামের সাথে Kt. অথবা C. I. E. জুড়ে দিতে লজ্জায় ঘৃণায় মরে যাই কিন্তু তার বদলে "মহাত্মা" "মৌলানা" একটা কিছু না লাগাতে পারলে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করি না। আমাদেরই এক বন্ধু সেদিন ভয়ানক আস্ফালন করে তাঁর দেশভক্তি দেখাতে দেখাতে বলছিলেন—'এই যে কোট প্যাণ্ট দেখ্‌ছ আমার, এ একেবারে আমাদের গ্রামের তাঁতে বোনা কাপড় দিয়ে তৈরি'! স্বরাজও আমাদের ঐ ধরণের—আমরা মনে কচ্ছি ইংরেজকে তাড়িয়ে, দেশী লোক দিয়ে ঐ বিলাতি কলটাকে, অবশ্য এখানে ওখানে একটু আধটু মেরামত করে নিয়ে, চালিয়ে নিলেই আমাদের হয়ে গেল মোক্ষপ্রাপ্তি!

কথাটা ছিল স্বারাজ্য—আমাদের দেশের নাড়ী বেদান্তের কথা, কিন্তু তাতে আমাদের মন উঠ্‌লো না, তাকে বুঝতেও পাল্লেম না, তাই তাকে ভেঙ্গেচুরে তাতে বিলাতি এসেন্স মাখিয়ে বানিয়ে নিলেম—স্বরাজ্। কোন সত্য যদি আমার কাছে পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠে, তবে তা হওয়া চাই—কায়েন মনসা বাচা। বাক্যে আমরা কতকটা স্বদেশী হলেও হতে পারি, কিন্তু কর্ম্মে আমরা বিদেশী, কারণ মনটাই যে বিদেশী রয়ে গেছে। মনটাকে কি করে স্বদেশী করা যায় তাই ত আসল সমস্যা। বলতে পার বাক্য দিয়েই আরম্ভ করতে হয়, আগে বাক্ বাক্যের সাথে কাজ, পরে মন আপনাথেকেই ঠিক গড়ে উঠ্‌বে ক্রমে; বিদেশী ভাবে আমরা ভরপুর মান্‌লেম না, কিন্তু বিদেশী ভাব দিয়েই বিদেশী ভাব কাটতে হবে—বিষে বিষক্ষয়—পরেই ত স্বদেশী ভাব গজাবার জায়গা পাবে? বিষে বিষক্ষয় সত্যি কথা—কিন্তু তাতে কি অমৃত ওঠে? বিদেশী ভাব দিয়ে বিদেশী ভাব তাড়ালেম কিন্তু তাতে কি স্বদেশী ভাব গজায়? শেষে কোন রকমে গড়ে উঠ্‌বে এই বলে ভাঙ্‌তে সুরু করলেই জিনিষ গড়ে উঠে না—গড়ে যা ওঠে তা ভাঙ্‌বারই শক্তি গড়্‌বার নয়। গড়্‌বার শক্তি পেতে হলে অলাদা রকম শিক্ষা সাধনা দরকার।

নন্-কো-অপারেশন যে শক্তিটা দিচ্ছে সেটা

ভাঙ্বার শক্তি আর সে ভাঙ্বার শক্তিরও দৌড় খুব বেশী নয়। ভাঙ্তে হলে দেশে আরও ঢের জিনিষ ভাঙ্তে হয়—নাম করে শেষ করা যায় না। কিন্তু নন্-কো-অপারেশন ভাঙ্তে চায় বর্ত্তমানের পলিটিকাল ইমারতটা; এই পলিটিকাল ইমারতটার আবার সবখানি সে ধরতে চায় না বা পারে না—প্রথমে সবটা ধরে নাড়া দিতে একটু চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু এখন দেখ্ছি শুধু ওর একটী স্তম্ভ অর্থাৎ ছেলেদের দল (তা'ও আবার ষোল বছরের বেশী বা কলেজের ছাত্র হওয়া চাই) নিয়েই লেগে পড়েছে। ছেলেদের নতুন প্রাণ, তা দিয়ে যা খুসী তাই করা যেতে পারে। আমাদের দুঃখ এই, এমন যে জমী সব পড়ে আছে, আবাদ কর্তে জানলে যাতে সোণা ফলে, সেখানে আমরা বাদ্তা ফলাতে ব্যস্ত। বাস্তবিক ছেলেদের মধ্যে সুপ্ত আছে যে একটা বিরাট শক্তি, নন্ কো-অপারেশন সে শক্তিটার উপর কোন টান কোন চাপ দিচ্ছে না, খেলিয়ে তুল্ছে কেবল সেই শক্তির একটা ছোট্ট অংশ। এতখানি যে হৈ চৈ এতটা বহ্বারম্ভ তার অর্থ ছেলেদের প্রাণে চায় যে রকম শক্তির ধারা যে রকম কর্ম্মের ক্ষেত্র সে রকম কিছু তারা পাচ্ছে না, সেই অভাবটাই তারা এই কোলাহল এই আড়ম্বর দিয়ে ভরিয়ে দিতে চেষ্টা কর্ছে। আর তা যদি না হয়, ছেলেদের প্রাণ, কিছু না ভেবে না চিন্তে, দুর্গা বলে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলেই যদি পায় পূর্ণ তৃপ্তি তবে বলব এতে প্রমাণ হয় তাদের কর্ম্মের তৃষ্ণা আছে, দেশের মঙ্গল বলে অন্তরে একটা ভাব আবেগ আছে কিন্তু ভাবের সাথে যে জ্ঞান আছে, আবেগের সাথে যে সামর্থ্য আছে তৃষ্ণার সাথে যে নৈপুণ্য আছে তা কখন বল্তে পারব না।

নন্-কো-অপারেশন দিচ্ছে সইবার শক্তি, কিন্তু ওতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। গর্দ্দভ যে ভার বইতে বইতে অশ্বে পরিণত হয়, এর প্রমাণ বিজ্ঞানেও পাই না, বুদ্ধিতেও পাই না। আমরা যদি সাইলকের (Shylock) কথা—Suffering is the badge of our tribe—বুকে এঁটে মনে করি চরম মন্ত্রটি পেয়েছি, যদি বিশ্বাস করি এই suffering এর জোরেই অমরা শেষে পেয়ে যাব সৃষ্টি করবার গুণ সব তবে অবস্থা যে আমাদের খুবই সঙ্গীন তা মান্তেই হবে। গান্ধী Soul force-এর কথা বলেন, কিন্তু তিনি soulএর যে force দেখাতে চান সেটা হচ্ছে ছাড়িয়ে নেবার, প্রত্যাহারের 'নেতিনেতি'র শক্তি—এটা soulএর আধখানা। পূর্ণ—উপনিষদের কথায়, 'কৃৎস্ন' যে আত্মা তার আছে আবার ছড়িয়ে দেবার প্রকাশের 'ইতিইতি'র শক্তি। নিগ্রহের শক্তি ত্যাগের শক্তি মস্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চেয়ে বড় শক্তি, বিকাশের, বিসৃষ্টির। তিতীক্ষার শক্তির চেয়ে শতগুণে বড় প্রভুত্বের ঈশ্বরত্বের শক্তি। তাই নন্ কো-অপারেশনের গুরু মহারাজ গান্ধী নন্-কো-অপারেশনের মধ্য দিয়ে যে ধর্ম্মে ভারতবাসীকে দীক্ষিত কর্তে চাচ্ছেন—ফলতঃ সে ধর্ম্মটা ভারতবাসীর পক্ষে খুবই পুরাতন ও পরিচিত আর সেই জন্যই গান্ধীর বাক্য সাধারণ লোকের প্রাণে গিয়ে এমন নাড়া দিয়েছে—সে ধর্ম্মের আশু ফল যত ভাল মনে হোক না কেন, তার ভবিষ্যৎ দেখে কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

এটা মনে রাখ্তে হবে গোড়ায় যে সঙ্কল্প সেইটাই শেষে হয় সিদ্ধি—সঙ্কল্পের বেশী সিদ্ধি হতে পারে না। যে শক্তি নিয়ে উঠ্বো সেই শক্তি নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। নন্-কো-অপারেশনের শক্তি তার নিজের ক্ষেত্রটুকুতেই কতখানি সম্ভবমত প্রযোজ্য কতখানি বাস্তবিক কার্য্যকরী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না তুলে, আমরা স্বীকার করেই নিলেম যে এই শক্তি দিয়েই আমরা যা চাই তা পেলেম অর্থাৎ

আমাদের চাই স্বরাজ—পলিটিক্যাল মুক্তি ও পলিটিক্যাল শক্তি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে দেশের—শুধু দেশের নয়, জগতের আজ সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সমস্ত জীবনের সমস্যা। আমাদের দেখতে হবে স্বরাজ বা পলিটিক্যাল মুক্তি ও শক্তি এই গোটা জীবনের সমস্যার কি মীমাংসা দিচ্ছে। স্বরাজের উদ্দেশ্য যদি শুধু অথবা মুখ্যতই হয় ইংরেজকে কোন রকমে তাড়াবার তরে অথবা বলতে কুণ্ঠিত হব না যে এ রকম স্বরাজ স্পৃহণীয় নয় আর হলেও তা স্থায়ী হতে পারে না। যে স্বরাজ আমাদের ভিতরে বাইরে স্থান করে ফুটে উঠবে সমস্ত জীবন সমস্যার যথাযথ খাঁটি একটা মীমাংসা নিয়ে, ঠিক সেই অনুপাতেই তার হবে পাকা ভিত, সে উঠবে জগৎশক্তির প্রতীক হয়ে, এমন একটা অটল সত্য ও সামর্থ্য নিয়ে যার ফলে তাকে বাধা দেবার নড়চড় করবার শক্তি কারোই আর থাকবে না। অর্থাৎ আমাদের সঙ্কল্প আমাদের প্রয়াস যদি কেবল স্বরাজ নিয়ে না থাকে, কিন্তু থাকে এমন একটা গোটা জিনিষ নিয়ে যার একদিককার সহজ অব্যর্থ অভিব্যক্তি হচ্ছে স্বরাজ, তবে তাতে স্বরাজ ত মিলবেই বটে তা থাকবে হস্তামলকবৎ—কিন্তু তাতে পাব সেই স্বরাজের প্রাণ, আসল উদ্দেশ্য হেতু সার্থকতা। কারণ, ভারতকে স্বাধীন হলেই অর্থাৎ ইংরেজের হাত এড়ালেই চলবে না—এটা খুব বড় কথা নয়, এর আশু প্রয়োজন আমরা যতই অনুভব করি না কেন—কিন্তু ভারতকে হতে হবে মহৎ। স্বাধীনতার বীজ আমরা বপন করতে চাচ্ছি, কিন্তু তার আগের প্রশ্ন, মহত্ত্বের বীজ বপন করেছি কি? মহত্ত্বের বীজ যদি পেয়ে থাকি, তবে তার মধ্যে স্বাধীনতার বীজও পেয়েছি। স্বাধীন ভারত নিয়ে আমরা কি করব, স্বাধীন ভারতের রূপ কি হবে, তার পূর্ণ চিত্র অন্তরে পূর্ণ সিদ্ধি দিয়ে ফুটিয়ে তুলে কর্ম্মে যে অগ্রসর হবে তারই প্রয়াস হবে সার্থক—আর সব ক্ষণিকের উত্তেজনা মাত্র। ক্ষণিক উত্তেজনার প্রয়োজন থাকতে পারে, তার একটা সুফলও থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মীর দৃষ্টি ওটিকে ছাড়িয়ে আরও দূরে নিবদ্ধ, তাঁর বিধি ব্যবস্থা সেই দূরকে লক্ষ্য করে।

নন্-কো-অপারেশন যদি করতে হয়, তবে তাকে করে তুলতে হবে সমস্ত জীবনের নন্-কো-অপারেশন। পলিটিক্স বা এডুকেশন ধরে যে নন্-কো-অপারেশন, তা আমাদের জীবনের একটা দিক, একটা ভাসাভাসা দিকই নিয়ে রয়েছে। এ যেন আমরা আগাছার ডালপালা কেটে ছেঁটে দিচ্ছি কিন্তু মূলটা মাটির সাথে তেমনি এঁটে রয়েছে—সে দিকে খেয়াল আমাদের নেই। এডুকেশন বল, পলিটিক্স বল, আর ইকনমিক্সই বল এ সবই নেশনের ডালপালা। নেশনের মূলে নেশনের প্রাণে যা সেটা আলাদা জিনিষ। সেখান থেকে ধরে তবে আর সব বিষয়ে আর সব দিকে নন্-কো-অপারেশন করতে হবে।

দেশের প্রাণকে, অন্তরাত্মাকে ব্যক্তির মধ্যে গোষ্ঠীর মধ্যে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত করে তুলতে হবে। ভবিষ্যৎ ভারতের ভবিষ্যৎ জগতের একটা পূর্ণ অখণ্ড সমৃদ্ধ জীবন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফলিয়ে তুলতে হবে—এইটিই ত গোড়ার কথা। কিন্তু এ বস্তুটি গজিয়ে ওঠে ফুটে ওঠে গোপনে নীরবে ধীরে ধীরে তলা থেকে। আগে চাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বারাজ্য—ভবিষ্যৎ থেকে কেটে আনা কয়েকখানি স্বর্গখণ্ড। বাইরের আন্দোলন দেশব্যাপী উৎসাহ এই গুলি থেকেই জীবন পাবে এইগুলিকেই মিলিয়ে বাড়িয়ে মহাসাম্রাজ্যে পরিণত করবে। কিন্তু আগের কাজ আগে চাই। এজন্য এখন প্রয়োজন কয়েকজন সাধক কয়েকজন কর্ম্মী যারা নিজের জীবনে, জীবনের চারিদিকে সর্ব্বতোভাবে আদর্শটিকে সৃষ্টি

করে চলেছেন। কোন রকম বিশেষ নন্‌কো-অপারেশন তাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু সমস্ত জীবনটা দিয়ে তারা এমন একটা জিনিষের সাথে কো অপারেশন করছে যার সহজ অব্যর্থ ফলই হচ্ছে বিরুদ্ধধর্ম্মী জিনিষ সকলের সাথে নন্‌-কো-অপারেশন। এ জন্য কোন চেষ্টা কোন হাঁক ডাক কোন হৈ চৈ করতেই যে হবে তার কোন মানে নাই।

নন্‌ কো অপারেশন হোক, আর নন কো অপারেশনের ফলে যদি স্বরাজ পাই তবে সে স্বরাজই হোক, তা হচ্ছে 'অল্পের' জিনিষ। কিন্তু অল্পেতে সুখ নাই, ভূমৈব সুখং। এই ভূমার বন্দোবস্ত আমরা কি করেছি, কি করছি? ভূমার আলোকে ভূমার শক্তিতে যদি স্বরাজ ফুটে না ওঠে, তবে সে স্বরাজের মূল্য খুব বেশী নাই। সমস্ত জীবনটা নূতন সুরের সাথে গেঁথে গেঁথে দিয়ে যে স্বরাজ ফুটে না উঠ্‌ছে, বিদেশীর উপর বিজাতীয় ক্রোধ বা অভিমানই হচ্ছে যে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা, সে স্বরাজের উপর লোভ অমৃতের পুত্রদের হওয়া উচিত নয়— বুদ্ধিমানেরও হওয়া উচিত কি না সন্দেহ। বলা হয়ে থাকে বটে, আগে চাই পলিটিকাল মুক্তি, আগে চাই কোন রকমে ইংরেজকে তাড়ান, পরে আর সব জিনিষ আপনা থেকেই হবে, না হয় তখন ভাবা যাবে। শরীরটা বন্ধন মুক্ত হলে, সেখানে বল আসবে, প্রাণ আপনি খুলে যাবে, নিজের খাত নিজে তৈরী করে নেবে। কিন্তু প্রাণ যদি না থাকে, শরীরে বল যদি না থাকে, তবে জড়কে মুক্ত করে দিলে কি হবে, তা ত পড়েই থাকবে? মনে প্রাণে যদি দাসত্বের মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকে, তবে দেহটা ক্ষণিকের উত্তেজনায় ক্ষেপে গিয়ে ছুঁড়েছুঁড়ে মুক্ত হয়ে গেলেও আবার ফিরে দাসত্বের বন্ধনের ভিতরেই আস্তে আস্তে এসে পড়বে—দেহকে, দেহের অঙ্গ বিশেষকে মুক্ত করা আসল কথা নয়, আসল কথা দেহের মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা, মনের উদ্বোধন। আগে ভাঙ্গা চুরা নয়, আগে দেখ্‌তে হবে তোমার গড়বার কি প্ল্যান আছে। প্রকৃত কর্ম্মীর কাজ chaos তৈরী করা নয়, কর্ম্মীর কাজ cosmosকে সৃষ্টি করা, cosmos সৃষ্টি করতে যদি ভাঙ্‌তে চুরতে হয় তবে সেটা পরের কথা, পরের কথা না হলেও সেটা আনুষঙ্গিক কথা মাত্র। বলা হয়, পলিটিকাল দাসত্ব যতদিন ততদিন কোন জিনিষই গড়ে উঠ্‌তে পারে না, সে চেষ্টা করাও বৃথা—পুরাতন বিষাক্ত ইমারতের জায়গায় নূতন কি ইমারত তুল্‌ব তা নিয়ে গবেষণা না করে অবিলম্বে সেটিকে ভেঙ্গে চুরে ধূলা-সই করাই যুক্তিযুক্ত। প্রথম কথা, দাসত্বের মধ্যে যদি কিছুই গড়া সম্ভব নয়, তবে ভাঙবার শক্তিটাই গড়লে কি করে? আর ভাঙ্‌বার শক্তিটাই যদি সে অবস্থায় পেতে পার, তবে গড়্‌বার শক্তিটাই বা কিছু পাওয়া যাবে না কেন? শক্তির বাহ্য প্রয়োগটা ভাঙ্গার জন্যে—বিশেষত আরম্ভের দিকে—প্রয়োজন হলেও হতে পারে কিন্তু তার আগে চাই শক্তিরই উদ্বোধন, শৃঙ্খলা, নিপুণতা, আর গড়ার জন্য যে শক্তি আমরা জাগাতে চাই, জাগাতে পারি, ভাঙ্গার জন্যে সেই শক্তিই তত পটীয়সী, কিন্তু ভাঙ্গার জন্যে যে শক্তি সে শক্তি অল্পেতেই অবসন্ন হয়ে পড়ে, গড়্‌বার পক্ষে সে রকম শক্তি সুবিধার নয়। তারপর নতুন ইমারত তৈরী করতে হলে, পুরাতন ইমারত আগে একেবারে ভেঙ্গে ফেল্‌তে হয় বটে; কিন্তু মানুষ, মানুষের প্রতিষ্ঠান জড় ইমারতের মত কিছু নয়। দুটি জড়-বস্তু একই সময়ে এক জায়গায় থাকতে পারে না, এটি বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু জীবন্ত জিনিষের খেলায় এ নিয়ম খাটে না। সজীব জিনিষ তৈরী হয় না, তার হয় জন্ম—পুরাতনের জঠরেই সে অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, সময় হলে বাইরে এসে দেখা দেয়, পুরাতনকে সে জন্যে আগে থাক্‌তেই ভেঙ্গে ফেল্‌তে হয় না।

আমরা আবার বলি, দেশকে যাঁরা বাস্তবিকই ভালবাসেন, তাঁদের আগে পেতে হবে স্বারাজ্য অর্থাৎ ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সমস্ত জগতকে জীবনের কি মীমাংসা দিবে তারই তপোমূর্ত্তি হয়ে দাঁড়াতে হবে। যিনি যতখানি এই জাগ্রত বিগ্রহ হয়ে উঠেছেন তিনি তাঁর চারদিকে ততখানি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, ভবিষ্যৎ ভারতের ভবিষ্যৎ জগতের ভবিষ্যৎ সমাজের, ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্ব-পরিকল্পনা এঁকে দিয়েছেন। সময়ে তাই এক হয়ে, বিপুল হয়ে, বিরাট হয়ে বিকশিত হবে। এই স্বারাজ্য সিদ্ধি হলে স্বরাজ সিদ্ধি ত তুচ্ছ কথা, সমস্ত জগৎ পাবে তার মুক্তি, মানুষের হবে সর্ব্ব সিদ্ধি।

এটা ভয়ানক বড় কথা বলে পশ্চাৎপদ হলে চলবে না—গান্ধী যে শুধু Soul force দিয়ে প্রাকৃত শক্তিকে বশ করতে চাচ্ছেন তার চেয়ে এটা বেশী চমৎকারী কিছু নয়। এ কথা স্থির জানতে হবে, সমস্ত জগতে যে আলোড়ন বিলোড়ন চল্‌ছে, যে নূতন ধর্ম্ম নূতন আয়তনের জন্য সমগ্র মানবজাতির প্রাণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তার তৃপ্তিকর একটা সত্য, একটা বার্ত্তা নিয়ে ভারত যদি স্বাধীন না হয় তবে সে স্বাধীনতা টিকবে না, ভারতবর্ষ বলে কিছুই থাকবে না। ভাবের আবেগে মায়ের শৃঙ্খল উন্মোচন করতে অধীর, দিগ্বিদিক শূন্য হলে চলবে না। চিনেছ কি, মা কি, মা কে? যে মা'কে তুমি উদ্ধার করতে চলেছ সে কি সত্য সত্যই তোমার মা? আর তুমি যেটাকে শৃঙ্খল বলছ, সেটাকে ধরে টানাটানি করে, কেটে ছিঁড়ে মায়ের পায়ে আঘাত দিবারই এমন প্রয়োজন আছে কি? খুঁজে পেতে পার না এমন মন্ত্র যার বলে সে শৃঙ্খল আপনা থেকেই খসে পড়ে? চাই কি, এমন পরশ-পাথর পাওয়া কি অসম্ভব যার স্পর্শে শৃঙ্খল হয়ে যেতে পারে সোণার আভরণ?

কাপড় ও সূতা

অল্লাধিক দুই বর্ষ পূর্ব্বে, একদিন কোন সুহৃদের সহিত কথা বলিতে বলিতে, বড় উত্তেজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, স্বদেশজাত কার্পাসে চরকায় সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিতে না পারিলে, এই এক-বস্ত্রে দিনাতিপাত করিব, শতগ্রন্থীযুক্ত হইলেও বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিব না। আমার প্রিয়বন্ধু স্নেহ-পরবশ হইয়া, এই দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ একটী বৎসর তপস্যা করেন। তাহাতে আমরা ইজিপ্‌সিয়ান্ আমেরিকান কটনের যে তুলা উৎপাদন করি, তাহা বিদেশজাত তুলার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমাদের মধ্যে চরকা প্রচলন ও তাঁতের সৃষ্টি সেই তপস্যারই ফল। আজ দেখিতেছি দুই বৎসর পূর্ব্বে যে প্রেরণা উপর হইতে আমাদের জীবনক্ষেত্রে প্রবল ধারে বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা দেবতারই অলঙ্ঘ্য আদেশ, মহাত্মা গান্ধীর মুখ হইতে এই অগ্নিমন্ত্র নিঃসরিত হইবামাত্র—বাংলার ঘরে ঘরে সেই অব্যর্থ প্রেরণা ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে—যদি দেশ ইহাতে কৃতকার্য্য হয় ভারতবর্ষে আবার সোণা ফলিবে একথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রতি বৎসর কার্পাসজাত বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষকে ষাটকোটী টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই টাকা দেশে রাখিতে পারিলে দারিদ্র্য দূর হওয়া বিচিত্র কথা নহে। যে ভারতবর্ষ বস্ত্রব্যবসায়ের জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল, যে দেশের চারু বস্ত্রে পারস্য ইজিপ্ট ইউরোপ ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্যদেশের নর নারী লজ্জা নিবারণ করিত—সেই দেশ পুনরায় বস্ত্রশিল্পে উন্নতিলাভ করিবে ইহা তো অসম্ভব কথা নহে। তবে চাই নিষ্ঠা চাই ত্যাগ—চাই অটুট সঙ্কল্প।

মহাত্মাজী বলিয়াছেন "The secret of Swaraj" স্বরাজের গূঢ় মন্ত্র 'spinning must be a compulsory subject" সূতাকাটা অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম হওয়া চাই। "Just as we cannot live without breathing and without eating, so is it impossible for us to attain economic independence and banish pauperism from this ancient land without reviving hand spinning?" আমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস এবং আহার ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারি না - সেইরূপ এই প্রাচীন দেশ হইতে দারিদ্র্যকে চিরবিদূরিত করিয়া অর্থপ্রতিষ্ঠান দৃঢ় করিবার জন্য ঘরে ঘরে চরকা প্রচলন কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব?

তারপর প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে চরকা প্রচলনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। চাই ইহার জন্য সংঘ সংস্থাপন (organisation)। যদি দেশের বালক বালিকারা একবার চরকার সূতা কাটা শিখিয়া লয়, ঘরে ঘরে ইহার প্রচার অসম্ভব হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন সূতাকাটা যাহার অভ্যাস আছে—তিনি প্রতিঘণ্টায় আড়াই তোলা সূতা কাটিতে পারেন। তাঁহার বিবেচনায় চল্লিশ তোলা সূতার মূল্য চারি আনা হওয়া উচিত। তাহা হইলে একজন প্রতিদিন বার ঘণ্টা চরকার কাজ করিলে—তিন আনা পয়সা উপায় করিতে পারিবে।

তিনি যে সকল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন—উহাতে বিদ্যার্থীদের প্রতিদিন চারিঘণ্টা সূতাকাটার ব্যবস্থা করা হইতেছে, ইহাতে প্রতি ছাত্র দশ তোলা সূতা কাটিবে, যাহার মূল্য এক আনা, ছাব্বিশ দিন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা চলিলে, প্রতিছাত্রের উপায় হইবে একটাকা দশ আনা। প্রতি শ্রেণীতে ত্রিশজন ছাত্র থাকিলে, সেই শ্রেণী হইতে প্রতিমাসে আটচল্লিশ টাকা বার আনা আয় হইবে, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনায়াসেই বাহির হইতে অর্থসাহায্য না পাইলেও, ছাত্রগণের সাহায্যেই জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের গৃহাদি যদি বাঁধিতে পারিলে ইহাদের ভাবনা থাকিবে না, কিন্তু এই কয় বৎসরে ইহাই না সমস্যা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র দেশের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে কঠোর তপস্যা বলেই ইহার মূলে কুঠারাঘাত করা চাই। ছাত্র এবং অধ্যাপক উভয়কেই আজ অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে। ঠিক সূতা কাটিয়া অর্থ উপায় দ্বারা নূতন বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা সম্ভব হউক আর নাই হউক, আমাদের এমন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে যদ্দ্বারা অল্পায়াসে ব্যাপকভাবে আমরা বিদ্যাপ্রচার করিতে পারি। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ের আলোচনা করিব, উপস্থিত তাঁত ও চরকা সম্বন্ধে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই দেশের সমক্ষে ধরিতে প্রবৃত্ত হইব।

মহাত্মাজী বলিয়াছেন প্রতি ঘণ্টায় কোন অভ্যস্ত ব্যক্তি আড়াই তোলা সূতা কাটিতে পারে—বার ঘণ্টা কাজ করিলে প্রায় ত্রিশ তোলা সূতা কাটা হইবে, তাহা হইলে (এই সূতা যদি কুড়ি নম্বরের হয়) একখানা কাপড়ের সূতার জন্য এক-

জনকে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে। এই সূতার মূল্য হইবে পাঁচ আনা ছয় আনা। খুব কম করিয়া কাপড় বুনাইবার 'বানি' যদি বার আনা ধরা হয়, এইরূপ একখানা দশ হাতি কাপড়ের মূল্য হইবে আরও কিছু খরচ ধরিয়া পাঁচসিকা—কুড়ি নম্বরের সূতার কাপড় নিতান্ত মন্দ হইবে না। সহরের লোকে উপস্থিত যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহা সাধারণতঃ ত্রিশ চল্লিশ নম্বরের সূতায় প্রস্তুত হয়, এবং ইহা একপ্রকার মিহি ধুতি; কুড়ি নম্বরের সূতায় কাপড় কিছু মোটা হইবে, তা হউক, দেশের তুলায় হাতে সূতা কাটিয়া আমাদের যদি মোটা কাপড় পরিতে হয়, বিদেশ জাত সৌখীন বস্ত্রাপেক্ষা ইহা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ, একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু একেবারেই এই কুড়ি নম্বরের সূতা কাটা বড় সহজ নহে। প্রথমতঃ চরকায় হাত সেট্ হইতে—প্রতিদিন অভ্যাস করিলে—পনের দিনের কম সূতা কাটা সম্ভব হইবে না; তারপর যে সূতা হইবে তাহাও তাঁতের উপযোগী হইয়া উঠিবে না। ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে অন্ততঃ দশ নম্বর সূতা যদি সমান পাকে অধিক সরু মোটা না হইয়া প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে উহা কোন প্রকারে তাঁতে চালাইতে পারা যাইবে। উপস্থিত আমরা যে কোটের ছিট প্রস্তুত করিতেছি উহার টানা দশ নম্বরের, পোড়েনের সূতা একুশ নম্বরের, কেবল দশ নম্বরের টানা পোড়েন হইলে সে কাপড় চটের তুল্যই হইবে।

দশ নম্বরের সূতায় কাপড় প্রস্তুত করিতে হইলে সতের হাজার গজ সূতা প্রস্তুত করা চাই, ইহার ওজন আন্দাজিক এক সের হইবে; সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী যে প্রতি ঘণ্টায় আড়াই তোলা সূতা কাটার কথা বলিয়াছেন, তাহা এই দশ নম্বর সূতা হইবে; একখানা কাপড়ের জন্য সূতা কাটিতে অন্ততঃ একজনের দুইদিন সময় লাগিবে। কুড়ি নম্বরের সূতায় যে দশ হাত কাপড় হয় তাহার পরিমাণ সাড়ে আঠার হাজার গজ, ওজন প্রায় অর্দ্ধ সের—ইহা কোন মতেই এক ঘণ্টায় আড়াই তোলা কাটা সম্ভব হইবে না; অন্ততঃ চারিদিনে, প্রতিদিন বার ঘণ্টা করিয়া কাজ করিলে যদি একজন এই সূতা কাটিয়া শেষ করিতে পারে। সূতা যত মিহি হইবে ততই মজুরি অধিক পড়িয়া যাইবে। একজনে সরু মোটা নির্ব্বিচারে এক ঘণ্টায় এক সের তুলা কাটিয়া ফেলিতে পারে—ইহা হইলে তো চলিবে না, সূতা যাহাতে কার্য্যোপযোগী হয়, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যেমন করিয়াই হউক, এই দারুণ দুর্ম্মূল্যের বাজারে বর্ত্তমান প্রথানুসারে সূতা কাটিয়া কেহই নিজ জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারিবে না—এরূপ না হইলে ব্যবসা হিসাবে ইহা স্থায়ী হইবে না—তবে জাতিগত শুদ্ধির জন্য ঘরে ঘরে সকলেই যাহাতে অবসর মত চরকা কাটে সে বিষয়ে আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। আর এই সূতা ব্যবহারোপযোগী হইলে ইহা সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে যাহাতে প্রেরিত হয় সে দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রথম প্রথম সূতার পাক এলো হইবে, গ্রন্থীযুক্ত হইবে। টানায় এই সূতা কোন মতেই ব্যবহৃত হইবে না, তবে যাঁহারা সখ করিয়া তাঁত বুনিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাহা হইলেও টানায় সূতা অধিক পরিমাণে ছিঁড়িতে আরম্ভ করিলে বুননকারী কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না সেইজন্য উপস্থিত দেশীয় মিলের সূতা কিনিয়া টানা দেওয়া হউক এবং চরকার সূতা যাহা পাওয়া যাইবে সমস্তই পোড়েনের জন্য ব্যবহৃত হইলে ধীরে ধীরে সূতা প্রস্তুত যত ভাল হইতে থাকিবে—আমরাও উহার প্রচলন তত অধিক করিতে থাকিব। কালে চরকার সূতাতেই সকল কাজ সাধিত হইবে।

চরকা কাটিয়া কোন ব্যক্তিই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না, একথা মাথায় রাখিয়া আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। তবে সকলেই যদি অবসর মত কাটিতে থাকে, দেশে প্রচুর সূতা উৎপন্ন হইবে—এই দিক দিয়া যদি চরকা প্রচলন সম্ভব হয়, আমরা তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে ক্রটী করিব না।

তারপর তাঁতের কথা। অনেকেই তাঁতের কাজ শিখিবার জন্য আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। তাঁত বুনা শিক্ষা করা দুরূহ কর্ম্ম নহে। যে-কোন ব্যক্তি দুই চারি ঘণ্টা দেখিলেই বুনন কাজ শিখিতে পারে, কেবল মাকু চালাইতে পারিলেই তাঁতের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না, একখানা তাঁত চালাইতে হইলে সূতা ভাতান হইতে বিম্‌করা নলি করা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মই শিক্ষা করিতে হইবে।

এই ভাতান কর্ম্মটীও একটি শক্ত কাজ। তাঁত শালা করিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁতি ব্যতীত অন্য কেহ কৃতকার্য্য হয় নাই—তাহার কারণ, সূতা ভাতান হইতে খুটিনাটী সমস্ত কর্ম্মই বুননকারীর পরিবারগুলী কর্ত্তৃক সাধিত হয়, ইহার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া বিশেষ তাহাকে ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু একত্র কয়খানি তাঁত বসাইয়া বাজার হইতে অথবা চরকার সূতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাঁতের কার্য্য চলিবে না, তাঁত চালাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বস্ত্র বুননের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মগুলি সাধন করিবার বিশিষ্ট আয়োজন করিয়া লইতে হইবে। সূতা ভাতান বিম্‌ করা নলি করা প্রভৃতি কাজগুলি যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক সাহায্যে ব্যবস্থা করিতে হয়, উৎসাহের যুগে বেকার লোক অনেক মিলিতে পারে, কিন্তু পরিশ্রমের অনুপাতে অর্থাগম না হইলে এই উৎসাহ অধিক দিন টিকিবে না, কাজেই স্বদেশী যুগের সময় যেমন বহু ব্যক্তি অনর্থক অর্থ নষ্ট করিয়া এই কার্য্যে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান আন্দোলনে তাহা যে না হইবে এমন কথা বলিতে পারি না।

দেশের এই সর্ব্বপ্রধান নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে ধীরে ধীরে গোড়া হইতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, এবং এই প্রচেষ্টা সংঘবদ্ধ হইয়াই করা চাই। সকলকেই ইহা করিতে হইবে এইরূপ উত্তেজনা বড় ভাল নয়, একদল লোক তূলার চাষ আরম্ভ করিয়া দিউন, অপর দল প্রচলিত প্রথানুসারে যাহাতে অধিক সূতা প্রস্তুত হইয়া উঠে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখুন, তারপর যাঁহারা এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সূতা ভাতাইবার একটা সুষ্ঠু প্রণালী আবিষ্কার করুন। কারখানায় বসিয়া যাহাতে একসঙ্গে অনেক সূতা ভাতাইতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা চাই, বাড়ী বাড়ী সূতা ভাতাইতে দিয়া শূন্য তাঁতখানি কোলে করিয়া বুননকারী যদি মাসের মধ্যে পনের দিন বেকার বসিয়া থাকে এই দারুণ অন্নাভাবের দিনে কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। তারপর বিম্‌ ও নলির সুব্যবস্থা—কেননা বিস্তৃত মাঠে দুই চারি জন লোক মিলিয়া প্রতি তাঁত খানার জন্য দৌড়াদৌড়ি এবং বর্ষাকালে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকা—এরূপ পুরাতন প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাবে আমাদের কাজে নামিতে হইবে।

আমরা চরকার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছি, বিমের সুবন্দোবস্ত কতকটা হইয়াছে, নলি প্রস্তুতের নূতন প্রণালীর চেষ্টায় আছি, সূতা ভাতাইবার ভাবনাও করিতেছি, এই সকল সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইলে দেশের ষাটকোটী টাকা রক্ষা করা মুখের কথায় হইবে না।

এক্ষণে চাই দেশবাসীর আনুকূল্য। বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে তবেই এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ ঘটিবে, কেবল অর্থব্যয় [illegible] দারুণ

অধ্যবসায় চাই, অক্লান্ত পরিশ্রম চাই। মৃতকে বাচাইতে হইলে যেরূপ কঠোর তপস্যার প্রয়োজন, ভারতের এই বস্ত্রশিল্পের উদ্ধার সাধনের জন্য তদ্রূপ একনিষ্ঠ সাধককে তপস্যা করিতে হইবে। কিছু করা চাই বলিয়া কার্য্যে নামিলে চলিবে না। ঠিক পাগলের মত কার্য্যক্ষেত্রে মাথার মধ্যে সমুদ্র মন্থন সৃষ্টি করিতে হইবে। সিদ্ধি মিলিলে, তবে এখনও কূল দেখা যায় নাই; প্রাণ পাইয়াছি, প্রতিষ্ঠান এখনও দৃঢ় হয় নাই—দেশের আশীর্ব্বাদ থাকুক—ভগবানের উপর ভরসা রাখিয়া আমরা এই কার্য্যে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছি—দেশ, আর একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

উপনিষদ কথা

—:০:—

দেবতারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহারা ছিল যন্ত্র নিমিত্ত মাত্র, ব্রহ্মই তাহাদের হইয়া জয় করিয়া দিয়াছেন। দেবতারা একথা বুঝিল না, মনে করিল নিজের শক্তিতেই তাহারা জয়ী হইয়াছে, নিজেদের মহিমা দেখিয়া নিজেরা গর্ব্ব করিতে লাগিল, এ বিজয় আমাদেরই, এ মহিমা আমাদেরই—অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমা!

ব্রহ্ম এ কথা জানিতে পারিলেন; তাহাদের গর্ব্ব ভাঙ্গিবার জন্য, চোখ ফুটাইয়া দিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে গিয়া আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা তাঁহার অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; কে ইনি কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অগ্নিকে ডাকিয়া বলিল, জাতবেদ! তুমি ত সকলের জন্মের তথ্য রাখ, জানিয়া এস, কে এই অদ্ভুত পুরুষ?

অগ্নি তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মের কাছে উপস্থিত হইল। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? উত্তরে অগ্নি বলিল, আমাকে অগ্নিও বলিতে পারেন, জাতবেদও বলিতে পারেন।" ব্রহ্ম আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি শক্তি?" অগ্নি উত্তর করিল, "পৃথিবীতে এই যা কিছু আছে সব আমি পোড়াইয়া ফেলিতে পারি।" "আচ্ছা, এইটি পোড়াও ত," এই বলিয়া ব্রহ্ম অগ্নিকে একটি তৃণ দিলেন। অগ্নি চেষ্টা করিল, তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল, কিন্তু কিছুতেই তৃণটি পোড়াইতে পারিল না। ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়া সঙ্গীদিগকে বলিল, "না, এ অদ্ভুত পুরুষকে আমি বুঝিলাম না।"

তারপর দেবতারা বায়ুকে বলিল, "বায়ু! তুমি যাও ত, জানিয়া এস কে অদ্ভুত পুরুষ।" বায়ু তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" বায়ু বলিল, "আমাকে বায়ুও বলিতে পারেন, মাতরিশ্বানও বলিতে পারেন।" "তোমার শক্তি কি?" "পৃথিবীতে এই যা কিছু আছে সব আমি উড়াইয়া নিতে পারি।" "আচ্ছা, উড়াও ত এই তৃণগাছটি।" বায়ুও সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও অগ্নির মতই নিষ্ফল হইয়া ফিরিল, বলিল, "না, অদ্ভুত পুরুষকে বুঝিলাম না"

দেবতারা এবার পাঠাইল ইন্দ্রকে। ইন্দ্র ব্রহ্মের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল কিন্তু ব্রহ্ম নাই, কোথায়

অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, আর তার পরিবর্ত্তে আকাশে দাঁড়াইয়া স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিতা পরমাসুন্দরী এক রমণী মূর্ত্তি। ইন্দ্র ইঁহারই কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে অদ্ভুত পুরুষটি?" উত্তর হইল, "তিনি ব্রহ্ম, তাঁহার জন্যই তোমরা জয়ী হইয়াছিলে, তাঁহার শক্তি-তেই তোমাদের শক্তি।"

ভগবান এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ আর তাঁর শক্তি—শিব ও অদ্যাশক্তি। সেই পুরুষ আপন শক্তির সহায়ে বিশ্বকে চালাইতেছে, চলিতে দিতেছে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে শক্তি সঞ্চারণ করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। জড়শক্তি ও জীবনী শক্তি দেহ ও প্রাণ ভগবানের অনির্ব্বচনীয় সত্তা ধরিতে পায় না, জ্ঞানময় শক্তি, মনই তাহাকে কথঞ্চিৎ ধরিতে পারে, তাও কেবল যখন সে দেখিতে পায় সেই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তিকে।

পুস্তক-পরিচয়

—:০:—

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। কলিকাতা, ৩০নং কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

২৯ জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত, রামেন্দ্র বাবুর ১৩১৭ সালের একখানি ত্রিবর্ণ চিত্র ও বিভিন্ন বয়সের ছবি, তাঁহার হাতের লেখা স্বাক্ষর, রবীন্দ্রের রামেন্দ্র সম্ভাষণ প্রভৃতি কয়েকটী মূল্যবান স্নেহ-চিহ্ন সম্বলিত এই সুদৃশ্য বইখানি যোগ্য মানুষের যোগ্য অর্ঘ্য। বাংলার বাণী লক্ষীর একটী প্রধান পূজারী, একনিষ্ঠ নিষ্কাম সেবক ছিলেন রামেন্দ্র-সুন্দর—বাংলার সাহিত্যপীঠ যাঁহাদের হৃদয়োপরি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর অন্যতম—বাংলার সাহিত্য পরিষদে, বাংলার সাহিত্য সম্মিলনে, সারস্বতভবন পরিকল্পনায়—সর্ব্বত্রই রামেন্দ্রসুন্দরের সুন্দর হস্ত ও মন আমরণ নিযুক্ত ছিল—"তিনি যে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর আর যাহা কিছু থাক আর নাই থাক, আছে তাহার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাণী। তিনি মায়ের ডাকে বুঝিয়াছিলেন, সাহিত্যসেবীদিগকে একত্র করিয়া মায়ের বোধন বসাইতে হইবে—মাতৃমন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দল বাঁধার উপকারিতা—সঙ্ঘের আবশ্যকতা তিনি হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, সংহতিই কাম্য সাধিকা, বাঙ্গালীর শক্তি যদি সম্মিলিত হইয়া একই খাতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সে ভাব-ধারা শাশ্বত হইবে।" পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন বোধ করি ঠিকই ধরিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের দেশগত জীবনের প্রাণসূত্র এই ঘননিবিড় প্রেরণাতেই নিবিষ্ট ছিল। আজিকার এই রাষ্ট্রচর্চ্চার দিনে যখন কঠোর জীবনরঙ্গে বাঙ্গালীর ছেলে নিবিড় ভাব-চর্চ্চার, বাংলার বিশিষ্ট cultureএর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরিচয় করিতে যেন কেমন একটু দূর দূর সরিয়া পড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়,

বাংলার ভাবসাধনা যখন কর্ম্ম-ঝঞ্ঝনায় বিলোড়িত, বিক্ষিপ্ত ও অভিভূতপ্রায়, তখন এই গভীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে সত্য সাধনায় অর্জ্জন ও দৃঢ় রক্ষিত করিতে হইবে, তাহারই গঠনে সফল মঙ্গল শক্তি নিয়োগ করিতে যাহা কিছু প্রেরণা দেয়, তাহাই অভিনন্দনীয়। এই দিকে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য জীবনে একটা প্রগাঢ় শিক্ষা আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের বইখানি এই শিক্ষাটুকু বাঙ্গালী পাঠকের মনে যদি জাগাইয়া ধরে, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

সাহিত্যিকা ·· ··	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
ঘর ও পর ··· ··	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শিক্ষার কথা ··· ···	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
চু' ইয়ারকি ··· ···	ঐ

নিবেদন

—:০:—

এ বৎসরের প্রবর্ত্তক বাহির হইতে খুব দেরী হইয়া গিয়াছে এজন্য আমাদের গ্রাহকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। ভবিষ্যতে যাহাতে ঠিকমত কাগজ বাহির হয়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইবে। যেটুকু পিছাইয়া পড়িয়াছি তাহা প্রতি দশ দিন অন্তর এক এক সংখ্যা বাহির করিয়া পূরণ করিব। ইতি—

শ্রীরামেশ্বর দে, কর্ম্মকর্ত্তা 'প্রবর্ত্তক'
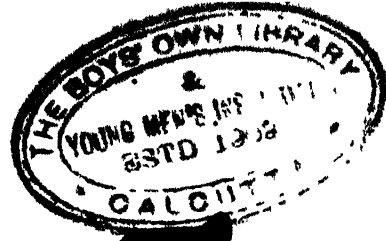
ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ মাঘ, ১৩২৭ [তৃতীয় সংখ্যা

শিক্ষা ও অন্ন সমস্যা

—— ∴০∴ ——

কাজের কথাই কহিতে হইবে।

দেশাত্মার করুণ আহ্বান জাতিকে অন্তর্মুখী হইতে উপদেশ দিতেছে। তাহারই জন্য চাই শিক্ষা। জীবন প্রতিষ্ঠানের উপর ভর দিয়াই স্বারাজ্য সংস্থাপন করিতে হইবে, অতএব জীবনধারণোপযোগী যথাবিধি আহার্য্য আহরণ আশু প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষাসমস্যা এবং অন্নসমস্যা এই দুয়ের প্রকৃষ্ট সমাধানের উপরই যেন ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, সত্য সত্যই বাহিরের এই উভয় সঙ্কট দূর না হইলে আমাদের আশা ভরসা নাই বলিলেই চলে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—জ্ঞানপ্রকাশ, হৃদয় প্রকাশ এবং জীবন প্রকাশ করিয়া তোলা। জ্ঞান প্রেম শক্তির ত্রিধারায় জীবন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। প্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে তিনটী প্রবাহই শুখাইয়া উঠিতেছে; জ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাইয়াছি অসার তর্কশক্তি, প্রেমহীন হৃদয় দিন দিন কুটিল ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, শক্তির বিনিময়ে জীবন মরণ নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কাজেই অচিরে শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন সংসাধিত না হইলে, এখন আর জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপায় নাই, পরন্তু প্রাণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

ভিতরে জ্ঞানের বাতি যতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে জীবনের ভঙ্গী ততই সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে—ভিতর অনুজ্জ্বল থাকিলে বহির্জীবনে মৃত্যুর বিভীষিকা অবশ্যম্ভাবী।

দেশের সকলেই বুঝিয়াছেন এতদিনের শিক্ষা আমাদের ব্যর্থ হইয়াছে। বাংলার রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর প্রচলিত শিক্ষার সুফল প্রমাণের জন্য সেদিন—রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস প্রভৃতি ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে সকলে কিছু সক্ষম হইবে না—আর রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র, তিনি একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া

মানুষ হইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় নাই, কেননা যেরূপ শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে মানস নামক পদার্থটা হারাইয়াই ফেলিতে হয়—চাকুরী ব্যতীত বর্ত্তমান শিক্ষিত শ্রেণী অপর কোন স্বাধীন উপায়ে ধন উপার্জ্জনে সক্ষম হন না। স্বামীজী বলিয়াছিলেন thought, feeling, action এর কথা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই তিনটীর একটীও বর্ত্তমান শিক্ষায় লাভ করা যায় না বরং যাহা আছে তাহা হারাইবার সম্ভাবনা অধিক।

তবে শিক্ষার ভার নূতন সম্প্রদায় অনুরাগী দেশীয়-দিগের হস্তেই প্রদত্ত হইয়াছে। শিক্ষানীতির প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনও তো সহজ কথা নহে। কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করিলে জাতীয় জীবন উন্নত হয়, জীবনে জ্ঞান শক্তি প্রেমের খেলা অবাধে খেলিতে পারে, তাহার সন্ধান কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, আর এরূপ হইলেও যতদিন না ইহার ফল দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন এ বিষয়ে কেহই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। তার উপর আবার অর্থাভাবের কথা আছে। শিক্ষা প্রচারের জন্য যেরূপ বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা কি প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে তাহাও এক বিষম সমস্যার কথা; কাজেই আমাদের অবস্থা বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এই মৃতপ্রায় জাতিটীর রক্ষার উপায় কোন দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা মরিব না একথা ধ্রুব সত্য। প্রাণের গতি স্বভাবতই জীবনের পানে ধাবিত হইয়াছে—অমৃতের সন্ধান আমাদের করিতেই হইবে—সহস্র প্রকার প্রতিকূল কারণ থাকিলেও আমরা এই সকলের মধ্যেই নিজেদের শিক্ষা ও জীবন ধারণের ব্যবস্থা নিজেদের হস্তেই সুসম্পন্ন করিব।

ভগবানের ইঙ্গিতই আমাদের পরম সহায়। দেশের এই নূতন আন্দোলনের বাহিরের উত্তেজনা যে আকারেই প্রকাশ হউক না কেন, ভিতরের আসল কথা হইতেছে দেশ আর প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি চাহে না—দেশের সন্তান স্বাধীন স্বাবলম্বী হইয়া মানুষের মত হইয়া উঠে, দেশ-আত্মার ইহাই ইচ্ছা। এই মহতী ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে, মনের রঙে ইহাকে রঞ্জিত করিয়া রাজনীতিক হোলি-খেলায় মাতিয়া থাকিলে কার্য্য আমাদের সুসিদ্ধ হইবে না, মাতামাতির ভাব ছাড়িয়া মুখ বুজিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

দেশে কাজের মানুষ যারা তাদের কানে কানে এই কথাটা সহস্রবার বলিতে চাই দেশের বর্ত্তমান সাধনা রাজনীতি নহে, সাধনা হইতেছে শিক্ষা ও অর্থনীতির একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করা। দেশের লোক যাহাতে মনের ও শরীরের প্রচুর খোরাক পাইয়া তাজা হইয়া উঠে, তাহার একটা ব্যবস্থা করা। লোকের বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করিয়া জ্ঞানের আলো ঢালিয়া দাও, হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূর করিয়া প্রেমের আস্বাদ উপভোগ করাও, আর শরীরের দৌর্ব্বল্য অক্ষমতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মানুষকে সবল ও সুস্থ করিয়া তোল, শিক্ষা ইহার মূল, সমাজ ও ঐশ্বর্য্য ইহার-শাখা প্রশাখা।

কাজ সহজ নয়—কঠোর সাধনসাপেক্ষ। আজ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া দেশসেবার মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদের তিল তিল আত্মদান আমরা কি আশা করিতে পারি না! বীর্য্যবান সঙ্কল্পপরায়ণ কর্ম্মী যদি মুষ্টিমেয় হয়, তাহা হইলেও এই পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাস্তূপকে অপসারিত করিয়া আমরা দেশের বুকে নূতন সৃষ্টি সার্থক করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করি। এ আশা কি আমাদের ব্যর্থ হইবে—অন্ততঃ এই

জাগরণের ফলে একশত জন সর্ব্বত্যাগী দেশভক্তের কণ্ঠরবে আমাদের হৃদয় বীণা কি সজোরে বাজিবে না, দুইশত ভূজের প্রবল শক্তি কি আমাদের কর্ম্মের বলকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে না? দীক্ষা যদি সত্য হয়, সাধনা যদি অটুট্ হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে মিলন আমাদের রোধ করিবে কে?

কর্ম্ম আমাদের, শিক্ষা আর অন্ন সংস্থান। আমরা নন্-কো-অপারেশন্ বুঝি না, রিফর্ম বুঝি না, repression বুঝি না। "আমি" রাখিয়া আমরা কার্য্য ক্ষেত্রে নামি নাই, আমায় স্পর্শ করিতে পারে এমন প্রলোভন এমন প্রতিবন্ধক জগতে আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। "আমি" থাকিলে আমাকে অনেক বাধায় অনেক বিঘ্নে বিপন্ন হইতে হয়, সেইজন্য ধর্ম্মযুদ্ধে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই এই "আমি"কে জলাঞ্জলি দিয়াছি; নূতন যুগের সাধকদিগকে এই পন্থাটি অনুসরণ করিতে হইবে, নিজেকে নিঃস্ব করিয়া কর্ম্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে হইবে।

যুগপৎ এই মুহূর্ত্তেই শিক্ষা ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা চাই। কার্য্যারম্ভ করিতে যত বিলম্ব ঘটিবে—মুক্তি তত সুদূরপরাহত হইবে। আমরা রাজনীতিক সুবিধা অর্জ্জনের প্রয়াসী নহি, বাহ্যিক অবস্থার একটু আধটু পরিবর্ত্তনে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—সাত মাস পরে, রাজশক্তির করুণা বর্ষণের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই স্বরাজ পাইয়াছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না। আমরা চাহি অন্তরের মুক্তি, ভিতরের আমূল পরিবর্ত্তন, একেবারে একটা নূতন জীবন। যে সাধনার উচ্চ সৌধ ভারতে প্রতিষ্ঠা করিব—সর্ব্বজগতের তাহাই আদর্শ হইবে। অন্তরে স্বারাজ্য আবিষ্কার করিয়া বাহিরে তাহাই বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করিব। আমাদের স্বারাজ্য বাহিরের অবস্থা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবে না—বাহিরকে অন্তরের ঐশ্বর্য্যেই ভরাইয়া তুলিব—ঋদ্ধিমান করিব।

মানুষের জীবন লইয়াই আমাদের সাধনা। জীবন অবিশুদ্ধ থাকিতে অস্পষ্ট থাকিতে অন্তর-রাজ্যকে বাহিরে অবিকৃত আকারে গড়িয়া তুলিতে পারিব না। এই জীবন গঠনের জন্য চাই শিক্ষা—সে শিক্ষা ঐ অষ্টম বর্ষীয় বালকের অন্তর দিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। অতীতের মানুষ—অতীতের সুর ধরিয়া কাল হরণ করুক; ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রতি আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না। অতঃপর প্রতি অষ্টম বর্ষীয় দেশের বালকটী নূতন শিক্ষার বিমল আলোকে যাহাতে পুলক লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা হউক। দেশের কর্ম্মীবৃন্দ! যদি তোমাদের জীবনে নূতন সূর্য্যের আলোকপাত হইয়া থাকে—সাত মাসে স্বরাজ-লাভের বৃথা আশায় উদ্‌ভ্রান্ত না হইয়া দেশে দেশে অসংখ্য পাঠশালা গড়িয়া তোল। ঐ অষ্টম বর্ষীয় বালকের ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর। আর দ্বাদশ বর্ষ তোমরা অনন্যমনে বালক বালিকার সহিত খেলার ছলে উত্তম শিক্ষার অমর বীর্য্য উহাদের হৃদয়ে বপন করিয়া দাও।

শিক্ষার আরম্ভ হউক—নূতন জীবনের ক্ষেত্র হইতে। এই ধৈর্য্য যদি তোমাদের না থাকে—ব্যর্থ হইবে তোমাদের সাধনা। একটা নূতন জাতি গড়িয়া তুলি-বার জন্য নূতন ক্ষেত্র হইতে কার্য্য আরম্ভ কর, পুরাতনের দান লইয়া নূতনকে সমৃদ্ধ করিয়া তোল; শিক্ষা নিখুঁত করিয়া যদি পাইতে চাও—আনকোরা জীবন লইয়াই সাধনা কর। একশত জন যুবক যদি নূতন জীবন লাভ করিয়া শিক্ষার মূলদেশ অধিকার করিতে পারে দ্বাদশবর্ষের মধ্যে বাংলার রূপ একে-

বারেই পরিবর্ত্তিত হইবে। হায়রে চঞ্চল তরল চিত্ত কর্ম্মীর দল, পারিবে কি দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া এই কঠোর তপস্যা করিতে!

কিন্তু আর উপায় নাই। গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার মত তোমাদের সকল কার্য্যই নিরর্থক হইতেছে। তোমরা মন্দিরের চূড়া গড়িতেই ব্যস্ত, বনিয়াদ গড়িবে কে? বনিয়াদ হইতে গাঁথিয়া তুলিতে পারিলে তদনুযায়ী চূড়া নির্ম্মাণ হইবেই। তোমরা চাও কলেজের পাশকরা ছেলে লইয়া শিক্ষামন্দির গড়িয়া তুলিতে—গ্রামে গ্রামে বটের মূলে নদীর তীরে ঘাসের গালিচায় বসিয়া শত শত বালক-হৃদয় জয় করিবার জন্য চাই একটা তপস্যা। তার-পর পরতে পরতে শিক্ষামন্দির স্বতই গড়িয়া উঠিবে। কাজ বিপুল—বিরাট উত্তেজনার সম্মোহন ছাড়িয়া স্থির ও সুস্থ মস্তিষ্কে মত্তমাতঙ্গের বল লইয়া কে এই উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবে, কে আমার হৃদয়-বীণার মধুর মূর্চ্ছনায় হৃদয়-বীণা মিলাইয়া ঐক্যতান সংযোগ করিবে, কে এই ভারতীর ভবিষ্যৎ মন্দির রচনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবন উৎসর্গ করিবে? হায়রে—বুদ্ধিজীবির যুগে এমন আপনহারা কয়জন মাথা পাগ্‌লা লোক আছে যে আমার কথায় সাড়া দিবে?

কিন্তু করিতেই হইবে। নববিধানে শিক্ষাদান যদি সার্থক করিতে চাও—দরিদ্র দেশের অবস্থা মত ব্যবস্থার ভিতর দিয়া নিরক্ষর দেশবাসীকে যদি জ্ঞানের আলো দিতে চাও, নিজেকে এবং দেশকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ঐরূপ অপ্রসিদ্ধ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে।

উপস্থিত যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন হইতেছে উহা দেশাত্মার ইচ্ছানুগত নহে, পাশ্চাত্যের ছদ্মবেশ উহার পর্ব্বে পর্ব্বে অনুপ্রবিষ্ট আছে, ধ্বংসের বীজ সৃষ্টির সঙ্গে সংগোপিত রহিয়াছে—ইহাতো গড়া নহে—কেবল কাল হরণ, বৃথা অর্থ এবং শক্তির অপব্যয়।

নূতন প্রণায় শিক্ষার ব্যবস্থার কথা পরিষ্কার করিয়া অনেকেই জানিতে চাহেন—কিন্তু যাহা নহে—যাহা এখনও অব্যক্ত—তাহাকে বৃথা বাক্যে রেখাচিত্র আঁকিয়া নয়নের তৃপ্তি বিধান করা মনকে চোখ্ ঠারা হইবে নাকি?

আমরা আজ নির্ম্মাণের যুগে আসিয়া পড়িয়াছি—কি হইবে তাহা নাই বলিলাম—তবে হইবে নিশ্চয়, কেননা যোগের সৃষ্টি ব্যর্থ হইবার নহে। করিতেছি না তো আমরা—যোগের অভিব্যক্তিই শিক্ষা ও অন্ন সমস্যার সমাধান চিত্র আঁকিয়া তুলিতেছে। সম্পূর্ণ চিত্র ফুটিয়া না উঠা পর্য্যন্ত—আমাদের অনুসরণ ধর্ম্মই অব্যাহত রাখিতে হইবে।

তবে মোটামুটি যোগের ধারানুসারে আমরা শিক্ষার কাল ও শ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। অষ্টম বর্ষীয় বালক লইয়া দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট বিনাড়ম্বরে পাঠশালায় একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তারপর এই সকল বালক লইয়া ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শ্রেণী বিভাগ করিয়াই উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিলে—তিন বৎসর যুবকগণকে জীবন গঠনের উপায় ও উপাদানের অবশিষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; আমরা স্থানে স্থানে ঠিক এইরূপ বিদ্যাপ্রচারের কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, ইহার সম্যক ফল দর্শিতে দীর্ঘ দিন লাগিবে, কিন্তু এই কার্য্যারম্ভে যত বিলম্ব হইবে দেশ যে ততই পিছাইয়া পড়িবে একথা বলাই বাহুল্য।

ইহার সঙ্গেই চাই অর্থ প্রতিষ্ঠান। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে অসংখ্য বালক ও যুবকের যোগদান আকাঙ্খা খুবই প্রবল দেখা যাইতেছে, কিন্তু মাত্র জীবনধারণের কোন সংস্থান না থাকায় আমরা ইহার

কোনই প্রতিকার করিতে পারিতেছি না—দেশের নিকট ঋণ চাহিয়াছি, তাহাও সহজে যে মিলিবে এমন আশাও নাই। কিন্তু এই দারুণ অর্থ সমস্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কিছু অর্থের প্রয়োজন হইবেই—দেশ ও ভগবান আমাদের সহায় হউন—ব্রত আমাদের অপূর্ণ থাকিবে না।

আমরা দেখিয়াছি—অর্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া আমরা যে পথ ধরিয়াছি তাহাই ব্যর্থ হইয়াছে—জীবন প্রকাশের জন্য যেখানে কিছু করা হইয়াছে তাহা কিন্তু সফল হইয়াছে; আমরা বুঝিয়াছি অর্থ সৃষ্টি দেশাত্মার অভিপ্রেত নহে—আমাদের মাটীর বুকে যে ক্ষীরধারা আছে তাহাই টানিয়া শরীর পোষণ করিতে হইবে, মায়ের স্তন্যদুগ্ধেই আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠান-টীকে দৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে, আমরা পীযূষপূরিত স্তন্য ছাড়িয়া বিলাতি ম্যানাপোষ মুখে ধরিয়াছি—মরণ যে এখনও আমাদের নিশ্চিহ্ন করে নাই, ইহাই মায়ের বড় আশীর্ব্বাদ।

আমরা চাই ধান্যধন, আমরা চাই শাক্‌সবজী, কলাই মসুর মুগ, আলু বেগুন কপি কলাইসুঁটী। আমরা চাই পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গাই। আমরা চাই ক্ষেত জোড়া কাপাস, ঘরে ঘরে বস্ত্র বয়নের তাঁত। আমরা চাই হলের জন্য লৌহ ফলক, কুড়াল কাস্তে, কাঁচি ছুরি, তাঁতের মাকু—তার জন্য চাই কামারশালা। জীবনযাপনের প্রয়োজন মিটাইতে চাই কুমারের বাসন, গৃহনির্ম্মাণের জন্য বাঁশঝাড়, উলুবন, ইটের কারখানা। বিস্তারন্ত করিতে হইবে যেন বাদক-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া—সেইরূপ জীবন প্রকাশের আদি ভঙ্গী ধরিয়া আমাদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া যাইতে হইবে—অর্থ তো আমাদের সম্পদ নহে, সে তো সিসে দস্তার ফাঁকা আওয়াজ-চোঁতা কাগজের ফোক্কা বাজী।

কিন্তু পারিবে কি! স্বরাজ সাধনার কঠোর সাধনায় কয়জন অগ্রসর হইবে। ইহাতো নগরে নগরে সভা করিয়া গলাবাজী করা নহে, মাঠে দাঁড়াইয়া একদলকে রসদ যোগাইয়া যাইতে হইবে, আর অন্য দলকে গাছের ছাওয়ায় বসিয়া ছেলে পড়াইতে হইবে; কলিকাতার সুরম্য প্রাসাদে—ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায়—জাতীয় শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে এই কর্ম্মের তুলনা করিয়া বুঝিয়া দেখ; জাতির আত্মা আজ কোন্ পথে ছুটিতে চাহে।

নবসঙ্ঘের—সাধক মণ্ডলী! এক টুকরা স্থান পাইলে বলভদ্রের মত হলাগ্রভাগ প্রথিত করিয়া দেশকে ওলটাইয়া দিবার গর্ব্ব যদি হৃদয়ে পোষণ করিতে পার—দেশের এই জটিল সমস্যা নিরাকরণ করিবার জন্য আগুয়ান হও—ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমরা জয়যুক্ত হইবে।

দখিণে বাতাস

শক্তি সব করছে—আমি তাঁর যন্ত্র, এই অনুভূতিই যোগের সবখানি নয়। সাধককে অনুভব করতে হবে যে, শক্তি সাধকেরই—পুরুষের ইচ্ছায় সাধকই কার্য্য করে চ'লেছে। শক্তির সঙ্গে সাধকের অঙ্গাঙ্গী পরিচয় হলেই, জ্ঞানের বিকাশ হবে। সাধক প্রথম প্রথম শক্তির হাতেই আত্মসমর্পণ করে, শক্তির খেলাই সে দেখে, জগতে শুধু শক্তির খেলাই অনুভব করে; শক্তির সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফুরিয়ে ফেল্‌লেই সাধক
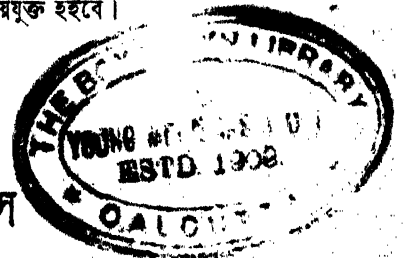
দেখে এই অনন্ত বিরাট শক্তির পশ্চাতে পুরুষ বিদ্যমান আছেন। পুরুষের দর্শন না ঘটলে যোগের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। পুরুষ প্রত্যক্ষ হ'লে, তাঁর ইচ্ছা সাক্ষাৎ ভাবেই আমাদের কার্য্য করাচ্ছে, ইহা অনুভূত হয়—তখন আর যন্ত্রবোধ থাকে না, সাধক নিজেকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে, সাধক তখন যন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং শক্তিরূপে বিরাজ করতে থাকে।

* * *

এই পুরুষকে না জান্‌লে না পেলে যন্ত্রবোধের সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়। কেবল ভাবের খেলা থাকে, ভাবটাই বড় হ'য়ে যায়। শক্তি করাচ্ছেন, শক্তি ভাবাচ্ছেন, শক্তির সংস্পর্শেই যন্ত্রের নড়াচড়া, এইরূপ ভাবমগ্ন অবস্থা খুব ভাল হলেও, পূর্ণযোগীর আরও এগিয়ে যেতে হবে। বাংলায় ভাবকে সহজেই পাওয়া যায়, ভাবের পাগল অনেক হয়েছে, ভাবের সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রন চাই, তাই বাংলাকে বেদান্ত-চর্চ্চা করতে হবে; ভাব ভক্তির দ্যোতক, ভক্তি থাক্‌লে ভগবানের কার্য্য করবার শক্তির অভাব হবে না, কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ এতদ্বারা হবে না। জ্ঞান না এলে বৃহৎ সৃষ্টি অসম্ভব, জ্ঞানেই ভগবানকে অনন্তভাবে অবধারণ করা যায়, অনন্ত বৈচিত্র একত্র সমাহার না করতে পারলে ক্ষুদ্র সৃষ্টিই অনিবার্য্য হয়ে উঠে, ক্ষুদ্রতা ভাগবৎ ইচ্ছার বিরোধী ধর্ম্ম, উহা প্রতি আঘাতে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তোমরা বৃহৎ হও, জ্ঞানকে পুরোভাগে ধারণ কর। জ্ঞানের অনুগামী সমতা—সমতাই বৃহৎ সৃষ্টির বীজ মন্ত্র।

* * *

বাংলায় আছে ভক্তি, আছে কর্ম্ম। নূতন সৃষ্টির জন্য ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—তোমরা ইহার সহিত জ্ঞানকে সংযুক্ত কর, দেখবে তোমাদের সঙ্ঘ জগজ্জয়ী হবে। জ্ঞানের সাধনা যদি উপেক্ষা কর সৃষ্টি যত বৃহৎ বলেই মনে কর না, উহা কোনমতেই স্থায়ী হবে না। চৈতন্যের সময় থেকে—আজ পর্য্যন্ত বাংলায় যা কিছু হয়েছে সবের মধ্যেই এই জ্ঞানের অভাব ছিল—তাই কোন সৃষ্টিই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। বিবেকানন্দের মধ্যেও জ্ঞানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নি; যা কিছু তিনি করেছিলেন সমস্তই ঠাকুরের শক্তি নিয়ে, ভক্তি ও কর্ম্ম তাঁর মধ্যে যতখানি বৃহৎ হ'য়ে উঠেছিল, জ্ঞান তত পূর্ণ হ'য়ে উঠে নি। তাঁর নির্ম্মাণও চিরদিন টিকে থাক্‌বে না—ঠাকুরের নাম নিয়ে যে যে শক্তি জাগ্রত হয়েছিল—তাঁদের তিরোধানে সবই ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা আছে। রামকৃষ্ণানন্দ গেছেন, শ্রীমাও গেলেন, বাকী ব্রহ্মানন্দ—উনি গেলেই রামকৃষ্ণমিশনের জীবন ম্লান হবে। ভক্তি আর কর্ম্ম, সৃষ্টির উৎস নয়, চাই জ্ঞান, বাংলায় জ্ঞানের সাধনা প্রবল করে তুল্‌তে হবে।

* * *

কাজ তো কেবল দরিদ্র নারায়ণের সেবা নয়, আর বন্যায় দেশ ডুবে গেলে, ঘরে ঘরে দুই মুঠা চাউল বিলান নয়, ঐ সব করে নিখুঁত সৃষ্টি কিছু গ'ড়ে উঠ্‌বে না, বিবেকানন্দ যে মঠ স্থাপন করেছিলেন, তাও তাঁর ভুল সৃষ্টি—তিনি চেয়েছিলেন কর্ম্ম, কিন্তু মঠ হচ্ছে negation of কর্ম্ম। শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের বীজ থাকে, মঠ শঙ্করের যুগেও স্থায়ী হয় নি, এ যুগেও হবে না, পূর্ণ জ্ঞান না এলে স্থায়ী কিছু করে উঠা যাবে না।

* * *

তোমাদেরও পূর্ণ জ্ঞান চাই, নতুবা পতনের খুবই আশঙ্কা আছে। কর্ম্ম ও ভক্তি বাংলার মাটীর গুণ, মানুষের দোষ এক্ষেত্রে কিছু নাই; সেইজন্য মাঝে মাঝে এই দুটাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞানের সাধনা করতে হবে। বাংলায় ক্ষত্রিয়-

ফুটে উঠেছে—কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের পরিস্ফুরণ এখনও হয় নি। তোমরাও আজ কর্ম্মোন্মাদ হয়েছ, ভক্তির প্রবাহে হাবুডুবু খাচ্ছ—কিন্তু জ্ঞানের অভাবে সব যে ব্যর্থ হবে—সেই জন্য এত কথা বলা। বাংলায় যেমন ভক্তি আছে কর্ম্ম আছে, মাদ্রাজে তেমনি জ্ঞান আর ভক্তি আছে শক্তির বড় অভাব। উভয়ের যদি সংমিশ্রন সম্ভব হ'ত—তা হলে কাজ মন্দ হ'ত না—কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। মাদ্রাজের বুদ্ধি মোটা, গুজরাট সঙ্কীর্ণ, বোম্বাই চালাক বুদ্ধির গভীরতা নাই, সেইজন্য কারু দ্বারা কার্য্যারম্ভ হবে না—বাংলাকেই সব করতে হবে, কেননা এখানে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হলেই সব মিটে যায়—আর সত্য সত্যই সকল প্রদেশই বাংলার দিকেই চেয়ে আছে—বাঙালীই মুক্তিমন্ত্রের ঋষি হবে।

* * *

বাঙালীর বুদ্ধি আছে—কিন্তু উহা জ্ঞান নয়। বুদ্ধি ক্ষিপ্র বটে কিন্তু গভীর নয়, বিরাট নয়। বুদ্ধি শান্ত গভীর বিরাটে পরিণত হলেই জ্ঞানের উদয় হবে। ভক্তি যতই প্রবল হোক জ্ঞান প্রদীপ্ত না হলে, ভার-চ্যুতি আসবেই, সেজন্য বাঙালীকে জ্ঞানের দিকেই অধিক ঝোঁক দিতে হবে।

* * *

এ সবই আসবে কাজ করতে করতে। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে পরস্পরের প্রতি পরস্পর দৃষ্টি রেখে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কার্য্য করে যাও,—মনে রেখো কর্ম্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞান প্রকাশই হবে সৃষ্টির মূল ভঙ্গী। জ্ঞান যখন রূপ নেবে—শক্তি ও ভক্তির সংমিশ্রনে তখনই নিখুঁৎ সৃষ্টি সার্থক হ'য়ে উঠবে, সংস্রবার উত্থান পতনের মধ্যেই চলতে হবে, অর্দ্ধেক পথে অবসাদ এলে জীবন প্রতিষ্ঠান যেন চূর্ণ করে না দেয়, এই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো—এই দর্শন যোগেই জ্ঞানাবতরণ সুসিদ্ধ হবে—নৈরাশ্য বা সংশয়ের কথা এ ক্ষেত্রে কিছুই নাই।

স্বরাজ ও স্বারাজ্য

—:০:—

দেশে আগে কথাটা ছিল 'স্বারাজ্য', আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় প্রয়োজন-চক্রে তাহা দাঁড়াইয়াছে 'স্বরাজ'। স্বারাজ্য ছিল অন্তরের একটা রূপান্তর, মানুষের স্বভাবের একটা শুদ্ধি ও ঋদ্ধি, স্বরাজ হইতেছে বাহিরের একটা রূপগঠন, মানুষের একটা কর্ম্মক্ষেত্রের পরিশোধন সম্প্রসারণ শৃঙ্খলাবিন্যাস। তারপর স্বারাজ্য ছিল ব্যষ্টিগত একটা সিদ্ধি, স্বরাজ কিন্তু হইতেছে সমষ্টিগত একটা সিদ্ধি।

আধুনিক যুগের বিশেষত্ব, তাহার দান হইতেছে ঠিক এই দুইটি জিনিষ—প্রথম, বাহিরের জগতের জীবনের উপর টান, মাটির পৃথিবীর রসে শক্তিতে জ্ঞানে ভরপুর হইয়া উঠা; আর দ্বিতীয়, এই জ্ঞান এই শক্তি এই আনন্দ হওয়া চাই সকলের সমবেত জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ, এ জিনিসটি কেবল পৃথক পৃথক ভাবে এখানে ওখানে দুই চারিজনের সম্পত্তি হইলে চলিবে না। সমষ্টি আর বাহির, এই দুইএর মধ্যে
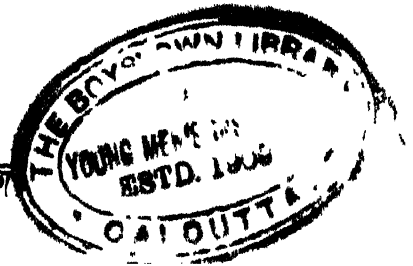
খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সমষ্টি যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে তাহার অর্থ ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধ—দান প্রতিদান, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—তাহার অর্থ কর্ম্মক্ষেত্র। ফলতঃ সমষ্টির স্বাভাবিক সাধনা হইতেছে কর্ম্মের সাধনা, কর্ম্মই সমষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই সমষ্টির জীবন ও জীবনের সার্থকতা। পক্ষান্তরে কর্ম্মী যাহারা, জীবন-সাধক যাহারা, বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে অপরের সাথে লেনা দেনা করিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয় একটা সমষ্টিগত ব্রত ও আদর্শ।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এই সমষ্টিগত ব্রত ও আদর্শ হইতেছে রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও শক্তি, কারণ, ভারতবর্ষের সমষ্টিগত জীবনে এই জিনিষটাই এখন দেখা দিয়াছে প্রথম ও প্রাথমিক প্রয়োজনরূপে। আমাদের অবস্থার বিপাকে ঘটনার তাড়নায় এইটাই হইয়া উঠিয়াছে আমাদের স্বরাজ। কিন্তু স্বরাজের এটা একটা রূপ মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে (এমন কি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও) অন্য রকম স্বরাজ সাধনার চেষ্টা চলিয়াছে—রাজ্যশাসনের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ বা যোগ থাকিলেও, এ জিনিষটি সেখানে মুখ্য কথা নয়। আমাদের স্বরাজ-চেতনা ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া জাগিয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—কিন্তু এই ইউরোপেই স্বরাজের সাধনা কেমন ভেক বদলাইয়া বদলাইয়া চলিয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়। আমরা আজ যেমন বলিতেছি চাই স্বরাজ অর্থাৎ 'পলিটিকাল' মুক্তি, এইটিই আসল জিনিষ, এটি হইলে আর সব জিনিষ আপনা হইতেই ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইবে, ঠিক তেমনি ইউরোপও একদিন মনে করিয়াছিল যে রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাম্য ও শক্তি হইলেই সমষ্টির মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ফরাসী বিপ্লব এই ভাবটিকেই মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল—আমেরিকা বা ইতালীতে স্বরাজের বীজ নিক্ষেপ করিয়া যায় এই ফরাসী-বিপ্লব, জর্ম্মনীর রাষ্ট্রীয় প্রতিভা ফুটিয়া উঠে এই বিপ্লবেরই ধাক্কায়। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল পলিটিকাল স্বরাজ অভিষ্টকে আনিয়া দেয় নাই, যে অভাব-বোধে লোকে স্বরাজ চাহিয়াছিল, স্বরাজ পাইয়াও সে অভাব তেমনি অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তখন উঠিলেন সেন্টসিমন (Saint Simon), কার্ল মারক্স (Karl Mark), তাঁহারা বলিলেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা মানুষকে স্বাধীন করিতে পারে না, চাই সামাজিক স্বাধীনতা। সমাজে স্বাধীন কে? যাহার অর্থ আছে। সুতরাং আগে চাই অর্থ বিষয়ে সাম্য ও স্বাধীনতা। এইরূপেই হইল সোসিয়ালিজ্‌মের ভিত্তি স্থাপন। রাষ্ট্রের আইন-কানুন লোককে ভোট দিবার, প্রতিনিধি পাঠাইবার, আইন গড়িবার বা অন্য রকম যত অধিকারই দিক না কেন, সমাজের অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে সে সব অধিকার কোন উপকারে আসিবে না। সমাজের যে আছে দুইটি শ্রেণী বা স্তর—এক ধনী আর দরিদ্র, এক মহাজন ও মুনিব আর মজুর ও চাকর—ইহার দরুণ নিম্নের যে শ্রেণী নীচের যে স্তর তাহাকে বাধ্য হইয়া উচ্চ শ্রেণীর উপরের স্তরের পদানত হইতে হয়, বড় লোকের সর্ব্ববিষয়ে অনুগত হইয়া চলা ছাড়া ছোটলোকের আর উপায় কি?

পদমর্য্যাদা ক্ষমতা শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নতি, যাহাই বল না কেন সে সব বড়লোকেরই ভাগ্যে হয়। গরীবদের দিন আনিয়া দিন খাইতেই পরিশ্রান্ত হইতে হয়, আর এজন্যেও বড়লোকদেরই কাছে যাইতে হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যার অর্থ অর্থের সমস্যা। লোককে অর্থের স্বরাজ পাইতে হইবে, তবে রাষ্ট্রের স্বরাজের একটা অর্থ হইবে। এই অর্থের স্বরাজ লইয়াই ইউরোপের মারামারি এখন চলিতেছে। রুশিয়ার বোলশেভিকেরা খুব জোরে একটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এই রকম একটা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

অন্ততঃ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

কিন্তু একটু চিন্তাশীল যাঁহারা, জিনিষকে যাঁহারা তলাইয়া দেখেন, যাঁহারা দূরে নজর দেন তাঁহারা ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিতেছেন এখানে আসিয়াও মানুষের মুক্তি নাই। কুলি মজুর চাষাভুষা—সমাজের পতিত দীন দরিদ্র যাহারা তাহারা ধনীর ধন কাড়িয়া লইল, ভাল করিয়া খাইতে পরিতে পারিল, তাহারাই হইল রাজ্যের কর্ত্তা; কিন্তু ইহাতে কি সমাজের পিছাইয়া পড়িবার আশঙ্কা নাই? বলশেভিকদের দেখিয়া কি মনে হয় না দেশটা অতিরিক্ত মাত্রায় বৈশ্য বা বাণিয়া বনিয়া যাইতেছে? শিক্ষার জ্ঞানের চর্চ্চা কি এমন আবহাওয়ায় থাকিতে পারে? সমাজের নিম্নতম স্তর যেখানে মাথায় উঠিয়াছে সেখানে শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান এ সব জিনিষ জন্মিতে পারে, না টিকিতে পারে? সেখানে যে শিক্ষা সম্ভব, যে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় তাহা হইতেছে অর্থকরী শিক্ষা, খাওয়া পরার মালমসলা যোগানের শিক্ষা। পলিটিকাল প্রয়াসের যখন প্রাধান্য ছিল তখন ইকনমিকস্ (economics) আমল পায় নাই; সেই রকম ইকনমিক্যাল প্রয়াস যখন প্রধান তখন যে এডুকেশন মানুষের আমল পাইবে না তাহাও কিছু আশ্চর্য্যের নয়।* তাই ভয় হয়, মানুষের জীবনকে সচ্ছল করিতে গিয়া, তাহার মনকে উপবাসী না করিয়া রাখি, সমাজে শুধু যাহারা গতর খাটাইয়া চলে তাহাদের সুখ সুবিধা করিতে গিয়া সমস্ত সমাজটাকে একটা গতরখাটান যন্ত্র না বানাইয়া ফেলি।

পাছে সমাজ এই রকমে ক্রমে বর্ব্বরতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইজন্য ইতিমধ্যেই প্রত্যেক দেশে আর একদল লোক দেখা দিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, দণ্ডশাসনের সমস্যা, অর্থের সমস্যা তারও আগে হইতেছে শিক্ষার সমস্যা—লোকের প্রথম চক্ষু ফুটাইতে হইবে, মনটাকে তৈয়ারী করিতে হইবে, নতুবা আর সব জিনিষ পণ্ডশ্রম মাত্র। আর স্পষ্টই ত দেখা যাইতেছে পলিটিকাল আন্দোলন কর আর economical আন্দোলন কর, তার গোড়ার কথা হইতেছে মনের সাড়া মনের পরিবর্ত্তন, ফলতঃ আন্দোলন অর্থই হইতেছে একটা শিক্ষা। তবে সে শিক্ষা শুধু একটা দিক লইয়া, একটা বিশেষ-উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষা। শিক্ষাই যদি গোড়ার কথা হইল, তবে শিক্ষাটাকে ওরকম সঙ্কীর্ণ না করিয়া রাখিয়া ব্যাপক করিয়া তোলা, শিক্ষাকে শিক্ষা করিয়া ধরা। সুতরাং দাঁড়াইল এই, আগে পলিটিক্যাল স্বরাজ নয়, আগে ইকনমিক্যাল স্বরাজও নয়, আগে হইতেছে এডুকেশনাল স্বরাজ। মানুষের মনকে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত পরিপুষ্ট করিয়া তোল, সব সমস্যার পূরণ আপনা হইতেই হইবে; এখন যে কোন মীমাংসাই হইতেছে না, শত চেষ্টার ফল হইতেছে শুধু গণ্ডগোল, তার কারণ আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি।

এই শিক্ষা কিরূপে হয়, মানুষের মনকে কি রকমে তৈয়ার করিতে হয়, চিন্তাশক্তিকে কি রকমে বাড়াইতে হয়, জ্ঞানকে কি রকমে জাগাইতে হয় তাহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিয়াছে অনেক পরীক্ষাও চলিয়াছে। শিক্ষার অর্থ কি, ইহার উদ্দেশ্য কি, উপায় কি? ব্যষ্টিকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, গোষ্ঠীকেই বা কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে? একটা নেশনের শিক্ষার ধারা কি, সমগ্র মানব জাতির শিক্ষার ধারাই বা কি? পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ, মনীষিবৃন্দ—Intelligentsia—আগে সেই কথা ভাবিতেছেন, সেই প্রয়াসে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

* শুনুন আমাদের দেশের আজকালকার মন্ত্র—Education can wait, but Swaraj cannot.

আমরা কিন্তু আরও একটু আগাইয়া যাইতে চাই। শিক্ষাসমস্যারও মধ্যে আর একটি সমস্যা অনুস্যূত আছে, আমরা সর্ব্বাগ্রে সেইটার উপর জোর দিতে চাই। মানুষের দেখিতে পাই আছে তিনটি ক্ষেত্র, তিনটি স্তর—দেহ, প্রাণ ও মন। সেই অনুসারে বাহিরের জগতে সমষ্টিকে লইয়া গঠিত হইয়াছে তিনটি আয়তন। প্রথমতঃ সমষ্টির দৈহিক আয়তন। মানুষ যাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারে নিরুপদ্রবে চলিতে ফিরিতে পারে, মুক্তভাবে পরস্পর লেনা দেনা করিতে পারে ইহাই দৈহিক আয়তনের কথা। ইহারই অন্য নাম পলিটিক্স—পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি বা দণ্ডনীতি। সমাজের [illegible]। উহাই মিটাইতেছে সমাজের প্রথম ও প্রাথমিক প্রয়োজন থাকিবার দাঁড়াইবার জায়গা চলিবার বাড়িবার সুবিধা ও অবকাশ। সমাজরূপ জগতের ইহাই পৃথিবী। তারপর দেহের উপরে প্রাণ। প্রাণ কি চায়, প্রাণের ধর্ম্ম কি? প্রাণ চায় বাঁচিয়া থাকিতে, প্রাণের ধর্ম্ম গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা। সমাজের প্রাণ-ধর্ম্ম—জীবন-ধারণ, খাওয়া পরার কথা লইয়া যে আয়তন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই নাম ইকনমিক্স বা অর্থনীতি। ইহাকে আমরা বলিতে পারি সমাজ জগতের অন্তরীক্ষ। প্রাণের পরে হইতেছে মন। মানুষ চায় আপনার বলিতে থাকিবার একটা জায়গা, সে চায় বাঁচিবার জন্য খাওয়া-পরা, কিন্তু এখানেই তাহার সব দাবি বা প্রয়োজন শেষ হইল না, সে চায় আবার জানিতে শুনিতে। বরং এই জানাশুনা তাহার যত ভালরকম হইবে, তাহার থাকা ও বাঁচার প্রশ্নটারও তত সুন্দর মীমাংসা হইবে, ইহা ছাড়া জানাশুনারও নিজস্ব একটা আনন্দ, একটা মূল্য আছে। সমাজেরও তাই আছে একটা জানাশুনা অর্থাৎ শিক্ষার সমস্যা। এই শিক্ষা লইয়াই সমাজের মনের আয়তন। দণ্ডনীতি, অর্থনীতি—তাহারও উপরে হইতেছে শিক্ষানীতি, এডুকেশন—ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সমাজ-জগতের দ্যৌ বা স্বর্গ।

কিন্তু দেহ প্রাণ মন হইতেছে মানুষের স্থূলতর আধার। দেহ প্রাণ মন ছাড়াইয়া আছে একটা বস্তু, সেখানেই মানুষের আসল নিবিড় সত্তা—তাহার নাম আত্মা। পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ ভূর্ভুবঃস্বঃ হইতেছে বিষ্ণুর (বা অনন্ত ব্রহ্মের) তিনটি পাদপীঠ, দেহ প্রাণ মন হইতেছে আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ। মানুষ দেহকে চায় দেহের জন্য নয় আত্মার জন্য, মানুষ প্রাণকে চায় প্রাণের জন্য নয় আত্মার জন্য, মানুষ মনকে চায় মনের জন্য নয় আত্মার জন্য। এই আত্মাকে জানিতে পাইলে মানুষ সত্যভাবে পূর্ণভাবে পাইবে তাহার মনকে প্রাণকে ও দেহকে। ঠিক সেই রকম সমাজের যে দণ্ডনীতিক, অর্থনৈতিক শিক্ষানীতিক আয়তন তাহাদের মূল হইতেছে একটা আত্মিক আয়তন, সেইটাই প্রধান ও গোড়ার কথা। এই নিগূঢ় আয়তনটিই আর সকল আয়তনকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়া আপনাকে সৃষ্টি করিতেছে।

মানুষের সামাজিক প্রচেষ্টা সব যে আশানুরূপ ফল দিতেছে না, তাহার কারণও আমরা ঠিক এখন বুঝিতে পারিব। আমরা প্রথমে চাহিয়াছি শুধু দেহের মুক্তি, তারপর চাহিয়াছি প্রাণের মুক্তি, তারপর চাহিতেছি মনের মুক্তি, কিন্তু সব মুক্তি সত্য ও সার্থক হইবে তখনই যখন চাহিব আত্মার মুক্তি—অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের, বিশেষ বিশেষ আয়তনের স্বরাজ নহে, কিন্তু আত্মার স্বারাজ্য। ব্যষ্টিগত হিসাবে যাহা সত্য, সমষ্টিগত হিসাবেও তাহাই সত্য। সমাজের দেশের জাতির আত্মা কোথায়, সেই দিকে সকলের আগে দৃষ্টি দিতে হইবে, সেই সমষ্টিগত আত্মার উদ্বোধন আগে করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ পাইলে দেশ জাতি সমাজ মুক্তি পাইবে না, অর্থনৈতিক স্বরাজ অর্থাৎ খাওয়া পরার সুশৃঙ্খলা সুবন্দোবস্ত হইলেও সে

মুক্তি পাইবে না, এমন কি শিক্ষানৈতিক স্বরাজ অর্থাৎ লেখাপড়া, বিদ্যা পাণ্ডিত্য জ্ঞানগুণে ভরপুর হইলেও, নহে। আগে চাই সমাজ-আত্মার স্বারাজ্য। আমরা এমন কথাও বলিতে পারি, এই স্বারাজ্য না হইলে অন্য সব স্বরাজ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। একের পর একে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তার অর্থই হইতেছে ভিতরে সেই আত্মার স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠার ঈপ্সা—স ঐচ্ছৎ।

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কথার এমন অর্থ নয়, যে দেশের এই সমষ্টিগত স্বারাজ্যসিদ্ধি যতদিন না হইতেছে ততদিন ইতরেতর স্বরাজের সাধন একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, ও সে সব দিকে কোনই মনোযোগ দিতে হইবে না। ব্যষ্টিকে আমরা এমন বলি না যে কর্ম্মজগৎ হইতে অপসৃত হইয়া দেহ প্রাণ মনকে নাকচ করিয়া সে ধ্যানস্থ সমাধিস্থ হউক, আগে লাভ করুক অন্তরাত্মার স্বারাজ্য, পরে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া অন্তরাত্মার স্বারাজ্য সিদ্ধি প্রয়োগ করুক দেহে প্রাণে মনে। ব্যষ্টিকে আমরা বলি দেহের প্রাণের মনের সহজ অবশ্য স্বাভাবিক ক্রিয়াকে অব্যাহত রাখিয়া, তাহারই মধ্যে অধ্যাত্মকে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে, জাগ্রতের মধ্যে চলিতে চলিতেই সমাধির চিৎশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে, সমাধির চিৎশক্তি দিয়া জাগ্রতভাবেই সেই জাগ্রতকে রূপান্তরিত করিতে। ঠিক সেই রকম সমাজের যে সহজ যে প্রয়োজনীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজীবন—তাহার পলিটিক্স তাহার ইকনমিক্স, তাহার এডুকেশন—সে সমস্তই চালাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে ধরিতে হইবে সমাজের অন্তরাত্মা, দেখিতে হইবে উহাদের মধ্যে কতখানি ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিয়াছি এই সমাজের অন্তরাত্মা। সব স্বরাজ-সাধনা যুগপৎ ও অবিরাম চলিবে; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে লক্ষ্য হইবে সামাজিক স্বারাজ্যের প্রতীক বা বিগ্রহ হইয়া উঠা: যে স্বরাজ যতখানি স্বারাজ্যের মূর্ত্তি লইয়া উঠিয়াছে, যে স্বরাজের পিছনে আছে যতখানি জাগ্রত স্বারাজ্যের চেতনা সেই স্বরাজই ততখানি সত্য ও সার্থক।

আমাদের দোষ বা অভাব এইখানে যে সমাজের এক একটি অঙ্গকে আমরা ভিন্ন করিয়া লই এবং তাহারই মুক্তি ও ঋদ্ধির চেষ্টা করি বাকী সকলকে একেবারে বাদ দিয়া রাখি, অথবা একটিকেই প্রধান করিয়া লইয়া তাহারই স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর আর সকল অঙ্গকে নিযুক্ত করিয়া দেই। কেহ বলেন চাই রাষ্ট্রীয় সাম্য ও স্বাধীনতা, এইটি হইলে আর সব আপনা হইতেই হইবে, ইহার জন্যে, ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া অর্থনীতিকে সাজাও ও প্রয়োগ কর—'স্বদেশী' ও 'বয়কট' কর, শিক্ষার বন্দোবস্তও এমনভাবে কর, যে তাহা যেন রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগাইয়া তুলে, রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত ও উদ্যোগী করিয়া তোলে। কেহ বা বলেন, চাই জীবনের স্বচ্ছলতা অর্থের যথেষ্ট উৎপাদন ও ন্যায্য ভাগ বাটরা—সেই জন্যই যথাযোগ্য গবর্ণমেন্ট তৈয়ারী কর, কর ডেমক্রাটিক বা সোসিয়ালিষ্টিক রাষ্ট্র, আর দাও এমন শিক্ষা যাহাতে লোকে খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে পারে, সমাজের ধন বৃদ্ধি করিতে পারে। আবার কেহ বলিতেছেন, না, ওসব আসল উদ্দেশ্য নয়—আসল উদ্দেশ্য শিক্ষা জ্ঞানার্জ্জন, সমাজকে বিদ্যায় বুদ্ধিতে মার্জ্জিত সমলংকৃত করিয়া, cultured করিয়া তোলা। রাষ্ট্রকে এই উদ্দেশ্যে গড়িতে হইবে, অর্থের যথাযথ বন্দোবস্ত এই জন্যই করিতে হইবে।

কিন্তু আসলে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকে আলাদা আলাদা দেখা উচিত নয়, দেখা উচিত গোটা সমাজকে। সমাজের প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট, ওতঃপ্রোত বিজড়িত; তাই বলিয়া আবার কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়া আর কয়েকটিকে

তাহার ছায়ায় আওতায় ফেলিয়া রাখাও উচিত নয়। প্রত্যেক অঙ্গের আছে নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব প্রয়োজন, নিজস্ব সার্থকতা; তাই চাই প্রত্যেকের যুগপৎ মুক্তি ও ঋদ্ধি—স্বরাজ সিদ্ধি এবং সকলের সম্মেলন ও সামঞ্জস্য। সকলের এই ঐকৈক পূর্ণতা ও সমবেত সামঞ্জস্য পাইতে হইলে, কেবল ঐ গুলিকে লইয়া সাধনা করিলে, উহাদের সহিত সমান স্তরে থাকিলে চলিবে না, আমাদের দৃষ্টি আরও একটু উপরে ও গভীরে চালাইতে হইবে, সমষ্টিগত চেতনাকে, সমাজের সর্ব্বসাধারণ ইচ্ছাশক্তিকে আরও একটা ঊর্দ্ধতর নিবিড়তর স্তরে উঠাইয়া ধরিতে হইবে, খেলাইয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ সমাজের সমবেত সত্তাকে স্বারাজ্য-সিদ্ধি পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন সমাজের স্বারাজ্য জিনিষটা কি? ব্যক্তির স্বারাজ্য কতকটা বঝিলেও বুঝিতে পারি, কিন্তু গোষ্ঠীর বা সমষ্টির স্বারাজ্য বস্তুটা তেমন সুস্পষ্ট নয়। তারপর ব্যক্তিগত স্বারাজ্য সিদ্ধির উপায়ও ধরা সহজ, কিন্তু একটা দেশের একটা জাতির, একটা মানব-সঙ্ঘের অধ্যাত্ম সাধনা চলে কি ভাবে, কোন পথে?

প্রথমতঃ, সমষ্টিগত স্বারাজ্য হইতেছে সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টির স্বারাজ্য অর্থাৎ ব্যষ্টির সেই স্বারাজ্য যাহা শুধু ভিতরের অন্তরাত্মার বস্তু নয়, কিন্তু যাহা আবার জীবনে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। যে মানুষ নিজের আত্মাকে নিজের ভাগবত সত্তাকে পাইয়াছে, যে মানুষ কেবল দেহের প্রাণের মনের বৃত্তি বা প্রেরণা অনুসারে চলিতেছে না কিন্তু চলিতেছে আত্মার সত্যে ঋতে ও আনন্দে ও তাহাকেই মনে প্রাণে দেহে ফুটাইয়া ধরিয়াছে; যে মানুষ সহজ জীবনের স্বাভাবিক আয়তন সমূহ চালাই করিয়া লইতেছে অতীন্দ্রিয় জীবনের ছাঁচে। যে মানুষ অপর মানুষের সহিত সম্বন্ধ যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে, জীবিকানির্ব্বাহের উপায় স্থির করিতেছে, শিক্ষাদীক্ষায় আপনাকে ভরিয়া তুলিতেছে অন্তরাত্মার জ্ঞান ভোগ আনন্দের টানে টানে, এই রকম মানুষের সমষ্টি লইয়া যে সিদ্ধি তাহাই হইতেছে সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধি। আর এই সমষ্টিগত স্বারাজ্য সিদ্ধির উপায়ও হইতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন স্বারাজ্য সিদ্ধির পথে চলা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে স্বারাজ্য পাইলেই চলিবে না; ফলতঃ আমরা যে ব্যষ্টিগত স্বারাজ্যের কথা বলিয়াছি তাহা পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়াও সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিতরে একটা সমষ্টির সত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে, এক অপরের সহিত অভিন্নাত্মক বুদ্ধি লইয়া চলিবে। প্রত্যেকে যে প্রত্যেকের সহিত একত্ব বা অভিন্নত্ব অনুভব করিবে তাহা প্রয়োজনের সুবিধার জন্য নয়, ইহার অন্য নাম সহযোগীতা নয়; 'আমি আছি' যেমন একটা সহজ অখণ্ড সত্য, সেই রকম 'আমরা আছি' ইহাও একটি সহজ অখণ্ড সত্য, 'আমি'র পূর্ণত্ব সার্থকতার সাথে সাথে চলিবে 'আমরা'র পূর্ণত্ব সার্থকতা। আর এই 'আমরা' শুধু কতকগুলি 'আমি'র যোগফল নয়, এই 'আমরা'র আছে একটা নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব ধর্ম্ম। 'আমি' হইতেছি এই 'আমরা'র একটা অঙ্গ, একটা যন্ত্র, একটা কেন্দ্র। এই আমরাকে যতখানি শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি 'আমি'ও ততখানি শুদ্ধ ও সিদ্ধ। অন্য কথায় বহু ব্যষ্টিকে একত্র করিলেই সমষ্টি হয় না—যেমন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জোড়া দিয়া এক সঙ্গে করিলে সজীব মানব-আধার হয় না। প্রত্যেক ব্যষ্টির পিছনে আছে একটা সমষ্টি, এই সমষ্টিই সেই ব্যষ্টিকে ধারণ করিয়া আছে, প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যষ্টিকে আপন আপন সত্তার চেতনায় আপনার সমষ্টিগত

সত্তাকে চেতনাকে সম্যক্ জাগরিত করিতে হইবে। তারপর ব্যষ্টির যে রকম জীবনের ধারা ও লক্ষ্য আছে সমষ্টিরও সেই রকম জীবনের ধারা ও লক্ষ্য আছে—ব্যষ্টির জীবনের ধারার ও লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত সেই সমষ্টিরই জীবনের ধারা ও লক্ষ্য। প্রত্যেক ব্যষ্টিকে দেখিতে হইবে সমষ্টির সেই নিবিড় জীবনধারা সে কতখানি ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতেছে।

এইভাবে দেখিলে সমষ্টিগত স্বারাজ্য-সিদ্ধি হইতেছে সেই বস্তু যখন সমষ্টির আছে যে একটা বিরাট আত্মচেতনা, একটা জীবনপ্রবাহ তাহারই জ্যোতিতে তাহারই শক্তিতে প্রত্যেক ব্যষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই সার্থকতার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক আয়তন প্রয়োজনমত ছাচরূপ পাইয়াছে ধর্ম্মকর্ম্ম পাইয়াছে। ইহার পথ হইতেছে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে মিলিয়া, আত্মার সহিত আত্মার বিনিময় করিয়া গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ বা চক্র গড়িয়া, একটা পূর্ণ অখণ্ড সমাজ জীবনের স্রোত তাহার মধ্যে বহাইয়া দেওয়া।

আধুনিক সমাজের প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়া উঠিয়াছে, সামাজিক জীবন একটা রূপ পাইয়াছে, মানুষের প্রাকৃত স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া, মানুষের দেহের ও প্রাণের ও কথঞ্চিৎ মাত্র মনের দাবি মিটাইবার জন্য। সমাজের স্বারাজ্য অথবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে তখনই যখন সমাজ গড়িয়া উঠিবে মানুষের অন্তরাত্মার লেনাদেনার ফলে, বাহিরের চাপে বা অভাবের প্রয়োজনে যখন মানুষে মানুষে আদান প্রদান চলিবে না কিন্তু মানুষ যখন ফুটাইয়া তুলিবে একাত্মতার ঐশ্বর্য্য। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের পাওয়া চাই নিজের আসল খাঁটি সত্তা, নিজের অন্তরাত্মা, নিজের ভাগবত পুরুষ, আর ইহারই প্রেরণায় নিজ নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ ও ঋদ্ধ করিয়া চারিদিকে তদনুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা চাই। এই সাথে আবার ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ধরা চাই সমষ্টির যে একটা নিবিড় সত্তা ও চেতনা, একটা তপঃশক্তি তাহার জীবনশৃঙ্খলার মধ্যে, তাহার আন্দোলন বিলোড়নের মধ্যে, তাহার ক্রমপরিণতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে; সমষ্টির এই গূঢ়াহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত মিলাইয়া, জাগ্রত সংযোগ রাখিয়া সমষ্টির কর্ম্মপ্রয়াস যখন বিকশিত হইতে থাকিবে, ব্যষ্টিরও জীবন যখন তাহাকে উপচিত করিয়া চলিবে তখন সকল স্বরাজ চেষ্টা স্বারাজ্যেরই এক একটি অবার্থ বিভূতি হইয়া উঠিতে থাকিবে।

শিক্ষা পদ্ধতি

—o—

সঙ্ঘপীঠের শিক্ষার স্তর তিনটী। প্রথম স্তরে বাংলাভাষার সাহায্যে পৃথিবী সম্বন্ধে অধুনা যতদূর জ্ঞান পাওয়া সম্ভব তাহার অধিকার। মাতৃভাষা গণিত কিঞ্চিৎ ইতিহাস ও ভূগোল এই সময়ে শিক্ষণীয়। এই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রের ইচ্ছা হইলে কিম্বা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার সঙ্গতি না থাকিলে তাহাকে স্ব-নির্দ্দিষ্ট একটী জীবিকাউপার্জ্জনোপযোগী কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহাতে ছাত্র চতুর্দ্দশ

অথবা পঞ্চদশ বর্ষ হইতেই স্বাবলম্বী হইয়া ভগবানের দেশের এবং তাহার ভিতর দিয়া সংসারের সেবা করিতে পারে। অধুনা প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষার্থীর নিকট হইতে বার টাকা হিসাবে অশন ও বাস খরচা লওয়া হইবে। কিন্তু জাতি সংগঠ সমৃদ্ধ হইলে এই প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যেই বিতরিত হইবে।

দ্বিতীয় স্তরে ছাত্র বঙ্গভাষা ও ইংরাজীভাষা সহায়ে উচ্চতর ও পূর্ণতর গণিত ও বীজগণিত বিশু জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি, ইতিহাস ও ভূগোল বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতি, কাব্য ও সাহিত্য এবং নীতি প্রভৃতি করা আয়ত্ত করিবে।

প্রাথমিক ও দ্বিতীয় উভয় স্তরের শিক্ষা ছাত্রের ভিতরে যে সকল মানসী শক্তি সুপ্ত বা স্বল্প জাগ্রত আছে সেগুলির উদ্বোধন ও পূর্ণ বিকাশ সাধন এক কথায় পূর্ণ একটা মানুষ তৈয়ারি করা যে মানুষ জীবনের অনন্ত পথ বাহিত হইয়া আনন্দের বেগে জন্মের পর জন্ম করিয়া বিশ্বজয়ের দিকে চলিবে। ইহার সহিত সে বর্ত্তমান জগতের আত্মপ্রকাশ করিবার ভঙ্গীগুলিও কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিবে। আমাদের দেশে শিক্ষণপদ্ধতির অজ্ঞতা অত্যধিক হইলেও শিক্ষা যে একেবারে নাই তাহা নহে। শিক্ষা না থাকিলে আমাদের দেশ, আমাদের সংসার অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু সেই শিক্ষার অপূর্ণতার সহিত জগতের অধুনাতন আত্মপ্রকাশ করিবার ভঙ্গীগুলির একান্ত আয়ত্তাভাব আমাদের দেশকে বহির্জগতে স্তরের পর স্তর নামাইয়া অধমতম স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে।

আধুনিক যুগে মানুষ চিন্তা করে—ভূগোল ও ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গণিত সহায়ে এবং এইগুলির ভিতর দিয়াই আপনার ভাব প্রকাশ করে। কাল ([illegible]) আয়তন (Space) শক্তি (Power) [illegible]টী রেখার মধ্যেই অধুনাতন মানুষের জ্ঞান নিবদ্ধ। আপ্ত বাক্য, শাস্ত্র, অলৌকিকে বিশ্বাস, ইহার মধ্যে আর মানুষের চিন্তাধারা নিবদ্ধ নহে। মানুষ এগুলি অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম (Experiment) দর্শন (Observation) ন্যায় (Logic) সহায়ে আপনার ও জাতিগত কর্ত্তব্য সকল নির্দ্ধারণ করে। আমাদিগের বাহিরে দেখিয়া দেখিয়া ভিতরের সত্যের সন্ধান করার এই যে ভঙ্গীটি এবং ভিতরকে বাহিরের রেখায় প্রতিফলিত করিয়া প্রকাশ করার যে প্রণালী উভয়ই আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদের সনাতন বিজ্ঞান বোধ (Mental Intuition) সহায়ে জ্ঞান গোচর করা ও ঐ সকল রেখায় অন্তরকে প্রকাশ করার যে ঋজু (Direct) প্রণালী আছে তাহাও সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করিতে হইবে।

কিন্তু এই মানসী শক্তিগুলির বিকাশ বা উদ্বোধন কোন প্রোগ্রাম (Programme) দ্বারাই সাধিত হইবে না। শিক্ষার প্রোগ্রামের আবশ্যকতা অতি অল্প। যে কোন প্রোগ্রাম সৎ উপায়ে অনুষ্ঠিত হইলেই ইপ্সিত মানসী শক্তিগুলির বিকাশ সাধন করিবে। এই সৎ উপায় ও ভঙ্গীটি আয়ত্ত করা জাতীয় শিক্ষকের প্রধানতম কর্ত্তব্য। ভঙ্গী (Method) সত্য না হইলে শত জাতীয় কাহিনীগাথা সম্বলিত সাহিত্য পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ছাত্র দাসই হইয়া পড়িবে, সহস্র বিজ্ঞান কথা কণ্ঠস্থ করিয়াও ছাত্র চিরদিন অধমতম কর্ম্মী থাকিয়া যাইবে। ভঙ্গী সত্য হইলে রাজা ও রাণীর প্রতিকৃতি সম্বলিত ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াও ছাত্র স্বাধীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইবে, ভাষা শিক্ষা ও ভূগোল শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সে স্বতঃ শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ও ব্যবসা করিতে সমর্থ হইবে। মনোবৃত্তি বিকশিত হইলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছাত্র আপনিই শিক্ষা করিয়া লইবে, বিদ্যাপীঠের কর্ত্তব্য সকল বিষয়গুলির কেবল আরম্ভ করিয়া দেওয়া।

ক্রোড়স্থ শিশু, মাতা তাহাকে ঐ চাঁদ বলিয়া দেখায়—চাঁদামামা চাঁদামামা মণির রূপ, ন মোর টিপ দিয়ে যাও। শিশু কানে শুনে চাঁদ, চোখে দেখে চাঁদ, চিত্তে তাহার ছবি পড়ে চাঁদ—তখন চাঁদমামা বলিলেই সে উপর দিকে তাকায়। ছেলে দেখে খাবার শোনে খাব, মুখে ভোজনে। আস্বাদ অনুভব করে, চিত্তে তার এই ছবি আঁকিয়া যায়, তখন সে ক্ষুধা পাইলেই বলে খাব, খাবার দেখিলেই বলে খাব। যে উপায়ে শিশু চাঁদের নাম চাঁদ শিখে, খাইতে হইলে খাব বলে, সেই উপায়েই একমাত্র বহির্জগতের সকল জ্ঞান সকল বিদ্যা ও সকল অজ্ঞান জ্ঞানগোচর করিতে পারি যায়। এই উপায় জানিবার পদ্ধতির নাম "অনুমান" (Guessing)। ছেলে দেখিবে অজগর সাপ, বলিবে অজগর সাপ। তাহার নিম্নে লেখা 'অ'—এইরূপে শিশু 'অ' 'আ' শিক্ষা করিবে। অজগর সাপ সে জানে, কুকুর সে দেখিয়াছে। 'অ' এ অজগর, ও 'ক' এ কুকুর বলিতে বলিতে তাহার এই দুইটী ছবির মধ্যে এরূপ একটী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল পাড়ে যে অজগর দেখিলেই তাহার মনে পড়ে অ, কুকুরের ছবি দেখিলেই তাহার মনে পড়ে 'ক'। শেষে কুকুর ও অজগর পিছনে পড়িয়া যায়—গর্ভীভূত 'ক' চিত্তপটের উপরে উঠিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে একটী জানা বিষয়ের সহিত অজানার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ছাত্রবর্গ শিক্ষা অর্জিত করিবে

শিশু ইট প্রত্যক্ষ করিয়াছে যখন সে বুঝিতে পারে ই আর ট-এ হয় ইট—তখন সে জানিতে পারে যে বানান আর কিছুই নয়, বর্ণগুলির একত্র উচ্চারণ ইহা সে অনুমান করিয়া লয়।

পড়িতে পড়িতেই সে পড়িতে শেখে তাহাকে পড়ে বলিয়া দিতে হয় না, পড়িয়া সে আপন অনুমান সহায়ে ক্রমে ক্রমে বিষয়টী সম্যক অনুধাবন করিতে পারে, বিষয়টী বিবৃত করিতে পারে, বিষয়টীকে বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিতে পারে, আরও কত কি পারে তাহা বলা অসাধ্য। বিনা অভিধান ও অর্থ পুস্তকের সহায়ে বিষয়ের বাক্যের ও শব্দের এরূপ সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণে সক্ষম হয়, যাহা অভিধানবিৎ ও বৈয়াকরণিকগণেরও দুঃসাধ্য। ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষা আয়ত্ত করিবার সময়ও এই অনুমানই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পন্থা। যে দেশের (যথা কলিকাতায়) শিশু মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিবার সময় দেখে যে কতকগুলি ইংরাজী শব্দ স্বভাবতই তাহার অধিগত হইয়াছে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রথমে Childs' Word Book বালকের দ্বারাই প্রস্তুত করান হইবে। সেই Word Book ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত কলেবর হইলে সেই সকল কথা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য নির্ম্মাণ করা হইবে এবং বালককে তাহার অর্থ অনুমান করিতে দেওয়া হইবে। এই বাক্যের মধ্যে নিশ্চয়ই দু একটী অজানা শব্দ থাকিবে। বাক্যটির অর্থ অনুমান করিতে গিয়া বালক অজানা শব্দগুলির অর্থও অনুমান করিয়া লইবে। এইরূপে উত্তরোত্তর তাহার Word Book এর কলেবর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। কলেবরটী যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলে দীর্ঘতর বাক্যাংশ বালককে অনুমান করিতে শিখান হইবে। যখন বালক সরল বাক্যাংশ সহজেই অনুমান করিতে অভ্যস্ত হইবে তখন তাহাকে একেবারে একখানি ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হইবে

যে সকল পুস্তকের বিষয় ছাত্র পূর্ব্ব হইতে অবগত সেই পুস্তকই প্রথম পাঠ্য—যথা, Æsop's Fable ইত্যাদি। অভাবে বিষয়টী প্রথমে বলিয়া দিয়া ছাত্রকে অনুমান সহায়ে পুস্তকটী অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হইবে। এইরূপে একখানি পুস্তক অধিগত হইলেই ছাত্র যে কোন পুস্তক ক্রমে ক্রমে আপন

আপনি পড়িতে সক্ষম হইবে।

যেখানে বৈদেশিক ভাষার কোন অভিজ্ঞতাই পূর্ব্ব হইতে স্বতঃ বর্ত্তমান নাই তথায় একখানি শিক্ষণীয় ভাষার পুস্তক ও তৎপার্শ্বে তাহার মাতৃভাষায় অনুবাদ রাখিয়া অনুমান সহায়ে বাক্যার্থ ও শব্দার্থ নির্ণয় করাইতে হইবে। প্রথমে এই প্রথাটী অতীব দুরূহ ও কর্কশ বোধ হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ বিফল চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয় না। পাঠ তখন দুই চারি দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হয়, কিন্তু মাসাধিক পরিশ্রমের পর অর্থ ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছয় মাসের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত ও মাতৃভাষাজ্ঞ ছাত্র বৈদেশিক ভাষা একরূপ অধিকার করিতে সক্ষম হয়। উভয় প্রথাতেই প্রথমে ছাত্রকে বর্ণ, বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে বালক বৈদেশিক ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে শিখিবে। লিখিবার জন্য ও কথা কহিবার জন্য অনুরূপ শিক্ষার আবশ্যক।

ছাত্র সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে অজ্ঞান সত্তার দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছে, তাহার পরিমাণ ও অর্থ তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে—কেহই তাহাকে গ্রহণ করাইয়া দিতে পারিবে না। শিক্ষক থাকিবেন ছাত্রের পশ্চাতে—ছাত্র আপনার শিক্ষা আপনিই গ্রহণ করিবে। শিক্ষক তাহার সম্মুখে ততটুকু বিঘ্ন প্রদান করিবেন যেটুকু ছাত্র অতিক্রম করিতে পারে অথবা তাহার উত্তরোত্তর আত্মোৎকর্ষ করিবার জন্য অতিক্রম করা আবশ্যক। শিক্ষক ততটুকু বাধা ছাত্রের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইবেন, যতটুকু বাধা না সরাইলে ছাত্রের গতি রুদ্ধ হইবে, ছাত্র উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু শিক্ষক ছাত্রকে কিছুই বলিয়া দিবেন না।

উনপঞ্চাশী

— o —

বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি। একদিন সন্ধ্যাবেলা একলা পেয়ে মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—'মন, কি চাও ?'

মন শুক্‌নো মুখে চুপ কোরে বসে রইল। কথার কোনো উত্তরই দিলে না।

সেবার পাসের পড়া পড়্‌চি। সবাই বলত ভাল ছেলে। জিজ্ঞাসা করলাম—'মন, একবার চুটিয়ে পাসটা কোরে নেবে ? বেশ ত গেজেটের ডগায় নামটা উঠবে, সোনার মেডেল পাবে, খোদ লাটসাহেব এসে হাতে সার্টিফিকেট দেবে, ছেলে মহলে হৈ হৈ পড়ে যাবে।'

মন একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—'পোড়া কপাল ! পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী, গোলামের আবার বিদ্যে।'

লেখাপড়ার গুমরটা মনে মনে একটু ছিল। সেখানে ঘা খেয়ে একটু শিউরে উঠলুম।

"তবে কি চাও, মন,—টাকা ? ঐ কল্‌কাতার বুকের উপর প্রকাণ্ড একখানা সাদা মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান বাড়ী, চমৎকার একখানা মোটর আর ব্যাঙ্কে

সাধ কতক—? কি বল?'

মন আমার মুখও তুললে না। শুধু বললে—একলা মানুষ, ও সব নিয়ে আমি করব কি? দুবেলা দুমুঠো ভাত, আর মাথা গোঁজবার একটু জায়গা পেলেই হ'ল।"

মনের এই উদাস উদাস ভাব দেখে ভাবলুম মন আমার বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে 'লভ' পড়েছে। একটু ইতস্ততঃ করে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম—'একটা টুক্ টুকে রাঙ্গা বউ বিয়ে করবে? খাসা মেয়ে। বেশ চার দিক আলো করে ঘুরে বেড়াবে।"

মন আমার হাই তুলে বললে—নিজের বোঝাই বইতে পারিনে—তার উপর আবার একটা মেয়ে!"

রোগটা ঠাওরাতে পারলুম না।

২

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গোলদীঘির ধারে একজন প্রকাণ্ড স্বদেশী পাণ্ডার লেকচার শুনে খুব খানিকটা হৈ চৈ করে বাসায় এসে খেয়ে দেয়েই শুয়ে পড়েছি। খোলা দোর জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না বিছানার উপর এসে ঢেউ খেলাচ্ছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টেরও পাইনি। আধা রাতে হঠাৎ যেন বুকটা ভুড় ভুড় করে উঠল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি মনটা আমার ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আঃ, সে কি কান্না! বুকটা যেন মুচড়ে মুচড়ে নিঙড়ে নিঙড়ে কান্নার ধারা ছুটেছে। আমাকে জাগতে দেখে মন আবার খানিকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চুপ করলে। অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলিয়ে টুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"হাঁরে, তোর কি হয়েছে বলনা? কি করলে তুই সুখী হোস?"

আবার কোঁপানি সুরু হ'লো। আমি ভাবলুম বুঝি বক্তৃতা শুনে এসে মনের আমার নেতা হবার সাধ হয়েছে। বললুম—"হাঁরে, ছেলেদের সর্দারি করবি? কত হাততালি পাবি, ফুলের মালা পাবি, খবরের কাগজে তোর নামে প্রবন্ধ বেরুবে, আর এখন থেকে সুরু করলে কালে লাট সাহেবের সভার সভ্যও হতে পারিস। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়াও বিচিত্র নয়—অথচ খরচ একটি পয়সা নেই! কি বলিস?"

মন আমার নাকটা সিঁটকে উঠল। মুখটা আমার চেপে ধরে বললে—"ওগো রক্ষা কর, রক্ষা কর আমি কি ছ্যাচোড় না দাগাবাজ যে আমায় ফক্কিকারি দিয়ে ভোলাচ্ছ?'

কি বিপদ! তবে কি মনের আমার বৈরাগ্য হল? জিজ্ঞাসা করলুম—"তুই কি সাধু হবি নাকি? চল, গেরুয়া ছুপিয়ে নিয়ে তা'হলে বেরিয়ে পড়ি। একটা অলখ্‌খেলা আর কমণ্ডলু নিয়ে আরম্ভ করা যাক শেষে চেলা টেলা জুটলে একটা ভাল জায়গা দেখে মঠ গেড়ে বসা যাবে'খন।'

মন আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপটি মেরে হাঁ করে চেয়ে রইল। শেষে একটু ঘাড় নেড়ে শুধু বললে—"ছি!'

৩

বাঙ্গালার ছেলে সেপাই হবে—এ কথা তখন কে ভেবেছিল? কিন্তু আজ তা'ও হলো। ১৯১৫ সালে যে ফরাসীর সঙ্গে জর্ম্মানের যুদ্ধ হবে, আর আমি ফরাসী পল্টনে ভর্ত্তি হয়ে লড়াই কর্ত্তে যাব—এ কথা আমার ভাগ্যবিধাতা ছাড়া আর কে আগে জানত? ভাল ছেলে হওয়া বা বড় লোক হওয়া আমার পোষাল না। আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছি। যত দূর দেখছি, সব ফরাসী জাতটা যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। ঘর ছেড়ে বৌ ছেড়ে, ছেলে ছেড়ে, ধন ঐশ্বর্য্য ছেড়ে—সুবা [illegible] রাইফেল কাঁধে ছুটেছে। নিয়ুক্ত

উড়ছে, বিউগল বাজছে, আর কান ফাটিয়ে ঐ এক গান উঠছে—"Allons, enfants de la Patrie." * * * আজ আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টির ধারা ছুটেছে আর আমরা মাঠের পর মাঠ ভেঙ্গে ডবল কদমে চলেছি। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে বিজলী চমকাচ্ছে; দূরে জর্ম্মানের তোপের আওয়াজ বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্চে।

মনটা আমার ফরাসীসেনার সঙ্গে সঙ্গে বেশ তালে তালে পা ফেলে চলেছে; হঠাৎ—কড়াং—ং—কান ফাটিয়ে, চোখ ধাঁধিয়ে, কোথা থেকে একটা শেল আমাদের খুব কাছাকাছি এসে ফাটলো। যে যেখানে পারলে গুড়ি সুড়ি মেরে মাটীর উপর পড়ল। পাশে একটী ফরাসী ছেলে সেই যে পড়ল আর উঠল না। শেলের এক টুকরো তার মাথায় এসে লেগেছিল।

মরণকে এত কাছে পেয়ে প্রাণটা যেন উন্মাদনায় ভরে গেল। মনে পড়ল সেই মেসের ছেলেগুলো, যারা পাশ করছে, আর বেঁচে মরে আছে। বাড়ীতে বুড়ী মা আর ছোট ভাইটা—আসবার সময় মার গলা জড়িয়ে ধরে এ পাষাণ চোখেও জল এসেছিল—দূর হোক গে!

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম—মন আমার যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তার চোখ দুটো যেন বিদ্যুতের মত চকচক করছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি মন, একবার ঝাঁপিয়ে পড়বে?"

মন আমার একটা পাগলের মত অট্টহাসি হেসে বললে—"মরণের লোভ যে কত বড় তা আমি জানি; কিন্তু যাদের জন্যে মরলেও সুখ হতো, এরা ত আমার তা' নয়!"

৪

"জয় দুর্গায় মা"—বলে আমি চলতে আরম্ভ করলুম। সেই যে চলিছি, আজ অবধি চলা আর আমার শেষ হলো না। যুদ্ধ শেষ হবার পর শুনলুম ইউরোপ নাকি একটা জাতিসংঘ গড়ে জগতে সত্যযুগ আনবে। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম—"দেখতে যাবি না কি রে?" মন বললে—"ধ্যাৎ, ওটা ত জাতিসংঘ নয় ও হলো মাতব্বরদের বদ্-জাতি-সংঘ।

"তুই যে আমার বেজায় আবদেরে মন!"

চললুম রুশিয়ায়—সেখানে নাকি সব ভেদাভেদ রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে লেনিন মানুষকে সমান করে গড়বে। গিয়ে দেখলুম, হাঁ—একটা নতুন রকমের কল বসেছে বটে! মানুষকে সেই কলের মধ্যে ফেলে, কারও মাথাটা ছেঁটে দিয়ে, কারও ঠ্যাংটা ভেঙ্গে দিয়ে সকলকে সমান করে গড়বার চেষ্টা হচ্ছে বটে। যার নাকটা একটু বড়, তার নাকটা ইঞ্চি খানেক কেটে নাও, যার চোখ দুটো একটু গোল গোল তার চোখ দুটো ছুরি দিয়ে পটল-চেরা করে দাও। একেবারে ভীষণ রকমের সাম্য। কর্ত্তার যদি জ্বর হয়, ত সবাই খাও সাগু; কর্ত্তা যদি পাশ ফিরে শোন, ত কেউ চিৎ হয়ে শুতে পাবে না। শুনলুম এর নাম Commune। মন আমার খানিকটা চুপ করে থেকে থেকে বলে উঠল—বাপ!

৫

ছুট, ছুট, ছুট!—একেবারে ছুটতে ছুটতে তুর্কিস্থান, কাবুল, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ভেদ করে বাংলার মাটীতে ন্যাংটা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ কোথায় তুমি, আমার স্বপ্নের বাংলা?—কোথায় তুমি মা! দশ হাতে দশ প্রহরণ নিয়ে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়ে তুমি একদিন বাঙ্গালী সাধকের মানস-পটে এঁকে উঠেছিলে, আর আজ দেখি সবাই আমারই মত জীর্ণ, ক্লিষ্ট, ক্ষতবিক্ষত দেহ প্রাণ দিয়ে

পরের পায়ে ধরণা দিয়ে পড়ে আছে!

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম মন আমার চোখ বুঁজে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। শুধু অন্তর্যামিনীর পদপ্রান্তে তার কাতর প্রার্থনা উঠেছে—একবার, এসো মা, এসো মা!

—বিজলী, ২২এ মাঘ।

স্মৃতি

—০—

অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, চৌদ্দ বৎসর হইয়া যায়, আমরা কয়জন বন্ধু মিলিয়া বুদ্ধগয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা তখন একেবারেই তরুণ, তরুণভাব এখনও হৃদয় ভরাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তখন তরুণের তরুণ আভা হৃদয়ে এমন একটা নূতন জগৎ আঁকিয়া তুলিয়াছিল, যে-জগতের পূর্ণরূপটী আমরা জানিতাম না, কিন্তু তার সত্তাটুকু হৃদয়কে এমন একরূপ গুলাইয়া দিত, সারা অন্তঃকরণটা কেমন যে [illegible] শিহরিয়া উঠিত তাহা অনুভব করিতাম, ঠিক বুঝিতাম না, কিরূপ অপরূপ সে জিনিস এবং তাহার ঐ পরশ। নবীন বয়স, চারিদিকে স্বদেশী বাতাস, বাংলার ঘেরা টোপটী হইতে এদিকে ওদিকে দু' একবার তাকাইয়া হৃদয়ের সেই পরম পরশ আর ভারতের মানচিত্র কেমন যে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল তাহা আমি আজ পর্য্যন্ত ঠিক গুছাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভারতের মানচিত্র দেখি, ব্র্যাডশ (Bradshaw) ধরিয়া রেলে টঙ্গায় কোথায় কোথায় চলিয়া যাই, বাংলার শ্যামল সমতলে আমার শরীরটুকু পড়িয়া থাকে, আমি উঠি কাঞ্চনজঙ্ঘায় নীলপর্ব্বতে,—নর্ম্মদার নবউৎস আমার নবীন প্রাণে নব নব তরঙ্গ তুলিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলে। আমি যখন যথায় গিয়াছি, আমার রক্তমাংসের পুঁটুলী-টুকু বিমল আনন্দ কখন উপভোগ করিয়াছে বলিয়া মনে নাই, ভিতর আমার খালি হইয়া গিয়াছে, আমি বুদ্ধের মূরতির ন্যায় পাথর প্রতিমারূপে দাঁড়াইয়া থাকি আর খুঁজি, কৈ আমি কোথায়? আমি কি কিছু দেখিতেছি?—আমি চাহিতেছিলাম যেন ভারতের ভিতরের ভিতরে ঢুকিয়া একবার আমায় ও তাহায় মিলিয়া মিশিয়া যাই, দেখি আমি তা'কে, আমারও যদি কিছু থাকে মা তুমি দেখিয়া লও, তোমার নয়নছাড়া দৃষ্টিহারা হইয়া আমি যে আকুল—আমার ভিতর যে তা' দেখে নাই তা বলি না কিন্তু দেহ ও প্রাণ অস্থির হইয়াই ছিল, একরূপ অব্যক্ত যাতনার সুর আমি অনুক্ষণ কর্ণে কর্ণে শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি।

এমন অন্তঃকরণ লইয়া চোখের দেখা বর্ণনা করা যায় না। আজ পর্য্যন্ত ফল্গু ও গঙ্গা নদী আমার নিকট মিলিয়া মিশিয়াই রহিয়াছে। যখনই পশ্চিম নেহারি তখনই এক রজত সমুদ্র। বৌদ্ধ-মন্দিরের চূড়া পার্শ্বনাথের চূড়া বহিয়া বহিয়া গঙ্গাপ্রবাহ অযুতধারে নামিয়া আসিতেছে; সকল ভূমি শ্বেতফেন তরঙ্গনৃত্যে নাচিয়া নাচিয়া গঙ্গা তীরে আমার হৃদয়খাতে একেবারে নিঃশেষে মিলাইয়া যাইতেছে, আবার তৎকাল দিয়া আমাকে ভাসাইয়া

সকল ভাসাইয়া নমঃ বুদ্ধায় ওঙ্কারে ফল্গুতীরে আছাড়িয়া পড়িতেছে—প্রবল বেগে, পাহাড়ের শক্ত তীরে পাহাড়প্রমাণ অযত অযুত নরনারীর জীবন বক্ষে সজোরে আঘাত করিয়া প্রেমশান্ত শান্তিবিন্দ আকাশ ভরাইয়া দিতেছে-তুষার বিন্দুর ন্যায় শান্তিবিন্দু মন্দিরের উচ্চচড়া পর্য্যন্ত যেন ছাইয়া আছে। মনে হয় বালক বুদ্ধ শীত প্রভাতে হেমগিরির পাদপীঠে নবীন অরুণ লক্ষ্য করিয়া যে বিমল দেব-হাসি হাসিতেন, তাঁহার মুখারবিন্দ অনন্ত শুভ্রবিন্দু অঙ্গে মাখিয়া যে আলোক-কুহক নব রূপের সৃষ্টি করিত—কে যেন ঐ দেবচিত্র পৃথিবীর বক্ষে বসাইয়া দিয়াছে, ঐ বুদ্ধগয়ায়। ঐ বুদ্ধগয়ায় ঐ বুদ্ধমন্দিরের পরিপার্শ্বে মানস সরোবরে ফল্গুতীরে বালক বুদ্ধ, যুবক বুদ্ধ, রাজবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব, মহাবুদ্ধ স্থির ধীর গম্ভীর পুলকে আনন্দে ভাববিলাসে ভরিয়া ভরিয়া জীবন্ত অপরূপ দেবলীলা চিরদিন ধরিয়া লীলায়িত করিয়া রাখিয়াছেন- পাথরের প্রতিমা দেখিলা, কঙ্কালসার বোধিসত্ত্বের নিকট সতৃষ্ণনয়না সুজাতার চিত্র দেখিয়া, পূর্ব্বজন্মে হনুরাজ বৌদ্ধরাজের সহৃদয়তাপূর্ণ পরম দেবপ্রাণের পাথর প্রতিমা লক্ষ্য করিয়া আমরা সেই সজাগ সবল প্রেম-পূর্ণ বৌদ্ধপ্রাণ কথন প্রাণে প্রাণে ধরিয়া লই, আবার কখন একেবারে শূন্য হইয়া পড়ি- -সে বিরাট বিশাল প্রেম সমুদ্র মানবহৃদয় কি ধরিয়া রাখিতে পারে?

যাঁরা কেবলই পাঁথর দেখেন, পাঁতি পাঁতি করিয়া বুদ্ধদেবের মহাভাবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলি হৃদয়ে ধারণ করিতে সচেষ্ট হন, তাঁরা হয়ত তাঁদেরই মনোভাবের সহিত বৌদ্ধ ভাবগুলি মিলাইয়া লন, নচেৎ এই বিপুল বৌদ্ধ সঙ্গমে একেবারে হৃদয় পাতিয়া দিলে মানুষের কোন্‌প্রকার মনুষ্যত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত যে বর্ত্তমান থাকে তাহা ত বোধ হয় না। অন্যকথা তুলিয়া কাজ নাই বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ায় আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, হে জগৎ, তোমারই কল্যাণ কামনায়—কিরূপে যে ইহা অনুভব করিবে, কোথায় যে ইহার অনুভব করিতে তাহা কেহ ঠিক করিয়া এখনও ধরিতে পারে নাই।

আমরা যখন একান্ত বৌদ্ধভাব লইয়া বুদ্ধগয়া দর্শনে চলি, নষ্ট বৌদ্ধ মন্দিরের অবিকল সংগঠক কানিংহামের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অযুত নমস্কার করি—তিনিই যেন বিশ্বে পুনরায় বৌদ্ধ ভাবের উদ্বোধন করিয়াছেন। আবার যখন শ্রবণ করি এইবৌদ্ধ মন্দিরের অধ্যক্ষ হিন্দুরাজন, রাস্তার অপর পার্শ্বে বৌদ্ধ যাত্রী নিবাসের এক শ্রেণীতেই অধ্যক্ষের বিশাল অট্টালিকা মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তিনি প্রতি বৎসর তিন লক্ষ আয়ের সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন, তখন হৃদয়ে যেন কিরূপ এক বিকার উপস্থিত হয়। আমা-দিগকে শুনিতে হয় বৌদ্ধগণ এই হিন্দু অধ্যক্ষকে বিতাড়িত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এক বৌদ্ধ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই,-—একথা শ্রবণ করিয়া আমরা ইহার মধ্যে কোন সুবিচারের সন্ধান পাই না। শুধু তাহাই নহে, যখন শুনি বুদ্ধদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গনে ছাগশিশুভোগী দশভুজা দুর্গা প্রতিবৎসর এই হিন্দু অধ্যক্ষকর্ত্তৃক শরৎকালে নিয়মিত পূজিত হইয়া হিন্দু অধিবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, তখন ত আমরা একেবারে শিহরিয়া উঠি—দয়ার সাগর ছাগশিশুর ক্রন্দনে কতই না ব্যথিত হইয়া উঠেন! ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া যখন শুনি ছাগশিশুর প্রাণবধ দয়ার অবতার ও [illegible]দেবীর সম্মুখে হয় না, অধ্যক্ষ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজগৃহে তাহা সম্পন্ন করিয়া দেবী উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড কটাহে উত্তপ্ত ঘৃতমধ্যে একটীর পর একটী মুণ্ড নিক্ষেপ করেন, তখন মনে হয় মানুষ একটা সামঞ্জস্যবোধের অন্তরালেই একান্ত বীভৎস

কার্য্যসমৃদ্ধ করিয়া থাকে।

একান্ত বৌদ্ধভাব ত্যাগ করিয়া নিজকে উলঙ্গভাবে বুদ্ধদেবের সম্মুখীন করিতে পারিলে লীলাময় কেন যে তাঁহার লীলাভূমিতে এরূপ লীলা প্রকাশ করিতেছেন তাহা হয়ত আমরা বুঝিতে পারিতাম ও হৃদয়ও আমাদের শান্ত হইত। হে বুদ্ধদেব, আমরা গণ্ডীর পর গণ্ডী টানিয়া তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি কি মনুষ্যের সকল ভাবের উপরে ও তাহার সকল খণ্ড তরঙ্গের অন্তঃস্থলে বিপুল শান্তিস্রোত বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ? যাহাকে নাশাইবা তুমি উদয় হইয়াছিলে আবার তাহাকে তুলিয়া ধরিয়াছ, তাহার সত্যটী তুমি জগতকে ভুলিতে দিবে না—কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া মনে প্রাণে যে বীভৎস কামলীলা চরিতার্থ করে তাহাকেই তুমি দূরে সরাইয়া দাও। তোমার প্রাঙ্গণে তোমাকে পূজা করিতে করিতে আমরা মহাদেবীর পূজা করিতে পারি, নিজের ছাগস্বভাবের একান্ত বলিও তুমি স্বচক্ষে দেখিবে, কিন্তু নিজের ছাগস্বভাব বলির অনুকরণে মানুষ যে ছাগ বলি করিয়া আত্মতৃপ্তি করে তাহা বুঝি তুমি চক্ষে দেখিতে চাহ না। যাউক বুদ্ধগয়ার এইরূপ বিচিত্র স্মৃতি লইয়া আমরা বসিয়া আছি

মত ও পথ

—০—

"ছাত্রেরা স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করায় একদল অভিভাবক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন" তজ্জন্য শ্রীহট্টের জনশক্তি বলিতেছেন, "ইঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের সংসার চলে কেমন করিয়া। বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে যে বিলাসবাসনা প্রবেশ করে তাহাই চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকাংশকেই হয় পিতা না হয় শ্বশুরের অর্থের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। প্রত্যেক যুবকের শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাহার কত অংশ ইহারা উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সেক্সপিয়র মিল্টন কণ্ঠস্থ করিয়া অবশেষে চাকুরীর উমেদারী অথবা বাবলাইবেরীতে অনাহার—ইহাই অধিকাংশের অদৃষ্টলিপি। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রয়োজন দিন দিন বাড়িতেছে কিন্তু উপার্জ্জনের সমস্ত পথ বন্ধ। এই প্রয়োজনের মাত্রা আমরা যতদিন সংক্ষিপ্ত করিতে না পারিব ততদিন স্বরাজ্যলাভ ঘটিবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের কথা কাহারও অবিদিত নহে। যাহারা এতকাল মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন যাপন করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহারা না থাকিলে এদেশ ধ্বংস হইয়া যাইত। এমন উচ্চশিক্ষিত লোক অতি অল্পই আছেন যিনি স্বীয় উপার্জ্জন হইতে মাসিক অন্ততঃ একশত টাকা বাঁচাইতে পারেন। কিন্তু এই জেলারই মৎস্য ব্যবসায়ী, ধান্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া মাসিক সামান্য কিছু বাঁচাইতে পারে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে ইহাদের ব্যয়বাহুল্য নাই। বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের মনোবৃত্তি যে ভাবে গঠিত হয় তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। অভিভাবকগণের এই চাঞ্চল্যও বর্ত্তমান শিক্ষারই ফল। যে আলস্যময় নির্ভাবনার মধ্যে আমরা দিনযাপন করিতেছি, যে মৃগতৃষ্ণিকার পানে আমরা চাহিয়া আছি যদি কোন আন্দোলনে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তবে

অমনি আমরা চঞ্চল হইয়া উঠি এবং বিজ্ঞের মত মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বলি—এ আন্দোলন টিকিবে না, ইহা দেশের ঘোর অনিষ্টকারক। কূপবাসী জীববিশেষের ন্যায় আমরাও ভাবি বুঝিবা আমাদের কূপের বাহিরে কোন জগত নাই। স্বদেশী যুগের মাপ কাঠিতে অ-সহযোগিতা আন্দোলনের বিচার করা চলে না ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তির প্রধান কারণ আমাদের আর্থিক দাসত্ব (Economic slavery) — রাজনৈতিক দাসত্ব (Political slavery) নহে। এই দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইতে গেলে আত্মসংযম প্রয়োজন। * * * স্বদেশীযুগে ভারতের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল না; সমগ্র ভারত এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই; জনসাধারণ তাহাতে কোন সাড়া দেয় নাই; পৃথিবীর অবস্থা এমন সঙ্কটময় ছিল না। আজ শোষণনীতির ফলে ধনী দরিদ্র একসঙ্গে নিষ্পেষিত। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত একইভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের মহাপরীক্ষার দিন উপস্থিত! স্বরাজের জন্য আমাদের আন্তরিকতা কতটুকু, এই মহাযজ্ঞের পূতবেদীতে স্বার্থবলিদান দিতে আমরা সমর্থ কি না তাহারই পরীক্ষার দিন সমাগত হইয়াছে।"

কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে নড়াইল—লোহাগড়ার কল্যাণী বলিতেছেন,—

"আজ ছাত্রসমাজে স্কুল কলেজ বয়কটের একটা সাড়া পড়িয়াছে। সবাই আজ উন্মত্ত। পিছনে তাকাইবার মত ফুরসুত নাই—সে বাসনাও নাই। আজ পনের বৎসর আগে বাঙ্গালায় এমনি একটা ভাবের ঢেউ খেলিয়াছিল—তখন ছিল বিলাতি জিনিষ বয়কট। সে বয়কটে ছাত্রসমাজ বেশীর ভাগ উন্মত্ত হইয়াছিল। তখনকার দিনের সেই সমর সজ্জা—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষা—উন্মত্ততা—কেমন এক স্বাধীন ভাবের বন্যার স্মৃতি আজিও প্রাণে ধিক্কার আনিয়া দেয়। সে সব দিনের সেই কর্ম্মের ভাব, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আন্দোলন, মায়ের মন্দিরে সভা, সেই প্রতিজ্ঞায়-কল্পতরু-সাহসে-দুর্জ্জয় ভাব—আজও এই ভাবের দিনে সেই অতীতের অভিশপ্ত স্মৃতি অন্তরাত্মাকে সঙ্কুচিত করে। মনে হয় আত্মপ্রতারণাময় বাঙ্গালী জীবনের সেই কয়টা দিন ইতিহাস হইতে যদি মুছিয়া যাইত!

সেই ভাবের বন্যে বাঙ্গালীর যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল, যাহা হইতে পারিত, সেই রত্ন সমূহ বহ্নিবুভুক্ষু পতঙ্গবৎ আপনাদিগকে আহুতি দিয়াছিল। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে যাঁহারা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, কর্ম্মই সংসারে সব নয়—কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম—কর্ম্মের সঙ্গে সংযম, ভগবানে বিশ্বাস, কর্ম্মে অনাসক্ততা, ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ কর্ম্মে আপনাকে নিয়োগ—কর্ম্মের মূল। যেখানে সংযম নাই—অনাসক্ত ভাব নাই—আস্তিক্য বিশ্বাস নাই—সেই কর্ম্ম ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। দেশ জাতি বড় কথা নয়—দু'দিনের সম্বন্ধ—সবার চেয়ে বড় কথা আত্মার সম্প্রসারণ।

সোদর প্রতিম ছাত্রগণ, স্কুল কলেজ ছাড়িতেছ—স্কুল কলেজ ভাঙ্গিতেছ। ভাবিয়া দেখ এই ভাঙ্গা-গড়া ভাবের মধ্যে তোমাদের নিজস্ব কতটুকু। আগে নিজে নিজদিগকে জান। ক্ষণিক ভাবের বশে, উন্মত্ততার মোহে, আত্মপ্রতারণা করিও না। সেই পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটা মোহের তাড়না আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল—ফলে বাঙ্গালার কত মাতার চক্ষের জল আজিও শুকায় নাই, কত সাধ্বীর বক্ষের ক্ষত আজিও মর্ম্মপ্রদাহী। কত পিতা বৃদ্ধবয়সে অনাহারে তিলে তিলে শুকাইয়া যাইতেছেন! মোহের সময় আপনাকে চিনিতে পারা যায় না, কেহ চিনিতে পারেও না—পরে আসে অনুতাপ—আত্মগ্লানি।"

আমাদের ভয় হয় পনের বৎসর পূর্ব্বের "যজ্ঞাগ্নি হইতে যাঁহারা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন" তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ বোধ হয় কল্যাণীর সহিত একমত হইতে পারিবেন না। কোন কোন স্থানে স্বদেশী যুগের চিত্র স্বদেশীকে যে এরূপ মর্ম্ম পীড়া দান করিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারিলাম। ভগবান করুন কর্ম্মযোগ গ্রহণ করিয়া ইঁহারা যেন শান্তির পথ দেখিতে পান।

ভারতবর্ষ স্বরাজ্য চায় অর্থনীতিক কারণে, রাজনীতিক কারণে। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ স্বরাজ্য চাহিয়াছিল বিধর্ম্মীর অধীনে ভারতের হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়া। বিদেশীর অধীনে

বহুকারণে জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইলে জাতি যখন নিজের স্বরাজ্য কামনা করে তখন বুঝিতে হইবে জাতিরক্ষার জন্য তাহার সেই প্রচেষ্টা—স্বদেশপ্রেম ও বর্ত্তমান যুগের স্বরাজ্য চিন্তায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ প্রবল থাকিলেও জাতির বৈশিষ্ট্যরক্ষা বা জাতিরক্ষা তাহার মূল কারণ। আবার ভারতের নবীন প্রাণে নূতন সঙ্কল্প জাগিয়াছে, তাহারা চায় স্বরাজ্য—জগতে প্রকৃত স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই। আজ পর্য্যন্ত জগতে যত কিছু শাসন চক্র ও যত কিছু সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে মানব প্রকৃত স্বরাজ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই—কতক অংশের অন্তরাত্মা সতত অধীন বা আত্মগুপ্ত অবস্থাতে বাস করিতেছে। ইহার সম্যক ধারণা না করিয়া ভারতের মুসলমানদের প্রাণ ভারতের স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্য কিসে এত উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহা "মোহাম্মদী"র ভাষায় আমরা ব্যক্ত করিতেছি। মোহাম্মদী লিখিতেছেন, "ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের রক্ষার আর কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষের অধিবাসীর হিসাবে স্বরাজ সম্বন্ধে মনোযোগিগণের স্বাভাবিক আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, পাঠক কেবল ধর্ম ও মোস্লেম জাতীয়তার দিক দিয়া বিষয়টীর বিচার করিলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ত্রিপলীর যুদ্ধে তুর্কের যে পরাজয় ঘটিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট। মিসর তখনও সম্পূর্ণভাবে তুর্কীর অধীনস্থ প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তখন আদেশ প্রদান করিলেন যে, তুর্কী সেনাদিগকে মিসরের মধ্য দিয়া ত্রিপলীতে যাইতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও রণসম্ভার পাঠাইতে না পারায়, যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও মহামান্য খলিফাকে ইতালীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এইরূপে খেলাফতের একটী স্তম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল। এখন একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য এবং ভারতের সামরিক ও আর্থিক শক্তির বলে, মিসরের উপর আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। ভারত স্বাধীন হইলে, ইংরাজের এই স্বার্থ ও তাহা রক্ষা করিবার শক্তি যুগপৎভাবে লোপ পাইবে। কাজেই আমরা দেখিতেছি—মিসরের মুক্তিও ভারতের স্বাধীনতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। তাহার পর মুসলমানের যে বর্ত্তমান বিপদ, তাহার একমাত্র কারণও ভারতবর্ষ। ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে অগণিত সৈন্য, অসংখ্য শ্রমজীবী এবং অস্ত্রশস্ত্র রণসম্ভারাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহা দ্বারা বছরা মেসোপোটামিয়া প্রভৃতি মোস্লেম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করেন, রাজভাণ্ডারের অর্থ সাহায্য ব্যতীত কোটি কোটি টাকা চাঁদারূপে সংগ্রহ করেন, এবং তাহারই বলে আমাদের মহামান্য সোলতানকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। যুদ্ধের পর, এর আজ পর্য্যন্ত এসিয়ার যে সমস্ত মোস্লেম সাম্রাজ্য ইংরাজের করতলগত হইয়া আছে, তাহার সমস্ত মালমসলা ভারতবর্ষই সরবরাহ করিতেছে। এই ভারতীয় সৈন্যই গত দুই বৎসর হইতে পারস্যে চড়াও করিয়া আছে। ফলতঃ ভারত সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনের সীমানা পর্য্যন্ত সমস্ত মোস্লেম সাম্রাজ্যই একমাত্র ভারতের অর্থ ও সামরিক বলে এবং ভারত রক্ষার স্বার্থের জন্য বিপদগ্রস্ত হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কায় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। আজ যদি ভারতবর্ষ স্বরাজলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আফ্রিকার আলজিরিয়া এবং ত্রিপলী ও টিউনিস হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে চীন ও ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত মোস্লেম সাম্রাজ্য গুলি একদিনেই সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারিবে। কাজেই রাজ্যরক্ষার সহিত ধর্ম্মের গৌরব এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, খলিফার এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে যদি তদ্দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের ও জাতির সর্ব্বনাশ হওয়া নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ভারতে স্বরাজ রক্ষা করা অন্যের পক্ষে রাজনৈতিক সাধনা হইলেও মুসলমানের পক্ষে উহা ধর্ম্মরক্ষা এবং জাতিরক্ষার মহা জেহাদের অনুরূপ।"

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের জনৈক পাঠক লিখিতেছেন, "৬ষ্ঠবর্ষ ১ম সংখ্যার প্রবর্ত্তকে যে মহাত্মা "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" নামে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে তদ্দ্বারা উপাধ্যায় মহাশয়ের মধুর জীবনীর আভাস পাইয়া বড়ই আনন্দিত হই-হইলাম। কিন্তু এক মহাপুরুষের জীবনী-আলো-

চনায় ব্রতী হইয়া সাধারণের অন্তর হইতে স্পষ্টতঃ না হউক ইঙ্গিতে এইরূপে অপর এক মহাত্মার প্রতি সাধারণের যে প্রীতি ও আদর্শ চিত্র আছে তাহা কাড়িয়া লওয়া সুসঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।" আমরা লিখিয়াছিলাম, "বাঙ্গালী যখন সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই তাহাকে বিদেশীর নিকট শিখিতে হইবে, এভাব লইয়া বাঙ্গালী যখন একেবারে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় পশ্চিমমুখী হইয়া অধঃপাতের পথে চলিতেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তখন বজ্রনির্ঘোষে তাহাকে মুক্তি ও স্বাধীনতার বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন—কিন্তু সে বার্ত্তা বাঙ্গালী সাধারণের নিকট পৌছায় নাই। স্বামীজী অতি অল্পদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন, তদ্ব্যতীত তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই ঘোষণা করিয়াছিলেন ও ভারতের এই মুক্ত ও স্বাধীন ভাবকে অক্ষুন্ন ও সদা সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য আধ্যাত্মিক আলোচনা ও যুগোপযোগী জগৎসেবায় এক বিশিষ্ট সাধন পথ সৃজন করিতেই তাঁহার সকল শ্রম ব্যয়িত হইয়াছিল। সেইজন্য সাধারণকে লইয়া তিনি বিশেষ কিছু করিয়া যান নাই। আবার বোধহয় সাধারণকে লইয়া সাধারণভাবে কাজ করাও তাঁহার দ্বারা সুসিদ্ধ হইত না।" বলা বাহুল্য, "কিন্তু সে বার্ত্তা বাঙ্গালী সাধারণের নিকট পৌছায় নাই" এবং "আবার বোধহয় সাধারণকে লইয়া সাধারণভাবে কাজ করাও তাঁহার দ্বারা সুসিদ্ধ হইত না," আমাদের এই দুইটী উক্তি পাঠকমহাশয়কে পীড়িত করিয়াছে। এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সৎউদ্দেশ্য লইয়াও কেহ আমাদের মনোমত ধারণার বিপরীত কথা কহিলে আমরা বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতাম। মনে করিতাম, জাতিগঠনের ভাব যাঁহার মধ্যে ভিন্ন পরিমাণ বর্ত্তমান, স্বামী বিবেকানন্দকে নির্ব্বিচারে অনুকরণ করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কর্ম্ম নাই—কিন্তু জাতির আ[illegible] করিতে গিয়া স্বামীজী যখন আমাদের নিকটতর হইয়া উঠেন, সে-সময়ে তাঁহার ব্যক্ত কার্য্যের মধ্যে অব্যক্ত স্বামীজীর দর্শন লাভ আমাদের ঘটিয়া থাকে, এই অব্যক্ত স্বামীজী বহুবার আমাদিগকে তাঁহার ব্যক্ত কার্য্যাদির সাময়িকতা ও সীমাবদ্ধতার কথা বলিয়া দেন। আমরা ভিতরের স্বামীজী ও বাহিরের স্বামীজীর বিপুল প্রভেদ লক্ষ্য করি, তবে স্বামীজী তাঁহার ভিতরকে অর্থাৎ ভারতের অন্তরতম পুরুষকে ধরিবার জন্য আমাদিগকে এক সাধন পথ ও জগৎসেবার প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি তাঁহাকে ভারতের তথাকথিত রাজনীতিক আন্দোলনকারী বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন—তথাকথিত রাজনীতিক আন্দোলন একটা অন্ধস্রোত লক্ষ্য করিয়া জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জাতিকে জানা ও পাওয়ার পথ স্বতন্ত্র। স্বামীজী দেখিয়াছিলেন তখনও ভারতে এই জানা ও পাওয়ার পথের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। তজ্জন্য এই পথ আবিষ্কার ও এই পথকে সুদৃঢ় করিতে তিনি সকল প্রকার বাহ্যিক আন্দোলন হইতে নিজকে নির্লিপ্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ঐ বিষয় বিশেষভাবে অবগত ছিলেন, তথাপি তাঁহার ধারণা ছিল যে কোন প্রকারেই হউক তমসাচ্ছন্ন জাতির মনোমধ্যে একটা আলোড়ন আনিতে হইবে নচেৎ জাতি কিছুতেই অভ্যুত্থানে অগ্রসর হইবে না। অতএব আমরা যে ধারণার বশবর্ত্তী, তাহাতে স্বামীজী সম্বন্ধে "সাধারণকে লইয়া সাধারণভাবে কাজ করাও তাঁহার দ্বারা সুসিদ্ধ হইত না" আমাদিগকে লিখিতেই হইবে। ইহাতে যে রকম লোকের মনঃক্ষুন্ন হইতে পারে তাহা আমাদের জানা আছে, কিন্তু স্বামীজীর অন্ধভক্ত না হইয়া যাহারা স্বামীজীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ তাঁহারা ইহাতে বিচলিত হইবেন না, ইহা জানিয়া আমরা [illegible]কে এইরূপ আলোচনা করিয়া থাকি।

প্লাবিত করিয়া ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিয়াছে, আমরা উহারই সঙ্গে সঙ্গে নীরবে দেশের সর্ব্বত্র যোগশিক্ষার অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপন করিতে চাই—যোগশিক্ষার নাম শুনিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না, ইহা আসন প্রাণায়াম রেচক কুম্ভক প্রভৃতি পতঞ্জলির কোনরূপ প্রক্রিয়া বিশেষ। আমাদের যোগ জীবন লইয়া শিক্ষার যে উদ্দেশ্য জ্ঞান প্রেম ও শক্তিকে জাগ্রত করা উদ্দ্যাপিত করা, আমরা শিশুকাল হইতে সেই শিক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে চাই। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্রই আমার সম্মুখে, অতীত বড় ম্লান—উহা কালের আঁধারে ডুবিতে বসিয়াছে, ডুবিয়া যাউক, বর্ত্তমান ভবিষ্যত গঠনের ক্ষেত্রস্বরূপ, সেইজন্য বর্ত্তমানকে দোহন করিয়াই ভবিষ্যতের কনকসৃষ্টি সম্ভব করিতে হইবে। এই বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল চিত্র অর্পিত তাহার সব দেয়টুকু কি নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিবে না? আমি ভিক্ষাপাত্র হস্তে তাহারই জন্য আসিয়াছি। অতীতের নন্দনী যাঁহাদের গলায় দৃঢ় হইয়া বসিয়াছে তাঁহাদের আসন্ন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—বর্ত্তমানে যাঁহারা বিধাতার বজ্র মাথা পাতিয়া সহ্য করিতেছেন তাঁহারাও মরিবেন, তবে ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের যে দান তাহা দিয়া যাইতে কুণ্ঠা বা কৃপণতা করিলে চিরদিনই আমাদের আঁধারে থাকিতে হইবে।

এই মরা অধঃপতিত জাতির শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য দেশে যে উত্তেজনা আসিয়াছে ইহা মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অতঃপর সকল কাজই যাহাতে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, একটী নিশ্বাস বা একটী—মুহূর্ত্তও যাহাতে ব্যর্থ না হয় তাহাই করিতে হইবে।

কাজকে বড় করিলে চলিবে না। জীবনকে ঋতময় করাই দরকার, বর্ত্তমান মানুষের মধ্যে এত পুঞ্জীভূত অশুদ্ধতা জমিয়াছে—আকস্মিক কোন দৈব কারণ না ঘটিলে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপাদান হইয়া উহার কায়া করিতে পারিবে না। এইজন্য আমরা ভবিষ্যতের উপরই অধিক আশা করি উচ্চ শিক্ষার অপেক্ষা দেশের অষ্টমবর্ষীয় বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থার দিকে আমরা অধিক মনোযোগ দিয়াছি।

কর্ম্মী পাইয়াছি অসংখ্য। পঞ্চদশবর্ষ ব্যাপী কঠোর সাধনায়—সাধক মিলিয়াছে, জীবন প্রকাশের ক্ষেত্র চাই, সেইজন্যই আমরা দেশের আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছি, মোটামুটি যাহা করিতে চাই তাহাই বলিব, আশা আছে দেশ বধির হইয়া বসিয়া থাকিবে না—যথাবীতি সাহায্য আমি পাইব।

বাহিরের কাজ তখনই শত বাধাবিঘ্ন অবিরত প্রকাশ পায় যখন উহা হয় মানবজীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এই জীবন গঠনের জন্য স্থায়ীভাবে শিক্ষাকেন্দ্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রতি বিদ্যাপীঠের পশ্চাতে বিস্তৃত কৃষির ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের মালার বিদ্যাপীঠের অটল ভিত্তি এই প্রণালী অনুসারেই সংসিদ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন জেলায় এইরূপ ভাবেই কার্য্য আরম্ভ করিতে চাই।

এইজন্য চাই—আত্মজ্ঞানসিদ্ধ যোগী যাঁহারা শিক্ষক হইবেন। অষ্টমবর্ষীয় ছেলেদের পড়াইবার জন্য সুযোগ্য শিক্ষক মিলে না কেননা জাতির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি মসীলিপ্ত, তাঁহারা বড় জোর বর্ত্তমানকেই বড় করিয়া ধরিতে চাহেন, আমরা কিন্তু সকলেই ভবিষ্যতের জন্য আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছি।

আর একদল লোক চাই—যাঁহারা এই বিদ্যাপীঠগুলির ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য, রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় বহিয়া মুক্ত মাঠে হলচালন করিবেন। জাতির উদ্ধার গলাবাজীতে হয় না, কঠোর সাধনার প্রয়োজন। আমরা এইভাবেই ক্ষুদ্র আকারে কর্ম্মসিদ্ধি পাইয়াছি, দেশের সহায়তা পাইলে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে নূতন শিক্ষায় নূতন কর্ম্মে দেশ ছাইয়া ফেলিব। কে

দেশ—তোমাদের প্রসন্নদৃষ্টি কি আমাদের দিকে নিপতিত হইবে না।

কৃষিজাত শস্য হইবে নবসঙ্ঘের জীবনরক্ষার উপায়। কৃষিজাত কার্পাসে সঙ্ঘের বস্ত্রসমস্যা দূরীভূত হইবে, নূতন জাতির জীবন প্রকাশের লক্ষণ হইবে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি। জাতিকে গড়িয়া তোলাই উপস্থিত আমাদের একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়া এই সকলেরই একটা ছাঁচ নির্ম্মাণ হইয়াছে—অতঃপর ইহার বিস্তৃত আকার দিবার জন্য চাই অর্থ, তিন বৎসরের জন্য সহস্র লোকের নিকট একশত টাকা ঋণ চাহিতেছি—দেশ কি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই একশত টাকা 'প্রবর্ত্তক" পাঠকগণের দশজন মিলিয়া দিতে পারেন, ইহাও মিলনের একটা উপায় স্বরূপ হইবে, এবং আমরাও ঋণস্বরূপ এই অর্থ লইতেছি উহাও আত্ম শুদ্ধির কারণ, কেননা দান হিসাবে যে টাকা দেশ হইতে সংগৃহীত হয়, তাহার অপচয় হয় যথেষ্ট। ইহার কারণ হইতেছে বাঙ্গালী চিরদিনই ভাবপ্রবণ - কর্ম্মসৃষ্টির যে নিগূঢ় নীতি সেটিকে উপেক্ষা করিয়া চলা, নয় টাকা হিসাবে সুদের জমা খরচ রাখিয়া কার্য্য করিতে করিতে দায়িত্ববোধটী অধিকভাবেই জাগ্রত হইবে, অর্থ বার্থ ব্যয় হইবার সম্ভাবনা কম থাকিবে।

অনেকেই একশত টাকা দিতে অসমর্থ এবং দশজনে মিলিতেও সক্ষম নহেন, তাঁহারা বলেন—অংশ কিছু কম হইলে এবং উহার সুদ পাইলে তাঁহারা ঋণ দিতে পারেন, এইজন্য আমরা প্রতি পচিশ টাকার সুদ দিতে মনস্থ করিয়াছি। দেশের কাজে দেশের সহায়তা চাই দেশ যদি ইহাতে উদাসীন থাকেন তাহা হইলে—কোন কাজই কৃতকার্য্য হইবে না, এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে—মানুষকে কিছুই দিতে হইতেছে না। মাত্র তিন বৎসরের জন্য এই বৃহৎ কর্ম্ম সাধনের উপকরণ স্বরূপ ঋণদানে তাঁহারা সাহায্য করিবেন, ইহাও কি অসম্ভব কথা।

অনেকে বলেন—বহুবার পীন খাইতে চূণে মুখ পুড়িয়াছে কাজেই বিশ্বাস হয় না, এক্ষেত্রে সে কথা নিরর্থক কেননা আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যে লক্ষাধিক টাকা খাটিতেছে এবং ঋণ যথারীতি কাগজে সহি করিয়া লওয়া হইতেছে। শূন্য হস্তে দেশের নিকট ঋণ ভিক্ষা করি নাই—অতঃপর যদি কোন কথা থাকে—আমরা নীরব রহিব।

হায় মা—চিরদিনই কি বালকের মত কাঁদিব আর তোমার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া মরিব, তোমার কোলে ভবিষ্যতের নির্ম্মাণ বীজ এখনও স্তূপাকার রহিয়াছে, উহার প্রতি অঙ্কুরটীকে বৃহৎ করিবার—এই সাধনার জন্য কেবল প্রতীক স্বরূপ অর্থ ভিক্ষা চাই। তোমার ঋণ তোমারই থাকিবে—আমরা কেবল জীবন সার্থক করিব—আমাদের জীবন দিয়া তুমি রাজরাজেশ্বরী বেশে জগৎ ধন্য করিবে। এই সোনার স্বপ্ন কি মিথ্যা হইবে—আমার কোন স্বপ্ন ত কোন দিন মিথ্যা কর নাই মা—আজও তোমার মঙ্গল হাস্যে আমার প্রাণ মন পুলকিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—আকুল কণ্ঠে তোমার চরণে মাথা নত করিয়া একবার বলিতে দাও—বন্দেমাতরম।

যায়। দেবশিল্পী স্বর্গ হইতে নামে। কবির গান বেদনার ভরা— তার আরাধ্যকে না পাইয়া। দেবতার গান আনন্দের উচ্ছ্বাস সে তাকে পাইয়া পাইয়াই চলিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মী চলে কেবল কর্ম্মের তাড়নায়।

পুরুষ ও নারী

কারণে পুরুষ ও নারী ছিল না। আত্মা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণার্থ অবতরণ করে, স্বর্গ মর্ত্ত্যের দ্বারদেশ অধিষ্ঠিতা দেবী অগ্নিশিখা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। দ্বিখণ্ডিত আত্মা পুরুষ ও স্ত্রীরূপে দুই স্থানে জন্ম গ্রহণ করে। এই দ্বিখণ্ডিত আত্মার মিলনপ্রচেষ্টা জগতে প্রেমের জন্মদান করিয়াছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এইরূপ রূপক ছলে স্ত্রী ও পুরুষের একত্ব এবং উভয়ের যে অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ, তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর স্ত্রী পুরুষবাদের রূপকটি রূপক হইলেও ইহার মধ্যে একটি অব্যক্ত সত্য নিহিত আছে।

পুরুষ নারী অপেক্ষা বলবান।

সাধনগুণে নারী পুরুষ অপেক্ষা শক্তিশালিনী।

প্রাণে পুরুষ অধিকতর মুক্ত।

চিত্ত নারীর অধিকতর বেগবতী।

মানসিক শক্তি পুরুষের পূর্ণতর।

প্রেরণায় (Mental Intuition) নারী উচ্চে অবস্থিতা।

পুরুষ জ্ঞানময়।

নারী শক্তিস্বরূপিনী।

পরম পুরুষ সকলের আদি ও পিতা।

পরম পুরুষ বিজ্ঞানময়।

বিজ্ঞানে স্ত্রী পুরুষ নাই।

* * *

মানব আধারে পুরুষের যে অঙ্গটি অধিকতর বিকশিত ও পূর্ণ, নারীর সেই অঙ্গটি অল্প বিকশিত ও স্বভাবতঃ অপূর্ণ।

পুরুষ যে দেহে প্রবল নারী তাহার পরবর্ত্তী দেহে প্রবলতর।

নারীর শিক্ষা পুরুষ হইতে ভিন্ন নারীর শিক্ষা চিত্তে ও প্রেরণায় কবিতায় ও শিল্পে।

পুরুষের শিক্ষা বুদ্ধি ও জ্ঞানে— বিজ্ঞান ও দর্শনে।

* * *

নারী হইতে ভিন্ন পুরুষ অপূর্ণ জীবন। পুরুষ হইতে ভিন্ন নারী অপূর্ণ জীবন। স্ত্রী ও পুরুষের যোগেই একটি সম্পূর্ণ ব্যষ্টি জীবনের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু পুরুষের ভিতর চিরদিনই প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিবে নারীত্ব।

নারীর জীবনে চিরদিনই থাকিয়া যাইবে প্রচ্ছন্ন পুরুষের ভাব

দাম্পত্য সম্ভাবনীয়তা

অতীতকালে পৃথিবীতে যে সব মহাত্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলেই মানসপুত্র। কিন্তু মানস প্রকরণে যাঁহাদের জন্ম সম্ভব হইয়াছে দৈহিক প্রকরণে তাঁহাদের জন্মদান অসম্ভব নহে।

দেহের মধ্যে যখন আত্মা জাগরিত হইবেন, যখন প্রতি রক্তবিন্দু আপনার সত্তা স্বতঃই অনুভব করিবে, তখনই এইরূপ অধ্যাত্ম জন্ম সম্ভব হইবে।

নব দাম্পত্যজীবনের ইহাই একটী আদর্শ সম্ভাবনীয়তা।

দশরথ ও কৌশল্যা এইরূপ দৈহিক প্রকরণে জ্ঞানতঃ রামচন্দ্রের জন্ম দিয়াছিলেন। বাসুদেব ও দেবকী এইরূপেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্ভব করিয়াছিলেন।

মহাশক্তি যখন আবির্ভূত হন সেইরূপ আত্মজ্ঞানীর

আধারই অবলম্বন করেন। একথা ভারতের অবিদিত নাই।

কিন্তু প্রথম যাঁরা ভাগবৎ অবতরণ ঘোষণা করিতে আবির্ভূত হন—যাঁরা বিশ্বপতির আগমনের অগ্রদূত—যাঁরা আসিয়া তাঁর আবির্ভাবোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলেন তাঁরা অধিকাংশই মানসপুত্র। প্রজাপতি দক্ষ হইতে 'জন' (দি ব্যাপটিষ্ট) চণ্ডীদাস বিবেকানন্দ ইঁহারা সকলেই এইরূপ ভবিষ্যের বার্ত্তাবাহক ভগবানের অগ্রদূত—মানসপুত্র।

কিন্তু জগতে আর একটী সম্ভাবনীয়তা আগতপ্রায় —তাহা দেবজন্ম।

অধ্যাত্ম পুরুষ কখনই দেবতা নহেন। তাঁহারা ভাগবৎ ইচ্ছার আধারগত মূর্ত্তি। ভাগবৎবাণীর প্রাণস্পর্শী স্বর, ভাঁগবৎ প্রেরণার পার্থিবরূপ।

অধ্যাত্মপুরুষ ভাব কিন্তু দেবতা কর্ম্ম।

অধ্যাত্মপুরুষ প্রেম কিন্তু দেবতা সমাজ।

অধ্যাত্মপুরুষ বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ কিন্তু দেবতা রামচন্দ্র।

অধ্যাত্মপুরুষ রামদাস দেবতা শিবাজী।

অধ্যাত্মপুরুষ দিতি দেবতা ইন্দ্র।

অধ্যাত্মপুরুষ কৃষক দেবতা ধান্য।

অধ্যাত্মপুরুষ মাতা দেবতা সন্তান। কিন্তু অধ্যাত্ম-পুরুষেরও দেবতা হইবার সম্ভাবনা আছে।

আপনাকে নিয়তই অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম-পুরুষ যোগবলে দেবতা হইতে পারেন। তবে তাঁহাদের দেবজন্ম দিবার সম্ভাবনীয়তাই অধিক।

* * *

তিনি এক অত্যদ্ভুত নারী।

তিনি এক অত্যদ্ভুত পুরুষ।

যাঁহারা দেবজন্মকে ধরায় সম্ভব করিয়া তুলিবেন।

দেবতা হইবেন ভগবান স্বয়ং।

* * *

যে সকল অধ্যাত্মপুরুষ বিবাহ করিবেন তাঁহারা এই দেবজন্মের সহায়।

যে সকল অধ্যাত্মপুরুষ বিবাহ করিবেন না তাঁহারাও সমভাবে এই দেবজন্মের সহায়—তাঁহারাই দেবজন্মের কবি।

এতাবৎ পুরুষেই দেবজন্মের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

এতাবৎ পুরুষেই দেবজন্মের জন্য সাধনা করিয়াছে।

এতাবৎ পুরুষ ও নারী একত্রে দেবজন্মের সাধনা করে নাই।

দেবজন্মের জন্য স্ত্রী পুরুষ সংযোগ এতাবৎ হয় নাই।

স্ত্রী যাঁহারা সাধনা করিয়াছেন সব একাকিনী।

* * *

একটী দেবজন্ম পৃথিবীতে সম্ভব হইলেই আর সকলের পক্ষে দেবজন্ম লাভ সহজ হইবে—তবে প্রথম অধ্যাত্মপুরুষগণই দেবজন্ম লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহারাই প্রথম ফলভোক্তা।

দেবজন্মে ভগবান মানুষাকৃতি পাইবেন। তাহা হইবে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃজন। ইহাই নব দাম্পত্য-জীবনের সর্ব্বশেষ সম্ভাবনীয়তা।

* * *

কাজের কথা

আমাদের ছেলেরা যারা দেশ সেবার জন্য আজ এতটা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, তারা যে কথাটি ঠিক বুঝতে পাচ্ছে না, তা এই যে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় না। তারা মানতে চায় না যে দেশটাকে উদ্ধার করতে খুব দেরী লাগে, তাদের বিশ্বাস এমন একটা পথ আছে যেটা ধরলেই সাত মাসে কেন সাত দিনে কি সাত ঘণ্টায় স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং আস্তে আস্তের দেরীর পথ যদি তাদেরকে বাৎলে দেওয়া যায় তবে তারা ওঠে চটে, বলে ও রকম আস্তে আস্তে যদি চলতে চাও তবে শেষ পৌঁছ বার আগেই দেশটা লোপ পেয়ে বসে থাক্‌বে আর সোজাপথ থাক্‌তে এমন বাঁকা পথে চলে কোন্ মূর্খে।

কিন্তু আসল কথাটিই ত এই, সোজাপথ বাস্তবিক আছে কি ? আমাদের মনে হয় সোজা যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হাওয়ার পথ, এই মাটির শরীর নিয়ে, পৃথিবীর টানকে নাকচ করে সে পথে মানুষের চলা সম্ভব নয়। আজ যদি ত্রিশ কোটী ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা চরকাও না কাটে শুধু চুপটি করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে, তবে স্বরাজ বল মোক্ষ বল সব পেয়ে যেতে পারি, স্বীকার করলেম। কিন্তু এই ছোট্ট 'যদি' টাই যে সব নষ্টের গোড়া। "যদি লোকে এ পথে চলে"—কিন্তু দেখ্‌তে হবে বাস্তবিক লোকে সে পথে চলে কি না, চলতে পারে, পারলে কতজন চলে।

মানুষের প্রাণের এটা একটা স্বভাব—যখন বসে ঝিমিয়ে থাকে তখন তার মনে হয় তার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়, কিন্তু যেই একটু সে জেগে ওঠে, তখনই সে বিশ্বাস করে, [illegible] সে পরমুহূর্তে বিশ্বটাকে ধরে সে উল্টিয়ে ফেল্‌তে পারে। তামসিকতার আতিশয্য নিয়ে চলে রাজসিকতার আতিশয্যে। আমরাও একদিন ঘুমিয়ে ছিলেম, স্বপ্নে কি একটা হঠাৎ দেখে জেগে পড়লেম আর মনে হ'ল শৃঙ্খলিতা ভারতমাতাকে মুক্ত করতে হবে, যেই মনে হওয়া অমনি কাজে লেগে যাওয়া, এই ধারণা নিয়ে যে পাঁচ বচ্ছরেই সব কর্ম্ম হয়ে যাবে। তবুও আমরা পদে ছিলাম, এক বচ্ছর বলতে সাহস করি নাই। পাঁচ বচ্ছর ছাড়া পনের বচ্ছর চলে গেল, কিন্তু দিল্লী যে এখনও দূরে, আরও পনের বচ্ছর লাগবে কি না কে জানে ?

আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাই বুঝ্‌তে পেরেছি যে কাজের পথ বড়ই ঘোরালো, বড়ই আস্তে আস্তে চলে। বরং এইটেই সত্য যে, যে যত তাড়াতাড়ি পথ ফুরিয়ে দিতে চায় তার পথ চলা তত দীর্ঘ হয়ে পড়ে, আর যে চলে লক্ষ্যটি ঠিক রেখে দেখে শুনে তার পথ আপনা হতেই খাট হয়ে আসে। যখন আমরা সাতমাসেই স্বরাজ পেতে ব্যস্ত, তখন তার অর্থ স্বরাজ কি বস্তু আমরা বুঝি না, স্বরাজ পাওয়াটা আমাদের কাছে ততখানি সত্য নয়, যতখানি সত্য বর্ত্তমান অবস্থার একটা যা হোক পরিবর্ত্তন অথবা খুব খানিকটা নড়াচড়া, আলোড়ন বিলোড়ন।

প্রশ্নটা মোটেও সময় নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে কাজ নিয়ে। কতখানি সময় তুমি নিয়েছ তাতে কিছু আসে যায় না, আসে যায় তুমি কি কাজ করেছ— কতখানি কাজও বল্‌ব না, বল্‌ব কি ধরণের কাজ তুমি করেছ তা নিয়ে। ছুটাছুটি করে, মিটিং করে, দৌড়াদৌড়ি করে তাড়াতাড়ি, একটা অতিকায় বস্তু

এ কথা যদি বুঝ্‌তে পারতেম যে আমাদের ছেলেরা আপাততঃ কিছু গড়্‌তে চায় না, চায় শুধু ভাঙ্‌তে, একটা বিরাট গোলমাল বা বিপ্লব ঘটাতে তবে স্বীকার করতেম্ তারা যে পথে চলেছে, সেটা উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঠিক পথই। কিন্তু সে কথা ত কেউ বলছে না, বল্‌তে চাচ্ছে না। সবাই বলছে, চাচ্ছে একটা কিছু পাকা জিনিষ গড়ে তুল্‌তে—এ সিদ্ধির জন্য চাই কিন্তু অন্য রকম সাধনা। হাটের লোককে, জনতাকে চাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে খুব কষ্ট করতে হয় না। ক্ষণিকের জন্য একটা বিশেষ কাজে জনসংঘকে খুব লাগিয়ে দেওয়া যায়। কারণ জনসংঘ স্থির বুদ্ধি দিয়ে চলে না, তাদের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই, দূর ভবিষ্যতের আদর্শ নাই, তারা চলে ভাবের আবেগে, প্রাণের উত্তেজনায়; কিন্তু ওজিনিসটা ত টেঁকে না—আজ সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ করছে, কাল ঠিক তার স্বপক্ষে কাঁচা মাথাটা দিতে কোনই দৃকপাত সে করবে না। তারপর হাটের মাঝে তোমার কথায় মেতে গিয়ে খুব বাহবা দিয়ে যেই ঘরে ফিরবে, অমনি সব ভুলে যার যার মত আপন পূর্ব্বাভ্যস্ত কাজই করতে থাকবে। সহজ ভাবে তারা তোমার কাজ করতে পারে না, তাদেকে মাতাল করে দেওয়া দরকার। দেশবন্ধু দাশের আত্মোৎসর্গ দেখে ছেলেরা দলে দলে ক্ষেপে গিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল—কিন্তু আস্তে আস্তে সে নেশা যেই ছুটতে আরম্ভ করল, দরকার হল তৎক্ষণাৎ মহাত্মা গান্ধীকে ডেকে এনে তাঁর পেয়ালা ছেলেদের মধ্যে ঢেলে দিতে। মহাত্মা গান্ধী চলে গেছেন, ছেলেরাও আবার ঝিমিয়ে পড়্‌ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় সময় তিনি নাকি আবার পেয়ালাভরা নেশা নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। এই ত আমাদের কাজের নমুনা। যে কাজটা করতে চাই সেটা যে অন্তরের ব্যাপার, কত বড় [illegible] এর চেয়ে আর বেশী প্রমাণ আর কি চাই?

আন্দোলনের, ছুটাছুটির, হৈ চৈ'র রবে একটা সুফল আছে তা আমরা স্বীকার করি—এতে যে দেশের শক্তি বৃথা নষ্ট হয়, তা'ও না হয় নাই মানলেম, কারণ, দেশ-শক্তির ব্যবসাদারী বুদ্ধি নাই, আমাদের বুদ্ধির মাপাজোখা ঠিক ঠিক পথে সে চলে না, তার ভাণ্ডার অফুরন্ত অজস্র। দেশের এক দল লোক থাকবেই বোধ হয় যারা এ রকম কাজ ছাড়া অন্য কাজের উপযুক্ত নয়—এরা হচ্ছে safety valve, এদের ভিতর দিয়ে দেশের আবদ্ধ উগ্র চঞ্চল রজঃশক্তি বেরিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে। এ সব কথা সত্য হতে পারে; কিন্তু আমরা চাচ্ছি আর এক ধরণের লোক, যাদের দৃষ্টি আরও দূরে ও গভীরে, যাদের ভিতর দিয়ে দেশের স্থিতধী আত্মস্থ-শক্তি ফুটে উঠ্‌তে পারে।

আমরা কি বলতে চাই? আমরা বলতে চাই, যে যেখানে আছ বা থাক্‌তে পার প্রতিষ্ঠা কর সেখানে তোমার সহজ স্বাভাবিক জীবন। একদল পলিটিক্যাল বা দেশভক্ত সন্ন্যাসী দেশে যদি নিতান্তই ছড়িয়ে পড়ে পড়ুক; কিন্তু আমরা চাই দেশভক্ত, শুধু দেশভক্ত নয় মানুষের মত মানুষ—মানুষের মত মানুষ হলে, তারা দেশভক্ত আপনা থেকেই হয়ে উঠবে—গৃহস্থের শ্রেণী। হাওয়ায় উড়ে উড়ে চল্‌লে মিলবে হাওয়ার স্বরাজ; মাটির বাস্তব স্বরাজ পেতে হলে, গড়তে হবে মাটির বাস্তব গৃহ সব—যেখানে স্বরাজ দানা বেঁধে উঠ্‌তে পারে। এক একটি গৃহ হবে এক একটি খণ্ড স্বরাজ, গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি হবে স্বারাজ্যের প্রতিমূর্ত্তি—তবেই না এমন সব গৃহ মিলে হবে দেশগত স্বরাজ, শুধু দেশগত নয় তখনই প্রতিষ্ঠা হবে মানব-জাতিগত স্বরাজের। প্রত্যেক গৃহ আপন ভরণপোষণের জন্য আপনভার বন্দোবস্ত করবে—গৃহের ব্যক্তিরাও সেই উদ্দেশ্যে নিজের নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্য ফুটিয়ে [illegible] নিয়োগ করবে। শুধু অর্থ সমস্যা নয় [illegible]

করবে তার শিক্ষার সমস্যা, তার সামাজিক সম্বন্ধের সমস্যা আর সবকের উপরে একটা দীক্ষা, একটা অন্তরাত্মার ভাগবৎ সত্তার উদ্বোধনের সমস্যা। এই রকম গৃহ বা সংঘ বা চক্র সমাজের মধ্যে আমরা যত গড়ে তুলতে পারব, একটা পূর্ণ অখণ্ড অনবদ্য জীবনের যত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারব, ততই আমাদের কাজটি অব্যর্থ অটুট হয়ে দাঁড়াবে, জগতের সম্মুখে ধরবে একটা জীবন্ত আদর্শ। বাষ্ট্রীয় সমস্যা পূরণের জন্য আলাদা কিছু বন্দোবস্ত করতে হবে না। এই সব কেন্দ্রই হয়ে উঠবে রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যের এক একটি স্তম্ভ। আজকালকার যুগে যেমন চাকরে (mercinary) সৈন্য দিয়ে আর কাজ চলে না, আজকালকার প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত দেশটাকে একটা নিরেট সৈন্যদলে পরিণত করা (a nation in arms), সেই রকম দু চারজন—এমন কি শত সহস্র লোকও নন্‌কো অপারেট করে সার দিয়ে দাঁড়ালে চলবে না, দেশের মুক্তি বা শ্রীবৃদ্ধি হবে না, আমাদের চাই ঘরে ঘরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে, ভিতরকার একটা নিরেট মুক্তি ও ঋদ্ধি নিয়ে দাঁড়ান —তা যদি করতে পারি, তবে বাইরের বন্ধন বা প্রতিবন্ধক যেটা আজ এত বড করে চোখে দেখ্‌ছি, সেটা অত বড় বা বিভীষিকাময় বলে মোটেও বোধ হবে না, কি প্রমাণিত হবে না।

মহাত্মা গান্ধী ও Soul-force, অন্তরাত্মার বলেরই কথা বলছেন। কিন্তু সেই অন্তরাত্মার বল ফুটিয়ে তোলবার জন্যে যে কেবল খিলাফৎ আর পাঞ্জাব অত্যাচারকেই সম্মুখে সদা সর্ব্বদা জাগিয়ে ধরে রাখ্‌তে হবে এমন কোন কথা নেই। ও সব বাইরের অজুহাতের দিকে না তাকিয়ে, দেখ নিজের দিকে দেখ নিজের জীবনে, নিজের চারিদিকে স্বজনের স্বতীর্থের জীবনে সেই অন্তরাত্মার বল কতখানি কি ভাবে বিকশিত করে তুলেছ। অন্তরাত্মার বল দিয়ে যদি কাজ করতে চাও, তবে মনে রেখো সে কাজ হবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে অন্ততঃ প্রথম প্রথম। সে জন্য ব্যস্ত অধীর নিরুৎসাহ হলে চলবে না।

অবশ্য যারা Soul-force মানে না, যারা জানে কেবল বাহুবল, ভারতে স্বরাজস্থাপনের উদ্দেশ্য যাদের ভারতকে আর একটা জর্ম্মণী বা ইংলণ্ড করে তৈরী করা, তাদের কথা আলাদা। নন্‌কো-অপারেশন যদি তাঁদের "স্বর্ণ সুযোগ" এনে দিয়ে থাকে, তবে আমাদের কিছু বলবার নেই। কারণ আমাদের পথ আলাদা, আমাদের সাধনা ভিন্ন, আমাদের লক্ষ্য পৃথক, সেই অনুসারেই আমাদের কাজের কথা আমরা বলছিলেম।

অরবিন্দ মন্দিরে

(১)

বোধ হয় এতক্ষণ আপনারা ওখানে বিদ্যাপীঠে সংঘের নূতন বাণী ঘোষণা শেষ ক'রে ব'সে আছেন—হয়ত এখনও আরপ্রসঙ্গ চলছে, এতদূর থেকে এ সব কথা কল্পনায় স্মরণ কর্‌তেও সুখ আছে। অরোকে ব'লছিলাম এই একটু আগে, যে, এতক্ষণ বোধ হয় আমাদের চন্দননগরে সাপ্তাহিক সংঘ সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হচ্ছে।

আজকার একটু কথোপকথন উদ্ধৃত করি। একটু মজা আছে। অন্য সকলে চ'লে গেলে একলা পেয়ে তাঁকে জ্ঞাপন করলাম "আপনি বলেন বাংলায় কর্ম্ম ও ভক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে—জ্ঞানের অভাব, উহা পূর্ণ ক'রে তুলুন।

অরো—জ্ঞানের অভাব মানে, একটা বিশাল ব্যাপক universal conciousnessএ আত্মস্থাপনা চাই- সংঘের মধ্যে একেবারে free না হউক, প্রচুর ভাবেই free শক্তির খেলা আর খুব intense ভাবের প্রকাশ আছে, সেই শক্তি আর ভাবের ধারা ধরিয়াই উপরে উপরে গতি চ'লছে, একটা free ও flexible জ্ঞানের নিজস্ব খেলা native power of knowledge হ'লে বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ সুন্দর হ'য়ে উঠে।

আমি—জ্ঞানের এই native powerএর একটা অভাব থাকতে পারে বুঝতে পারছি—কিন্তু সে বইটই প'ড়ে হবে না আপনাকেই তা সুসিদ্ধ ক'রে তুলতে হবে, আমরা consecration আর communal consciousness খুব সুদৃঢ় ও পাকা ক'রে পেয়েছি।

অরো সংঘের মধ্যে * * * * ছাড়া এই জিনিসটা এখনও আর কারু মধ্যে পূর্ণস্ফুট হ'য়ে উঠে নি। ব্রহ্ম consciousnessএর মধ্যে বিশেষ বিশেষ দেবত্ব তোমাদের মধ্যে রয়েছে potential শক্তির মধ্যে জ্ঞানের মধ্যে উহার জ্ঞানময় formation হবে। * * * * মধ্যে (মাথার উপর দেখাইয়া) এইখানে সেটা form হয়েছে এইবার শরীরী ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রছে।

আমি—সবই তো আপনার উপর ভার

অরো—ক্রমশঃ হবে—

তখনকার মত কথাটা শেষ ক'রতে হলো—সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল। আমি এখানে এসে সব জিনিষই accept ক'রে নিচ্ছি। এইটাই দরকার। আমি দেখছি, সংঘের প্রতিষ্ঠা খুব grand রকমে হয়েছে—ভাবে, এই ভাবের চোখে এবং শক্তির মধ্যে আমরা যে potential তেজোমূর্ত্তি পেয়েছি, তার উপর একটা উপরকার বিশাল জ্ঞানজ্যোতিঃ ফেলে এবার আত্মদর্শন করবার আমাদের সময় এসেছে।

* * *

শিক্ষা সম্বন্ধে ব'লছিলেন mass of booksএর নীচে ছেলেদের না ফেলা হয়। বই প্রথমে একেবারেই না থাকা ভাল, কেবল নানা রকম observation ও interest জাগান—শিক্ষাক্ষেত্রটি যতটা পারা যায় আনন্দের ক্ষেত্র ক'রতে হবে। ছেলেদের free growth of original faculties হোক; তারপর যখন প্রত্যক্ষ পরিচালনা ফলে মনোবৃত্তি গুলি স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে, তখন যার যে দিকে taste সেই অনুযায়ী বই পড়তে দেওয়া। আর গবর্ণমেণ্টের মত একটা বিশেষ pattern, যেমন efficient citizen গড়া, এরূপ কোন কিছু আমাদের education এ থাকবে না—যার কাছে ভগবান যা চান, তার ভিতর সেইটাই ফুটে উঠুক। moral educationএর text একেবারেই নয়। সত্যানুরাগ, প্রেম, nobleness, strength—এই কয়টা হৃদয় বৃত্তি প্রকৃত পক্ষে জাগাইবার আছে—জীবনের atmosphere এতেই তা ফুটে উঠ্‌তে দিতে হবে।

এইবার সাধনার কথা আরম্ভ করলেন—মনের স্তর এবং উহার অবস্থার কথা। শেষ স্তরে Supermind, সেইখানেই অধ্যাত্ম রাজ্যে দেবরূপ গঠন ক'রতে হবে—বৈদিক ঋষি যেমন নিজ চিৎলোকে দেবতার জন্মদান করিতেন। এইটাই আমাদের গুরুতর কাজ—চেতনায় দেবসৃষ্টি। সাধারণতঃ আমরা যে অবস্থায় থাকি সেটা mind of ignorance, সে মন প্রাণ কেন্দ্র ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

এখানে আমরা কিছুই জানি না, জানিবার ক্ষীণ চেষ্টা-পরম্পরা মাত্র এখানে সম্ভবপর। আছে আর এক মন mind of self forgetful knowledge, সেখানে জ্ঞান সত্যকে যেন পাই আভাসে আভাসে, যেন হারানো নিধি, ভোলা জিনিস সব বাহিরের আঘাতে অথবা ভিতরের উদ্দীপনার পর্দায় পর্দায় জাগিয়া উঠিতেছে, স্বতঃ পথে আসিয়া ধরা দিতেছে Plato'র যে theory ছিল—all knowledge is but a remembrance of forgotten things সাধকের প্রথম পরিচয় এই মনের সঙ্গে। বিবেকানন্দের highly developed intuitive mind এই মনের উচ্চ পর্দায় দাঁড়াইয়াই থাকি যাবিয়াছে। Mind of knowledge তার উপরের স্তরে, যাহা ঠাকুরের ছিল—সেখানে জ্ঞানের জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে বাস—সাক্ষা দীপ্ত জ্ঞানরাজ্য। ইহার উর্দ্ধে ঠাকুর গেলে আর কথা ব'লতে পারতেন না, ব'লতেন আর বলা যায় না। মা সে সময় তাঁকে এখানে রেখে'ছিলেন।

সংক্ষেপে উক্তি যা যেমন শুনলাম তেমন লিখে গেলাম। খানিক স্তব্ধ থেকে আবার ব'ললেন ভিতরের দোরগুলি খোলবার একটা গূঢ় কৌশল আছে—art of opening up, সেইটুকুই শক্ত, সেইটা হ'লে আর সব হুর হুর ক'রে উঠতে থাকে। তিনি বলেন লেলের কাছে এই কৌশল পেয়েছিলেন, তবে তাঁর নিজের একটা প্রবল will ছিল।

* * *

তারপর Psychic experience সম্বন্ধের কথা। আমি ব'ললুম ও সব কেন সোজাসুজি spirituality'ই ভাল। বাংলায় ঐ সব নিয়ে কি বুজরুকি যদি দেখেন।

তিনি ব'ললেন—ও সব আছে। জেলে ঐ সব গুলা খুব দেখতুম। প্রথম প্রথম অনেক ভুল ভ্রান্তি delusionও আসত, জানতুম না কোনটা ভুল, কোনটি সত্য, অনেক সময় ভুলের উপরই বড় build ক'রতাম, শেষে এক ধাক্কায় সব ভেঙ্গে দিত এর জন্য ভগবানকে কি গালাগালিই না দিতাম। তবে রক্ষা ছিল একটা sceptic ভিতরে ছিল, critical mind বাহিরের প্রমাণ খুঁজিত। এই psychical fieldটাকে পরে এখানে সাধনকালে সব suppress ক'রেছিলাম। তাতে এখন এরকম বড় অসুবিধা বোধ হ'চ্ছে। আমার thought সব স্থির হ'য়ে গেছে, সেখানে supermental দিব্য খেলেছে, কিন্তু supermentalকে যখন life এর দিকে ফেরাতে চাই মুস্কিলে প'ড়তে হয়, তখন mind of ignorance আবার rushes up to obstruct, এখন psychical জিনিষগুলাকে আবার টেনে আনবার দরকার হচ্ছে। Suppression মাত্রই খারাপ, একটা defect থাকেই আমাদের life এর সকল বৈচিত্র্য আলিঙ্গন করাই আদর্শ—life physical এবং psychical উভয়ই বাহিরে physical লইয়া থাকি psychicalও প্রকৃত হইবে, psychical field একটা field of experience।

২

সকল জিনিষের মধ্যে যে সব সত্য আছে, প্রকৃতির সবখানি ভরিয়া সিদ্ধি আমাদের চাই পরিশেষে বাহ্য শরীর পর্য্যন্ত। Supermind প্রথমে গড়িয়া উঠে মাথার উপরে, সেইখানেই সকল জ্ঞান, চিন্তা, ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত খুলিয়া কার্য্য করিতে থাকে—কিন্তু এইখানেই শুধু তাহাকে থাকিতে দিলে, আমরা উপরে উঠিয়া যতক্ষণ থাকিব, ততক্ষণই সব থাকিবে, এই জন্যই প্রাচীনেরা সমাধির উপর এতখানি ভর করিতেন—ঐ supermental energyটাকে প্রথমে psychic planeএ নামাইয়া আনিতে হয়,

সেখানে নূতন বস্তু ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সব সৃষ্টি হয়, সত্যই এ নবসৃষ্টি—ভিতরের ইন্দ্রিয় গুলি বাহিরের সাহায্য না লইয়াও দর্শন, স্পর্শন করে।

Conquest পূর্ণ ও substantial হবে না যতক্ষণ না শরীরটা পর্য্যন্ত রূপান্তর পায়, তার মানে শরীরের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হবে এমন নয় তবে functions সব বদলাইয়া যাইবে। তখন শরীর অমৃতময় হইবে, রোগ জরা রহিবে না। চক্ষু একটা প্রত্যক্ষ করে সেরূপ ভাবে আর প্রত্যক্ষ করিবে না একটা অখণ্ডের অসংখ্য form, রূপ, গুণ, play of forces and qualities নয়নে প্রতিভাত হবে। কর্ণ শ্রবণ করিবে প্রতি শব্দে একটা totality of sound, সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যঙ্গের ভিতরে এমন একটা intensity, innerness, totality থাকিয়া যায়—এই সাফল্য, অখণ্ডত্ব পূর্ণত্ব যে ঘটিতে পারে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বৈদিক যুগে ঋষি দেবগঠন করিতেন সে চিন্ময় সৃষ্টি। উপনিষদের যুগেও জ্ঞানীগণ জানিতেন—সবই, সমস্ত চৈতন্য ও জ্ঞান ভিতরে আছে, concentration পূর্ব্বক সেইগুলিই উদ্দীপ্ত করিতেন, পরম্পরে উপলব্ধ সত্য মিলাইয়া লইতেন, scientific apparatus তাহাদের ছিল না। জাবালীর পুত্র সত্যকামের গরু চরাইতে চরাইতে অনন্ত প্রকৃতির কোলে অন্তরের উৎস খুলিয়া গেল—সমস্ত মধুময় হইয়া উঠিল। পশুপক্ষী তরুলতা পর্য্যন্ত জ্ঞান দান করিতে লাগিল—দিক সকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল; ইহাই সনাতন জ্ঞান পথ, জ্ঞানের মুক্ত প্রণালী। আর আজিকার scientific ধারণা কি? যে, sense এর সঙ্গে object এর সাক্ষাতই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস—যাহা দেখি শুনি, যাহা অন্যে দেখে শুনে, যাহা পড়ি বুঝি সেইটুকুই জিনিষ ও মানুষ সম্বন্ধে জানা যায়, আর কিছু জানা যায় না। তবু নূতন চিন্তাবীরগণ আজ কাল আর একটা গুরুতর জ্ঞানাঙ্গের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—যেমন Bergson এর intuition, intuition এই অন্তরঙ্গ জ্ঞানেরই উদ্দীপ্ত করিবার শক্তি আভাস রশ্মি।

একটা curious observation এর কথা উল্লেখ করিয়া আজিকার মত বলা বন্ধ করিলেন—বলিলেন প্রতি নব ধর্ম্মতরঙ্গ তিনটী পুরুষে থাকিয়া যেন শুকাইয়া যায়—যেমন রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ, বাহিরের জগতেও বাহা ধর্ম্মে বাব, বাহাউল্লা, আবদুল বাহা।

এই নূতন যুগে কি দাঁড়াইবে সে কথা আপনার ভাবিবেন, আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র

—০—০—

এবার বরিশালের প্রাদেশিক সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। উপযুক্ত লোকই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাতৃযজ্ঞে বরিশাল দেশের প্রধান পুরোহিতকেই আহ্বান করিয়া থাকে। ১৯০৬ সালে বাঙ্গালীর "রাজা" সুরেন্দ্রনাথ তাহার আহ্বানে বরিশাল যাত্রা করিয়াছিলেন, আর ১৯২১ সালে বাঙ্গালীর রাজনীতিক সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের প্রধান নিদর্শন মনীষী বিপিনচন্দ্র প্রাদেশিক সভার

সভাপতি হইয়া বরিশালে গমন করিতেছেন। যোগ্য স্থানে যোগ্য ব্যক্তিরই আসন হইয়া থাকে

বিপিনচন্দ্র যোগ্য ব্যক্তি, বিপিনচন্দ্র স্বপ্নদর্শী স্বপ্নদর্শী চিন্তাবীর বিপিনচন্দ্রকে আমরা বিং শতাব্দীর প্রথম হইতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। জাতিগঠনের যতকিছু সম্মানজনক পদ সম্ভবপর আমরা হৃদয়ের আবেগে তাঁহাকে একটীর পর একটীতে অধিরূঢ় করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই। বলিতে কি আমরা প্রতিপদে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, কিন্তু দুইদিনপরে আমাদের নিকট তিনি তেমন নিবিড় সম্বন্ধ বজায় রাখিতে পারেন নাই। ইহাতে আমাদের কোন দুঃখ নাই বরং ইহার জন্য তিনি আমাদের নিকট একটী অস্পষ্ট ও মধুর ভাবময় মূর্ত্তি লইয়া অনুক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। অনেক বার আমরা তাঁহার উনবিংশ শতাব্দীর চরিত্রগাথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, বহুবার তাঁহার জীবনবেদ পাঠ করিবার প্রলোভন হইয়াছে, কিন্তু ভাসা ভাসা শুনা ও দেখা ভিন্ন আমরা অধিক পরিশ্রম করিতে অগ্রসর হই নাই। কেননা আমাদের আদর্শ বিপিনচন্দ্রকে আমরা আনার মাপে মাপিয়া লইতে ইচ্ছুক হই নাই।

জাতির যাঁহারা স্তম্ভ স্বরূপ, আমাদের মতে তাঁহাদের আত্মাকে স্পর্শ করিবার মত অধ্যবসায়ই আমাদের প্রথম আবশ্যক, বাহিরের বিবরণগুলি যদি কাহারও সে ক্ষেত্রে অন্তরায়স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বাহিরের বিবরণগুলি অনেক সময়ে আমাদিগের পথ সরল না করিয়া তাহাকে দুরূহই করিয়া তুলে। উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। কেশবচন্দ্রের জীবনের মূল সূত্রটী আবিষ্কার করা অতি কঠিন। যে কোন প্রকারেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক বাঙ্গালী যদি একবার তাহার প্রাচীন মূলটী মূলশুদ্ধই তুলিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্বভাবপ্রবণতা ও তাহার ক্ষিপ্রবুদ্ধি তাহাকে যে কোথায় নিক্ষেপ করিতে পারে তাহা অনুমান করা একরূপ অসম্ভব। কেশবচন্দ্র যেরূপ ক্ষিপ্রবেগে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন মাথায় করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের মূল সত্যাবিষ্কারে তাঁহার সরল অন্তঃকরণের প্রবল তৃষ্ণার কথা একেবারেই চাপা পড়িয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে অধিকাংশ পুস্তকাদি তাঁহাকে যেরূপে চিত্রিত করিয়াছে তাহা পাঠ করিলে ত তাঁহাকে উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্রের ক্ষিপ্র পরিবর্ত্তনে তাঁহার মানসিক অস্থিরতা ও তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির দম ভিন্ন তাহাতে যে তাঁহার আত্মার ব্যাকুলতাই অধিক ছিল তাহাই আমাদিগকে প্রথম দেখিতে হইবে। তৎপরে তাহার কার্য্যের সমালোচনা চলিতে পারে।

তদ্রূপ বিপিনচন্দ্রকে আমরা যদি তাঁহার বাহিরের কার্য্য ধরিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা তাঁহার জীবনসূত্র অনেক স্থানেই ছিন্ন দেখিতে পাইব। বিপিনচন্দ্র তেজস্বী বক্তা, বিপিনচন্দ্র নির্ভীক জননায়ক, কিন্তু বরিশালহাঙ্গামার সময়ে হিতবাদী বর্ণিত তাঁহার ব্যবহারের কথা না ধরিলেও লালা লাজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন সংবাদ শ্রবণেই তাঁহার দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সহজেই মনে এক সন্দেহের সঞ্চার করিয়া দেয়। সে সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছিল যখন তিনি বন্দেমাতরং পত্রের সাক্ষ্যকালে অসহযোগীতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করেন। জননায়ক ও দেশ বক্তাদিগের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিমাপ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বর্ণিত সংজ্ঞা ও উদাহরণের দ্বারা কখনই সুসম্পন্ন হয় না। মহাভারত ও রামায়ণের উদাহরণও এস্থলে প্রযুজ্য নহে, পাত্র ও কাল অনুযায়ী নীতির পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। জননায়ক ও দেশ বক্তাদিগের একটী প্রধান গুণ, সূক্ষ্মবুদ্ধিযোগে বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের

গতি নিরূপণ করা ও সম্ভবপর মীমাংসার সূত্র দেশকে ধরাইয়া দেওয়া। এই কার্য্যে সিদ্ধহস্ত সুবুদ্ধি বিপিনচন্দ্র শতবার কাপুরুষতার কার্য্য করিলেও দেশের মর্ম্মব্যাখ্যাতা হিসাবে আমরা কেহই তাঁহার আসন টলাইতে পারিব না। তাঁহার বুদ্ধির সহিত বিশেষতঃ তাহার রাজনীতিক বুদ্ধির সহিত পরিচিত না হইলে তাঁহার কুজ্ঝটিকাময় আন্তর সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করিতে পারিব না। বুদ্ধি কখন জাতির আন্তর দেবতার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না তজ্জন্যই তিনি আমাদের রাজনীতিক ঋষি নহেন, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি স্বদেশপ্রীতি ও শ্রদ্ধানিষ্ঠাসহকারে আমাদিগকে যে প্রদেশে লইয়া যায়, তাহার বাক্য আমাদের সেই কেন্দ্রস্থানে পৌছিলে সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিবেন।

এই দৃষ্টি দিয়া দেখিলে তিনি যখন বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন ও তাঁহার বিলাতে প্রকাশিত স্বরাজ পত্রের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাকে বোম্বাইএর বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইতে হয়, তখন বিচারালয়ে তিনি যে উক্তি প্রকাশ করেন তাহার মর্ম্ম যাহাই হউক তাহাতে আমাদের মনোযোগ দিবার কোনই আবশ্যক হয় না। তাঁহার হিন্দু রিভিউএর মধ্যে ভালর সহিত যতকিছু মন্দই মিশিয়া থাকুক তাহাতেও আমাদের ভ্রূক্ষেপ করিবার কিছুই থাকে না, কেন না বিপিনচন্দ্রের সহিত তখন আমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আসন আমরা জানিয়া লইয়াছি, অতএব তাঁহাকে কোন আদর্শের মূর্ত্ত দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তখন পূজাই সম্বন্ধের সূত্র ক্ষণে ক্ষণে অপহৃত হইবার আশঙ্কায় বিব্রত থাকিতে হয় না—আমার জন্য কে আর আদর্শের ছাঁচেই আবদ্ধ থাকিবে? সকলেই নিজ নিজ জীবন প্রকাশ করিতেছে বৈ ত নয়!

এই জীবনপ্রকাশের কথায় বর্ত্তমানে বিপিনচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল অবস্থার কারণ অবগত হওয়া যায়। জননায়কেরা সত্যসত্যই জাতির প্রতিভূস্বরূপ, তাঁহারা জাতির এক একটী দিক্‌পাল; এবং জাতির এক একটী গুণ সমষ্টি আকারে তাঁহাদের ভিতর প্রকাশ হইয়া থাকে। জাতি যখন যে ভাবে চলে সেইভাবের নায়কগণ তখন জাতির কর্ম্মবীর হন। মধ্যপন্থীদের প্রাচীন রাজনীতির জাল যখন জাতিকে ছিড়িতে হইয়াছিল তখন বিপিনচন্দ্রের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিককে আমরা শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছিলাম। এখনও যেখানে বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও স্পষ্টতা আবশ্যক, সেই সেই স্থানে বিপিনচন্দ্রের উক্তির যথেষ্ট মূল্য আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু জাতি এখন বুদ্ধির গণ্ডী কাটাইয়া তাহার নবভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সহজ প্রেরণার বশেই অগ্রসর হইতেছে, এ সময়ে বুদ্ধিমান যদি নিজকে হারাইয়া জাতির অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের—তাহা কোয়াসা মণ্ডিত হইলেও—একটা স্তম্ভ আবিষ্কারের জন্য সর্ব্বস্ব আহুতি দিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে জাতির নিকট তাঁহার স্থান নাই। জাতির এই অস্পষ্ট অথচ বিপুল অগ্রগমনের সময়ে ভাবপ্রবণ ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আত্মবিসর্জ্জন করিলে অতিশীঘ্র তাঁহার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ভাব ও শক্তি সহায়ে দেশের মর্ম্ম অধিকার করিতে পারেন, বুদ্ধিমানের কিছু বিলম্ব হয়। বর্ত্তমান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও মহাত্মাগান্ধীর যুগ কিন্তু বুদ্ধিমান অদ্ভুত নিষ্ঠাবলে জাতির সহিত, যুক্তের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন এবং দেশে সেইরূপ নেতার শীঘ্রই আবশ্যক হইবে। দেখি আমাদের বিপিনচন্দ্র সেই স্থান অধিকার করিতে পারেন কি না, এই আশা পোষণ করিয়াই আমরা এক্ষণে এইরূপ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

মানুষ সৃষ্টি

— ১০৬

দেশে দুর্ভিক্ষ আসে, মানুষ মনে করে— তার কারণ অজন্মা। আমরা কিন্তু উদরান্নের অভাবে দুর্ভিক্ষের উৎপত্তি, একথা অস্বীকার করি। সুজলা সুফলা মেদিনীর গর্ভে অসংখ্য কোটী মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের জীবনধারণোপযোগী প্রচুর খাদ্য ভগবান সংস্থিত রাখিয়াছেন - দয়াময়ের অপার করুণা একবিন্দু লাঘব হইবার নহে।

দুর্ভিক্ষ আসে মানুষের। মানুষ যেদিন ভুলিয়া যায় ভগবানের করুণা, অহঙ্কারের কণ্টকমুকুট মাথায় পরিয়া পৃথিবীর সিংহাসনে আপনাকে বড় বলিয়া ঘোষণা করে, বিধাতার বজ্রবিদ্রূপ বড় নির্ম্মমভাবেই তখন এই ভুল ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আসে মহামারী রাষ্ট্রবিপ্লব আর শোচনীয় দুর্ভিক্ষ।

য়ুরোপে মানুষ জন্মিয়াছিল -তাই দুস্তর কালাপাণি পার হইয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল আমেরিকা, আফ্রিকার গভীর অরণ্য কাটিয়া সুদৃশ্য নগর নির্ম্মাণ হইল, আসিয়ার ঐশ্বর্য্য ভারে ভারে নীত হইয়া য়ুরোপকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। য়ুরোপে প্রচারিত হইল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। সোসালিজ্ম, এনার্কিজম্, বলসিভিজম্। কত নব ধর্ম্ম, রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজ; জড় বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বাষ্পীয় শকট, অর্ণবযান, গগনে ডানা মেলিয়া উড়িবার বায়ুপোত, কত আশ্চর্য্য অদ্ভুত আবিষ্কার, য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

এইবার য়ুরোপের মধ্যাহ্ন সূর্য্য পশ্চিমে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আজ সেখানেও দেখিতে পাই মানুষের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইটালী ম্লান, ফ্রান্স মুমূর্ষু, ইংলণ্ড বিমূঢ়, জার্ম্মাণী মরণাপন্ন, ক্ষুদ্র আয়র্লণ্ডে তবু একটা আধটা মানুষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, কেবল রুশিয়া প্রদেশে বড় জোর দুই দশ অতি-মানুষ আবির্ভূত হইয়া কি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, পুরাতন রুশিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে বহুদিনের স্বভাব সংস্কার নিমেষে দূর হইতেছে— এ সকলই মানুষের খেলা!

বহু গৌরবের কথা ভারতেও মানুষ দেখা দিয়াছে। বহুদিন পরে ভারতজননী যোগ্যসন্তান বুকে পাইয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, ভারত দিন দিন নূতন হইয়া উঠিতেছে। হাজার হাজার বৎসরের দীনতা সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিয়া— মহাত্মাজী আসমুদ্র হিমাচল নূতন মন্ত্রে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন— তাঁহার অমানুষিক কর্ম্মশক্তি দেখিয়া পুলক বিস্ময়ে আমরা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছি। এই একটী মানুষ কোটী কোটী দেশবাসীকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া গন্তব্যের পথে ছুটিয়াছেন— এমন মত্ত মাতঙ্গের অপরাজেয় শক্তি না থাকিলে নেতা হওয়া অভিনয় বিশেষ হইয়া পড়ে, ভারত আজ— যোগ্য নেতা পাইয়াছে, বাংলার হৃদয় সমুদ্র তোলপাড়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শতদল কমলের মত বাংলার আন্দোলন স্রোতে ভাসিয়া উঠিয়াছেন— মহাত্মাজী কি প্রকার সৃষ্টি করিবেন কে জানে!

এই একটী মানুষের আবির্ভাবে পরাধীন জাতির জীবনে কি বিপুল উৎসাহ, কি অভাবনীয় আশা, কি প্রদীপ্ত উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হইয়াছে একবার উপলব্ধি কর, সাত মাসে স্বরাজ পাইবার বিশ্বাস দিনে দিনে জাতির মনে কেমন বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে আজ

কর, মানুষের মনে কত দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে তাহাও চিন্তা কর—আমরা মহাত্মাজীর জয় না গাহিয়া আর থাকিতে পারি না।

কেহ কেহ সাতমাসে স্বরাজ লাভ হইবে শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকেন, বাহিরেও এই কথা লইয়া আন্দোলন সুরু হইয়াছে। মহাত্মাজী ইহার উত্তরস্বরূপ বজ্রনির্ঘোষে কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর।

"No one need feel anxious about my belief. I wish people will cease to think of what I believe and begin to believe something themselves. If I could infect India with the intensity of my belief, she can gain swaraj to-day for the will of a nation composed of three hundred million men and women acting in union cannot be withstood by any power on earth. অর্থাৎ আমার বিশ্বাস লইয়া কাহাকেও ভাবিতে বসিবার প্রয়োজন নাই, আমার ইচ্ছা, আমি যাহা বিশ্বাস করি মানুষ যেন তাহা লইয়া চিন্তা না করে, বরং তাহারা কিছু বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করুক। যদি আমার সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতাম, আজই সে স্বরাজলাভ করিত। তেত্রিশকোটী নরনারী লইয়া যে জাতি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা যদি একযোগে কার্য্য করে, জগতে এমন শক্তি নাই তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়।"

কথাগুলি বিদ্যুৎশক্তি পূর্ণ।

কিন্তু হায় মহাত্মা হয়তো তুমি কিছু আগে আসিয়া পড়িয়াছ। তোমার হৃদয়ের ঐ জ্বলন্ত বিশ্বাসের অনুরূপ আধার সৃষ্টি এখনও যে হইয়া উঠে নাই। শিক্ষার আয়োজন জাতি সবেমাত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছে, উপযুক্ত আধার না পাইলে তোমার মহাবীর্য্য অবধারণ করিবে কে? বাংলার চিত্তরঞ্জন অধিক প্রস্তুত হইয়াছিল, তোমার আহ্বানে অকূলে ঝাঁপ দিয়াছে, আরও হাজার হাজার চিত্তরঞ্জন থাকিলে তোমাকে সার্থক করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি বীর তুমি সিদ্ধ—কাহারও প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবার পাত্র তুমি নও—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার বিশ্বাসকে জয়যুক্ত দেখিতে চাই।

মহাত্মা গান্ধির প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই—তাঁর অপরাজেয় বিশ্বাস অলৌকিক শক্তি সৃষ্টি করিয়া সাতমাসে স্বরাজ আনিতে অনায়াসেই সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু নূতন বাংলাকে আমরা এই উত্তেজনার যুগে ভবিষ্যতের জন্য গোটাকয়েক কথা বলিব।

বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে দেশে যে সাগর তরঙ্গের মত কর্ম্মস্রোত বহিয়াছে, তাহাতে অকুণ্ঠচিত্তে অবগাহন করাই জাতির মুক্তির জন্য অতি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের হৃদয় মন প্রতিমুহূর্ত্তেই এই মহাপ্লাবনের কূলে কূলে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই বিপুল পতিতজাতির বর্ত্তমানটাই সবখানি নয়, ইহার আবার ভবিষ্যৎ আছে—এই ভবিষ্যতের মানুষ যারা তাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে চাই রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ অথবা রাজনীতিক সমধিক অধিকার আয়ত্ত করা খুব কঠিন হইলেও কোটী কোটী মানব মনের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত করিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের মুক্তি—আমরা নিঃসংশয়ে এবং নিরুদ্বিগ্নে উপভোগ করিতে পারিব না যদি ভিতরকে মুক্ত করিয়া আমরা বীর্য্যবান হইয়া উঠিতে না পারি।

দেশের একদল লোক এই কথা শুনিয়া নিশ্চয় আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিবেন ছেলে ধরিতে সমর্থ নহে, কেউটে ধরিবার সাধ করিতেছে—স্বাধীনতা পাইলে প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সহজেই আয়ত্তে আসিবে। আমরা ইহার বিপরীত চিন্তাই করিয়া

থাকি—পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশাত্মার মর্ম্মকথা নূতন অর্থে আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছে, আমরা রাজনীতিকে গৌণ এবং মানুষ সৃষ্টির আয়োজনকে মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করিয়াছি।

মহাত্মাজী বলিতেছেন If I could infect India with the intensity of my belief প্রভৃতি। মহাত্মা গান্ধির উপর ভক্তি শ্রদ্ধা অটুট্ হইলেই—তিনি যে আমাদের মধ্যে তাঁর লক্ষ্য বিশ্বাসটাকে আমন মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে পারিবেন এ বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। দেশের সব লোক না হইলেও অন্ততঃ একদল লোকের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী অবিকৃত প্রকাশ না পাইলে এই কার্য্য সংসিদ্ধ হওয়া কঠিন হইবে—তবে কোন অলৌকিক উপায়ে ইহা সিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু উহা স্থায়ী হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না—অলৌকিকতায় আশ্চর্য্য অনেক কিছু সৃষ্ট হয়, প্রতিক্রিয়ার এবং প্রকৃতির প্রতিশোধে উহা শীঘ্রই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। পৃথিবীর সৃষ্টি—পার্থিব উপায়েই সংসিদ্ধ করিতে হইবে, তবে অব্যর্থ সন্ধানে অমোঘ উপায়ে যোগী শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করে না।

ভারতের যতকিছু কর্ম্ম, সমস্তই সাধিত হয় হৃদয়ের সাহায্যে। হৃদয়ই মানুষের সবখানি নয়, কাজেই এ দেশের কর্ম্মধারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, যুগপ্রবর্ত্তকের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমরা দেখিতে পাই—মানুষের মনে ও প্রাণের তারে একটু ঝঙ্কার উঠিলেই মানুষ সেই সুরের অধীন হইয়া পড়ে, জীবনের তারগুলি মিলাইয়া লইবার ধীরতা তাহার নাই, কাজেই কাজও হয় অসম্পূর্ণ, আনুগত্যও হয় সাধ্যমত, নিজেও অতৃপ্ত হইয়া অবসাদে ডুবিয়া পড়ে।

মহাত্মা গান্ধির অন্তরে যে দিব্য সৃষ্টি রচিয়া উঠিয়াছে—প্রত্যেক কর্ম্মীকে সেই চিত্রের সবখানিই অবিকল আঁকিয়া লইতে হইবে নিজ নিজ হৃদয়ে, অন্তরের পাওয়া রূপটাই বাহিরে প্রতিফলিত করিবার তবেই অপ্রতিহত শক্তিলাভ করিবে, নতুবা অন্ধ আনুগত্য সত্য সাফল্য কোনদিন আনিয়া দেয় নাই, আজও দিবে না।

আনুগত্য সাধনার অঙ্গ—সাযুজ্য হইতেছে সিদ্ধি। এই সিদ্ধিলাভের সঙ্গেই বাহিরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, এই সনাতন পদ্ধতিটীকে উপেক্ষা করিয়া চলিলে মহাত্মাজীর তপঃশক্তি ভোগসৃষ্টি সার্থক করিয়া তুলিলেও জনসাধারণের উহা উপভোগের বস্তু হইবে না—বিধাতার করুণায় তপস্বী গান্ধি উত্তম বর লাভ করিলে—দেশবাসীর তাহাতে অধিকার কি? পাইয়া হারাণোর মত হাহাকারই হইবে আমাদের কর্ম্মফল, ঘাটে আসিয়া বোঝাই তরি বানচাল হইলে দুঃখের আর অবধি থাকিবে না।

হৃদয় ব্যতীত বুদ্ধি বলিয়া আমাদের আর একটা সম্পদ আছে। হৃদয়ের আবেগ যতই প্রবল হউক—বুদ্ধি দিয়া যদি বর্ত্তমানের সবখানি গ্রহণ করিতে না পারি, অর্দ্ধপথে নিঃশেষ হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িব, ইহা অবধারিত জানিবে। সংশয় ও বিচার লইয়া যে বুদ্ধি, আমারা তাহার কথা বলিতেছি না—ঐগুলি বুদ্ধির অশুদ্ধতা। বুদ্ধিকে অসংখ্য চিন্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভগবানের ইচ্ছাটীকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে হইবে—যাহা করিতে যাইতেছি, তাহার আমূল নির্দ্দেশ মাথার উপরে চিত্রিত করিয়া তুলিতে হইবে—তার পর উত্তেজনা নয়, অস্থিরতা নয়, অদম্য শক্তিতে—ধীরভাবে মন চিত্ত ও প্রাণের ভিতর দিয়া জগতের বুকে একে একে নূতন সৃষ্টিকে সাজাইয়া তোল—তোমরা প্রতিজনে হও নির্ম্মাণের ঋষি—এইরূপ হইলে নেতার অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হইবে না, কালের পরিমাপ করিয়া দিন গুণিতে

হইবে না, জীবন হইবে ভগবানের রথচক্র, গতিই তাহার স্বভাব—গতিই তাহার ধর্ম্ম এবং আনন্দ।

যে জীবনভোর তপস্যার ফলে—মহাত্মা গান্ধির অন্তরে বাহিরে দিব্যশক্তি বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়াইতেছে, যে সাধনার বলে তিনি আজ অসংখ্য বিঘ্নের মাথায় পা দিয়া লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছেন—সেই তপঃশক্তি, সেই সাধন বল আমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে। আন্দোলন আমরা বন্ধ করিতে বলি না, জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়া যোগ যেমন অসিদ্ধ, তদ্রূপ জাতির জীবনে যে প্রেরণা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে রুদ্ধ হইতে না দিয়া তাহার অবাধ লীলা সার্থক করিতে করিতে এই আত্মবিস্মৃত জাতির চৈতন্য সঞ্চারের কেন্দ্রস্বরূপ নূতন শিক্ষা মন্দির অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা কর, মানুষ সৃষ্টির উপযোগী সাধন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে না পারিলে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিবে বটে, কিন্তু ছেদহীন প্রবাহে জগতে স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিবে না। আমরা চাই মানুষ—চাহিনা শুধু আন্দোলন উত্তেজনা আর বাক্‌চাতুরী।

জীবন সাধনা

বাঙ্গালায় কেবল ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর তিন লক্ষ হইতে চারি লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। তারপর এই রোগাধিক্যে মানুষ কেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সম্প্রতি "বসুমতী" কাগজে ২৩টি জেলায় জন্ম হইতে মৃত্যুর আধিক্য বুঝিবার যে তালিকা বাহির হইয়াছে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

জিলার নাম	হাজার করা জন্মের হার	হাজার করা মৃত্যুর হার	মৃত্যুর হারের আধিক্য
বর্দ্ধমান	২১'২	৫০'৫	২৯'৩
বীরভূম	২৩'৭	৬২'৩	৩৮'৬
বাঁকুড়া	২৫	৩৮'৫	১৯'৫
মেদিনীপুর	২৪'২	৪০'১	১৫'৯
হুগলী	২১'৫	৩৬'১	১৪ ৬
হাওড়া	২৭	৩৫'১	৮'১
২৪ পরগণা	২২'৫	৩৩'৪	১০'৯
নদীয়া	২৫'৬	৪৩	১৭'৪
মুর্শিদাবাদ	২৮'৯	৪৭'৩	১৮'৪
যশোহর	২১	৩০'২	৯'২
খুলনা	২৭'৮	৪১'২	১৩'৪
রাজসাহী	৩২'৮	৪১'৫	৮'৭

জিলার নাম	হাজার করা জন্মের হার	হাজার করা মৃত্যুর হার	মৃত্যুর হারের আধিক্য
দিনাজপুর	৩১'৬	৪৩'৭	১২'১
জলপাইগুড়ী	৩২'৪	৪২'৬	১০'২
দার্জ্জিলিং	৩০	৪৮'৪	১৮ ৪
রঙ্গপুর	৩২'৪	৩৩'৪	১
পাবনা	২৫'৭	৩৬'১	১০ ৪
মালদহ	৩০'৫	৩৯	৮'৫
ময়মনসিংহ	২৭ ৩	২৭'৭	'৪
বাকরগঞ্জ	২৯'৮	৩৪'৭	৪'৯
চট্টগ্রাম	৩০'৩	৪১'৪	১১'১
নোয়াখালি	৩২'৮	৩৩'৪	'৬
ত্রিপুরা	২৭'৮	২৯'৪	১'৬

সহযোগী বলেন, "বীরভূম জেলায় মৃত্যুর হার জন্মের অপেক্ষা হাজার করা ৩৮ অধিক। সেই বীরভূম জিলায় সরকার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসার ব্যবস্থাদি বাবদে মোট ৪ শত ১৮ টাকা খরচ করিয়াছেন"। ব্যবস্থাটা যে অসঙ্গত তাহা অস্বীকার করা যায় না।

নূতন শাসননীতি প্রবর্ত্তনে, দেশীয় মন্ত্রীগণের উপরেই প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার ভার অর্পণ করা হইয়াছে, কিন্তু যোগ্য লোক হইলেই ইহার প্রতীকার হইবে না, এই আধমরা জাতিটার পেটের খোরাক যোগাইবার উপায় নাই, শুধু ঔষধের ব্যবস্থা করিলে কি হইবে? তা ছাড়া ব্যাধি নিবারণের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইলেও যে টাকার প্রয়োজন তাহাও বা কোথা হইতে আসিবে?

"বসুমতী" দেখাইয়াছেন—মরণোন্মুখী বাংলার স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে সরকার ২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, বিবাহিত গোরা সার্জেণ্টদিগের গৃহনির্ম্মাণের জন্য কিন্তু ২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা দিয়াছেন, তারপর মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বৎসরে ১৪ হাজার টাকা খরচ করিবেন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধে খরচ হইবে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, যুবরাজ আসিলে ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা উৎসবে খরচ করিতে হইবে, প্রভৃতি. দেশ বাঁচুক আর মরুক, খরচা কোনদিকেই কমাইবার উপায় নাই।

কিন্তু মৃত্যুর তালিকা দেখিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছি। আমরা যোগই করি আর ভগবানকেই পাইতে চাই, সকলই তো মানবের জন্য, আমার সম্মুখে একটা মানবগোষ্ঠী পোকা মাকড়ের মত কালের কুলাল চক্রে নিষ্পেষিত হইতে বসিয়াছে, আমি কেমন করিয়া আহ্লাদে চক্ষু মুদিয়া দিনগুলি অতিবাহন করি, সংসার যাত্রার প্রথম পদক্ষেপেই যদি দেশবাসীর এই আসন্ন বিপদে উদাসীন হইয়া পথ চলিতে থাকি, আমার মানবপ্রেমের মধুর বাক্যগুলি শুনিবে কে? এই আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে আমার স্বদেশবাসীকে যদি উদ্ধার করিতে না পারি—আমার যোগশক্তির প্রমাণ কি? ভগবান হৃদয়ে বল দাও—অনন্য মনে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দেশকে বাঁচাইব—অন্নের কাঙাল কাহাকেও রাখিব না—শস্যশ্যামলা বঙ্গের কোলে অস্থিচর্ম্মসার সন্তানের নবীনকান্তি ফিরাইয়া আনিব।

সরকারের ব্যবস্থা লইয়া আন্দোলন করার উপকারীতা আমরা বুঝি, প্রজার অভাব অভিযোগের কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে, কালে একটা সুব্যবস্থা হইলেও হইতে পারে, কাজেই এই কার্য্যে একদল লোক চিরদিনই লাগিয়া থাকা চাই, কিন্তু ইহাই তো একমাত্র কাজ নয়, চীৎকারের ফল কবে ফলিবে কে জানে। মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন অবিলম্বে ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত।

আমরা সেদিন "বীরভূমের" একটা গণ্ডগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলাম, গ্রামবাসীদের কদাকার চেহারা, তাহাদের শ্রীহীন বাসকুটিরের পারিপার্শ্বিক শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া প্রকৃতই চোখ দিয়া জল বাহির হইয়াছিল, গ্রামখানির এক তৃতীয়াংশ লোক তো মরিয়া উজাড় হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট গ্রামবাসীগণ নিরুপায় হইয়া মৃত্যুকালের অপেক্ষায় বিষণ্ন মনে বসিয়া আছে, জীবনে তাহাদের আশা নাই, মনে তাহাদের উৎসাহ নাই, শরীর তো জরাজীর্ণ। ওগো আমার প্রাণের বাংলা, কি করিতেছি, আমরা তোমার দুর্দ্দশা যদি দূর করিতে নাই পারি, তবে বিশ্বের কল্যাণ-কামনায় কি সাহসে অগ্রসর হইয়াছি—ছিঃ ছিঃ পৃথিবীর বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পথচলা যে একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌লামী!

প্রতি বর্ষে যদি দুর্ব্বল জাতির তিন-চারি লক্ষ লোক পরলোক যাত্রা করে, একেবারে নিশ্চিহ্ন

না হই, প্রেতপুরীর অপেক্ষা বাংলার শোচনীয় দশন যে কি ভয়াবহ হইবে তাহা অনুমান করিতে অধিকক্ষণ লাগে না। সরকারের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা ছাড়িয়া দেশের মানুষ যাঁরা তাঁদেরই মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার বিপুল আয়োজন করিতে হইবে, রাজকৃপা ইহার উপর যুক্ত হইলে সোনায় সোহাগা হইবে কিন্তু মরণের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ভার আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। কাজ বড় সোজা নয়—তার কারণ যে কেবল অর্থাভাব বা মানুষের টানাটানি তাহা নহে। অর্থ মানুষ থাকিলে আসিবে, কিন্তু যে মানুষ আছে তাহাকে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে—একেবারে জাতিটাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কথা শুনিয়া অনেকেই হতভম্ব হইয়া পড়িবেন, মানুষ মরিতেছে তাহার প্রতিকারের কথা চুলায় যাউক, মানুষ গড়ার মামুলী কথা উত্থাপন করায় অনেকেই হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইবেন কিন্তু অন্য উপায় আর নাই, এই নির্ম্মাণের ভিতর দিয়াই দেশকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে।

চাই প্রথম একটা সংহতি। আজ পর্য্যন্ত নেতৃবৃন্দের উপদেশ মত কার্য্য সাধনের যে গোষ্ঠী গঠন হইয়া আসিয়াছে উহা দিয়া কিছুদূর কাজ চলিতে পারে কিন্তু আপদ আমূল উপাড়িয়া ফেলিবার জন্য, আজীবন নিরাসক্তভাবে খাটিয়া যাইবার মত একদল অক্লান্ত পরিশ্রমী দৃঢ় অধ্যবসায়ী লোকের প্রয়োজন হইবে। উত্তেজনায় যাঁহারা স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া উঠেন, আবার উত্তেজনার উপশমে ডুবিয়া পড়েন, তাঁহাদের দ্বারা হৈ চৈ করিবার, আসর জমাইবার কাজ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অধঃপতনের মূলটাকে উৎপাটিত করিবার জন্য সাধক সংহতিরই প্রয়োজন হইবে।

এই সাধক সমষ্টি এক অখণ্ডসত্তার অনুভূতি লইয়াই কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, একজন মানুষ যেমন নিজের ত্রুটী বিচ্যুতি না ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েন, এই সমষ্টিও প্রত্যেকে আপন আপন ভাবও ধারা সমগ্র সমষ্টির—এই বোধে কার্য্য করিয়া যাইবেন, মতানৈক্য বা সুখ্যাতি অখ্যাতির আকাঙ্খায় গোষ্ঠীর একটী অঙ্গও বিচলিত হইবেন না—এইরূপ আত্মায় আত্মায় অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইয়া সমষ্টি একটী আত্মার অভিব্যক্তি স্বরূপ যদি কার্য্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়, তবেই বর্ত্তমান দেশের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে। আশার কথা দেশে এরূপ সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, এইবার ব্যাপকভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

কাজ সোজা না হইলেও অতি ক্ষুদ্র করিয়া ইহা আরম্ভ করা যাইতে পারে। একটী বা ততোধিক সংহতি দ্বারাই যে সব কাজটী সম্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা ধৃষ্টতা—সংহতি গুলি কেবল আদর্শ নির্ম্মাণ করিবেন—দেশবাসী যে দিন এই আদর্শ জীবন দিয়া ধরিতে শিখিবে সেই দিন আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ঘটিবে।

যাঁহারা ভগবানের আদেশ পাইয়াছেন, ভগবানের অমর শক্তি-উৎসে অভিষিক্ত হইয়া জাতির মঙ্গল সাধনে কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারময় মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র কয়েকটী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, অন্ন সংস্থানের জন্য কৃষি, ইহা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে হলাকর্ষণ করিবেন যাঁহারা তাঁহাদিগকে শিক্ষাব্রতে দীক্ষা লইতে হইবে, কেননা দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আর শিক্ষকের বেতন দিয়া ব্যাপকভাবে শিক্ষাকেন্দ্র নির্ম্মাণ করা সহজ হইবে না, অবস্থার উন্নতি যদি ঘটে তখন ব্যবস্থারও উন্নতি করা যাইবে—উপস্থিত যেমন দেশের

অবস্থা তাহার মত ব্যবস্থা করিয়া কাজে নামিতে হইবে।

মহামতী ম্লোণাল্ডসে বলিয়াছেন, দেশের উন্নতি করিতে হইলে হয় চাই Revolution না হয় Evolution. দেশ এই দুয়ের মধ্যে কোনটী চায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহার মতে evolution প্রকৃষ্ট পন্থা। আমরাও তাহাই বিবেচনা করি কিন্তু তিনি যে ভাবের evolution চাহেন আমরা হয়তো সে ভাবের ভাবুক না হইতে পারি, ইহা স্বাভাবিক, দেশের স্বভাব অনুযায়ী আমরা evolution রচিয়া চলিব।

কঠোর কাজ আমাদের সম্মুখে—মৃত্যুর করাল কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে চিরদিনই আমরা আহ্বান করিয়া আসিতেছি—দেশ সেবার ব্রত বড় কঠিন, জননী জন্মভূমির উদ্ধার সাধন শুনিতে মধুর, কিন্তু এই মহাব্রত পালন করিবার জন্য চাই উত্তম শিক্ষা, অটুট স্বাস্থ্য আর সরল অন্তঃকরণ।

ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আমরা দেশ মাতার চরণ তলে আছাড়িয়া পড়িলাম, উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল এই কর্ম্ম সমুদ্রে ভাসিবে কে, হরে মুরারে, হরে মুরারে, আগাইয়া আইস—মায়ের আশীর্ব্বাদে জয় না করিয়া ফিরিব না।

পুস্তক-পরিচয়

ঘর ও পর—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি·প্র ভাণ্ডার, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি, পুস্তকনির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি ভাষার গুণে বিশেষরূপেই সুব্যক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে অতি শীঘ্রই আমাদিগকে একটী জীবন্ত মনুষ্যের, একজন খাঁটি স্বদেশসেবকের সম্মুখীন হইতে হয়। পুস্তকখানি একজন স্বদেশীর হৃদয়ের কথা, স্বদেশী তার সকল হৃদয়টাই যেন দেশের নিকট ব্যক্ত করিতে চায়। স্বদেশ-হিতকর বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমরা স্বদেশের সকল দিকটা দেখিতে পাই না, স্বদেশপ্রীতির সকল প্রকার আস্বাদ গ্রহণ করাও আমাদের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু বসন্তবাবু স্বদেশহিত-কর যেরূপ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুন, তিনি তাঁহার স্বদে-শের সর্ব্ব অবয়বটী অনুক্ষণ মানসচক্ষে রাখিতে পারিয়া ছিলেন; তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে সকলেই আমা-দের সহিত একমত হইবেন। স্বদেশের সকলপ্রকার উন্নতির চেষ্টা একটা নির্দ্দিষ্ট চিন্তা ধারার মধ্য দিয়াই হইয়া আসিয়াছে—ভূদেববাবুর ন্যায় মনস্বীরাও যখন সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে নিজের মানসছবি প্রবন্ধাকারে চিত্রিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের পিছনে একটা ফিলজফি, দেশকে দেখিবার একটা মানসসূত্র আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই। কিন্তু বসন্তবাবু স্বদেশী-যুগের লোক—স্বদেশী যুগের লোকের প্রধান জিনিষ ছিল প্রাণ, সেই প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তাঁহারা যে

বস্তু পাইয়াছিলেন তাহা ঠিক ফিলজফিও নয়, মনকে বিকাশ করিবার একটী সূত্রমাত্র তথায় বর্ত্তমান নাই, তাহা একেবারেই অন্তরতম প্রদেশের; তাহাকে যে ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠা করা হউক তাহাই প্রাণস্পর্শী হইবে।—বসন্তবাবুর পুস্তক প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।

তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে দেশের জন্য তিনি যে তৃষ্ণা অনুভব করেন, দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রাণের যে-কামনার সহিত আমরা পরিচিত হই তাহার জন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের সকল ত্রুটি বরণ করিয়া লই। কিন্তু দেশকে তিনি যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পত্তন হইতে প্রাচীন সমাজের গুণানুশীলন পর্য্যন্ত বহুক্ষেত্রে আমরা সে নির্দ্দেশের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছি। "আমি যদি মুচির ছেলে হইয়াও নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে পারি, যোগ্যতার সহিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ", "সমাজে ব্রাহ্মণও চাই মেথরও চাই। * * যখন উভয়ের অস্তিত্ব রহিয়াছে আর যখন একের কার্য্যকারিতা অপরের অস্তিত্বের উপর নিভর করিতেছে * * তখন মেথরকে মেথর বলিয়া দূরে রাখিতে যাওয়া সুস্থবুদ্ধির পরিচয় কি?"—ইত্যাকার মত প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার যে মনের পরিচয় দিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়গুলিতে আমরা সেই মনই দেখিতে পাই কিন্তু তাহা তত গভীরে প্রবেশ করে নাই। পুস্তকখানিতে তিনি সমস্ত প্রাণখানি ঢালিয়া দেওয়ায় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইবেন, গ্রন্থকার সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবেন, কিন্তু তিনি যে মনুষ্যত্ব বিকাশ করিয়া পরকে আপন করিতে চান সেই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা তিনি সকলকে "নিজের কায কর্ম্মের উপর, নিজের চরিত্রের উপর—স্বভাবের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া" আত্মসংযম শিখিয়া লাভ করিতে বলেন। তিনি দেশের কাজগুলিকে যে ভাবে সম্পাদন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা যেন ঐরূপ আত্মশুদ্ধি ও ঐরূপ আত্মসংযম লক্ষ্য করিয়া।

নিজের জীবনকে মুক্ত করিয়া অন্তরে মুক্তির বাতাসের সহিত বাহিরে যে অফুরন্ত জীবন প্রকাশ হয় তাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত আমরা এই পুস্তকে পাইতেছি। গ্রন্থকারের ন্যায় পাঠক যদি সদিচ্ছাপরায়ণ হন, তাঁহারই ন্যায় তিনি যদি দেশগতপ্রাণ হন, তাহা হইলে দেশের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে করিতে তিনি আপনা আপনিই সংযত হইয়া উঠিবেন এবং তাঁহার জীবনের সুষ্ঠু ধারাটী তিনি জানিতে পারিবেন; এই ধারা অবলম্বন করিয়া চলিলে জগতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয়, অথবা গ্রন্থকারের ভাষায় "পরের হিতে আত্মসমর্পণ করিয়া জয় তিলক" পাইতে পারেন।—পুস্তকখানিতে কিন্তু এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া লিখিত হয় নাই। তথাপি ইহার দ্বারা প্রত্যেক পাঠক উপকৃত হইবেন—উপকার শুধু সাময়িক হইবে না, স্বদেশ জীবনের একটা স্তর তিনি চারিদিক দিয়া দেখিতে পাইবেন। গোন্দলপাড়া (চন্দননগর) বিদ্যাপ্রচার ভাণ্ডারের এই প্রথম পুস্তক পাঠ করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। পাঠকগণ উহার সহিত পরিচিত হইলে আমাদেরই ন্যায় পরম প্রীত হইবেন।

জীবন-তরণী

—*—
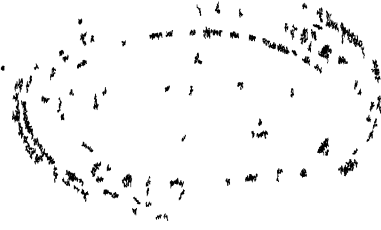
এ যে সীমাহীন অগাধ জলধি জলে
নীলাকাশ মিশে গেছে দিক্ চক্রবালে,
অজানা প্রদেশ হ'তে আসে সমীরণ
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া উঠে তরঙ্গ ভীষণ।
কি ভীম ভৈরব দৃশ্য অনন্ত অপার,
শান্তিহীন সদা তাই করে হাহাকার,
ধরিয়া প্রলয় মূর্ত্তি কোন অভিযানে
চলিয়াছ ওহে সিন্ধু কি কার্য্যসাধনে ?
তব বক্ষে তুচ্ছ মম জীর্ণ তরিখানি
ছিন্নপাল তুলে দিয়ে কোথা নাহি জানি
চলিয়াছি ভগ্নমনে কোন্ মহাপথে
নিরাশায় বেঁধেবুক কেহ নাহি সাথে।
আমি মুগ্ধ ভ্রান্ত তাই একা মনে হয়,
অন্তর্যামি আছে সাথে আমার কি ভয়।

———
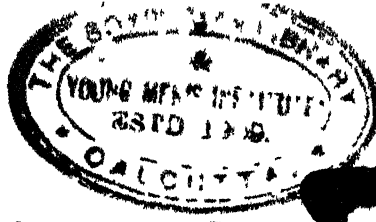
ষষ্ঠ বর্ষ] ২৯এ ফাল্গুন, ১৩২৭ [পঞ্চম সংখ্যা

বরিশাল কন্‌ফারেন্স

— :০: —

১৯০৬ সালের বরিশাল কন্‌ফারেন্স পুলিশের লগুড়াঘাতে ভঙ্গ হইয়া যায়, আর ১৯২১ সালে বরিশালে যে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স হইল অনেকের মতে যেরূপ আশা লইয়া সকলে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন সে আশা সকলেরই ভঙ্গ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা ও সাধারণ কার্য্যাবলী যেরূপ হইবার তাহার কোন ত্রুটী হয় নাই কিন্তু মোটের উপর বরিশালের কন্‌ফারেন্সে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

সুরাটে দক্ষযজ্ঞের পরে পাবনায় যে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী যেরূপ পুলকিত হইয়াছিলেন এক্ষেত্রে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, বরং বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পর হইতেই সভাস্থ ব্যক্তিবৃন্দ সভাপতিকে নিরবই দেখিতে থাকেন। একটা কর্ত্তব্যবোধের রজ্জু তাঁহাদিগকে সংযত রাখিয়াছিল তথাপি তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া সভাপতি বৈঠক শেষ হইবার পূর্ব্বেই কয়েকবার আসন ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার বিদায়কালীন অভিভাষণ শ্রবণ করিলে সত্যসত্যই করুণার সঞ্চার হয়। কোন মানব-অবতারের পশ্চাদ্ধাবন করা তাঁহার দ্বারা কখনই সম্পন্ন হয় নাই এবং আজিও তাহা হইবে না ইহা তিনি যতই বলুন, শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে বুঝিতে না পারায় তাঁহার আত্মা যে দুঃখে অভিমানে বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই—একটা অন্তঃপীড়ার ব্যথা আমরা তাঁহার মুখ ও চোখে সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছি।

বিপিনচন্দ্র যে এ সময়ে সময়োপযোগী কার্য্য করিতে পারেন নাই তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ পাবনায় যেরূপ মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সূক্ষ্মদর্শী বিপিনচন্দ্রের নিকট হইতে আমরা তাহার কম আশা করি নাই। তিনি সে আশা পূরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার জন্য বিপিনচন্দ্র নিজে যতটা দায়ী বলিয়া মনে হইতেছে তিনি ততটা দায়ী নহেন; বাঙ্গলার জাতীয়

দলের সমগ্র দোষ ইহার মধ্যে বর্ত্তমান আছে। একদিক দিয়া দেখিলে তাহাদের দোষের জন্যই বিপিনচন্দ্রকে এইরূপ অপদস্থ হইতে হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র জাতীয়দলের প্রতিভূস্বরূপ, তিনি তাহার বাণীমূর্ত্তি। এই জাতীয়দল এক্ষণে বাঙ্গলার বক্ষে কিরূপ আসন পাতিয়া বসিয়া আছে তাহার সংবাদ বর্ত্তমান কনফারেন্সে আমরা জানিতে পারি নাই কিন্তু সমগ্র স্বদেশী আন্দোলনে হৃদয়টী পাতিয়া দিয়া জাতীয়দল বাঙ্গালীজাতির হৃদয়রূপে পরিগণিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই হৃদয়ের সারবত্তা এই সময়ে প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের ধারা স্মরণ করিয়া এরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছেন যে বর্ত্তমানে যে নন-কো অপারেশন আন্দোলন আসিয়াছে তাহার ভিতরে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে এক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি যেন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে একটা রূঢ় সত্য কথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। আমাদের মতে বাঙ্গালীর খুব অল্পাংশই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে মনে হয় স্বদেশী আন্দোলনটা দেশাত্মবোধের একটা প্রদর্শনীস্বরূপ হইয়াছিল। দেশ বলিতে যিনি যাহা বুঝিতেন, দেশসেবা বলিতে যাহার যে পন্থা ভাল বলিয়া বিবেচিত হইত স্বদেশীর প্রেরণায় সকলে নিজ নিজ দেশাত্মবোধ ও নিজ নিজ দেশসেবার পন্থা লইয়া যেন আসরে আত্মমহিমা প্রচারই দেশধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা এ যুগের প্রভাব। যাহারা ধর্ম্মের সংস্কার চান তাহারা জানেন ধর্ম্মের সংস্কার না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না অতএব তাহারা উচ্চকণ্ঠে ধর্ম্মসংস্কারের মহিমা প্রচার করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সমাজসংস্কারক অর্থনীতিক সাহিত্যিক নিজ নিজ উদ্ভাবিত বা কল্পিত মার্গ অবলম্বন করিতে দেশকে অনুরোধ করেন। বিভিন্ন পন্থী রাজ-নীতিকগণও এইরূপে নিজ নিজ মার্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া দেশকে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পরামর্শ দেন। ইহা একটা স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে আমাদের দেশাত্মা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছে এইরূপ বোধ লইয়া যে আমরা জাগরিত হইয়াছিলাম তাহাতে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ ভিন্ন ইহাও আমাদের অন্তর দিয়া অনুভব করা উচিত ছিল, "আমাদের হৃদয়বৃত্তি পূর্ব্ব প্রণালীসমূহ দিয়া দেশ আত্মার যে স্পর্শলাভ করিতেছে তাহাতে তাহার একটা মস্ত পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে, আমাদের হৃদয়টাকে এমন করিতে হইবে—এ দৃষ্টিলাভ হইলে অবশ্যই আমরা তাহার জন্য সাধনা করিতাম—যে সে যেন কোন প্রণালীতে আবদ্ধ না থাকে, তাহার ভিতর দেশপ্রীতির স্রোত অনাহত অব্যাহতভাবে বহিতে থাকে, আর সেই প্রীতির বশেই যে সর্ব্বসমন্বয়কারী স্বচ্ছ ও প্রকৃষ্ট স্বদেশ বিধানের উদয় হইবে তাহাতেই আমরা দেশমাতার সত্য সত্যই উদ্ধার সাধন করিব।"

আমাদের আশা ছিল বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের অন্তর অবগত হইয়া জাতীয়দল এ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যদিও তাঁহারা ভাবরাজ্যে নিজদিগকে সর্ব্ববিষয়ে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ভারতের সামাজিক ও অর্থনীতিক আদর্শ বলিতে তাঁহারা যাহা বুঝিতেন সেই সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী গ্রাম ও গ্রামসমষ্টি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া অধিকার করিয়াছিল. তাহার উপর তাঁহাদের একটা রাজনীতিক কুসংস্কারই জন্মিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের থার্। ভারতীয় আদর্শের আরাধনা ও অনুশীলন করিয়া যে একটা নীতিবল পাওয়া যায় তাঁহারা মনে করিতেন সেই নীতিবল ও সংহত শক্তির জোরে তাঁহারা তাঁহাদের রাজনীতিক অধিকার লাভ করিতে

সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের আদর্শ স্বরাজ, কিন্তু আইন সভাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিজদিগের করায়ত্ত করিতে পারিলে, গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ব অঙ্গ তাহার অধীন হইলে, এক কথায় Legislative Independence লাভ করিলে তাঁহারা মনে করিতেন আর সবই আপনি আসিয়া যাইবে। এখন দেখিতেছি এই দুইটা জিনিষ তাঁহাদিগকে এরূপে অধিকার করিয়াছিল যে সূক্ষ্মদর্শী বিপিনচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নন কো অপারেশন আন্দোলনের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ না করিয়া তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা বর্ত্তমানকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত অতীত জাতীয় নীতির সার্থকতার জন্য ব্যবহৃত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে অতীত সার্থক হইবে যদি অতীতের মধ্যে যে সনাতনত্ব আছে তাহা ধরিতে পারা যায়। অতীতের স্বাধীন গ্রাম ও সম্পূর্ণ স্বাধীন গ্রাম্যগোষ্ঠী অঙ্গযুক্ত একটী সম্পূর্ণ প্রাদেশিক বা ভারতীয় অবয়ব কেবল ত আর কল্পনার সাহায্যে এবং Organisation এর নীতিপ্রচার করিয়া উদ্ভব করিতে পারা যায় না। প্রাচীনের সনাতনত্ব যখন তোমাকে ছাইয়া ফেলিবে এবং সেই সনাতন সূত্র ধরিয়া যুগে যুগে যে আদর্শ, কর্ম্মব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা উদিত হইয়াছে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও কার্য্যকারিতা যখন তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে তখনই না তুমি নবযুগোপযোগী একটা শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। ইহা করিতে হইলে দৃষ্টিটী বড়ই সজাগ রাখিতে হয়। কোন আদর্শেই নিজকে আবদ্ধ করিতে নাই, যে শক্তি আদর্শ করিতেছে ব্যবস্থা করিতেছে, আবার আদর্শ দূরে ফেলিয়া দিতেছে আর নূতন ব্যবস্থার সৃজন করিতেছে, তোমাকে সেই শক্তির সহিত একেবারে মিলিয়া যাইতে হইবে। ইহা না করিয়া সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এক সময়ে পুণ্য প্রচেষ্টার ফলে আমরা দেশসেবার যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলাম, সেই পন্থাকে পুষ্ট করিতে যদি সকল সময়েই সকল বিষয়কে তাহার জন্যই ব্যবহৃত করি তাহা হইলে প্রতিহত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।

জাতীয় দলের যে মনোভাব সর্ব্বাঙ্গীন স্বরাজলাভ করিতে হইলে Legislative Independence অগ্রে আবশ্যক, জাতীয় দল যে ধরিয়া লইয়াছেন একটা আদর্শের মধ্য দিয়া দেশকে ধাবিত করিতে না পারিলে—দেশের ধাতুমত, এককালে দেশ যেরূপ আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছে সেইরূপ এক আদর্শের মধ্য দিয়া দেশের সকল প্রচেষ্টা সংহত করিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ নাই ইহা সত্য কথা, কিন্তু দেখিতে হইবে তুমি যে বর্ত্তমানকে তোমার খোঁটায় বাঁধিতে চাহিতেছ সেই বর্ত্তমানের প্রেরণার সহিত তুমি এক যোগ কি না। আমরা জানি, বিপিন চন্দ্রের অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া আমরা বুঝিতেছি, বাঙ্গালীর জাতীয়দল—একরূপ বাঙ্গালী জাতিটাই এ দিক দিয়াই চলে নাই, দেশে একটা উত্তেজনা আসিয়াছে সকলেই নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে, নন কো অপারেশন কেবল একটা নামের জন্য। আর নন কো অপারেশনের যে দিকটা যাঁহার ধাতুর সহিত মিশিয়া যায় সেই দিকটাই তাঁহার নিকট নন কো-অপারেশনের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে।

বাঙ্গালী কিঞ্চিৎ সমাহিত হইলে ১৯০৬ সালেই সে বিশ্বে এক আত্মবোধ-অতিরিক্ত দেশ-আত্মার নির্ম্মল বাণী প্রচার করিতে পারিত, আবার স্বদেশী-যুগের সাধের সামগ্রী জাতীয় দল যদি তাঁহাদের আদর্শের গণ্ডী কাটাইয়া বর্ত্তমানকে নিজের জন্যই ব্যবহার করিতে না গিয়া বর্ত্তমানের সনাতন প্রবাহে অবগাহন করিতে পারিতেন তাহা হইলে আমরা বিপিনচন্দ্রের নিকট হইতেই এক অমর দেশবাণী প্রচার হইতে দেখিতাম। বিপিনচন্দ্রের দুর্ভাগ্য আর আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি স্বদেশীর

জন্মদাতা বাঙ্গালী নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে ভারতকে এক নূতন কথা শুনাইবার সময়ে কিরূপ বিমূঢ় হইয়া তাহার স্বদেশীর আন্তর ইতিহাস লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল। বর্ত্তমানটা যদি নূতনই নয়, ইহা যদি স্বদেশীর একটা ভারতব্যাপী সংস্করণ মাত্র, তাহা হইলে স্বদেশী যুগে যে আদর্শ আমরা একরূপ আদর্শরূপেই কল্পনা ও অল্প কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলাম, ভারতব্যাপী এই কর্ম্মপ্রচেষ্টার দিনে সেই আদর্শকে এতটা বাড়াইয়া তুলিবার কি আবশ্যক ছিল? আর শেষে বিপিনচন্দ্রের Will to Independence লইয়া পনর পনর জনের স্বদেশী সঙ্ঘের মহিমাপ্রচারও এখন অনেকটা তরল বলিয়াই মনে হয়।

বরিশালের কনফারেন্স যে ব্যর্থ হইল তাহা বাঙ্গলার জাতীয়দলের স্বদেশীযুগের অহঙ্কারের জন্য, আর চিত্তরঞ্জনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালী যতই তাহার আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান করুক, যতই সে ঘোষণা করুক সকল ত্যাগ করিয়া নন-কো-অপারেশন আমাদিগকে আত্মার সন্ধানের জন্যই ব্যাপৃত করিতে চাহে ইহাও নিরর্থক ভাষণ হইবে যদি বাঙ্গালী অতীত ও বর্ত্তমানের সকল জাতীয় মায়া পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্যই আত্মদর্শন না করে এবং সেই আত্মার বিকাশের পথ সে প্রস্তুত করিতে না পারে। মুখে সকল ত্যাগের কথা কহিয়া নন্-কো-অপারেশনের একান্ত সময়োপযোগী কর্ত্তব্যনিচয়ের মায়ায় আবদ্ধ হইলে চলিবে না। বিপিনচন্দ্র বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক সত্য আছে। কোন বাঙ্গালীকেই আমরা খুব আন্তরিকতার সহিত মহাত্মা গান্ধির প্রবর্ত্তিত মার্গ অবলম্বন করিতে দেখিতেছি না। তাঁহারা জানেন না চিত্তরঞ্জন যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ সকল ছাড়িয়া আমাদিগকে আত্মার দর্শনলাভ করিতে হইবে, তাহার বলেই আমাদের সকল কার্য্য সাধন করিতে হইবে— Logic বা Reason এর শক্তি খুব অল্প। এই আত্মদর্শন ও আত্মবিকাশ মূলক পন্থার উদ্ভব হইলে ভারত রক্ষা পাইবে. বাঙ্গলার ইহাই বক্তব্য এবং বাঙ্গালীকেই ইহা কার্য্যে দেখাইতে হইবে। বুদ্ধির ছকাছকি আর প্রাণের আবেগের অন্তঃস্থলে মূল শক্তির বেদে বাঙ্গালীকে যাইতে হইবে। বাঙ্গালী পারিবে কি?—বাঙ্গালী তাহা পারে এবং সেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, বাঙ্গালীকে এই শক্তি ও এই কর্ম্মের দিকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

দখিণে বাতাস

— ঃ০ঃ —

ভাব ও কর্ম্মের তরঙ্গ সবখানি নয়, তার সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রন চাই। তা না হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। পূর্ণ যে সাধনা সেখানে আছে জ্ঞান আর শান্তি, সেখানে কর্ম্ম আছে কিন্তু ছুটোছুটি নেই, ভক্তি আছে কিন্তু emotion নেই। কর্ম্মের মধ্যে ভক্তির স্থান আছে, কিন্তু আমাদের থাকতে হবে ভক্তি এবং কর্ম্মের উপরে, সেখানে অনুভব করবো শান্তির আনন্দ, কর্ম্ম এবং ভক্তির মধ্যেও আনন্দ আছে কিন্তু উহা শান্তির আনন্দ নয়, কারণ ঐ গুলির মধ্যে পূর্ণতা নাই, তাই পূর্ণ শান্তির আনন্দ

পাই না। যখন কর্ম্ম এবং ভক্তিকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে যেতে পারবে, তখন যে জ্ঞান তারই মধ্যে আছে শান্তির পূর্ণ আনন্দ। অক্ষর ব্রহ্মের যে জ্ঞান তার মধ্যে কর্ম্ম এবং ভক্তির আনন্দ নেই, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে উভয়েরই স্থান আছে। Mental consciousness ছাড়িয়ে এক supramental consciousnessএর মধ্যে থাক্‌তে হবে, সেখানে আমরা সব সমানভাবে receive করতে পারবো।

* * *

আমাদের মধ্যে individual liberty ফুটে উঠা চাই, এখানে আমি পাশ্চাত্য libertyর কথা বলছি না, আমি বলছি divine libertyর কথা, spiritualised হলেই যে divinised হবে এমন কোন কথা নাই, spiritualised হলেও প্রাণ বুদ্ধির খেলা থাকে, প্রাণ বুদ্ধির উপরে গিয়ে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে divinity লাভ করতে হবে। spiritualised হয়ে গেলেও ভাবের খেলা হতে থাকে, কিন্তু এই ভাবকেও আমাদের অতিক্রম করতে হবে। পাশ্চাত্যের যে liberty, এর মধ্যে divine liberty নেই, তাই শুধু কর্ম্মের liberty থাক্‌লেই individualityর বিকাশ হয় না, কর্ম্মের মধ্যে যে individuality ফুটে উঠে সে হচ্ছে individualityর partial manifestation, তাই কর্ম্মের libertyতে divine liberty ফুটে উঠে না।

* * *

মানুষ যখন ভাব এবং মনের রাজ্য ছাড়িয়ে যেতে পারে তখন তার মধ্যে খেলা হয় supramental reasonএর, এবং এই যে supramental reasonএর খেলা, ভাবের মধ্য দিয়াই সেখানে পৌঁছাতে হয়, তবে সেখানে আর heartএ অবস্থান করতে হয় না। মানুষ যখন এই অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে, তখন তার কাছে জ্ঞানের আলো ফুটে উঠে বটে। কিন্তু তখনও সে প্রত্যক্ষ অপরের মধ্যে কি হচ্ছে তা দেখ্‌তে পায় না। এই supramental reasonএর উপরে supramental inspirationএর রাজ্য, এখানে পৌঁছালে, জ্ঞানের আলো বেশ স্পষ্ট উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে, সে অপরের ভিতর অনেকটা দেখতে পায়, কিন্তু ঠিক অনুভূতি জাগে না। ইহার উপরে বিজ্ঞানের খেলা, সেখানে অনেক জ্ঞান, এই জ্ঞান হচ্ছে knowledge by identity অর্থাৎ আমিও সকলের ভিতরে অবস্থান করছি, এই অবস্থায় সে অনুভব করে যে সমস্তই আমার মধ্যে রয়েছে, আমি সকলের মধ্যে রয়েছি, তখনই ভগবানের সহিত আমি যে এক ইহাই অনুভব হয়। তখন অপরের মধ্যে কি হচ্ছে, তা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তিনটী স্তরের যে বিভিন্ন অবস্থা তাহারও অনেক gradation আছে। এবং সকলের মধ্যেই উঠা-নামা হতে থাকে। বিজ্ঞানে পৌঁছালে সাধক ইচ্ছা কর'লেই আবার নেমে আস্‌তে পারে, কিন্তু এই যে নেমে আসা, ইহা আর সাধকের ইচ্ছায় হয় না, তখন হয় শক্তির ইচ্ছায়। উপরে যে বিজ্ঞানের খেলা হতে থাকে, সেখান হতে সাধক যে নেমে আসে তা কেবল ভাবে এবং মনকেও তার সঙ্গে উর্দ্ধে তুলে নেবার জন্য। বিজ্ঞানে উঠে গেলেও, শক্তির ইচ্ছা হলে, সাধক নেমে এসে এমন কি physical অবস্থাতেও কিছুকাল অবস্থান করে। এটাকে পতন বলা যায় না, কারণ এই নেমে আসা, সমস্ত নিম্নস্তরকে শুদ্ধ করে উচ্চে তোলবার জন্য। তারপর আনন্দের কথা। মানুষ সকল অবস্থাতেই একটা আনন্দ অনুভব করে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানলোকে সকলেরই মধ্যে আনন্দের স্থান আছে, সে আনন্দকে সচ্চিদানন্দ বলা যেতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানেরও উর্দ্ধে মানুষ যে আনন্দ অনুভব করে তা হচ্ছে অনন্ত সচ্চিদানন্দ, সেখান থেকে আর নাম্‌তে হয় না।

Willএর একটা আনন্দ আছে, উহা কর্ম্মের আনন্দ, heartএর মধ্যে যে আনন্দ আছে উহা ভক্তির আনন্দ, এই আনন্দের মধ্যে মানুষের ভাবের খেলা হতে থাকে, তাই ভক্ত তার ভগবানকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে আনন্দ পায়, কর্ম্মী তার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্য করছে এই অনুভূতিতে আনন্দ পায়, কিন্তু সব আনন্দের মধ্যেও একটা limitation আছে, এখানে জ্ঞানের আলো ফুটে উঠেনি, এখানে 'আমি' থেকে যায়।

* *

সখ্যরূপে নিয়ে সখ্যের সাধনা, তারপর দাস্যের সাধনা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভু আমি দাস, বাৎসল্যের সাধনাও এইরূপ, শান্তের সাধনা সকল সময়েই চ'লতে পারে, মধুর সাধনায় সবগুলিকে ভ'রে বিজ্ঞানলোকে নিয়ে যায়। এই বিজ্ঞানলোকে পৌছিলে আর সখ্য শান্ত দাস্য মধুর কোন সাধনারই প্রভেদ থাকে না। সকল সাধনাই সেখানে এককালে হতে থাকে বিভিন্ন স্তরে যখন বিভিন্ন সাধনা চলে, তখন "আমি" রূপ অহংকার থেকে যায়, কিন্তু বিজ্ঞানে পৌছিলে আর 'আমি' থাকে না। সকলের মধ্যেই তখন একটা universal consciousness অনুভব করা যায়। সাধনার প্রথম অবস্থায় মন এবং বুদ্ধির খেলা বিজ্ঞানের খেলা ব'লে ভ্রম হ'তে পারে। ক্রমে সাধন করতে করতে ভুল ঠিক হ'য়ে যায়।

* * *

যোগ গ্রহণ করা তত কঠিন নয়, কিন্তু যোগের মধ্যে দুইটা জিনিষ খুবই শক্ত। (১) commune (২) বিজ্ঞান। প্রথম হচ্ছে ত্রিমার্গের সাধনা, উহাই যোগের ভিত্তি, ইহার উপরেই commune এবং বিজ্ঞান উভয়ই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ত্রিমার্গের সাধনা চ'ললেও, বিজ্ঞান এবং commune না হ'লে যোগের পূর্ণতা আসে না। যদি একটী অপূর্ণ থেকে যায়, তা হ'লে যোগের যে পূর্ণতা তা আসতে বিলম্ব হয়। বিজ্ঞান সাধনা না হলে যোগের উপর (অর্থাৎ ত্রিমার্গ সাধনার উপর) ভর করে commune গড়ে তোলা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে যে commune গঠিত হয়, উহা কখন স্থায়ীভাবে টিকতে পারে না। Heart এর উপর basis করে ত্রিমার্গের সাধনা চলতে পারে। সেখানে যে কোনরূপ commune গড়ে না উঠে তাও নয়, কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার অভাবে উহা কিছুকালের মধ্যেই নষ্ট হযে যায়। ভারতে যত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, সবের মধ্যেই এই বিজ্ঞান সাধনার অভাব ছিল। ভাবের উপর ভর করে চৈতন্যের ধর্ম্ম গড়ে উঠে ছিল, কিছুদিন পরে চৈতন্যধর্ম্মের intensity খুবই প্রবল হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার অভাবে উহা টিকে নাই, বুদ্ধের ধর্ম্ম শুধু জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেখানেও ছিল না higher বিজ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম্মের নিশানা ভারতে নাই—চীন ও জাপানে উহা আশ্রয় নিয়েছে। আরও অনেক অনেক ধর্ম্মের মধ্যে এই বিজ্ঞান সাধনা ছিল না, তাই কোনটিই স্থায়ী হয় নি। বিজ্ঞান সাধনা না হলে commune-এর ভাব থাকতে পারে, অনেক ধর্ম্মের মধ্যে সে ভাব ছিল, কিন্তু এক বিজ্ঞানের অভাবে সকলেরই পতন হয়েছে। এমন কি আর্য্যদের মধ্যেও এই higher বিজ্ঞানের পূর্ণতা আসেনি, তাই সেখানেও যে communeএর খেলা দেখা দিয়েছিল, তাও পূর্ণ হয়নি। এই বিজ্ঞানই এ যুগের নূতন contribution. বিজ্ঞান না হলেও যোগ এবং commune দুই হতে পারে, কিন্তু উহা mental planeএর যোগ, এই mental planeএ এসে সকল রকম সাধনা সম্ভব, তবে উহাদের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প। কর্ম্ম করবার সময় কর্ম্মের প্রাণমন্ত্র তার

যাহাতে না আসে সে দিকে সাবধান থাকতে হবে। কর্ম্ম করতে হবে, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে এমন একটা শান্ত স্থির অবস্থা থাকবে, যেন আমরা কর্ম্মের উপরে গিয়ে অবস্থান করতে পারি। এই বিজ্ঞানের শান্ত অবস্থা না আসলে কর্ম্মের প্রমত্তভাব মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা আছে। বিজ্ঞান সাধনার অভাবেই কর্ম্মের প্রমত্ত অবস্থা আসে।

অন্তরাত্মার বল

(Soul force)

বুদ্ধদেব বলিতেছেন

"ন হি বেরেন বেরাণি সম্মন্তীধ কুদাচন।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।
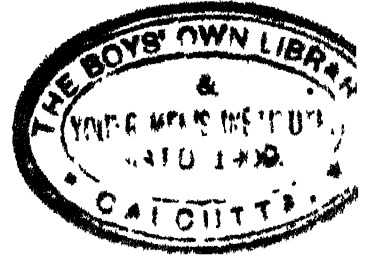
শত্রুভাবকে কখন শত্রুভাব দিয়া জয় করা যায় না, শত্রুভাবকে মিত্রভাব দিয়াই জয় করিতে হয়—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

খৃষ্টও বলিতেছেন, "Resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also."—অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে যাইও না, এক গালে কেহ যদি তোমায় চপেটাঘাত করে, আর গালটি পাতিয়া দিও।

শ্রীচৈতন্যও বলিতেছেন—

মেরেছ মেরেছ কলসী কাণা।
তাই বলে কি প্রেম দিব না॥

বুঝিলাম কথাটা। কিন্তু তবে এ আবার কি দেখি? কৃষ্ণের মুখে এ কি ভৈরব বাণী—

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং সম্ভবামি যুগে যুগে * *
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—

এমন কি খৃষ্টও জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, 'I come not to sow peace, but discord." শান্তির নয়, আমি আসিয়াছি কলহের বীজবপন করিতে"—

I come not to send peace, but a sword" "শান্তি বিতরণ করিতে আমি আসি নাই, আমি আসিয়াছি অসি বিতরণ করিতে"—

শুধু কথায় নয়, কার্য্যতঃও খৃষ্ট পশুবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, স্বহস্তে চাবুক চালাইয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে, এ সব হইতেছে ভগবানের কথা, মানুষের কথা নয়। দণ্ডবিধান ভগবানেরই কাজ—Vengeance is Mine! মানুষের কাজ অহিংসা। কিন্তু ভগবান ত শূন্যে শূন্যে কিছু করেন না, তাঁহারই একটা সৃষ্ট পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তবে তাঁহার কার্য্য তিনি করেন। ধ্বংসের কাজ করিতে হইলে তিনি প্রাকৃতিক শক্তিকে আশ্রয় করেন, আবার মানুষরূপও আশ্রয় করেন। দণ্ডদাতা মানুষের মধ্যেই তিনি দণ্ড দণ্ডোদমতামস্মি। ভগবান দণ্ডদাতা বলিয়া মানুষ যে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে এমন নয়। তাই ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ক্লৈব্য কার্পণ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে উত্তেজিত উৎসাহান্বিত করিতেছেন, বলিতেছেন—

"ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি

"যুদ্ধ কর-তবে, এতে তোমার কোন পাপ হইবে না।"—

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্।

কারণ, "ইহাদিগকে ত পূর্ব্ব হইতেই আমি মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হইবে"।

এখন তবে এ মহাসমস্যার মীমাংসা কি? কথাটা আমরা বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। বৈরীকে বৈরভাব দিয়া শান্ত করা যায় না। আমার মনে যদি থাকে শত্রুভাব, তবে শত্রুর মনে সে ভাব গিয়া ধাক্কা দিবে, সেখানে তুলিবে শত্রুভাবেরই তরঙ্গ, যে লাঠি দিয়া আঘাত করে সহজ প্রতিক্রিয়া বশে আমি যদি তার বিরুদ্ধে লাঠি চালাই, তবে সেও আবার লাঠি চালাইবে—উভয় পক্ষ এইরূপে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দোল খাইতে থাকিবে, ইহার আর শেষ হইবে না। কিন্তু একপক্ষ যদি প্রশান্তভাব অবলম্বন করে, তবে অপরপক্ষও চেতিয়া উঠিবার সুযোগ আশ্রয় বা সাড়া পাইবে না। এ কথাটি আরও সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ, শত্রুভাবের বহিঃচেষ্টা হইতেই বিরত হইলে চলিবে না, হাত পা আমার নিশ্চল হইল, কিন্তু প্রাণ মন গুমরাইয়া মরিতে লাগিল তাহাতে ফল দিবে না। কারণ মনে প্রাণে যতক্ষণ বিক্ষোভ আছে ততক্ষণ তাহা অপরের মনে প্রাণে গিয়া পৌঁছিবেই, আর সেখানে যে প্রতিক্রিয়া হইবে তাহার প্রকাশ শুধু মনে প্রাণে না হইয়া, বাহিরের অঙ্গ চেষ্টার মধ্য দিয়াও হইতে পারে। মন প্রাণ হইতে শত্রুভাবের বীজ পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিতে হইবে, তবেই সে মনের প্রাণের কোন রকম প্রতিক্রিয়া হইবে না। মনে প্রাণে শত্রুভাব রাখিয়া তাহা যত ক্ষীণ হউক না কেন—শুধু তদনুরূপ বাহিরের কাজ হইতে বিরত হইলে, তাহাকে বলে মিথ্যাচার—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

সুতরাং যেখানে ভয় পাইয়া অথবা সামর্থ্য নাই বলিয়া অথবা কৌশলের দোহাই দিয়া প্রতীকার করি না প্রতিশোধ লই না সেখানে আমার সে মিথ্যাচার নিরর্থক, কারণ শত্রু তাহাতে ভুলিবে না, কারণ মানুষের চোখে ধূলা দেওয়া যত সহজ তাহার প্রাণে ধূলা দেওয়া তত সহজ নয়। যেখানে Non violence প্রচার করিতে মুষ্টি আপনা হইতেই দৃঢবদ্ধ, চক্ষু আরক্ত, কণ্ঠ ঘনগর্জ্জিত হইয়া আসিতেছে (এ রকম দৃশ্য একটি আমাদের নিজের চক্ষে দেখা) সেখানে প্রাণের সহজ গতিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা যে কতদূর মিথ্যা, কতখানি বিফল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বোপরি চাই মনের প্রাণের সাম্য ভাব, অন্তরাত্মার প্রশান্ত সহাস সহিষ্ণুতা। অহিংসা আমার অন্তরাত্মার সত্যধর্ম্ম হইয়া উঠা চাই, তবেই সে জিনিষটি যাহাকে শত্রু বলি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইতে পারিবে।

এখন দ্বিতীয় কথা এই, বাস্তবিক এইরূপ ঘটে কি না। আমি শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া মিত্রভাব ধরিলে আমার শত্রুও যে মিত্রভাব ধরিবে এমন কি বাধ্য-বাধকতা আছে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, এই রকম সন্দেহ হয় বলিয়াই বাস্তবে ঘটিয়া উঠে না, মনে আমার যতক্ষণ এই রকম সন্দেহ আছে তাহার অর্থ ততক্ষণ আমার প্রাণে শত্রুভাবের আছে একটা বীজ, আর সে বীজের বিষময় ফল ত হইবেই। কিন্তু এ কথা ছাড়িয়া দিলেও, কার্য্যতঃ এ সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, যুক্তি বা জ্ঞান ইহার সমর্থন করে কি না তাহা দেখিবার বিষয়। আমার স্বভাব যেন বিশুদ্ধ হইল, কিন্তু অপর পক্ষেরও আছে একটা স্বভাব বা স্বধর্ম্ম। আমি সাধু কাহারও কিছু চুরি করি না, তাই বলিয়া চোরে আমার বাড়ীতে চুরি করিতে বিরত হইবে? স্বভাব যাহার হিংসাপরায়ণ সে ত হিংসাই করিবে, আমার অহিংসায় তাহার কি যাইবে

মানিবে? আমি তাহার মনে কোন প্রতিক্রিয়া জাগাইবার কোন অজুহাত না দিতে পারি, কিন্তু সে অজুহাতের অপেক্ষা সে আমার কাছে রাখে না, তাহার নিজের স্বভাবের ভিতরেই তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

চরম অহিংসাবাদের দিক হইতে এ কথার উত্তর যে নাই, তাহা নয়। অহিংসাবাদের মূল ভিত্তি হইতেছে এইখানে যে কোন মানুষ একেবারে খারাপ হইতে পারে না, হাজার পাপী হউক দুঃশীল হউক মানুষের মধ্যে আছে এমন একটি গুপ্তস্থান যাহা কখন মলিন কখন দুষ্ট হইতে পারে না, যেখানে স্পর্শ করিতে পারিলে ভাল জিনিষ ছাড়া খারাপ জিনিস বাহির হয় না। চোর সাধুর বাড়ীতে চুরি করিতে পারিবে না, যদি একবার সে অনুভব করে সেই সাধুর সাধুত্ব। এইটুকু বুঝিতে হইবে, যে অজ্ঞানিত সংস্কার বশতঃ পাপী ধর্ম্মাত্মার উপর অন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে অভ্যাসের পথে সে চলিয়াছে, ধর্ম্মাত্মার স্বচ্ছ অন্তরাত্মা ছিল তখন নিষ্ক্রিয়, ভাল বা মন্দ কোন প্রতিবন্ধকই দেয় নাই। কিন্তু অন্তরাত্মার ধর্ম্ম অভাবাত্মক (negative) জিনিষ নয়, সে শুধু নিষ্ক্রিয়ই থাকে না, তাহার আছে একটা শক্তি, সে মন্দের প্রতিষেধকরূপে মন্দের বিপরীত দিক হইতে তুলিয়া চালাইয়া দেয় একটা ভাল'র তরঙ্গ—ইহারই নাম ত অন্তরাত্মার বল। এই অন্তরাত্মার বলের অনুভব পাইলে, অতি ঘোর পাপীরও স্বভাব প্রতিহত হইয়া যায়। লে মিজেরাবল (Les miserables) গ্রন্থে ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই। জিন ভালজিন কারাগার হইতে ফিরিয়া সমাজের আচার ব্যবহার সমানরূপে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দেখিতে পাইল আর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিল, এই প্রতিশোধের প্রথম পাত্র হইলেন পরম সাধু ধর্ম্মাত্মা বেনভেনুতো মীরিয়েল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জিন ভালজিনের হিংসাপরায়ণ প্রাণ সেই মহাপুরুষের অন্তরাত্মার স্পর্শ পাইল সেই মুহূর্ত্তে তাহারও অন্তরাত্মার কি একটা অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়া গেল। শুধু তাই নয়, মানুষ ত দূরস্থান, বনের পশুও এই অন্তরাত্মার বলের কাছে মাথা নত করে। শ্বাপদ-সঙ্কুল বিষধর পরিপূর্ণ অরণ্যে মুনিঋষিগণ যে কি রকম নিরাপদে বসবাস করিতেন সেই সব ইতিকথা এই সত্যটিই প্রমাণিত করে নাকি?

প্রতিপক্ষের দিক হইতে প্রত্যুত্তরে এই বলা যায় যে, এই রকম অন্তরাত্মার বল দিয়া দুষ্টের স্বধর্ম্মকে আমি নিরোধ (inhibit) করি মাত্র, তাহার স্বভাবকে একেবারে বদলাইয়া দেই না, যাহা করি সেটা হইতেছে সাময়িক স্তম্ভন—আমার দিক দিয়া না হয়, অন্য দিক দিয়া সে স্বভাব ও স্বধর্ম্ম ফাটিয়া বাহির হইবেই। এমন কি জিন ভাল-জিনও মহাপুরুষের স্পর্শের পরেও দুঃখী বালকটির পয়সা কাড়িয়া লইবার ঝোঁক সম্বরণ করিতে পারে নাই, তবুও ত জিন ভালজিন আসলে পাপী ছিল না, তাহার অন্তঃকরণ স্বভাবতই ছিল বিশুদ্ধ, যে ময়লা ধরিয়াছিল সেটা খুব বাহিরে বাহিরে, ঘটনা চক্রের অবস্থার তাড়নার চাপে।

তারপর আর একটি কথা, আমার একলার স্বভাব বিশুদ্ধ হইলেই হয় না, আর সকলের স্বভাব কি রকম সেটাও গণনা করিতে হয়, ব্যষ্টিগত হিসাবে যাহাই হউক না, সেই ব্যষ্টি সমষ্টির ধর্ম্ম অনুসারে সমষ্টির ট্যাক্স না দিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের মধ্যে থাকিলে অন্তরাত্মার বল সত্বেও সাধু যে নিগৃহীত হন না, একের অন্তরাত্মার বল যে সকলের পশুবলের কাছে বিফল হইয়া যায় না, বাস্তবে সব সময়ে তাহার প্রমাণ পাই কি? সমাজের অসাধুত্বের প্রায়-শ্চিত্ত কেবল যে অসাধুকেই করিতে হয় তাহা নয়, সাধুকেও অনেক সময়ে করিতে হয়—বিশেষতঃ যে

সাধু জীবনের সাধক, যাঁহার লক্ষ্য ব্যক্তিগত মোক্ষ বা নির্ব্বাণ নয়, পরন্তু যাঁহার কাজ সমাজের ভিতরে সমাজকে লইয়া।

অসাধুর পাপের ভার তাই সাধুকে লইতে হয়—পাপীর স্বভাবের জের ধর্ম্মাত্মাকে টানিতে হয়। তবে পার্থক্য এই একের যাহা সত্য, অপরের তাহা আরোপ; একের যাহা প্রয়োজন অপরের তাহা ঐশ্বর্য্য। কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করিতে হয়, বিষ দিয়া বিষ ক্ষয় করিতে হয়, কিন্তু এক পক্ষে কাঁটা বিষ হইতেছে আধারের অঙ্গীভূত জিনিষ, আর এক পক্ষে তাহা শুধু ব্যবহার্য্য অস্ত্র বা যন্ত্র। এক পক্ষে রিপুর দাস আমি আর এক পক্ষে রিপুর প্রভু আমি। রিপু জয় হইতেছে ভিতরের কথা, ভিতরের সংস্কার হইতে মুক্তি, কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরে সে রিপুর অঙ্গলীলা পর্য্যন্ত যে লোপ পাইয়া যাইবে এমন কোন প্রয়োজন নাই। রামকৃষ্ণও তাই বলিতেন "সাধু হয়েছিস্ বলে বোকা হবি কেন? ছোবল দিতে তোকে বারণ করি কিন্তু ফোস করতে ত বারণ করি নি।" খৃষ্টও কতকটা সেই ধরণের কথা এক জায়গায় বলিয়াছেন, "Be ye wise as serpents and harmless as doves". গীতাকার খৃষ্ট বা রামকৃষ্ণকে যে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের কথারই জের মাত্র এরূপ বলিলে খুব বেশী ভুল হয় না।

অসাধুর প্রকৃতিকে শুধু নিরোধ করিলেই হয় না, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। অসাধু ভাব হইতে নিবৃত্তিই যথেষ্ট নয়, অসাধুভাবের পরিবর্ত্তে সাধুভাব জন্মাইতে হইবে। সাধুর স্পর্শ একটা সহায় হইতে পারে, খুব একটা বিশেষ সহায়ই হইতে পারে, কিন্তু তবুও তাহা সহায় মাত্র, অসাধুর নিজের অন্তরাত্মার ভিতরে জাগরণ চাই, তাহার দিক হইতেও একটা সম্মতি একটা চেষ্টা একটা সঙ্কল্প একটা তপঃ-প্রয়োগ চাই। নতুবা তাহার স্বভাব পাকাপাকি বদলাইবে না। সাধুর অন্তরাত্মা অসাধুর অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিল সেখানে ফেলিল নূতন জীবনের বীজ, কিন্তু সেই অন্তরাত্মার বীজ মনে প্রাণে দেহে অঙ্কুরিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠা দরকার, অন্তরাত্মায় সাধুসঙ্কল্প জাগিতে পারে কিন্তু স্থূলতর আধারে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তোলাই ত কঠিন, তাই ত কত সময় চক্ষের জল ফেলিয়া বলিতে হয়—The Spirit is willing but the flesh is weak. অন্তরাত্মা ক্রমে ক্রমে তাহার প্রভাব স্থূল আধার fleshএর উপর বিস্তারিত করে, সত্য কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে স্থূল আধারেরও নিজের চাই একটা সাধনা। আর স্থূল জিনিসের প্রয়োজন ত স্থূল সাধনা। যোগীরা যে ঘোর কৃচ্ছ্র সাধনা করিতেন, শুধু ধ্যান ধারণা নয় সেই সঙ্গে ছিল যম নিয়ম, আবার যম নিয়মও শুধু নয়, ছিল শরীর পীড়ন। শুদ্ধিসাধনা জিনিষটার মধ্যেই আছে একটা পীড়ন বা violence, তবে যে জিনিষটা শুদ্ধ করিতে চাই সেটা যত সূক্ষ্ম পীড়নটাও তত সূক্ষ্ম, আবার তাহা যত স্থূল পীড়নটাও তত স্থূল—এ শুধু মাত্রার কথা। এখন এই যে পীড়নটা সেটা নিজে নিজে লওয়া হউ কিম্বা অপরের নিকট হইতে পাওয়া হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না অর্থাৎ তাহার ফল বা উদ্দেশ্য যদি হয় শুদ্ধি। দেবতা যদি অসুরকে পীড়ন করেন তবে তাহা হিংসাপরবশ হইয়া নয়, দেবতার অন্তরাত্মায় বা প্রাণে মনে দেহে হিংসার সংস্কার নাই, তিনি করেন শুধু হিংসার কর্ম্মটি বাহ্য অঙ্গ চেষ্টাটি—গীতার কথায়, কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্, অসুরের স্বভাবশুদ্ধির জন্য। অসুরের আধার যদি এমনি শক্ত কঠিন হয় যে তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হয়; কিন্তু তাহাতে অসুরের অন্তরাত্মা ধ্বংস হয় না, অসুরের অসুরত্বটুকু নষ্ট

করিবার সুবিধা হয় শুধু—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। খাঁটি অহিংসাবাদের অর্থ এমন নয় যে শরীরের হিংসা করিবে না, তাহার অর্থ মনে প্রাণে হিংসার যে ভাব যে তরঙ্গ তাহা রাখিবে না, অন্তরাত্মায় হিংসা নাই, অন্তরাত্মায় আছে শুধু প্রেম বা একাত্মতা। অন্তরাত্মার বলের অর্থ এমন নয় যে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে ন্যায়তঃ কথাবন্ধ করিয়াও বসিয়া থাকিতে হয়। কেবল মাংসপেশীর প্রয়োগ হিংসা, বাক্যপ্রয়োগ হিংসা নয়, ইহা অতি স্থূলবুদ্ধির কথা। মুখে যাহাকে শয়তান বলিতে পারি, হাত দিয়া তাহাকে দু'ঘা দিলেই সব আধ্যাত্মিক যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল, এ রকম সাধনা কষ্ট কল্পনা মাত্র।

আসল কথা আমাদের এই বলিয়া মনে হয় যে আধ্যাত্মিক বা অন্তরাত্মার বল আর আদিভৌতিক বা পশুবল বলিয়া যে দুইটি শক্তি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়, তাহা সব সময় ঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে যে একান্ত পার্থক্যের দাঁড়ি টানিয়া দেওয়া হয় সেটা কৃত্রিম জিনিষ, এখানেও দেখি সেই পুরাতন আদর্শের ছায়াপাত, ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, আত্মাই কাজের শরীরটা বাজে। আমরা পশুবলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি না। আমরা বলিতেছি পশু যখন কেবলই পশু তখনই তাহা হেয়, কিন্তু এই পশুই ত হইতে পারে আবার দেবতার বাহন। আমরা এমনও বিশ্বাস করি যে একদিন হয়ত মানুষ আর পশুবল প্রয়োগ করিবে না, কিন্তু তার কারণ এমন নয় যে পশুবলটা খারাপ হীন, তার কারণ এই যে ও জিনিষটার প্রয়োজন থাকিবে না। বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্‌যাপনের জন্য প্রাণীর এক একটী অঙ্গের আর প্রয়োজন থাকে না, তাহা তখন আপনা আপনিই মরিয়া যায়, সেই রকম পশুবলও একটা নূতন আবহাওয়ায় নূতন ধর্ম্ম কর্ম্মে কোন স্থান না'ও পাইতে পারে। কিন্তু কোন অঙ্গ লুপ্ত হইলেই বলি কি সেটা কুৎসিত হেয় জঘন্য ছিল, না, ছিল না সেটি জীবনেরই অভিব্যক্তি? সেই রকম মানুষের পশু বল যে কুৎসিত জঘন্য হেয়, তাহার অন্তরাত্মার বলেরই অভিব্যক্তি হইতে পারে না, তাহা নয়। মানুষের পশুবল মানুষের যোগ্য নয় তখনই যখন সে তাহাকে ব্যবহার করে পশুভাবে প্রণোদিত হইয়া, মানুষের পশুবল মানুষের অযোগ্য নয় যদি তাহাকে ব্যবহার করা যায় প্রকৃত মানুষভাবে প্রণোদিত হইয়া। মানুষেরও আছে পশুর শরীর, সুতরাং বাহিরের কর্ম্ম এক হইতে পারে, আসল পার্থক্য ভিতরে, সেখানে মানুষের আছে অন্তরাত্মার চেতনা, পশুর আছে অজ্ঞান অন্ধকার। গীতার সমস্ত রহস্যই এই কথায়—অজ্ঞানী আসক্ত হইয়া যে কর্ম্ম করে, জ্ঞানী অনাসক্ত হইয়া সেই কাজই করিতে পারেন।

যোগ
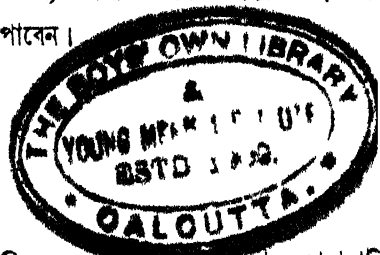
চারিদিক হইতেই সঙ্ঘ সৃষ্টির সংবাদ আসিতেছে, শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে। কিন্তু যোগের ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে সঙ্ঘ আবার এক নূতন বিরোধ সৃষ্টি করিবে, মিলনের ঐক্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত করিয়া দিবে। আমরা আর একবার ধারাবাহিক যোগের কথা কহিয়া যাইব।

যোগে পুরাতনের একান্ত নিরসন হয়। পুরাতন মন প্রাণ বুদ্ধি থাকিতে যোগসিদ্ধি একেবারেই

অলীক স্বপ্ন মাত্র। আর এই যোগ মানুষের চেষ্টায় সুসিদ্ধ হয় না, বাসনা করিলেও ইহা পাওয়া যায় না, প্রতীক্ষা করিতে হয়—অম্বব পুরুষের আহ্বান না আসিলে, যতই চেষ্টা কর, আকুল হও, যোগ মর্ত্ত হইয়া উঠিবে না।

যখন আহ্বান আসে—ভগবান জাগ্রত হইবার ইচ্ছা করেন, তখন জীবনের ষোল আনা ইচ্ছা তাঁর দিকেই নিয়োগ করিতে হয়, মনকে দৃঢ় সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়, জগতের যত কিছু আকর্ষণ—তাহার দিকে মন যাহাতে আকৃষ্ট না হয় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই, ইচ্ছাকে অব্যাহত রাখ, মনকে উন্নত কর তাঁহাকে পাওয়াই জীবনের সব ধর্ম্ম—যোগ ব্যতীত অন্য কোন দিকে ইচ্ছা ও মনকে নিয়োগ করিবে না।

ভগবানের ডাক আসিলে ষোল আনা জীবন দিয়া সেই ডাক শুনিতে হয়। নিজেকে অহংকার মুক্ত না করিলে, ভগবানের ডাকের মত নিজেরে গড়িয়া তোলা যায় না, সেইজন্য চাই আত্মোৎসর্গ। এই আত্মোৎসর্গ কোথায় করিবে, কাহাকে করিবে ইহা লইয়া এক দ্বন্দ্ব। অহঙ্কার এক নূতন ফন্দি বাহির করে—অরূপের কাছে আত্মসমর্পণ করা। যাঁহাদের উৎসর্গ কেন্দ্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, মনকে চোখ ঠারিয়া অরূপের সাধনা তাঁহারা প্রচার করেন, কিন্তু পছন্দসই মানুষ পাইলে তাহার চরণে মাথা লুটাইয়া স্বপ্রচারিত সাধনের ব্যভিচার করেন—এরূপ কপট ভণ্ডদের কথায় বিভ্রান্ত হইও না। রূপের ভিতর দিয়া অরূপের সাধনা সনাতন পদ্ধতির বিরোধী ধর্ম্ম নহে। জগতে সবই ভগবান, তোমার উৎসর্গ ভগবানের নিকট, রূপকে খণ্ড করিয়া দেখিলেই উহা হয় সসীম, তোমার ইষ্টকে ভগবান বলিয়াই প্রেম কর, বিশ্বাস কর, তোমার নিষ্ঠা অচল হউক; অহং দূর হইলেই দেখিবে, প্রস্তর-মূর্ত্তির ভিতর হইতেই তোমার আত্মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। আপনাকে পাওয়ার জন্যই উত্তর সাধকের প্রয়োজন, এই উত্তর সাধক তুমি যেখানে পাও যেমন করিয়া পাও, অটল বিশ্বাসে সেইখানেই তুমি আত্মনিয়োগ কর, অন্তর্য্যামী তোমার জীবনসাধনা সার্থক করিবেন।

ভগবানের আহ্বান কাহারও কাহারও জীবনে আকস্মিক আসিয়া উপস্থিত হয়, কোন কোন স্থলে কোন মহাপুরুষের বিদ্যুৎস্পর্শে ভিতরের ডাক স্পষ্ট হইয়া উঠে। জগদীশ্বরের আহ্বান অনাহত—যেমন করিয়া হউক উহা তোমার শ্রবণ গোচর হউক। তাঁর পথে উঠিতে পারিলে আর কখন পতন সম্ভাবনা নাই। বাহিরের আঘাত যতই প্রবল হউক অন্তরের বল উহাতে বৃদ্ধি পাইবে—প্রতিবন্ধক প্রেমের আকর্ষণ বর্দ্ধন করে।

অকস্মাৎ যোগস্পর্শ সকলের ভাগ্যে সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। মন চাহিলেও স্বভাব আমাদের অনুকূল নহে। এই স্বভাবের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া মন স্বভাবতই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; কখনও কখনও যোগের কথা ও ইহার ফল দেখিয়া বুদ্ধি ইহার জন্য আকৃষ্ট হয়। মানুষ যোগ্য হইবার জন্য অনেক কৃচ্ছ্র সাধনও করে, জীবনের উন্নতি যে ইহাতে কিছুই হয় না—এরূপ নহে, তবে আধারকে অধোমুখী স্বভাবের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধভাবে গড়িয়া তুলিতে জীবনের সব সময়টুকুই ফুরাইয়া যায়। কতজন্ম মানুষ তপস্যা করিতেছে ভগবানকে পাইবার জন্য, প্রতিজন্মের অর্জ্জন সংগৃহীত হইলেও ভাগবৎ স্বভাব লাভের জন্য প্রচুর শক্তির অনুপাতে উহা নগণ্য—ভগবানের ইচ্ছা জাগ্রত না হইলে মানুষের চেষ্টায় কিছুই হইবার নহে ইহা ধ্রুব জানিবে। যোগের ফল দেখিয়া কেহ কেহ বুদ্ধি দিয়া উহা আয়ত্ত করিবার জন্য হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে, জীবনের সকল শক্তিই উহার জন্য নিয়োগ করে কিন্তু চাই ভগবানের চাওয়া;

তিনি যে দিন চাহিবেন—সেই দিনই পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিবে মূক বাচাল হইবে; আকুল হইলে কি হইবে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ফকির সাজিলে কি হইবে, ধনের লোভ অপেক্ষা ভগবানের লোভ কত প্রবল তাহা কি আর বলিয়া জানাইতে হইবে? মন বুদ্ধি প্রাণের ইচ্ছায় কিছু হইবে না। ভগবানের জন্য স্থির ও সুস্থ জীবন লইয়া যে এক দৃষ্টে বসিয়া আছে তাঁহারই প্রতীক্ষায়, ভগবানের আগমন দিন তাহার নিকট অদূরবর্ত্তী জানিবে। বাসনা ছাড়িয়া দাও চেষ্টা বিসর্জ্জন কর। তিনি জাগুন এই ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া রাখ।

যোগই তাঁর জাগরণ লক্ষণ। এই যোগ প্রাপ্তি গোপন রহস্য হইতেছে যোগকে উপায় স্বরূপ না লইয়া জীবনকে যোগময় করিয়া তুলিতে হইবে। যোগ জীবনের একটা প্রধান অংশ মনে করিয়া আত্ম প্রতারিত হইও না, যোগকে জীবনের সবখানি বলিয়া গ্রহণ করিও।

ভগবানের ইচ্ছা যদি জাগিয়া থাকে, দেখিবে, তোমার অন্তরের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—মনের ঘরে যে মানুষ বসিয়া কেবল আত্মতৃপ্তি ও আপনাকে বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছিল, তাহার অধঃপতন হইতে আরম্ভ করিয়াছে, মনের তৃপ্তি প্রাণের বাসনা চরিতার্থের পরিবর্ত্তে ভগবানের ইচ্ছা, মন ও প্রাণ দিয়া সুসিদ্ধ হইবার জন্য পুরাতন স্বভাব ও প্রথাগুলি আমূল পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবনের সাধারণ গতি রুদ্ধ হইয়া—স্বভাবের গতানুগতিক ধারা বিপরীত মুখী হইয়া উজান বহিতে আরম্ভ করিতেছে তোমার মধ্যে যাহা ছিল তাহার কোনটাই বিনষ্ট হইতেছে না, অতি কদর্য্য প্রবৃত্তির স্রোতটীও দেবজীবন লাভের উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। জীবনের কোন জিনিষটী বিসর্জ্জন দিবার নহে—সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া দেবজীবনের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

কাজটী সোজা নহে। মানুষের উত্তম স্বভাবটী রাখিয়া মন্দগুলির পরিবর্ত্তন অসম্ভব জানে অন্যান্য যোগে উহার একান্ত পরিবর্জ্জনই উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, জীবনধারণের উপায় স্বরূপ কোন কোন বৃত্তি রাখিয়া অপর সব বিরোধী ধর্ম্মগুলিকে সংহার করাই যোগীর প্রকৃষ্ট সাধনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এরূপ করিব না। ভগবান যদি অবতরণ করেন এই মর্ত্ত্যজীবনে, তবে জীবনকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আছে সবগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিশুদ্ধি বাঞ্ছনীয়। মন্দগুলিকে ত্যাগ করিয়া ভালগুলি তাহাকে উপহার স্বরূপ দিব না, সর্ব্বস্ব দিব—সত্য মিথ্যা—প্রেম ঘৃণা—বিরোধ মিলন—জীবনের সব বৃত্তিই তিনি গ্রহণ করুন—আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সহিত সংযুক্ত নিত্য অনিত্য সকল পদার্থই ভাগবৎ সাহায্যে নূতন হইয়া উঠুক; আমরা কেবল আত্মার মুক্তি চাহি না, চাহি ভাগবৎ জীবন—জীবনের পথ দিয়াই উহা সিদ্ধ করিয়া তুলিব।

সাধারণ মানুষ জানে তাহার জীবন খুব সরল খুব স্বচ্ছন্দ। যেখানে বাধা যেখানে দ্বন্দ্ব তাহাকে পাশ্বপক্ষে পরিহার করিয়া চলে—সাধনাও তদ্রূপ হইয়াছে। জীবন যেখানে জটিল সে ক্ষেত্রে জীবন অতিক্রম করাই ধর্ম্ম। হৃদয় বৃত্তি যে ক্ষেত্রে উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গের মত অস্থির, উহাও পরিবর্জ্জন করি হয়ত কেহ শাস্ত্রবিচারে তন্ময় হইবার প্রচেষ্টাকে ধর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করেন। ইহাদের বাহিরটা দেখিলে মানুষ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভিতরে পশুত্বের তাহারব নীরব হইয়া কোন একটা উন্নততর জীবের ছাঁচ লয় নাই। পূর্ণযোগী ভিতরে একটা সামঞ্জস্য আনিতে চাহে। ভিতর হইতে ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়া বহির্জীবনে তাহার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিবারই তাহার ইচ্ছা। এই ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা কি দেখিতে পাই—বুদ্ধির প্রতি

অংশ, মন প্রাণ এমন কি শরীরের প্রতি ধর্ম্মটি পরস্পরের সহিত পরস্পর বিরোধী হইয়া আছে, জীবনের অর্দ্ধেক চিন্তা অর্দ্ধেক ভাব অনুভূতি বাহির হইতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়া আছে, কাজেই আত্ম-জীবনকে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিলেও, এই বাহিরের জীবন অসিদ্ধ থাকিতে পূর্ণযোগীর মুক্তি বিড়ম্বনা মাত্র।

যাঁহারা আত্মমুক্তি চাহেন, তাঁহারা প্রধানতঃ জীবনকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, হয় জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া জ্ঞান দিয়া সমস্ত মায়া বলিয়া উদাসীন থাকেন, নয় অন্তরের ধর্ম্মকে সার্থক করিয়া বাহিরের গণ্ডগোলে মাথা ঘামাইতে অস্বীকৃত হয়েন। ভক্ত যে সে সোজাসুজি ভগবানকে হৃদয়ে ধরিয়া হৃদয়ের আবেগ অনুসারে—এক শ্রেণীর লোকের সহিত অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট বিপরীত অস্তিত্বের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। আর জ্ঞানী প্রাণ ও হৃদয়ের ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া সোটান অন্তর্দ্ধানের উদ্যোগ করেন। অখণ্ড আত্মবোধে বিপুল মানব জাতির মুক্তিব্রত যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তিনি কোন একটী খণ্ড ধর্ম্মে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। নিজেকে অনন্ত শক্তির আধার স্বরূপ করিয়া জগতের যত বিপরীত ধর্ম্ম ও অবস্থা আছে সকলের মধ্যে একটা দৈবী শৃঙ্খলা আনয়নের সাধনা করেন, নিজের জীবনের মধ্যে যেমন সকল বৃত্তির যোগাস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শান্তিলাভ করেন তেমনি পৃথিবীর সমাজ জীবনে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করেন—আমরা এই যোগের আলোচনা করিব।

বিশ্বমানবতা ও দেশাত্মতা

—— ·:০:· ——

উপনিষদের উদার ও উদাত্ত সুর বাঙ্গালীর বিশাল হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া বাংলায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা তাহা এখন বিচার করিবার কোন আবশ্যক নাই কিন্তু ব্রাহ্মদিগের ভাষায় বাক্যে, রীতি নীতিতে আমরা সাম্প্রদায়িকতার যথেষ্ট প্রতিবাদ লক্ষ্য করিয়া থাকি। একান্ত উদার ও একাত্মবোধ লইয়া ব্রাহ্মভাব ও ব্রাহ্ম রীতিনীতির মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ না করিলে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মদিগকে আমরা সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতিবাদমূলক একটী বিশিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যকিছু মনে করিতে পারি না—তজ্জন্য তাঁহারা যখন বিশ্বধর্ম্ম ও বিশ্ব-মানবতার দোহাই দিয়া দেশীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা কহেন তখন তাহা সুযুক্তিপূর্ণ মতবাদহিসাবে গ্রহণ করিতে কোন বুদ্ধিজীবীরই কোন আপত্তি থাকিতে পারে না কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রাণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। যতই সুযুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করি না কেন অন্তঃকরণের মধ্যে যে পরাণ-পুরুষ বসিয়া আছেন তিনি অনবরত অনুভব করিয়া চলিতে-ছেন কোন্ কথাটি প্রাণের আন্তর ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। যে কথা অন্তঃকরণের ঔদার্য্য ও ঐশ্বর্য্য হইতে প্রসূত হয় নাই সাহিত্যের উদার অর্থব্যঞ্জক শব্দরূপে তাহা গণ্য হইলেও তাহার সীমাবদ্ধতা খুব

সহজেই ধরা পড়িয়া যায়, আর সীমাবদ্ধ যে তাহার অঙ্গের আঘাত আমার সীমাবদ্ধ অন্তঃকরণ অতি সহজেই বুঝিতে পারে। অতএব ঐরূপ স্থান হইতে বিশ্বমানবতার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমরা বিশ্বমানবতার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই বরং উহার একটা বিকৃত অর্থই আমরা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবনা যাঁহাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন বিশ্বমানবতার এইরূপ অর্থ করা অসঙ্গত হইবে না যে, দেশের পারিপার্শ্বিকতার সহিত প্রথম হইতেই একটা নিবিড় সহানুভূতিসূচক সম্বন্ধবোধ না থাকায় দেশাত্মবোধের একান্ত অনধিকারী ব্যক্তি যখন আত্মতৃপ্তির জন্য বিদেশের কোন রীতিনীতি ও ভাব অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন তখন মনে করেন তাঁহাদের ঐ বিদেশীয় সাহায্যের আবশ্যকতা তাঁহার অন্তঃকরণের এক বিশ্বভাব হইতে অনুভূত হইতেছে এবং তাঁহাকে ইঙ্গিতেও যদি আত্মামোদী ব্যক্তি বলিয়া কেহ প্রকাশ করিতে থাকেন তখনই তাঁহার মধ্য হইতে এক বিশ্বমানবতার উদ্ভব হইতে আরম্ভ হয়। সত্য সত্য ইহাই যদি বিশ্বমানবতা হয় তাহা হইলে তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কিছু করা যায় না। অন্য দিকে দেশ কাল পাত্র, সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল সর্ব্বপাত্রের সহিত একাত্মবোধ লইয়া, সকলের মধ্যে সকল সময়েই যে এক আত্মা বিরাজ করিতেছে সাধনদৃষ্টি বলে তাহা অবগত হইয়া যখন বিশিষ্ট দেশ ও বিশিষ্ট ধর্ম্মের শতমুখে প্রশংসা হইতে থাকে তখন পূর্ব্বোক্ত বিশ্বমানবতা ত আরও ফিকা হইয়া যায়। সেই সময়ে ইঁহারা যদি জলদগম্ভীর স্বরে প্রকাশ করেন যে বিশেষ দেশের শিক্ষা ও সাধনা সময়োপযোগী সামান্য পরিবর্ত্তন লাভ করিলে মানবের সঙ্কীর্ণ আত্মার মধ্যেই সত্য সত্যই বিশ্বাত্মার উদয় হইবে, একই আত্মার বিভিন্ন রূপকে—দেশ জাতি ও ব্যষ্টিকে সেই পরম বিশ্ব-আত্মার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে জগতে বিশেষ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিজাত সকল দ্বন্দ্বেরই মীমাংসা হইয়া যাইবে, তাহা হইলে এই জাতির স্বাদেশিকতাকেই আমরা প্রকৃত বিশ্বমানবতায় অভিষিক্ত না করিয়া পারি না। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবন গঠন করিয়া এইরূপ দেশপ্রীতি যদি ভারতবর্ষ লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে বিশ্ব-মানবতার দোহাই দিয়া আমরা ভারতকে "জাতীয়তায়" অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইবার বক্তৃতা দিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করি না।

বোমা ও রিভলবারের উদয় হইলে এবং স্বদেশী যুবকদিগের লুণ্ঠন কার্য্যের গোপন সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িলে ১৯০৮ সালে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় চরিত্রের অধোগতি দেখিয়া ক্ষোভেদুঃখে, একান্ত বিরক্তিতে তীব্র ও কর্কশ ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন দেশনিষ্ঠাযুক্ত অনেক স্বদেশীই রবিবাবুর প্রতি বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই মন্তব্যের সম্বন্ধে অনেকেরই হয়ত দ্বিমত থাকে নাই কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের দেশ-উৎসের যে আভাস পাওয়া যাইতেছিল সেইটাই বহু প্রতিবাদ ও সন্দেহের মূল। ভালই হউক আর মন্দই হউক দেশ ব্রাহ্মদিগের কণ্ঠনিঃসৃত ঔদার্য্যের মহাত্ম্য বর্ণনা শ্রবণ করে নাই—ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকেই দেশসেবক আছেন, দেশও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে কিন্তু তাঁহাদের সেবার দ্বারা দেশ-আত্মার জাগরণ কেবল সেইরূপেই হইতে পারে যেরূপে ইংরাজ আগমনে ও ইউরোপীয় সভ্যতাগ্রহণে আমাদের দেশে নবযুগের সম্ভব কল্পনা করা যায়। উপনিষদের সূত্র ধরিয়া,

বিভিন্ন দেশের জগৎকল্যাণকামী ধর্ম্ম পিপাসুর হৃদয়ের ধারা অবগত হইয়া, জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবলবেগের সন্ধান লাভ করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার এক ভারতীয় সংস্করণ যে দেশ-আত্মার জাগরণের সুষ্ঠু বিধান নহে, উপরে উপরে তাহার আবশ্যকতা থাকিলেও, তাহা যে সহজ পন্থা নহে তাহা দেশ একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই বসিয়া আছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আদিব্রাহ্ম সমাজের অর্থাৎ বিশিষ্টভাবে ব্রাহ্মকাণ্ডের উপনিষদ শাখার তলে বাস করিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের বন্ধুত্ব লাভের পরে যখন দেশকবি হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিতে-ছিলেন তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম বোধ হয় বা সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ দেশ সাধনায় ব্রাহ্মমার্গ ও দেশোদ্ধারে ক্রন্দননীতি ত্যাগ করিয়া সত্যই সহজ ও নবপন্থাই অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৮ সালে তাঁহার চুম্মুখ ভাষায় দেশ আবার ভাবিতে লাগিল রবি আবার কোন্ গগনে উদয় হইতেছেন? সেই সময়টা সত্য সত্যই দেশের একটা দুঃসময়। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বপ্রীতিমূলক আমাদের দেশ-আত্মার সহিত যোগযুক্ত হইবার আমরা যে সাধনা করিতেছিলাম তাহার পথে উহা বিষম অন্তরায় হইয়া উঠে। ইউরোপের সংস্পর্শের ফলে আমরা যে জাতিবোধ পাইয়াছি তাহার মধ্যে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষভাব বেশ লুকাইয়া আছে। সূক্ষ্মবুদ্ধি বিপিনচন্দ্র ম্যাজিনির ইতালির সূক্ষ্ম স্বদেশ-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা দিয়া তাহাকে বিশেষ কিছুই উন্নত করিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দপ্রোক্ত ভারতীয় ভাব অবলম্বনে কেবল আমরা উহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। বিবেকানন্দ ভারতীয় চরিত্র ও ভারতীয় সভ্যতাকেই দেশ উদ্বোধনে উপযোগী বুঝিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতীয় রীতিনীতি আচারনিয়ম জাতিধর্ম্ম সকলের সহিত বিশিষ্ট একাত্মবোধ লইয়া ভারতের ভাগবৎ সত্তাটী উদ্ধার করিতে পারিলে আমাদের চরিত্রে যে বিপুল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতে পারে, যাহাতে আমরা ভারতেরই কার্য্য করিব কিন্তু ভারতবর্ষ বিশ্বের সম্মিলনস্থান হইয়া উঠিবে—এই সাধনাটী ভারত রাজনীতিমার্গেও অবলম্বন করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন ইহার জন্যই নব আন্দোলন ও নবযুগের অগ্রদূত।

কিন্তু তাহাকে পাশ্চাত্য দেশবোধের মধ্য দিয়াই যাইতে হইতেছিল। আমাদের যে-কোন রীতিও যে-কোন ভাব অন্তরে অনন্ত সম্ভাবনাময়তা পোষণ করিয়া সগর্ব্বে আগুয়ান হইতেছিল। কিন্তু তাহা অন্তরের বিশ্বপ্রেম অধিকার করিতে। তাহাকে যখন রূঢ় ভাষা ও কর্কশ শব্দে ধিক্কার দেওয়া হইল তুমি অধঃপাতের অতল তলে প্রবেশ করিতেছ তখন তাহার লড়াইয়া বৃত্তি, তখন তাহার তৎকালীন আত্মপরিশুদ্ধিমূলক ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ একেবারে সংগ্রাম বাধাইয়া দিল রবীন্দ্রের ক্ষীণ অথচ কর্কশ কণ্ঠের বিরুদ্ধে। তিনি যাঁহাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের ক্ষোভের ও ক্রোধের পরিচয় আমরা দিতেছি না, কেবল জাতিবোধের খণ্ডতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রতি যে যে আরোপ ছিল তাহার সূত্র ধরিয়াই ভারতের জাতীয় উপাসকগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যে ভারতীয়তা বিশ্বমানবতারই নামান্তর।

ইহাতে দোষ হইল এই দেশাত্মতার মধ্যে সাধারণতঃ যে খণ্ডতা থাকিয়া যায় আমাদের মধ্যে তাহাই একরূপ দাঁড়াইয়া গেল। সাহিত্যে ইতিহাসে পর্য্যন্ত আমাদের ধারাবোধ অর্থে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আদর্শের বোধরূপেই গণ্য হইতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মযোগীন্ ও ধর্ম্ম পত্র কয়েক মাস বিশুদ্ধ ও উচ্চ স্বদেশপ্রেম প্রচার করিয়া বন্ধ হয়

হইলে হয়ত আমরা অভীপ্সিত ফল পাইতাম। কিন্তু তাহা হয় নাই। মানুষের ঠিক আত্মদর্শন না হইলে মানুষ দোষে গুণেই আত্মদর্শনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। নেতাদের পক্ষেও তাহাই। রবীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র ইত্যাদি যখনই কোন উচ্চ ও বিশ্বমানবতাসূচক মতবাদ প্রকাশ করিতেছিলেন তখনই একটা ধারণা হইতেছিল স্বদেশীযুগের সাধনস্রোত হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া ইঁহারা মনঃকল্পিত কতকগুলা বড় বড় কথারই অবতারণা করিতেছেন। ধৈর্য্য সাহস ও উদ্যম না থাকিলে লক্ষ্যভূমি স্পর্শ না করিয়া অনেককেই বসিয়া পড়িতে হয়, ইহা সত্য কথা। ভূমি স্পর্শ করিতে যাইয়া লক্ষ্যের তারতম্যও হইয়া থাকে। সেই সময়ে দোষারোপ কলহ মতানৈক্য খুবই স্বাভাবিক। এই সময়ে আবার দেশাত্মতা বলিয়া যে জিনিষটা আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল তাহাকে রবীবাবুর ভাষাতেই গালি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে বিশ্বমানবতার নামে রবীবাবু গালি দিয়াছিলেন সেই বিশ্বমানবতার পথের কণ্টক স্বরূপ না হইয়া দেশাত্মতা-বিশ্বমানবতা রূপ অপূর্ব্ব ভারতীয় সত্তায় সত্তাবান হইবার যে দৈবী ইঙ্গিত আমরা লাভ করিয়াছিলাম, তাহাকে উদ্ধার করিবার পক্ষে বিশ্বমানবতার পক্ষীয় ও দেশাত্মতার পক্ষীয় উভয় সম্প্রদায়ই আমাদের সাধনার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহারা আবার খুব ভাল কার্য্যই করিয়াছেন। ইউরোপীয় নেশনবোধ লইয়া ভারতকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল এবং উহা বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতীয়ের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করিবে। কিন্তু ইউরোপীয় প্রথা লইয়া ভারতীয় চরিত্রলাভ এবং বিশ্বের নবজাতি গঠন একান্ত সহজ নহে, একরূপ অসম্ভব। নিজের ভাগবৎ সত্তায় উদ্ধার করিয়া ভারতের ভাগবৎ গতি ধরিতে হইলে একটা নিবিড় কর্ম্ম সাধনা, একটা বিরাট জ্ঞান সাধনা ও একটা নির্ম্মল প্রেম সাধনার আবশ্যক। এই হট্টগোলে যাঁহারা সত্য সত্যই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এই হট্টগোলের মধ্যে যাঁহারা আরও ব্যাকুল হইয়া অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে দেশ-যোগের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, দেশের আগে ভগবান অর্থাৎ ভাগবৎ জ্ঞানের উপরেই দেশকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহা হইলে বিশ্বমানবতাই স্বাদেশিকতা ও স্বাদেশিকতাই বিশ্বমানবতায় পরিণত হইবে। এ অপূর্ব্ব সাধনা তাঁহারা যেরূপ ভাবে করিয়াছিলেন দেশকে সেভাবে সকল ছাড়িয়া এমন কি দেশজ্ঞান পর্য্যন্ত ছাড়িয়া এরূপ অপূর্ব্ব যোগকৌশল লাভ করিতে আহ্বান করা যায় না। পাশ্চাত্য নেশনবোধ যে দেশের আকাশে বাতাসে খেলিয়া বেড়াইতেছে তাহাকে অবলম্বন করিয়াই বা তাহাকে তৃপ্তি দিয়াই আমাদিগকে ভাগবৎ কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে বিশ্বমানবতা ও দেশাত্মতায় কোন বিরোধ থাকিবে না। হৃদয়টা ভাগবৎ প্রেমে ভরিয়া গেলে তাঁহার বাক্যে পরিবারের কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়াও বিশ্ব প্রেমের সঞ্চার হইবে। বিশ্বমানবতাপূর্ণ হৃদয় না হইলে বিশ্বমানবতার কথায় বিপরীত ফলই প্রসব করে।

ভারতবর্ষ বহু ঘাত প্রতিঘাতে এইস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিদেশী নেশনবোধ যাহা চায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইতে হইলেই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বদেশীযুগ নন্‌কো-অপারেশন কত বড় জিনিষেরই না ইঙ্গিত করিতেছে ; তাহাকে সম্যকরূপে পাইবার জন্য প্রতিবাদরূপেই হউক বা অসম্পূর্ণ বোধ লইয়াই হউক যাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কোন দুঃখ নাই। ব্রাহ্মগণ ও রবীন্দ্রনাথ তজ্জন্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু অন্তর্দর্শী হইয়া

সমন্বয়বার্ত্তার মধ্যে সকলের সকল প্রকার সাফল্য দানই এই যুগে করিতে হইবে। ব্রাহ্ম, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী, নন্-কো-অপরেটর সকলে যদি ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন তাহা হইলে কার্য্য খুব সহজেই সম্পন্ন হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদের ভালমন্দের প্রভাবের আলোচনার সহিত অপূর্ব্ব বিশ্বমানবতা-দেশাত্মতার আলোচনার অবতারণা করিলাম।

সময়ের ইঙ্গিত

-০:-

১৯০৫ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত আমরা যেন অন্য এক জগতে ছিলাম। ১৯২১ সালে অনেক নূতন কথা শুনিয়েছি, অনেক নূতন কিছু দেখিয়েছি, মানুষের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, অনতি-কাল মধ্যে জগতে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন আশা দুরাশা নহে; গতি যখন উর্দ্ধমুখী তখন সে পরিবর্ত্তনে মানবের কল্যাণ বিধান হইবে ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

কতদিনের পরাধীন জাতি আমরা, সহস্র প্রকারের দুর্ব্বলতা সঙ্কীর্ণতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উপর বেতো সীমাবে, রাজকর্ম্মচারী দিগের আচার ব্যবহারে, প্রতিপদক্ষেপেই আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, জগতের চক্ষে আমরা কত হীন কত তুচ্ছ তা স্পষ্ট হইয়া উঠে—ঘৃণায় অপমানে বড় ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি, নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত শৃগাল কুক্কুরের অধম অজস্র লাঞ্ছনা আর যেন সহ্য করিতে পারি না, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি ময়মনসিং জেলার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কঠোর আদেশ হৃদয়ে বজ্রাঘাত করিয়া সেদিনও বুঝাইয়া দিয়াছে আমরা একান্তই পরানুগ্রহভিখারী, মরণাপন্ন একটী অসহায় দুর্ব্বল জাতি—উপায় একমাত্র মৃত্যু, তাহাও তিল তিল করিয়া অসহ্য যন্ত্রণাসহ ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতে হইবে।

এইরূপ নিরুপায় অবস্থায় ইংরাজ সম্রাটের মুখে ভারতের স্বরাজ ঘোষণা যখন স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে রাজ-কর্তৃপক্ষগণের এক প্রকার ত্রুটী স্বীকার ডিউক-অব্-কনটের বাণীতে যখন প্রকাশ হইয়া পড়ার কথা মনে পড়ে—তারপর সেদিন কনভোকেশন সভায় মহামতি রোণাল্ডসে যে আশার কথা শুনাইলেন, এই সকল ভাবিয়া আমরা যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাই, সময়ের একটা পরিবর্ত্তন আসিতেছে বুঝিয়া আশ্বস্ত হই, মনঃ প্রাণে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়—হায়রে এ জগতে বাঁচিবার সাধ কাহার নাই!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈদেশিক শাসনকর্ত্তৃপক্ষ-গণের মুখে এইরূপ আশাবাণী স্বপ্নের মতই দুর্লভ ছিল। যে ইংরাজের মুখে শুনিয়াছি "অসিবলে ভারত জয় হইয়াছে, অসিবলেই ভারত শাসিত হইবে" "ভারত-বর্ষ কোনকালে স্বরাজ পাইবে কিনা সে কথা বলা যায় না" প্রভৃতি—সেই ইংরাজের মুখ হইতেই যখন "স্বরাজ" মন্ত্র উচ্চারণ হইতেছে শুনি, যখন রাজার জাতির সহিত ভারতবাসীকেও যোগ্য আসন অধি-কার করিতে দেখি, তখন কি নবযুগের শুভলক্ষণ বলিয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে না? এই সকল দেখিয়াই আমরা ভারতের ভাগ্যচক্র যে উর্দ্ধপথে বিবর্ত্তিত হইবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

বাংলার শাসনকর্ত্তা মহামতি লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর সুবিবেচক, চিন্তাশীল, তাঁর সকল কথার মধ্যেই বহুদিন হইতে আমরা একটা নূতন কিছুর আভাস পাইয়া আসিতেছি। বৈদেশিক শাসনকর্ত্তাদের মুখ হইতে সহানুভূতিপূর্ণ মধুর আশ্বাস শুনিলে, আমরা সহজে নিঃসংশয় হইয়া উহা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, ভারত সমাজ্ঞী পুণ্যময়ী ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীর প্রতি যে করুণাবাণী প্রচার করিয়া ছিলেন, তাহাও চোতা কাগজ বলিয়া যখন পরিত্যক্ত হইতে পারে, তখন দান হিসাবে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা একেবারেই আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি। তবে সম্প্রতি রোণাল্ডসে বাহাদুরের কথাগুলি এমন সরল মধুর যুক্তিপূর্ণ হইয়াছে যে উহা অসার শর্করা মিশ্রিত ভাজাল মাল বলিয়া পরিত্যাগ করা চলে না, তাঁহার প্রতি বাক্যটী হৃদয়ের মঙ্গল ইচ্ছাকে যেন মূর্ত্ত করিয়া ধরিয়াছে।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা চায়। নরম গরম সকল শ্রেণীর দেশভক্তই উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্রই উচ্চারণ করিতেছে—ইংরাজরাজেরও ইহাতে অসম্মতি নাই, নূতন শাসন সংস্কার প্রণয়ন ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই নূতন নীতি অনুসারে পরিচালিত হইয়া দেশ যদি যোগ্যতা দেখাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আরও অধিক অধিকার সে লাভ করিবে, এইরূপে ক্রমে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অন্যান্য মিত্ররাজ্যের মত স্বাধীন ভাবেই রাজ্য পরিচালনা করিবে—শত শত বৎসরের পরাধীন জাতির কাছে ইহা বড় কম আশার কথা নয়।

বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী চাহেন এই দশবৎসর কালকে আরও ক্ষিপ্র করিয়া আনিতে, সময় সংক্ষেপ করিতে হইলে পন্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং কর্ম্মের ভঙ্গীও অনুরূপ হইবে—অসহযোগীতা ব্রত সাধন করিয়া দেশ নেতৃগণ অচিরেই স্বরাজলাভের প্রয়াসী। লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর এইরূপ পরিবর্ত্তনে অসুখী নহেন, তিনি বলেন "I have no objection to change. What I object to is change that is violent, abrupt, catastrophic, in other words revolution. পরিবর্ত্তনে বাধা নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবর্ত্তন আমিও চাই, আমি আপত্তি করি এরূপ পরিবর্ত্তন যাহাতে প্রচণ্ড বিপৎপাতের সৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ বিপ্লবের সম্ভাবনা না থাকে। তারপর বলিয়াছেন "what I welcome is change that can be brought about harmoniously without violent and destructive dislocation of the existing order—in other words evolution. অর্থাৎ আমি যে পরিবর্ত্তন চাহি উহা বর্ত্তমান শৃঙ্খলার প্রতিরোধী ধ্বংসনীতি অবলম্বন না করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবেই আনিতে পারা যায়। অন্য কথায় ক্রমোন্নতির ধারানুসারে।

মত বিরোধ এইখানেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। যাহা পাইতে হইবে—তাহা যতশীঘ্র পাওয়া যায়, যাহারা পাইবে তাহার জন্য তাহাদের ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। এবং এই পাওয়ার প্রচেষ্টাকে খর্ব্ব করিয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। অধুনা দেশ যে পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাহা অবৈধ প্রচণ্ড নীতি নহে, ত্রিশকোটী প্রজার স্বাধীনতালাভের প্রয়াস যদি রক্তপাতের কোনই সম্ভাবনা সৃষ্টি না করে, ধৈর্য্য সহকারে ইহার গতিলক্ষ্য করিয়া চলাই রাজশক্তির পক্ষে কল্যাণজনক হইবে, ইহার বিপরীত আচরণ ঘটিলে—রাজা প্রজা উভয়েরই মধ্যে অকারণ ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য

সাবধান হইয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত non-violent non-co-operation যথারীতি মানিয়া চলিলে রাজশক্তির দিক্ হইতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা আমরা আশা করিতে পারি না। দেশ আজ Revolution চাহে না, শাসনকর্ত্তাদের অভিপ্রায় মত evolution এর মধ্য দিয়াই অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছে; রাজা প্রজার মধ্যে প্রভেদ কেবল গতিভঙ্গী লইয়া, একপক্ষ নূতন শাসননীতি অনুসারেই দেশের মুক্তি বিধানে তৎপর, অপরপক্ষ স্বাধীনভাবে নিজেদের মনের মত করিয়া আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিতে চাহে—সত্য সত্যই কর্ত্তাদের নির্দ্দেশানুসারে নিজেদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া স্বরাজ যদি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে, বাধ্য হইয়া আমাদের বলিতে হইবে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পর ধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। নিজদিগকে যোগ্য করিয়া যদি স্বরাজ লইতে পারি, তবেই উহা জাতীয় জীবন সার্থক করিবে—ইহার অন্যরূপ হইলে স্বরাজের আদর্শ নিশ্চয়-ছোট হইয়া পড়িবে—উপরন্তু আমরাও নিজদিগকে ছোট করিয়া তুলি॥

রোণাল্ডসে বাহাদুরের বক্তৃতার মধ্যে আমরা যেন নিজেদের বাণীই শুনিতে পাই। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "You are not satisfied with the existing system, you want change, so do I." তোমরা প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট নও, তোমরা ইহার পরিবর্ত্তন চাও, আমিও তাহাই চাই। তিনি শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহেন "Why should she turn her back upon all that the West has to offer her by way of supplement to that which she claims as her own, knowledge is not the monopoly of our country or of one race, it is the common property of mankind, and if in certain branches of knowledge it so happens that the western race have forged ahead of others, why should those others deprive themselves of the fruits of western success? To do so is not patriotism, it is suicidal folly." অর্থাৎ ভারত নিজের বলিয়া যাহা দাবী করে তাহার উপর অতিরিক্ত হিসাবে পাশ্চাত্য যদি তাহাকে কিছু দিতে যায় তাহাতে সে মুখ ফিরাইবে কেন? জ্ঞান কিছু একটা দেশের বা একটা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, ইহা সমগ্র মানব গোষ্ঠীরই সাধারণ সম্পত্তি। অতএব এরূপ যদি হয় জ্ঞান রাজ্যের কোন কোন বিভাগে পাশ্চাত্য জাতি অন্য সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহা হইলে অন্যান্য জাতি পাশ্চাত্যের এই সাফল্য হইতে নিজদিগকে কেন বঞ্চিত করিবে? এরূপ কার্য্য স্বাদেশিকতার পরিচায়ক নহে, ইহাকে মারাত্মক মূর্খতা বলিতে হইবে।

আমরা ঠিক এই ভাবেরই কথা দেশপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি। সম্প্রতি নওগাঁর কোন সভায় আহুত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানে ধুয়া উঠেছে যে জাতীয় শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি Shakespeare কোন জাতীয়? হেমচন্দ্র বলেছেন "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি।" Hamlet এর মত drama কোথায়? ইংরাজ বিদ্বেষ জর্জ্জরিত জর্ম্মণিতে এক Philosophy of Hamlet সম্বন্ধে যত বই রচিত হয়েছে, তা দিয়ে এক library পূর্ণ করা যায়।.................আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ব সাহিত্যে যে ব্যাপকতার যে উদারতার সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মানব প্রাণের যে গানটী গেয়েছেন তাতেই তো তাঁকে আজ জগৎ কবি বলে বিশ্ববাসী বরণ করে নিয়েছে।"

সত্য সত্যই শিক্ষা বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে

যদি ইহার পদ্ধতিটীকে আবদ্ধ করি, আমরা বিশ্বের উদার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইব। তিনি মনীষী স্যার আশুতোষকে আহ্বান করিয়া "Complete Home rule in the matter of university education" দিতে চাহিয়াছেন। আমরা বাংলার সুযোগ্য লাটবাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

এই সকল কথা আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই জগতের হাওয়া ফিরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদের সহিত দেশবাসীর উদ্দেশ্য লইয়া মারাত্মক বিরোধ আর নাই। স্বরাজ উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া লইয়াছে, আমরা লইব রাজশক্তি দিবে, শিক্ষার ভঙ্গীও যে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে সে বিষয়েও রাজা প্রজার মধ্যে মতভেদ নাই, বরং এ ক্ষেত্রে আমরা সমধিক স্বাধীনতা পাইয়াছি, দেশবাসীর হস্তেই শিক্ষাদানের সকল ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা রাজনীতিক সকল সমস্যা নিরাকরণের ভার দেশনেতৃগণের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিতে চাই। স্যার আশুতোষ হয়ত রাজপ্রতিনিধি রোণাল্ডসে বাহাদুরের অনুরোধে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে শিক্ষা প্রণালীর যথেষ্টই উন্নতি বিধান করিবেন, ভবিষ্যতে দেশের যুবকগণ আরও উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার শুভ সুযোগ লাভ করিবেন—দেশে উচ্চ শিক্ষিতদের সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি কেবল পৃথিবীর জ্ঞান অর্জ্জন করা হয়, আর মানুষের অসংখ্য কদর্য্য স্বভাব ও সংস্কারের নিরসন না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ বিদ্যাপ্রচারে দেশের উন্নতি না হইয়া উপস্থিত যে সকল অক্ষমতা লইয়া দেশের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ অশান্তি ভোগ করিতেছেন, তাহার মাত্রা অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই।

শিক্ষাসম্বন্ধে বড় কথা হইতেছে, উহা যেন অর্থকরী হয়। Vocational education, জীবনধারণের উপযোগী প্রচুর অর্থ সংগ্রহ না করিতে পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, ইহাই সকলের অভিমত; সেইজন্য সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার অপেক্ষা অর্থকরী চিকিৎসা শাস্ত্র কৃষি শিল্প যন্ত্র শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের অধিক অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। জাতীয় বিদ্যালয় অর্থে তাহার সহিত সাধারণতঃ কৃষি ও বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করা। দেশে অন্নচিন্তা চমৎকার হইয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য, তাই বলিয়া শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য যদি উদর সংস্থানের উপায় স্বরূপ গণ্য হয় তবে দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকিবে না।

শিক্ষা আমাদের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। চিন্তাশক্তির প্রাখর্য্য বৃদ্ধি করিবে, গভীর করিয়া দিবে, হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূর করিয়া উহা জগতের সদ্‌গুণাবলীতে পূর্ণ করিয়া তুলিবে, নিস্তেজ প্রাণ বীর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিবে। বুদ্ধি হৃদয় আর প্রাণ এইগুলিকে পুরাতন সংস্কার ও স্বভাবের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্ত শক্তি প্রবাহের উৎস স্বরূপ করিয়া তুলিতে হইবে, শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই। চিন্তা যদি প্রখর এবং গভীর হয়, হৃদয় যদি প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য গুণে বিভূষিত হয়, প্রাণ যদি অনন্ত শক্তির আধার হয়—তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির অপ্রাপ্য বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে বুঝিতে পারি না। জাতির মধ্যে এইরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশের অবনতি ততই দূর হইবে, দেশ ততই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিবে।

জীবন যদি নূতন করিয়া গড়িতে না পারি, এই পুরাতন জরাজীর্ণ সংস্কারদুষ্ট আধারে ভারে ভারে যত বহির্বিজ্ঞানই ঢালিয়া দাও না, উহা আরও দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। জাতিকে বাঁচিবার মন্ত্রটী

শিখাইয়া দাও, জীবনে অমর উৎসের সন্ধান বলিয়া দাও; অমৃতের আস্বাদ পাইলে উৎকট হলাহলে তাহার আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। আমরা যতই শিক্ষা পাই, জীবন যে প্রতিদিনই নষ্ট হইতে বসিয়াছে, স্বভাবের অধোগতি হইতে মুক্তি পাইবার যে অভয় মন্ত্র সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে. জীবন রক্ষার উপায় কলকব্জারূপ যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় হইবে না, উত্তম চিকিৎসক হইলে, কৃষি কার্য্য করিলে বয়ন বিদ্যা শিখিলে জীবন রক্ষা হইবে না, জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে অন্তর্জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভিতর হইতে জীবনমন্ত্র ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে, ভিতর স্বাধীন ও মুক্ত হইলে বাহিরে তাহার ঐশ্বর্য্য স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

জীবন থাকিলে ত অর্থ উপার্জ্জন করিব, মেদিনী কর্ষণ করিয়া আহার্য্যের সংস্থান করিব, মানব কল্যাণের জন্য নব নব সৃষ্টি থরে থরে সাজাইয়া তুলিব, ভূতাবিষ্ট জাতিটার চৈতন্য সঞ্চারের জন্য যে মহাদীক্ষার প্রয়োজন, ভারতের ঋষি মণ্ডলী তাহার ব্যবস্থা করুন। জীবনমন্ত্র উপনিষদের ছন্দে আবার ঘরে ঘরে ঝঙ্কৃত হউক। মৃতপ্রায় জাতির মর্ম্মে মর্ম্মে একবার যদি সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত করিতে পার সুপ্ত সিংহ তবেই গর্জ্জিয়া উঠিবে, ভীম পরাক্রমে জগতের যাবতীয় জ্ঞান সে অর্জ্জন করিবে—ধরিত্রীকে অমরার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে।

পণ্ডিচারীর চিঠি

—:০:—

(১)

আজ তোমাদের পথের কথা জানাব। কলিকাতায় আসিয়া যখন পৌছিলাম তখন অন্ধকার। চক্ষের যন্ত্রণায় অস্থির। বাড়ী হইতে কোন খাবার দ্রব্য আনি নাই, মনে করিয়াছিলাম কলিকাতা হইতে কিছু কিনিয়া লইব; কিন্তু 'না' বাবু আমায় ভরসা দিলেন যে, তিনি আমার আহার যোগাইবেন। চক্ষের এত অধিক যন্ত্রণা হইতেছিল যে আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মাদ্রাজ মেলে উঠিবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও ভাবিতেছিলাম, দাদার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইব, হয়ত পথে কোন নূতন ঘটনায় আমায় বহুদিন প্রবাসে থাকিতে হইবে। যাহা হউক ঈশ্বরের করুণায় পরম স্নেহময় দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাদ্রাজ মেলে একখানি ইণ্টার ক্লাসে চড়িয়া বসিলাম। 'না' বাবু সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়াছিলেন, কাজেই 'ব' বাবু ও আমি একত্রে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। গাড়ীতে আরও দুইটী ভদ্রলোক উঠিয়াছিলেন—তাঁহারা খড়্গপুরে নামিয়া গেলেন, শুনিলাম তাঁহারা মেদিনীপুরের যাত্রী। খড়্গপুর হইতে গাড়ীটি আমাদের একপ্রকার রিজার্ভ হইয়া গেল। এক দিকে 'ব' বাবুর বিছানা অন্যদিকে আমার। চক্ষের এত অধিক যন্ত্রণা হইতেছিল যে আমি সমস্তক্ষণ চক্ষু মুদিয়াই ছিলাম। গাড়ী দ্রুত গতিতে কত কানন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ছুটিল তাহার কিছুই ঠিকানা রাখিবার সামর্থ্য তখন আমার ছিল না। খুড়দা রোড

জংসনে আমাদের গাড়ী যখন পৌছিল, তখন পূর্ব্বাকাশের প্রান্ত হইতে এমন একটা জ্যোতির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল যে সারা নিশার জমাট অন্ধকার কোথায় পালাইবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না—ঝোঁপে ঝাঁপে, গৃহস্থের কুটীরের কোণে গিয়া লুকাইতেছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তরুণ অরুণদেব আপনার উজ্জ্বল কিরণরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। নিমেষে অন্ধকার ছুটিয়া পলাইল, চতুর্দ্দিকে কি এক মহা আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল, কাননে বন্যকুসুম ফুটিয়া উঠিল, বিবিধ বর্ণের বিহঙ্গম টেলিগ্রাফের তারে চড়িয়া মধুর নৃত্যে কূজন করিতে লাগিল। প্রতি ষ্টেশনে গরম দুধ চা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য উৎকলবাসীদের উচ্চৈঃস্বর আমাদের কর্ণ বধির করিবার উপক্রম করিল। নীলবর্ণের চশমাখানি চক্ষে দিয়া দেখিলাম একরাত্রে আমি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। কোথায় বিলাস বিভবের লীলা কানন বঙ্গের উর্ব্বর নদনদী তড়াগ বহুল শস্য শ্যামল ক্ষেত্রের বিচিত্র চিত্র, আর কোথায় উড়িষ্যার শুষ্ক বালুময় চতুর্দ্দিকে পাংশুবর্ণের গিরিশ্রেণী, অপূর্ব্ব সমাবেশ! সমস্তই যেন স্বপ্নের মত অপূর্ব্ব বোধ হইতে লাগিল। শতগ্রন্থীযুক্ত মলিন বসন পরিধান করিয়া রুক্ষ, শুষ্ক বদন উৎকলবাসীরা প্রাতঃকালে মাঠে হল চালনা করিতেছে, দূরে—বহুদূরে বিকট রাক্ষসের মত তরুলতা বিহীন পর্ব্বতশ্রেণী পৃথিবীর রুদ্র মূর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সম্মুখে জলশূন্য নদীর বালুকারাশি প্রাতঃ সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে খানা কাটিয়া অতি অল্প জল গ্রামবাসীরা নিত্য ব্যবহারের জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছে। কি বিচিত্র চিত্র! ক্ষণকাল পরে বঙ্গের শেষ সীমা কালিকোটা* অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী মাদ্রাজ বিভাগের মধ্য ভেদ করিয়া ছুটিল।

* বর্ত্তমান সময়ে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের।

সম্মুখে কি অভাবনীয় প্রকৃতির অপরূপ শোভা, রেলের পার্শ্বেই কাকচক্ষুর মত সুবিমল সলিল রাশি সুদূর—বুঝি পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া—আপনার কোমল অঙ্গ বিস্তার করিয়া আছে। প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া জলের তরঙ্গগুলি যেন বহু বাহু তুলিয়া পরমানন্দে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। দূরে—অনন্ত সলিল রাশি মধ্যে ক্ষুদ্র পর্ব্বত, তাহারই কোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতা পরিপূর্ণ সুশ্যামল ক্ষেত্রে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত কুসুম স্তবক। মরি! মরি! জননীর কোলে সুন্দর স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট স্বর্ণকান্তি নধর শিশুর অমিয়-মাখা চাঁদ বদনে অথবা পূর্ণিমার নীল গগনে যেন সুধাংশু শেখরের মুখে মধুর হাঁসি উছলিয়া পড়িতেছে। এটী চিল্কা হ্রদ। উড়িষ্যার বিকট দৃশ্যের পর, মাদ্রাজ প্রবেশের প্রথম মুখেই এমন সুন্দর ও মধুর দৃশ্য দেখিয়া আমার নয়ন ও হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। গাড়ী রম্ভা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। তখনও হ্রদের সীমা আমরা অতিক্রম করি নাই। ষ্টেশনটী হ্রদের উপরেই অবস্থিত। চিল্কার যে অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি নয়নগোচর করিয়াছি তাহা লেখনা সংযোগে বিবৃত অসম্ভব। গাড়ী চলিয়াছে, অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, এক একটা ষ্টেশন আসিতে বহুক্ষণ কাটিয়া যাইতেছে। চিল্কা পার হইয়াই আমার মনে হইতে লাগিল যেন আমি বর্দ্ধমান বিভাগে আছি, দূরে মাঠের কোলে সারি সারি তাল গাছের শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে দীঘি, মাঠে গোধূম ধান্যের সুশ্যামল শোভা, কোথাও শাকের ক্ষেত্র, কোথাও বেগুনের ক্ষেত্র, আবার কোথাও বা বহুদূর বিস্তর ইক্ষুক্ষেত্র। কৃষকেরা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে। দেখিতে দেখিতে দিনমণি আবার পশ্চিম দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দক্ষিণে রাখিয়া আমরা

চলিয়াছি। রেল পথের ধারে ধারে দরিদ্র মাদ্রাজবাসীদের কুটীর শ্রেণী—নারিকেল পাতায় ছাওয়া। দেখিতে দেখিতে সম্মুখের সকল দৃশ্য গুলিই অন্ধকার মধ্যে নিমগ্ন হইল। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি কাটিয়া গেল—আবার সোণার বরণে সূর্য্যদেব উন্নত গিরিশ্রেণী মধ্যে প্রকাশিত হইলেন, প্রতি বৃক্ষপত্র ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল, দূরে নারিকেল কুঞ্জে বসিয়া কতকগুলি কাক হরেক রকম শব্দে জগতে ঘোষণা করিল—'জাগ জাগ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।' চক্ষু দুইটী জাল করিয়া রুমালে মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। ছুটিয়া ছুটিয়া আমাদের গাড়ী মাদ্রাজের পূর্ব্ব ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। মধ্যে অনেক নূতন ষ্টেশন, তাহার নাম মনে রাখা অসম্ভব। লিলুয়ায় যেমন লেখা থাকে 'হাওড়াকো টিকট হিয়া লিয়া যাতা হৈ,' এই ষ্টেশনটীও তদ্রূপ। মাদ্রাজের টিকিট এইখানে লওয়া হয়। একজন সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত মাদ্রাজী মহিলা আমাদের নিকট আসিয়া টিকিট চাহিল। টিকিট দেখিয়া আমাদিগকে প্লেগ ডাক্তারের নিকট হইতে Certificate লইয়া আসিতে বলিল। আমরা ষ্টেশন সংলগ্ন একটী স্থানে গিয়া ঐ Certificate লইয়া পুনরায় গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম।

ক্রমশঃ—

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

—:০:—

ইরাণী উপকথা	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সিনযিন	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
উভয় সঙ্কট	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত
মহাত্মা শিশিরকুমার	শ্রীঅনাথনাথ বসু
কর্ম্মের পথে	স্বামী স্বরূপানন্দ
পথের সাথী	ঐ
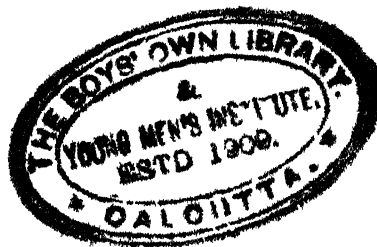
প্রবর্ত্তক

ষষ্ঠ বর্ষ]　　১৫ই চৈত্র, ১৩২৭　　[... সংখ্যা

ধর্ম্মসঙ্ঘ

—:০:—
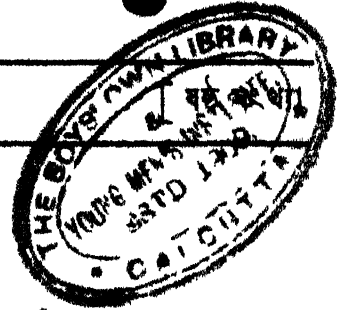
সঙ্ঘসৃষ্টির কথা এখন যেখানে সেখানে শুন্‌তে পাচ্ছি। কাজ করতে গিয়ে যখন মনের মত মানুষের অভাব হয়, তখন মুখ মলিন করে ভাবতে বসি, কাজের রূপ তো মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে, একা আমি ক'রবো কি। চাই সঙ্ঘ, অনেকে মিলে তবে যদি এই বিপুল কাজ সিদ্ধ করতে পারি।

এই অনেকে মিলে কাজ করবার ভঙ্গীর মধ্যে সঙ্ঘের কথা এসে পড়ে। তখন কাজটাকে কি ক'রে করতে হবে, তার ছকাছকি আরম্ভ হয়। এই রকম ছক নিয়ে আবার সকলেই একত্র থাকৃতে চায় না, কাজেই দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র নিয়ে কাজ আরম্ভ হচ্ছে। সব দলগুলিকে একটি বড় কেন্দ্রে শৃঙ্খলিত করে তোলার অন্তরায় কার্য্যপদ্ধতি এবং মানুষের অহঙ্কার নিয়ে। একদল লোক যে পন্থার অনুসরণ করে, অন্য দল হয়তো সে পথ পছন্দ করে না; একদল লোক অপর দলের সহিত মিশে আনন্দ পায় না—অসংখ্য দলসৃষ্টির ইহাই মুখ্য কারণ।

কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন যখন হয়, তখন আবার নূতন গণ্ডগোল দেখা দেয়। কেহ পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করে না, কেহ বা অভিজ্ঞতানুসারে নূতন পথে চলতে চায়, এই অবস্থায় একটা দল আবার দশটা দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। বাংলা দেশে এখন দলাদলির লীলাখেলা চ'লছে।

জাতীয় মহাসভা থেকে আরম্ভ ক'রে, বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমিতিগুলিতে এই একই খেলা দেখ্‌তে পাবে, দলপতি যাঁরা, তাঁরা দলরক্ষার জন্য উঠেপ'ড়ে লেগেছেন, নন্‌-কো অপারেশনের উত্তেজনায় দেশের হাওয়া কিছু গরম হ'য়ে উঠেছে, এখন দল টেকা দায়, যেদেশে এখনও ঐক্যস্থাপন সাধনায় এতখানি গোলমাল চল্‌ছে, তাদের বৃহৎ সৃষ্টির এখনও ঢের বিলম্ব আছে।

এইরূপ অবস্থা যে অধঃপতনের লক্ষণ তাও নয়। জাগরণের আভাস ইহার মধ্যে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে। দল ভাঙ্গাভাঙ্গির যতই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ততই

দলগঠনের সত্য নিয়মটী আবিষ্কার হ'য়ে পড়ছে। বিপ্লবযুগে যখন বড় বড় কর্ম্মীরা—পুলিশের হাতে ধরা পড়েই, পেটের কথা আমূল আবৃত্তি আরম্ভ করে দিল, তখন বিপ্লবপন্থীদের মধ্যে ইহার কারণ অন্বেষণের একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল; এই অন্বেষণের ফলে যে কোন কাজই করা হোক না, তার জন্য নিরেট চরিত্র গঠনের একটা স্পৃহা জেগে উঠেছে—শিক্ষা, সাধনা না থাক্‌লে কোন কাজেই যে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, একথা আর কেউ অস্বীকার করবে না।

রাজনীতিক সাধনার জন্য যে সকল দল গ'ড়ে উঠ্‌ছে তাদের পিছনে আরও অনেক দল আছে। তার মধ্যে ধর্ম্মসংহতিগুলিই খুব প্রবল। রাজনীতিক দল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃহৎ হয়ে উঠে, কিন্তু ভিত্তি আল্‌গা থাকায় বেশীদিন ঐগুলি টিকে থাকে না। নিছক দেশসেবার ব্রত নিয়ে, আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংহতির আবির্ভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি—ইহাদের মধ্যে বেশ একটা অনাবিল দেশভক্তি আছে—ব্যষ্টি জীবনগুলিতে সঙ্কল্প শক্তিরও অভাব নেই, এই সব জাগরণের চিহ্ন ব্যতীত আর কি বলিব?

কিন্তু এই সকল সংহতি আয়তনে এতই ক্ষুদ্র যে দেশের প্রয়োজন মত অভাব পরিপূরণের পক্ষে কোনটীই উপযোগী নয়। এইজন্য প্রায় সকলের মধ্যেই একটা অন্তরতম ইচ্ছা আছে বৃহত্তর কেন্দ্রে সবগুলিকে সমাহৃত করে ব্যাপকভাবে দেশসেবা করা; সম্প্রতি জাতীয় সভার অভিপ্রায় অনুসারে সারা বাংলার কর্ম্মকেন্দ্রগুলিকে একত্র করে, একটা বৃহৎ সঙ্ঘ রচনার প্রচেষ্টা চলছে—কিন্তু কেন্দ্রগঠনের নিগূঢ় মন্ত্র না জানায় এই কার্য্য যে সহজে সুসিদ্ধ হবে এরূপ আমাদের মনে হয় না। তা না হোক, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হ'য়ে বাঙ্গলার প্রাণশক্তি যে সব কাজে হস্তক্ষেপ করেছে তাতে কর্ম্মীদের আত্মশুদ্ধি আসবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

কিন্তু দল যদি সীমার প্রাচীরেই নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অজ্ঞানতা ও সঙ্কীর্ণতা এসে দলস্থিত ব্যষ্টিজীবনগুলিকে পঙ্গু ক'রে দেবে, তাই প্রত্যেক দলই শনৈঃ শনৈঃ উদার ও আত্মপ্রসারিত হবার জন্য চারিদিকের দরজা যেন অবারিত রাখে, বাহিরের সকল রকম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে দলস্থ কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। এইরূপ হলেই আবশ্যক মত আজিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংহতিগুলি ভবিষ্যতে একত্র হয়ে বৃহতে পরিণত হ'তে পারবে। দলরক্ষার অজুহাতে বৃহৎ হবার সম্ভাবনা যেন আমরা হারিয়ে না বসি।

বাংলার সংহতিগুলিকে আমরা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত ক'রতে পারি। একদল লোক যারা কোন মহাপুরুষকে আশ্রয় ক'রে অথবা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধনার জন্য একত্র হয়েছেন, অপরদল দেশসেবার জন্য, স্বরাজলাভের জন্য, রাজনীতিক সম্বন্ধে দলবদ্ধ হয়েছেন।

ধর্ম্ম রাজনীতি—যে কোন সম্বন্ধেই হউক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য—দেশমাতৃকার কল্যাণ বিধান করা। রাজনীতিক সমধিক অধিকার অথবা একেবারেই স্বাধীন-শাসননীতি নিজেদের হস্তগত করবার প্রচেষ্টায় যাঁহারা দল গ'ড়ে তুলছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একটা গর্ব্ব আছে; সকলেই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে বহুব্যক্তির মতানুসারে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভা কর্ত্তৃক এইরূপ দলগুলিকে পরিচালিত ক'রতে চান। বরিশালে গণতন্ত্রবিদ্ বিপিনচন্দ্র অধুনা রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আচ্ছন্ন দেশনেতৃবর্গের এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাব দেখে যেন কিছু মর্ম্মাহত হয়েছেন। এই ক্ষেত্রে তবুও গণতন্ত্রবাদের মূলনীতি অবলম্বন করা হয়েছে,

বহুব্যক্তির মতানুযায়ী আদর্শ নিয়েই মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশনেতৃগণ দেশকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন; কিন্তু দেশমতের ভিন্ন অস্তিত্ব যেন মহাত্মাজী গ্রাস ক'রে বসেছেন—এইরূপ অনুভূতি ভারতের পাশ্চাত্য বিদ্যাবিদ্ নেতৃগণের মর্ম্মে একটা আঘাত দিয়েছে; তাই, গণতন্ত্রমূলক রাজনীতিক দলের মধ্যেও আমরা ঐক্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখ্‌তে পাই না।

ধর্ম্মসঙ্ঘ ঠিক ইহার বিপরীত। এখানে স্বাতন্ত্র্যের নিরসনই সংহতিসৃষ্টির মূলনীতি। কোন মহাপুরুষ, অথবা কেন্দ্রপুরুষের সহিত একাত্ম অনুভূতি আন্‌তে গিয়ে, ব্যষ্টির ভিন্ন অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। বিন্দু বিন্দু মধুমিশ্রিত এইরূপ পদ্মের মধুচক্রগুলি ভেঙ্গে যাবার ততদিনই সম্ভাবনা থাকে, যতদিন সম্পূর্ণরূপে প্রতি ব্যষ্টিটা অপর ব্যষ্টির সহিত অমিশ্র হয়ে না মিশে যায়। বাংলার যে সব ধর্ম্মকেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে, সেগুলি শত বাধাবিঘ্নে বাহিরের উপদ্রবে ভেঙ্গে পড়বার খুবই কম সম্ভাবনা যদি সত্য সত্যই সেখানের মিলন—এইরূপ অন্তরাত্মার সংস্পর্শে ঘটে থাকে; তবে মূলকেন্দ্রকে ঘিরে বেষ্টন ক'রে অনেক সময় বাহিরের যে-আবর্জ্জনাস্তূপ ইহার সত্য রূপটাকে ঢেকে হয়তো বৃহত্তর রূপের মরীচিকা সৃষ্টি করে, প্রাকৃতিক ঝটিকাবর্ত্তে সেইগুলিই নিরাকৃত হ'য়ে মূল সঙ্ঘকে আরও অধিক শক্তিশালী ক'রে তোলে।

রাজনীতিক সঙ্ঘের অপেক্ষা ধর্ম্মমূলক এই সকল সঙ্ঘের অটল অস্তিত্বে আমরা অধিক বিশ্বাসবান। কিন্তু রাজনীতিক দলগুলি পুনঃ পুনঃ ভেঙ্গে যাওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকায় আমরা ঐ সকলের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও উহাদের মধ্যে শক্তির একটা অবাধ প্রবাহ চলতে থাকে, তাহার ফলে ব্যষ্টিচরিত্র খুব শক্তিশালী খুব উদার ও খুব বৃহৎ হয়ে উঠে। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মসঙ্ঘের কেন্দ্রপুরুষ ব্যতীত অপর অঙ্গগুলি যেন মান, একটা বৃহৎ বৃক্ষের আব্ ছায়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীর্ণ লতাগুল্মের মত যেন নির্জ্জীব হয়ে পড়ে; আপনাকে নিঃশেষ করে দিয়ে, এক্ষেত্রের ব্যষ্টিশক্তিগুলি বৃহত্তের উপাসক স্বরূপ যেন—পূর্ণচন্দ্রের চতুঃস্পার্শে অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বিরাজ ক'রতে থাকে; স্বভাবতঃ কেন্দ্রপুরুষের পতনে এই সকল সঙ্ঘের জীবন্ত মূর্ত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না—ছায়ার মত যা থাকে তা প্রেতমূর্ত্তি

আজ কথা উঠেছে, ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করে আমাদের সব গ'ড়ে তুলতে হবে। ধর্ম্মের মহিমাজ্যোতি পাশ্চাত্য শিক্ষার মসী আবরণ উদ্ভিন্ন ক'রে দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে অতীতের যে অজীর্ণ হলাহল, ব্যষ্টিজীবনের সাফল্য বিনষ্ট ক'রে দেয়, তা থেকে ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকর্ত্তাদের সাবধান হ'তে হবে। সঙ্ঘদেবতা জগদ্দল পাথরের মত সঙ্ঘের উপাদানগুলিকে চিরদিন যেন আবরণ দিয়ে না রাখে। ধর্ম্মসঙ্ঘ যথার্থ ঐক্যসাধনে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু সে ঐক্যের লীলামাধুরী যেন অনন্তকাল স্থায়ী হয়।

এই ধর্ম্মসঙ্ঘ নির্ম্মাণের সিদ্ধ মন্ত্র উৎসর্গ। সঙ্ঘদেবতার নিকটেই ব্যষ্টিকে উৎসর্গ ক'রতে হবে। এই উৎসর্গ সম্পূর্ণ না হলে, ব্যষ্টির অহঙ্কার আমূল উৎপাটিত হবে না; অহঙ্কারের একান্ত নিরসন না হলে চক্রগঠন যদিও সম্ভব হয়—কিন্তু উহা স্থায়ী হ'তে পারে না, প্রধূমিত বহ্নির মত এই গোপন অহঙ্কার একদিন প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে।

উৎসর্গ ক'রবে সঙ্ঘ দেবতার কাছে মানুষ হিসাবে নয়, ভাগবত বোধে; নাম রূপ প্রতীকের সীমার মধ্যে নয়, অনির্ব্বচনীয় অরূপ অসীমের অনুভূতিতে। উৎসর্গকারী অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে নিজের মধ্যে সঙ্ঘ দেবতারই অধিষ্ঠান অনুভব ক'রবে। সঙ্ঘদেবতাও আপনার মধ্যে আপনাকে নয়, প্রতিব্যষ্টিকে ভক্ত

অনুরক্ত নাম রূপ নিয়ে নয়, ভাগবত বোধেই তন্ময় থাক্‌বে; সঙ্ঘের প্রতি পদার্থ, প্রতি কার্য্য, প্রতি ঘটনা দেবতারই সম্পাদ্য—দেবতারই আনন্দানুভূতি বোধে অবধারণ ক'রবে, তারপর প্রতিব্যষ্টি যেমন তদীয় সঙ্ঘের প্রতিব্যষ্টিকে সঙ্ঘের দেবতাকে হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখবে—তদ্রূপ এই ভাগবত অনুভূতি দিয়ে বাহিরের সকল লোকের সহিতই এই একই সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠ্‌তে হবে।

আমরা ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে থেকেও যে এতখানি সঙ্কীর্ণ, এতখানি অনুদার হয়ে পড়ি তার মূলকথা হচ্ছে—আমরা দেবতার অনুভূতিকেই ক্ষুদ্র ক'রে নিয়েছি সঙ্কীর্ণ ক'রে নিয়েছি, আমার ভক্ত যদি অপরের অনুগত হয়ে পড়ে, আমার হৃদয়ে বজ্রপাত হয়, আমাকে অপরের মধ্যে অনুধাবন ক'রবার অক্ষমতাই যে আমাদিগকে বৃহৎ হতে দিচ্ছে না, সেই মূলব্যাধির প্রতিকার ক'রতে হবে। আমি ভগবানে অবস্থান ক'রবো—জগতের প্রতি কাজ প্রতি ঘটনা ভগবানের ইচ্ছাসম্ভূত জেনে আনন্দমগ্ন থাকবো, আমি যে আমার মধ্যেই কেবল আছি তা নয়, সকলের মধ্যেই আছি আবার সকলে আমার মধ্যেই আছে—আমাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষেও যেমন অসাধ্য অপরের পক্ষেও তাই—এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানে সুদৃঢ় হলে, বাংলার ধর্ম্মসঙ্ঘগুলি এক বৃহৎ চক্রে পরিণত হবে, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা এই মহান ঐক্যের উপরই নির্ভর ক'রছে—সুধীজন এই কথাগুলি তলাইয়া বুঝিবেন কি?

দখিণে বাতাস

—০—

অহংকার একেবারেই থাক্‌বে না। অনেকের সাত্বিক গর্ব্ব আছে। বাহির থেকে সাত্বিক অহংকার রাজসিক বা তামসিক অহংকারের অপেক্ষা ভাল দেখাতে পারে, কিন্তু আসলে উহা অহংকার। সাত্বিক অহংকার থাক্‌লেই একদিন রাজসিক বা তামসিক অহংকার প্রকট হয়ে উঠ্‌তে পারে, সাত্বিক অহংকার যেখানে আছে, সেখানে রাজসিক বা তামসিক অহংকারও ভিতরে সুপ্ত থাকে, এবং ইহা প্রকট হয়ে উঠ্‌লে বিপদের মাত্রা অধিক হয়। কোন রকম অহংকারই রাখ্‌বে না, তা সে সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যাহাই হোক। এই সাত্বিক অহংকারকে basis করে একটা ধর্ম্ম গড়ে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু সে ধর্ম্ম mental planeএই থাক্‌বে, heart ছাড়িয়ে কখন বিজ্ঞানে পৌঁছিবে না। আর সাত্বিক অহংকার নিয়ে যা গ'ড়ে উঠ্‌বে তা হবে গণ্ডীবদ্ধ, কাজেই এক্ষেত্রে একটা sect গড়ে' উঠ্‌বারই অধিক সম্ভাবনা। সাত্বিক অহংকারের ভিতর largeness নেই, তাই সেখানে limited কিছু গড়ে' উঠে। সাত্বিক অহংকার দিয়ে একটা ধর্ম্ম গ'ড়ে তোলা যায়—একটা Social change নিয়ে আসাও সম্ভব হয়, কিন্তু সে কাজ আমাদের নয়।

*　　*　　*

আমরা চাই একটা Spiritual humanity, একটা দেবজাতি। একেবারে বিজ্ঞানে উঠে গিয়ে,

সকল অহং পরিত্যাগ না করলে, তা কখনও সম্ভব হবে না। অতীতে যা কেউ দেয় নাই, এযুগে সেই জিনিষ আবির্ভূত হয়েছে, এবং আজিকার অভিনব সম্পদই যে শেষ, সবখানি, এমন কথাও মনে করো না। Infiniteএর কতটুকু এ যুগে সম্ভব হবে, ভবিষ্যতে আবার অনেকে আস্‌ছেন, যাঁরা বর্ত্তমানকে আরও সমৃদ্ধ করে তুল্‌বেন, infiniteকে কেহ কি exhaust করতে পারে?

* * *

আত্মসমর্পণ করে অনেকে মনে করে, যার কাছে সে আত্মসমর্পণ করছে সে সব করিয়ে নেবে, একি কখন সম্ভব হয়? অবশ্য একজন যদি giver হয়, অপর জনকে receiver হতে হবে। যে receiver তার স্বভাব যদি বাধা দেয়, giver কি করতে পারে। Giver যা দেয় receiverকে সেটা খেলবার একটা অবাধ গতি দিতে হবে। সেখানে যদি গণ্ডী থাকে, একটা tightness থাকে তা হলে দেওয়া জিনিষটা কি করে receive করবে? Free play দিলে তবে তো করিয়ে নেওয়া সম্ভব। দেওয়া যায় যোগের principles, আর তাকে push করবার শক্তি, নিজের স্বভাব দিয়েই সেটাকে মানুষ নেয়, অহং চলে গেলেও এই স্বভাবের খেলা হ'তে থাকে, স্বভাবের একান্ত নিরসনে যোগের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

* * *

আত্মসমর্পণ করতে হবে ভগবানের কাছে—মানুষের কাছে নয়। ভগবান হচ্ছেন infinite, মানুষ এক উপায় বটে, কিন্তু উপায়কে লক্ষ্য বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। আমাদের দেশে গুরুবাদের মধ্যে বহু আবর্জ্জনা প্রবেশ করেছে, আমরা চাই গুরুভাব উড়িয়ে দিতে। আজ পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় হয়েছে—তার মধ্যে সকলেই প্রায় গুরুভাবের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, আমরা কেবল বিবেকানন্দকেই দেখেছি, যিনি গুরুভাবের মধ্যে আবদ্ধ হননি। রামকৃষ্ণ মিশনে আর যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই রামকৃষ্ণের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

অহং ত্যাগ হলেও, অহংএর ছায়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অহংএর ছায়া পর্য্যন্ত না চলে যায়, ততক্ষণ মানুষের mental planeএ কার্য্য হ'তে থাকে। মানুষ যখন mental planeএর highest stageএ গিয়ে উপনীত হয়, তখনও তার সাত্বিক অহংকারের ছায়া থাকে, এবং এই অহংএর ছায়াকে আশ্রয় না করলে সে কার্য্য করতে পারে না; অন্যথা হলে একটা chaotic অবস্থা আসে, যেমন পরমহংসদের হ'য়ে থাকে, তাঁরা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন। আর মানুষ যখন mental plane ছাড়িয়ে supramental planeএ এসে উপনীত হয়, তখন তার অহংএর ছায়া পর্য্যন্ত চ'লে যায়, বিজ্ঞানের স্তর থেকে তখন তার সমস্ত কার্য্য হ'তে থাকে।

* * *

ধ্যান করতে ব'সে—চিন্তা স্রোত যখন নেমে যাবে, তখন ঐদিকে খুব জোর দিতে হয়, ভিতর প্রশান্ত হ'লে জ্ঞানের আলোকে সমস্তটা ভরে' যাবে। দেখ্‌তে হবে উপর হতেই জ্ঞানস্রোত নেমে আস্‌ছে। এই রকম করতে করতে সাধক যখন বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার অবস্থাটা abnormal বলে' বোধ হয়, আর ঐ যে জ্ঞানে অবস্থিত অবস্থা উহাই হয় স্বভাব। প্রথম প্রথম যোগের যে অবস্থা, তাতে মানুষের অবস্থাই হচ্ছে স্বাভাবিক, আর এই জ্ঞানের অবস্থাই abnormal; সাধারণ লোক কর্ম্মের impulse হ'তে কর্ম করে, যোগী দেখে কর্ম্মের পশ্চাতে একটা মহান বিরাট জ্ঞান রয়েছে—সেই জ্ঞানের অনুভূতি নিয়েই তাঁরা কার্য্য করেন।

কর্ম্মের পশ্চাতে যে মহান বিরাট ভাব রয়েছে তার অনুভূতি ত আসবেই, আরও অনুভব করতে হবে—পুরুষকে। যিনি শক্তির পশ্চাতে থেকে কর্ম্ম করাচ্ছেন। এই পুরুষের অনুভূতি জাগলেই পূর্ণ জ্ঞান আসবে। সাধনার তিনটী স্তর—প্রথম আত্মজ্ঞান, দ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান, তৃতীয় ভগবদজ্ঞান। আত্মজ্ঞান আসলে আমি সবেতে অবস্থিত এবং সব আমাতে অবস্থিত এই জ্ঞান ফুটে উঠে, তারপর যখন ব্রহ্মজ্ঞান আসে, তখন সবই এক, সবই ব্রহ্ম, এই অনুভূতি জেগে উঠে, সর্ব্বশেষে যখন ভগবদজ্ঞান হয়, তখন ব্রহ্মই ভগবান্ ইহা প্রত্যক্ষ হয়, ভগবান সর্ব্বভূতে সর্ব্ব অবস্থায় বিরাজিত, এটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, তখন একটা universal consciousnessএ সাধক ভরে' থাকে। জগতে আর কিছু ভেদ থাকে না, এই যে বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বলছি ইহার কোনটী আগে হয়, কোনটী পরে হয় এমন কিছু নয়; সবই তখন ভগবান্। এইরূপ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধ যোগী একশত জন চাই। তা'হ'লে জগতে একটা অলৌকিক পরিবর্ত্তন আসবে।

* * *

উপস্থিত যে ভাবে সাধনা চলেছে, তারমধ্যে কর্ম্ম এবং ভক্তিই প্রবল। শক্তি এবং প্রেম বিশাল সমুদ্রের ঢেউ, শুধু ঢেউ নিয়ে থাকলে তো হবে না, উৎসে পৌঁছিতে হবে, উৎস হ'তে হবে। তবে তো শান্ত অবস্থা আসবে, তবে তো অতল দেখ্‌তে পাবে, আর যদি খালি ঢেউ নিয়ে থাক, একদিন সে ঢেউ শুখিয়ে যাবে, আর যখন জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিতে পারবে, তখন তার মধ্যে শক্তি এবং প্রেম, কর্ম্ম এবং ভক্তি,—দুইই পাবে, সবই সমানভাবে পাবে। এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নয়, পূর্ণ জ্ঞান, বিজ্ঞান এর basis. এই বিজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সবই থাকবে।

* * *

এই পূর্ণ জ্ঞান অবধারণ করবার mould প্রস্তুত করা চাই, mould ঠিক হলে জ্ঞানের perfection আনবার বিলম্ব হয় না। দেহ প্রাণ মন সমস্ত পূর্ণভাবে সমর্পিত হ'লে, ভগবান অজস্রধারে তার ভিতর জ্ঞান ঢেলে দেন। Mould তৈয়ারী হ'লে পূর্ণ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সহজেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে কাজও বৃহৎ হ'য়ে উঠবে। Perfection এলে যে কর্ম্ম আরম্ভ করতে হবে, এমন নয়, জ্ঞান যদি আস্‌তে আরম্ভ করে, কর্ম্ম করতে করতেই পূর্ণতা এসে যাবে। প্রথম প্রথম meditation দরকার, এতে খুব help হয়, কিন্তু যখন passivity এসে যায়, তখন একটা insistence of will থাক্‌লেই যথেষ্ট। সকল কর্ম্মের মধ্যেই passivity রাখা চাই, যখন কোন কাজ থাকবে না তখন এইদিকেই খুব জোর দিতে হবে।

যোগ

বিচারজ্ঞান যোগের পরিপন্থী। চাই বিশ্বাস—হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। আর ভক্তি, নিষ্ঠা, উৎসর্গ। বিশ্বাস করিবে ভগবানে—উৎসর্গ করিবে সমস্ত খানিই ভগবানের নিকট,—যতই তুমি ক্ষুদ্র হও, ভাগবত স্পর্শে বৃহৎ হইবে, ব্রহ্মস্বরূপ হইবে।

ভগবান যদি শব্দময় হয়েন, কোন সঙ্কীর্ণ অক্ষরে তাঁহাকে নিবদ্ধ করিও না; যদি তিনি রূপময় হয়েন, রেখার সীমায় তাঁহাকে আঁকিয়া তুলিও না; তোমার ভগবান হউন অনির্ব্বচনীয়, অসীম; ভগবানকে যতই ক্ষুদ্র করিয়া ধারণা করিবে, জীবনও তত সঙ্কীর্ণ হইয়া

পড়িবে। রূপকে যদি হৃদয়ে ধরিয়া থাক, তবে রূপের সাগরে ডুবিয়া যাও, নামের আস্বাদে যদি রসনা ভরিয়া থাকে, তবে সকল শব্দ মায়ের মন্ত্র বলিয়া অজপায় মজিয়া থাক, চাই বিরাটকে, অনন্তকে, মায়ার ফাঁদে ব্রহ্মকে কাঁদাইও না।

তুমি তো তুমি মাত্র নও। বিশ্বজগতের প্রতিনিধি তুমি। নিঃসঙ্গ হইবার বৃথা আশা করিও না। ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধন, অনন্তকে অবধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। নিজেকে একাকী জ্ঞানে, ক্ষুদ্র করিয়া কল্পনা করিলে, সিদ্ধিও স্বপ্নমাত্র হইবে। বিরাট বাধাস্তূপকে অপসারিত করিবার জন্য বুদ্ধি হৃদয়, মন বাসনা, শরীর প্রভৃতির সহিত পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিতে হইবে, এই সংগ্রাম তোমার একার জন্য নহে, মানব জাতির জন্য—বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানকে সংযুক্ত কর, প্রেমের সহিত শক্তির সম্মিলন হউক, অন্তরে বিমল শান্তি ও অনাবিল আনন্দ স্রোত প্রবাহিত কর, বাহিরে ঝটিকাবর্ত্তের মত ভীমবেগে—পৃথিবীর যাবতীয় অশুদ্ধতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়, —দেবজন্মলাভের রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দাও।

তোমার ধারণা, তোমার অনুভূতি, তোমার দর্শন, তোমার আদর্শ হউক ভগবান তোমার সাধনা তোমার কার্য্য, তোমার জীবন হউক ভগবান, তোমার হৃদয়, তোমার আনন্দ, তোমার অন্বেষণ, সকলই ভগবানে ভরিয়া যাউক, যোগই যেমন জীবন—তদ্রূপ ভগবানই তোমার জীবনস্বরূপ হউক, ইহাই তো ভাগবত জীবন। জগৎপ্রাণ সমীরণের মধ্যে যেমন আছি আমরা সঞ্জীবিত, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ সাগরের তুফান হইয়া জীবন আমাদের দুলিয়া উঠুক। সামগ্রী দেখিব ভগবানের বিগ্রহরূপে, অনন্তকোটী জীব তাঁহারই চৈতন্যমূর্ত্তি, ঘটনানিচয় তাঁরই লীলাতরঙ্গ।

যখন জীবনের ষোল আনা ইচ্ছা এইদিকে নিয়ন্ত্রিত হইবে, হৃদয় বুদ্ধির ষোল আনা আকর্ষণ ভগবানে নিয়মিত হইবে, তখন জানিবে শরীর মন জগদীশ্বরের আবাস ক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে—স্বর্গের সৌরভে জীবন তোমার পুলকিত হইয়া উঠিতেছে—প্রেমের উৎস শক্তির উৎস আনন্দের উৎস খুলিয়া গিয়াছে।

ষোল আনা ইচ্ছা—ষোল আনা হৃদয় বুদ্ধি ভগবানে সমর্পিত হইলে, ভগবানের ইচ্ছা ভগবানের জ্ঞান, ভগবানের প্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠে, পূর্ণ উৎসর্গেই পূর্ণ ভাগবত জীবন লাভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে ভাগবত জীবন লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়, তারপর বুদ্ধি এই ভগবানের স্বরূপ যতই স্পষ্ট করিয়া তুলে, মন ততই প্রসারিত হয়, কিন্তু বাসনা থাকিতে ভগবানের অনাবিল আনন্দ—ভগবানের প্রত্যক্ষ লীলা জীবনে ঘটিয়া উঠে না, একটু বড়াইয়া, একটু ফেনাইয়া তরল করিয়া জীবনে উহা জাগিয়া উঠে। উৎসর্গ সম্পূর্ণ হইলে বাসনাও পরিশুদ্ধ হয়।

বাসনার গতি প্রবাহ ঊর্দ্ধমুখী করিয়া দাও। নিজের জন্য কিছু আর করিও না, যাহা কিছু করিবে ভগবানের জন্য করিয়া যাও। জীবনতরীর কর্ণধার হউন ভগবান, আত্মবাসনা চরিতার্থের জন্য যে ভাবে জীবন চলিয়াছিল হয়তো জীবনগতি বিপরীত ভাবেই চলিবে, তুমি চঞ্চল হইও না, অধীর হইও না, তুমি যাহা জান, ভগবানের জানা তদপেক্ষা কত অধিক তাহা পরিমাপের অতীত—তুমি দেখিয়া যাও উজানে জীবনতরী ছুটিয়াছে—পালে তার স্বর্গের হাওয়া, আনন্দ তুফানে কেবল মধুর এবং মঙ্গল নৃত্য।

জীবনই তো যোগের প্রতিষ্ঠান। ভাগবত জীবন লাভ করাই তো যোগের উদ্দেশ্য। আত্মসমর্পণ তো ইহার পন্থা। মনঃসংযোগ এবং উৎসর্গ ইহার আরম্ভ।

জীবন আমাদের নিকট অপ্রাপ্ত নহে, মন আমরা জানিয়াছি, ষোলআনা হৃদয় বুদ্ধিও ভাগবত উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছি—আত্মাকে জানিতে হইবে, আত্মাকে

পাইতে হইবে, তবেই সমর্পণ সার্থক করিতে পারিব।

জীবনের আছে কার্য্য, বাসনা এবং ভোগ, হৃদয়ের আছে প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তি, বুদ্ধির আছে অজস্র চিন্তা—এই সকলের কেন্দ্র সত্য যে চৈতন্য উহাই আমিরূপ অহঙ্কার, এই অহঙ্কার বিরাট ভগবানে সংযুক্ত হইলে আমার বাসনা হইবে বিরাটেরই আনন্দ উৎস, আমার কার্য্য এবং ভোগ হইবে ভাগবত কার্য্য এবং ভাগবত ভোগ, আমার হৃদয়ের বৃত্তি তখন প্রেমের তরঙ্গে পরিণত হইবে, আমার চিন্তার মালা জ্ঞানের সূর্য্যমণ্ডল সৃষ্টি করিবে, আমি তখন হইব ভাগবত পুরুষ।

কিন্তু এ সকলই হইবে ভগবান যদি ইচ্ছা করেন—তিনি যদি জাগিতে চাহেন। এই তাঁর মহিমময়ী ইচ্ছাকে কোথায় পাইব, এই ইচ্ছার জাগরণ কেমন করিয়া হইবে? ভাগবত ইচ্ছাও জীবনের অতীত কিছু নহে, ইহা পাইতেও মানুষকে জীবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে হয় না। উৎসর্গের মধ্য দিয়াই আমরা ইহা লাভ করিব।

ত্রিমার্গ সাধনায় যোগের সিদ্ধি। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম্ম। কেবল জ্ঞানযোগ খণ্ডসাধনা, জ্ঞান ভক্তির সাধনাতেও জীবনের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে, কাজেই জীবন যদি যোগের প্রতিষ্ঠান হয়, এই ত্রয়ী সাধনায় আমাদের আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ জীবনের বার আনা আমাদের কর্ম্মময়। এই কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়াই আমরা ভাগবত ইচ্ছাকে জানিব, পাইব, আমরা যাহা করি উহার মূলে আছে বাসনার তাড়া। আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছা নহে, উহা খণ্ড বিকৃত অশুদ্ধ। কর্ম্ম যদি হয় শুদ্ধ আত্মপ্রকাশ, মূলগত ইচ্ছাও হইবে বিশুদ্ধ ভাগবত।

আমরা যাহা ইচ্ছা করি, ভগবান হয়তো তাহা ইচ্ছা করেন না, আবার ভগবান যাহা ইচ্ছা করেন, আমরা উহা অস্বীকার করি, ইহাই হইতেছে জীবনের দ্বন্দ্ব। আমাদের বাসনা চরিতার্থ না হইলে আমরা ক্রোধাতুর হই, বাসনার পরিতৃপ্তিতে এক প্রকার আনন্দ লাভ করি। কিন্তু ভগবানের কার্য্যে এরূপ দ্বন্দ্ব নাই, তিনি যাহা করেন সকলই আনন্দের অভিব্যক্তি, উহার মধ্যে আছে সমতা, শান্তি। আমাদের কার্য্য যে দিন ভগবানের কার্য্য হইয়া উঠিবে সে দিন আমরাও শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইব।

ভগবানই সব হইয়াছেন—সৃষ্টির বৈচিত্র্য, মায়ার সৃষ্টি। আমরা যখন পুরুষে অবস্থান করিতে পারি তখনই পাই আনন্দ। মায়াচক্রে সুখ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ি। ভগবানের সহিত আত্মার অভিন্ন দর্শনই সিদ্ধি। ইহা বুঝিতে হইলে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ জানিতে হইবে।

পুরুষের ইচ্ছা সম্পাদনের শক্তি হইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতি অন্ধ—নিজে ভোক্তা নহেন, পুরুষের তৃপ্তি-তেই প্রকৃতির আনন্দ। পুরুষ প্রভু প্রকৃতি দাসী।

আমাদের আত্মা যখন প্রকৃতির একান্ত অধীন হইয়া পড়ে, তখনই আসে অন্ধতা, প্রকৃতিকে অতি-ক্রম করিয়া আত্মার সত্য স্বভাব যখন জাগিতে আরম্ভ করে, তখনই প্রকৃতির সঙ্গে করিতে হয় তুমুল সংগ্রাম, প্রকৃতিকে অতিক্রম করাই আত্মার মুক্তি অর্থাৎ তখনই বিরাট পুরুষের সহিত আমাদের মিলন সার্থক হইয়া উঠে।

জাগরণের এই মহতী ইচ্ছা মনের মধ্য হইতেই ফুটিয়া উঠে—আমরা এই চৈতন্যকে যতই ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিব ততই আমরা দেখিব প্রকৃতির প্রভাব হইতে আমরা উপরে উঠিয়া আসিয়াছি, মনের স্তরকে অতিক্রম করিয়া আরও উচ্চতর মানস-ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আমির আকৃতি হইতে

করিয়া একান্ত শিশুপালের ন্যায় সে কৃষ্ণনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়—ভয়াবহ পরিণামের পূর্ণ ইঙ্গিত সম্মুখে দেখিয়াও শক্তির শেষ দ্যোতনাটুকু আশ্রয় করিয়া সে নবযুগের বিরুদ্ধে বলপরীক্ষায় চেষ্টা করে এবং অল্পবুদ্ধি তরলচিত্ত ব্যক্তিদিগকে নিজের আশ্রয়-স্বরূপ করিয়া নবযুগের তাহার ও তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহারা যে কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা বিশেষভাবে প্রকাশিত না হইলে এ বিষয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু যখন জাতি ও যুগ লইয়া কথা উঠিয়া থাকে তখন দেশের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবকে সম্মুখে রাখিয়া একবার দেখিতে হইবে, প্রাচীনে নিষ্ঠাই মানবকে সঙ্কীর্ণ করিয়া পরে অসুরে পরিণত করে বা নিষ্ঠাই প্রাচীননূতন সকল আদর্শকে পূর্ণ সঞ্জীবিত রাখিয়া প্রাচীন ও নবীনের খণ্ডতা এবং অন্ধতা জনিত দ্বন্দ্বের সম্যক নিরসন করিয়া থাকে। আমাদের মতে, দ্বন্দ্ব যখন উপস্থিত হয় তখন মানবে-মানবেই দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে—মানব যে সমস্ত আদর্শ গুণ ও কর্ম্মে চিহ্নিত হইয়া সংগ্রামে তৎপর হয় তাহা নিমিত্ত মাত্র; আদর্শ গুণ ও কর্ম্ম হইতে মানবত্বের বিলোপ হইলে তাহা আর কোনরূপেই বিরোধের নিমিত্ত মাত্র হইতে পারে না। মানব তাহার অহং বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া গুণ ও কর্ম্মের অবতারণা করে নাই, মানবের অহংকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান গুণে কর্ম্মে প্রকট হইয়া মানবকে দেব-স্বরূপে পরিণত করেন।

অন্ততঃ যখন আমরা দেখি গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রাচীনের যেন একান্ত প্রেমালিঙ্গনে আবিষ্ট হইয়া প্রাচীনের প্রতিভূস্বরূপ হইলেন, অথচ তাঁহার চক্ষু এমন প্রখর ও উদ্দীপ্ত হইল যে অনায়াসে তিনি নবীন পাশ্চাত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতেছেন—দৃষ্টির আলোকসাহায্যে তিনি পাশ্চাত্য ও নবীন প্রাচ্যের সকল অন্ধিসন্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিচয় লাভ করিতেছেন, কিন্তু একদিনও তিনি কাহারও প্রতি উত্যক্ত হইতেছেন না, তখন এইদৃশ্য দেখিয়া স্বতঃই হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। প্রাচীনের প্রেমে তাঁহার নিষ্ঠাধারা হৃদয়কে সদা সঞ্জীবিত রাখিত, তিনি প্রাচীনের পূর্ণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া পাশ্চাত্য, নবীন প্রাচ্য ও সংস্কার-মুগ্ধ বর্ত্তমানকে হৃদয় দিয়াই আলিঙ্গন করিতে পারিতেন—কিন্তু তাঁহার আলিঙ্গন পৌঁছাইত শেষোক্ত ত্রয়ী ধারার সেই মূল উৎস, নিষ্ঠায়। যাঁহারা নিষ্ঠাবান নন, যাঁহারা নামে আচারী উদারপন্থী বা ইউরোপীয়ান কিন্তু কার্য্যে কেবল ঐ ঐ সংজ্ঞা দ্বারা অন্তঃকরণে মাপিয়া লইতেন তাঁহাদের অহঙ্কারের বিভিন্ন লীলাভঙ্গী, তাঁহারা গুরুদাসের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতেন না কিন্তু তিনি নীরব থাকিতেন—কোনরূপ ব্যথিত অন্তঃকরণ লইয়া নহে, একটা উদার স্বচ্ছ সাম্যভাবের অনুভূতি লইয়া তিনি নির্ব্বিবাদে অহঙ্কার-মূর্ত্তিগুলিকে দেখিয়া যাইতেন। এখনও আমরা তাঁহারই ন্যায় দেখিয়া থাকি, সংস্কারের নাম লইয়া বা আজীবন নবীন আব্-হাওয়ায় লালিত পালিত হইয়া যাঁহারা কেবল অহঙ্কারের পুষ্টি ও সন্তোষ ভিন্ন—বা একটা অন্যবিধ-উন্মার্গগামী সংস্কারের সুখতৃপ্তি ভিন্ন অপর কিছু জীবন দিয়া দেখিতে পান না, তাঁহারাই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অন্তঃকরণে একটা দ্বন্দ্বের ধারা রক্ষা করিয়া চলেন। যাঁহাদিগকে সচরাচর আমরা গোঁড়া বলিয়া থাকি, তাঁহারা অনুষ্ঠানগুলি যখন হৃদয় দিয়া ধরিয়া থাকেন না, অহঙ্কার—তাঁহাদের মধ্যে নিছক অহঙ্কার আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-প্রাধান্য যখন মাথা তুলিয়া থাকে, নবীনের প্রতিবাদ

স্বরূপই হউক বা স্বার্থ ও আত্মসর্ব্বস্বতাজনিত অন্তঃকরণের অধম তৃষ্ণার জন্যই হউক, তাঁহারা যখন অন্তর লইয়া হা হা করিতে থাকেন তখনই তাঁহারা সত্যসত্যই আবর্জ্জনা স্বরূপ হইয়া একান্ত অবজ্ঞার পাত্র হইয়া উঠেন।

জাতি বা সমাজের এইরূপ বিষম সময়ে নিষ্ঠাই একমাত্র জাতি এবং সমাজকে রক্ষা করিয়া থাকে। মানব প্রধানতঃ পশুপ্রকৃতিক, মানব প্রধানতঃ স্বার্থপর কিন্তু মানবের ভিতর আবার যে দৈবী সত্তা রহিয়াছে পশুর প্রকৃতি নিয়ামক ও পরিশুদ্ধিজনক বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহা মানবের অন্তরে উদয় হয়, মানব তাহাকে ধরিয়াই উন্নতির এক একটী স্তরে উঠিতে পারে; কিন্তু তাহার স্বার্থপরতা, তাহার পশুত্ব ঐ স্তরে উঠিয়াই আবার নূতন করিয়া জগতের সহিত ক্রোধঈর্ষা দ্বেষদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। ইহা নিয়ম গুণ বা কর্ম্মের দোষ নহে, দোষ ঐ মানবের পশু প্রকৃতির। ইহা বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হয় যখন নিষ্ঠাই কোন ব্যক্তির জীবনের প্রধান নিয়ামক হইয়া ব্যক্তিকে জাৎ সম্প্রদায় ও দেশগত জীবনের মধ্য দিয়া অখণ্ড বিশ্বমানবতায় নিক্ষেপ করে, পরে আবার সেই মানবই অখণ্ড বিশ্ববোধ হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেশ প্রদেশ, জাৎ ও সম্প্রদায়ের সমগ্র গুণনিয়ম অবিচলিত ভাবে পালন করিতে থাকে। এরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব খুবই বিরল কিন্তু সমাজবিপ্লব ও নীতি-বিপর্য্যয়ের সময়ে এইরূপ একটা সম্প্রদায় গঠিত হইয়া পড়ে যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত চরিত্র স্মরণ করিয়া প্রাচীনের সনাতনত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদের চরিত্রে গুরুত্ব ও বিরাটত্ব না থাকায় তাঁহারা অনেকটা নব প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নবীনের খানিকটা ভূমি অধিকার করেন; তাঁহাদের কার্য্য হয় প্রবীনের মূল রক্ষা করিয়া চলা—কোন কারণেই তাঁহারা প্রাচীন ধারার মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন না এবং দেশকেও তাহা করিতে দেন না। অনেকেই নব প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে জাতির ধারারক্ষায় চেষ্টিত হন, কিন্তু কেহ কেহ প্রাচীন আবাসে বাস করিয়াও যুগোপযোগী কার্য্য করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে রাজা রামমোহনের যুগ হইতে এইরূপ এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ইঁহাদের প্রধান গুণ নিষ্ঠা। যাঁহার অন্তঃকরণ যত বেশী নিষ্ঠার আলাসস্থল ছিল, তিনি তত বেশী গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে মানব-অহঙ্কারের ক্রূর লীলা অবলোকন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং মানবের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা পুঞ্জীভূত হইয়াই যেন আমাদের মধ্যে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণের উদয় সম্ভব করিয়াছে—তিনি আমাদিগকে এমন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যদ্দারা আমরা অহঙ্কার হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে সক্ষম হই এবং কোনরূপ প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ না করিয়া বিশ্বমানবতার পূর্ণ ও নিবিড় চরিতার্থকরূপে দেশ-ধর্ম্ম ও সমাজ-জাতের সকল প্রকার কার্য্য অতি আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিতে পারি। এরূপ চরিত্রের প্রধান সম্বল নিষ্ঠা। নিষ্ঠার শক্তি দ্বারাই আমরা গণ্ডীর পর গণ্ডী ছিন্ন করিয়া বিশ্ব-আত্মায় মিশিতে পারি, পুনরায় প্রত্যেক তথাকথিত গণ্ডীর মধ্যে বিশ্ব আত্মার পূর্ণ আনন্দ সম্ভোগে কৃতার্থ হই। কিন্তু নিষ্ঠারও আবার একটা অহঙ্কার আছে—এই অহঙ্কারকে চূর্ণ না করিলে আমরা আমাদের চরম ধামে পৌঁছাইতে পারি না এবং এই নিষ্ঠার গর্ব্বের জন্য একান্ত শুদ্ধপ্রকৃতিক ও সত্ত্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে আবার ঠেলিয়া দিয়া শুদ্ধা নিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিতে হয়; কিন্তু

সকল সময়ে সাবধান হইতে হইবে, তাঁহারা যে গুণ ও কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন আমরা যেন তাহার প্রতি একান্ত কঠোর হইয়া সমাজে নৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়া না উঠি। সংস্কারে নিষ্ঠা স্রোতে অবগাহন করিলে এ ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু মানব গুণ ও কর্ম্মের দৈবীশক্তি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, যখন সে অহঙ্কার ও স্বার্থপূর্ণ জীবন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। আর এই অহঙ্কার ও স্বার্থের জন্য বিনা শিক্ষার সাহায্যে সে কিছুতেই মানবের বিভিন্ন প্রকার জীবন ধারার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না। অন্তঃকরণ একেবারে পরিশুদ্ধ না হইলে বিভিন্ন জাতিবোধ ও সভ্যতা বোধের ধারার সমঞ্জস্য করা খুব শক্ত হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গলায় কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহাদের চরিত্রবল দৃঢ়, যাঁহারা প্রাচীনকে পদে পদে অনুভব করিয়াছেন না জীবনের প্রতি পদে যাঁহারা প্রাচীন বন্ধনীর স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাঁহাদের প্রভাব দেশে ঘনীভূত হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশ প্রাচীন সভ্যতা ও গুণানুযায়ী এক ভারতীয় দেশাত্মতাবোধ পাইয়া এক্ষণে যেন তাহার গর্ব্বে বিশ্বমানবতাকে তাহার ন্যায্য আসন দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমানের এই বৃহৎ বস্তুর সূক্ষ্ম ও একরূপ বিরাট গন্ধটুক শুদ্ধা নিষ্ঠা যোগে বিলুপ্ত না হইলে আমরা দেশের আত্মাকে পূর্ণ সম্ভোগ প্রদান করিতে সক্ষম হইব না। এই কার্য্যেও নিষ্ঠাই আমাদের প্রধান সহায় হইবে। শুদ্ধা নিষ্ঠা যোগে কিরূপে দেশনিষ্ঠার অহঙ্কার অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহা যিনি জীবনে অনুভব করিয়াছেন, বর্ত্তমান ভাববৈচিত্র্যে তিনি অন্তরাল হইতে অনেক আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।

প্রথমে তিনি দেখিতে পাইবেন, দেশবোধ জগতে যতই প্রাধান্য বিস্তার করুক না কেন মানবমধ্যস্থ বিশ্ব আত্মার ক্ষুধা তাঁহাকে তৃপ্ত করিতেই হইবে। বিশ্বের কথা ভাবিয়া দেশবাসীর নিবিড় ও সংহত শক্তি দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন হইবার ভয়ে সকল দেশে যে ভূয়া বিশ্বাত্মার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের ধারা চলিয়া আসে তাহাতে পূর্ণ দেশপ্রেমিকের বিশ্বপ্রীতি কিছুতেই সংযত করা যায় না—দেশের ও-চেষ্টা বিফল হইবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাইব, ঐকান্তিক দেশপ্রেমিক হৃদয়ের প্রবল নিষ্ঠার বেগে দেশজ অহঙ্কার পার হইয়া একান্ত কাতর অন্তঃকরণে বিশ্বসাগরে স্নাত হইতেছেন, আবার দিব্য শান্তি লাভ করিয়া শুদ্ধ দেশপ্রেমে দেশকে অভিষিক্ত করিয়া জগতে পুলক সঞ্চার করিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টিটুকু হারাইলে আমাদের চলিবে না যে বিশ্ব আত্মা বিশ্ব সমষ্টিতে আয়তন লাভ না করিয়া কিছু বেদনায় অস্থির হইতেছে, যেমন পূর্ণ দেশপ্রেমিকের আত্মা কাতরে বিশ্বতীর্থে স্নান করিতেছিল। ইহার তুষ্টি জগতে কখন হইবে কিনা জানি না, তবে প্রশান্ত মানবের হৃদয়ের বিশ্বপ্রীতি তাহাকে সঞ্জীবিত রাখিবে এবং পরে সকল দেশ লইয়া এবং সকল মানব লইয়া তাহা যে কখন বিশ্বরাষ্ট্রে ও বিশ্বসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, মানবের একমাত্র শুদ্ধা নিষ্ঠাই তাহা নির্দ্দেশ করিবে। কেন না উহা ভিন্ন আর কিছুই ভূয়া বিশ্বপ্রেমিকের বিমূঢ় আত্মার জ্ঞান সঞ্চার করিবে না এবং উহা ভিন্ন আর কিছু বিমল স্বাদেশিকতার সূক্ষ্ম অহঙ্কারটুকুও নষ্ট করিতে পারিবে না।

ভূয়া বিশ্বপ্রেমিকের বিমূঢ় ও তরল আবেগ দেখিবার পরে, একনিষ্ঠ স্বদেশীর দেশের প্রতি তীব্র আগ্রহের মধ্যে যে কিরূপ পুরাতনকে টানিয়া যুগ-রাজ করিবার চেষ্টা—অন্তরাল হইতে তাহা অবলোকন করিয়া আমাদের অনেককেই পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে

হয়। তাঁহাদের সহিত অনেকেরই সাধনার ঐক্য থাকিয়া যায়, অতএব অধিকাংশ সময়ে বিশ্ব আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে যখন তাঁহারা অক্ষম হন বা দেশের মধ্যেই বিশ্বদর্শনের সত্যাংশকে পূর্ণ সত্যরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যখন তাঁহারা কোন্দল ও হট্টগোলে প্রবৃত্ত হন, তখন আমাদিগকে সশঙ্ক হইয়া তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিতে হয়. এই অবস্থায় যখন অনেক শিশির চন্দ্র ও অনেক সুরেশচন্দ্র উদয় হন এবং যাঁহাদিগকে আমরা শিশির ও সুরেশের অতিরিক্ত আর অন্য সত্তায় দেখিতে পাই না, তখন আমাদের হৃদয়ের কোন অমঙ্গল হইতে অতল নিরাসমদ উথলিয়া উঠে এবং দেখিতে চাই তাহা যেন স্বদেশাগ্রহী ব্যক্তিকে স্পর্শ করে। এই প্রবল নিষ্ঠার যোগে তাঁহাদের পরামুক্তি যে সম্ভব সে বিষয়ে ত আমাদের সন্দেহ নাই। নিষ্ঠার শক্তি যেরূপ প্রবল, হৃদয়ের মধ্যে তাহার সুপ্রকাশের যদি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে অচিরে ধরাধাম স্বর্গে পরিণত হইবে। আর দেখা যায় যখন ধরা স্বর্গে পরিণত হয় তখন শুদ্ধ নিষ্ঠারই লীলাখেলা হইতে থাকে। মানুষের অহঙ্কারকে ভাঙ্গিয়া সকল নিয়ম গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে ভাগবত প্রেমের বন্যা বহাইতে নিষ্ঠার অদ্বিতীয় শক্তি।

পণ্ডিচারীর পত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
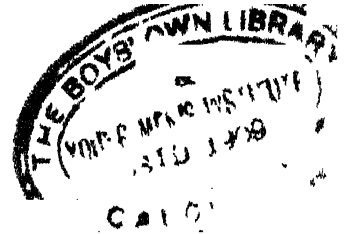
গাড়ী মাদ্রাজে পৌঁছিলে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কোথায় আমার বাংলা দেশ আর কোথায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ভারতের দক্ষিণ, লোকের আচার ব্যবহার বেশভূষা সকলেরই পরিবর্ত্তন—আমি মুগ্ধনেত্রে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলাম। গাড়ী লোকজন বাড়ীঘর সকলই নূতন; ভাষা নূতন, একই ভারতবর্ষে বাস করিয়া আমরা ইহাদিগকে চিনিনা, ইহাদের ভাষা বুঝিনা—বুঝি বিলাত আমাদের কাছে পুরাতন, কেননা সেখানে ভাষা দিয়া আমরা মনোভাবের আদান প্রদান করিতে পারি। এই নবাগত কয়েকটী বাঙ্গালীকে দেখিয়া ইহারা অবাক হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। বাস্তবিক এত বড় মাদ্রাজ সহরে আমরা একজনও বাঙ্গালীকে দেখিলাম না। কলিকাতা যেমন সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী • এই মাদ্রাজও তদ্রূপ মাদ্রাজ বিভাগের রাজধানী। কলিকাতার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। তবে এখানে High Court, University, Medical College Law College, Electric Light, Electric Tram Car, Motor Car, সমুদ্রবক্ষে বন্দর, জলেরকল, দোকানপশারী বাড়ীপ্রাসাদ সবই আছে। কিন্তু সবই নূতন। মহিলারা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিঃসঙ্কোচে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কত কি দেখিতে দেখিতে আমরা এক হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন দিবা দ্বিপ্রহর হইবে। ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলিয়া উঠিয়াছে, স্নানের ইচ্ছা

এত প্রবল তাহা আর কি বলিব, যাহা হউক কলের জলে স্নান করিয়া একটু সুস্থ হইলাম। পরে সেই হোটেলের এক যুবতী মহিলা আমাদিগকে অন্ন পরিবেশন করিয়া গেল, অড়হর ডাল আলু চড়চড়ি আর কাঁচা আম সরিষা মাথা—তাই দিয়া কোন প্রকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া বিশ্রাম করিলাম। মাদ্রাজের প্রায় প্রান্তভাগে একটী ষ্টেশন, সেটীর নাম "Egmore"। আমরা একখানি গরুর গাড়ী করিয়া সেই "Egmore" ষ্টেশনে আসিলাম। মাদ্রাজের ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচম্যান, মুটে প্রভৃতি অতি ইতর লোকেও চলনসই ইংরাজী কথা কহিতে পারে। ষ্টেশনটী অতি সুন্দর, ইহার বিশ্রাম করিবার ঘর এত সুন্দর তাহা তোমাদের কি জানাইব। এইখানে আমরা দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ করিলাম, ভিল্লুপুরাম ষ্টেশন পর্য্যন্ত। পরে ট্রামে চড়িয়া আমি ও 'না' বাবু মাদ্রাজ সহর দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। তখন সূর্য্যদেব অস্তমিত প্রায়, অফিসের বাবুরা বাড়ী ফিরিতেছে। মহিলারা নানাবিধ বেশভূষায়, পুষ্পমাল্যে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া পথে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। পথের ধারে সাধারণ স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ পুষ্পরাশি লইয়া বিক্রয় করিতেছে। সমুদ্রকূলে গিয়া দেখি কত জাহাজ কলিকাতার মত বন্দরে রহিয়াছে, কোনটী হইতে মাল নামান হইতেছে, আবার কোনটীতে বা মাল বোঝাই দেওয়া হইতেছে। পরে আমরা ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সাতটার সময় গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়া লাগিল। আমাদের জন্য একজন ইউরোপীয়ন বীচ ষ্টেশন হইতে সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর লইয়া গিয়া জলের কল, পায়খানা, Electric light, fan প্রভৃতি আবশ্যকীয় স্থানগুলি দেখাইয়া দিল। একটী মাদ্রাজী 'Boy'কে আমাদের আদেশ শুনিবার জন্য রাখিয়া গেল। 'ব' বাবু আনন্দে আটখানা হইয়া সকল Electric fan গুলি খুলিয়া "এই যে ছিল কোথায় গেল কমল দল বাসিনী" গানটী গাহিতে লাগিলেন। গাড়ী অবিশ্রাম গতিতে চলিয়াছে। আমরা তন্দ্রাতুর এমন সময়ে "Boy" আমাদের জাগাইয়া দিয়া বলিল, "Babu this is Villupuram"। আমরা সচকিতে চাহিয়া দেখি একটা মস্ত প্লাটফরম, মধ্যে মধ্যে তৈল প্রদীপ বড় বড় কাচের লণ্ঠনের মধ্যে জ্বলিতেছে, তামিল ও ইংরাজী ভাষায় লেখা আছে "ভিল্লুপুরাম." আমরা নামিলাম, গাড়ী প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সেইখানে অবস্থান করিল। আমরা ফাষ্টক্লাসের টিকিট কিনিয়া পণ্ডিচারী ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ী ক্ষণপরেই ছাড়িয়া দিল। রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময় গাড়ী পণ্ডিচারীতে পৌঁছিল। মধ্যে অনেকগুলি ষ্টেশন ছিল কিন্তু আমরা বড়ই ক্লান্ত হওয়ায় শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ষ্টেশনে আমাদের জন্য দুইজন বাঙ্গালী যুবক অপেক্ষা করিতেছিল, ইহারা এখানে পড়িবার জন্য চন্দননগর হইতে আসিয়াছে। আমরা অতঃপর উহাদেরই নির্দ্দিষ্ট একটী বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম।

পণ্ডিচারী,
ডিসেম্বর, ১৯১১ }

(২)

এই সহরটী খুব নূতন বলিয়া বোধ হয়। কোন প্রাচীন দৃশ্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল দুই একটী দেবমন্দির ব্যতীত সমস্ত বাড়ী ঘরই নূতন। শুনিতে পাওয়া যায় 'ডুপ্লে' সাহেবের সময় যে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল সেই সময় ইংরাজেরা সহরটীকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। পরে ক্রমে ক্রমে আবার নূতন করিয়া সহরটী গঠিত হইতে থাকে। সহরটি অতি ক্ষুদ্র, দেখিতে হংস ডিম্বের মত। সহরের

প্রান্ত-সীমায় ঠিক ঐরূপ রাস্তা আছে। এক স্থান হইতে ভ্রমণে বাহির হইলে পুনরায় সেই স্থানে পৌছিতে তিন কোয়াটারের অধিক সময় লাগেনা। এখানে রাস্তা ঠিককরা বড় শক্ত, কারণ সমস্ত রাস্তাগুলিই প্রায় একরূপ। রাস্তাগুলি খুব সোজা (Straight)। বালুময় স্থান বলিয়া সহজে কোন রাস্তায় কাদা হয় না। এখানে রাস্তার উভয় পার্শ্বে নর্দ্দামা অথবা ড্রেন নাই। রাস্তাগুলি কচ্ছপের পিঠের মত ঢালু, রাস্তার পার্শ্ব দিয়া জল বহিয়া চলে। সহরের পশ্চিম দিকে একটা ছোট নর্দ্দামা, তাহাকে Petit canal বলে। আর একটা canal আছে, সেটা সাহেব ও হিন্দু-মহলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঐ দুই canal দিয়া জল নির্গত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। সহরের পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র, পশ্চিমে বাগান ও অনেকগুলি গ্রাম, উত্তরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং দক্ষিণে ষ্টেশন।

এদেশের মেয়েরা বেশ মুক্ত। এদের সুন্দর সরল হাসিমুখ দেখিলে এদের ভিতরকার একটা আনন্দের আভাস পাওয়া যায়। বাংলা দেশের মত অতি অল্প বয়সে এ দেশের মেয়েদের বিবাহ হয় না। আমি বাংলাদেশের দোষ দিই না। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে আমাদের দেশের মেয়েরা যেমন পুত্রবধূ হইয়া পার্থিব আনন্দের সকল শেষ করিয়া 'রুক্ষসূক্ষ্ম' ভাবে দিন যাপন করে, এ দেশে তেমন নয়। কাজেই এখানকার মেয়েদের স্বাস্থ্য দেখিলে আমাদের হিংসা হয়। মাদ্রাজে একটী হোটেলে একবেলা ছিলাম, সেখানকার কর্ত্রী এমন বলশালিনী যে এক 'হাণ্ডা' (ছোট জালার মত পাত্র বিশেষ) জল এক হাতে কলতলা হইতে অনায়াসে রন্ধনশালায় লইয়া আসিল। একথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। বাজারে দেখিলাম অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে বাজার করিতেছে। বাংলা দেশে একটী অতি হীন জাতির মেয়ে যদি একটু 'সেজেগুজে' রাস্তায় বাহির হয় তবে আমাদের দেশের অতি শিক্ষিত ভদ্র সন্তানরা পর্য্যন্ত কদর্য্য ব্যবহারের ভাব দেখায়। এখানে সে সকলের ভাব আদৌ নাই। আমাদের দেশের মেয়েরা প্রকৃত চুলের যত্ন জানে না। চুল গজাইতে না গজাইতে একটী দড়ি ও ফিতা দিয়া চুলগুলিকে যেরূপ নিষ্পীড়ন করে তাহাতে তাহারা আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এবং যেটুকু হয়, দুই এক ছেলের মা হইলে সেগুলিও উঠিয়া যায়। এদেশে চুলের কদর আছে, ইহারা চুলগুলিকে বেশ বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ দেয়, কখন শিল্পকলার নৈপুণ্য দেখাইতে প্রয়াস পায় না। এখানকার মেয়েরা চুলগুলিকে বেশ গুছাইয়া সম্মুখ ভাগটী পরিষ্কার করে, সিঁথি সোজা হউক আর নাই হউক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া নয়, তারপর পশ্চাতের নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলগুচ্ছ বেশ গুছাইয়া কেহ কলা খোপা করিয়া বাঁধে আবার কেহ কেহ পুঁটুলির মত করিয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া রাখে। তাহাতেই ইহাদের এমন সুন্দর দেখায় তা তোমাদের কি বলিব, তবে সকলের চক্ষে আমি যাহা দেখিতেছি বা বলিতেছি তাহাই যে সুন্দর বোধ হইবে এমন বলা যায় না। নূতন দেখিলেই ভাল লাগে, কোন বঙ্গমহিলা এখানে আসিলে খুব সহজেই এদের উপর 'গুরুগিরি' করিবেন সন্দেহ নাই।

অলঙ্কার সম্বন্ধে এদের বেশ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। নাকে একটী বেশ বড় রকমের 'নাকছাবি,' কি দরিদ্র কি ধনী সকল রমণীই পরিয়া থাকে। তবে ধনীদের 'নাকছাবি' হীরক চুণি পান্না খচিত, আর গরীবরা সামান্য প্রস্তর অথবা উজ্জ্বল কাচ খচিত 'নাকছাবি' পরিধান করে। উভয় কর্ণে বেশ বড় বড় সোণার 'ফুল,' যাহার যেমন ক্ষমতা সে তদ্রূপ মূল্যবান 'ফুল' দ্বারা অঙ্গের শোভা বর্দ্ধিত করে। গলদেশে সুবর্ণ হার। কেহ বা সারি সারি মোহর গাঁথিয়া পরে কেহ বা বড় বড় সোণার দানা গাঁথিয়া পরে।

এই সকল গহনা অনেকটা 'নেকলেসের' মত। যাহারা দরিদ্র তাহারা উজ্জ্বল প্রস্তর পতি অথবা নীল কাচের মালা ঐরূপ আকারে কণ্ঠে ধারণ করে। হস্তে আমাদের দেশের মেয়েরা যেমন সোণার শাখা পরে এরা তদ্রূপ বেশ মোটা মোটা চকচকে চওড়া সোণার চুড়ি দুই গাছা ধারণ করে। রৌপ্য নির্ম্মিত কেহ ব্যবহার করে না। যাহারা দরিদ্র তাহারা একপ্রকার ঐরূপ আকারের লাল রং এর চুড়ি পরিয়া থাকে। আমাদের মেয়েদের অপেক্ষা ইহারা বেশ সভ্যভাবে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। বেশ রঙীন কাপড গুলি এমন সুন্দর ভাবে অঙ্গে জড়াইয়া লয় যে তাহাতে অতি কুরূপা রমণীকেও দূর হইতে সুন্দর দেখায়। গায়ে প্রায় সকলেরই 'কোর্ত্তা' থাকে লজ্জা নিবারণের জন্য ইহাই এদের যথেষ্ট। আমাদের মেয়েরা বেশ সরু কাপড় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকেন নিজেদেরও লজ্জা হয় না আমাদেরও লজ্জা করে না। এদেশের মেয়েরা কিন্তু পুরু রং করা, অবস্থাভেদে দামী অথবা সস্তা কাপড় গুলি বেশ গুছাইয়া পরিধান করে। কি ধনী কি দরিদ্র সকল ঘরের স্ত্রীলোকই কবরীতে ফুল অথবা ফুলের মালা দেয়। বাজারে রাশীকৃত ফুল ও ফুলের মালা সারাদিন বিক্রয় হইতে থাকে। একটী ধনী গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম একটী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বালিকা গান সাধিতেছে, গমক শিখিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম এইবার তাহার বিবাহ হইবে। বুঝিলে এখানে হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়াও কেমন স্ত্রী স্বাধীনতা আছে? এখানকার মহিলারা বিবাহ হইলে লোহ ও সিন্দুর ধারণ করে না, কণ্ঠে একপ্রকার ধুক্‌ধুকি ব্যবহার করে, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় এই রমণী বিবাহিতা। ইহারা ললাটদেশে সিন্দুর ধারণ করে। অপরাহ্ণ কালে 'টিপ' পরে। ছোট ছোট পাত্রে এক প্রকার কাল রং বাজারে বিক্রয় হয় ইহাই স্ত্রীলোক দিগের 'টিপ', মূল্য এক 'কাশ' অর্থাৎ এক পাই।

এখানকার সকল লোকেই প্রায় খালি পায়ে বেড়ায়, বড়জোর খড়ম পায়ে দেয়। এমনকি শুনিলাম *Consul General*এ সদাশিবম খড়ম পায়ে দিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন রাত্রে হিন্দু দেবমন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। রাত্রি অধিক হওয়ায় অন্য দেবতাদির বিবরণ লিখিতে অসমর্থ হইলাম। মন্দিরের আকার ও গঠন সম্পূর্ণরূপে আমাদের বাংলা দেশ হইতে বিভিন্ন। আমাদের দেশে যেমন ঠাকুর যেস্থানে থাকেন সেইটাই মন্দির আকারে গঠিত এবং সর্ব্বোচ্চ, এদেশে সে প্রকার নহে। প্রবেশের পথে যে সিংহ দরজা সেইটাই সর্ব্বোচ্চ গোপুরগুলি একতলা, দ্বিতলা, এমনকি সপ্ততলা পর্য্যন্ত উন্নত। প্রতি তলে একটী করিয়া আলোক জ্বালাইয়া রাখে সে বেশ সুন্দর দেখায়। ভিতরে দেব নহে দেবী মূর্ত্তি। অথবা তিন মূর্ত্তি, পরে বিস্তৃত দালানে নানাবিধ বিগ্রহ শোভা বিস্তার করিয়া বিরাজমান। একটী মন্দিরের ইতিহাস শুনিলে তোমরা চমৎকৃত হইবে। হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য এইখানে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সহরটী দুইভাগে বিভক্ত, একটা বিস্তৃত পরিখা সহরটীকে বিভক্ত করিয়াছে। সহরের পশ্চিম ভাগ দেশীয় দিগের জন্য এবং পূর্ব্বভাগ শ্বেতাঙ্গ দিগের জন্য। পূর্ব্বে পরিখার নিকট একখণ্ড কাষ্ঠ ফলকে লেখা থাকিত অবশ্য ফরাসীভাষায় "শ্বেতাঙ্গ দিগের আবাসভূমি"। সে বিভাগে কালা আদমির বাস করিবার অধিকার ছিল না। তাহার পর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ফরাসী রাজ্যে এই প্রকার অসামঞ্জস্য থাকা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া উদার সবল কোন রাজপুরুষ এইরূপ লিখিত ফলকটী দূর করিয়া তাঁহার উচ্চ চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন। যখন সহরটীর পূর্ব্বার্দ্ধভাগ কেবল শ্বেতাঙ্গদিগের আবাসভূমি ছিল, তখন ঐ ভাগে

বহুদিনের একটী হিন্দু দেবমন্দির ছিল। কোন শ্বেতাঙ্গ এইরূপ অসদৃশ দৃশ্যে কোপান্বিত হইয়া মন্দির-স্থিত বিগ্রহকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিয়া দেন। পরদিন প্রাতঃকালে বিগ্রহ চুপে চুপে আবার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। সাহেব ভাবিল কোন দুষ্টলোক তাহার অতর্কিতে বিগ্রহটীকে সমুদ্রসলিল হইতে উঠাইয়া আবার মন্দিরে স্থাপন করিয়াছে। এইবারে সাহেব বিগ্রহকে অধিক জলে নিক্ষেপ করেন। বিগ্রহ স্থানত্যাগ করিতে নারাজ, কাজেই তিনি আবার আসিয়া মন্দিরে আশ্রয় লন। সাহেব বিরক্ত হইয়া হিন্দুর দেবতার উপর গো-রক্ত গো-হাড় নিক্ষেপ করিয়া মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন। হঠকারিতার ফলস্বরূপ সাহেব পরদিন প্রাতঃকালে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকেন। সন্তান সন্ততির হাসিমাখা চাঁদমুখ তিনি আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সম্মুখে সারা বিশ্ব একটা নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পিণ্ডবৎ বোধ হইতে লাগিল; দিবারাত্র সমান হইয়া গেল, সাহেব চিরতরে অন্ধ হইলেন। কিছুদিন পরে সাহেবের অনুভব হইল তাঁহার হস্তের অঙ্গুলিগুলি স্ফীত হইয়াছে, পদতল মেদিনীস্পর্শে সূচি-বিদ্ধ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সাহেব কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিকট আকার ধারণ করিল। সাহেবের চৈতন্য আসিল। কোন্ মহাপাপে তাঁহার এই দুর্দশা, ইহা তাঁহার বুঝিতে আর বাকি রহিল না। সাহেব নিজে অর্থব্যয় করিয়া পুনরায় সেই মন্দির করিয়া দিলেন। ঠাকুরের সেবা যাহাতে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। European Quarterএ এখনও সেই দেবমন্দির স্বীয় মাহাত্ম্যের ঘোষণা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে সাহেবের বাটী, মধ্যস্থলে হিন্দুর মন্দির, শঙ্খ কাঁসর প্রভৃতির ঘোর রোলে সদাই মুখরিত। বুঝিলে, ঠাকুর জিদ্ করিয়া কেমন আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন?

এখানে সাত জন মাত্র বাংলার ছেলেদের দেখিতে পাই। তিন জন চন্দননগরের, ইহারা এখানে পড়িতে আসিয়াছে। আর চারিজন অরবিন্দ বাবুর ছাত্র। তাহারা এখানকার সকলের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া আছে।

পণ্ডিচেরী }
ডিসেম্বর, ১৯১১ }　　শ্রী—

সূতা ও চরকা

—:০:—
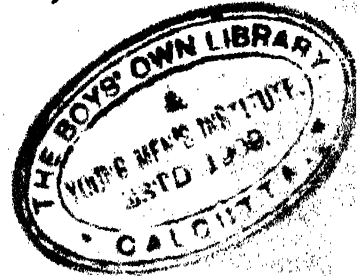
মানুষ অর্থ আর অস্ত্র এই তিনের প্রাচুর্য্যে একটা বিপ্লবসৃষ্টি অনায়াসসিদ্ধ হইতে পারে—কোন পরাধীন জাতির মুক্তি এইরূপ বিপ্লবের উপরই নির্ভর করে। ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের সম্ভাবনাও এই একই নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তবে রক্তপাতের বিভীষিকা এক্ষেত্রে একেবারেই নাই, কেননা এই বিপ্লবে violenceএর নাম গন্ধ থাকিবে না।

মানুষ চাই এককোটী—অর্থ সংখ্যাও তদতিরিক্ত নহে, অস্ত্রস্বরূপ এককোটী চরকা হইলেই চলিবে। অংশ করিয়া বাংলায় ৩০এ জুনের মধ্যে ১৫ লক্ষ

লোক, ১৫ লক্ষ টাকা আর ১৫ লক্ষ চরকা সংগ্রহ করিতে হইবে। বাংলার নেতৃপুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই আবেদন দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন —এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবনে কর্ম্মের কশাঘাত যত তীব্র হইয়া বাজিবে, মোহ আমাদের তত শীঘ্র টুটিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, অতএব ঘৈ ঘৈ রবে মানুষ কর্ম্মরত হউক ইহা আমাদের ষোল আনা ইচ্ছা।

কাজের চাপ দিয়া লোকের স্বভাব পেরণারুদ্ধ করিবার জন্য যদি চরকার প্রবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই, কেননা Non violence মানুষের বক্তমাংসের শবাবে বড় সুবিধার হয় না, যিনি দেবত্ব পাইয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র, সর্ব্ব ভূতে আপনাকে এবং আপনার ভিতর সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান দর্শন না করিলে ইটের বদলে পাটকেল নিক্ষেপ করাই স্বভাবরীতি হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মীদের রক্ত দধির মত শীতল রাখার পক্ষে প্রতিদিন চারি পাঁচ ঘণ্টা চরকা ঘুরান খুবই প্রয়োজন, কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপার এরূপ নহে, ইহার মধ্যে বস্ত্রসমস্যা নিবারণ প্রয়াস, এবং প্রতি বৎসর বিলাতী বস্ত্রে ষাট্‌কোটী টাকা বাহিরে চলিয়া যায় উহা রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গোপন রহিয়াছে, কাজেই এতদ সম্বন্ধে মানুষের স্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল, এরূপ বৃহৎ উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে বেকার থাটাই যদি পরিণাম হয়, অবসাদের মাত্রা কিরূপ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিবে —তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, পুনঃ পুনঃ আশাভঙ্গে আমাদের অস্থিপঞ্জর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—এবার কর্ম্মনির্দ্দেশ সত্য হওয়া চাই, খাঁটি হওয়া চাই, কাজের মাতাল যারা তাদের কাজ একটা নেশা, যেমন তেমন কাজ মিলিলেই তারা বক্তমুখী হইয়া ছুটে, কিন্তু বাংলার একদল লোক বিগত পনের বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কাজের আদি অন্ত না দেখিয়া আর নাচিতে রাজী নহে, তাহাদেরই প্রশ্ন —এই চরকার সাহায্যে আমরা কি দেশের বস্ত্রসমস্যা দূর করিতে পারিব? না, অন্য কোন সুষ্ঠু উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে অতি সহজে ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে।

চরকার গোঁড়া যারা, তাঁরা বলেন –

"চরকা আমার সোয়ামীপুত
চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার
দোয়ারে বাঁধা হাতী। –

কিন্তু এই ছড়া যখন পাড়ায় পাড়ায় গীত হইত, তখন একটা টাকা টাকে গুঁজিয়া, এক সপ্তাহের মত হাট বাজার করিয়া বাড়ী ফেরা যাইত, আর আজ একটা টাকার মূল্য কতখানি তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, অথচ চরকাকাটার পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই—মহাত্মা গান্ধীর মতে এক জন প্রতিদিন বারঘণ্টা কাজ করিলে তাহার পরিশ্রমের মূল্য হইবে তিন আনা বার ঘণ্টা যে পরিশ্রম করিতে পারে, সে তিন আনা পয়সার জন্য এতখানি সময় দিবে না, কার্য্যান্তরের চেষ্টা দেখিবে।

আমরা চরকা প্রচলনের বিরোধী নহি—তবে বড় আশায় উদ্বুদ্ধ না হইয়া আমাদের ঘরে যে সব নরনারী অনর্থক সময় নষ্ট করে, তাহাদের পক্ষে খুব উপযোগী কাজ হিসাবে ইহা প্রবর্ত্তিত হউক, আমরা বার বার বলিয়াছি, চরকার সাহায্যে দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে না—অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারতে ১৯১৯ সালে সূতা আমদানি হইয়াছিল ১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড; ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল ১৪ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক, ইহা চিক্কণ সূতা নহে, কাজেই বিদেশে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে—কথাটা শুনিলে কি মনে হয়? দেশীয় তাঁতিগণ মোটা সূতায় কাজ না করায়, বিলাত হইতে আমদানি সূতার বায়-

গুণ অধিক সূতা ভারতে প্রস্তুত হইয়া বাহিরে চলিয়া যায়, আর আমরা আজ পর্য্যন্ত অন্নের প্রতি কোন দৃষ্টি না দিয়া চরকা চরকা করিয়া চেঁচাইতেছি—এ দেশের মাথা নাই অথচ মাথার যন্ত্রণায় অস্থির, কাজেই ইহাদের বাতুল না বলিয়া কি বলিব ?

১৯১৯ সালে ভারতে ১৯ কোটী ৭০ লক্ষ গজ কাপড় আসিয়াছিল, আর ভারতে ২০ কোটী ১০ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হইয়াছে। আমদানি রপ্তানি বাদ দিলে, ভারত ৫৯ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কাপড়ের টাকা বাহির করিয়া দিয়াছে। ভারতে প্রস্তুত মোটামুটী ২৩ কোটী পাউণ্ডের সূতা যদি আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি, প্রতি পাউণ্ড সূতা যদি ৪॥০ গজ কাপড় হয় তাহা হইলে আমরা পাইব প্রায় ৫৮ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কাপড়। ভারতে দুইশত আশী কোটী গজ কাপড় আন্দাজ প্রতি বৎসর প্রয়োজন হয়।

বিলাত হইতে যে কাপড় আমদানি হইয়াছে, উহা বাদে ভারতবাসী প্রায় একশত বিশকোটী গজ কাপড় পাইয়াছে, তারই দেখা যায় ভারতে যত বিদেশী সূতা আসিয়াছিল তাহার রপ্তানি বাদে ভারতের কলের জন্য ব্যবহৃত সূতার পরিমাণ ব্যতীত ভারতে যে সূতা বাড়তি হইয়াছিল সেগুলি নিশ্চয় হাতের তাঁতে বুনা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের এককোটী দশ লক্ষ পাউণ্ডের সূতার অভাব হইতেছে, এই সূতা ভারতে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিলে, ভারতবর্ষ বস্ত্রের জন্য বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিবে না—এই সহজ কথাটা দেশবাসীর মাথায় প্রবেশ করাইতে সম্ভবতঃ অধিক বেগ পাইতে হইবে না।

তারপর কলগুলি সাগরপারে পাঠাইবার ব্যবস্থা যদি করিতে হয়, তাহা হইলে—এই মুহূর্ত্তেই তো ইহা সম্ভব নাই, বরং ইহার দ্বারা আমরা যতটা দেশের অভাব দেশ হইতেই মিটাইতে পারি তাহার দিকে লক্ষ্য দিব, ইতাবসরে চরকার উন্নত সংস্করণের দিকে মনোযোগ দেওয়া হউক। আমরা চরকার একটা কল নির্ম্মাণ করিয়াছি, উহা হইতে একত্রে পাঁচ থাই সূতা বাহির হইতে পারে, কিন্তু তূলা পেঁজার সুব্যবস্থা করিতে না পারায় কেবল সরু মোটা এলোপাথের সূতায় কাজ তো বিশেষ হইবে না, সেইজন্য উহার উপকারিতা বিষয়ে আমরা সন্দিহান হইয়াছি। শুনিতে পাই ছাপরার কোন এক ভদ্রলোক এইরূপ চরকার আবিষ্কার করিয়াছেন—সূতা না দেখিলে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিব না। সত্যাগ্রহ আশ্রম হইতে চরকার উত্তম সংস্করণের জন্য পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, ৩০শে মার্চ্চ চরকা পাওয়া গেল কি না সে কথা ঘোষণা করিবার দিন ছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ আমরা পাই নাই, খুব সম্ভব ইহাতে এখনও পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, উত্তেজনার যুগে যেমন তেমন করিয়া পাকাইয়া দুই চারি থাই সূতা কোনরূপ কৌশলে বাহির করিতে পারিলেই—সংবাদ পত্রে ঢাক পিটান হয়, কিন্তু ফলে কার্য্যসিদ্ধি তো দেখিতে পাই না। অবশ্য উদ্যম রক্ষা করিতে পারিলে, একদিন আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব, ইতিমধ্যে আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছিল—সেখানে কোন কৌশলী এই চরকাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা শীঘ্রই ভারতে পৌঁছিবে, এরূপ যদি হয় তাহা হইলে উটজ শিল্পের পক্ষে খুবই আশার কথা বটে। বর্ত্তমান অবস্থায় পুরাতন প্রথানুসারে চরকা চালাইয়া দুইশত আশীকোটী গজ কাপড়ের সূতা প্রস্তুত একটা প্রকাণ্ড "গোঁয়ার্‌-তুমি" ভিন্ন আর কিছু বলিব না।

ভারতবর্ষের বীরেন্দ্র বাবু সংবাদ দিয়েছেন, "চরকায় কাটা সূতার কাপড় বাজারে কিছু কিছু আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক ধুতি ও শাড়ীর মূল্য ৪॥০ হইতে ৮৲ পর্য্যন্ত।" ঠনঠনের গোঁড়ের

ইয়ং সোসাইটীতে এই কাপড় পাওয়া যায়, অবশ্য আমরা কাপড় দেখি নাই, কাজেই এ বিষয়ে কোন মন্তব্য দেওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত পত্রে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়, চরকা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "আমি যে বস্ত্র এক্ষণে পরিধান করিতেছি তাহাতে গণিয়া দেখিলাম অসারের দিকে (Breadth wise) আন্দাজ ২০০০ সূতা আছে।" আবার বলিতেছেন "আমার কাপড়ের সূতা খুব মোটা" —কথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। চরকার কাটা সূতা এখনও চল্লিশ নম্বরে দাঁড়ায় নাই, তিনি নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার কাপড়ের সূতা মোটা, কিন্তু আমরা জানি Breadth wise এ ৪০ নম্বরের সূতা ২০০০ হাজার থাকে; খুব সম্ভব দেশী মিলের সূতায় প্রস্তুত কাপড় খরিদ করিয়া বসন্ত বাবু চরকায় কাটা সূতার কাপড় কিনিয়াছেন এইরূপ মনে করিয়াছেন; অথবা আজকাল বাজারে মোটা সূতায় কাপড় বুনিয়া তাঁতিরা কলিকাতার দোকানদারদের চরকার সূতার কাপড় বলিয়া বেচিয়া আসিতেছে, সেই কাপড় খরিদ করিয়া তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। *

বসন্ত বাবুর বস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। একদল লোকের যেমন বক্তৃতা করাই স্বভাব তদ্রূপ কয়েকজন লেখক প্রসিদ্ধ মাসিকগুলিতে যা তা লিখিয়া নাম জাহির করিতেছেন—দেশের লোক, এই সকল লেখা পড়িয়া মাথা ঘুলাইয়া মরিতেছে।

তিনি "প্রবর্ত্তকের" ভুল দেখাইতে গিয়া কাপড় খানির Breadth wiseএ দুই হাজার সূতা আছে গণিয়া, কাপড় খানি দশহাতি এইজন্য উহাতে দশ দিয়া গুণ করিয়া বলিতে চাহেন "প্রবর্ত্তকের" হিসাব ভুল, কেননা ২২০০০ হাজার গজ সূতা তো দশ হাত কাপড়ে থাকে না, থাকে বিশ হাজার হাত সূতা; কিন্তু অসারের দিকে দশ হাজার সূতা থাকিলে পড়েনে যে আর দশ হাজার থাকিবে বসন্ত বাবুর এ খেয়াল নাই, কাজেই তাঁর ভুল সংশোধন করিয়া বলিতে হয় তাঁহারই হিসাবে তাঁহার কাপড় খানিতে ৪০ হাজার হাত সূতা আছে, অতএব উহা ২০ হাজার গজ সূতার ন্যূন নহে। ৫ ঘণ্টা কাজ করিলে একখানি কাপড়ের সূতা কাটিতে ৭।৮ দিন লাগিতে পারে, কিন্তু আমাদের হিসাব ছিল ৪০ নম্বরের সূতার, ইহার অধিক মোটা সূতা কাটিলে পারিশ্রমিক কমিয়া যাইবে—৪০ নম্বরের সূতা যদি কাপড় পানায় ২৲ টাকা লাগে, ৮।১০ নম্বরের সূতায় তাহার ঢের অল্প দাম হইবে একথা বলাই বাহুল্য।

ভদ্র-মহিলাগণকে অধিক পরিশ্রম করিবার জন্য কেরানীগিরিতে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ আমরা দিই না। বসন্তবাবু যদি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তবেই তাঁর কথার মূল্য অবধারণ করিব, তাঁর লেখা পড়িয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে একেবারেই আনাড়ি বলিয়া আমাদের অনুমান হইয়াছে। যাহা তিনি জানেন না যে কার্য্যে তাঁর অভিজ্ঞতা নাই এ বিষয়ে আলোচনা না করাই তাঁর পক্ষে মঙ্গল এবং দেশও অনর্থক কতগুলি অসাধ্য বিষয়ে বৃথা উত্তেজনা পাইয়া অনর্থক সময় ও শক্তি যাহাতে নষ্ট না করে, তাহার দিকে প্রতি দেশপ্রেমিকের লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমরা মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত চরকা ও তাঁতের আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই ইহা লইয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছি; ব্যবসা হিসাবে চরকার সূতায় কাপড় করিতে হইলে এখনও উহা দুঃসাধ্য একথা নিশ্চয় জানিয়াছি। একখানা কাপড়ের টানা পোড়েনে যদি ২০ হাজার গজ সূতার প্রয়োজন হয়, তাঁতি একখানা কাপড়ের সূতা পাইলেই কিছু তাঁতে

* আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি চরকার সূতায় প্রস্তুত বলিয়া কলিকাতায় কতকগুলি বড় বড় দোকানে যে কাপড় বিক্রয় হইতেছিল তাহা মিলের মোটা সূতা হইতেই প্রস্তুত।

চড়াবে না অন্ততঃ চারি জোড়া কাপড়ের সূতা তাহাকে সরবরাহ করিতে হইবে; ১ লক্ষ ৮০ হাজার গজ সূতা না হইলে একখানি তাঁত চারিদিনও চলিবে না—চরকার সূতা দুই এক লুটি লইয়া হৈ চৈ করিলে চলিবে না, সখ অধিক দিন টিকে না, যাহাতে সত্য সত্য আমরা কার্য্য সিদ্ধি পাই তাহার দিকেই মনোযোগ দিতে হইবে।

পরিশেষে ভারতবর্ষের সরলা দেবীর চরকাকাটার আদর্শ চিত্র দেখিয়া ইহার সমস্তটাই যেন অভিনয় বলিয়া আমাদের বোধ হইল। স্বদেশী যুগ হইতে বিদুষী সরলা দেবীর নিকট হইতেও দেশ অনেক দানই পাইয়া আসিতেছে, ইহার জন্য আমরা তাঁর নিকট চিরদিন ঋণী থাকিব—কিন্তু তিনি যদি পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া সেফ্‌টীপিন বহুমূল্য বস্ত্রে বিদ্ধ করিয়া হোম্রীকাষ্ঠের চারু আসনে উপবেশন করিয়া চরকা কাটার আদর্শ দেখান, তাহা হইলে আমরা এই চরকা প্রচলন করিতে গিয়া আবার এক নূতন বিপদে পড়িব ইহার আর সন্দেহ নাই। বসন্তবাবু একদিকে বিলাস ব্যসনের নিন্দা করিয়াছেন আবার চিত্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে ভুল করেন নাই--হায়রে প্রহসন—এমন করিয়া দেশ কি জাগিবে।

চরকার সূতায় বর্ত্তমান ভারতের বস্ত্র সমস্যা সম্যক দূর না হইলেও আমরা ইহার পক্ষপাতী। পল্লীরমণীগণ সারাদিন অকাতরে পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ঘোল আনাই আমরা সহরবাসী লুটিয়া খাইতেছি। যাঁহারা তাস পিটিয়া নভেল পড়িয়া নানা বক্তৃতা লইয়া দিন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের দীর্ঘ অবসর ইহাতে নিযুক্ত হইলে আমরা উপকৃত হইব। ভারতে এই চরকার কাটা সূতায় মোটা কাপড় প্রস্তুত হইত, আসল কাটিয়া ঢাকার মসলিন বুনা হইত, আবার উদ্বৃত্ত সূতা বিদেশে রপ্তানি হইত, সুতরাং আজ হইতে ইহার অভ্যাস চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে আমাদের একটী নষ্ট শিল্পের উদ্ধার হইবে ইহা বড় কম গৌরবের কথা নয়, তবে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে—মানুষের বস্ত্র-শিল্পের অভাব যে পরিমাণে ছিল তাহার মাত্রা যে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাচ অধিকন্তু ন দোষায় হিসাবে চরকার প্রচলনে যাঁরা আজ উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে--চরকা আমরাও চালাইতেছি, বাহির হইতে চরকার টেকসই প্রচুর সূতা খরিদ করিবার জন্য আমরা সতত প্রস্তুত আছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি

বরিশাল—১৩২৭

শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্তের অভিভাষণ

বন্ধুগণ,

স্বাগতম্, স্বাগতম্। স্বাগতম্ বলিতে বলিতেই, অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ রাসবিহারী ঘোষ ও স্বদেশবৎসল জনবল্লভ সুবোধচন্দ্র মল্লিক, একনিষ্ঠ স্বদেশ ও সাহিত্যসেবক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, স্বজাতিবলবর্দ্ধক সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, সাহিত্যরথী

অকৃত্রিম স্বদেশসেবক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়গণের অভাবে বঙ্গমাতা কিরূপ পুত্রবিয়োগবিধুরা হইয়া পড়িয়াছেন তাহাই মনে হইল। তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের পুণ্যপদাঙ্ক ত আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আজ পঞ্চদশবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল, আবার বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইতেছে। সমাসীন সুহৃদগণকে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সশ্রদ্ধ সাদর সম্ভাষণ করিতেছি। এই জেলায় সম্পদশালী অধিবাসীর বড়ই অভাব, তাই আমরা আপনাদিগের যোগ্য অভ্যর্থনার কিছুই আয়োজন করিতে পারি নাই, আশা করি সে ত্রুটী ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে কৃপা করিবেন।

এবার ভুবনবিখ্যাত সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে আমাদিগের লক্ষ্য সাধন পথে অনেকদূর অগ্রসর হইব এই আশায় স্ফীত ও প্রফুল্ল হইতেছি।

এই সময়ে সেবারকার একদিকে, অত্যস্ত বাঙ্গ বাহাদুরের হাবেলীর দ্বারে anti circular society র যুবকগণের প্রতি পুলিশ নিগ্রহ, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এমারসন সাহেব কর্ত্তৃক দণ্ডবিধান, পুলিশের বড সাহেব কেম্প ও তদনুচরবর্গ সাধিত যজ্ঞভঙ্গ, অপরদিকে, প্রতিনিধিগণের অদম্য উৎসাহ, উক্ত সোসাইটীর যুবকগণের অদম্য তেজ, হাবেলীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে পাতিত লগুডাহত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার দুর্জ্জয় বন্দেমাতরম ধ্বনি এবং সেই অধিবেশনের পূর্ব্বের ও পরের একদিক, স্যার ব্যাম্‌ফাইল্ড ফুলার-বিহিত আমাদিগের লাঞ্ছনা, গুর্খাবিধ্বস্ত দোকান পসরা ও ক্ষতবিক্ষত হস্ত পদ মস্তক, বড়লাটের আদেশে সভানাশ ও বাক্‌নিগ্রহ, ক্রমান্বয় বহুদিনব্যাপী কারাবাস, নির্ব্বাসন ও অন্তরীণ বিধানের ঘটা, অপরদিকে, স্যার ফুলারের ব্যবহারে মর্ম্মাহত বরিশালের সেদিনকার ক্রয়বিক্রয়রাহিত্য, নির্জ্জন রাস্তাঘাট ও তদনুবর্ত্তী স্বদেশীদাঢ্য, সহানুভূতিপূর্ণ র‍্যাটক্লিফ, নেভিনসন, কেয়ার হার্ডি প্রভৃতি মহোদয়গণের বরিশালে শুভাগমন, পার্লিয়ামেণ্টে মহাপ্রাণ ম্যাকারনেস, কটন প্রভৃতি সভ্যগণের নির্ব্বাসিত ব্যক্তিবৃন্দের মুক্তি চেষ্টা—আজ মানসপটে এই সকল চিত্র উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত দেখিতেছি।

এই সুখ-দুঃখময়ী স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিতপ্রাণ বলিতেছে, আজ সেই হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনপ্রিয় সেবারকার সভাপতি আবদুল রসুল আমাদিগের বুকের কাছে নাই, সম্পাদক—যজ্ঞের প্রধান হোতা রজনীকান্ত দাস নাই, ধীর গম্ভীর নেতা দীনবন্ধু সেন নাই, স্বেচ্ছাসেবকদলাধিপতি সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র নাই, স্বদেশসেবায় পরমোৎসাহী বিরাজমোহন রায় নাই, বরবন্ধু সুপন্থাদর্শক কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ নাই, হিন্দুমুসলমানবিভেদজ্ঞানশূন্য স্বদেশসেবক নবাবজাদা মোতাহার হোসেন নাই, বঙ্গললাম বীর মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা নাই, দেশপ্রাণ সৎসাহসী জনাগ্রণী উপেন্দ্রনাথ সেন নাই, আর সেদিন স্বদেশমঙ্গলকল্পে প্রদীপ্তপাবক, সেবারকার অক্লান্ত সেবক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী আমাদিগের বুকশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

যাক, এখন ইহাদিগের দেহান্তধানজনিত দুঃখ দূরে রাখিয়া পুণ্যস্মৃতি অনুবলে প্রশ্ন এই, আমরা কি জন্য এস্থলে সমবেত হইয়াছি? উদ্দেশ্য কি? সকলেরই বোধ হয় উত্তর হইবে স্বরাজলাভের উপায় উদ্ভাবন ও তদনুযায়ী কার্য্য নির্দ্ধারণ, স্বরাজলাভ বলিতে কি বুঝি? বুঝি আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া। তাহারই অর্থ পরমুখাপেক্ষাত্যাগ ও স্বমহিমায় অবস্থিতি। যখন কেহ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারেন "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্ সর্ব্বমাত্মবশং সুখম" তখন তাঁহার পরবশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে অরুন্তুদ যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়। আমরা কি তাহা বুঝিয়াছি? কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি নতুবা বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে অমন বিরাট

আন্দোলন হইত না, যে আন্দোলনের ফলে অতুল প্রতাপশালী ভারতসম্রাটের বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইল। ভারতসচিব লর্ড মর্লি কতবার বলিলেন 'বঙ্গভঙ্গ অটল হইয়া রহিয়াছে', কিন্তু অটল টলিল। টলাতেই আন্দোলন মন্দীভূত হইল। কিন্তু যে বীজ উপ্ত হইয়াছে তাহা পিপীলিকার চেষ্টা নষ্ট করিতে পারে নাই। ঐ আন্দোলন ও তাহার ফল দেখিয়া অকাট্য ধারণা হইয়াছে যে আমরা যতদূর মরিয়াছি ইহার অধিক আর মরিবার সাধ্য নাই। একটা গল্প শুনিয়াছি :—কলিকাতায় পাঁচটি মাতাল কোন শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া মদ্যপান করিয়াছে। পাঁচটিই মত্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। তন্মধ্যে একটি অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অপর চারিটি তাহাকে ডাকিয়া ও নাড়িয়া যখন কোন সাড়াশব্দ পাইল না তখন ভাবিল তাহার দেহে প্রাণ নাই। সুতরাং সেই চারিজন তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া "বল হরি, হরি বোল" বলিতে বলিতে নিমতলার ঘাটের দিকে লইয়া চলিল। কিঞ্চিৎ দূরে গেলে সেই মৃতকল্প ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভারবাহী চারিজনের একজন বলিল "ওরে ও ত মরে নাই, পাশমোড়া দেয় যে"। তাহার সঙ্গী একজন উদাসীন ভাবে গম্ভীর স্বরে বলিল "ওরে চল্, কি হয়েছে ? এ মড়া এই অবধিই মরে, চল্"।

আমরাও ঐ হতচৈতন্য সুরাপায়ী ব্যক্তির ন্যায় শত বর্ষ মোহমদিরাপানে সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, এখন পাশমোড়া দিতেছি। মরিবার হইলে এতদিনে মরিতাম। অষ্ট্রেলিয়ার আদি নিবাসী, আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ান প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, আমরাও শেষ হইতাম কিন্তু ঋষিসেবিত ভক্তসেবিত দেশে বাস করিয়া যুগপরম্পরায় তাঁহাদিগের চরণরেণুর প্রসাদে আমরা আজও বাঁচিয়া আছি। ভারতের সেই সুদৃঢ়ভিত্তি সংস্থিত যুগাদি প্রবর্ত্তিত সভ্যতার বলে আজিও আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হই নাই। আমরা বিধাতা প্রবর্ত্তিত যে চক্রে ভ্রাম্যমান তাহার অধঃস্থিত বিন্দুতে কি তাহার অতি নিকটে পৌঁছিয়াছি বটে কিন্তু যখন মরি নাই তখন চক্রে আরোহণ করিলে যাহা হয় তাহা অর্থাৎ আমাদিগের গতি ঊর্দ্ধদিকে অবশ্যম্ভাবী ; আর যাঁহারা আমাদিগের শাসক তাঁহারা সর্ব্বোচ্চবিন্দু হয় ত পার হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদিগের গতি ——।

আমরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে যে একটি পাশমোড়া দিয়াছি তাহাতে সম্রাট অবধি চঞ্চল হইয়াছিলেন। সেই আন্দোলনে আমাদিগের এই জিলা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া ভারতসচিব লর্ড মর্লির কি উদ্বেগ হইয়াছিল তাঁহার প্রণীত Recollections এ ১৯০৬ সালের ১১ই মে তারিখের লর্ড মিণ্টোর নিকট লিখিত পত্রে তাহার আভাস পাই। তিনি লিখিয়াছেন :—"To speak quite frankly all depends on you and me keeping in step. I am convinced we shall, about frontier, army expenditure, Barisal and all else that may arise. Only you must consider my difficulties, as I assuredly consider yours" (সরলভাবে কহিতে গেলে কহিতে হয় যে, আপনার ও আমার সমপদবিক্ষেপের উপরে সমস্তই নির্ভর করে। অর্থাৎ আপনার আমার একমত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সীমান্তসমস্যা, সৈন্যব্যয়, বরিশাল এবং আর যাহা কিছু উত্থিত হয় তৎসম্বন্ধে আমরা ইহা পারিব, একমত হইয়া চলিতে পারিব। কেবল আমি যেমন আপনার কি কি মুস্কিল, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করি, আপনিও সেইরূপ আমার কি কি মুস্কিল আছে বিবেচনা করিবেন।) আমাদিগের শাসনকর্ত্তাগণ ভাবিয়াছিলেন যে আমরা মৃত, তাঁহারা আমাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দো-

গনে প্রথমবারের পাশমোড়া দেখিয়া বুঝিয়াছেন, আমরা মরি নাই। এবার মহাত্মা গান্ধির অঙ্গুলি-হেলনে দেখিতেছেন, দ্বিতীয়বারের পাশমোড়া।

প্রথমবারেই জাতীয় জাগৃতিবোধক, আত্মসম্মান-বোধ, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসংযমের পরিচয় পাইয়াছি। তখন জাতীয়ধারাবলম্বন, আত্মনির্ভর, পরমুখাপেক্ষা-হীনতা, নির্ভীকতা, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, শক্তি-বিকাশ, সংহননশক্তি, ব্যসনত্যাগ, অভিমানত্যাগ, সঙ্কীর্ণতাত্যাগ, বিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যত্যাগ এবং কষ্ম মাহাত্ম্যোপলব্ধির যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে।

জাতীয়ধারাবলম্বন, আত্মনির্ভর ও পরমুখাপেক্ষা-হীনতার প্রেরণায়ই জাতীয়বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা। যদিও জাতীয় বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ লোপ পাইয়াছে, তথাপি বঙ্গবাসীর তদভিমুখিনী মতির নিদর্শন এবার-কার আন্দোলনে বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। কলি কাতার জাতীয়শিক্ষাপরিষদস্থাপিত Technical Institute এর উন্নতি তাহাই প্রচার করিতেছে।

তখনকার বিদেশীদ্রব্যবর্জ্জনব্রতপ্রকোপ ও বন্দে-মাতরম্ কোলাহল শাসনকর্ত্তাদিগের সুনিদ্রার বিশিষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে এবং তাঁহাদিগের বিহিত দণ্ড মাতৃসেবকগণ নির্ভীকভাবে হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াছেন। মাতৃভূমিকল্যাণকল্পে কেহ কেহ পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও অকুতোভয়চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহা-দিগের শমনভয় ত্যাগের মহনীয় আদর্শ মাতৃসেবক-গণের হৃদয়ে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

যাহারা আপনাদিগকে উপায়হীন ভাবিয়াছিলেন একমুষ্টি অন্ন কি করিয়া অর্জ্জন করিবেন তাহা ভাবিয়া পন্থা পান নাই, সেই আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া তাঁহাদিগের অনেকে উদ্যম, অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভর প্রভাবে এখন লক্ষ্মীমন্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দু মুসলমান তন্তুবায় সম্প্রদায় একেবারে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদিগের সেই অভাব দূর হইয়াছে।

যে ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বে যে শক্তির পরিচয় পাই নাই, তাহারই মধ্যে সেই শক্তির সুন্দর বিকাশ দেখিয়াছি। আমাদিগের এই জিলায় 'জারি'গান গায়ক আদান বয়াতী যিনি রাজনীতি কাহাকে বলে তাহার "ক" অক্ষরও জানিতেন না, তিনি সরকার-প্রদত্ত উপাধির প্রতি আজ মহাত্মাজী যে বিরাগ দেখাইতেছেন, তাহা দেখাইয়া গাহিয়াছিলেন :—

"কেহ হবে খাঁ বাহাদুর,
কেহ হবে রায় বাহাদুর,
ভাই, তুমি কি হবে লাঙ্গলং বাহাদুর ?"

কর্ত্তাদিগের প্রতিজ্ঞাপালনে শিথিলতা লক্ষ্য করিয়া তদ্রূপ অজ্ঞ মফিজুদ্দিন বয়াতী গাহিলেন :—

"এ দেবো, তা দেবো ব'লে
অবশেষে ভুজঙ্গিনীর পা দেখায়।"

দেশবিশ্রুত শ্রীমান মুকুন্দ দাসের শক্তিবিকাশের পরিচয় আপনাদিগের অনেকেই পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। নানাবিধ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণেও অনেকের শক্তিবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ—
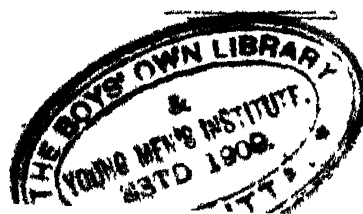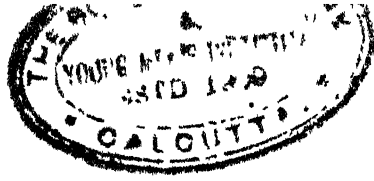
প্রবর্ত্তক

ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ চৈত্র, ১৩২৭ [সপ্তম সংখ্যা

মিলন সঙ্গীত

——•:০:•——

আর তো আমার সময় নেই সকল কথা বিনিয়ে বিনিয়ে গুছিয়ে বলি, মোটামুটি বুঝে নাও তোমায় করতে হবে কি ?

১৯১১ সালের আদমসুমারিতে লোক সংখ্যা ছিল ৩১, ৫১, ৫৬, ৩৯৬ জন, এবারের গণনায় দাঁড়িয়েছে ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ। হিসাবের খাতায় ৩৯ লক্ষের উপর লোক বেড়েছে, কিন্তু ১৯১১ সালে লোক বেড়েছিল ২ কোটি আট লক্ষ। এই দশ বৎসরে যা বেড়েছে তার যে সবাই ভারতের এমন কোন কথা নাই—অতএব দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় সে কথা অধিক ক'রে বুঝাতে হবে না।

য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ নরবলি হয়েছে, ভারতের তুলনায় সে দেশের লোক তবুও বেড়েছে, এই দশ বৎসরে ইংলণ্ডে শতকরা ১০·৯ জন লোক বেড়েছে, আর ভারতে ১·২৬ জন। আমরা কি নিশ্চিহ্ন হবার পথেই ধীরে ধীরে এগুচ্ছি না ?

যদি এই ভাবে আর অধিক দিন চলা যায়—হয়তো লোক গণনায় জমা খরচের হিসাব সমানই থাকবে—তবে ভারতবাসীর সংখ্যা হ্রাস হয়ে, চীনে, জাপানী, কাবুলী, প্রভৃতি ভিন্ন দেশের লোকে দেশ ভ'রে যাবে।

মরণ পথের যাত্রী আমরা, আমাদের ঘরে ঘরে বিসূচিকা, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও দারিদ্র্য নিত্য বিরাজমান—বাঁচতে হলে এই সব দুর্দ্দান্ত শত্রুর সঙ্গেই না আমাদের যুদ্ধ ক'রতে হবে ? কিন্তু তেমন প্রচুর প্রাণশক্তি কোথা ? দীর্ঘ দিনের পরাধীনতায় আমরা দারুণ অবসাদগ্রস্ত—মৃত্যু যেন জীবনের চেয়ে সুখের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পনের বছর আগে বাঙ্গালীর বাঁচ্‌বার চেষ্টা জেগে উঠেছিল, সে প্রেরণা এখনও অক্ষুণ্ণ; কিন্তু ইন্ধনের মাত্রা বছর বছর বৃদ্ধি ক'রে তুল্‌লেও নৈরাশ্যের মাত্রা এত অধিক, কোন গতিকে ইচ্ছাটুকুকে বুকে নিয়ে বেঁচে থাকাই এখন শ্রেয়ঃ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁচিবার পথ যে আমরা এই পনের বছরে বিশেষ প্রশস্ত করে তুলতে পেরেছি এমন তো বোধ হয় না, কিন্তু এইবার ভাব ছেড়ে বাঙ্গালী কাজের মানুষ হবার তপস্যা

আরম্ভ করেছে, আশার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে —দেখা যাক্ কি হয়।

কাজ করতে গেলে—যে-সব উপাদান দিয়ে চরিত্রটীকে গড়ে তুলতে হয়, তার সন্ধান আমাদের সর্ব্বাগ্রে করতে হবে। কাজ করতে হবে বলে যে সব তরুণ, ঘরের কোণ ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছে, নীড়হারা পাখীর মত ঝড়ো হাওয়ায় আকাশের কোলে তারা কেবল উড়েই বেড়াচ্ছে, দোষ তাদের নয় — দেশের ভাগ্য! বাঁচবার পথে দাঁড়াবার স্থানটুকু যে আমাদের ঘুচে গেছে, মরণের টান ছাড়িয়ে এক পা আমাদের এগুবার উপায় নেই—তাই দেখি উত্তেজনার স্রোতে পালটা খেয়ে যারা কর্ম্মনদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, ঝাপটা খেয়ে পুনঃ পতনই তাঁদের পরিণাম হচ্ছে—ইচ্ছা থাকলে, ত্যাগ থাকলে, উৎসাহ থাক্‌লে কি হবে, বাহিরের ঝঞ্ঝাবর্ত্ত এত প্রবল, মানুষের সামর্থ্য সেথায় থৈ পায় না।

তবে কি আমাদের মরতেই হবে? আমরা বলি না। বাঁচবার ইচ্ছাকে মর্ত্ত করে' তুলে ধরতে যারা জীবন পণ করে' এই পনের বৎসর কঠোর তপস্যা করে এসেছে, যারা নির্ব্বাসনে কারাগারে—রাজবিধির কঠোর শাসনে নিজদিগকে নিঃস্ব বিপন্ন বিধ্বস্ত করেও, আজ পতিত দেশের উদ্ধারমানসে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে—তাদের দান এখনও ফুরিয়ে যায় নি। তাদের অস্থি মজ্জা, শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ, শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রতি স্পন্দনটী পর্য্যন্ত মাতৃ-প্রেমের অমর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ, ভগবান তাদের নির্ম্মাণ করেছেন—জননী জন্মভূমির জন্য জীবন-বেদীতে যে হোমানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, প্রকৃতি স্বয়ং তার ইন্ধনদাত্রী ; এ বহ্নি নির্ব্বাপিত হবার নয়।

দেশের জাগ্রত সন্তান যারা, তারা হয়তো একদিন তমোময় জীবনের মসী-আবরণ উন্মুক্ত করবার জন্য অলস-জড় দেশের বুকে বিপ্লবের ধ্বনি জেলে দিয়েছিল, আত্মরক্ষায় সক্ষম দেশবাসীর চৈতন্যসঞ্চার মানসে ঘরে ঘরে লুণ্ঠনের প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, স্বদেশদ্রোহিতা পাপ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য আত্মজনের হৃদপিণ্ড উৎপাটন করে ছিন্নমস্তার মত নিজ রুধিরে নিজেই অভিষিক্ত হয়েছিল—কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল কি পাপ, হিংসা, না অত্যাচারের সৃষ্টি করা? কে কোথায় ব্যভিচার করে, ব্যভিচার উদ্দেশ্য নিয়ে? হত্যা করে হত্যাকে লক্ষ্য করে? পাপ কোন্ কালে জীবনের আদর্শ হয়েছে?

সাফল্য, পূর্ণতা, সিদ্ধি ইহাই না জীবনের লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্যের সন্ধানেই না সহস্রবার পদস্খলন? স্বভাবের গতি বাঙ্গালা রোধ করে নাই—বহ্নিদীপ্ত স্বর্ণের মত বাঙ্গালী তাই আজ এত উজ্জ্বল, এত গৌরবময়।

আজ এই বাঙ্গালীর কণ্ঠেই আবার মেঘমন্দ্রে নূতন মন্ত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে—মত্ত মাতঙ্গের বল নিয়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ই আবার সহস্র অত্যাচারের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, এইবার জয় তাকে পেতেই হবে—বিশ্বের দরবারে বল বীর্য্য গৌরবের জয়ধ্বজা তাকে উড়িয়ে মায়ের স্নিগ্ধ অঞ্চল তলে এসে দাঁড়াতেই হবে—সহস্র সহস্র বাঙ্গালী তার জন্য উদ্যতবজ্র হাতে করে' পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, জর্ম্মণীর ভার্দ্দন জয়ের সংগ্রাম অপেক্ষা এই সংগ্রাম ভীষণ ঘোরতর, ইহার উদ্যোগপর্ব্ব বিপুল বিরাট—বাঙ্গালী উদ্বুদ্ধ হও, জাগ্রত হও, জয় এবার অবশ্যম্ভাবী।

ভারত আজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রাজার বিরুদ্ধে নয়, আত্মকৃত বন্ধনের মহাপাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য, আজ তার প্রায়শ্চিত্তের দিন। এই মহাযজ্ঞে কোন্ বাঙ্গালী না যোগ দিবে—এই ধর্ম্মযুদ্ধে আত্ম-বলির জন্য কার প্রাণ না ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াবে —দীর্ঘ কতদিনের বন্ধনগ্রন্থি ছিন্ন করবার এই

মহা প্রেরণায় ভারত আজ বড় আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, বিধাতার বর আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠুক—বাঙ্গালীর আত্মদান সার্থক হোক্।

সাড়ে চারকোটী বাঙ্গালীর কাছ থেকে এই মহা সংগ্রামের জন্য—ধর্ম্মযুদ্ধের প্রধান পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী চেয়েছেন পনের লক্ষ টাকা, পনের লক্ষ লোক আর পনের লক্ষ চরকা, বাঙ্গালী প্রাণপণে তা পূরণ করবে বাঙ্গালীর সম্মানরক্ষার জন্য। বাংলার নেতৃবৃন্দ অকাতরে পরিশ্রম করছেন—হয়ত উপকরণ সংগ্রহ অসম্ভব হবে না।

কিন্তু কোন প্রাণ নিয়ে, কোন মন নিয়ে, কোন বুদ্ধি নিয়ে—বাঙ্গালী, আজ তুমি রণযাত্রা ক'রছ, একবার তা ভাল করে' বুঝে নাও, অর্থ, মানুষ আর চরকা এই তিন সামগ্রী যুদ্ধজয়ের সহায় হলেও উহা একান্তই বাহিরের এবং গৌণ সহায়, অন্তরের বলই এ যুদ্ধের মূলশক্তি—মূল উপকরণ। সে অন্তরের বল আমাদের কৈ? সে মহিয়সী শক্তির বিদ্যুৎ বিকাশ সাড়ে চারকোটি বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব মিলন আমরা যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—জানি একদিনে উহা সম্ভব নয়, কিন্তু যে মন্ত্রে এই অঘটন সম্ভব হবে, সে দিব্য ঋকের একটী শব্দও যে তোমাদের কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে না? আমরা শঙ্কিত চিত্তে তাই দূরে দূরে তোমাদের অনুসরণ ক'রে চ'লেছি, জাতির এই মহাসঙ্কট যাত্রায় নীরব উদাসীন থাকাও যে মহাপাপ। আমাদের মর্ম্মন্তুদ নিবেদন একবার কর্ণগোচর কর, আমাদেরও সঙ্গে নাও।

পরাৎপর পুরুষের যে আহ্বান তোমাদের হৃদয়-তন্ত্রে মধুর মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে, উহা বড় উদার বড় মহান, উহা অনন্তের গান বৃহত্তের মন্ত্র। এই যে আজ ভারতের দুইটী প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মিলন চিত্র, ইহা ভবিষ্যতের বিপুলসৃষ্টির ক্ষীণ আভাস মাত্র—এ মিলন বাহিরের; অন্তরাত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধনে যদি ইহা সম্ভব ক'রে তুলতে পার—তবে সারা পৃথিবীর ধর্ম্মক্ষেত্র মহাতীর্থরূপে ভারতবর্ষ চিরদিন মানুষমাত্রেরই পূজা পাবে। এই মহাধর্ম্ম সমন্বয়ের পুণ্য প্রভাতে বাঙ্গালী তোমায় আমরা অগ্রদূতরূপেই দেখ্‌তে চাই।

নিজেকে অতিক্রম না ক'রলে—অন্তরাত্মাকে চিনবে না জানবে না, দেশের মমতা ত্যাগ না ক'রতে পারলে দেশাত্মার অমর শক্তি প্রত্যক্ষ হবে না আজ হিন্দুকে হিন্দুত্ব ছাড়তে হবে, মুসলমানকে মুসলমানত্ব ছাড়তে হবে—মানবত্বের বিজয় সঙ্গীত গাইতে হলে নিজেদের যে পরমহংস ক'রে তুলতে হয়। বাড়ীর বাঁধনও বাঁধন, দেশের সীমায় নিজেকে ধরে' রাখাও তেমনি বন্ধনের নিদর্শন, বড় শক্ত দিন, বড় পরীক্ষার দিন, ভগবান হিন্দু নন্ মুসলমান নন্—ভারতের ভাগ্যে আজ একাকারের সূচনা দেখে আমরা কেবল করতালি দিয়ে তাঁর মহিমা গানই গাচ্ছি, আর ব'লছি আর কেন ভগবান! যুগযুগান্তরের ভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে দাও, এই দুর্ভেদ্য দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেওয়ার পথেই যে আমরা যাত্রা ক'রেছি।

ভারতের রাষ্ট্রনীতি আজ এই মহাধর্ম্ম সমন্বয়ের উদাত্ত সঙ্গীতে পরিণত হোক, রাষ্ট্র আন্দোলন—খর-প্রবাহী শুদ্ধ ধর্ম্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক, ভারতের জাতীয় মহাসভায় রাষ্ট্রের ছদ্মবেশ অপসারিত হয়ে কোটি সূর্য্যপ্রভ জাতির সত্যরূপ প্রকাশ হয়ে উঠুক—ভারতের এক সহস্র লোক যদি লক্ষ জন্মের স্বভাব সংস্কার পরিত্যাগ করে' ঐক্যতান বাদন করে, মুগ্ধ জগৎ অবনত মস্তকে—সেই বিরাট সৌম্য শান্ত ধর্ম্মের বিজয় পতাকার তলে এসে দাঁড়াবে। তখনই মানবকণ্ঠে মহাঐক্যের মধুর-সঙ্গীত সত্য হ'য়ে উঠবে।

ভারতের দৈন্য, ভারতের মহামারী, ভারতের অবনত চরিত্র নিরসনের একমাত্র উপায় সাধনা, তপস্যা,

আত্মসমর্পণ। হিন্দু মুসলমানের মিলন যত সত্য হয়ে উঠবে, বন্ধন শৃঙ্খল ততই শিথিল হয়ে আসবে; সে মিলন বাহিরের দিক্ দিয়ে আসবে না—নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের দাঁড়ি বেঁধে ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন কেবল অভিনয় - জাতি ধর্ম্ম স্বভাব সংস্কার সব উৎসর্গ কর, মিলনের সত্যরূপ দেখ্‌তে পাবে।

জাতীয়তা

জাতিকে অতিক্রম না করিলে সত্য জাতীয়তাটী কোন দিনই ফুটিয়া উঠিবে না।

জাতির ভিতরে বিশ্বদর্শন ইহাই জাতীয়তার সত্য স্বরূপ।

* * *

ভারতবর্ষ বলিলে কোন সত্য একটী জিনিষ বুঝায় না।

ভারতবর্ষ বলিলে বুঝায় আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা।

ভারতবর্ষ বলিলে আমাদের অজ্ঞানতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে—আমরা ভারতের সত্য স্বরূপটী বুঝি নাই।

ভারতবর্ষ বলিয়া, কি অন্তর্জগতে কি বহির্জগতে কোন কিছু নাই।

বিশ্বে আছে কেবল বিশ্ব।

বিশ্বে কেবল আছে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিশ্ব—তার একটীর নাম ভারতবর্ষ।

* * *

খণ্ড মানুষ বা ব্যষ্টি বলিয়া জগতে কিছু নাই—আছে কেবল বিশিষ্ট বিশিষ্ট :একই পূর্ণ ব্রহ্ম বা
।

সকল ব্যষ্টির মধ্যে পূর্ণ ভগবান বিরাজিত। সান্ত আমরা যাহাকে বলি তাহাই—অনন্ত। আমরা কেবল অজ্ঞানতা দিয়া জগৎছাড়া জাতি, ভারত ও ব্যষ্টির সৃষ্টি করিয়াছি।

* * *

ভারত স্বাধীন হইতে চাহে—ইহাতে ভারত সত্য কি চাহে—তাহা বলা হয় না।

ভারতকে স্বাধীন করিতে প্রয়াস কখনও ভাগবত ঈষণা নহে।

জগত ভারতের মধ্য দিয়া বিশিষ্টভাবে মুক্তি-প্রয়াসী ইহাই বার্ত্তা।

জগৎকে স্বাধীন করিতে প্রয়াসী হইলেই ভারতের স্বাধীনতাপ্রয়াস সার্থক।

জগৎকে মুক্ত করিতে হইবে নবভাবে—তাহার অহংএর গণ্ডী হইতে, তাহার অজ্ঞানতা হইতে তাহার সত্য স্বরূপটাকে উদ্ধার করিতে হইবে—ইহাই ভাগবত ইচ্ছা; তাহার জন্য আমাদের সাধনা ও তাহার প্রকাশের রূপই আমাদের কর্ম্ম।

* * *

ভারতের স্বাধীনতাপ্রয়াসী কখনই ভারতকে স্বাধীন করিতে পারিবে না। অথবা সে স্বাধীনতার নামে পরাধীনতাকেই প্রাপ্ত হইবে।

* * *

আত্মমুক্তি বলিয়া স্বাতন্ত্র্যমূলক মুক্তি, কোন সাধনা দ্বারাই সম্ভব নহে। স্বাতন্ত্র্যীভূত জাতির স্বাধীনতা প্রচেষ্টা মানুষকে আরও পরাধীনই করিতে পারে। সারা বিশ্বে মুক্তি সিদ্ধি ও ভুক্তি না আসিলে কোন ব্যক্তিই ঐ স্বরূপ গুলি পাইতে পারেন না। প্রতি ব্যক্তিই বিশ্বের একটী ক্ষুদ্র ও বিশিষ্ট স্বরূপ।

পৃথিবীতে এত সাধনা করিয়া কোন ব্যক্তিই এ পর্য্যন্ত মুক্তি পান নাই।

পৃথিবীতে এত প্রচেষ্টা করিয়া কোন জাতিই এখনও স্বাধীনতা পায় নাই।

চেষ্টা করিয়া অনেক ব্যক্তি হয়ত লয় বা নির্ব্বাণ পাইয়াছেন।

অনেক জাতিও পৃথিবীতে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে।

ব্যক্তিগত ভাবে শত সাধনায় ব্যর্থ হইয়া আজ-ব্যষ্টি সমষ্টিগত সাধনা গ্রহণ করিয়াছে। জাতিগত ভাবে শত সাধনায় বন্ধনকেই প্রাপ্ত হইয়া জাতি আজ বিশ্বসাধনায় উদ্বুদ্ধ।

* * *

জগৎ তাহার সকল সৃজনের ব্যর্থতায় মর্ম্মাহত। সকল সমাজ, সকল রাষ্ট্রতন্ত্র, সকল অর্থনীতি, সকল ধর্ম্ম আজ ব্যর্থ।

জগৎ আজ চাহে সকল সমাজ, সকল ধর্ম্ম, সকল তন্ত্র-নীতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষটীকে পুনরুদ্ধার করিতে।

* * *

হোমানল প্রজ্জ্বলিত হউক।

অতীত তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করিবে।

দেবগণ ধ্যান নিমীলিত নেত্র হউন।

স্রষ্টা ক্ষান্ত হউন।

এখনও পূর্ণ সত্য জানা হয় নাই!

* * *

হোমানল আবার জ্বলিয়া উঠুক।

মানবকে উদ্ধার করিতে হইবে

মানবের অন্তরের সত্যটীকে আর একবার জ্ঞান-গোচর করিতে হইবে।

ইন্দ্র আমাদিগকে সত্য পথটী দেখাইয়া দ'ও।

তুমি আমাদের মিত্র।

* * *

হোমানল আবার জ্বলিয়া উঠুক।

মানবের সত্য স্বরূপটী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

আত্মাকে জগতের মধ্যে আনিয়া বসাইতে হইবে।

ইহাই অমৃতত্ব।

যজ্ঞশেষে আমরা পাইব সত্য মানুষটীকে।

সত্য মানুষটী গড়িয়া লইবে তাহার সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও নীতি।

হে দেবাসুর, আজ উভয়কে এই জগৎ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত ভোগী হইতে হইবে।

জগৎ চলিয়াছে মানুষটীর উদ্ধার করিতে।

রুষ, জাপান, আয়রলণ্ড, ভারত, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী ইংলণ্ড, আমেরিকা, পারস্য, তাতার, আফ্রিকা সকলেই ব্যাপক বা নিভৃত ভাবে চলিয়াছে মানুষটীকে বাঁচাইতে।

মানুষ যদি বাঁচে ত সব হইবে।

সমাজবিশেষ নহে—অনেক সমাজ করিয়া প্রকৃতিদেবী ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছে।

ধর্ম্ম বিশেষ নহে—ধর্ম্ম বিশেষ জগৎকে অমৃতত্ব দিতে পারে নাই।

তন্ত্র বা নীতিবিশেষ নহে—তাহারা রক্ষা না করিয়া আমাদিগকে ভক্ষণই করিতেছে।

মানুষকে উদ্ধার কর— সমাজ, ধর্ম্ম, জাতি,

তন্ত্র, নীতি নির্ব্বিশেষে। নব নব জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম আপনি নির্ম্মিত হইবে।

মানব আপনার সকল ঐশ্বর্য্য লইয়াই উঠিবে।

*　　*　　*

বিশ্বশক্তি, বিশ্বধারা, বিশ্বধর্ম্ম নির্দ্দেশ আজ বিশ্বেরই দিকে।

বিশ্ব, পাইতে বিশ্বরূপ, বিশিষ্ট জাতি নিবেদ হইতে ভিক্ষা করিতেছে।

ভবিষ্যের জাতি উঠিবে একেবারেই বিশ্বশক্তিতে এবং বিশ্বেরই জন্য।

বিশ্বমানবাত্মা তাহার জীবন সত্যটী ধরাইয়া দিতে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার জীবন-সমস্যাগুলির মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য ভারতের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া আছে।

ভারত বিশ্বমানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি, ভুক্তি, ও সিদ্ধির জন্যই তপস্যা করিবে।

সাধনার ত্রিধারা

—ঃ০ঃ—

আর কি তোমার ভাল দেখায়, গণ্ডীর পর গণ্ডী কেটে নিজের পানে চেয়ে বসে থাকা। ঐ দেখ, দলে দলে তীর্থযাত্রী, সব ছেড়ে পথে বেরিয়েছে—মুখে তাদের স্বর্গের আলো, বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে গান গেয়ে ছুটেছে, এবার আর স্বপ্ন নয়, ভাব নয়, কল্পনা নয়, দেশের ভগবান জেগেছেন, তাঁর বাঁশী বেজেছে—আপন হারিয়ে উঠে পড়, জীবনের পথে ছুটে চল।

শুধু যদি তুমি তোমার হ'তে, নিজেকে ঘিরে চিরদিন বসে থাকা তোমার শোভা পেতো, কিন্তু তা ত নয়, এ ঘর একা করা চলে না, আর সবাই কিছু তোমার সুখের জন্তই এ সংসারে আসে নি; তোমাকে ছাড়িয়ে, কুড়িয়ে, বিলিয়ে এই নূতন গোষ্ঠী সার্থক করে' তোল।

তোমার বেঁচে থাকার নিয়ম—বড় ক্ষুদ্র, বড় সঙ্কীর্ণ; সবায়ের বেঁচে থাকার ভঙ্গীর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল, সবায়ের বাঁচার সঙ্গে তোমার বাঁচা অসম্ভব হবে না।

যখন ডাক এসেছে তখন তোমায় সাড়া দিতে হবে, জগৎ-জোড়া বানের ঢেউয়ে তোমায় ভাস্‌তে হবে, আর একা থাকা চলবে না, নিজের বলে কিছু রেখে দেওয়া হবে না, তোমায় নিঃস্ব হতে হবে, ভিখারী সাজ্‌তে হবে, নিজের জীবন পরের তরে অনুভব করতে হবে, এতো মরণের পথ নয়, আত্মবিস্মৃতির পথ, আপনাকে সঙ্কীর্ণতা থেকে টেনে এনে বৃহৎ হবার পথ, ব্যথা সে ভগবানের হাতুড়ির আঘাত—তোমায় চূর্ণ করতে নয়, তোমার অনন্ত বৃহৎ সত্তার উদ্বোধনের জন্য নিজেকে প্রসারিত কর, অসীম হও; অনন্ত পথের যাত্রী—তোমায় যে অমর হতে হবে।

উপায়—আত্মসংযম। নিজেকে গুটিয়ে বিষয়-বিবর্জ্জিত নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা বল্‌ছি না। নিজের অন্তর বাহিরের প্রসারতার মধ্যে আছে যে সবখানিকে ব্যাপ্ত করে' আত্মচৈতন্য—উহাই সংহত সংযত করে' ভাগবতমুখী করে' তোল। চিন্তার অজস্রধারা হৃদয়ের অসংখ্য তরঙ্গ জীবনের অনন্ত প্রবাহ একমুখী কর;

এই আত্মসংযমের চরমফল নিজের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আত্মবোধকে গুছিয়ে একত্রিত করা, তারপর উৎসর্গের পূত হোমানলে আত্মশুদ্ধি—পরিশেষে আত্মসমর্পণ—অনন্তের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া—মানবজীবনের চরম সার্থকতা এইখানে।

চিন্তার কেন্দ্র নিরূপণ হয় ধ্যানে। হৃদয়মর্ম্ম সংঘের মধ্যেই অনুভূত হয়; জীবনে অমর বীর্য্যের সন্ধান পেতে হয় কর্ম্মযোগে।

কোন নিয়মের মধ্যে অভ্যাসের অধীনে সাধনা আরম্ভ করে' দিলে, উন্নতি হয় বড় ধীরে এবং আপনাকে নিংড়ে নিষ্পেষিত করে' বিনিয়ে বিনিয়ে চলাই হয় জীবনের গতি; নিজেকে প্রস্তুত করে' তোলার ইহা এক প্রকার উপায় হলেও জীবনের সারল্য মাধুর্য্য ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়; প্রাকৃতিক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, কৃচ্ছ্রমূলক প্রচেষ্টাই হয় সাধনার অঙ্গ, প্রকৃতি বিরোধী কাজেই জীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে—জ্ঞান, প্রেম, শক্তির অবাধলীলা জীবনে লীলায়িত হয়ে উঠে না।

তপস্যা ব্যর্থ হয় না—কিন্তু পূর্ণযোগের পথ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়, ভগবানকে সবখানি দিয়ে নিশ্চেষ্ট হওয়াই ইহার মূলমন্ত্র। বাসনা এবং চেষ্টা আমরা যত পরিত্যাগ করতে পারবো যোগের খেলা ততই মূর্ত্ত হয়ে উঠ্বে।

ধ্যানে চিন্তার তরঙ্গলীলা স্তব্ধ করে' তুরীয়ের অজস্র কিরণে অবগাহন কর। চিন্তাশূন্য অবস্থার মধ্যেই উর্দ্ধের জ্ঞান আধারে অবতরণ করে—আমরা দুই উপায়ে ইহা সিদ্ধ করিতে পারি।

প্রথম স্থির হয়ে বসে, অথবা সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্বাবস্থায় যদি সম্ভব হয়—নৃত্যচঞ্চল চিন্তাকে স্তব্ধ করে' ফেল, কোন চিন্তাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে দীর্ঘ হতে দিও না; যত চিন্তা কর তত কাজ হয় না, উহা কেবল সংস্কারের ঢেউ—এই ঢেউয়ের আবিল উচ্ছ্বাস যতই কমে আস্বে, বুদ্ধি উপরের আলোয় ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠ্বে। অন্য উপায় হচ্ছে—চিন্তার উচ্ছেদ না করে' প্রতি চিন্তাটি ভগবানের স্বরূপ জ্ঞানে তাকে খেলতে দেওয়া, জীবনের শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদয়ের স্পন্দনটিও যেমন ভগবানেরই সাড়া বলে নিতে হবে তদ্রূপ চিন্তার কোনটিই পরিত্যাজ্য নয়, সবই ভগবান; চিন্তা, চিন্তার বিষয়, চিন্তাশক্তি বুদ্ধি পর্য্যন্ত ভগবানে ভরিয়ে ফেল, ধূর্জ্জটীর মত অটল পদে জটাতরঙ্গ এলিয়ে দিয়ে অজস্র ধারা মাথা পেতে গ্রহণ কর, দেখ্বে সেই একই বহুর বিচিত্ররূপে লীলাখেলা কচ্ছেন; বহুর মধ্যে এক, এবং একের মধ্যে বহুকে দেখ্তে দেখ্তে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সেই পরম পদার্থে সংযুক্ত হয়ে যাবে, জ্ঞানের বিমল আলোকে তোমার ললাট তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্বে—কালিমাখা আঁধার আকাশে বিদ্যুল্লেখার মত চিন্তার হিজিবিজি তখন স্পষ্ট সূর্য্যকিরণে সত্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে, ইহাই বুদ্ধির শুদ্ধি—ইহাই জ্ঞানপ্রকাশ।

সংঘজীবনেই অহং দূর হয়ে হৃদয়-দেবতা বহুর মধ্যে নিজের অবস্থিতি অনুভব করেন। আমি যদি আমার হতুম তবে সংঘ গঠনের প্রয়োজন ছিল না, প্রকৃতি স্বয়ং মানুষকে ধীরে ধীরে বৃহত্তর জীবনে পরিণত করে' তোল্বার জন্য সমাজসৃষ্টি বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলে ঘোষণা করেছেন।

সমাজ কোন এক ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয়, সমাজ-নিয়মের বশবর্ত্তী হ'তে গিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, তাই সেখানে বিপ্লব; ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব চ'লেছে। সমাজ মানুষকে জানাতে চায়, তার জীবন, তার সব কিছু সমাজের জন্য; সমাজ-আত্মারই প্রতিনিধি সে, কিন্তু মানুষ তার ক্ষুদ্রতা নিয়ে বলতে চায়, সমাজ তুমি উদার হও, বৃহৎ হও, যেখানে আমার স্বতন্ত্র লীলাবিলাস অবাধে সার্থক হতে পারে; কিন্তু সমাজ গ'ড়ে উঠেছে—মানুষকে একান্ত ছোট কোরে রাখ্বার জন্য নয়, সমাজ-আত্মার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে মানুষ

কেবল তার নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য, দেশের জন্য দশের জন্য, জাতির জন্য। কিন্তু অহঙ্কার থাকতে বর্ত্তমান সমাজ মানুষকে ভেঙ্গে নিজের কুক্ষিগত করতে পারবে না; তা ছাড়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও একটা সত্য আছে, সে সত্য অস্বীকার করে' চলা ভগবানেরই অপমান করা, কেননা তিনিই তো ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে অবস্থান করে' আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন; সত্য সত্যই এমন সমাজ গ'ড়ে উঠুক যেখানে ব্যক্তির স্বচ্ছপ্রকাশ সার্থক হতে পারে, সে সমাজ—সমষ্টি মানবজীবনের বৃহৎ স্বার্থ সংরক্ষণের হেতু গড়ে' উঠবে না, মানুষ যেমন বিরোধ সৃষ্টি করে, তার ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষা করবার জন্য আমাদের সমাজও তদ্রূপ বহুব স্বার্থ পুঞ্জীভূত করে' এক বিরাট অহং গড়ে' তুলেছে। আমাদের ব্যষ্টিকেও যেমন আপনাকে ছেড়ে ছেড়ে বৃহৎ হয়ে উঠতে হবে, বর্ত্তমান সমাজও যদি যুগোপযোগী নিজের গণ্ডী প্রসারিত করে না ধরে' তবে তার ধ্বংস অনিবার্য্য।

আমরা সঙ্ঘ গড়ে' তুলতে চাই—স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে নয়, ভগবানকে ঘিরে বেষ্টন করে—ভাগবত প্রেমের অমর বন্ধনী দিয়ে। আমাদের সঙ্ঘসৃষ্টি অন্তর সাধনার প্রতীকস্বরূপ। সঙ্ঘের আচার আচরণ, সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, পৃথক পৃথক ভাবে অনুভব না করে', একটী অখণ্ড আত্মার মত যুগপৎ সমষ্টির অনুভূতিই ইহার চরম নিদর্শন। আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করেই যে ইহা সম্ভব করে' তুলতে হবে এরূপ নয়, একটী অপ্রমত্ত যোগীর চিন্তা ভাব কর্ম্ম যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ, তদ্রূপ এই বহুর সম্মিলনে একটী অখণ্ড সত্তার উদ্বোধন সম্ভব করে' তুলতে পারলে কার্য্য আমাদের সুসিদ্ধ হবে;—ইহা কি সম্ভব? কিন্তু নিরুপায়—সংগ্রাম তো ইহারই জন্য, লক্ষ্য যদি স্থির থাকে মানুষ এই সুমহান্ ধর্ম্মযুদ্ধ থেকে কখন বিমুখ হবে না।

তারপর কর্ম্মের কথা। আমরা কর্ম্ম করি সেও তো স্বার্থের দায়ে। সে ব্যক্তিগত জীবনের জন্যই হোক, পরিবার মণ্ডলীর ভরণপোষণ অথবা সমাজ ধর্ম্ম দেশের জন্যই হোক। মানুষ পৃথিবীর চাপে আপনাকে যতখানি ছড়াতে পেরেছে তার কর্ম্মের পরিধি ততই বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে—আপনাকে ছড়াতে ছড়াতে মানুষ বৃহৎ হয়ে উঠে, কিন্তু মুক্তি পায় তখনই যখন সে অসীমের উৎস জীবনে আবিষ্কার করে' ফেলে। জীবনের কর্ম্ম প্রবাহ—সে তো দেশের জন্য নয় জাতির জন্য নয় উহা ভগবানেরই জন্য। দেশ জাতি সব ভগবানেই বিধৃত—কর্ম্ম আমাদের ভগবান, ফল ভগবান, কর্ত্তাও ভগবান। কর্ম্মের মধ্যে এই অনুভূতি যেদিন জাগ্রত হয়ে উঠে তখনই আমরা জীবনে অমৃতের সন্ধান পাই—তখনই বুঝতে পারি জীবন আমাদের অসার নয়, তুচ্ছ নয়, দুর্ব্বল নয়, পঙ্গু নয়, জীবন ভগবানের প্রতীক—অনন্তের প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র।

ভারতের নরনারী আজ এই মহাসাধনার সিদ্ধমন্ত্র কর্ণগোচর করেছে, জীবন তাদের দুলেছে নেচেছে বাহিরের ঝড়ো হাওয়ায় নয়, অন্তরের ঠাকুর নেড়ে উঠেছেন। ভারতের স্রোত এবার কোথায় গিয়ে পৌছবে তা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; মানুষ তুমি এবার বেরিয়ে এস, ঘরের কোণে আঁধার দেখে ভয় পেয়ো না, একবার আকাশ পানে চাও, সোণার উষা স্বর্ণিম্ আলোয় জগৎ ছেয়ে দিয়েছে, ঋজু পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; ধ্বজা নিয়ে সারি দিয়ে পথে এসে দাঁড়াও, এবারের অভিযান জয়ের নিশান কাঁধে নিয়ে ফিরবে—ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয়ের দিন সমাগত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি

বরিশাল—১৩২৭

শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্তের অভিভাষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
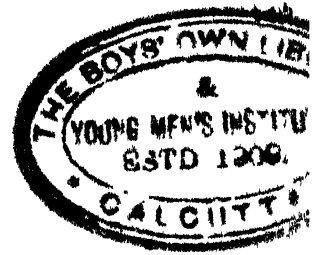
মিলনশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আজ যে ধর্ম্মঘটের এত বৃদ্ধি তখন তাহার সূচনা দেখিয়াছি। এই নগরেই সেটেলমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া তাঁহাদিগের উপরিস্থ কর্ত্তাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয় না জন্মিলে ধর্ম্মঘট হয় না এবং মিলনশক্তির প্রাবল্য ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না। মিলনশক্তির বলেই স্বদেশীব্রত অত বলসঞ্চয় করিয়াছিল এবং বিদেশীপণ্য প্রভূত পরিমাণে বর্জ্জিত হইয়াছিল। এক বৎসরে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী প্রায় তিনকোটী টাকার কমিয়া গিয়াছিল। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় গ্রামে গ্রামে কেহ কোনও বিদেশী দ্রব্য উপস্থিত করিতে সাহস পান নাই। বিদেশী দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয় না দেখিয়া বরিশালে তাৎকালীন মেজিষ্ট্রেট সাহেব স্বদেশী ও বিদেশী উভয় প্রকারের দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি বাজার স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়া নহবতমন্দির অবধি নির্ম্মাণ করাইলেন। ঘোষণা দিলেন অমুক তারিখে বাজার খোলা হইবে, সে দিন ক্রেতা বিক্রেতা প্রায় কেহই উপস্থিত হইল না। তাঁহার উদ্যম নিষ্ফল হইল। সেই মিলনশক্তিবলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক ডাক বিলি করিবার বন্দোবস্তও হইতেছিল। আমাদের স্বদেশবান্ধব সমিতির ১৫৯টী শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া ইংলিশম্যান পত্রিকায় এ দেশের কোন বন্ধু লিখিয়াছিলেন :—

"Barisal is probably the only place where there is a systematic organization and where the volunteers have done immense mischief. The organization is nowhere so complete as at Barisal."

(সম্ভবতঃ একমাত্র বরিশালেই সুসম্বদ্ধ সংহতি গঠিত হইয়াছে, এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রভূত অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। বরিশালে যেমন তেমন আর কোন স্থলেই এরূপ সংহতি হয় নাই), এই সমিতিগুলি অবশেষে এক বিকট আদেশ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সমূলে বিনাশ করিলেন।

ব্যসনত্যাগের দৃষ্টান্তও অল্প নহে। অনেক ব্যসনী যুবক স্বদেশীনেশায় মত্ত হইয়া সুরাপানাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অনুরক্ত স্বদেশসেবক হইয়া ধন্য হইয়াছেন। এই জিলায় একবৎসরে ৫২টি বিদেশী সুরাবিপণির মধ্যে মাত্র একটি বিদ্যমান ছিল।

অভিমান ও সংকীর্ণতাত্যাগের ফলে দেখিয়াছি "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি।" নিরক্ষর নিম্ন-শ্রেণীর বালকদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পুণ্যকর্ম্মা তেগাই হালদার তাঁহার নমঃশূদ্র বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে আপামর সাধারণের নিকটে কিরূপ আদৃত হইয়াছেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অভিমানহীন হইয়া কত ব্রাহ্মণ ও অপর যাহারা ভদ্রসমাজস্থ বলিয়া পরিচিত তাঁহারা রাস্তায় ফেরিওয়ালা হইতে লজ্জাবোধ করেন নাই, কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি স্বয়ং মৃত্তিকা খনন ও মস্তকে মৃত্তিকা বহন করিয়া পুষ্করিণী সংস্কার

ও দুই চারি মাইল দীর্ঘ রাস্তা অবধি প্রস্তুত করিয়াছেন। স্বগ্রামে শান্তিরক্ষার্থ কোন কোন গ্রামে যুবকগণ স্বীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া চৌকিদারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এক গ্রামে আমি শুনিয়াছি চোর ধরিয়া থানায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। কোন কর্ম্মই নীচ নহে এ ধারণা অনেকের জন্মিয়াছে। গতবার এ স্থলে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন সময়ে এক স্বেচ্ছাসেবক এক প্রতিনিধির ট্রাঙ্কটি মস্তকে বহন করিয়া নিতেছিলেন, নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে প্রতিনিধি দেখিলেন যিনি কুলীর কার্য্য করিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রভুপুত্র। দেখিয়া জিহ্বা দংশন করিলেন, বড়ই সঙ্কুচিত হইলেন। স্বেচ্ছাসেবকটি বলিলেন আপনার সঙ্কুচিত হইবার কোনই কারণ নাই, আজ আমার এইরূপ বাহকের কার্য্য করাই প্রধান কর্ত্তব্য, আপনি আমার স্বত্য।"

আমি কূপমণ্ডুক বলিয়া আমার দৃষ্টান্তগুলি প্রায়ই এই জিলাসম্বন্ধ। বঙ্গদেশময় ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জাগরণের চিহ্ন বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু যুগযুগান্তব্যাপী তামসী নিদ্রায় অভিভূত বলিয়া আমরা আবার তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছিলাম। রাউল্যাটপ্রমুখ গদাঘাত, জালিয়ান ওয়ালাবাগ ও খিলাফত্পীড়ন এবং অন্ন ও বস্ত্রকষ্টে আবার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

সেবারকার আন্দোলন বঙ্গদেশে ও কথঞ্চিৎ মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এবারকার আন্দোলন বিপুলায়তন ধারণ করিয়া ভারতবর্ষব্যাপী হইয়াছে। সেবারকার আন্দোলনে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের অতি অল্পসংখ্যক মাত্র যোগ দিয়াছিলেন, এবার একপ্রাণ হইয়া হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায় সহযোগিতাবর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। সেবার নিরক্ষর জনসাধারণ বঙ্গদেশে কোন কোন স্থলে বিশেষ জাগৃতির পরিচয় দিয়াছেন, এবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সুরাপানাদি ব্যসন ত্যাগ সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে সেবার ইহার অতি সামান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পুরাতন ভারতের মেরুদণ্ডস্থানীয় আত্মসংযম ও তজ্জনিত বল, যাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঋষিগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাত্মা গান্ধি এবার বিশেষভাবে প্রচার করিয়া এ দেশের বলবিধান করিতেছেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ঋষির এই মহাবাক্য এই জাতীয় বলকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা, আত্মদর্শনের সোপানমাত্র। জাতীয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইলে উপনিষদোক্ত স্বরাট্‌ভাব লাভ করিবার পথ প্রশস্ত হয়। হিংসাশূন্যসহযোগিতাবর্জ্জনে আমাদিগের বলসঞ্চয়ের বিধান হইতেছে। আমরা ঋষিনির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইবার উদ্যোগী হইয়াছি। আমাদের এই পন্থা ভিন্ন স্বরাজাভিমুখী অন্য পন্থা নাই, ইহা অল্পদিনের মধ্যে বোধ হয় ভারতবাসী মাত্রেরই দৃঢ় ধারণা হইবে; এবং তাহা হইলে যে আমাদের স্বরাজপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, প্রফেসর সিলি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"If the feeling of a common nationality began to exist there (India) only feebly, if without inspiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion that it was shameful to assist him in maintaining his dominion, from that day almost our empire would cease to exist."

(যদি অতি ক্ষীণ ভাবেও তথায় (ভারতে) সম্মিলিত জাতীয়ত্ববোধের উন্মেষ হয়, বিদেশীকে বহিষ্কৃত করিবার উত্তেজনা না জন্মিয়াও যদি তাহার

রাজত্ব রক্ষার সাহায্য করাও লজ্জাজনক, মাত্র এই ভাবেরই সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই দিন হইতে বলিলেও হয়, আমাদিগের সাম্রাজ্য শেষ হইয়া যাইবে।)

আজ সেই ভাবের যে সৃষ্টি হইতেছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মহাত্মাগণের অলোক-সামান্য ত্যাগে আজকার এ আন্দোলন ধন্য হইয়াছে এবং উপরোক্তভাব ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে। পর মুখাপেক্ষাহীন হইয়া আত্মচেষ্টা ব্যতীত স্বরাজপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। স্বরাজপ্রাপ্তি কখনও দানের ফল হইতে পারে না। ভুবনবিখ্যাত স্বদেশপ্রাণ প্রাতঃ স্মরণীয় কোসুথ বলিয়াছিলেন :—

"Freedom never yet was given to nations as a gift, but only as a reward bravely earned by one's own exertions, own sacrifices, and own trial, and never will never shall it be attained otherwise."

(স্বাধীনতা কোন জাতিকে কখনও দানস্বরূপে দত্ত হয় নাই, কিন্তু উহা স্বকীয় উদ্যম, স্বকীয় ত্যাগ এবং স্বকীয় পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে পৌরুষ সহকারে পুরস্কারস্বরূপ অর্জ্জিত হয়, ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ইহার প্রাপ্তি ঘটে না—ঘটিতে পারে না।)

এই তত্ত্বটী এতদিনে বোধ হয় ভারতবাসীর হৃদয়-ঙ্গম হইতেছে। আমরা শৈশবস্থ, কার্য্যের সফলতা দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে ক্রমে গুরুজনের নিকট হইতে একমুষ্টি দুইমুষ্টি করিয়া স্বরাজদান লাভ করিব, ইহা যদি কাহারও ধারণা থাকে তবে সে ধারণাপুষ্টির পৃথিবীর ইতিহাসে কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। এবার যাহা দেখিতেছি, ঋষিনির্দ্দিষ্টপন্থার সসংযম সহ-যোগিতাবর্জ্জনের দ্বারা স্বচেষ্টায় আমরা গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছি—ইহাই তো মনে হয়। ইহার প্রমাণ আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত। আমরা আমাদের বস্ত্রাদি সংস্থান সম্বন্ধে নিতান্তই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশী-দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের চেষ্টায় কথঞ্চিৎপরিমাণে পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহাতে দেশের হিন্দুমুসলমান তন্তুবায় প্রভৃতি অনেক সুফল পাইয়াছেন এবং অপর শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণও চরকা এবং তাঁতের দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু সেই পরমুখাপেক্ষাহীনতা ও আত্মনির্ভরের ভাব শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, এবার মহাত্মা গান্ধীর অনুজ্ঞায় গৃহে গৃহে চরকাদির ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া তাহা আবার দৃঢ়তর হইতেছে। যাঁহারা পরমুখাপেক্ষাহীনতা ও আত্মনির্ভরের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাসন হইবামাত্র আমা-দিগের দেশবাসীগণ ভীষণ প্রতিবাদ করিতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মনোমোহন নিউগী ও তায়েবুদ্দিন আহাম্মদ মহাশয়গণের প্রতি যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে, বণিক, দোকানদার উকিল, মোক্তার এবং কুলি, মেথর অবধি অপরাপর দেশবাসী যে হরতাল করিয়াছিলেন, তাহা এই ভাবো-ন্মেষের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যখন শুনিলাম হরতালের দিনে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির লোভ সম্বরণ করিয়া গাড়োয়ান ও কুলিগণ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন নাই, তখন বুঝিলাম, পরমুখাপেক্ষাহীন হইয়া আত্মনির্ভরের দিকে বল সঞ্চয় হইতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় উন্নতিকল্পে যে গুণ গুলির উল্লেখ করিয়াছি তাহা এবারকার হিংসাশূন্য অসহযোগীতা আন্দোলনে অধিকতর স্ফুট হইতেছে।

আমাদের এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য আত্মপ্রত্যয় ও সৎসাহস বৃদ্ধির উপায়বিধান, আত্ম-প্রত্যয় যত বাড়িবে, সৎসাহসও ততই বাড়িতে থাকিবে। এই আত্মপ্রত্যয়প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগীতা-বর্জ্জন বিশেষ উপকারী।

যাঁহারা উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত নিম্নপদস্থ কেহ সহযোগিতা করিতে গেলে অনেক স্থলেই স্বতঃই অধীনতা আসিয়া পড়ে, সুতরাং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটে। যশোহর জিলাস্কুলে সদ্ভাবশতকরচয়িতা পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন, অল্প বেতন ছিল বলিয়া তিনি যে গৃহে বাস করিতেন সে গৃহটী উপযুক্তরূপে সংস্কৃত না হওয়ায় তাঁহার সে গৃহে থাকিতে কষ্ট হইত, রৌদ্র বৃষ্টি উভয়েরই পীড়ন সহ্য করিতে হইত। তাঁহার শিষ্য একটী অপেক্ষাকৃত ধনীর পুত্র, তিনি তাঁহাকে একদিন বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয়! আপনি এখানে এত কষ্ট পাইতেছেন কেন? দয়া করিয়া আমাদিগের বাসায় একখানি ঘর আছে তাহাতে আপনি বাস করিলে আমরাও কৃতার্থ হইব, আপনারও কষ্ট দূর হইবে, আমাদিগের সহিত আপনার কোন সংস্রব থাকিবে না।" মহাপুরুষ উত্তরে বলিলেন, "বাবা! তুমি যাহা বলিলে তাহা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম, তুমি যে আমাকে কিরূপ ভালবাস এবং ভক্তি কর তাহার পরিচয় পাইলাম, কিন্তু তোমার কথানুযায়ী কার্য্য হইতে পারে না, ধনীর সহিত কোন সংস্রব না থাকিলেও নিকটে গেলে সহজেই অধীনতা আসিয়া পড়ে।" এই মহদ্বাক্যটী আমাদিগের মনে রাখিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সমানে সমানে সহযোগিতা থাকিলে আত্মপ্রত্যয়ের কোন ব্যাঘাত হয় না, ছোট এবং বড়র সহযোগিতা হইলেই ঐ মজুমদার মহাশয়ের বাক্যটী মনে হয়—"সহজেই অধীনতা আসিয়া পড়ে।" সুতরাং আত্মপ্রত্যয় জন্মাইবার জন্য আমাদিগের স্বকীয় বলের উপরেই নির্ভর করা নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটী বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য :—

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বদেশী, সালিশী।

শিক্ষা :—আমাদিগের দেশে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাদ্বারা আমাদিগের জাতীয় ভাবের উন্নতি হওয়া দূরে থাক্, বরং অবনতি হইতেছে, ইহা কি বুঝিতে আমাদের বাকি আছে? আমাদিগের আদর্শ ও জীবনের মানদণ্ড পাশ্চাত্যজাতির ন্যায় নহে, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও আমাদিগের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে ভিন্ন, মনোবৃত্তির চালনার মধ্যেও তাঁহাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা আমরা যে জাতীয় ধারা ভুলিয়া যাইতেছি ইহা কি আবার বলিতে হইবে? ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় রীতিনীতি যে ক্রমেই আমাদের যুবকগণের নিকট দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। আমার সমবয়সী বৃদ্ধ, কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পান নাই; এবং মুসলমান ভ্রাতৃগণেরও অনেকে বোধ হয় এইরূপ মহম্মদচরিত, হেদায়ত উল-ইসলাম, কিমিয়াএ সাদত, তজকরত উল আউলিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার অনেকের প্রবৃত্তিও হয় নাই। আমাদিগের শাস্ত্রীয় আলোচনা কতদূর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন; অতি অল্পদিন হইল কিঞ্চিৎ চেতনার উদয় হইয়াছে। ভারতের ইতিহাস আমাদিগের সময়ে অতি অল্প পরিমাণে কিঞ্চিৎ পড়িতে হইত, এখন তো তাহাও লোপ পাইয়াছে। জাতীয় গৌরবানুভূতি ও সেই গৌরবের বৃদ্ধি করিতে হইলে স্বকীয় জাতীয় গৌরবের পুরাতন ইতিহাস এবং প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনকালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজাতিগুলির উন্নতি ও অবনতির ইতিবৃত্ত পাঠ করা

ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে উপায় আমাদিগের বিদ্যালয়গুলিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। এখন স্কুল ও কলেজে অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্রই ইতিহাস পড়িয়া থাকেন। কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, বিগত আন্দোলনের সময়ে এ দেশে ইতিহাস পাঠ বন্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। এক রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "পরাধীন জাতির অদৃষ্ট এই যে তাঁহাদিগের বিদ্যালয়গুলির অবাধ চালনার ভার তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় না, এবং তাঁহাদিগের স্বাধীন চিন্তা ফুটিবার অবকাশ রহিত করা হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য রাজকীয় প্রয়োজনের অধীন করিয়া রাখা হয়, অথবা তৎপ্রয়োজনে একেবারে ধ্বংস করা হয়।" আমাদিগের এ দেশে এই তত্ত্বটীর কি আমরা পরিচয় পাইতেছি না? অবশ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি, জাতীয়শিক্ষা পরিষদ তন্মধ্যে যাহা উপকারী তাহা বাদ দিবেন না।

জাতীয় ধারানুযায়ী স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তৎপথে অগ্রসর হইতে হিন্দু মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসিগণের ধর্ম্মশিক্ষার বিধান করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে জাতীয়ভাবে আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং দৈহিক বল বৃদ্ধি হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সঙ্গে প্রধান চিন্তার বিষয় আমাদিগের এই দরিদ্র দেশে জীবিকানির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য আমরা কি শিক্ষা দিতে পারি; এ দেশে ইহার উপায় উদ্ভাবনই এক কঠিন সমস্যা। আমাদিগের স্কুলগুলি জাতীয়-বিদ্যালয় করিতে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা উদ্দেশে এখনকার স্কুল কলেজে পড়িতে আসেন, তাঁহাদেরই বা কজন এই শিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের পথ করিয়া লইতে পারেন? আমার মনে হয়, আমাদিগের উদ্যমের অভাবই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ; আমাদিগের দেশের যুবকগণ স্কুল ও কলেজে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চলিতেছেন, তাঁহারা যদি এই পদ্ধতি ছাড়িয়া ম্যাট্রিকুলেশন তুল্য কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজী ও হিন্দি কোন প্রকারে বলিতে সক্ষম হন এবং উত্তম সহকারে যে অর্থ এল, এ, বি, এ, পড়িতে ব্যয় হয় তাহার অর্দ্ধ কি সিকি পরিমাণ মূলধন করিয়া, এই বিপুল ভারতের নানাস্থানে দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা অবশ্যই সফল হয়। জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতেও নানাপ্রকার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের মন এতদভিমুখ হইলে অর্থের যে বড় অভাব হয় তাহা মনে হয় না; স্বাধীন জীবিকানির্ব্বাহ পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য জিলার লোক উৎসাহী হইলে প্রত্যেক জিলায় বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করা অসাধ্য নহে। তবে উৎসাহটী এমন হওয়া চাই যে অর্থদাতৃগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অর্থ প্রেরণ করিবেন এবং এই অর্থ প্রেরণ বিশিষ্ট পুণ্য কার্য্য মনে করিবেন। আমি একটি ভদ্রলোককে জানি যে তিনি কোন সমিতিতে শিক্ষা ও দরিদ্রের সাহায্য ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া প্রত্যেক বিজয়াদশমীদিনে ২৫৲ পঁচিশটী টাকা প্রেরণ করিয়া থাকেন, ইঁহারই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া এই জিলার ২৪ লক্ষ লোকের মধ্যে যদি এক লক্ষ লোকও, হিন্দুগণ বিজয়া দশমীর দিনে, মুসলমানগণ ইদের দিনে এবং খৃষ্টানগণ যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে প্রত্যেকে একটী টাকা প্রেরণ করেন, তাহা হইলেইতো লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়।

জাতীয় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় সৃষ্টি করাতে

কিছুই কঠিন নয়। গ্রামে গ্রামে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মশিক্ষা ও লিখন পঠন, গণিত এবং কৃষি ও দু একটী সামান্য শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা অতি সহজ। গ্রামের লোক যে ইহাতে উৎসাহী হইবে না তাহা মনে হয় না। আমরা এই জিলায় কয়েক বৎসর গত হইল কোন সমিতির পক্ষে একটী লোক রাখিয়াছিলাম তিনি অল্পদিনের মধ্যে ৩২টী স্কুল স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রামের লোকদিগকে দেশের অবস্থা জানাইয়া এইরূপ শিক্ষাভিমুখ করা অনায়াসসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রচারক ও কর্ম্মকর্ত্তারই অভাব। এবারকার আন্দোলনে সেই অভাব দূর হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। অনেক গ্রামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দয়া করিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবৈতনিক শিক্ষক হইয়া দিনে ৩।৪ ঘণ্টা ব্যয় করিলে আমাদের শিক্ষাহীনতা বিদূরিত হইতে পারে।

স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদিগের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতিতে যে গ্রামগুলি উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে ইহাতো সকলেই জানেন। গত বৎসর কলেরায় এই বঙ্গদেশে দেড় লক্ষ লোকের অধিক এবং ম্যালেরিয়ায় প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদিগের স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী বলিতেছেন, টাকা পাইলেই তিনি ম্যালেরিয়া দূর করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সে টাকা কোথায়? এই বরিশালে একবার এক ছোটলাট সাহেব উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকটে আমরা আবেদন করিয়াছিলাম যে মালিকানা ফিস স্বরূপে তখন যে তিন লক্ষের উদ্ধে টাকা জমা হইয়াছিল, তাহা সরকারের সাধারণ খরচে না লইয়া আমাদিগের এই জিলায় কোন হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের ঐ টাকার উপরে চোখ পড়িয়াছে কিন্তু উহার উপরে আমার হাত রহিয়াছে।" তখন মালিকানা ফিস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমাদিগের প্রদত্ত রাজস্ব, টাক্স প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহা কি এখনও প্রযুজ্য নহে? এবারকার বাজেটে কোন্ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহা দেখিলেইতো আমরা কোথায়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। স্বরাজ লাভ না হইলে আমরা যে ভাবে যে টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য মনে করি, তাহাতো কিছুতেই করিতে পারিব না। যাহা হউক এখন আমাদিগের শক্তি অনুসারে আত্মনির্ভরশীল হইয়া যথাসাধ্য জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ মনুষ্যগণের যে অজ্ঞতা আছে, তাহাত অনেক পরিমাণে দূর করা যাইতে পারে। শাস্ত্রীয় নিয়ম ও স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে কি প্রকারে চলিলে আমরা কতদূর সুস্থ থাকিতে পারি, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারি। দেশের প্রাচীনারাও এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন, আজ তাহা আমাদের প্রচলিত সুশিক্ষার গুণে, পুরনারীরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কৃষকেরা গো চিকিৎসা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা জানিতেন তাহা আর এখন জানেন না। অজ্ঞতা যে কতদুর বাড়িয়াছে, তাহা যাঁহারা গ্রামের সংবাদ রাখেন তাঁহারাই জানেন। সেই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য প্রচারকের আবশ্যক। পানা পুকুরাদির আবর্জ্জনা দূর করা কিংবা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীগুলি সংস্কার করা অথবা কোন কোন স্থলের জল নিঃসারণ প্রণালী করিয়া দেওয়া এবং গ্রাম্য জঙ্গলাদি পরিষ্কার করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। সে দিকে গ্রাম্য লোকের মতি নাই বলিয়াই অনেক সময় তাঁহারা রোগাধীন হইয়া থাকেন। গ্রামে গ্রামে যথাসাধ্য সমবেত চেষ্টা হইলে অনেক উপকার সাধিত হইতে

পারে। রোগের সময়ে পরস্পরকে সাহায্য করার ইচ্ছা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়। সেবকদল যত তাহার বল বিধান করিবেন ততই দেশের উন্নতি হইবে; পরস্পরের সৌহার্দ্য বাড়িলে, মিলনশক্তির প্রবল চেষ্টা উৎপন্ন হইবে।

স্বদেশী—স্বদেশী বলিতে কৃষি ও শিল্পদ্বারা দ্রব্যজাত উৎপন্ন করা এবং তাহাদ্বারা দেশের অভাব পূরণ করা বুঝি। দেশে দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাহা দেশের জন্য রক্ষা করা ও দেশের অভাব ঘটাইয়া বিদেশে প্রেরণ না করা কর্ত্তব্য। দ্রব্যোৎপাদন ও রক্ষা করার জন্য গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, ধর্ম্মগোলা ও যৌথ কারবার স্থাপনের প্রয়োজন। বিদেশী দ্রব্য যথাসাধ্য ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। গত বৎসর বিদেশী বস্ত্র ও সূতা ক্রয়ে আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকার অধিক বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এই ভারতবর্ষই ত এক সময় বস্ত্র ব্যবসায়ে দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল, আজ বস্ত্রকষ্টে কোটী কোটী লোক নগ্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধি গৃহে গৃহে চরকা প্রচলনের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা যদি ম্যাঞ্চেষ্টার বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে যে স্বরাজলাভের পন্থা পরিষ্কার হয়, ইহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। তণ্ডুল ২৩ কোটী টাকার উর্দ্ধ মূল্যের বিদেশে পাঠাইয়া আমরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছি। দেশে এত তাম্রকুট থাকিতেও চুরুট বার্ডসাই প্রভৃতিতে ২ কোটীর অধিক টাকা বিদেশীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। অলমতি বিস্তরেন—এই সকল সংবাদগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করিলে যে আত্মদৃষ্টির পথ খুলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোন্ কোন্ স্থলে কৃষি ও শিল্পজাত কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহা অবগত হইয়া সহস্র সহস্র অক্লান্তকর্ম্মী প্রচারক ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বদেশীর ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। একটা কথা আছে "যা' নাই ভারতে তা' নাই জগতে" অর্থাৎ ভারতবর্ষ জগতের একখানি সংক্ষিপ্তসার। বাস্তবিকই ভারতের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। নানাস্থানে নানাপ্রকার জলবায়ু ও মৃত্তিকা প্রভাবে নানাপ্রকার শস্য, বৃক্ষ ও ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয় এবং কতপ্রকার যে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহারও বোধ হয় সংখ্যা করা কঠিন। এই সকল বহুবিধ পদার্থগুলির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে যে কত প্রকার স্বদেশী ব্যবসায়ের কত উন্নতি হইতে পারে তাহার সম্প্রতি পরিমাণ করা অসাধ্য। চাই ইচ্ছা, চাই উত্তম, চাই গৃহকোণ হইতে বহির্গমন। আমাদের যুবকগণ যদি উত্তম ও অধ্যবসায় লইয়া, চির নির্দ্দিষ্ট পন্থাগুলিতে আবদ্ধ না থাকিয়া যত্ন ও শ্রম করিতে থাকেন, তাহা হইলে যতদূর বুঝি, তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালনের কোন অভাব থাকিতে পারে না এবং ভারতবাসী কোন লোকেরই প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য কোন বিদেশীর অপেক্ষায় থাকিতে হয় না।

শালিসী—আমরা অধুনা যে ধর্ম্মাধিকরণগুলিতে, আমাদের বিবাদ নিরসনের জন্য উপস্থিত হই তাহাদিগের কৃপায় কত কত পরিবার নিঃস্ব হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা বোধ হয় কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। গত বৎসর এই বঙ্গদেশে একমাত্র কোর্টফিসে ১৮৯৬৪০০৮৲ টাকা বাদী বিবাদীগণের ব্যয় হইয়াছে। কোর্টফিসেই এই ভীষণ ব্যয়, তদুপরি উকিল, মোক্তার, আমলা, প্যাদা, চাপরাশী, কনেষ্টবল, দারোগা প্রভৃতির দাবী পূর্ণ করিতে আমাদের কত কোটী টাকা দিতে হয় একবার অনুমান করুন। একমাত্র এই ভীষণ ব্যয় নিবারণকল্পেই তো শালিসী অবলম্বন যৎপরোনাস্তি প্রয়োজনীয় মনে হয়। পূর্ব্বেই এদেশে সাধারণতঃ গ্রামে

গ্রামে পঞ্চায়েৎ ও শালিস দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইত। আমাদিগের বাল্যবয়সেও আমরা শালিস দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, প্রতি গ্রামেই কোন কোন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহাদিগকে সেই গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ সকলেই বিশেষ মান্য করিতেন। এখন শিক্ষাগুণে মানুষ স্ব স্ব প্রধান হওয়ায় এবং অভিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় কাহাকেও সেরূপ মান্য দিতে প্রস্তুত নহেন। তথাপি পূর্ব্বের ভাব একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমাদিগের এই জিলায় স্বদেশবান্ধবসমিতির ইঙ্গিতে এক বৎসরে ৫২৩টী মোকদ্দমা শালিস দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৯০ হাজার টাকা মূল্যের দুইটী সম্পত্তি সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা ছিল। কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই শালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করার জন্য অনেক অর্থী প্রত্যর্থী উপস্থিত হইবেন। আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে যাইয়া কিরূপ সর্ব্বনাশ পাইতে হয়, তাহা যতদূর জানি, জনসাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন। শালিসের দ্বারা গ্রামে গ্রামে মামলা নিষ্পত্তি হইলে ব্যয় বাহুল্য হইবে না এবং সত্যনির্দ্ধারণ পক্ষেও বিশেষ সুযোগ হইবে, ইহা সহজেই বোধগম্য। কেহ কেহ আপত্তি করেন, শালিস দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে তাহার উপর আপিল চলিবে না, কিন্তু দুই দল শালিস নিযুক্ত করিয়া, প্রথম দলের নিষ্পত্তিতে কেহ অসম্মত হইলে দ্বিতীয় দলের নিকট আপিল চলিবে এবং তাঁহাদিগের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসসাধ্য। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, মোকর্দ্দমায় যাহার বিরুদ্ধে আদেশ হইবে, সে আদেশ না মানিলে তদ্বিরুদ্ধে আমরা কি করিতে পারি? আমার মনে হয়, শালিসী নিষ্পত্তির সংখ্যা যত বাড়িবে, তত আত্মপ্রত্যয় এবং জনসাধারণের শালিসী পক্ষে মতপ্রাবল্য এমন হইয়া উঠিবে যে, সামাজিক শাসনই আদেশ পালন করাইবে। শালিসীর উপযুক্ত চেষ্টা হইলে তজ্জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বদেশী, শালিসী সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা অনেকদিন হইতেই বলা হইতেছে; কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যমশীল কর্ম্মীর বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এবারকার আন্দোলনে অনেক যুবকের এতদভিমুখ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা দেখিতেছি। ভগবান তাহাদিগের প্রাণের সেই ইচ্ছা বলবতী করুন এবং কার্য্যসাধনে সামর্থ্য দিন! আমাদিগের বাঙ্গালীযুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধিচালনা ও সৌহার্দ্যভাবের অভাব তত দেখিতে পাই না, কিন্তু ইচ্ছার দার্ঢ্যের অভাব দেখিতে পাই। দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মশক্তিচালনা স্থায়ী হইলে আমাদিগের ভাগ্য ফিরিবে। চঞ্চলতা আমাদিগকে নিতান্ত হীন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার স্থানে বীরোচিত দৃঢ়তাসাধন করিতে পারিলেই আমাদিগের স্বরাজ লাভ অবশ্যম্ভাবী। মহাত্মা গান্ধীর ভিতরে যে দার্ঢ্য দেখিতেছি, দেশময় তদনুকরণে দার্ঢ্য সাধন হইলেই আমাদিগের ইচ্ছা সফল হইবে। আমরা বারংবার তরঙ্গের সহিত উচ্চে উঠিতেছি ও নিম্নে নামিয়া যাইতেছি। এবার ভগবান আমাদিগের সেই দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিন, তাঁহার শ্রীচরণে সনির্ব্বন্ধ এই প্রার্থনা। এবার মণিকাঞ্চন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান গলাগলি হইয়া বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এই সৌহার্দ্য এবং দৃঢ়তা চিরস্থায়ী হউক, ভগবান!—আবার যেন ক্ষুদ্র স্বার্থানুসন্ধানে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি, উভয় সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ ভারতবাসীগণসহ সংহত হইয়া যেন উদ্যম, উৎসাহ ও তেজে বক্ষঃস্ফীত করিয়া কর্ত্তব্যপথে চলিতে পারি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে নিপীড়নের ফলে যে সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বরাজলাভের চেষ্টা করিতে পাইলে যে প্রভূত

নিপীড়ন সহ্য করিতে হইবে ইহা তো ধ্রুব কথা। কোন দেশ কোন দিন ত্যাগ ও আত্মবলিদান ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। আমরাও সুকোমল পুষ্পাচ্ছাদিত পথে চলিয়া স্বরাজলাভ করিতে পারিব না। আমাদের মাত্র দেখিতে হইবে যে আমরা ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া কোন হিংসার কার্য্যে ব্রতী না হই, বক্ষ পাতিয়া গুলির আঘাত লইতে প্রস্তুত হইব কিন্তু আমরা শরীর কি বাক্য কি মনের দ্বারাও কোনরূপ প্রতিহিংসার চেষ্টা করিব না, অথচ আমাদের "কোট" বজায় রাখিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব। দধীচি তাঁহার অস্থি দান না করিলে দেবতাগণ জয়ী হইতেন না। আমরাও আমাদিগের হৃদয়ের উদ্যম ও ধৈর্য্য দ্বারা যে আধ্যাত্মিক বজ্র নির্ম্মাণ করিব, তাহাদ্বারাই এই সংগ্রামে জয়লাভ করিব।

উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেনাসুরা হতাঃ।

উত্থানেন মহেন্দ্রেণ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তং দিবীহ চ॥

উদ্যমের দ্বারাই দেবগণের অমৃত লাভ হইয়াছিল, তাহাদিগের উদ্যমেই অসুরগণ নিহত হইয়াছিল, মহেন্দ্র উদ্যমের দ্বারাই দ্যুলোক ও ভূলোকে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। অতএব

উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতি কর্ম্মসু।

উঠ্‌তে হবে, জাগ্‌তে হবে, লাগ্‌তে হবে —ভাগ্যসম্পদবৃদ্ধিকর্ম্মে।

উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্।

অপ্যপর্ব্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ॥

নিয়তই উদ্যমশীল হইবে, কোনক্রমেই অবনত হইবে না, যেহেতু উদ্যমই পুরুষকার, অপর্ব্বস্থানে ভগ্ন হইবে, (যেখানে সন্ধি বা জোড়া নাই সেই স্থানে ভগ্ন হইবে) তথাপি কস্মিনকালেও নত হইবে না।

আমি বৃদ্ধ, আমার উদ্যমের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রাণের সহিত আপনাদিগের নিকটে আমার সনির্ব্বন্ধ নিবেদন, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে এই ঋষিবাক্য অবলম্বন করিয়া স্বরাজপতাকা হস্তে লইয়া আবালবৃদ্ধ সকলে উদ্যম ও উৎসাহে প্রজ্জলিত হউন এবং সেই প্রভায় সমগ্র দেশ উদ্দীপ্ত হউক—অচিরে স্বরাজলাভ হইবে।

নারী সৃষ্টি

যতদিন না পুরুষ নারীর সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে উঠ্‌তে পারছে, ততদিন পর্য্যন্ত নারীকে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিনীরূপে জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সমানভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে চলে আস্‌তে নিমন্ত্রণ করা বাতুলতা মাত্র। যতই সৎ উচ্চ উদার আদর্শ সম্মুখে খাড়া থাক, সমস্তকে চুঁইয়ে সেই সনাতন পরস্পর ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধের কদর্য্য হিংস্রবৃত্তি বেরিয়ে পড়্‌বেই। আজ দেশ কালের অবস্থা সখ্ জাগাতে পারে কিন্তু সখ্ জিনিষটা এখানে প্রশ্রয়ের উপযুক্ত নহে। অভাব জাগাতে পারে কিন্তু সে অভাবকেও সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে হবে। অবশ্য এই অভাববোধ জেগেই একদিন দেশে স্ত্রীলোকের পুরুষের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রচার কর্‌তে হবে। সে অভাব কিন্তু অসামান্য অভাব। সে বোধমাত্রে পর্য্যবসিত নয়, সে

একেবারে জীবনের অন্তঃস্থল থেকে উদ্রিক্ত একটা আহ্বান। সে অভাবের প্রস্তুতি-অবস্থা নহে—প্রকৃতি।

যেমন করে এই প্রকৃতি একদিন জগতে নারী-ত্বকে আলাদা করে দিলেন তেমনি করেই তিনি তাকে সহযোগিনী করে' দিতে পারেন। সহযোগিনীকে চাওয়াটা সত্য, সহযোগিনীরূপে নারীর অভিব্যক্তি সত্য, আর কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর সহযোগ সত্য এই ত্র্যহ-স্পর্শের সংযোগেই সে পবিত্র ক্ষণ আস্‌বে। কাজটা মানবপ্রকৃতির, সভ্যতা বা সংসার বলে' যে একটা আদিম মানব আমাদের মধ্যে আছে তার নয়।

এই মানবপ্রকৃতির একটু কাব্যদৃষ্টির পরিচয় দিই। কেমন করে' প্রকৃতি নারীত্বকে আলাদা করে দিলেন? মহিলাকাব্য হতে একটু উদ্ধৃত করি।

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে
শূন্য দেখে শোভিত সংসার।
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধি বলে
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার—
বুঝি ভাব মানবের
ধাতা তার মানসের
করিলেন প্রতিমা রচনা,—

এই প্রতিমা পূজায় নর আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে পৃথিবীকে যে অমরাবতীর সজ্জা দান করেচে, সমস্তই সেই কাব্যের কবি বর্ণনা করেচেন। উদ্ধৃত করা বাহুল্য। জগৎ এখনও সে সজ্জায় সেজে রয়েচে।

কথা হচ্চে এই যে প্রকৃতি আপনার মোহন-তুলিকাস্পর্শে বাহির বল অন্তর বল সর্ব্বত্রই ক্ষণে ক্ষণে আপনার রঙ্ ফলাচ্চেন, তারই বর্ণবিকাশ আমাদের বর্ত্তমান সংস্কার অভ্যাস যা কিছু। সেখানে একটা রৌদ্র বীভৎস মিশ্রিত রসের মুখভঙ্গীর কল্পনা ফুটে উঠেই সমাজে এই নারী-নর সমস্যার উদয় হয়েচে। অর্থাৎ এই দুই জাতি সুখ ও জীবন উভয়ের আসক্তিতে পরস্পর পরস্পরের সুখ ও জীবনকে চেপে লড়াই কচ্চে। পুরুষের অস্ত্র পৌরুষ, আর নারীর অস্ত্র মোহিনীর মোহময় সম্মোহনকুহক। আমরা বুদ্ধির যথেষ্ট স্পর্দ্ধা রেখেও যেখানে মাথা ঘুলিয়ে ফেলে বলি ছলনা চাতুরী। এই দৃশ্য এখনি পরি-বর্ত্তিত হয়ে যাবে যদি প্রকৃতি তুলির আঁচড়ে আবার নূতন কিছু টেনে বসেন। তিনি টেনেচেন।

আমরা যে অনুভব কচ্চি। সত্যই যে হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে আজ একটা আহ্বানধ্বনি বেরিয়ে আসচে। এবার বুঝি সেখানে একখানি করুণা ছল ছল আঁখি প্রীতিময়ী সুখের মৃদু হাসির লীলা বিলাস আঁকা হয়ে উঠেচে।

সেই অতীতের গৃহস্থালী পাতা রয়েচে—নারী এখনও তেমনি অন্তঃসারশূন্য। আমাদের সকল দুর্ব্বিসন্ধি পূরণেরই উপায়রূপা, আমাদের হাতে উপায়হীনা সবই তেমনি, যেমনটী পেয়ে একদিন আমরা তাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে সুখের সংসার পেতেছিলাম। আমরা বই আর তাদের জীবনে কোনও অবলম্বন রাখিনি—তাদের সমস্ত আশা ভরসা ব্যাপ্তি আমাদের ধারণপোষণ ও রক্ষণেই যন্ত্রের মত নিয়োজিত করেছিলুম—তেমনি অবস্থা, তেমনি ব্যবস্থা করে নেবার সমস্ত বৃত্তিগুলি তাদের মধ্যে রয়েচে, তবুও একটা গোপন সলজ্জ অস্বস্তিতে আমরা ভরে উঠচি, আমাদের মন স্বীকার কর্ত্তে না পার্লেও অন্তরে অন্তরে বুঝচে—"শূন্য দেখি শোভিত সংসার," আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হয়ে খুঁজে পাচ্চে না—কিসে দুঃখী কি অভাব তার।

অবস্থাটা তারই চিহ্ন, যে দুইটী জাতির পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। মনের মধ্যে অস্বস্তি দেখ্‌চি—গৃহস্থালীতে বিশৃঙ্খলা দেখ্‌চি—সমাজে কর্ম্মক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকেই আমরা নিজেদের মধ্যে দেখচি অপূর্ণতা। চারিদিকেই

অভাববোধ। জীবনের প্রত্যেক স্তরে এমনি করে অভাববোধ যখন বুঝতে পাচ্ছি' তখন স্পষ্ট হতে আর দেরি নেই, যে এ সেই প্রকৃতিরই অভাব যে প্রকৃতি আমাদের সমস্ত জীবনটারই প্রসূতি। সুতরাং এই অভাবকে আমরা অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।

তবে দেরি কেন? তবে যেমন আছি তেমনি ভাবেই যেমন যা আছে তারই মধ্যে নারীত্বের সহযোগিনীপণা চেয়ে, তারা যে আমাদের সঙ্গে সমান জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাদের আমাদের অধিকার এক ঘোষণা করে দিই না কেন?—দুয়ার খুলে দিতে হানি কি?

হানি যা তা হয়ত অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আর কিছুই থাকবে না। এখনও একটু হানি আছে বৈকি। অনেক উচ্চে প্রকৃতির নিভৃত ভাণ্ডারে যা সৃষ্ট হয়ে উঠেছে এখনও ত ধরণীতে তার অভিব্যক্তি পৌঁছায় নি। বিজ্ঞান যা দেখেচে মন প্রাণ তা সঙ্গে সঙ্গেই কি পেতে পারে? প্রকৃতি তাঁর নূতন ছবিখানির বর্ণ সংযোগ শেষ করে ফেলুন।তবে ত আমাদের চোখের সামনে সেটা ফুটে উঠবে। আমরা দেখতে পাব। স্বভাব যখন স্বভাবতই পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠবে তখন সকলেই নারীকে নতন চোখে দেখবে কিন্তু স্বভাব পরিবর্ত্তিত হবার আগে সেই চোখে তাকে দেখতে হলে এই চোখ নিয়ে ত হবে না, এই চোখকে সেই চোখ করে নেওয়া চাইত।

একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষ ও নারী যোগযুক্ত হবে—বিধাতা এমনি একটা বিধান করে বসেচেন। সেই সহযোগ আজই যারা পেতে চায় তাদের সাধনা করে যোগযুক্ত হতে হবে এও ভগবানেরই খেলা। সমস্ত সমুদ্র জমে ওঠবার আগে দু একটা ছোট ছোট হিম শিলার বুদ্বুদ ওপরে ভেসে ওঠে। যে সমষ্টি যোগে সমস্ত জাত একদিন সহযোগ পাবে আজ ব্যষ্টির মধ্যে দু এক জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষারূপে তা ঘটে উঠতে থাকবে।

আজ তাই স্তব্ধ হয়ে আত্মপরীক্ষা কর, তোমাকে প্রেরণা টানচে কি বাসনা টানচে, কিসের জন্য তুমি সহসা ব্যথিত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচ, নারীর জন্য? যে গলায় বিবাহ রাত্রের ফুলমালা পরিয়ে এনেচ আজ সৌহৃদ্যের আবেষ্টনে সেখানে বাহু স্থাপনা কর্ত্তে চাও, এ কার চাওয়া ভগবানের না তোমার?

তোমার চাওয়া ত তাই যা এই অশীতিকোটী যোনীপথ দিয়ে তোমায় সঙ সাজিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসচে। আর ভগবানের চাওয়া, সে চাওয়া যাই কর্ণে প্রবেশ করেচে অমনি সেই যে থমকে দাঁড়িয়ে গেচ আর ছোটাছুটি নেই। তোমার স্বরূপ বেরিয়ে পড়েচে; স্বভাব ব্যক্ত হয়ে গেছে—সঙসাজা একেবারে শেষ। এখানেও তাই। নারী গড়তে চাও, তুমি যতদিন চাইবে গড়া হবে না, ভোগ করাই হবে। চাইবে সহযোগ, পাবে উৎকট আকর্ষণ আর বিকর্ষণ। ভগবান চাইলে ফুটে উঠবে তোমার মধ্যে আর তোমার সংস্পর্শে নারীর মধ্যে শ্রদ্ধা ও শুদ্ধির প্রতিমা। যার যা কাজ সে ত কর্ব্বে। ভগবানের কাজ সৃষ্টি, তাঁর মধ্য দিয়ে না করলে' তুমি কি কর্ত্তে পার?

তাই নারী গঠন আর কিছু নয়—নারীতে যোগযুক্ত হওয়া, নারীর মধ্য দিয়াও ভাগবত উপলব্ধি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহজ করে বোঝাবার জন্য বলতেন ওদের গঠন কে কর্ত্তে পারে, মহামায়ার অংশ বলে চিনতে হয়। আরো সহজ করে কথাটাকে বুঝা চলে। মহামায়া আপনি না চেনালে কে চিনতে পারে? চেনবার বা শক্তি কই? আমাদের বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি বলুক ত জোর করে' সে আমাদের বিশ্ব রহস্যের কতটুকু বোঝাতে পারে? বুঝবো এই যে অহঙ্কার যাকে বুঝতে হবে তার পায়ের তলায় সঁপে দেওয়াই সোজা রাস্তা। নারীকে গড়বো চিনবো

এই যে অহঙ্কার, এটা নারীর মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়াই সোজা রাস্তা। এমনি করলেই অতি চুর্জ্জয় নারী-চরিত্র সবল হয়ে যেতে পারে।

প্রকৃতি অনেক উচ্চে আদরাপানি টেনেচেন বও ত ধবে নি। সম্ভাবনা জেগেছে স্বভাব ত গঠিত হয় নি। এই জন্যই যোগকে সাধনা করে' টেনে নামিয়ে আনতে হবে মনে ও পাণে। এই জন্যই সচেতন হয়ে এ চেতনা জাগাতে হচ্চে যে এই যে পুরুষের আলাদা অহঙ্কার ও নারীর আলাদা অহঙ্কার, উভয়ের মধ্যে জয় পরাজয়ের ধাক্কাই সমাজ খেয়ে এসেচে, সামঞ্জস্য চেষ্টা এখনও হয় নি। এই সামঞ্জস্যের উপরই উভয়ের সম্মিলিত যোগযুক্তজীবন।

উৰ্দ্ধলোকে—সম্ভাবনায় যার বিকাশ দেখেছি সে অপূর্ব্ব। এখানে স্বভাবে যা দেখ্‌চি সে একটা অতি কায় বিশৃঙ্খলা। সে এমন অনেক আঁধার অনেক ঝড়ের মধ্য দিয়েই অপসারিত হবে—সহজে ও শীঘ্র নয়।

শিক্ষার বিশুদ্ধি পেয়ে বিংশ শতাব্দীর এই সমাজে নারী ও নর উভয়েই মর্ত্ত্যরাজ্য থেকে কতবড় একটা লাফ দিলে একেবারে স্বর্গরাজ্যে পড়া যায় তার হিসাব ঠিক কর্চ্চেন। সম্ভাবনার রাজ্যে একটা পরিণামে উভয়েই বিশ্বাসী। স্বভাব ধীরে ধীরে প্রকৃতির বও কল্পনায় উজ্জ্বল হতে হতে কোন্ সম্ভাবনাটিকে পরি স্ফুট কর্ব্বে তারও অনেকেই কেমন একটা আভাস পাচ্চেন। কিন্তু স্বভাবের গতি এখনও আরম্ভ হয় নি তাই কেমন করে' তা হবে সে এখন সমস্যা। শিক্ষিত পুরুষ সেই দূরবর্ত্তী লক্ষ্যটীর কথা স্মরণ হলে লাফিয়ে ওঠেন—নারী-মহিমার অনির্দ্দিষ্ট সম্ভ্রমেই। কিন্তু হায় কোথায় সে সম্ভ্রম। আর কি সে? শিষ্ট-মতী নারীরও সমস্ত মনোবৃত্তি অভিষিক্ত হয়ে ওঠে—অবদানের বান বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—ক্ষণেকের জন্য আপনাকে তাঁরা এই পৃথিবীর প্রয়ো-জনের চেয়ে অনেক উঁচু—একটা কোন অপূর্ব্ব যজ্ঞের উপকরণ বলে জানতে পারেন—কিন্তু এইটুকু। তার-পর সব অন্ধকার। দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত অশ্রু ঢেকে সমস্ত ভাবোচ্ছ্বাসকে চেপে আবার সেই চিরদিনের অভ্যস্ত জীবন।

ভগবান যে শক্তিরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্যসংযোগে ধীরে ধীরে ওই স্বভাবকে পরিস্ফুট করে' মানবকে ঐ পরিণামমুখে নিয়ে যাবেন, তাঁকে বন্দনা করি আবা-হন করি। বিশ্বমুক্তির জন্য তাঁকে ধারণ করবার স্পর্দ্ধা যেন লক্ষ লক্ষ আধারে জেগে ওঠে।

আর ঐ পরিণামের সম্ভাবনার অস্পষ্ট আভাস আমাদের এখন কোন মনোবৃত্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। স্বভাব বর্ত্তমানে ঠিক কেমনটী হয়ে আছে তারও একটা প্রত্যক্ষ ছবি চাই ত। যাকে বদলাতে হবে তার এখনকার স্বরূপ কি? বলা শক্ত। অনি র্দ্দেশ্য যেখানে নির্দ্দিষ্ট হয়েচেন সেখানে বৈচিত্র্যের এত বড় সম্ভার এলিয়ে দিয়ে তার প্রকাশ যে তার হিসাব রাখে কে? সসম্ভ্রমে বলতে হয় এর চেয়ে অনন্দেশাও যে ভাল।

নূতন স্বভাবের আভাস নারীকে প্রয়োজনের শৃঙ্খল ছিন্ন করে' জগতে আনন্দের বাঁধন পরে' গৃহপ্রতি ষ্ঠানকে জাতীয়তার মুক্ত বাতাসে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে ডাক্‌চে—কিন্তু সে যে এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি—সে যে এখনও আভাস মাত্র, তাই, অভাবরূপে তার মন যা জাগাচ্চে—স্বভাবরূপে সেই মনই আবার তা ঠেকাচ্চে। তারা চাইতে ইচ্ছা কর্চ্চে এক, চেয়ে বসচে আর। যে মন নিয়ে অতীন্দ্রিয় সত্যের অভি-মুখে তারা ছুটে যাচ্চে আবার সেই মন নিয়েই তারা প্রত্যক্ষ বাস্তবের পদতলে ধুপ করে' বসে পড়্‌চে। তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা খুঁজচে নারীত্বের লক্ষ্য কই? পরি-ণাম কি?. হৃদয় বলচে নারী যে এই। অভাববোধ স্বভাবের হাতে অবশেষে আত্মসমর্পণ কর্চ্চে। জীবন-

যুদ্ধে শান্তির শুভ্র পতাকা তুলে ধরে' তারা পথহারা হয়ে যাচ্ছে। নারীত্বের মহিমামন্দির নির্ম্মাণ তাই এখন বিলম্বিত। নারীজাতি অপেক্ষা কর্চ্ছে—কে সেই পুরুষ, যে ভিতর হ'তে হয়ে কার্য্য আরম্ভ করে দেবে।

আর পুরুষ। সে অধ্যাত্মবাজোর যত উচ্চ স্তরেই উঠুক, পৌরুষের প্রতিকূলে পুরুষ হ'য়ে উঠে নারীর জন্য কেমন করে' আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারা যায়, এ সমস্যার সে মীমাংসা করে' উঠতে পাচ্চে না। সেও তাই স্তব্ধ। ... তাই মানব কথা ... মধুরহাসিনি সুকেশিনি তা হয় না! আমারই কণ্ঠলগ্না হয়ে যদি থাক—উন্নতিস্রোতে পৃথক করে' গা ভাসান, সে আর হয় না।

সোজাকথা এই যে মানবত্বের মধ্যে এর মীমাংসা নেই। মীমাংসা যেখানে সেখানে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনও দৃষ্টিই পৌঁছায় না। সেখানে আপনার দিক থেকে সব চেষ্টা গুঁড়িয়ে গেলে প্রকৃতি টেনে নিয়ে যান। এই প্রকৃতিই সহায়, এই প্রকৃতিই উপায়—তিনিই কালী।

নব লিখন পদ্ধতি

যোগ যখন মানবাধারে অবতরণ করে, তখন প্রকাশ হয় নিত্য নব নব বিচিত্র সৃষ্টি।

সকল তথাকথিত মিথ্যার মধ্যে যে সত্য আছে, সকল তথাকথিত মায়ার মধ্যে যে সৎ বিরাজমান, সকল ক্ষুদ্রতার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনীয়তা আছে, সকল বিকৃত প্রয়াস ও বাসনার মধ্যে যে শক্তি ও ঈষণা লুক্কায়িত, নূতনযোগের উদ্দেশ্য সেগুলি ফুটাইয়া তুলিয়া ধরা। নূতন যোগ যাহা আছে সে সকলেরই সার্থকতা আনিবে।

নূতন যোগ, যাহা নাই তাহাও সার্থকসৃষ্টিতে পরিণত করিবে। সকলেরই বিশিষ্ট ও সমষ্টিগত সার্থকতা একত্র প্রকটিত হইবে নব যোগ প্রকাশে।

যোগ যখন অর্থসমস্যার মীমাংসা করিতে ছুটিবে তাহা হইবে বিচিত্র ও সার্থক।

যোগ আজ অর্থসমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া পাইয়াছে সঙ্ঘ।

যোগ দেশকে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে পাইয়াছে, অনন্ত বর্দ্ধিষ্ণু সজ্জাবারে।

যোগশিক্ষার সমাধান করিতে গিয়া গ্রাম্য বিদ্যালয় ও বৃক্ষতল, গ্রামসভা ও নবশিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছে।

যোগ যখন রাজনীতির চর্চ্চা আরম্ভ করিবে তাহা হইবে একটী অদ্ভুত রাষ্ট্রবাদ।

* * *

যোগ আজ পাইয়াছে বোধ (Mental Intuition)।

যোগ ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতে যাইয়া সৃষ্টি করিয়াছে নবলিখনপদ্ধতি, যাহা বোধাত্মক (Intuitive Style)।

সাধারণ লিখন পদ্ধতি মানসজ (Intellectual)। ইহা ভিন্ন চৈত্তিক (Emotional)—আত্মিক (Spiritual) লিখনপদ্ধতিও আছে।

ওঁ সাহা ; ওঁ কালী ; ওঁ ফট্, T. S. M. ; S—S. ; এই মন্ত্রগুলির প্রকট অর্থ কিছু না থাকিলেও একটি অব্যক্ত ভাব ইহাদের ভিতর লুক্কায়িত আছে। ইহা আত্মিক জ্ঞানপ্রকাশের ভঙ্গী।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত" ইহা বৈদিক ভঙ্গী।

"যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম।

যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে,

— এবং তৎপরেই অকস্মাৎ—"মন্যে বিদিতম্।"—ইহা বোধাত্মক (Intuitive) ভঙ্গী।

উপনিষদের রচনার মধ্যে ব্যক্ত শৃঙ্খলা সম্বন্ধ নাই—তাহা বোধ দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়।

যাহার বোধশক্তি (Intuition) জাগ্রত হয় নাই, যাহার অন্তর্সাধনা নাই, সে উপনিষদ বুঝিতে পারিবে না।

* * *

সঙ্ঘে সকলেই বিরাট, সকলেই পূর্ণ, সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু সকলে মিলিয়া একটী দেহের ও একটী আত্মার সৃজন করিয়াছে।

অন্তরে মন, চিত্ত, প্রাণ, দেহে সকলের পুরুষ ও প্রকৃতি যেদিন শুদ্ধ হইবে, জ্ঞানোজ্জ্বল হইবে, সেদিন অন্তরে হইবে একটী সঙ্ঘ সৃষ্টি।

* * *

চিদাকাশে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে আবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে এই সকল উঠাপড়ার যোগে একটী তরঙ্গ প্রবাহ।

নবনব চিন্তা আসিতেছে আবার ডুবিতেছে, আবার আসিতেছে এইগুলি পরপর ভাষারূপ দিলে হয় বোধিক সাহিত্য সৃষ্টি।

নব নব স্বতন্ত্র চিত্র পরম্পর আসিয়া বাহিরে সৃজন করিয়াছে সিনেমেটোগ্রাফ।

অন্তরেও আমাদের "বায়স্কোপ" চলিয়াছে।

ডোবা পাহাড় থাকে সমুদ্রে ডুবিয়া।

কিন্তু মাঝে মাঝে (দুই চারিশত মাইল অন্তরেও) যদি একটী একটী শৃঙ্গ থাকে, সেই ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দ্বীপগুলি একটী কাল্পনিক রেখার দ্বারার যোগ করিয়া ঐ পর্ব্বত মালার প্রবাহ রেখাটী অনুমান করিতে পারা যায়।

সমুদ্র নিহিত পর্ব্বত মালায় এই দ্বীপগুলি নবলিখন পদ্ধতির একটী একটী স্বাধীন বাক্য।

সামুদ্রিক দ্বীপগুলি একত্র করিলে হয় একটী পর্ব্বতমালা, ইহাই আমাদের রচনা।

যদি সঙ্ঘের প্রতি ব্যষ্টি হয় বাক্য, সঙ্ঘ আমাদের রচনা। যদি আধারের প্রতি স্তর হয় একটী বাক্য, মানুষ আমাদের রচনা। যদি স্বর্গের প্রতি দেবতা হয় একটী বাক্য, রচনা আমাদের স্বর্গ।

প্রবাসীর পত্র

৩

(পণ্ডিচেরী)

—*—
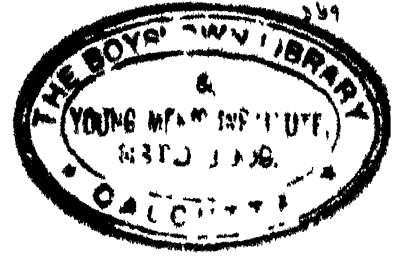
এতদিন আমরা স্থির হয়ে বস্‌তে পারি নাই, একটা এমন কদর্য্যস্থানে আমাদের বাসা নিরূপিত ছিল যে, সে স্থানে ভদ্রলোক বাস করতে পারে না। যাহা হউক এখানকার ভদ্র লোকদের সাহায্যে আমরা একজন খুব অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী আশ্রয় পেয়েছি, এ আশ্রয়টী সম্প্রতি আমাদের আবাসস্থান হয়েছে। এই অবস্থাপন্ন লোকের নাম সামুগাগাম, ইনি এখন পরলোকে। ইঁহার বংশধর পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় সপরিবারে দেশ ভ্রমণে গিয়াছেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ 'ডুপ্লে' সাহেবের মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে তামিল, ফরাসী ও ইংরাজী পুস্তক আছে, এখনও পড়িবার সুবিধা হয় নাই। বাড়ীটী খুব বৃহৎ, ত্রিতলের ছাদে দাঁড়াইলে সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত নয়ন গোচর হয়, সহরের সমস্তই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে বাড়ীতে আছি তার সামনেই বৃহৎ ঘণ্টাঘর, উচ্চে পেড্রোর মন্দিরের মত। প্রতি ঘণ্টা ও অর্দ্ধ ঘণ্টা বাজে, সহরের সকল লোকেই ইহা শুনিতে পায়। সম্মুখেই "grand Bazar," বাজারটী খুব জমকাল, কলিকাতার বড় বাজারের মত। হিন্দুরা মাছ-মাংস বড় একটা খায় না, কিন্তু মাছ মাংস বাজারে এত প্রচুর যে এরূপ ক্ষুদ্র সহরের এত যে আবশ্যক তাহা ধারণায় আনা যায় না।

সহরের প্রান্তভাগে government garden, বাগানটী খুব বড় ও শিবপুরের Botanical garden এর নকলে গঠিত।

একটী Libray আছে, কলিকাতার Imperial Library'র মত। এত ক্ষুদ্র সহরে এত বড় পুস্তকাগার আছে আমার ধারণায় ছিল না। অধিকাংশ পুস্তকই ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী পুস্তক অতি সামান্যই আছে। এখানে freely পুস্তকাদি বাড়ীতে আনিয়া পড়িতে পাওয়া যায়, ঠিকানা ও নাম সহি করিয়া আসিলেই পুস্তক ছাড়িয়া দেয়। আমি দুইখানি পুস্তক আনিয়াছি, একখানি "Female Detective" অন্যখানি "Dick Rodney," বেশ interesting। রাস্তায় জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে, সহরটী নিতান্ত নিন্দার নয়। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাস।

নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি নামক পুস্তকে পায়খানার যে বিবরণ আছে, এখানকার লোকেরা তদনুরূপ পায়খানা নির্ম্মাণ করে। আমরা সহুরে-বাঙ্গালী, পায়খানার এত অসুবিধা তা লিখে জানাবার নয়। বাড়ীর ঈশান কোণে তিন চারি শত হাত দূরে সারি সারি উনুনের মত ধাপ গাঁথা পায়খানা, আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যেমন জননীরা ইট পাতিয়া রাখেন। যে বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে ছিলাম তাহার ব্যবস্থা অন্য প্রকারের, শুনিলাম সাধারণ লোকে ঐরূপ পায়খানাতেই যাওয়া আসা করে, সেটী একটী গাঁথা চৌবাচ্ছা—বিষ্ঠার হ্রদ। সেইখানে সকলে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করে, এমনকি বাড়ীর সক্‌ড়ি জঞ্জাল সমস্তই তাহার ভিতর ফেলা হয়। যখন তাহা পূর্ণ হইয়া উঠে তখন "পারিয়ারা" আসিয়া ক্রয় করিয়া লয়, শুনিলাম চারি আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য হয়, অবশ্য মাল দেখিয়া। বুঝিতেছ পোড়াদেশে বিষ্ঠা ত্যাগের কি কষ্ট!

এখানে ঘোড়ার গাড়ী বড় নেই, যারা খুব বড় লোক কেবল তারাই যা ব্যবহার করে। গাড়ীগুলি ফিটনের মত। গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, এছাড়া "Push" আছে, মানুষে ঠেলিয়া লইয়া যায়, আরোহী ব্রেক ধরিয়া বসিয়া থাকে। বোধ হয় কলিকাতার দুই একজন নান্ এই প্রকার গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ায়। এই প্রকার গাড়ী এখানে অসংখ্য, পাঁচ আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত ইহাদের ভাড়া। এখানে 'ঝাঁকা মুটে' পাওয়া যায় না। ঐ পুশে করিয়া অথবা চাকর দিয়া বাজার করা হয়। এখানকার খাবারের দোকানগুলি হোটেলের মত, ভিতরে গিয়া যাহা আবশ্যক খাইয়া আসিতে হয়। প্রাতঃকালে 'দোসার' (সরুচাক্‌লি) সুজি (মোহনভোগ) ও কাফি পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে একটু চিনি ও লঙ্কার তরকারি দিয়া থাকে। আমরা সুজি খাইয়া থাকি. এক আনায় একজন লোকের বেশ জল খাওয়া হয়। ছানার দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না।

সাধারণ লোকে তামিল ভাষায় কথা কয়, শিক্ষিত ব্যক্তি ফ্রেঞ্চ কয়। ইংরাজী জানা লোক অতি সামান্য। এখানকার লোকেরা বাঙ্গালীদের বেশ ভাল বাসে। এবং এত কথা বলে যে আমাদেরও হারিয়ে দেয়, কাজের বেলা কিন্তু লুকায়। আমি একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খানিকটা গদ চাহিতে গিয়াছিলাম, অনেক কথার পর সে গঁদ আনিতে গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কথা বলিতে আরম্ভ করিল! আমি বেগতিক দেখিয়া গঁদের কথা মনে করাইয়া দিলাম, সে পুনরায় বাড়ীর ভিতর গেল—বহুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল গঁদ ফুরাইয়া গিয়াছে তবে বাজারে চাকর পাঠাইয়াছি আসিল বলিয়া, ঘণ্টাখানেক পরে চাকরের অন্বেষণে বাজারে গিয়া দেখি সে এক মাগী দোকান দারের সহিত রসিকতা করিতেছে। বুঝিলে লোকের আক্কেল?

এখানে এখন বর্ষাকাল। অবিরত বৃষ্টিপাত হইতেছে, আকাশ সদাই মেঘাচ্ছন্ন, সমুদ্র বক্ষ তরঙ্গ সঙ্কুল, প্রবল উত্তর-পূর্ব্ব বাতাসে সব উড়াইয়া দিতেছে। রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই।

পণ্ডিচারী
ডিসেম্বর, ১৯১৯
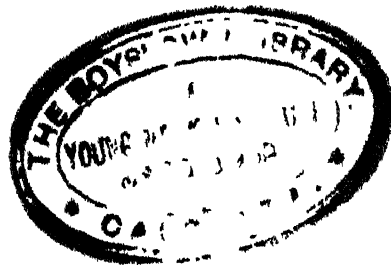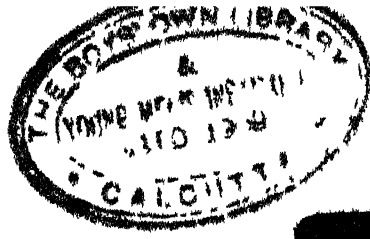
ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই বৈশাখ, ১৩২৮ [অষ্টম সংখ্যা

নব জাগরণ

ভগবান জেগেছেন ? আর স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, তবে আর বিলম্ব কি ? অন্তরায় কি সেই কথাই বলছি।

পনের বছর পূর্ব্বে বিধাতার ডাক বাঙ্গালীর জীবনে নূতন সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল—বাঙ্গালী মায়ের দুয়ারে হাটু গেড়ে সাত কোটী কণ্ঠে চীৎকার করে' উচ্চারণ করেছিল, "বন্দেমাতরম"। সে মন্ত্রের অলৌকিক শক্তি, জাতির জীবনে নূতন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে; বাঙ্গালী উদ্বুদ্ধ, মাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত, বাঙ্গালী দুর্জ্জয় প্রাণশক্তির অহঙ্কারে বিশ্বজয়ে অভিযান করেছে।

যারা একান্তই পাশ্চাত্যের সম্মোহনে অভিভূত, তারা বাংলার এই নবজাগরণের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার লাভেরই সুযোগ সন্ধান করে' এসেছে। ১৯০৭ সালে কলিকাতার জাতীয় মহাসভায় দাদাভাই নৌরোজীর কণ্ঠে অভিভাষণে যেদিন "স্বরাজ"মন্ত্র উচ্চারণ হ'ল, বাংলার নেতৃবৃন্দ সে স্বরাজ রাজনৈতিক আদর্শ বলেই অবধারণ করেছিল, তারপর এই স্বাধীনতা লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে মতভেদ, দলাদলি, কত রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হয়ে গেল; এখনও আদর্শ যে সকলের নিকটেই স্পষ্ট স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে এমন কথা স্পর্দ্ধা করে' বলি না, কিন্তু বাংলার একদল লোক এই স্বদেশীযজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সুবিধা অর্জ্জন নহে, পরন্তু ইহা আত্মসাধনা ও আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেছিল—আমরা তাদের উপলক্ষেই বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করতে পারি।

তারা কারা ? প্লাবনের উত্তাল তরঙ্গ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে যারা কেবল কথার বাণী সৃজন করেছিল—যারা বিগত পঞ্চদশ বর্ষের জাতীয় কঠোর সাধনার অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে' কেবল ইহার গ্লানি ঘোষণা করেছিল - যারা ভীরুতার আবরণে নিজেদের আচ্ছন্ন ক'রে নীতিধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কেবল উপদেশবাণী অনর্গল উদ্গার করেছিল, তারা সেদিনও যেমন দেশাত্মার প্রকৃত বাণী উপলব্ধি করতে পারে নাই, আজও তদ্রূপ এই মহাজাগরণের সত্যবার্ত্তা তাদের নিকট অস্পষ্ট অর্থহীন, দেশ জাতি এই সব অন্ধ নেতৃবৃন্দের অনুসরণ কোন মতেই করতে পারে না।

তারা তবে কারা ? বাংলার গৌরবতর সাধনার সকল অনুষ্ঠান যারা জীবন দিয়ে সার্থক করেছিল,

যারা বহিষ্কার নীতি থেকে আরম্ভ করে' বিপ্লব তরঙ্গের রক্তলীলা পর্য্যন্ত আপন অঙ্গে জড়িয়ে অন্তঃশুদ্ধির আয়োজনেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, যারা এই কঠোর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেছিল—হিংসার জন্য নয়, বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য নয়, কোন বিশিষ্ট ফলপ্রার্থী হয়ে নয়—যারা ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবনে রাজসিকতার রক্তকিরণ প্রজ্জ্বলিত করে' অন্তর্দেবতার অন্বেষণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেছিল—যারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জীবন মৃত্যু, নিন্দা প্রশংসা অভেদ করে' জ্ঞানে অজ্ঞানে দেশের জন্য, জাতির জন্য ধর্ম্মের জন্য, ভগবানের জন্য কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়ন, কত নির্য্যাতন হাসিমুখে বরণ করে' নিয়েছিল—বাংলার ভবিষ্যৎ একান্তই এবার তাদের উপরই নির্ভর করছে।

১৯০৭ সালে জাতীয় আত্মার অলক্ষ্যবাণী আজ ১৯২০ সালে তপস্বী গান্ধীর জীবনে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু এই মহাযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত—সে যে বাঙ্গালী;—এই ব্রত সাধনের সম্পূর্ণ ভার, বিধাতার বরে বাঙ্গালীর মস্তকেই ন্যস্ত হয়েছে—পঞ্চদশ বর্ষের কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ তান্ত্রিকের দলকেই এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।

একদিন দেশ অনুভূত হয়েছিল—"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্"রূপে, মাতৃমহিমা প্রাণ আর মনের দুয়ারেই বাঁধা পড়ে' গিয়েছিল, 'তাই বলেছিলাম "ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে"; সে তালতমাল বনরাজিনীলা সপ্তকোটী কণ্ঠের মঙ্গলসঙ্গীতপূর্ণ সোণার বাংলা কবে রাজরাজেশ্বরী বেশে বীরেন্দ্র কেশরী-পৃষ্ঠে অসুরনিধনতৎপরা, মহামহিমাময়ী জননীরূপে বিরাজ করবেন! জেগেছিল প্রাণেরই উত্তেজনা, মনেরই আবেগ, সাধনা আমাদের ব্যর্থ হয় নাই—প্রাণ আজ শক্তিপূর্ণ—চিত্ত আজ স্থির, কর্ম্মে জীবন ছেয়ে ফেলে নাই, অতীতকে আমরা গ্রাস করেছি—নিজেকে ছাড়িয়ে, দেশকে ছাড়িয়ে, জাতিকে ছাড়িয়ে আমরা ভগবানের আশ্রয় নিয়েছি—বিষ্ণুপাদপদ্মনিঃসৃত ভাগীরথীধারার মত, ভগবানের অঙ্গে আজ মায়ের সত্যরূপ দেখে ধন্য হয়েছি—নূতন পুলকে জীবন স্পন্দিত—বাঙ্গালী নদী তড়াগ গিরি বন উপবন পরিবেষ্টিতা সাগর-মেখলা দেশজননীর দিব্যরূপ সর্ব্বাগ্রে সন্দর্শন কর—তবেই দেশব্রতসাধনের পরম দীক্ষা তোমার সার্থক হবে।

ঘৃণার অতিক্রমেই প্রেমের উৎপত্তি, খণ্ডতার মসী আবরণ উদ্ভিন্ন করতে পারলেই জ্ঞানপ্রকাশ সম্ভব হয়, অক্ষমতার সীমা উল্লঙ্ঘনে শক্তির সন্ধান মিলে, নিজেকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে না পারলে আত্মদর্শন ঘটে না; যে বাঙ্গালী কেবলই এই পনের বছর ধরে'—সীমার পর সীমা অতিক্রম করে' অনন্তের পথে ছুটেছে, বিশ্বের মঙ্গল তার দ্বারাই সম্ভব হবে। যারা কর্ম্মী—তাঁদের সকলবিধ আবছায়া থেকেই মুক্তি পেতে হবে, দেশ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা এমন কি ব্যক্তিগত ভগবানের (Individual God) ছায়াও পরিবর্জ্জন করা চাই, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করে' তুলতে না পারলে সত্যনির্দ্দেশ মূর্ত্ত হয়ে উঠে না।

বাংলায় জাতীয়তার ঢেউ এসেছে—দেশপ্রেমের নূতন বন্যায় বাঙ্গালী আজ অবগাহিত, যারা আজও দেশ ও জাতীয়তার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে নাই—তাদের এই নূতন সাধনা আত্মশুদ্ধির পরম উপযোগী; কিন্তু উৎসর্গমন্ত্রের পুরোহিতবৃন্দ যারা, তাঁদের এই নবযুগে অনেক আগিয়ে যেতে হবে; মঙ্গলপতাকা উড়িয়ে সারি দিয়ে তাঁদের ছুটতে হবে, তা না হলে' নবশক্তি-পূত নবীনের দল রক্তমুখী হয়ে আবার যদি দেশের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়—অনর্থসৃষ্টি অনিবার্য্য হবে; জাতিগত শুদ্ধির উৎকৃষ্ট পন্থার নবাবিষ্কার তাদের চোখের সামনে ধর্‌তে না পারলে অন্তঃপ্রকৃতির কষাঘাতে প্রাণের আগুণে আবার দেশ পুড়ে ছাই হবে—জানি মৃত্যু তার নেই, কিন্তু আর বৃথা কালক্ষয় করে'

সুদিন আগমনের বিলম্বসৃষ্টি নিরর্থক।

ভাগবতনির্দ্দেশ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—সাধক, আবার জিজ্ঞাসা করি—কোথায় তোমার অন্তরায়, কোথায় তুমি বন্ধনগ্রস্ত?

মর্ত্ত্য প্রতিষ্ঠানে এখনও ঊর্দ্ধের দিব্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় নাই—এখনও মাটীর প্রাণ প্রণব ঝঙ্কারে মঞ্জরিত হয়ে উঠে নাই, এখনও রক্ত মাংস মজ্জায়—তুরীয়ের বিদ্যুৎশক্তি অজস্রধারে প্রবাহিত হয় নাই, পদে পদে মাটীর টানে গতি রুদ্ধ হয়ে পড়্ছে, ব্যাধি মৃত্যুর উৎকট বিভীষিকার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে—অর্থ অন্ন জীবন-সাধনার উপকরণরাজি প্রতিকূল স্বভাবাপন্ন, টানিয়া ছিঁড়াইয়া শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় করতে হচ্ছে—ভূত-শুদ্ধি চাই কিন্তু সাধক ইহার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে? এই ভূতশুদ্ধির জন্য এখনও কি নীরব তপস্যার প্রয়োজন আছে? এখনও কি অতীতের আসনেই বজ্রাসনে অবস্থিত করতে হবে? নূতন প্রেরণায় হৃদয় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে—সত্য মিথ্যার প্রমাণ চাহি না, অনুভূতি আমার মিথ্যা নয়—তবে একবার সাড়া চাই—সম্মতি চাই—প্রসন্ন নয়নের একটী দৃষ্টি চাই—বাংলার সাধনক্ষেত্রে বিনা ইন্ধনে হোমানল লক্ষ জিহ্বা বিস্তার করে', জ্বলে উঠল কেন? সহসা এক সঙ্গে লক্ষ শঙ্খ তুমুলনিনাদে দিগ্মণ্ডল প্রতিধ্বনি তুলিল কেন? লক্ষ সাধক একই মুহূর্ত্তে নিমীলিত নয়ন মেলিয়া চাহিল—বাহিরে, ঐ যেখানে জাহ্নবী পূত-প্রবাহে অনন্তকোটী বীচিমালাকে ছুটিয়াছে নাচিয়া নাচিয়া, কিসের প্রতীক্ষায় কাহার অপেক্ষায় এই সচকিত প্রাকৃতিক নিদর্শন?

এই শেষ অতীতের জের মিটিয়ে বাংলা এইবার অবধারিত—নূতনের অভিনন্দন করবে। মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক স্বরাজ আদর্শে বাঙ্গালী এইবার, এই শেষবার আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দেবে—ইহার মধ্যে সংশয়ের ভ্রুকুটী-ভঙ্গী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করছি, আশাভঙ্গে তীব্র রোষ ক্ষোভের কালানল জ্বালিয়ে তোল্বার আয়োজন চল্তে পারে—কে ভারতের ভাগ্যদেবতা। বাংলাকে এইবার যদি রক্ষা করতে পার বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত অভিনব প্রথায়—আত্ম বন্ধনচ্যুত করবার অপূর্ব্ব লীলা তবেই প্রকট হয়ে উঠে।

আমরা আর বাধাকে স্বীকার করে' চলবো না, বাধা আজ ভগবানেরই দেওয়া কর্ম্ম-সিদ্ধির বৃহৎ উপায়, বাধার ভিতর দিয়া অবাধ অতিক্রম আমাদের ধর্ম্ম হোক সাধনা হোক।

আজ সহস্র সন্তান বাধার আঘাতে নিঃশেষ হবার প্রতীক্ষায় আর দাঁড়িয়ে রইল না লক্ষ বিপত্তির সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম ক'রতে ক'রতে তারা এগিয়ে চললো। বিঘ্ন পায়ের চাপেই দলিত হোক, বাঙ্গালীর আর অপেক্ষা করা চলে না।

আত্মমুক্তির শুভ্র পতাকা উড়িয়ে নূতন জাতি বর্ত্তমানের উত্তপ্ত আন্দোলনের পশ্চাতে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে থাক, রক্ত চিহ্নে মঙ্গল নিশান এবার আর লাঞ্ছিত হ'তে দেব না; ঘৃণা বিদ্বেষের গভীর সংস্কার তপঃশক্তি সহায়ে বিদূরিত হোক। গতানুগতিক পন্থায় ভারতের স্বাধীনতা আন্বার প্রচেষ্টা মানুষের বহির্বুদ্ধির লঘু প্রেরণা, ভগবানের বিধান অবধারণ কর—মহাত্মা গান্ধির বাণী ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার আভাষ—অধ্যাত্ম-শক্তির পূর্ণ প্রকাশ বাঙ্গালীর জীবনেই প্রতিফলিত হবে—স্বরাজ আন্বে বাঙ্গালী, সে স্বরাজ্যের আদর্শ এখনও তেমন স্পষ্ট জীবন্ত হ'য়ে উঠে নাই—এবার যদি বাংলায় রক্ত পিপাসা প্রবল হ'য়ে উঠে, বুঝতে হবে ভারতের স্বরাজ লাভের এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে। মহাত্মা গান্ধি ভারতের রাজনীতিক সাধনায় অধিকাংশ অঙ্গভঙ্গী প্রাণ ক'রে দিলেন, এইবার একেবারেই শুদ্ধ অধ্যাত্ম আন্দোলনে সারাদেশ ছেয়ে ফেলতে হবে, বাঙ্গালীকেই

প্রেম।
আনন্দ।

ভক্তি অধম।
প্রেম মধ্যম।
আনন্দ উত্তম।

ভক্তের ভগবান।
প্রেমময় ভগবান।
আনন্দময় ভগবান।

ভক্ত পূজা করে।
প্রেমিক আলিঙ্গন করে।
বালকের রমণ।

প্রাণের শক্তি।
হৃদয়ের প্রেম
আত্মার আনন্দ

ভক্তির শান্তি।
প্রেমের রস
আনন্দের রতি।

শান্তি।
জ্যোতিঃ।
তপঃ

তমঃ—বিজ্ঞানে শান্তি।
রজঃ—বিজ্ঞানে তপঃ।
সত্ত্ব—বিজ্ঞানে জ্যোতিঃ।

নির্গুণো গুণী।

ভগবান নির্গুণ।
ভগবান গুণময়।

মুক্তি।
ভুক্তি।
সিদ্ধি।

অহং হইতে মুক্তি।
দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি।
গুণ হইতে মুক্তি।

প্রাণের ভোগ।
হৃদয়ের ভোগ।
আত্মার ভোগ।
ভাগবত ভোগই লক্ষ্য।

পুরুষের সিদ্ধি।
প্রকৃতির সিদ্ধি।
পুরুষোত্তমের সিদ্ধি
পুরুষোত্তমই লক্ষ্য।

ভগবানে শ্রদ্ধা।
শক্তিতে শ্রদ্ধা।
আত্মায় শ্রদ্ধা।
ভাগবত শ্রদ্ধাই মূল।

পুরুষের জ্ঞান।
প্রকৃতির শক্তি।
পুরুষোত্তমের আনন্দ
আনন্দই মূল।

ধারণা।

ধ্যান।	ধ্যান ফল।
ঐক্য।	ঐক্য বস।
	ঐক্যই তাদাত্ম্য।
ধারণা বীজ।	ঐক্যই যোগের লক্ষ্য।

চাই স্বারাজ্য

স্বরাজ ভাল কথা, কিন্তু স্বারাজ্য আরও ভাল কথা। স্বরাজের জন্য চেষ্টা চলুক, তাহাতে বিন্দুমাত্র ঢিলা দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু সেই সঙ্গেই স্বারাজ্যের বন্দোবস্তটাও ঠিক করিয়া লইতে হইবে। স্বরাজের উদ্দেশ্য বাহিরটা পরিষ্কার করা, সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দেওয়া; কিন্তু সেই সাথে চাই ভিতরটা পরিষ্কার করা, অন্তঃকরণে নূতন প্রেরণা ও অভিনব শক্তি ফুটাইয়া তোলা। ভিতরটা ঠিকমত গড়ন না পাইলে, বাহিরটার শত পরিবর্ত্তনে ওলট পালটে বিশেষ কিছু ফল হইবে না। এ কথাটি আজ কালকার জগৎজোড়া বিপ্লবের মধ্যে আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, জোর করিয়া বলিতে হইবে যে বাহিরের বিধিব্যবস্থার নিয়মকানুনের যতই ভাঙ্গাচুরা গড়াপেটা হউক না কেন, মানুষের স্বভাব যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে সব পণ্ডশ্রম। মানুষের স্বভাবে যদি গলদ থাকিয়া যায়, তবে সে গলদ তাহার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে ফুটিয়া উঠিবেই। পরাধীন অবস্থায় যদি আমাদের প্রকৃতিতে থাকিয়া যায় অশুদ্ধ জিনিস সব, তবে স্বাধীন অবস্থায় আসিলে সে সকল যে ভৌতিক বাজির মত দূর হইয়া যাইবে তাহা কেহ মনে করিবেন না। ইউরোপের দেশ সব দেখুন—সব দেশই ত স্বাধীন। কিন্তু ভিতরের অবস্থা তাদের খুবই কি লোভনীয় বলিয়া বোধ হয়? ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া আমরা অশ্রু ফেলি, সব দোষ দেই পরাধীনতার উপর। কিন্তু স্বাধীন ইংলণ্ডেরই কি অবস্থা, আজ তাহার পরিচয় দিতেছে শ্রমজীবীদের বিদ্রোহ। পরাধীন দেশে দেখি রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ (স্বাধীন দেশে এ সংঘর্ষও আছে), স্বাধীন প্রজাতন্ত্রদেশে দেখি প্রজায় প্রজায় সংঘর্ষ। স্বাধীনতা ও পরাধীনতায় যে তাই বলিয়া কোন পার্থক্য নাই, তাহা নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ দেশের লোকের কাছে সব না হউক অন্তত একটী শ্রেণীর কাছে সুযোগ সুবিধা আনিয়া দেয়, পরাধীন দেশে দেশের কোন লোকই প্রায় সে সুযোগ সুবিধা পায় না। কিন্তু কথা হইতেছে এই স্বাধীন অবস্থায় স্বরাজে এই সুযোগ ও সুবিধার সম্পূর্ণ ফল পাইব তখনই যখন মনের জগতে একটা স্বাধীনতা স্বারাজ্য আমরা স্থাপন করিতে পারিয়াছি। স্বাধীন হইয়াও ইংলণ্ড জর্ম্মণী রুশিয়া ফরাসী আমেরিকা এমন কি জাপান পর্য্যন্ত যে-সব ব্যাধিতে জরজর হইয়া পড়িয়াছে, সে-সকলের হাত এড়াইতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইতে হইবে। বিধান বা শাস্ত্র উল্টাইয়া দিলে যে মনটাও উল্টিয়া অন্য রকম হয়, তা নয়। আর মন যদি অন্যরকম না হয়, তবে ব্যবস্থা বদলাইয়া বদলাইয়া গেলে কিছু হয় না। ইংরাজীতে ইংলণ্ডের ইতিহাস

না পড়িয়া, বাংলায় বাংলার ইতিহাস পড়িলেই তাহাকে জাতীয়শিক্ষা নাম দেওয়া চলে না; সেইরকম সাদা-রাজের পরিবর্ত্তে কালো-রাজ প্রতিষ্ঠা করিলেই যে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা হইবে তাহাও একটা একান্ত ভুল বিশ্বাস।

মহাত্মা গান্ধীর কাছে তাই একটা জিনিষের জন্য আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ। দেশবাসীর কাছে তিনি চাহিতে-ছেন যে অহিংসা, তাহার অর্থ তিনি চাহিতেছেন স্বভা-বের একটা সংযম ও শুদ্ধি। অন্তরাত্মার বল তিনি যে অর্থে গ্রহণ করেন তাহা আমরা হুবহু গ্রহণ না করিতে পারি,—তাঁহার অন্তরাত্মার বল হয়ত শুধু নৈতিক বল, ঠিক আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে হয়ত বলা চলে না—কিন্তু তিনি যে এই গোড়ার কথাটা এমন জোর দিয়া বলিয়াছেন যে আমরা বাহিরের ব্যবস্থা উল্টাইব, বাহিরের শক্তি দিয়া নয়, রাজনীতি-কের ছল বল কৌশল দিয়া নয় কিন্তু অন্তরাত্মার বলে, তীব্র বৈরাগ্যের জোরে, তপস্যার চাপে, ইহাই ভারত-বাসীর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। আর ঠিক এইজন্যই আমা-দের রাজশক্তি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, চেষ্টা করিতেছেন বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সমান স্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যে-শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই শক্তি লইয়া তাঁহাদের সাথে লড়ি ও পরাভূত হই। ভারতবন্ধু ইউরোপীয়েরা পর্য্যন্ত এইজন্য বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। কর্ণেল ওয়েজউড গান্ধীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন ভারতের গোলমাল মিটিবার নয়, কারণ ভারতবর্ষ যে কেবল ইংলণ্ডের হাত হইতে মুক্তি চায় তা নয়, সে ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে চায়। কর্ণেল ওয়েজউড সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন—ভার-তের স্বরাজচেষ্টা শুধু একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, বাহিরের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা নয়, ইহা হইতেছে অন্তরের পরিবর্ত্তনের কথা। প্রাণের জোড়ে দেহের জোরে তর্কবুদ্ধির দাপটে ইউরোপীয় প্রতিভা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াই-তেছে ভারতের অধ্যাত্মপ্রতিভা স্বারাজ্য-শক্তি—মানু-ষের মধ্যে ভগবানের শান্ত সমাহিত অথচ বিপুল অটুট ঈষণা। ভারতের স্বরাজ সাধনার ইহাই মূল কথা।

দুইটি জিনিষের উপর আমাদের বিশেষ দৃষ্টি এখন দিতে হইবে। প্রথম, স্বভাবের পরিবর্ত্তন অর্থে কি বুঝি, অধ্যাত্ম-শক্তি কাহাকে বলি। স্বভাবের পরি-বর্ত্তন অর্থ স্বভাবের আমূল রূপান্তর, অধ্যাত্মশক্তি অর্থ মানুষের নিবিড়তম উদারতম সত্তার ঐশ্বর্য্য। মানুষের আছে দুই রকম স্বভাব, একটা হইতেছে প্রাকৃত স্বভাব আর একটা হইতেছে আত্মিক বা ভাগবত স্বভাব—গীতা যাহাদের নাম দিয়াছেন আসুরী প্রকৃতি আর দৈবী প্রকৃতি। আসুরী প্রকৃতি বা প্রাকৃত স্বভাবটিকেই মানুষের সহজ নিত্যনৈমিত্তিক খুব আপনার বলিয়া বোধ হয় আর বস্তুতঃ আমরা দেখি মানুষ সচরাচর ইহারই দ্বারা পরিচালিত কিন্তু দৈবীপ্রকৃতি বা ভাগবত স্বভাবও মানুষের পক্ষে কম আপনার নয়—বরং এইটিই মানুষের গভীরতম সত্তার মধ্যে আছে, মানুষ ইহাকেও সহজ নিত্যনৈমিত্তিক করিয়া লইতে পারে। তারপর দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, এই দৈবীপ্রকৃতি, ভাগবত স্বভাবে চিনিয়া বুঝিয়া সম্যক উপলব্ধি করিয়া জীবনে ফলাইয়া ধরিতে হইবে—মানুষের প্রত্যেক চিন্তা ভাব ও কর্ম্মের লক্ষ্যই হইবে এই নিবিড়তর ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা। আসুরী প্রকৃতি দিয়া স্বরাজলাভ করা যে যাইতে পারে না তাহা নয়। কিন্তু সে স্বরাজ হইবে আসুরিক-স্বরাজ—তাহাতে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অন্যায় অত্যাচার অভাব দৈন্য থাকিবেই, সেখানে যথার্থ স্বাধীনতা যথার্থ সাম্য যথার্থ ঋদ্ধি স্থান পাইবে না। সেইজন্য আমরা যদি সত্য সত্যই স্বরাজপ্রয়াসী হই কায়েন মনসা বাচা, কেবল উত্তেজনার বশে বা

বাহিরের একটা খোঁচার ফলে নয়—তবে আমাদিগকে স্বরাজ্য পাইতে হইবে অর্থাৎ দৈবী প্রকৃতি ভাগবত স্বভাব পাইতে হইবে। সমস্যার এই একমাত্র খাঁটি সমাধান, আর সব গোঁজামিল—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ পথটি যদি মানুষের অগম্য বলিয়া বিবেচনা কর, যদি বল মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্যসাধন, তবে বুঝিতে হইবে মানুষের কোনই আশা নাই, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সব মায়া মরীচিকা। তবে বলিতে হইবে মানুষের শিক্ষার সাধনার কোন অর্থ নাই, মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য নাই।

মানুষ যে দৈবী প্রকৃতি পাইতে পারে না এ রকম বিশ্বাসের অবশ্য যথেষ্ট হেতু আছে। কারণ ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক, সমষ্টি হিসাবে যখনই মানুষ এ সাধনা করিয়াছে তখনই দেখিতে পাই প্রথম প্রথম একটু আধটু সুফল পাওয়া গেলেও অচিরে যথাপূর্ব্বং তথাপরং হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহের ইতিহাস একটু দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এই যে বিফলতা ইহার কারণ কি আদর্শের মধ্যেই, না সাধনার মধ্যে, উপায়ের মধ্যে? আমরা বলিতে চাই দোষ আদর্শে নাই, দোষ হইতেছে যে পথে চলা হইয়াছে সেইখানে। প্রথমতঃ দৈবীপ্রকৃতিকে যে চাওয়া হইয়াছে তাহা কেবল আসুরীপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া অর্থাৎ আসুরীপ্রকৃতিকে নিগ্রহ করিয়া, কোন রকমে চাপাচুপি দিয়া যে প্রকৃতিটা পাইয়াছি তাহারই নাম দিয়াছি দৈবীপ্রকৃতি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দৈবী প্রকৃতি তাহা নয়, আর শুধু এই টুকু দিয়াই দৈবীপ্রকৃতি পাওয়া যায় না। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? চাপা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়া উপরে উপরে একটা সাত্ত্বিকতা বা সাধুভাব—দৈবীপ্রকৃতির আভাস পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সেটা প্রকৃতি নয়, স্বভাব নয়, সেটা নিয়ম দিয়া আইন কানুন দিয়া প্রকৃতিকে স্বভাবকে বাঁধান মাত্র। দুই রকমে আমরা আসুরী প্রকৃতিকে ঢাকিয়া চাপিয়া রাখিতে পারি, স্বভাবের উপর দৈবী প্রকৃতির একটা ছায়া বা জলুস লাগাইতে পারি। প্রথম, কঠোর ইচ্ছা শক্তির জোরে, তপস্যার তাপে, তীব্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা, শিক্ষার সভ্যতার বলের দ্বারা। দ্বিতীয়, একটা চিত্তাবেগ, ভাবোন্মত্ততার দ্বারা। কিন্তু উভয় পন্থাই অনিশ্চিত। কারণ কোনখানেই আসুরী প্রকৃতির গোপন বীজ নষ্ট হয় নাই, সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়া ফুলিয়া উঠিবে। চাই আসুরী প্রকৃতির রূপান্তর, সমস্ত আধারের একটা নির্ম্মল টলটল শুদ্ধি, উপরতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত একটা প্রসাদগুণাত্মক স্থির সমতা। এ জিনিষ জোর করিয়া হয় না, সহজ ভাবাবেগেও হয় না। এ জন্য চাই নিবিড় জ্ঞানের, অন্তরাত্মার জাগরণের ক্রমবিকাশ, আধারের মধ্যে ক্রমবিস্তার। ইচ্ছা শক্তি ও ভাবাবেগ সহায় হইতে পারে, কিন্তু ও দুটি ছাড়া চাই ভিতরে একটা পূর্ণব্রহ্মের অনুভূতি, এবং তাহারই এগণায় অঙ্গের একটা ধীর রূপান্তর।

যম নিয়ম—অহিংসা অস্তেয় স্বাধ্যায়-দ্বারা নৈতিক মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধু মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন দিব্য মানুষ। দিব্য মানুষের সম্ভাবনা হইবে তখনই যখন মানুষ দাঁড়াইবে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর, পাইবে গীতার "ব্রাহ্মীস্থিতি"। সুস্থ অখণ্ড সহজ স্বাভাবিক মানুষ, অথচ হইয়া উঠিব দিব্য মানুষ—এইরূপ লক্ষ্য হইলে যে সাধনা যে ক্রিয়া যে পথ মানুষকে এক-রোখা একদিকভারী অস্বাভাবিক করিয়া ফেলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনের বা চিত্তের কসরৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে; সমস্ত আধারকে সহজ ছন্দে দুলাইয়া দিতে হইবে, ও সেই ভাবেই

তুলিয়া ধরিতে হইবে একটা উচ্চতর গ্রামে। অর্থাৎ মনের চিত্তের কোন বিশেষ ধারার মধ্যে চালিয়া নয়, অন্তরাত্মার পূর্ণ বিস্ফূর্তির মধ্যে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।

অন্তরাত্মার সিদ্ধি বল, ব্রহ্ম সিদ্ধি বল আর স্বারাজ্য সিদ্ধি বল—আমরা গোড়ার সেই একই জিনিষকে লক্ষ্য করিতেছি। ইহার পথ কি? ইহার কোন বিশেষ পথ নাই, কারণ ইহা আছে সমস্ত জীবনকে ঘিরিয়া, ইহা উপার্জ্জন বা লাভ করিবার বস্তু নয়, ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বিশেষ পথ ধরিয়া, একটা কাটাছাঁটা সাধনার ক্রম ধরিয়া এখানে পৌঁছান যায় না, সমস্ত আধারটিকে পুঁটুলি পাকাইয়া, নিজের সমস্তখানিকে গুটাইয়া ইহার মধ্যে যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবে, সেই ইহাকে পাইবে। এই রকমেই সকলকে এ জিনিষ পাইতে হইবে।

শিশুর স্বাধীনতা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিবার পর হইতেই শিশুর অধীনতার বন্ধন ধীরে-ধীরে একটি একটি করিয়া মুক্ত হইতে থাকে। ক্রমশ সে আহার সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছামত খাইতে চায়, কিন্তু তখনও তাহার আরো-অনেক কাজে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। তখনও চলা-ফিরা উঠা-বসা, স্নান করা, কাপড় পরা ইত্যাদি সকল বিষয়েই শিশু অন্যের সাহায্যের ভিখারী। কিন্তু তাহার এই ভিখারীর ভাব যদি সমস্ত জীবন ধরিয়াই চলে, তবে তাহার ন্যায় বিড়ম্বনা আর কি আছে? তাই সন্তান ৩।৪ বছরের বড় হইলেই যাহাতে নিজের কাজ যতটা সম্ভব নিজেই করিতে পারে, তাহার প্রতি পিতা-মাতা দৃষ্টি ও যত্ন রাখিবেন। কেমন করিয়া খাইতে হয়, তাহা শিশুকে প্রথমে কোন রকমে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তার পর মাতার আহার করার সময়েও শিশু যাহাতে তাঁহার আহারের পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করে, তাহাও দেখিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক কাজ তিন-চার বৎসর বয়স হইতেই নিজে করিতে পারিলে শিশুর আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বর্ত্তমান কালে শিশুর স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। নিজের কাজ নিজের হাতে করাই যে প্রকৃত স্বাধীনতা, এ আদর্শ এখনও আমাদের দেশে তেমন শ্রদ্ধা পায় নাই। শৈশব হইতেই মানুষ যদি এই আদর্শের মধ্যে প্রতি-পালিত হইতে পারে, তবে তাহার মত সৌভাগ্য কয় জনের আছে?

শিশু যখন এই রকম স্বাধীনতার আদর্শের মধ্যে বাড়িয়া উঠে, তখনও কি পৃথিবীতে তাহার আর অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—সব দিকের সব প্রয়োজন মিটাইতে হয়ত মানুষের পক্ষে একেবারে আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীনতাকামী মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার বাহিরের প্রতি মুখাপেক্ষিতা যথাসম্ভব ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন। একজন দার্শনিকের দর্শন-

শাস্ত্রের আলোচনা ত্যাগ করিয়া রন্ধন ও অন্যান্য কার্য্য করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পাচকের আকস্মিক অভাবে যদি দার্শনিকের দক্ষিণ হস্তের কার্য্যের অসুবিধা ঘটে, তবে কি তাঁহাকে নিজের অজ্ঞতার জন্য দুঃখ ও লজ্জা পাইতে হইবে না?

শৈশব হইতেই মানুষ যদি এইরূপ আত্মনির্ভরতার শিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক ভার লঘু হয়। অনতিদূর ভবিষ্যতে এমন দিন কি আসিতে পারে না, যখন মানুষ অর্থের জন্য আর অন্য মানুষের দাসত্ব স্বীকার করিবে না? অর্থের লোভে বা বন্ধনে কোন মানুষ আর অন্য মানুষের কোন কাজে সাহায্য করিবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ থাকাই বর্ব্বরতা বলিয়া গণ্য হইবে। সেই অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রকৃত স্বাধীন মানুষ গড়িবার উদ্যোগ পৃথিবীর নানাস্থানে নানা ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশেও অন্ততঃ একদল লোককে শিশুদের শৈশব হইতেই স্বাধীন ও আত্মনির্ভর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানের আবর্ত্তের মধ্যে সকলে ডুবিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে আমাদের লজ্জা ও দুঃখের সীমা থাকিবে না।

শান্তিনিকেতন, মাঘ, ১৩৩৭

যোগ

অহংবোধের খণ্ডতা অন্ধতা নিরসনের উপায়স্বরূপ আপনাকে উৎসর্গ করা আমাদের স্বভাবধর্ম্ম। প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের সত্তা বিরাট রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আত্মদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপনাকে ছাড়িয়া ছাড়িয়া না চলিলে, আমরা একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারি না, আমাদের সত্য স্বভাব হইতেছে আমি কেবল আমার জন্য নহে, সকলের জন্যই। যে দম্ভের মধ্যে আমরা এই জ্ঞান হারাইয়া ফেলি, যে ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধনে আমরা আপনাকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলি, ত্যাগের মধ্য দিয়া আমাদের সেই ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, স্বার্থের বন্ধন খসিয়া পড়ে, আমরা সেই ভগবানের সহিত এক হইয়া যাই—যে ভগবান সর্ব্বভূতে সমান-ভাবেই অবস্থান করিতেছেন।

সকল মানুষই আপনাকে বিলাইয়া চলিয়াছে—তবে কেহ জ্ঞানে, কেহ অজ্ঞানে। অজ্ঞানী যাহারা, প্রতি পদে তাহারা বিচার করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া চলে, তাহাদের দানের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খাতায় জমাখরচ করে, প্রতিদান না পাইলে ইহারা দুঃখ পায়, ইহারা ত্যাগ করে বাধ্য হইয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে, কিন্তু পদে পদে চক্ষের জল ফেলিতে হইলেও আত্মবিস্মৃতি এ ক্ষেত্রেও অনিবার্য্য। আপনি যে সবখানি নয়—এ জ্ঞান ধীরে ধীরে আসিতে থাকে। জ্ঞানকৃত স্বার্থত্যাগ বড় আনন্দের—ইহাই যোগ, ইহাই সাধনা, এস্থলে প্রতিদান লাভের প্রতীক্ষা নাই, আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিলেই স্ব-কে পাওয়া যাইবে—এ উচ্চ আশায় সাধক কর্ম্মপ্রবৃত্ত হয়। ত্যাগ এখানে ধর্ম্ম, আত্মদর্শনের উৎকৃষ্ট পন্থা।

সমাজ অথবা সংসার-রক্ষার জন্য মানুষের যে ত্যাগ স্বীকার—উহার মূলে আছে প্রবল স্বার্থ। দৈহিক জীবন নির্ব্বাহের জন্য স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের একান্তই

প্রয়োজন আছে—একা একা বাস করা সম্ভব হইলে মানুষ সংসার বা সমাজের বন্ধন উপেক্ষা করিত, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাকে গোষ্ঠিবদ্ধ হইয়া থাকিতেই হইবে, কাজেই তাহার জীবন কেবলমাত্র তাহার করিয়া রাখিলে গোষ্ঠি রক্ষা হয় না, এই নিয়মে মানুষ স্বভাবতই আপনাকে বৃহৎ করিয়া তুলিতেছে। মানসতৃপ্তির জন্যও আমরা অনেক ত্যাগস্বীকার করি, রূপাপরবশ হইয়া অথবা পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা নিবিড় করিয়া তুলিবার জন্যও আমাদিগকে অনেক কিছু ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু প্রকৃত আত্মত্যাগ দেহের বা মনের নয়, উহা আত্মার। অপরের মধ্যে নিজেকে এবং নিজেকে অপরের মধ্যে দেখার শক্তি সাধনা এই ত্যাগশক্তি প্রেম উৎসর্গের বিকাশ হইতেছে চরম পরিণতি।

এই ত্যাগ আত্মলাঞ্ছনা নয়, আত্মউচ্ছেদও নয়—উহা হইতেছে আত্মাকে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করার সাধনা, নিজেকে নিঃশেষ করিয়া নিজেকেই পুষ্ট করিয়া তোলা। যেখানে ত্যাগের মধ্যে আছে একটা গরিমা—অর্থাৎ আমি, সেখানে এই আমির উচ্ছেদ সাধন হয় বলিয়া মানুষ ইহার মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করে, কিন্তু যে দেয় নিজেকেই সার্থক করিতে, তাহার আনন্দের অবধি নাই—জগতে ত্যাগের মহিমা, যে করে তাহার জন্য নয়, উহা ত্যাগ ধর্ম্মেরই বিমল সৌরভ। ত্যাগ তো দুঃখের নয়, আনন্দের পরম আস্বাদ উহাতে আছে, মানুষ আপনাকে অমর করিবার জন্যই আত্মউৎসর্গ করে, মানুষের ইহা স্বভাবধর্ম্ম—আমরা স্বধর্ম্ম ভুলিয়াছি, সেইজন্য যখন কেহ আপনাকে ছাড়িয়া চলে তখন আমরা বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে তাহার জয় ঘোষণা করি—কিন্তু কে কোথায় ত্যাগধর্ম্মে নিঃস্ব হইয়াছে, আপনাকে বৃহৎ করিয়া তোলার ইহাই কি একমাত্র পথ নয়?

আমরা ত্যাগ করিব কি? জীবন—উহা অপরিত্যাজ্য, মন—অসম্ভব, বুদ্ধি—না; আমরা ত্যাগ করিব বাসনা, দুঃখ, আসক্তি, দ্বন্দ্ব। ইহার জন্য চাই উৎসর্গ—জীবনবেদীর উপর যজ্ঞানল প্রজ্বলিত কর, সর্ব্বস্ব আহুতিস্বরূপ ঢালিয়া দাও, এই মহাযজ্ঞের ফল আত্মদর্শন।

আমরা যাহা করি, যাহা খাই, যাহা ভাবি, সমুদয়ই উৎসর্গ করিতে হইবে ভগবানের নিকট; আমাদের প্রতি কর্ম্মটি, শ্বাস প্রশ্বাসটী, হৃদয়ের পর্য্যন্ত ভগবানের—এইরূপ জ্ঞানে অবস্থান করিতে হইবে। কর্ম্ম উৎসর্গ কর, কর্ম্মচিন্তা উৎসর্গ কর, কর্ম্মশক্তি পর্য্যন্ত ভগবানের চরণে ঢালিয়া দাও—তোমার বলিতে কিছু রাখিও না, সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ং তোমার জীবন পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন।

এই উৎসর্গযজ্ঞের জন্য তোমার কোন অনুষ্ঠান উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে না, জীবনের কর্ম্মগুলিই হবিঃস্বরূপ আহুতি দাও—মহতী ভাগবত ইচ্ছা তোমার মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠুক। এই উৎসর্গযজ্ঞের ভিতর দিয়া হৃদয় প্রেমাপ্লুত হইবে, বুদ্ধি আলোকোদ্ভাসিত হইবে।

কাহাকে উৎসর্গ করিতেছ, গৃহীতা কে? এই বিষয় লইয়া সাধকের একটা দ্বন্দ্ব আসে। কিন্তু যেমন উৎসর্গের সামগ্রী বিচার তোমার নাই, তদ্রূপ গৃহীতা সম্বন্ধে কোন বিশেষ ধারণা রাখিও না তোমার সুবিধার জন্য কোন কাল্পনিক ভগবান সৃজন করিয়া বন্ধনের গ্রন্থী সুদৃঢ় করিয়া লাভ নাই। ভগবান আছেন তোমার আত্মদান তিনি ব্যর্থ করিবেন না—তুমি কেবল দিয়া যাও—যেদিন শূন্য হইতে পারিবে, হৃদয়কে সংস্কারমুক্ত করিতে পারিবে সেদিন ভগবানের সত্য রূপটী স্বতই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

ভগবান সর্ব্বত্রে ব্যক্ত তিনি জগতে এবং এখনও যাহা অব্যক্ত আছে তাহাও তিনি। যোগ একটা কল্পনামাত্র নয়, চিন্তারাশি নয়, কোন বিশেষ দার্শনিক

থাক্‌তে কেউ পারবে না। যাহা হউক এখানে আসিয়া অবধি নদী জলে স্নান করিতে পাই নাই, একদিন মাত্র সমুদ্রজলে ও আর সব দিন কুয়ার জলে স্নান করিয়াছিলাম। রাস্তার দুইধারে গ্রামবাসীদের কুটীর, পুরুষ রমনী কোলের শিশুরা অবধি আমাদের দেখিয়া পরম কৌতুহলাক্রান্ত, যেন আমরা এক অভিনব জীব। আমরা এক নাতি উচ্চ স্থানে আসিয়া দেখিলাম এক প্রশান্ত তটিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের প্রান্তভাগ বিধৌত করতঃ সমুদ্র অভিমুখে ছুটিয়াছে। হিন্দুরা ইহাকে বরাহ নদ বলে। অনেকখানি বালির চড়া অতিক্রম করিয়া আমরা জলের নিকট উপস্থিত হইলাম। নদীর পরপারে রাখালেরা মহিষ চরাইতেছে এপার হইতে একটা মহিষের পাল চলিয়া চলিয়া নদী পার হইয়া গেল, বুঝিলাম নদী গভীর নহে। দূরে তরুলতা সমাকীর্ণ সুন্দর বনভূমি। একখানি কাপড়, একে একে স্নান করিতে হইবে; আমি সেই অবসরে সেই বনভূমিতে প্রবেশ করিলাম, সঙ্গে একজন টিক্‌টিকি পুলিশ। দেখিলাম ছোট ছোট ঝাউগাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই বনভূমি অতিক্রম করিয়া একটা মাঠে গিয়া পড়িলাম। সেটা চীনের বাদামের ক্ষেত, সারি সারি মেয়েরা একমনে বাদাম তুলিতেছে। সকলেরই গায়ে কোর্ত্তা, কপালে কেউবা সিন্দুরের ফোঁটা, কেউবা বিভূতির ফোঁটা, আবার কেউবা কাল ভূষার ফোঁটা পরিয়া। আমায় দেখিয়া সকলে কৌতুহলাক্রান্ত দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিল, তারপর একজন আমার সেই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল, কে এ? চন্দননগরের মেম্বর? আমার সঙ্গী "হাঁ তাহাই" বলিয়া উত্তর দিল। এই সময়ে আমার অপরাপর বন্ধুরা আসিয়া স্নানের জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি কাপড় বদলাইয়া স্নান করিতে নামিলাম, আমার সেই সঙ্গী সেই স্থানের প্রথামত সামান্য মাত্র একখণ্ড কানি খুন্‌সিতে বাঁধিয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই জলে নামিয়া পড়িল। নদীর অনেক দূর যাইয়াও ডুবন জল পাইলাম না, জল কিন্তু খুব ঠাণ্ডা, যাহোক করিয়া অবগাহন স্নান করিলাম। স্নানান্তে আয়ারের বাটীতে পৌঁছিলাম। পরিশ্রান্ত টিক্‌টিকি পুলিশের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া, তাহাকে আমার সঙ্গে বৃথা ঘুরিতে নিষেধ করিলাম। আমি ভিলনুরের আবশ্যকীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া পুনরায় প্রবাসে ফিরিয়া যাইব এবং যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইবই, একথাও জানাইলাম। সে সস্মিত মুখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলে আমি বাড়ীর মধ্যে আহারের জন্য প্রবেশ করিলাম।

পণ্ডিচেরী
ডিসেম্বর, ১৯১১ } শ্রী—

হাজির!

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

হঠাৎ চীৎকার করিয়া কেহ উত্তর দিল—"হাজির!" কাহাকেও ডাকিতে শুনি নাই, তথাপি অতি করুণ ভক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে উত্তর শুনিলাম—"কি আজ্ঞা প্রভু?" কে তোমার প্রভু, কাহার হুকুমে তুমি এরূপ উদ্বীপ্ত হইবে?

কি আশ্চর্য্য! একটি কথাতেই জীবনের সমস্ত স্তরগুলি আলোড়িত হইল! সুপ্তস্মৃতি আজ জাগরিত,—যাহা অশব্দ, আজ তাহা শব্দায়মান; যাহা

বুদ্ধির অগম্য ছিল, আজ তাহা অর্থযুক্ত হইল

এখন বুঝিতে পারিতেছি বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে। মনে করিতাম আমার ইচ্ছাতেই সব হইয়াছে। আমি কি এক? একটু মন স্থির করিলেই দুইএর মধ্যে যে সর্ব্বদা কথা চলিতেছে তাহা শুনিতে পাই, ইহারাই আমাকে চালাইতেছে। এদের মধ্যে কুমতি ত আমি, সুমতি তবে কে?

এ সম্বন্ধে ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কোনদিনও লিখতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমেই অজ্ঞাতে 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম, পরে লিখাইল 'উদ্ভিদ জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়া মাত্র।' জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না, কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না। ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি ইহার কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা?' জবাব দিলাম যে-সব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন আমি সে সব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাঁহাদের অসংখ্য কলকারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই, অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব? ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যে সব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি হইল এবং বিলাতের সম্বর্দ্ধনা-সভায় নিমন্ত্রিত হইলাম। খ্যাত বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম র‍্যাম্‌সে বহু সাধুবাদ করিলেন, পরে বলিলেন—"কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞানযুগ আরম্ভ হইল, কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" সেদিনে বোধ হয় আমার উপর কুমতিরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে, কারণ স্পর্দ্ধার সহিতই উত্তর দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম,—আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষিত করিবে। এখন সেদিন আসিয়াছে, যাহা কুমতি বলিয়া ভয় করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহাই সুমতি। তখনকার শুভলগ্ন পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল. একদিনের পর আর-একদিন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং সম্মুখের সমস্ত পথগুলিই খুলিয়া গেল।

এমন সময় যে হুকুম আসিল তাহাতে সোজা পথ ছাড়িয়া দুর্গম অনির্দ্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল। তখন জীবহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম, দেখিতে পাইয়াছিলাম, কলের সাড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারম্ভেই পরীক্ষণ শ্রেয়, কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়া যায়। অমনি ভিতরকার সমালোচক বলিয়া উঠিল— 'কল কি মানুষ, যে ক্লান্ত হইবে?'

কলে কেন ক্লান্তি হয়?—এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল, সে সব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্পাধিক-কালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। এইরূপে বহুস্থ

মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের হস্তে এই সব নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থাবস্থা-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া আসিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। রয়াল সোসাইটিতে সব পরীক্ষা দেখাইয়াছিলাম। সর্ব্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ বার্ডন্ সেণ্ডারসন্ বলিলেন—"জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্ব্বে নিষ্ফল হইয়াছে, সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য; এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার-চর্চ্চা হইয়াছে; আপনি পদার্থ-বিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন, আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন।" তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম—নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার, আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম; আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই সত্য; ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

এই কুমতির ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। সব দিকের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত আলো যেন অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্তরের ক্ষীণ আলো অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল; প্রখর আলোকে যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহা দেখিতে পাইলাম। আশা ও নিরাশার অতীত এই ভাবে বিশ বৎসর কাটিল।

এক বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ যেন নির্দেশ শুনিতে পাইলাম—"বিদেশ যাও"। বিদেশ যাত্রা! সেখানে কে আমার কথা শুনিবে? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম—"আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল! ভালামন্দ বলিবার তুমি কে?" আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

তারপর সমস্ত দিকের রুদ্ধ দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। কাহার হুকুমে এরূপ হইল? এ কি স্বপ্ন? বিরোধী যাহারা ছিলেন, এখন তাঁহারাই পরম মিত্র হইলেন; যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, এখন তাহা সর্ব্বত্র গৃহীত হইল। বিশ বৎসর আগে যাহা কুমতি মনে করিয়াছিলাম, পুনরায় দেখিতে পাইলাম তাহাই সুমতি।

সুতরাং কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা কুমতি জানি না; কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট তাহাও মন বোঝে না। সুদিনের বৃহৎ সফলতা ভুলিয়া দুর্দ্দিনের বিফলতার কথাই মনে পড়িতেছে; তখন সর্ব্বত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম, কেবল দুএকজনের অহেতুক স্নেহ আমাকে আগুলিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহারা অন্ধকার যবনিকার পরপারে। অস্ফুট ক্রন্দন কি সেথায় পৌঁছিয়া থাকে?

জীবনের যখন পূর্ণশক্তি, তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি। তবে বলিবার কি আছে? কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা কুমতি এই ধন্দাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমার পদপ্রান্তে লুন্ঠিত সে কেবল বলিবে—"আসামী হাজির!"

—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২
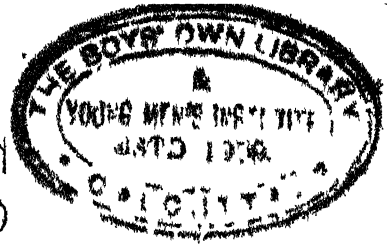
করে, উপলব্ধি করে সে নিজেও ইহলোকেই হয় "প্রকাশবান্" বিশুদ্ধ সত্ত্ব—সর্ব্বলোকজয়ী।"

পরদিন প্রাতঃকালে সত্যকাম গাভী সকল লইয়া চলিল। সন্ধ্যা হইল যেখানে সেইখানে থামিয়া তাহাদিগকে বাঁধিল; সমিধ আহরণ করিয়া অগ্নি জ্বালাইল ও সম্মুখে আসন করিয়া বসিল। হঠাৎ সত্যকাম শুনিতে পাইল অগ্নি তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, "সত্যকাম!" সত্যকামও নিষ্ঠাভরে উত্তর করিল, "আজ্ঞা করুন।" অগ্নি বলিল "ব্রহ্মের আর এক ভাগ সম্বন্ধে তোমাকে আমি জ্ঞান দিব, শুন।" সত্যকাম সেইভাবেই উত্তর করিল, "বলুন, গুরুদেব।" অগ্নি বলিতে আরম্ভ করিল—"পৃথিবী সমুদ্র অন্তরীক্ষ স্বর্গ, ইহারা হইতেছে ব্রহ্মের আর একটি ভাগের চারি কলা। এই চারি কলা লইয়া ব্রহ্মের অনন্ত সত্তা। ইহারা ব্রহ্মের বিভূতি, ইহারা জ্ঞাপন করিতেছে ব্রহ্মের শেষ নাই সীমা নাই—ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাম "অনন্তময়।" অনন্ত সত্তারূপে যে এই অনন্তময়ের চারি অঙ্গ আরাধনা করে, উপলব্ধি করে, সে নিজেও ইহলোকেই হয় অনন্তময়, অনন্তসত্ত সর্ব্বলোকজয়ী।"

পরদিন প্রাতঃকালে সত্যকাম আবার গাভী সকল লইয়া চলিল। আবার সন্ধ্যা হইল যেখানে সেইখানে তাহাদিগকে বাঁধিল; সমিধ আহরণ করিয়া অগ্নি জ্বালাইল ও সম্মুখে আসন করিয়া বসিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটি হংস উড়িয়া আসিয়া সত্যকামকে অভিবাদন করিল, "সত্যকাম!" —সত্যকাম একইভাবে নিষ্ঠা সহকারে উত্তর করিল, "আজ্ঞা করুন।" হংস বলিল, "সত্যকাম, ব্রহ্মের আরও এক ভাগ সম্বন্ধে তোমায় আমি জ্ঞান দিব, শুন।" সত্যকাম উত্তর করিল, "বলুন গুরুদেব।" হংস বলিতে লাগিল, "অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র সূর্য্য, ইহারা হইতেছে এই ভাগের চারি কলা। এই চারি কলা লইয়া ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, ব্রহ্ম যে জ্ঞান-স্বরূপ, তাই ব্রহ্মের তৃতীয় নাম—জ্যোতিষ্মান্। জ্ঞানময়-সত্তারূপে এই জ্যোতিষ্মানের চারি কলা যে আরাধনা করে, উপলব্ধি করে, সে নিজেও ইহলোকেই হয় জ্যোতিষ্মান, জ্ঞানময়—সর্ব্বলোকজয়ী।"

চতুর্থ দিনেও প্রাতঃকালে সত্যকাম গাভী সকল লইয়া চলিল, সেই রকমেই চলিতে চলিতে যেখানে সন্ধ্যা হইল সেইখানে তাহাদিগকে বাঁধিল; সমিধ আহরণ করিয়া অগ্নি জ্বালাইল ও সম্মুখে আসন করিয়া বসিল। আজও একটি পানিকৌড়ি আসিয়া সত্যকামকে অভিবাদন করিল, বলিল—সত্যকাম, ব্রহ্মের অবশিষ্ট ভাগ সম্বন্ধে তোমায় আমি জ্ঞান দিব, শুন।" সত্যকামও উত্তর করিল, "বলুন গুরুদেব।" পানিকৌড়িটি বলিতে লাগিল, "প্রাণশক্তি চক্ষু কর্ণ মন এই চারি কলা লইয়া ব্রহ্মের কর্ম্মময় সত্তা। ব্রহ্ম যে শক্তি স্বরূপ, তাহার চাই ক্ষেত্র, প্রতিষ্ঠান—ব্রহ্মের চতুর্থ ও শেষ নাম "আয়তনবান।" কর্ম্মময় সত্তারূপে এই "আয়তনবানের" চারি কলা যে আরাধনা করে উপলব্ধি করে সে নিজেও ইহলোকেই হয় আয়তনবান সিদ্ধকর্ম্মী—সর্ব্বলোকজয়ী।"

অবশেষে সত্যকাম আচার্য্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌতম ঋষি তাহার দিকে তাকাইয়াই বলিলেন, "সত্যকাম! তোমাকে যে ব্রহ্মজ্ঞের মত দেখাইতেছে, কে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে?" সত্যকাম নিবেদন করিল, "গুরুদেব, মানুষের কাছে আমার এ শিক্ষা হয় নাই। আমার শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ, আপনি পূর্ণ করিয়া দিবেন।"

আদেশ

(অরোর কথা)

তোমরা আদেশ বল কাকে ? তাহা কি রকমে হয় ?

তখন কম্মযোগিন মামলা—প্রশ্ন উঠিয়াছিল, পূর্ব্ববৎ রাজনৈতিক জীবন, না ভারতের সাধনরহস্য ? কোন বুদ্ধি বিবেচনা করিলাম না—আদেশ পাইয়াছিলাম—Go to Chandernagore. কেন, কি সম্বন্ধে কিছুই বুঝি নাই। পরক্ষণেই শুনিয়াছিলাম। The same thing with Pondicherry coming. এরূপ আকাশবাণী খুব rare জিনিষ। কিন্তু আদেশ miracle নয়।

আদেশ পাইয়াছিলেন—মহম্মদ—স্বর্গে উঠিয়া। তাহাতে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না। সমস্ত জগতে ধর্ম্ম স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত জগতের জন্য নয়, একটা বৃহৎ সমষ্টির জন্যই ছিল তাঁহার প্রকৃত আদেশ। বলিতে হইবে, তাঁহার অহঙ্কারই তাঁহার সত্যকে magnify করিয়া দেখাইয়াছিল।

সেদিন যখন তিলকের পতন হইল, গান্ধীর উদয় হইল—স্পষ্ট দর্শন করিলাম এটা গান্ধীর hour এবং আমার hour নয়। গান্ধী যাহা করিতে আসিয়াছেন, তাহা করিবেন, এখন তাঁহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। তিনি যাহা পান, তাহাতে নিঃসংশয় বিশ্বাস। যদি failও করেন, তবু তাঁহার যাহা contribution তাহা দিয়া যাইবেন, তাহা দেশের destiny যথেষ্ট ফিরাইয়া দিবেই। সেই রকম Napoleon—বড় বিভূতি, কিন্তু কত ভুল।

এক আদেশ আসে—কোনও বৃহৎ movement-এর জন্য। এক আসে, নিজের জন্য। কাজের আদেশ। হওয়ার আদেশ।

আমার, supramental এতে মানুষকে জীবনকে তোলাই হচ্ছে mission. জানি না ইহা সকল মানুষ, সমস্ত জগতের জন্য হইবে কি না। সেই আমার আশা, সেই আমার উৎসাহ ও উদ্যম—কিন্তু ভগবানের যাহা will হইবে তাহাই লইব।

দেখিয়াছি, আদেশ genuine এবং imitation অনেক রকমের হয়। ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি কতকগুলা আসে উপর হইতে—clear imperative—তাহা না করিয়া থাকিবার যো থাকে না—জীবনের বড় বড় decisive movement এর সময়ে ইহাই আমাকে চালাইত। Psychic Inspiration ও আসিত—অনেকগুলাই মনের stuff এ মেশান। তার পর আর এক রকম আছে—psychic impulsion, ইহারও যাহা উপরের, তাহাই imperative—অবশ্য ও অনিবার্য্য। বাকী অধিকাংশ—psychical world এর আশ পাশ চারিদিক হইতে আসে। হয়ত, কতকগুলা সত্য, কিন্তু অন্যের জন্য, আমার জন্য নয়। যেমন—নন-কো-অপারেশন movement সম্বন্ধে আদেশ যদি এইবার এই movement এর যুগ, আমি এই অর্দ্ধাংশটুকুই পাইতাম—বাকী অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ ইহাতে আমার contribution কিছু নাই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে না বুঝিতাম—সে আদেশ, যাহা অপরের জন্য meant, তাহা আমার বলিয়া বিভ্রমে পড়িতে হইত। এইরূপ নানা প্রকার—psychical বাণী, message, ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়—সকলগুলা সত্য নয়, অনেকগুলা মিথ্যা সত্য মিশান, অনেক অন্যের জন্য। খুব স্বচ্ছ যোগস্থ হইয়া distinguish করিতে হয়—কারণ অনেক সূক্ষ্ম beings ও forces সূক্ষ্ম জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহারা আমাদের স্থূল জগতের ব্যাপারগুলো interested—তাহারা কত কি message, indication পাঠাইতে পারে। হয়ত

ইন্দ্রিয়ের উপর চাপাইয়া, আরোপ করিয়া চালাইয়া দেয়—কিন্তু তাহাতে tranformation হয় না। তাবে যাহা পায়, জগতের actionএ মানিতে তাহাদের গোলমাল হইয়া যাইবে—কেন না জগতের action এ যাবৎ অন্য ধর্ম্ম অন্য lawই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে প্রকৃষ্ট ভাবে, বিজয়ী ভাবে ফিরাইবার শক্তি তাহার নাই। সে শক্তি উৎপন্ন হয়—উপরে উঠিলে—supramentalএ—যাহা ভগবানের higher manifestation—নিম্ন প্রকৃতির সত্য ও আসল স্বরূপ যেখানে।

Supramentalএ ঠিক উঠা না পর্য্যন্ত—intuitive mentality ফুটিয়া উঠিতে পারে—উঠে। খুব perfect intuitive mind হইলে, তাহা অনেকখানি নির্দোষ ও সম্পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মক্ষম—কিন্তু man, as it is, mental stuffএর উপরের জিনিষকে lightকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাতে ভয় নাই। আমরা কেহই এখনও supramentalএ পূর্ণভাবে উঠি নাই, বাস করিতে পারি নাই। তবে আমাদের এবার, এ যুগে এই dwelling in truthই করিতে হইবে। Living from truth এ'ও ভুল সম্ভব—কেন না, উপরের সত্য ঠিক; কিন্তু জগতের যে অসম্পূর্ণ materialএর উপর, দেহ, প্রাণ, মনের উপর তাহার প্রয়োগ ও খেলা, তাহাতে সে সত্য বিচ্ছুরিত, dilute, তরলীকৃত, হয়ত বিকৃতই হইয়া যাইতে পারে। জগতের উপর পূর্ণ, অভ্রান্ত ও অব্যর্থ ভাবে কার্য্যকরী যে সত্য—সেই সত্যে উঠিয়া, সেইখানেই বাস করিতে হইবে, সেইখানেই সমস্ত তুলিয়া লইয়া transfigure করিয়া লইতে হইবে। We must live in Truth—বিজ্ঞানে। Mind of intuition খুব perfect হইলেও বড় জোর তাহা mind of ignoranceকে ছাড়াইয়া mind of self-forgetful knowledgeএ উঠে। Mind of ignorance—কিছুই জানে না—সব জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে—বাহির হইতে। Mind of self-forgetful knowledge—truth ভিতরে আছে অনুভব করিতেছে কিন্তু তাহাকে পায় নাই—অন্ধকার ঘরে যেন প্রদীপ জ্বালিয়া একটা একটা ভিতর হইতে আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া ধরিতেছে দেখিতেছে। Mind of knowledgeও আছে—তাহা বিদ্যুতালোক পূর্ণ ঘর—তবে সব বস্তুর উপর মনোনিবেশ নাই, তাই সব জ্ঞানগোচর হইয়া নাই। ইচ্ছা মাত্র, চোখ ফিরাইয়া ধরিলেই সহজে, with ease and command সব সত্য জানা ও পাওয়া যায়। যেমন রামকৃষ্ণের ছিল—জগতের সকল জ্ঞানের উপর একটা divine command ছিল—ইচ্ছা মাত্র, মায়ের ইঙ্গিত মাত্র সমস্ত জানিতে পারিতেন।

আমাদের লক্ষ্য—mind of knowledgeকেও ছাড়াইয়া একেবারে Super-mind—above mind এ উঠা—যাহাকে বলা যায় divine mind—supramental knowledge—তাই দিয়া সমস্ত being—দেহ পর্য্যন্ত শুধু intuitivise নয়, supramentalise করিয়া লইতে হইবে।

উহার জন্য দরকার—একটা largeness, wideness এবং openness to the higher light. মনের উপর ভিতর হইতে আলো আসিয়া লুটিয়া পড়িতেছে,—বাঙ্গালীর, আমাদের highly developed চমৎকার intuitive মনে—কিন্তু এখানেও tightly ও rigidly hold করা নয়। কারণ সত্য খুব সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বস্তু, দৃঢ়মুঠায় হাঁপাইয়া উঠে—* * * ঐরূপ জোরে, rigidly সব truthকে ধরিতে চায়—অনেক কিছু miss করে। Sincerely সব সত্য বুঝিয়া লইতে হইবে, কিন্তু মনের দরজা যেন খোলা থাকে—নূতন সত্য আসিয়াই সহজে বিনা বাধায় light প্রক্ষেপে

প্রবেশ করিতে পারে। এই ভাবেই সত্যের মুখ চাহিয়া আলো হইতে উদারতর দীপ্যতর আলোকে চলিতে হইবে।

হয়ত, কর্ম্মবেগ একটু মন্দা, তুলনায়, অপেক্ষাকৃত—হইলেও হইতে পারে। ক্ষতি নাই—সত্য আরও বড় শক্তি, স্থির ও স্থায়ী কর্ম্মের উৎস। Action বন্ধ করিতে বলিতেছি না—তবে সকল কর্ম্ম ছাড়াইয়া থাকিবার -action-less পরিপূর্ণ passivity'র capacity ও থাকা চাই। কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ ......।

মত ও পথ

—:০:—

"সবুজপত্রে" উড়ো-চিঠির লেখক লিখিতেছেন :—

"আমরা আমাদের দেশকে ঐশ্বর্য্য সম্পদে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এর মানে অবশ্য এই নয় যে, দেশের মাটী ঐশ্বর্য্য সম্পদে গৌরবশালী হয়ে উঠবে—তার মানে দেশের মানুষই সত্যি সত্যি উক্তরূপ বিশেষণে বিভূষিত হয়ে উঠবে। দেশকে মাতৃমূর্ত্তিতে গড়ে সামাজিক জীবের মনে প্রাণে emotion জাগান সুবিধা হতে পারে এবং জীবন্মৃত জাতির পক্ষে যে সেটার একটা মস্ত দরকার তাও স্পষ্ট, কিন্তু দেশ মানে যে মানুষ এ কথা political economy র সময় মনে না রাখলে লাভের সম্ভাবনা ভগ্গা রম্ভা। সুতরাং দাঁড়াল এই, দেশ ঐশ্বর্য্য সম্পদে পূর্ণ হয়ে উঠবে, মানে দেশের লোকেরা ধন দৌলত অর্জ্জন ও উপার্জ্জন করবে, তার অর্থ সেটা তারা বর্জ্জন করবে না। কিন্তু বৈরাগ্যের প্রধান ও প্রথম সূত্রই হচ্ছে ঐ সব অনিত্য বস্তুকে বর্জ্জন করে চলা। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ দেশের ধন দৌলতের সঙ্গে মানুষের বৈরাগ্য ভাবের কোনই সম্বন্ধ নেই—ওর একটা আর একটার ঘোর বিরোধী।

এখন মানুষ যদি ধন দৌলত যশ গৌরব অর্জ্জন করতে চায় তবে তার জন্যে তার চাই সত্য আকাঙ্খা। এটার বোধ হয় বিশেষ ব্যাখ্যা তোমার কাছে দিতে হবে না। মানুষের আকাঙ্খার সঙ্গে যে তার কর্ম্ম প্রেরণার বিশেষ যোগ আছে সেটা ত সবার কাছেই স্পষ্ট। যে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের সত্য আকাঙ্ক্ষা নেই সে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের কর্ম্ম প্রেরণা সত্যভাবে নিয়োজিত হতে পারে না। সত্য-আকাঙ্খা বলতে আমি বুঝি মানুষের আত্মাই বল - বা তার deeper selfই বল বা তার higher consciousnessই বল তারই সত্য— এবং মানুষের জীবনে সেই সত্যই বিকশিত হতে হতে চলেছে—মানুষের চিন্তা কর্ম্ম ধর্ম্ম সেই সত্যেরই বর্ণে ও গন্ধে ফুটে উঠছে, সেই সত্যেরই সুরে ও তালে বেজে উঠছে—মানুষের জীবন সেই সত্যেরই একটা সাকার রূপ।

উপরের ঐ কথা যদি মান, তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশের লোকের আত্মায় তার deeper self-এ যদি বৈরাগ্যই, অর্থাৎ বিষয় বিতৃষ্ণাই সত্য হয়ে থাকে, তবে তার কর্ম্ম প্রেরণা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-গৌরবের সংস্পর্শে আনন্দ লাভ করবে না—সে প্রচেষ্টা তখন তার হবে একটা Superficial

impulse—তাতে থাকবে তার বেদনা, কেননা সেটা তখন তার স্বধর্ম্ম নয়—পরধর্ম্ম। এবং আমাদের পরধর্ম্ম অন্যের স্বধর্ম্মের কাছে পদে পদে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হতে বাধ্য। ভারতবাসীর অসত্য আকাঙ্খা ইংলণ্ডবাসীর সত্য আকাঙ্খার সামনে যুগে যুগে মাথা নীচু করে' থাক্‌বে।

সুতরাং দেশবাসীর সম্মুখে থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত কর্‌তে হবে এবং তাদের অন্তরাত্মায় বস্তুর বিষয়ের ভোগের আনন্দকে সত্য করে' তুলতে হবে, তবেই তাদের কর্ম্মপ্রেরণার সত্য প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে, সেদিকে আনন্দের ভিতর দিয়ে—কেননা অন্তরাত্মার যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ। আর তবেই তা সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে কেননা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সৃষ্টি সফল হয়ে আছে, তার কারণ তা আনন্দে উৎসৃষ্ট হয় আনন্দ থেকেই আনন্দেই যাচ্ছে সব কিছুরই আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই গতি"।

বৈশাখের "ভারতী"তে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় লিখিতেছেন—"বাংলার শিক্ষিত Aristocracy ছাড়ুখোর খাকি-পরিহিত মহাত্মা গান্ধিকে ঠিক মনের সঙ্গে বরণ করতে পারেন নি প্রমাণ সবুজ পত্র ··।" আমরা উপরে সবুজ পত্রের খানিকটা উদ্ধৃত করিয়াছি—ঠিক ঐ কথা গুলিই বাগচী মহাশয়ের লক্ষ্য কি না, জানি না, তবে গান্ধি মহারাজের একদিকে ব্যক্তিগত ধর্ম্মে যে ঘোর ত্যাগের বৈরাগ্যের দরিদ্রতার কৌপীনবস্ত্র সন্ন্যাসের আদর্শ, অন্যদিকে জাতিগত কর্ম্মে যে ঋদ্ধির ধনদৌলতের ঐশ্বর্য্যের আদর্শ সে সম্বন্ধে "শিক্ষিত Aristocracy"র একটা মত ঐ প্রবন্ধটিতে খুব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিচারের ভার আমরা লইলাম না। সে ভার পাঠকদের উপরেই দিলাম।

বাগচী মহাশয় গান্ধি মহারাজের চরমপন্থী ভক্ত, তিনি আবারও বলিতেছেন "বাংলা দেশে মহাত্মা গান্ধিকে অনেকেই সহ্য করিতে পারছেন না—নানা কারণে। মহাত্মা গান্ধি অনেকের জীবনকে একটা প্রকাণ্ড ধিক্কারে পরিণত করে তুলেছেন। তাদের অন্তরের মর্ম্মস্থানে তলব পৌঁচেছে কিন্তু জড়তা ও দুর্ব্বলতাবশতঃ তারা উঠ্‌তে পারছে না।···আর একদল সহ্য কর্তে পারছেন না, যাঁরা বেশ সুখে ভাতে আছেন। কখন কোন্ হাঙ্গামা বাধিয়ে দুধের বাটিটির হস্তান্তর (?) হন, এই ভয়েই তাঁরা মহাত্মাকে জুজু দেখছেন।" গান্ধী মহারাজের পথে যাহারা চলেন না তাঁহারা সকলেই যদি বাগচী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট এই দুইটি শ্রেণীর একটি না একটিতে পড়িয়া যাইতেন, তবে বাংলা দেশের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, বাগচী মহাশয় নিজেই আর একটা শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন আর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালকে তাহার প্রতিনিধিরূপে লইয়াছেন। বিপিনবাবু ও গান্ধী মহারাজের তুলনা করিয়া বাগচী মহাশয় বলিতেছেন, "উভয়ের অন্তর-প্রকৃতির গঠন, লক্ষ্য ও পথের মধ্যে এমনি সাংঘাতিক পার্থক্য যে মিলনের আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিপিনবাবু জ্ঞানমার্গী, মহাত্মা প্রেমমার্গী। আর প্রেম গভীর ও জীবন্ত হলেই কর্ম্মের ধারায় আপনাকে বাহিয়ে না দিয়ে থাকতে পারে না, কাজেই কর্ম্ম-মার্গীও বটেন। জ্ঞান ও প্রেমমার্গের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বিপিনবাবুর লজিক যে প্রেমের বিশ্ববিজয়ী লজিককে ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে, এটা খুব স্বাভাবিক।"

বিপিনবাবু শুধু জ্ঞানমার্গী,—তিনি প্রেমমার্গীও নহেন কর্ম্মমার্গীও নহেন, অর্থাৎ তিনি দেশকে ভালবাসেন না অথবা খুব কম বাসেন, দেশের জন্য

ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ বৈশাখ, ১৩২৮ [নবম সংখ্যা

জীবনের কথা

দেশের অবস্থা কি সেটা ভাল করে বুঝলে প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ বড় সহজ হবে না। অধ্যাত্মজীবন আমাদের বেশ জাগ্রত হয়ে উঠলেও সত্যপ্রতিষ্ঠান যে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করছে সে দিকে দৃষ্টির অভাব থাকায় সাধনার মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে—যুগে যুগে এই রকম একটা করে ফাঁক থাকায় ভারতের বড় বড় কর্ম্ম ধরাশায়ী হয়েছে।

জীবনের উপরেই যখন ভগবানকে মূর্ত্ত করে তুলতে হবে, তখন জীবন রক্ষার উপায় সঙ্গে সঙ্গে করতে না পারলে, ভগবানকে পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু সে আর ইহজীবনে নয়, এই রক্ত মাংসের শরীর দিয়ে নয়, জীবন ছাড়িয়ে সেই দূরায় লোকে গিয়ে দাড়াতে হবে।

মনের দৌড়, শরীরের চেয়ে কিছু এগিয়ে পড়েছে। সেটা নিশ্চয় আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচয়, তাই যখন ভগবানকে পেতে চাই তখন মনকেই প্রসারিত করে থাকি, দেহরক্ষার চিন্তা একান্তই গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেশের এই দারুণ অন্নাভাব—তার মূল কারণ যে আমাদেরই উদাসীনতা একথা না বলে আর থাকা যায় না।

বাংলার উৎকৃষ্ট সন্তান যাঁরা তাঁরা পর্য্যন্ত অন্ন চিন্তায় বিরত হয়ে পরের স্কন্ধে নিজ গুরুভার করে আত্মসাধনায় মগ্ন থাকতে কুণ্ঠিত নন—উঁহাদের এমন চৈতন্য নাই যে প্রতি ব্যক্তি যদি স্বকৃত উপার্জ্জন না করে, তা হলে, অপরকে তার জীবন ভার বহন করতে হয় এবং সমাজে যত অধিক এই শ্রেণীর লোক জন্মাবে ততই সমাজ ভারগ্রস্ত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়বে, বাংলায় উপস্থিত দুই বেলা দুই মুঠা আহার পেলে অসংখ্য যুবক অনায়াসে অধ্যাত্ম সাধনায় চির জীবন কাটিয়ে দিতে পশ্চাদপদ নয়, কেবল খেতে পেলে আত্মসমর্পণ যোগ নেবে এমন অসংখ্য পত্র আমরা প্রতিদিন পাচ্ছি এবং ইহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। কথাটা অপ্রিয়—কিন্তু দেশের শোচনীয় অবস্থা আমাদের জেনে রাখা কর্ত্তব্য নয় কি?

দরিদ্র নারায়ণের তবু কিছু মেহনৎ আছে, দশ বাড়ি ঘুরে তিরস্কার, লাঞ্ছনা কুড়িয়ে, এরা দিনযাপন করে, কিন্তু এই সকল মার্জ্জিত বুদ্ধি ভদ্র নারায়ণেরা সহজ জীবনযাপনের একটা পন্থা আবিষ্কার করে, আত্মপ্রবঞ্চিত হচ্ছেন—ইহার উপায় কি? ভগবান পেতে চলেছেন যারা এবং যে ভগবান জগদতীত নহেন, তার প্রথম পরীক্ষা স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনা, যে নিজের জীবন পোষণে অকৃতকার্য্য—ভগবান লাভ তার পক্ষে সুদূরপরাহত।

"নায়মাত্মা বল হীনেন লভ্য" যে বলহীন—যাহার আত্মসংস্থান নাই তাহার যোগ গ্রহণ প্রয়াস ব্যর্থ হবে; সর্ব্বাগ্রে আপনার অন্ন-প্রতিষ্ঠান দৃঢ় কর, যার কিছু নাই সে দিবে কি? সাধনা যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—নেশার ঘোরে অনেকেই তুরীয়ানন্দ ভোগ করছেন, অন্নচিন্তার সমস্যা উপস্থিত কর, অমনি শুনতে পাবে, ওসব কাজ তাহার নয়, তাহার ভরণ পোষণ ভার ভগবানের হাতে, এ পৃথিবী বড় দয়াময়ী, এই অধম অকৃতকর্ম্মীরাও তাঁহার দয়ায় অভুক্ত থাকে না।

আমাদের অভিজ্ঞতা—ভবিষ্যতকে রক্ষা করুক। এই জন্যই সত্য অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করতে সাহস হচ্ছে। যারা ধর্ম্ম সাধনায় রত আছেন তাঁরা মনে মনে ঠিক জানেন ইচ্ছা করলে পৃথিবীর ধন আকর্ষণ করে আনা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। পরীক্ষা কালে হাজার টাকা মূল ধন নিয়ে একজন ব্যবসা সুরু করলেন—তিন মাস পরে তহবিল মিলিয়ে তিনশত টাকা মাত্র পুঁজি দেখা গেল, তখন কাজেই তিনি বললেন, এ সব কাজ তাঁর নয়, ভগবানের ইচ্ছা তিনি যোগ প্রচার করেন, কাজেই জীবন রাখতে হলে পরের স্কন্ধে ভর দিয়ে চলাই ইহাদের একমাত্র ...ত।

ভারতের ধর্ম্ম এমন তামসিক নয়। আত্ম-উপলব্ধি করবার জন্য পর্ব্বত গুহা আশ্রয় করতে হয় না, শরীরকে গুটিয়ে জড়ত্ব লাভের প্রয়োজন নাই, নিজেকে আদ্যা প্রকৃতির হস্তে উৎসর্গ করে' উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি কর, প্রকৃতির সহিত নিজের ভিন্নতা যত উপলব্ধি করতে পারবে ততই তোমার সত্য স্বরূপ স্বতঃই উদ্ভাসিত হবে—তখনই তুমি দেখ্‌বে তুমি খণ্ড নও, দুর্ব্বল নও, মানুষ নও তুমি অনন্ত, সর্ব্ব-শক্তিমান, তুমি দেবতা, আর তোমার প্রকৃতি ইনিই কালি—মহাশক্তি—কর্ত্রীরূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করছেন। তুমি চেয়েছিলে অজ্ঞতা পরাধীনতা, তিনি তাহাই ফলবতী করেছেন—আজ যদি চাহ মুক্তি আত্মউপলব্ধি আত্মজ্ঞান, তিনি তদনুসারেই কার্য্য করবেন—এত আত্মবিশ্বাস দৃঢ় কর, আত্ম শক্তির উপর অবিচল শ্রদ্ধাবান হও, এই চিন্তা জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করবে, এই ধারণা হৃদয়ে শ্রদ্ধার উৎস খুলে দেবে, এই শক্তি তোমায় বীর কর্ম্মী করে তুল্‌বে—আজ যা থেকে তুমি বিরত হবে একদিন তাহাই আবার জীবনের অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে—তখন সেই বস্তু অর্জ্জনের জন্য তুমি যতবড় সিদ্ধ পুরুষ হও, তোমায় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে; কিছুকে ছেড়ে চলা সাধনার সত্য ধর্ম্ম নয়, সবাকে ঘিরে সবকে আলিঙ্গন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—জ্ঞান শক্তি প্রেম এই ত্রিধারার একটীও যেন ক্ষুণ্ণ না হয়; আজ জ্ঞানের সাধনায় পর্ব্বত গুহা আশ্রয় করলে, কাল শক্তির অভাবে মৃত্যুই হবে আমাদের পরিণাম।

কি ধর্ম্ম কি অর্থ, সবের জন্য পরের মুখ চেয়ে বসে থাকাই আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমরা ধর্ম্মের জন্য গুরুর চরণে স্মরণ নিই, অর্থের জন্য দাতার দরজায় ধন্না দিই; কত শত বৎসরের দাস মনোবৃত্তি—একদিনে তিরোহিত হয় না, কিন্তু সকল দিক দিয়ে আমাদের আজ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে

—নিজের মণিকোটায় সর্বৈশ্বর্য্যশালী আত্মপুরুষের সন্ধান কর। যদি লক্ষবার মরতে হয় ভীত হয়ো না ; মরণের ভিতর দিয়াই নবজীবনের সূত্রপাত হয়, এতখানি অধীনতার মধ্যে জীবনধারণ মৃত্যু অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেয় নহে।

আজ জাপান থেকে এক পত্র পেলুম। মুর্শিদাবাদের এক বিপন্ন যুবক জাপানবাসীর করুণা উদ্রেক করে'—আত্মসংস্থানের উপায় নির্ণয় করতে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন—তার পত্রের সঙ্গে আমাদের বক্তব্য না লিখেছেন তার কিয়দংশ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন আমাদের দুরবস্থার সীমা উল্লঙ্ঘন করে গেছে কি না।

A young man, with full vigour, instead of making any effective attempt toward progress, assumes a most humiliating position and then roundly condemns his own countrymen? And why he heaps such abuses on his neighbours' heads! Because they are loath to comply with the demands of a lazy boy

বৈদেশিকদিগের নিকটেও বাংলার সমাজচিত্র কেমন রেখায় প্রতিফলিত হচ্ছে বাঙ্গালী একবার ভেবে দেখ। যুবক I. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নাই—পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের কথা উপেক্ষা করা মহাপাপ তাই বিবাহও করেছেন, সন্তানাদি হয়েছে কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই।

কেন—বাঙ্গালী—তুমি এমন ভাবপ্রবণ হ'লে—এখনও যে তোমার মাটীতে সোনা ফলে—তোমার অর্থ নাই লোকবল নাই—বাহু দুটো আছে তো হৃদয় তো কেহ কেড়ে নেয় নি, আত্মশক্তির উদ্বোধন কর—দোহাই তোমাদের, মরণ পথের পথিক বাঙ্গালী একবার ফেরো, একবার জীবনের পথে ছুটে চল, জীবন যদি থাকে ধর্ম্মলাভ তোমার অসম্ভব হবে না—কে আজ এই মুমূর্ষু জাতির জীবনে মৃতসঞ্জীবনী সঞ্চার করবে—কে এই ভাবভক্তিপ্রবণ জাতিটাকে জ্ঞানের আলোয় পুলকিত করে' মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রকৃষ্ট পথ নির্দ্দেশ করে দেবে ;

বাঙ্গালীর সম্মুখে—ভীষণ দারিদ্র্য রাক্ষসী করাল বদন ব্যাদন করে' দাঁড়িয়ে আছে, জীবনের পথে এক পদ যাতে আমরা অগ্রসর হতে না পারি, ইহাই তার উদ্দেশ্য—কিন্তু এই প্রবল অন্তরায় দূর যে আমাদের করতেই হবে—ভাবের নেশায় নিমিলীত নেত্রে কেবল তত্ত্বকথা আর কেউ শুনবে না—তাঁকে মুক্ত করে ধর জীবনে, জীবনের রেখায় রেখায় যদি সত্য আবিষ্কৃত হয়, সারা পৃথিবী তোমারই দুয়ারে মাথা নত করে দাঁড়াবে। যোগ যে জীবন—যোগ যে সাধনা—সে তো বাক্য নয় ছন্দ নয় স্বপ্ন নয়।

মনটাকে একটা mould তৈরী হবে—মনের একটা preparation দরকার। ... হতে হবে সেটা স্থির একটা নিথর ... প্রতিষ্ঠা হবে।

Stillness মানে এমন কিছু নয়, যে তার মধ্যে আর কিছুই হবে না। প্রকৃতির সব রকম ঘাত প্রতিঘাত, যা কিছু মনকে বিচলিত করতে আসবে, সেই সবে অবিচল, unaffe-

tied থাকবার অভ্যাস—একটা বুদ্ধির মনের স্বভাব-সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মহান বৃহৎ বিশ্বভাব—একটা infinite realisation—সকল ভুবনভরা, all embracing, সকলের মধ্যে অখণ্ড ভাবে ছেয়ে আছে—তাতে অবস্থান করতে হবে—নিজেকে তার ভিতরে ছড়িয়ে দেওয়া—অন্ততঃ তার কোলে অংশ-রূপে অবস্থান করার অভ্যাস সিদ্ধ হওয়া চাই। মনের এই শান্ত সত্তায় নিরবচ্ছিন্ন নিমগ্ন থাকা অভ্যাস হয়ে গেলে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ফুটে উঠতে আরম্ভ করবে। কিন্তু তার জন্য যেন কোনরূপ impatience না থাকে—অধীর নয়, অখণ্ড নির্ভরতা নিয়ে থাক—ভগবান সব ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলবেন।

প্রথম হবে thought-এ—একটা জ্ঞানধারা অনুভব করবে—উপরে তার উন্মেষ হবে—mind'এর ভিতরে inspiration রূপে নেমে আসা নয়—mind ছাড়িয়ে একটা ঊর্দ্ধ activity আরম্ভ হয়ে যাবে—supermind-এর সেইটা হবে direct action—স্বরূপ সৃষ্টি। দুই ধারায় হবে—একটা জ্ঞান একটা নূতন জ্ঞান ঘনীভূত হয়ে উঠবে—সেইই সব উপর থেকে আপনি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে—কি করতে হবে, কোথায় imperfection, কি বর্জ্জন করতে হবে—সব কথাই সে বলে দিতে আরম্ভ করবে—সেই ভিতরের গুরু। তার আলোকে সব করতে হবে। এই একটা দিক। আর একদিকে হবে একটা স্বচ্ছ Will'এর formation—তার পরে এক সময়ে এই দু'য়ের সত্য জ্ঞানের এবং মূল ইচ্ছা মিল হয়ে যাবে—দুই মিশে একে পরিণত হবে অখণ্ড স্বরূপ।

* * *

উপর থেকেই সমস্ত mentality-কে তুলে দেবে। সমস্ত পূর্ণরূপে intuitivitise হয়ে যাওয়া চাই। এই intuitive action হবে একেবারে স্বচ্ছ নির্দোষ,—নিজে নিজেই অনুভব করবে—সেই action আর সাধারণ চিন্তার খেলায় কি তফাৎ। Difference টা ক্রমেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সব mentality টা এই রকম intuitivitised হবে—তা'হলে বিজ্ঞানের খেলা আরম্ভ হ'তে Heart'এর দিক থেকে সম্পূর্ণ surrender চাই। এই consciousness থাকবে—সমস্তর মধ্যে এক অনন্ত ভগবান তাঁর অনন্ত শক্তিযোগে সমস্ত কর্চ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণরূপে হউক—নিজের কোনরূপ স্বতন্ত্র ইচ্ছা—সূক্ষ্ম insistence পর্য্যন্ত রাখবে না। কোন ইচ্ছা নয়—সবটুকু নির্ভর তাঁর উপর করে দেবে। তোমাদের একলমাটা হয়েছে। জানবে—তাঁর মঙ্গল ইচ্ছায় সব কিছু ঘটনা সৃষ্টি করছেন—তাতে তিলমাত্র সংশয় রেখো না। ভগবানে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই তিনি যা কিছু imperfection দেখছেন তেমনি সমস্ত নিরসন করবার জন্যই সব কিছু করছেন এসব সাধনার পর্য্যায় বলেই স্মরণ রাখবে—সাধনার জন্য দরকারই—তিনি পরিপূর্ণ কল্যাণময়—অনন্ত ভাবে অনন্তরূপে তাঁরই অনন্তশক্তি কল্যাণ ও মুক্তিবিধানের জন্যই নানা ঘটনা তরঙ্গে খেলা করছে—কিছু বিচলিত না হয়ে অক্ষুণ্ণ, সম্পূর্ণ কল্যাণ-শ্রদ্ধা তাঁর উপরে রাখবে। শ্রদ্ধাই সব ঠিক করে দেবে—শ্রদ্ধাই উৎসর্গের ভিত্তি। অনন্ত জ্ঞান নিয়ে আসবেই আসবে। তিনিই পূর্ণ জ্ঞান-শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন।

আর একটা universal love-এ হৃদয়খানি পূর্ণ করে রাখবে—সকলের জন্য ... —সকলের মধ্যেই তিনি খেলছেন—এই consciousness অব্যাহত রাখবে। একটা deep love, আর এই surrender আর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হ'লেই হৃদয়ের সমস্ত

obstruction চলে যাবে। ভগবান সব নিঃশেষে নির্মূল করে' দিচ্ছেন। অধীর বা বিচলিত না হয়ে ধৈর্য সহকারে অগ্রসর হয়ে যাও—বিজ্ঞানের উৎস খুলে গেলে, স্বরূপ-খোলা সিদ্ধরূপে সফল হবে

* * *

প্রথম করতে হয় নিজেকে একেবারে চিন্তাশূন্য করে' ফেলা। মন বুদ্ধিকে একেবারে খালি করতে পারলে একটা স্তব্ধ স্থির প্রসন্ন শান্তভাব আসে। তখন উপর থেকে আর একজন খুব সুস্পষ্ট রকমে কথা কইতে আরম্ভ করে। যা বলবার সেই সব বলে, যা করবার সেই সব করে। (লেলে) যখন আমার প্রথম এই ভাবটার সন্ধান বলে' দেয়, তাই করলুম। তিনদিনে সমস্তটা একেবারে empty of thought হয়ে গেল। বক্তৃতা দেবার ভার পড়লো কিন্তু কি বলবো ভিতর সব খালি। (লেলেকে) সেই কথা বলতে, সে বললে, কিছুই করতে হবে না উপর থেকেই সব বলবে। তাই হলো—কে অনর্গল বলতে আরম্ভ করলে। সে একেবারে আমার সাধারণ ধরণে নয়—নূতন ভাবভঙ্গী, নূতন style—যখন চমক ভাঙ্গলো, তখন দেখি হাতে কে একজন কি একখানা কাগজ দিচ্ছে। এমনি ভাবে (বোম্বাই) থেকে (কলিকাতা) পর্যন্ত সারা পথ বক্তৃতা দিতে দিতে গেলুম। এখন এই অবস্থাটা normalised হয়ে গেছে। নিজের intellect দিয়ে কিছু বলতে করতে ভাবতে আদৌ হয় না—সব উপর থেকে আসে, হয়।

* * *

কোনরূপ mental construction না বাধাই হচ্ছে—এই বিজ্ঞান-প্রাপ্তির প্রথম, প্রধান, আর indispensable condition—বুদ্ধির যা কিছু চিন্তা মনের যা কিছু অনুভূতি, এই সব উপর থেকেই আসে—তবে নীচের এই আধার-স্তরে এসে মিশিয়ে ঘুলিয়ে গিয়েই যত গণ্ডগোল বাধে। তখন idea'র সঙ্গে idea'র, feeling'এর সঙ্গে feeling'এর, impulse'এর সঙ্গে impulse'এর আবার এই সবের পরস্পরের কত রকমই না বিরোধ বিসম্বাদ বেধে যায়। সাধারণ mental অবস্থাই আমাদের এই রকম একটা নিরন্তর warring self-conflict পূর্ণ। মনের ধর্মই এই self-division—সেখানে সামঞ্জস্য অসম্ভব। যথার্থ ও অবিকৃত সত্য পেতে গেলে মন ছেড়ে উপরে অধিরূঢ় হতে হবে। সেইখানেই আসল জ্ঞান, নিখুঁত প্রেরণা, খাঁটি ও সত্য প্রেম এবং সামঞ্জস্য (harmony)। বিজ্ঞানই হচ্ছে—Home of Truth—সত্যের স্ব-দমং—মূল নিজ ধাম—সব কিছু'র পূর্ণ real স্বরূপ সেইখানেই পাওয়া যায়।

* * *

মন স্থির শান্ত হলেই সত্যের প্রকাশ হয়। ভগবানকে স্বয়ং প্রকাশ বলা হয়—সে খুব সত্য—মন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হলেই ভগবান আপনি প্রকাশ হন। Supermindকে সূর্যস্বরূপ বেদে ও উপনিষদে বলেছে। এও খুব জলন্ত সত্য অনুভূতি। আদিত্য বর্ণ জ্যোতিঃ পুরুষকে অনুভব করা যায়। সকলেই সেখানে এইরূপ করে—করতে পারে। বিজ্ঞানকে চতুর্থ লোক বলা যায়। প্রত্যেক plane'এরই এক একটা বিশিষ্ট বর্ণ (colour) আছে। physical substance—বাহিরের এই matter নয়, আসল pure "Anna" principle'এরও পর্যায় একটা বিশিষ্ট রং আছে, crimson red—বিজ্ঞানের বর্ণ—golden light—হিরণ্ময় জ্যোতিঃ।—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতম্ মুখম্। এসব প্রত্যক্ষসিদ্ধ অনুভূতি। বিজ্ঞান-সূর্যের এই golden light—সত্য সত্যই psycho-spiritual realisation দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়। বৈদিক ঋষিদের এইরূপ realisationই ছিল।

* * *

সাধারণ inspiration—যাকে প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ বলা হয়, উপর থেকেই আসে—কিন্তু অলক্ষ্যে চিত্তভূমিতেই নেমে থাকে—তারপর সেইখানে পুনরায় ফুটে উঠে জাগ্রত বুদ্ধিকে গিয়ে আঘাত করে। সেই অবস্থায় প্রেরণার কার্য্য হয়। এ'তে অনেক ভুল ও বিকৃতির সম্ভাবনা নাই তা নয়। কেন না—হৃদয়ের মনের স্তরে অবতরণ করবার অনেক মিশল—intermixture হয়ে যায়। সেই mixed প্রেরণার খেলাই জীবনে ঘটে। এই রকম প্রেরণার খেলা ছাড়িয়ে একেবারে উপর থেকে direct action এর channelরূপে অন্তঃকরণটাকে পেতে দিতে হবে। সেইজন্যই অখণ্ড সমতার উপর এত জোর দিই। Mind, heart, intellectএর একটুকুও action থাকতে কোথায় কি একটা twist পেকে যাবার সম্ভাবনা। আর অবিকৃত ধারণসামর্থ্যের জন্যও সমতার একান্ত প্রয়োজন। নহিলে—ভাবাতিশয্যে অনেক রকমের শরীর মনের বৈষম্য-অবস্থা ঘট্‌তে পারে। উপরের বিদ্যুৎশক্তি ধারণের পূর্ণোপযোগী আধার গড়ে না নিলে উপরের ধাক্কা শরীর মন ভেঙ্গে দিতেও পারে। এ রকম অবস্থায় কিছুদিন ভিতরটা খালি করে' রাখলে উপকার হয়।

— — —

অরবিন্দ ও কর্ম্ম

"বিজলীতে" বারীন্দ্র লিখেছে—"আজ সকালে অরবিন্দের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বল্লেন, "এ জাতি অনেক খেটেছে অনেক দুঃখ বেদনায় পরিশ্রান্ত হয়েছে, মানুষকে শান্তি ও আনন্দ দিতে হবে। মানুষ ভেতরে ভগবানের ডাক ও তাঁর শক্তির স্পর্শ পায়, তা বুঝতে না পেরে ছুটফট্ করে' বেড়ায়, খানিকটা যা তা এলোমেলো কাজ করে' ক্ষতবিক্ষত হয়ে বসে পড়ে। তাঁর শক্তি ও আনন্দ ধারণ করতে শিখতে হবে; কারণ ভিতরের কর্ম্ম--অন্তরের প্রকাশই প্রকাশ, বাকিটা—এই জগৎচরাচর ও কর্ম্মযন্ত্র তাঁরই জ্যোতিচ্ছটারই একটুখানি রেশমাত্র। কর্ম্ম থাকবে, জগত থাকবে, কিছুই যাবে না, শুধু রূপান্তর হয়ে Transformed হয়ে থাকবে। মানুষের পিছনে অগাধ অটল শান্তি ও অন্তরে অফুরন্ত আনন্দ বিরাজ করলে, আর অতি বড় কর্ম্মও তাকে শ্রান্ত করতে পাবে না, সব কাজ সুখের অনায়াস খেলায় পরিণত হয়"। আরও তাঁর কথা, "আর অভাবের কর্ম্ম নয় দৈন্য পরিশ্রমের এ বিষম তাড়নার কর্ম্ম নয়—আনন্দের কর্ম্ম। জ্ঞানে বিধৃত শক্তির শান্ত মধুর কর্ম্ম"। শেষটুকু এই, "তোমরা স্থির হয়ে নিতে শেখো, আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তি একটুখানি পেতে না পেতে নেচে উঠো না, খরচ করো না, স্থির হয়ে ক্রমাগত অন্তর থেকে প্রকাশ হতে দাও, তারপর সেই পূর্ণ শক্তিকেন্দ্র থেকে সহজ আনন্দের কর্ম্ম আপনি হবে।"

কথাগুলি কর্ম্মোন্মাদ বাঙ্গালীর প্রণিধানযোগ্য। স্বদেশীযুগের ঝড়ো হাওয়ায় বাঙ্গালীর প্রাণ দুলে উঠেছিল, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর স্বদেশীর শেষফল দেখে আমরা স্তম্ভিত হলুম—কেননা কতখানি ত্যাগ, কতখানি সময়, কতখানি উত্তেজনা খরচ করা ফল এতই নগণ্য—যে একেবারেই তা উল্লেখ-

যোগ্য নয়।

কিন্তু তাই বলে' বাংলায় স্বদেশীকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। হিসাবের খতিয়ানে জমাখরচের আঁকর বিশিষ্টভাবে চক্ষুগোচর না হলেও, এই দীর্ঘ পনের বছরে আমরা একটা জিনিষ লাভ করেছি—সেটা জাতির অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবনে রাজসিকতার আবির্ভাব। জীবন যে আমাদের এমন কম্পচঞ্চল—তার মানেই হচ্ছে—আমরা জেগেছি আর এই জাগরণকে কেউ আর বাধা দিতে পারছে না—সামান্য অনুকূল বাতাসে প্রাণের আগুন ধূ ধূ করে' জলে উঠ্‌ছে। নুন, চিনি, কাপড় নিয়ে স্বদেশীর হুজুগ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভীরু বাঙ্গালী আগ্নেয়ান্নিকা ও ভীষণ বিস্ফোরক অস্ত্র নিয়ে কন্দুকক্রীড়া আরম্ভ করে' দিলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীচারণ বিংশ শতাব্দীতে কি অভাবনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে তা সহজেই অনুমেয়।

তারপর বিধাতার কঠোর বিধান মূর্ত্ত হয়ে উঠলো ভারতরক্ষা আইনরূপে। অস্ত্র সংগ্রহের পথ যদি অবাধ থাকতো তবে এই আটশত বৎসরের কঠোর প্রচেষ্টায় আয়র্লণ্ড যে অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি করেছে বাঙ্গালী এই অল্পকাল মধ্যেই তার চেয়ে এত অধিক বিপ্লব আগুন জ্বালিয়ে তুল্‌তে পারতো—যা বঙ্গোপসাগরের সব জল ছেঁচে তুলে আনলেও তা নিভ্‌তো না। কিন্তু ভারতের জাগরণ অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি কর্‌তে নয় সেইজন্য জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রেরিত দুইখানা অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই জাহাজ প্রশান্ত সাগরের বুকে আটক পড়ে' গেল, বাঙ্গালী সমুদ্র উপকূলে কেবল অথৈ অসীম নীলের দিকে অনুবীক্ষণ লাগিয়ে দৃষ্টিপাত করে' প্রতীক্ষাই কর্‌লে, রত্নাকরে রণচণ্ডীর আদেশপত্র এসে আর পৌঁছলো না—

ভিন্ন ইচ্ছায় বাঙ্গালী মর্ম্মাহত—কিন্তু ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করে' মুক্তির অন্য পথ তাদের অন্বেষণ করতে হলো।

"প্রবর্ত্তকের" ছত্রে ছত্রে বাহির ছেড়ে অন্তরের মণিকোঠায় ফিরে আসার মন্ত্র নানা ছন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌লো—কিন্তু ভগবান যদিও চাহেন প্রকৃতির উৎক্রান্তি তবুও তিনি, তার গতিভঙ্গীর প্রতি পদক্ষেপটীর অটুট সম্মান রক্ষায় অমনোযোগী নহেন, পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য কিন্তু প্রকৃতিগত সংস্কারবর্জ্জন বড় ধীরে বড় মন্থরে সম্পাদিত হতে লাগ্‌লো, আজও অশুদ্ধতার পরিসমাপ্তি আসে নাই। প্রকৃতির মধুর সচ্ছন্দ লীলা আমাদের জীবনে এখনও লীলায়িত হয়ে উঠে নাই, কাজেই ধৃতি সহকারে আজও আমাদিগকে অপেক্ষা করেই যেতে হবে।

বাংলায় রাজসিক অহমিকার শেষাংশ মহা সমারোহে অভিনীত হচ্ছে। প্রাণপ্রবল পূর্ব্ববঙ্গ আবেগ উত্তেজনায় টলমল কর্‌ছে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত—চতুর্দ্দিকে নব নব ঋষিবৃন্দের কণ্ঠোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশ মুখরিত—এই বিরাট আন্দোলনে বাঙ্গালীর সাড়া অপর সকল দেশের কণ্ঠ ছাড়িয়ে দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলেছে। জাতিগত শুদ্ধির পুনঃ পুনঃ এই বিরাট আয়োজন বাঙ্গালীর জীবনেই সম্ভব স্বদেশীযুগের মত এই অসহযোগীতা সাধনাতেও আমরা বাহিরের কোন দিব্যসৃষ্টি সার্থক করে' তুলতে না পারলেও অন্তর শুদ্ধি লাভ করে' অনেকে যে দিব্য-জীবন লাভ করবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এইরূপ অভিব্যঞ্জনায় অনেকেই মনে করিতে পারেন আমরা বুঝি দেশের বর্ত্তমান আন্দোলনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌ছি না। এই মহাপ্লাবনের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়, তবে আমাদের অন্তরগত অবস্থা লক্ষ্য করেই আমরা চল্‌তে বাধ্য—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত এই অসহযোগীতা আন্দোলন আমাদের কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে এবং সে বিষয়ে দেশবাসীর চরম জ্ঞান না থাকাই ভবিষ্যতে ইহা বড় আশঙ্কার কথা

বলেই আমাদের মনে হয়। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনীতিক সাধনা ব্যর্থপ্রায়—সমাজ সংস্কার নূতন সমস্যায় জটীল হয়ে পড়েছে আর সত্যধর্ম্ম প্রচারে নানা উপধর্ম্মেরই সৃষ্টি হয়েছে। এই সকলই পাশ্চাত্য অন্ধ অনুকরণের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বৈশিষ্ট আমরা হারিয়ে বসেছি—আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের ইতিহাস, আমাদের জাতীয়তা আমরা উপেক্ষা করে' এসেছি—যা কিছু করতে গেছি তা সবই পাশ্চাত্য আদর্শের অনুগত করে' তোলবার জন্য। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে—পুরাতনের লক্ষ্য, আদর্শ, উপায় সবই আমরা পরিহার করেছি—আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি ভারতের একটা স্বতন্ত্র প্রাণ আছে, সত্ত্বা আছে এবং তারই অনুসরণ করে' আমাদের চলতে হবে—আমরা বর্ত্তমানকে বিশ্বাস করি না—অতীতের গৌরব আমাদের জীবনের অনাহত ইন্ধন, আর সেই অখণ্ড গৌরবের দান নিয়েই ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে' তুলতে হবে—তার জন্য যে চরিত্র চাই সে চরিত্র যদি দেখতে না পাই তবে যত বড় কর্ম্মই আজ আবির্ভূত হোক্ না—আমরা নিঃসঙ্কোচে তার পরিণাম ব্যক্ত করে' দেবো।

এই যে বাংলার বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রবাহ—এই যে জিলায় জিলায় জাতীয় শিক্ষার মন্দির প্রতিষ্ঠা এই যে লোকশিক্ষার সুমহান প্রচেষ্টা—ইহার মূলে অতীতের সেই একই ধ্বংসের বীজ নিহিত দেখতে পাচ্ছি। এই যে স্বরাজলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—এবং ইহার জন্য দেশের তরুণ জীবনে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ইহাও সেই প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণের লীলাখেলা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কাজের সৃষ্টি হবে প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়ে নয়, মনের মাঝে উত্তেজনার ঢেউ তুলে নয়, কাজ পদ্মফুলের মত জীবনক্ষেত্রে স্বতঃ প্রস্ফুটিত হবে—ভগবানের অসীম জ্ঞান ও প্রেমের অভিব্যক্তিরূপে—দশ ইন্দ্রিয় আমাদের দশ দিকে ছুটবে মনের বল্গায় তাদের সংযত রেখে বুদ্ধি হবে সারথী আর এই জীবন রথের আরোহী সেই পুরুষোত্তম—যিনি নিত্য শাশ্বত—সচ্চিদানন্দময়।

বাংলার কর্ম্মী যাঁরা তাঁরা আজ বুঝে দেখুন এমন কর্ম্মে দেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে কিনা? জয়পরাজয়, সম্পদ বিপত্তি সমান করে' অপ্রমত্ত চিত্তে কর্ম্মী কাজ করে' যাবেন কাজের অহঙ্কার তার থাকবে না—সাফল্য ব্যর্থতা দেবকর্ম্মে উভয়ই তুল্য মূল্য। ভগবান সহায় আবার ভগবানই ঘোরতর বাধা। অন্তরের ঠাকুর যার জেগেছে—বাধারূপী ভগবান সেখানে অধোমুখ; কাজ যে সেখানে অবাধ ভগবানের পরীক্ষা—কেবল গতিবেগ দ্বিগুণ করে' দেয় মাত্র—অরবিন্দ এইরূপ অমর কর্ম্মপ্রবাহে জাতিকে অভিষিক্ত করে' নিতে চান—হে বাঙ্গালী তাঁর বাণী অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

কর্ম্মবিরত হয়ো না, যা করছ—তার মূলে আছেন তিনি, তুমি কেবল অহং পরিহার কর—প্রকৃতি থেকে আপনাকে বিযুক্ত করে' তোল। দেখ তুমি শান্ত, ধীর, অপ্রমত্ত—প্রকৃতি জীবননাট্যে যে বিচিত্র অভিনয় আরম্ভ করে' দিয়েছেন—তুমি তার দ্রষ্টা অনুমন্তা ভোক্তা আর ভর্ত্তা মাত্র। এই নিরাসক্ত কর্ম্মযোগ জাতির জীবনে যেদিন ছড়িয়ে পড়বে স্বর্গের বিমল কিরণে সেদিনই দেশ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠবে—আর সে অপার্থিব আনন্দের হাট বাঙ্গালীকেই সত্য করে' তুলতে হবে।

বস্তুই কেন ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি না, স্বরাজ আমাদের চরম লক্ষ্য নহে। আমাদের যুদ্ধ আধ্যাত্মিক যুদ্ধ মনুষ্যত্বের জন্য যুদ্ধ; মানুষ নিজের চারিদিকে এই যে জাল বুনিয়াছে এই দেশাত্মবোধের অহঙ্কার-প্রসূত প্রতিষ্ঠানজালে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহা হইতে তাহার মনুষ্যত্বকে মুক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রজাপতিকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে তাহার গুটির আশ্রয় হইতে আকাশের স্বাধীনতা বড় জিনিষ। আমরা যদি শক্তিমানকে, সশস্ত্রকে, ধনবানকে হেলায় উপেক্ষা করিতে পারি এবং জগতের সমক্ষে অমর আত্মার শক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে পারি তাহা হইলে পার্থিবতার বিপুল অট্টালিকা মুহূর্তে বিলীন হইবে। তখন মানুষ যথার্থ "স্বরাজ" লাভ করিবে। নিরস্ত্র নিঃস্ব অপদার্থ আমরাই বিশ্বমানবের যথার্থ স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিব।

আমাদের ভাষায় "নেশন" শব্দের কোন প্রতিশব্দ নাই। আমরা পাশ্চাত্যের নিকট এই শব্দটি ধার করি বটে কিন্তু ইহা আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কারণ আমাদের মৈত্রী নারায়ণের সহিত: আমাদের জয় আমাদিগকে আর কিছু দিবে না, দিবে কেবল বিশ্বজগতের মুক্তি। আমি পাশ্চাত্য দেশ দেখিয়াছি; যে অপবিত্র উৎসবে পাশ্চাত্য দেশ অনুক্ষণ উন্মত্ত রহিয়াছে তাহার প্রতি আমার বিন্দু মাত্রও লোভ নাই, ইহা ক্রমশঃই যে স্ফীত ও প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছে। নিশীথের উদ্দীপ্ত মশালের আলোকে এই উন্মত্ত উল্লাস আমাদের জন্য নহে; প্রভাতের সৌম্য আলোকে আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের কাজ।

(২)

* * * আমার দেশের উপর দিয়া উত্তেজনার যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে আমি আমার মনের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহার সহিত আমার সুর মিলাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে কেন একটা প্রতিকূলতার প্রবৃত্তি জাগরূক রহিয়াছে। আমি ইহার স্পষ্ট উত্তর পাইতেছি না। * * * আমার চারিদিকে এ কোলাহল কিসের জন্য? এ যদি সঙ্গীত হয় তবে আমার সেতার তার সুর ধরিতে পারিবে। কিন্তু এ যদি কেবল চীৎকার হয় তবে আমার সুর রুদ্ধ হয়। এ কলরবে আমি আত্মহারা হই। কিছুদিন যাবতই আমি সাবধানে কাণ পাতিয়া এই শব্দের মধ্যে সঙ্গীতের সন্ধান করিতেছি। কিন্তু প্রচুর মুখরতা সত্ত্বেও এই অসহযোগের নত্ব যেন আমার কাণে গানের সুর বাজাইতেছে না। ইহার পুঞ্জীকৃত নেতির জঞ্জাল যেন কেবলই উৎকট চীৎকার করিতেছে। * * *

বর্ত্তমান আন্দোলনের সমর্থন করিবার জন্য র— আমাকে অনেকদিন বলিয়াছে যে প্রথম প্রথম আদর্শ গ্রহণ অপেক্ষা বর্জ্জনের প্রেরণাটাই প্রবল থাকে। আমি জানি জাগতিক ব্যাপারে এ কথাটা খাটে। কিন্তু তাহা হইলেও আমি ইহাকে সত্য বলিয়া মানিতে রাজি নই। আমাদের যথার্থ মিত্র কে তাহা একবারেই চিনিয়া লইতে হইবে; কারণ পরে আর তাহাকে ছাড়াইলেও ছাড়ানো যায় না। আমরা যদি একবার মাদকতার সাহায্যে শক্তিলাভ করিতে চাই, তবে প্রতিক্রিয়ার সময় আমাদের স্বাভাবিক শক্তি লুপ্ত হয় এবং আমরা বারংবার সেই দৈত্যের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতে যাই, যে, যে পাত্রে করিয়া শক্তি প্রদান করে, তাহারই তলদেশ অপহরণ করে।

ভারতবর্ষে "ব্রহ্মবিদ্যা"র উদ্দেশ্য মুক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা। বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য "নির্ব্বাণ" অর্থাৎ বিলোপ। একথা বলা যাইতে পারে যে দুইটি শব্দেই বিভিন্ন নামে একই ভাব প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু নামের দ্বারা মনের অবস্থা বুঝা যায়, নাম সত্যের বিভিন্নরূপকে উজ্জ্বল করিয়া ধরে। "মুক্তি" সত্যের

ইতি বাচক এবং "নির্ব্বাণ" নেতিবাচক রূপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মোপদেশে বুদ্ধদেব চিরন্তন সত্তা "ওম" সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। কারণ তিনি মনে করিয়াছেন নেতিমার্গাবলম্বনে অহঙ্কারকে উন্মূলিত করিতে পারিলে আমরা স্বভাবতঃই এ সত্যে উপনীত হই। সেইজন্য তিনি "দুঃখ"—যাহা নিবৃত্ত করিতে হইবে, তাহার উপর জোর দিয়াছেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা জোর দিয়াছেন 'আনন্দের' উপর যাহা লাভ করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করিবার জন্য অবশ্য আত্মসংযম আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা ইহাকে সাধনার পরিণাম না করিয়া সমগ্র সাধনপ্রণালীর সোপান বর্ণনা করিয়াছেন। সেইজন্য বৈদিক যুগে ও বৌদ্ধযুগে মানবজীবনের সাধনার আদর্শ বিভিন্ন ছিল। বৈদিক যুগের সাধনা ছিল জীবনকে আনন্দে পূর্ণ করা। বৌদ্ধযুগের সাধনা উহাকে বিনষ্ট করা। বৌদ্ধধর্ম্মে যে উৎকট বৈরাগ্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার চরম আদর্শ ছিল অবিবাহিত জীবনযাপন এবং সর্ব্বতোভাবে কৃচ্ছ সাধন। কিন্তু "ব্রাহ্মণের" তপস্যা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিরোধী ছিল না, তাহার সহিত সামঞ্জস্য ছিল। তপোবনবাসী ঋষিদের ন্যায় জীবনসঙ্গীতের সমস্ত কম্পটি বাধিত রাখিত যাহাতে উহা বেসুরা না বাজে। 'আনন্দম্'এর উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং তাঁহার লক্ষ্য ছিল আত্মার ঐ সুরকে সুসঙ্গত রাখা, তাহাকে ধ্বংস করা নহে।

অসহযোগিতা অর্থ রাজনৈতিক বৈরাগ্য সাধন। আমাদের ছাত্রগণ তাহাদের ত্যাগের অর্ঘ্য কাহার পায়ে সমর্পণ করিতেছে?—পূর্ণতর শিক্ষার পায়ে, না অশিক্ষার পায়ে? ইহার পেছনে আছে ধ্বংসের একটা উৎকট আনন্দ; সাধুবুদ্ধি প্রণোদিত হইলে উহা ধারণ করে বৈরাগ্যের আকার এবং অসাধুবুদ্ধি প্রণোদিত হইলে মানব প্রকৃতির যত সত্যগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া ইহা অনর্থক ধ্বংসে একটা অকারণ পুলক অনুভব করে। বিগত মহাযুদ্ধে এবং আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত আরও কোন কোন ঘটনায় আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। নেতিবাদ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বৈরাগ্য এবং সক্রিয় অবস্থায় অনাচার। মরুভূমি যেমন "হিংসা"র একটি মূর্ত্তি, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরও তেমনি আর একটী, উভয়েই জীবনের বিরোধী।

আমার মনে আছে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে একদিন একদল যুবা ছাত্র আমাদের "বিচিত্রা"র দোতলার ঘরে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তাহারা আমাকে বলে যে আমি যদি তাহাদিগকে স্কুল কলেজ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেই তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিবে। আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম যে আমি তাহাদিগকে ঐরূপ উপদেশ দিতে পারিব না। তাহারা আমার দেশভক্তিতে সন্দেহ করিয়া বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যায়। আমার ঐরূপ বলার কারণ এই ছিল যে নিরবচ্ছিন্ন শূন্য ভাবের প্রতি আমার কখনও অনুরাগ নাই ইহাকে সাময়িক উপায়রূপে গ্রহণ করিলেও নহে। জীবন্ত সত্যকে যাঁরা অগ্রাহ্য করেন করুন, অবাস্তব ভাবের কথা শুনিলে আমার ভয় হয়। এই যুবকগণকে আমি কেবল ছায়া বলিয়া গ্রহণ করি নাই, তাহাদের জীবনটা আমার নিকট একটা জলন্ত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহাদিগকে একটা নিরবচ্ছিন্ন নেতিবাচক কার্য্যপ্রণালী উপদেশ দিবার বিপুল দায়িত্ব আমি আমার স্কন্ধে নিতে সাহস করি নাই; কারণ তাহাতে তাহাদের জীবনের শিকড় ভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া যাইবে—সে ভূমি যতই নীরস ও অনুর্ব্বর হউক না কেন। যে সকল ছেলেদের জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিয়া তাহাদের পাঠ

হইতে নিরস্ত করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি যে অবিচার ও অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহা কখনও পরিশোধিত হইবে না। অবশ্য যে অবাস্তব ভাব বাস্তব সত্যের ক্ষীণমাত্র অংশকে উপেক্ষা করিতে পারে তাহার দিক হইতে দেখিলে ইহা কিছুই নহে। এই যে অবাস্তব ভাব সকল যাহারা বিচিত্র রঙ্গের মুখোস পরিয়া জগৎশুদ্ধ লোকের আত্মাহুতি আহরণ করিয়া বেড়াইতেছিল—এই সকল ভাবগুলিকে বিধ্বস্ত করাই যদি আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হইত তাহা হইলে আমি খুব সন্তুষ্ট হইতাম।

* * * আমি যখন সমুদ্রের এপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিতেছি ঠিক তখনই সমুদ্রের অপর পারে অসহযোগের মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত হইতেছে;—দৈবের একি রহস্যময় লীলা! আপনি জানেন আমি পাশ্চাত্যের পার্থিব সভ্যতায় আস্থাবান্ নহি; তেমনি আমি ভৌতিক শরীরটাকেই চরম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। এখন আবশ্যক হইতেছে মানুষের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সমন্বয় সাধন, ভিত্তি ও অট্টালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যথার্থ মিলনে আমি বিশ্বাস করি। প্রেমই আত্মার পরম সত্য। এই সত্য যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় তৎপক্ষে আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। অসহযোগ অনাবশ্যকভাবে ঐ সত্যে আঘাত করে। ইহা আমাদের চুল্লী আগুন নহে, ইহা সেই আগুন যাহাতে আমাদের চুল্লী ও গৃহ উভয়ই দগ্ধ হইবে।

পুরাতন প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পণ্ডিচারীর পত্র "বিজলীতে" প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র মধ্যে কর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অরবিন্দের কতকগুলি উক্তি আমরা দেখিতে পাই। উক্তিগুলি প্রবন্ধান্তরে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই উক্তিগুলি পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইয়া যায়। ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে শ্রীযুক্ত অরবিন্দের সহিত মাত্র দুই কি তিনবার সাধারণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ১৯০৯ সালের কথাবার্ত্তায় জাতীয় কর্ম্মের অন্তর্নিহিত ধারাটি যেন বিশেষভাবেই ধরিতে পারিয়াছিলাম। ইহার পর হইতে জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যেক প্রকাশটীর মধ্যে দেখিতাম যেন জাতির আত্মা ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহার পূর্ব্বে স্বদেশ সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ উন্নতিকর কার্য্যেই আমি যেন ভাবাবেশে একটা একত্ব অনুভব করিতাম। আপাতবিরোধী কার্য্যসমূহের মধ্যে একটা সমন্বয় রহিয়াছে ইহা দেখিতে না পাইলেও ঐরূপ একটা অটুট বিশ্বাসে হৃদয় ছাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তৎপরে শ্রীঅরবিন্দের সহিত কথাবার্ত্তায় আমার এরূপ অন্তর্দৃষ্টি হয় যাহার ফলে দেশের প্রতি কাজটীর মধ্যে আমি দেশের আত্মাকেই দেখিতেছিলাম। আমি ভাবে মজগুল, বিশ্বাসে স্থির; দেশের কার্য্যের একটী অঙ্গের মধ্যে সমস্ত দেশটীকে ফলাইয়া তুলিবার জন্য একটা মত্ত আবেগ ভিতর হইতে ঠেলিতেছিল।

এইরূপ এক আবেগের সময়ে স্বরস্বতী পূজোপলক্ষে আমরা এমন এক উৎসব করিয়া বসি যাহাতে প্রাচীন ভারতের সমস্ত দিকটাকে সুস্পষ্ট করিয়া ধরিতে আমরা বিপুল প্রয়াস করিয়াছিলাম, এই প্রয়াসের চিত্র—আমাদের ভাবানুরঞ্জিত অদ্ভুত কর্ম্মতরঙ্গের বিবরণী আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কেননা উৎসব একরূপ শেষ হইতে না হইতেই আমাদের নিকট শ্রীযুক্ত অরবিন্দের উদয় হয়। আমরা চমকিয়া উঠি। আমাদের ক্ষুদ্র আত্মার স্বল্প অনুভূতি দিয়া ভারত-বাণীর পূর্ণরূপটী প্রকাশ করিতে আমরা সচেষ্ট হইয়াছিলাম—জানিনা এইফলে স্বদেশআত্মার বাণীমূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীঅরবিন্দ আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন কিনা। তাঁহাকে পাইয়া বিশেষতঃ তাঁহার নির্জ্জনবাসের সঙ্কল্প ও তাঁহার নব সাধনাবস্থার নিবিড় তন্ময়তা দেখিয়া আমরা একাকালে পুলকিত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। উৎসব-বিবরণী প্রকাশ করিয়া দেশকে চমৎকৃত করিবার স্বপ্নও আমাদের মনোমধ্যে উদয় হইল না।

আজ যে কথাগুলি তিনি বারীন্দ্রবাবুকে বলিয়াছেন তাঁহার তখনকার মূর্ত্তিতে সেই কথাগুলি যেন বড় বড় অক্ষরে সাজান ছিল—যিনিই সোৎসুক হইতেন তিনিই উহা দেখিতে পাইতেন; কিন্তু এমনও হইয়াছে কোন কোন অবুঝ 'যা তা এলোমেলো' কাজের সহিত মমতাবশে ঐরূপ কাজের মধ্যেই ভগবানের ডাক ও শক্তির স্পর্শ আবিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল। যাহাকে নিঃশেষ করিয়া এবং যাহাকে নিঃশেষ করিবার জন্য তিনি ভগবানের ডাকে নির্জ্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অন্তরে ভগবানের জন্য বেদনা অনুভব করিয়া অনুক্ষণ বিশেতর ভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন তাঁহার সেই দিব্য অদ্ভুত মূর্ত্তি অবলোকনের ফলে সেই প্রাচীন ভূত ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া যে কাহাকেও অধিকার করিয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইলেও ইহা সাধন রহস্যের একটী গুরুতম রহস্য।

ফলতঃ ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন রাজনীতিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে বাঙ্গলার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে বাঙ্গালী বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করিবার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া জগতে ধন্য হইতে পারিবে; অতএব বাহ্য প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়া আন্দোলনের ধারাটি এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে একান্ত স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি ভারতের সুউন্নত ভবিষ্যত সম্বন্ধে আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেও বঙ্গভঙ্গরূপ অপমান চিহ্ন তাঁহাকে যেন বাঁধিয়া রাখিত। শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতিগঠনের একটী প্রকাণ্ড ধারা অবলম্বন করিয়া জাতিকে তাহার সুমহান ভবিষ্যতের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য শত চেষ্টা করিলেও জাতি জাতীয়শিক্ষা ও গ্রামামণ্ডলী স্থাপনের সহিত অনুক্ষণ যেন প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, তাহার স্বাবলম্বনের প্রথম ফল হউক বঙ্গভঙ্গ প্রতিনিবারণ, তাহার শক্তির প্রথম পরিচয় হউক যুক্তবঙ্গ ভরিয়া বাঙ্গালী যেন নিঃসঙ্কোচে গাহিতে থাকে বঙ্গ 'আমার' জননী 'আমার'। ফলে জাতীয়শিক্ষা ও গ্রামামণ্ডলীর বিস্তার ঘটে নাই।

কর্ম্মযোগীনের অরবিন্দ শতবার ঘোষণা করিতেছিলেন, "কর্ম্ম থাকবে জগত থাকবে কিছুই যাবে না শুধু রূপান্তর হয়ে থাকবে"—অর্থাৎ বাঙ্গালী তোমার সকল উদ্দেশ্য সফল হইবে কেবল সকল জাতির নিয়ন্তার পদতলে তোমার উদ্দেশ্যকে বলি দাও, তুমি তাঁহার শক্তির তালে তালে নৃত্য করিতে শিখ, তাহা হইলে—তোমার সঙ্কল্প নহে—বাঙ্গালীজাতির মধ্যে বঙ্গভঙ্গ নিবারণ অতিক্রম করিয়া যে ভাগবত সঙ্কল্প নিহিতআছে সেই অমরসঙ্কল্প সাধন করিয়া তুমি জগতে ধন্য হইবে। এ বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা বাঙ্গালীরপক্ষে

অন্তর রূপ

—:০:—

চাইনা অহঙ্কারের খেলা—চাই ভগবানের সত্যরূপটি জীবনের খেলায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ভগবানের ইচ্ছাই অবিশ্রান্ত জীবনের উপর দিয়া ঘটিয়া উঠিতেছে। স্বভাব অপরিশুদ্ধ বলিয়া ইচ্ছার স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটে না। মনের ছাঁচে ইচ্ছাটিকে ঢালাই করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি, সে কর্ম্ম মূলে ভাগবত কর্ম্ম হইলেও, তাহা উপরের স্তর হইতে একটু নামিয়া মনের স্তরেই প্রতিফলিত, এইজন্য এরূপ কর্ম্ম একান্ত মিথ্যা না হইলেও উহা পরিবর্ত্তনশীল। এই কর্ম্মের রূপান্তর না হইলে, কর্ম্মযজ্ঞটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ব্যক্তিগত সাধন-জীবনে যেমন সমষ্টি সাধনজীবনেও তেমনি কর্ম্মের একটা আমূল রূপান্তর অত্যাবশ্যক। কর্ম্ম ত বাহিরের রূপমাত্র—মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত কর্ম্মরূপের পিছনে যে অনির্ব্বচনীয় ও পূর্ণ-স্বভাব অধ্যাত্মরূপটি আছে, সেইটিকে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরাই ব্যক্তি-আত্মা ও সংঘ-আত্মা উভয় আত্মারই তপস্যার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই লক্ষটি যে কর্ম্মে যতটুকু ফুটিয়া ফলিয়া উঠে, সেই কর্ম্ম সেই পরিমাণেই সার্থক ও সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ম্ম হইবে, যখন আমরা শুধু আমাদের অন্তরের মূল ও নিত্য সত্যরূপটি শুধু জ্ঞানের মধ্যে চিনিয়াছি তাহা নয়, উহার প্রতি অঙ্গ প্রতি স্তর এক অপরূপ অনন্ত ছাঁচে গড়িয়া লইয়াছি, রেখায় রেখায় উহাকেই নিখুঁত করিয়া সাজাইয়া সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি। অহঙ্কার ও বাসনা থাকিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ম্মপ্রকাশ হয় না। এইজন্যই ব্যষ্টিসাধক ও সমষ্টিসাধকের জীবনে স্বভাবের সকল অহঙ্কারের নিরসনই একান্ত প্রয়োজন।

অহঙ্কার শুধু ব্যবধান দেয় মাত্র—সে ব্যবধান বালুকার রেখা হউক কিম্বা প্রস্তরকঠিন হউক, এই অহঙ্কারকে উৎসর্গ করিতে হইবে। কর্ম্মফলের বাসনা যেমন শুদ্ধ জীবনপ্রকাশের ঘোর অন্তরায়, কর্ম্মনির্ণয় ও কর্তৃত্ববোধও কম অন্তরায় নহে। বরং বাসনার মূলে এই কর্ম্ম ও কর্তৃত্বচিন্তাই থাকিয়া অসীমের বুকে সীমার রেখা টানিয়া দেয়। বাসনা একান্তভাবে দূর হয় না, যতক্ষণ অহঙ্কারের ক্ষীণ আভাসটুকুও অন্তরে ভাসমান থাকে। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে অহঙ্কারের শেষ শিকড়টুকুও উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে। কর্ম্মও ভগবানকে উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। আমি কর্ম্মের কর্ত্তা—এই বোধ একান্তভাবে বিনষ্ট হইলেই পুরুষ শান্ত আত্মস্থ হয়। সমতার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইলে স্বভাবের মধ্যে ভাগবত শক্তির খেলা অনাবিল স্রোতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। তখন কর্ম্মের কর্ত্তা, করণ ও অনুষ্ঠান সমস্তই সমভাবে প্রকৃতির হস্তে নিঃশেষে উৎসর্গীকৃত হইয়া কর্ম্মযজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকৃতি বর্ত্তমান স্বভাব নয়—যাহা insinctive, mental ও intellectual nature—উহা প্রকৃতির খণ্ড অন্ধমূর্ত্তি মাত্র, উৎসর্গ করিতে হইবে স্বভাবের কাছে নয়, ভাগবত প্রকৃতির কাছে। ভগবান তাঁহার শক্তিযোগে কর্ম্ম, সাধনা, লীলা সমস্ত সম্পন্ন করেন—উপর হইতে। নীচের স্তরে, মনে প্রাণে শরীরে উহারই গতি-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় মাত্র। উপরে যাহা সত্তায় নির্ণীত হয়, মনের পটে তাহারই কর্ম্মাদর্শ ফুটিয়া উঠে—এই অসংখ্য অপ্রত্যক্ষের মধ্য হইতেই আবার স্থূলে বাহ্য কর্ম্মের বাছাই হইয়া চলে। সাধারণ মানুষ স্থূলদৃষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ বলিয়া বাহিরের এই গতি-পরিবর্ত্তনটুকুই পরিলক্ষ্য করিতে পারে, কচিৎ কোনও কোনও সূক্ষ্মদর্শী ভাবুক চিন্তাশীল এই

বহিস্তরকের অন্তরালবর্ত্তী সূক্ষ্মতর ভাব ও শক্তিপুঞ্জের খেলা আবিষ্কার করিয়া ভিতরের যোগ-সূত্রটি আভাসে ধরিতে ছুঁইতে প্রচেষ্টা করেন। উহারও উপরে যে মূল কারণ রূপ—যাহা সকল কর্ম্মের গূঢ় শক্তি-উৎস তাহার সন্ধান আত্মনিষ্ঠ যোগীরই সাধন-লভ্য। উৎসর্গ নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হইলে এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কারণ রূপটিই মানুষের মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

মানুষের অশুদ্ধ স্বভাব সাধারণজীবন ছাড়া সাধকের অন্তর-জীবনেও বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকে, উপরের বিজ্ঞান-তনুটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা ও পরিশ্রম মানুষ আরম্ভ করিয়া দেয়। মন নিজেকে নিজে হত্যা করিবার বৃথা চেষ্টায় বার-বার পর্য্যুদস্ত হইয়া পরিশেষে অবসাদগ্রস্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ, মনের সাধ্য নাই আত্ম-ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া উপরের ধর্ম্মে আপনাকে পরিবর্ত্তন করিয়া তোলে। মন তাই নিরন্তর আত্মসংগ্রামে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া আকাশ পানে চাহিয়া দেবতার কাছে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থার একবার প্রতিষ্ঠা হইলেও উপরের শক্তির খেলা অনুভূত হইতে আরম্ভ করে। মনের মৃত্যু ঠিক মনের হাতে নাই, মনের উপরে যিনি আছেন তাঁহারই করুণা ধারায় স্নাত না হইলে মানুষের বিজ্ঞান রূপের পরিস্ফুরণ হয় না। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুম্ স্বাম্।

একদিনে মনের এই মৃত্যু হয় না। তিলে তিলে দিনে দিনে যেমন মন আপনাকে রূপে রসে গড়িয়া তুলিয়াছে, তিলে তিলে দিনে দিনে যেমন তাহার বর্ত্তমান স্বভাবের সংগঠন হইয়াছে, তেমনই ধীরে ধীরে প্রশান্ত অথচ ছেদহীন উপরের তপঃপ্রয়োগে এই স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। মন মরিয়াও মরিতে চায় না। হয়ত এই-বার শান্ত নিস্পন্দ হইল, আপনার চিন্তাকুল ক্লান্ত চিন্তা সংস্কার নিশ্চিহ্ন উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষায় উপরের দিকে তাকাইল। মনে হইল এইবার সমতার প্রতিষ্ঠা শেষ হইয়াছে। শক্তির প্রত্যক্ষ খেলা আরম্ভ হইবে। শক্তির অবতরণও ঘটিল। কিন্তু সেই উপরকার স্পর্শ লাভে মৃত কঙ্কালে ওই দেখ আবার প্রাণচিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। মরা মন যেন দানা পাইয়া ধড়মড় করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ জাগিয়া প্রভু হইয়া বসিয়াছে। এমন ঘটনা সাধকের অন্তর-জীবনে নিত্য উপলব্ধির সামগ্রী। উপরের শক্তিস্পর্শে অনেক স্থলে প্রথম প্রথম মনের শক্তিবৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে—প্রতীয়মান হয় যেন মন একটা শুদ্ধতর ক্ষিপ্রতর স্বচ্ছতর নূতন জীবনই পাইয়া বসিয়াছে। হায়, সে শুধু ক্ষীণ খদ্যোৎবিন্দু, স্বচ্ছ আলো তুরীয়ের জ্যোতিঃপ্রতিমারই ক্ষণিক ঝলক বিকাশ মাত্র—আবার সব নিভিয়া যায়, সমস্ত যে তিমিরে সেই তিমিরেই ফেলিয়া রাখিয়া যায়। এই উঠা পড়া, এই আলো আঁধারে আবর্ত্তন বিবর্ত্তন—ইহা সাধনার গতিরই পরিচয়।

বেদে আছে দিবা ও রাত্রি উভয়েই আর্য্যযোদ্ধার পরিপোষক, উভয়েই স্তনন্ধয়ী মাতা। উত্থান পতন গতিরই তরঙ্গ বৈচিত্র্য। যখন কিছুই হইতেছে না মনে হইতেছে, সব তমসাচ্ছন্ন, হৃদয় আছাড় খাইয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে—কে জানে উহাই নব-জন্মের পূর্ব্বচিহ্ন প্রকৃতির গর্ভবেদনা নয়। দেবাত্মার নবজন্ম মুহূর্ত্তে এই বেদনায় অশ্রু-সলিল উপশর্য্যা সকলকেই সহ্য করিতে হয়। প্রকৃতির মঙ্গলমধুর স্নেহস্পর্শে যখন কঠোর করুণার তীব্র কশাঘাতে ললাটে বেদনার রেখা টানিয়া দেয়, কে জানে তাহারই মধ্য দিয়া তাঁহার বিজয়লক্ষ্মী দেব-বীরের ললাট-প্রদেশে জয় তিলকই আঁকিয়া দিতেছে, দুর্ব্বোধ্য হৃদয়ে দিব্য শক্তির সিদ্ধ পীঠই প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সকল জয় পরাজয়ের মধ্য

ঘরের ন্যায় বোধ হয় বা দেশ কর্ম্মের এত বড় আয়োজন কোন দিন খসিয়া পড়িয়া যাইবে। এ সময়ে আমাদের কার্য্য আর কিছুই নহে কেবল জ্ঞানের বাতিটী ধরিয়া যাওয়া—ভিতরে দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিলে সময়ে ভিতর হইতে আমাদের একটা প্রতিষ্ঠা দাঁড়াইয়া যাইবেই।

এই কার্য্যটী করিতে যাইলে আড়ম্বরপূর্ণ সাময়িক দেশকর্ম্মে আর নিবিড়ভাবে মিশিতে পারা যায় না। উত্তেজনামূলক কোন কার্য্যে আত্মহারা হইয়া স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় দেশবাসীকে মুগ্ধ করা আর কিছুতেই সম্ভবপর হয় না—স্থিরভাবে জ্ঞানের শিখা ধরিয়া স্থির ও ভাব-ঘন কার্য্যে দেশের আত্মা শীতল করা ভিন্ন অন্যপথ অবলম্বন করা ত যায়ই না, বরং এইরূপ কার্য্যকে ভিত্তি করিয়া দেশের প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত করিবার জন্য দেশকে আহ্বান করিতে হয়। দেশের নিকট এ আহ্বান নূতন, কাজেই অনেক প্রশ্নই আমাদিগকে শুনিতে হয়। কোন একটী লোকের প্রতি দেশ মধ্যে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইলে বোধহয় বা প্রশ্নের চাপে তাহাকে পিষিয়া যাইতে হয়, কিন্তু কোন মণ্ডলী যদি এই প্রশ্নের উত্তর দানে কৃতসঙ্কল্প হয় তাহাকেও যে টলিতে না হয় তাহা নহে।

ভিতরের আলোক দেখিয়া কার্য্য করিবার জন্য দেশে স্থানে স্থানে যে সকল মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের সহিত আমাদের যোগ আছে। এইরূপ একটী মণ্ডলী [illegible]র হইতে একটা প্রশ্নে বড়ই বিব্রত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। প্রশ্নটী এই, অন্তর মলিনতা মুক্ত না হইলে যখন অন্তরের আলোক ফুটিয়া উঠে না তখন ভিতরের মলিনতা অরূপ বাহিরের মুক্তি না আসিলে আমরা কিরূপে ভিতরের মুক্তি পাইতে পারি? পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলীর নিকট কথাটী বড় সমস্যাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বলেন, "আমরা ত চিরকাল বলিয়া আসিতেছি ভিতর হইতে মুক্তি না আসিলে বাহিরের মুক্তি কিছুতেই সম্ভবপর নহে, ইহার অর্থ আমরা সরলভাবে এই বুঝি যে ভিতর হইতে মুক্তির জন্য একটা প্রবল বেগ অনুভব না করিলে বাহিরকে মুক্ত করিতে আমরা কিছুতেই সক্ষম হইব না, কিন্তু কার্য্যকালে আমরা যখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি বাহিরের অবলম্বন বিনা—গুরু শাস্ত্র কাল ও সঙ্ঘ—আমার অন্তরাত্মা কিছুতেই উদ্বুদ্ধ হয় না তখন বাহিরের স্বাধীনতার উপর যে ভিতরের স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে এ সার সত্যও আমাদিগকে মানিতে হইবে। তবে এই সত্যকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে কোন ধারাকে আমরা নিন্দা করিতে পারি, তা' বলিয়া বাহিরের স্বাধীনতার উপর অন্তরাত্মার স্বাধীনতাও নির্ভর করে ব্যবহারিক ভাবে আমরা কি তাহা স্বীকার করিতে পারি না?"

সহযোগী মণ্ডলীর সহিত এ-বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবার কোনই আবশ্যক ছিল না, কেবল জানিতে হইল ব্যাপারটির ঠিক ভিতরের খবরটা কি! মণ্ডলীর খটকা লাগিয়াছে এইখানে, যে, বর্ত্তমানে ভারতে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা সফল হইলে ভারতবাসীর আত্মমুক্তির পথ সুগম হইবে কি না, সহযোগী এখনও সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই কিন্তু টলিয়াছেন রাজনীতির দিকে—একা মহাত্মা গান্ধী অন্তরাত্মার বলে (Soul force এ) যখন ভারতকে এতটা অগ্রসর করিতে পারেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, তখন অন্তরাত্মার বলে বলীয়ান মণ্ডলীর পর মণ্ডলী যদি ভারতের রাজনীতিক মুক্তির জন্য লাগিয়া যায় তাহা হইলে অচিরে ভারতের বাহির ও ভিতর দুইই স্বাধীনতায় মণ্ডিত হইয়া যাইবে। কথা ভাল, কিন্তু ইহা যে কেবল—বিশ্বাসের কথা। বাহিরের স্বাধীনতা

আর ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা এক বস্তু নহে। বিশেষতঃ যখন স্বাধীনতা অর্থে আপাততঃ বুঝা যায় যেন তেন প্রকারেণ ইংরাজকে ভারত হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া। বাহিরের যে-স্বাধীনতা ভিতরের অবাধ ও স্বচ্ছ গতিপ্রবাহে মনের ময়লা ধুইয়া দিয়া অন্তঃকরণে স্বাধীনতাসূর্য্যের উদয় ঘটায় সে-স্বাধীনতাকেও যে চিনিতে হইবে। বাহিরের যে কোন স্বাধীনতা আমার অন্তরের প্রকাশকে সার্থক করিবে এই বিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত হইলে চলিবে কি?

আমরা বিশেষভাবে স্বীকার করি বাহিরের স্বাধীনতার আবশ্যকতা আছে কিন্তু যে স্বাধীনতা সকলের অন্তর-প্রকাশের সাহায্য করিবে তাহার মূলে একটি স্থির জ্ঞানের প্রদীপ চাই। একটা বড় দেশের রাজনীতিক মুক্তিকে দেশের সর্ব্বজনের অন্তর্মুক্তির সাহায্যস্থল করিয়া তুলিতে হইলে অধুনাপ্রচলিত রাজনীতিকমার্গ অবলম্বন করিয়া কেবল ভারতের শাসনচক্রটি অধিকার করিলেই হইবে না---সাধারণভাবে ইহা অধিকার করিবার পথেই কত সঙ্কীর্ণতা কত হলাহলবর্ষণ কত উৎপীড়ন একের উপর অন্যের কতটা চাপিয়া বসিয়া থাকা যে দেখিতে পাইব তাহাতেই ত আমাদের অন্তর কাঁদিয়া উঠিবে, তা'ছাড়া উন্নতমনা উচ্চচরিত্র দূরদর্শী ব্যক্তিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া দেশের জনসঙ্ঘ শাসনচক্র অধিকার করিলেই দেশের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে না। দেশের [illegible] এবং ক্ষত্রিয়গণ যে কোন এক রকমের শাসনচক্র নির্ম্মাণ করিয়া একান্ত তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য চালাইতে পারে। এখনও আমরা যে তিমিরে তখনও সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইতে পারি। কেবল এইটুকু দেখিতে পাওয়া যায় দেশের জনসাধারণের খাওয়া পরার জন্য এরূপ আয়োজনের আবশ্যকতা হইতে পারে, তাহাও ব্যর্থ হইবে যদি স্বাধীন ভারত অনর্থক বিদেশীর ভয়ে বড় বড় জাহাজ ও যোদ্ধা ও যুদ্ধসরঞ্জামে ভারতের জল ও স্থল পূর্ণ করিতে থাকে। মাত্র জাতীয় গৌরব ও জাতীয় শাসনচক্রকে জনগণের আত্মমুক্তির সহায়তা করিবার সর্ব্বাধিক সম্ভাবনাই আমাদিগকে একাজে নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু আমরা যে ঐরূপ এক বিশ্বাসবশে বাহিরের মুক্তির জন্য সাধারণ পথে অন্তরাত্মার বলপ্রয়োগ করিয়া চলিব তাহা যে একেবারেই মনগড়া কথা বা মনকে ভুলাইয়া অন্যে আমাদের ভিতর দিয়া ঐ কথা কহিয়া লইতেছে। অন্তরাত্মার বল কি সম্যক পাইতে পারি যদি অন্তরকে না দেখা যায়?

একের অন্তর্মুক্তি প্রথমে কিরূপে আসে তাহার কথা না তুলিয়া দেখিতে পাই অন্তরে তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া লোকে যখন আত্মমুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন ঐ ব্যক্তি সকলের জন্য একটা স্বাধীন পারিপার্শ্বিকতা সৃজন করিয়া দেয়—স্বাধীন আবহাওয়ায় মানবে নৃত্য করিতে না পারিলে ভিতরে একটা স্বচ্ছ গতিরই উদয় হয় না। অতএব বাহিরের স্বাধীন হাওয়ার আবশ্যক, তবে তাহার মূলে একটী প্রাণের সম্যক প্রতিষ্ঠা চাই, সেই প্রাণে প্রস্ফুটপদ্মরূপে অবলোকন করিতে পারে বাহিরের কোন্ স্বাধীনতা অন্তরের কোন্ স্বাধীনতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া চলিবে। কেবল বিশ্বাসে কার্য্য করা যায় না।

অনেকগুলি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্ঘাত্মাকে আশ্রয় করিয়া যখন বহুল জনমণ্ডলী আত্মজ্ঞানের পথে চলিতে থাকে তখন সেই সঙ্ঘ তাহার আবেষ্টনের মধ্যে জনমণ্ডলীর জন্য বাহিরের অভাব নিবারণের ও বাহিরের স্বাধীনতাদানের নব নব ক্ষেত্র সৃজন করিয়া দেশে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। এখন ভারতের আত্মা যাহা চাহিতেছে তাহা এই সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাই। এই সঙ্ঘ রচনার দ্বারা দেশে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্ঘতলে মানবকে বাহিরের অনেক

অর্থবলেরও সংগ্রহ ও উপচয় সাধনে যথেষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছেন। অন্তর-সাধনাটি স্পষ্ট মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শক্তি-প্রেরণাটি সংহত ও তপঃশুদ্ধ হইয়া অমৃত অবাধে খেলিয়া উঠিতে পারিতেছে না—বাঙ্গালীকে তাহার অতীত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া আজ সকল ব্যর্থ সম্ভাবনাকে চিরদিনের জন্য পরিহার করিতে হইবে।

আমরা চাই অন্তর বল, আর সেই অন্তরের অনিবার্য্য ও অব্যর্থ শক্তিপ্রয়োগেই জাতির জীবন হইতে দুর্ভিক্ষ ও দৈন্য রাক্ষসীর তিল তিল রক্ত শোষণ চিরদিনের জন্য নিরস্ত করিব—জাতির অন্ন-প্রতিষ্ঠান, জাতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিব—ইহার জন্য তরুণ মণ্ডলীকেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে। যে শিক্ষা, যাহাতে ভারতীয় চরিত্র গঠন হইয়া উঠে, ভারতীয় অধ্যাত্ম-শক্তি নূতন যুগোপযোগী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জাতির জীবনে মহত্ত্বের বীজ রোপণ এবং সত্য রূপটির প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারে—ভারতের ভাগ্যদেবতা নিভৃত বিজ্ঞানলোকে ভবিষ্যৎ মানব জাতির যে মহান ও সার্থক অধ্যাত্ম রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও প্রাণ মনের অতীত এক বিজ্ঞানময় দিব্য ছাঁচ অসীম ধৈর্য্যে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছেন—সেই গূঢ় বিজ্ঞান শিক্ষাটিই ধারণা, অধিকার ও প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত ও বিশুদ্ধ জাতীয় শিক্ষা—এই জাতীয় শিক্ষার সত্য ও আসল পথটি আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। জাতির জীবন যজ্ঞে এই মহৎ শিক্ষা-ব্রত লইয়াই আমরা আজ উপনীত হইয়াছি—বিদ্যাপীঠ নূতন শিক্ষার একটি গূঢ় ও পক্ক বীজ মাত্র—যা প্রাণ হৃদয় ক্ষেত্রে এই সিদ্ধ বীজ এইবার বহু ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাহারই জন্য অর্থ প্রতিষ্ঠান।

আমরা বড় বড় কথা জানি না, রাজনীতি সমাজনীতি বুদ্ধির সকল জটিল কূটনীতি মাথায় পুরিয়া কেবল উত্তেজনার কচকচি করিতে আদৌ উৎসুক নহি—আমরা বুঝিয়াছি সরল স্পষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়া—এই মুমূর্ষু জাতিকে বাঁচাইয়া তোলাই এক্ষণে একমাত্র ভাগবত ইঙ্গিত; বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে স্বাধীন জীবনপ্রতিষ্ঠানে, এখন যে মুহূর্ত্তটি আকাশ পানে তাকাইয়া সুখস্বপ্নের ধ্যানে কাটাইবে, সেই মুহূর্ত্তটিতেই ধ্বংসের বীজ জীবনের মূল প্রদেশে শিকড় গাড়িয়া বসিবে—জাতীর জীবন আজ টলমল—হয় বাঁচা নয় মৃত্যু, আজ এই উভয় সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী তোমার ভাগ্য নির্ব্বাচন করিয়া লও—বাঁচিতে হইলে কঠোর তপস্যাই চাই। তিল তিল করিয়া আত্ম উৎসর্গের অবদান কুড়াইয়া অক্ষয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তোল।

বাঁচিতে হইবে, অন্ততঃ দুই বেলা পেট ভরিয়া দুই মুঠা স্বাধীন অন্নের সংস্থান উদ্দেশ্যে আজ প্রত্যেক আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবককে এখনই ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্নযজ্ঞে উপেক্ষা করিয়া যে আজ যোগ, ধর্ম্ম, সাধন ভজনে সমুদ্যত হইবে, পৃথিবীমাতা স্বয়ং তাহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া সাধনায় বিঘ্নাচরণ করিবেন—বুঝিতেছ না, হে বাংলার জনসাধারণ, লক্ষ্মীহারা তোমার কোন ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতিষ্ঠাভিত্তি অচল অটল হইতে পারে? অন্নের সংস্থান কর, আত্মরক্ষা কর, স্বাধীনতার বিজয় মন্দির প্রতিষ্ঠা, মেরুদণ্ডহীন জাতির পক্ষে নিদারুণ বিদ্রূপকর ব্যর্থতারই আয়োজন নহে কি—অগ্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, তবেই সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি সব কিছুই প্রাণের মহিমা ধর্ম্মে উজ্জ্বল ও সত্য মণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

এই জন্য ফাঁকা কল্পনা ও কথার ফাঁকিবাজি লইয়া একটী মুহূর্ত্ত ব্যর্থ করিতে আমরা তরুণ মণ্ডলীকে নিষেধ করিতেছি। তপস্বাদের আবেদনের যাহার জীবনে আজ তীব্র করুণ স্বরে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে তাঁহারা আমাদের এই করুণ হৃদয়-ক্রন্দনের মর্ম্ম

বুঝিবেন, বাংলার আত্মশিক্ষার ভার বাঙ্গালীকেই আজ নিজ স্কন্ধে সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া লইতে হইবে, স্বাবলম্বন হইবে প্রত্যেক বঙ্গ যুবকের একমাত্র জীবন নীতি, আত্মোৎসর্গই আমাদের ধর্ম্ম; বিদ্যা, ধন, সামর্থ্য, স্বাস্থ্য আজ সবটুকু অঞ্জলি পুরিয়া জাতি-দেবতার চরণে ধরিয়া দাও—দাঁড়াইয়া যাও—সারি সারি তরুণ শক্তি-সাধক বাংলার তপঃক্ষেত্রে আজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবন-বেদী সুরক্ষিত করিয়া তোল। জাতি-দেবতার প্রলয় হুঙ্কার যদি অন্তরে তোমার সত্যই রুদ্র-মন্দ্রে গর্জ্জিয়া উঠিয়া থাকে—আর সংশয়ে পথবিভ্রমে এতটুকু শক্তি ক্ষয় করিও না।

চাই জেলায় জেলায় শক্তি সাধনার কেন্দ্র, চাই গ্রামে গ্রামে শিক্ষাপীঠ, সেখানে কোনও উত্তেজনা-কুহক, কোনও বিদ্বেষমন্ত্র আমরা প্রচার করিব না—কোনও গুপ্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া জাতিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে চাই না—বাঙ্গালীকে আজ সরল স্বচ্ছ পথে অভিযান করিতে হইবে—ছয় বৎসর হইতে ঊর্দ্ধ বয়স্ক প্রত্যেকটি শিশু সন্তান, প্রত্যেকটি বালক বালিকা জাতির ভবিষ্যৎ বীজসৈনিক—ঐখানেই জাতির মহৎ ভবিষ্যৎ প্রকৃতিজননী গোপন অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছেন—শিশুকে উপেক্ষা করিও না—বীজ-জাতিকে মাতৃস্তন্য ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অমর শিক্ষায় পুষ্ট ও অভিষিক্ত করিয়া তোল। ইহার জন্য যে বিপুল অথচ অনাড়ম্বর আয়োজন করিতে হইবে, তাহার পরিপূর্ণ চিত্র অন্তর্জগতে সমস্ত থরে থরে সাজা-ইয়া রাখিয়াছি। শত শত তরুণ ক্ষাত্র-সাধক সিংহ-বীর্য্যে সেই ভার মাথায় লইয়া সমগ্র বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই আজ আগুয়ান হইল—বাংলার সমাজ, বাংলার উৎসর্গ-উৎসুক দেশহিতৈষী সুধীজন, গৃহস্থকুল—আজ তোমরা এই শত শত সর্ব্বস্বত্যাগী ভাগবত মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ স্বদেশ সাধকের কর্ম্মক্ষেত্র অনুকূল ও বাধাহীন করিয়া দাও। যাহার যাহা সামর্থ্য, হৃদয়ের সহানুভূতি, অর্থের আনুকূল্য—সবটুকু দিয়া এই পল্লী-স্বরাজ প্রবর্ত্তকগণের ব্রতসাধনা ও কর্ম্মসাফল্যের সহায়তা কর। হে দেশ, আজ তোমার দ্বারে ভিখারী সাজিয়া ইহারা চলিল—এই নূতন বীর সাধকসংঘ—এই ভবিষ্যৎ ভারতের অগ্রণী সেনানীকুল—বাংলার বিভিন্ন জেলায় ইহারা কর্ম্মবেদী রচিয়া তুলিবে, ব্রহ্ম-বিদ্যার সঙ্গে জীবনবিদ্যা, অধ্যাত্মের সঙ্গে অর্থশিল্প,—পল্লীশিক্ষার জীবনপ্রদ, মহত্ত্বপ্রদ, সত্য ও ধর্ম্মের উদার সমন্বয়পূর্ণ মঙ্গল পতাকা উড়াইয়া আজ কাতারে কাতারে ইহারা অভিযান করিতেছে—জাতির অন্তর-মুক্তি, জাতির দিব্য শিক্ষা, জাতির অন্নসংস্থানই ইহাদের মন্ত্র, ইহাদের ব্রত, ইহাদের জীবন সাধনা। এক একটী দেশ-কেন্দ্রে এক একটী শক্তি-বীজ ছড়াইয়া দিলাম—এক একটী কেন্দ্রে শত বাধা বিপত্তি পায়ে দলিয়া বারম্বার রক্তাক্ত হইয়াও ইহারা নব জীবনের প্রতিষ্ঠা করিবে, নবভাবের উদ্বোধন করিবে—জীবনধারণোপযোগী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে বিদ্যাসংঘের সৃষ্টি করিবে। ইহারা আজ কপর্দ্দকশূন্য রিক্তহস্তে ঘোর অজ্ঞানতার শিবিরে কুণ্ঠাহীন হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে—দেশবাসী, বাংলার গৃহস্থকুল, আবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া হাঁকিতেছি—সাড়া দাও, অনুকূল হও, দেশসেবার নিমিত্ত এই শত শত প্রথম কর্ম্মীকুলের শূন্যহস্ত তোমাদের হৃদয় দানে পূর্ণ করিয়া দাও।

ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ [দশম সংখ্যা

অবস্থা ও কাজ

যুদ্ধোদ্যমের সূত্র উপলক্ষ করিয়া গবর্ণমেণ্টের চক্ষে যাঁহারা বিপ্লববাদী বলিয়া সন্দেহভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিনাবিচারে তাঁহারা অবরুদ্ধ হয়েন। সে ঘোরতর আতঙ্কের যুগে বাংলায় রাজনৈতিক সাধনা ম্লান হইয়া পড়ে। গুপ্ত-পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া শচীন্দ্র যে দিন আত্মহত্যা করিল, অবরুদ্ধগণের মধ্যে কয়েক জনের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল, কাহারও বা স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া প্রাণবিয়োগ হইল, তখন বাংলায় ইহা লইয়া দেশনেতৃবৃন্দের একটু সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের এতদ্বিষয় লইয়া নির্ভীক আলোচনার কথা আমাদের স্মরণ আছে— ইহার প্রতীকার আশায় আমরাও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম, রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে কলিকাতার প্রতিবাদ সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "প্রবর্ত্তক" হইতে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের উক্তি সমর্থন করিয়াছিলেন, দেশের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই—রাজনৈতিক সংশয়ভাজন সকলেই এক্ষণে মুক্ত, সকলেই স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার লাভ করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

বাংলার কয়েকজন কর্ম্মী ভারতরক্ষা আইনে আবদ্ধ না হইয়া এতদিন আত্মগোপন করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি মুক্তি পাইয়াছেন—এ সংবাদ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে, সদাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতের জন্য উঁহার উপর কোন লিখিত অথবা কথিত বন্ধন আরোপ করেন নাই—সুতরাং হৃদয়ের অজস্র ধন্যবাদ স্বতঃই উদয় হয়—আমরা ইহার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

তারপর সর্বজন পরিচিত উদারচরিত্র অমরেন্দ্রনাথের জন্যও আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই—সে বিষয়েও সফলকাম হইয়াছি কিন্তু "Standard Bearer" "প্রবর্ত্তক" "নবসঙ্ঘ" "বিজলী" "Servant" "Amrita Bazar Patrika" প্রভৃতিতে তাঁহাকে আহ্বান করা সত্ত্বেও—এপর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, খুব সম্ভব তিনি আবার দূর দেশে গিয়া পড়িয়াছেন—স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করুন—ইহাই আমাদের অন্তরের ইচ্ছা।

অবশিষ্ট এখনও যাঁহারা আত্মগোপন করিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে আমরা শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নলিনী করের সংবাদ পাইয়াছি—তাঁহাদের মুক্তিও আসন্নপ্রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর এযাবৎ কোনই সংবাদ নাই, এতদ্ব্যতীত রাজনীতিক সংশয়ভাজন আর কাহারও বিষয় আমরা অবগত নহি—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে—এরূপ আত্মগোপন না করিয়া তাঁহারা অনায়াসেই আমাদের নিকট আসিতে পারেন, অবস্থা বুঝিয়া প্রতীকার অসম্ভব হইবে না—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর কথা। আমাদের আশা ভারত গবর্ণমেণ্ট অতীতের সকল স্মৃতি মুছিয়া একেবারে সকলকেই মুক্তি দিন—রাজবর্ণে বর্ণে সত্য হউক, রাসবিহারীবাবুর জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা করিতেছি তাহা সফল হইলে আমরাও অকৃতজ্ঞ রহিব না।

এইবারে আমরা রাজনীতিক বন্দীদের কথা উল্লেখ করিতে চাই। বাংলায় বিদ্রোহ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন বারীন্দ্র, তারপর যাহা কিছু হইয়াছে তাহা উঁহারই অঙ্কুর মাত্র। সেই বীজপুরুষ যদি মুক্তি পাইতে পারেন, তবে স্বদেশীর জের মিটাইয়া সকলকেই মুক্ত জীবন দান করা রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়। রাজা বাজারের বোমার মামলায় অভিযুক্ত শ্রীমান অমৃতলাল হাজরার বিষয় লইয়া আমরা কিছু চেষ্টা করিয়াছিলাম, এতাবৎ তাহার কোনই সুফল দেখা যায় নাই—বরং সংবাদ পাওয়া গিয়াছে অমৃতলাল কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে মুমূর্ষু, ভগবান না করুন এই উন্নতমনাঃ, স্বদেশপ্রেমিক যুবকের যদি মৃত্যু হয়, দেশের বুকে এমন শেল বিদ্ধ হইবে যাহা আর কোন উপায়ে উপড়িয়া ফেলা সম্ভব হইবে না। অনেক ক্ষত আমরা স্বেচ্ছায় শুখাইয়া ফেলিয়াছি—ক্ষতের উপর ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ করা হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কেবল অমৃতলালের মুক্তিই যে আমরা প্রার্থনা করিতেছি এরূপ নহে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের জের না মিটিলে অতীতের চূড়ান্ত উপসংহার হইবে না—রাজার করুণা বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য করিবার জন্য রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের এইদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে রাজা প্রজা উভয়েরই যে কল্যাণ হইবে, এ বিষয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা দেশের অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। যদিও অসহযোগীতারূপ রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার স্থানে স্থানে কিছু কিছু উত্তেজনা দেখা যাইতেছে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অটুট থাকায় ইহার মধ্যে অকল্যাণ অশান্তির ছায়াপাত একেবারেই নাই। রাজশক্তির ব্যবহার প্রজার মনে যদি অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তাহার অভিব্যক্তি না হওয়াই একটা আতঙ্কের কথা। মহাত্মাজীর প্রাণপাত পরিশ্রম রাজশক্তির করুণা উদ্রেক করিবে ইহাও আমাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলে কোনরূপ বিভীষিকার চিহ্ন নাই—তাহা মহাত্মাজীর সম্প্রতি সিমলা গমনের ফলেই বেশ বুঝা যায়; তিনি প্রজার অভিমান জাগ্রত করিয়া, রাজশক্তির নিকট হইতে শীঘ্র শীঘ্র প্রতীকার যাহাতে হয়—তাহারই জন্য সচেষ্ট আছেন। লর্ড রিডিং মহোদয় একথা বুঝিলেও ভারতীয় শাসনপদ্ধতির কঠোর বন্ধন এড়াইয়া তিনি যে উপস্থিত কিছু করিতে অসমর্থ একথা জ্ঞাপন করিয়াছেন—ইহাও ইংরাজ রাজনীতির একটা বড় চাল। গভর্ণমেণ্ট পরমুহূর্ত্তে যাহা করিবেন পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তদ্বিষয়ে একটা বড় "না" বলিয়া থাকেন; মহাত্মাজীর তপস্যা সিদ্ধ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই—এই কয়েক

মাসের মধ্যে ভারতবাসীর আশানুরূপ স্বরাজলাভ এক প্রকার অসম্ভব হইলেও তিনি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গেলেন—কোটী কোটী পরাধীন মানুষের জীবনে যে আশার অঙ্কুর ফুটাইয়া দিলেন তাহা এই অবস্থায় তিনি ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

এক্ষণে দেশের সম্মুখে যে কাজ দেখা যাইতেছে তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য বহু সহস্র অক্লান্ত কর্ম্মী যুবকের প্রয়োজন। রাজনীতিক সাধনায় আমরা অনেক পরে, রাজ্যরক্ষা অধিক মাত্রায় লাভ করিতে পারি, রাজার সাথে অবিরোধে কলায় কলায় আমাদের উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ ভাবে চিরদিন চলিলে আমাদের মনুষ্যত্ব দিনে দিনে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া দেশটী একেবারেই পঙ্গু হইবে। [illegible] বড় করিয়া তুলিবার জন্য রাজনীতিক সাধনা বর্ত্তমানে অনুকূল নহে। আত্মচেষ্টায় প্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের এই পরাধীনতা সম্পূর্ণ হইতে একেবারেই মুক্তি পাইতে হইবে। শক্তি ও সময়ের অপব্যয় ইহাতে যতখানি হয়, ততখানি শক্তি ও সময় আত্মগঠনের জন্য ব্যয় করিতে পারিলে তাহা যে এতদিন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিত সে বিষয়ে আমাদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বাংলায় আমরা দুইটী কাজে সকল বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ দেখিতে চাই—এই দুইটী দিক্ যদি পূরণ করিয়া তুলিতে পার, জগতে তোমরা অপরাজেয় হইবে। প্রথম শিক্ষা, দ্বিতীয় অর্থ প্রতিষ্ঠান।

বাংলায় যত সুকুমারমতি বালক আছে—তাহারা যাহাতে গোড়া হইতে ভারতীয় ভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার আয়োজন কর। রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে যে জাতীয় বিদ্যালয়ের কথা উঠিয়াছে—উহা সোণার পাথর বাটী, উহা দ্বারা কিছুই হইবে না, উত্তেজনার বন্যা চিরদিন থাকে না। আজ যে সকল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সংবাদ পাইতেছি ফলে তাহার মধ্যে অনেকগুলির তিরোধানও লক্ষ্য করিতেছি। প্রথম, বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন যিনি তাঁহাকে তপস্বী হইতে হইবে—একেবারেই সমগ্র দেশকে আমরা আমাদের বিদ্যামন্দিরে স্থান দিতে পারিব না, কিন্তু অগাধ উৎসাহ ও প্রাণশক্তি লইয়া আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে, অটুট ধৈর্য্যে অতীতের যত বিরোধী শক্তি আছে তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া একবার যদি নববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন দেশের আদর্শস্বরূপ গড়িয়া তুলিতে পার, দেখিবে দেশ শিক্ষায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আমরা এই পঞ্চদশ বর্ষ ধরিয়া নিভৃতে এই শিক্ষাকেন্দ্রের তপস্যা করিতেছিলাম আজ আমরা সার্থক হইয়াছি, আমাদের বিদ্যাপীঠ ছাত্রপূর্ণ হইয়াছে, এইবার আমরা দেশের চতুর্দ্দিকে এই সকল শিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রেরণ করিতে চাই- বিনাড়ম্বরে, বিনা উত্তেজনায়, সংভাবে নীরবে শিক্ষার অমোঘ মন্ত্রসাধনায় বাঙ্গালী উদ্বুদ্ধ হও—উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর এই বিশ বৎসর অতিক্রম হইয়া যায়—পাশ্চাত্য জগতে দেশগত সাধন করিয়াছে, একবার দশটী বৎসর তোমরা মুখ বুজিয়া ভারতীয় সাধনায় নিরত হও—বৃককেদের মত প্রকৃতির সহস্র অত্যাচারে তোমার পৃষ্ঠ ভগ্ন হইয়া পড়ুক—সিদ্ধির জয়মন্ত্র তোমার কণ্ঠে একদিন ধ্বনিয়া উঠিবে—একথা নিঃসন্দেহ জানিও।

তারপর অর্থ প্রতিষ্ঠানের কথা। আর সুখ বিলাসের জন্য নহে—এই শিক্ষাব্রত সার্থক করিতে একদল লোক স্বাধীন উপজীবিকার দ্বারা প্রচুর ধন আহরণ করিতে থাক - যে সকল পতিত জমি বাংলার বুকে হাহাকার করিতেছে তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়,—সন্তানের ক্ষুধায় শুষ্ক ধরণী ক্ষীরধারা বর্ষণ করিবে—বড় বড় চালানী নৌকায় হাল ধরিয়া দেশদেশান্তর স্থান হইতে স্থানান্তরে কাঁচা মাল সরবরাহ

কর, গ্রামে গ্রামে বস্ত্রবয়নের কারখানা বসাইয়া দাও, কৃষি শিল্পে-বাণিজ্যে দেশ ছাইয়া ফেল—কেবল মনে রাখিও এই অর্থ সংগ্রাম নিজের জন্য নহে, কেবল স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য নহে—জননী জন্মভূমির জন্য।

আমরা এই যে বলিতেছি ইহা আমাদের ফাঁকা উপদেশ নহে, আমরা যাহা করি না তাহার উপদেশ দিই না—সেকথা শুনিবে কে—এইরূপ মটকায় বসিয়া যে—দেশকে ইহা কর উহা কর—বলিয়া উপদেশবাণী বর্ষণ করে, কাণে আঙ্গুল দিয়া তাহার কথা অগ্রাহ্য করিবে—দেশের যে সঙ্কট অবস্থা—পূর্ণ অভিজ্ঞতা না জন্মিলে কাহারও কথা শুনিয়া কাজে নামিলে ব্যর্থ হইতেই হইবে। আমরা অনেক ব্যর্থ হইয়াছি—অবসাদে আমাদের জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে—পুনঃ পুনঃ কেবল অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য কর্ম্ম করিলে আমরা আর বাঁচিব না; এক্ষণে চাই সিদ্ধকর্ম্মী—নৌকার হাল ধরিয়া এবার ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে—মাঠে হাল চষিতে চষিতে জাতির কথা আলোচনা করিতে হইবে—অসংখ্য ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে গ্রামের ধারে অশ্বথ বৃক্ষমূলে বসিয়া এবার উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াই এবার আমাদের ধর্ম্ম সাধনা, তাই বলিতেছি রাজনৈতিক সাধনার দিন আর নাই; টঙে বসিয়া দেশকে জাগো উঠো বলিবার দিন ফুরাইয়াছে কে আছ জনক অজাতশত্রু সোণার দেশ রক্ষা করিতে আর একবার তোমরা কর্ম্মের মাঝে ব্রহ্মমন্ত্রে আমাদের দীক্ষা দাও।

দখিণে বাতাস

—:০:—

Chief difficultyই হচ্ছে এইখানে—মনের কবল এড়িয়ে উঠা। মনের ছলনা অসীম—উপরের কিছু নেমে এলো—অমনি পুরাতন মন—যেন ওৎ পেতে বসেছিল—তার উপর গিয়ে rush করে' পড়্‌লো। নিজে সেইটা use করতে আরম্ভ করে দিলে। পরক্ষণেই দেখা যায় কোথায় কি একটা গণ্ডগোল ঘটে গিয়েছে। Will এর দিক দিয়েও ঠিক ঐ রকম। একটা নেমে এলো—অমনি পুরানো will তার উপর অভ্যাস মত চড়াও হয়ে পড়্‌লো। খানিক চলেই দেখা গেল—Something was wrong in the way—তখন আবার শান্ত অবস্থায় ফিরে এসে বসতে হয়। আবার সব ঠিক হয়। এই রকম মনের ছন্নছাড়া activity অনেক দিন ধরেই চলে। ধৈর্য্য অবলম্বন করে' এই মনের ভোগগুলা কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে। তারপর ক্রমেই মন শিষ্টতর হ'তে আরম্ভ করবে।

*　　*　　*

দুই রকম সাধনা আছে—এক নিজের তপস্যা। কর্ম্মযোগ কিম্বা জ্ঞানযোগ। এ সাধারণ জ্ঞানযোগের কথাই বলছি। সমস্ত পৃথক হয়ে দ্রষ্টাভাবে দেখে যেতে হয়—মনের ভিতর কি কি desire, impulse, thoughts সব উঠ্‌ছে পড়্‌ছে। উদাসীন হয়ে দেখতে হয়—কিছুতেই identified হ'তে নেই। প্রথম প্রথম আগে মিশিয়ে পড়্‌তে হয়, তারপর দৃষ্টি পড়ে। ক্রমে অভ্যাস হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে দর্শনে পড়ে। সমস্ত অনুভূত হয় প্রকৃতিরই ত্রিগুণের ক্রীড়াতরঙ্গ

psychical cultureও সম্ভবপর—কিন্তু তাতে dangerও আছে। Psycho-spiritual অনুশীলনই উপকারী। তবে physical, psychical, psycho-spiritual (ভাব সাধনা) এ সমস্তেরই স্বরূপ সত্য experience করতে গেলে supramental natureএই উঠতে হবে।

* * *

সংজ্ঞান—হচ্ছে ভগবান যে চক্ষু কর্ণ দিয়ে দেখেন শোনেন—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং চক্ষুষঃ চক্ষু প্রভৃতি। ভগবান দেখেন আগে বস্তুর আসল স্বরূপ, কারণকে, তার পর নানা কল্পনা সম্ভাবনার রঙের খেলা—শেষে বস্তুতন্ত্র স্থূল কার্য্য—imperative অধ্যাত্ম সত্য, possible এবং potential, psychical সত্য, এবং পরিশেষে স্থূল physical সত্য। আমরা উল্টা দিক থেকে সব দেখি। আগে দেখি স্থূল বাস্তব, তার পর সূক্ষ্ম সম্ভাবনা, শেষকালে উঁকি ঝুঁকি মারি উপরের অধ্যাত্ম কারণে। এই জন্য আমাদের এত difficulty—আসল সত্য দর্শনে। ভাগবত দৃষ্টি পেলে আমরা দেখ্‌বো যথার্থ সত্য, তার মধ্যে তার যত কিছু সম্ভাবনা কল্পনা, আর বাস্তব সত্য প্রকাশও। God said—Let there be light and there was light—আলোক দেখা আর আলোক হওয়া দুইই সেখানে যুগপৎ—কারণ, সত্য সেখানে পূর্ণ অখণ্ড।

* * *

সেই রকম ভাগবত আনন্দও। ভগবানের যেটা আনন্দ সেইটাই ঘটে—অনিবার্য্য ক্রমে ঘটে। আমরা সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব বোধ করি। দুটাই আনন্দের প্রকারান্তর। আমাদের receiving powerটা খণ্ডিত বলে'—অর্দ্ধেক sensationএ দুঃখই পাই। এ দুঃখ সনাতন নয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায়—খুব তীব্র pain হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। তার কারণ, painও আনন্দই—একটা চরম মাত্রা অতিক্রান্ত হ'লে তার ভিতরের আনন্দটাই released হয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়ে। ভগবান সমস্ত enjoy করেন। বেদে supermind—বিজ্ঞান-সূর্য্যের চারি দেবরূপ—বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও ভগ। ভগ—ভোগ-স্বরূপ। ভগবান ভোগময়। grief ও painএও আনন্দ আছে—বাহিরের প্রাণের ভিতর থেকে আর একজন সমস্ত দ্বন্দ্ব-রসের আনন্দ আস্বাদন করে। তবে এই বেদনার আনন্দের আসল উৎসমুখটুকু খুলে দিতে হবে—তখন পূর্ণ দিব্য ভোগ উৎসরিত হয়ে উঠ্‌বে।

* * *

ভারতের সাধনার বেশ একটা ক্রমধারা দেখা যায়। প্রথম বৈদিক যুগ—ঋষিরা psychical ও spiritual অনুভূতি যোগে উপরে বিজ্ঞান সত্যে উঠ্‌ছিলেন। সে এক মহিমাময় যুগ—মানুষ উপরে দেবতার জগতে উঠ্‌ছে—দেবতাকে জীবনে জন্ম দিচ্ছে—দেবাসুরের সংগ্রামভূমি রূপে নিজেকে পেতে দিয়ে দেবতাকে জয়ী করে' তুলছে। সে খুব intimate experience—তার পর মানুষ সেই বেদ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মণগুলিতে কত সব ছড়া উপকথা—বেশ বোঝা যায় মানুষ আসল সত্য হারিয়ে ফেলেছে। উপনিষদের যুগে মানুষ আর একবার সত্য অন্বেষণ করেছে। এবার psychical experience নয়—Intuitional experience দিয়ে। বেদের মানুষ যেমন উপরে উঠ্‌ছে—উপনিষদের মানুষ বেশ বোঝা যায় তেমনি উপর থেকে নাম্‌ছে। এই জন্য উপনিষদের সত্য সব খুব উদার মহান্‌—সত্যের উলঙ্গ সুস্পষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ—তবে বেদের সত্যের মত intimate নয়। তবুও, উপনিষদ একটা বিরাট অধ্যাত্ম যুগ। উপনিষদের ঋষিরা তর্ক জানিতেন না, জানিতেন দৃষ্টি—কে কি বিচার তর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা নয়—কে কি দেখেছেন—এই ভাবেই ঋষিরা পরস্পর অনুভূতি মিলাইতেন—অন্য অনুভূতিকে

তাহার মুখ দিয়া তখন ভারতের বিরুদ্ধে কতকগুলা মন্দ কথা বাহির হইয়া যায়। সাহিত্যিক ও কবি হইলে ঝোঁজ করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার পুরাতত্ত্ব খুঁজিয়া কতকগুলি তত্ত্বকথা শুনাইয়া দেয়। ইহারাই হন বাঙালী বনাম ভারতবাসীর একপক্ষ আর পূর্ব্বোক্ত ধুরন্ধরগণ তাহার অন্য পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

পাণ্ডব ও কুরুপক্ষের ঐরূপ ভীষণ সংগ্রামের সময়ে অরবিন্দ-কথিত যুদ্ধের অধ্যাত্ম রহস্য ও জীবনের পরম ছন্দের কথা—এ কথা কি আমরা তলাইয়া বুঝিতে পারিব? যদি কখন জীবনে ইহা ধারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভারতের সকল সমস্যাই একদিনে মিটিয়া যায়। বাঙালীকে জীবনের ছন্দ আবিষ্কার করিতে হইবে, পূর্ণরূপে নিজেকে পাইতে হইবে। যদি কেহ ভারতবাসী থাকেন তাঁহাকেও ভারতের রূপটী basisটী জীবনে পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে হইবে—যতদিন না তাহা হইতেছে ততদিন আমাদিগকে বাঙালী বনাম ভারতবাসীর দ্বন্দ্ব দেখিতে হইবে, তাহা অতি শূন্যগর্ভ—শূন্যহস্তে একান্ত শূন্যে আস্ফালনা।

ভারতের নাম করিয়া প্রাদেশিকতা বর্জ্জনের যে কথা থাকে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলাকে তেলেগুর পক্ষে অন্ধ্রদেশকে এবং গুজরাটীর পক্ষে সৌরাষ্ট্রকে পূর্ণরূপে সত্যরূপে পাইবার জন্য একটা বিশেষ সাধনা-বিশেষ। আর যাঁহারা প্রাদেশিকতাই জীবনে ধ্রুবতারা করিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ সেটুকু সহজ স্বচ্ছ ও ভোগপূর্ণ জীবন পাইয়া যাহারা অন্য কথায় কাণ দিতে চান না এবং তাহাকে তাহার প্রদেশধর্ম্ম দেশধর্ম্ম এবং জীবনধর্ম্ম বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার পোষণ করেন, তাঁহারাও একটা কাজ করিয়া থাকেন। যখন মানুষের অন্তরাত্মা আর সঙ্কীর্ণতায় থাকিতে চায় না তাহার ভিতর হইতে সঙ্কীর্ণতাজনিত একটা বেদনা উপলব্ধ হয়, তখন অন্য একটা বৃহত্তের টান সে অনুভব করিয়া থাকে—সে জানেনা সেটা কি, তথাপি বাংলা প্রদেশ, ভারতবর্ষ দেশ অতএব বৃহৎ এ জ্ঞান তাহার আছে। তাহার ভিতরে যে সঙ্কীর্ণতা আছে বাঙালীগন্ধে তাহা প্রতিষ্ঠিত ছিল—যদি ভারতকে কোনরূপে নিজের মধ্যে স্থাপিত করা হয় ভারত বৃহৎ বলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া যাইবে—এরূপ ভাব লইয়া স্বতঃই সে বৃহত্তের টানকে ভারতের টান বলিয়া ধরিয়া লয়। এটা ধরিয়া লওয়া—ভারতবর্ষ তাহার জানা নাই সকল প্রদেশের ভাল জিনিষগুলি বা সকল প্রদেশে গৃহীত হইতে পারে, এরূপ জিনিষগুলি অঙ্গে জড়াইয়া সে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাকেই ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ বলিয়া ঢক্কা বাজাইতে থাকে। প্রাদেশিক খণ্ডজীবনে উৎফুল্ল ব্যক্তিদিগের বিদ্রূপবাণে ইহাদের আবরণ যত শীঘ্র ছিন্ন হইয়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বৃহত্তের দিকে যে টান আছে তাহার মধ্যে একটা দিব্য ঊর্দ্ধমুখী সত্য রহিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিকতার মধ্যে একটা খণ্ড অথচ জীবন্ত ও উৎফুল্ল জীবনের সত্য থাকিলেও তাহা অপেক্ষা ইহার মূল্য খুবই অধিক।

আমরা সাধারণতঃ বাঙ্গালী বলিয়া যে গর্ব্ব করিয়া থাকি তাহাকে ধরিয়া আছে বাঙ্গালীর একটা সত্যরূপ যাহার উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী বিনা বিরোধে ভারতের ও জগতের সহিত একটা সত্য-অনাবিল ও সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। এই সত্যাদর্শনের পথে তাহাকে কে যেন ভারতের ও জগতের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। বাঙ্গালীকে সে কি জানেই না, বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ আবরণ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া পীড়িত করিতেছিল সে-সময়ে অন্তরে বৃহত্তের ক্রন্দনধ্বনি তাহাকে ভারত-পথ অবলম্বন করায় —ভিতর ক্রন্দনময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন, জীবন পাইবার

পথে বৃহৎ ছায়াশক্ত অনেক কিছু বাজে বোঝা তাহাকে বহিতে হয়। তাহাদের বৃথা কষ্ট ও গলদঘর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া হাসি আসে বটে কিন্তু ঐরূপ গলদঘর্ম্ম না হইলে অনেকের ভাগ্যে নিজের ভিত্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আত্মোপলব্ধির উহাই একমাত্র পথ হইলে সজ্ঞান না হইলেও বাঙ্গালী বোধহয় ইহার প্রতি তত বিদ্রূপবান বর্ষণ করিত না। বাঙ্গালীজীবনের ভাসা-আনন্দ হইতে উহার নিবিড় ও গূঢ় আনন্দে পৌঁছিবার জন্য কাহারও কাহারও অন্তরে এক গভীর টান আসিয়া থাকে। ইহা খুব কম ক্ষেত্রে হইলেও আসিয়া থাকে। উঁহাদের আনন্দঘন অবস্থায় সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র থাকে না, অতএব সদা বাঙ্গালা জ্ঞান ও অনুভূতি লইয়া যে বাঙ্গালী জীবনে উদার ও বৃহত্তের ভিত্তি লাভ করিতে পারে ইহা যখন উপলব্ধির জিনিষ—তখন বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা নিজ নাম ও পথভ্রষ্ট ভিন্ন পন্থায় বাঙ্গালীজীবনের ভিত্তি খুঁজিতে যাইলে তাহার ত ক্রোধ আসিবেই। এমন কি যাঁহারা নিজকে সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিতে বাঙ্গালীভাব ছাড়িয়া ভারত-ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাও অন্তরের সুপ্ত প্রদেশে বাঙালী-গর্ব্বের ডাকে সঞ্জীবিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, তথাপি বাঙালীর জীবন বিকাশে যা' ভুল ভ্রান্তি আছে তা' যখন ভারতের সত্য দিয়া আমাদের অধিকাংশকেই সংশুদ্ধ করিয়া লইতে হয় তখন বাঙালী বাঙালী করিয়া বৃথা চীৎকারে কিছু হইবে না। বাঙালী বলিয়া যে চীৎকারটা উঠে তাহা প্রায়ই বৃহত্তের সত্য সন্ধান অবগত না হইয়া সঙ্কীর্ণতার আনন্দকে সারবস্তু ধরিয়া একটা তরল নৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষ একটাই দেশ। দেশ বৃহৎ—প্রদেশে প্রদেশে সেই দেশের আনন্দ যেরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা একটা বিশেষ সত্তামণ্ডিত, বিচিত্র আনন্দ সম্ভোগের এক একটী সত্তাসম্পন্ন কেন্দ্র বিশেষ, শাসন সৌকর্য্যার্থ এক একটী বিভাগ নহে। বাংলা মহারাষ্ট্র ও গুজরাট শাসনকেন্দ্র না হইয়া এক একটী জীবন-কেন্দ্র, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে এ জীবন-কেন্দ্রটা এরূপ নহে যেরূপে ফ্রান্স জার্ম্মণী ও রাশিয়া এক একটী কেন্দ্রে নিজেদের সকল ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়া স্ব স্ব আত্মাকে ফুটাইয়া ফলাইয়া চলিতেছে। বাংলা ভারতীয় জীবনের একটা জীবন্ত সম্ভোগকেন্দ্র। ভারতবর্ষে একটা জীবন একটী সত্য একই culture খেলা করিতেছে। কিন্তু তাহা বাঙালী সত্য মহারাষ্ট্রীয় সত্য ও তামিল সত্য বাঙ্গালী 'কালচার', শিখ 'কালচার' ও দ্রবিড়ী 'কালচার'রূপে ফুটিয়া ও রঙ্গিয়া উঠিতেছে। অতএব অরবিন্দ বাবু যে বলিতেছেন বাঙালীর জীবন বিকাশে ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিতে গিয়া দেখিতে হইবে বাঙালীর জীবন ভিত্তি তাহাতে যেন নড়িয়া না যায়, ইহা শুনিয়া আমরা যেন আমাদের প্রাদেশিক জীবন ভিত্তি সম্বন্ধে একটা মস্ত কিছু ধারণা পোষণ করিয়া না বসি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার ও ভাব। পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিয়া আমরা যে মনের পরিচয় পাই সে মন একান্ত মুক্ত ভিতরের মুক্তির তালে প্রতি পর্দায় নব নব জীবন সৃষ্টি করিয়া চলে নাই; সে মন যেন গোষ্ঠীসূত্রে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া সকলের গোষ্ঠী ধর্ম্ম বিভিন্নরূপে বিভিন্ন 'মনে' প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। মোট কথা ভারতের এক সত্য ও ভারতের এক 'কালচার' বহুরূপে ও বহুরসে উপভোগ করিবার জন্য ভারতবর্ষই যেন বাংলা মহারাষ্ট্র ও রাজপুতানার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের এক একটী mentality আছে; ভারতের সার ও একই সত্য তাহারা ঐ mentality দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে এবং ফলাইয়া সকালের দর্শন-ইন্দ্রিয় তলি

করিতেছে। এই মনে বহির্মুখী ভাব এবং বাহিরের প্রকাশ-আনন্দ যখন খুব বেশী হইয়া পড়ে তখন সে ভিতরের বন্ধনের কথা এবং আপন গোষ্ঠীধর্মের কথা ভুলিয়া যায়। ইহার টান খুব প্রবল হইলে সে তার নিজের মন জীবন-কেন্দ্র গড়িয়া লয়। ভারতের মধ্যে বাঙ্গালী খুব আবেগচঞ্চল, কয়েকবার লম্ফ প্রদান করিয়া সে ভারতের পূর্ব্ব অংশে "কালচার' হিসাবে একটী স্বাধীন কেন্দ্র গড়িবার মত অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল।

সেই জন্য বাঙ্গালীর মুখেই আমরা বেশীরভাগ বাঙ্গালী বনাম ভারতের কথা শুনিয়া থাকি। শ্রীঅরবিন্দও প্রায় বলেন বাঙ্গালীত্ব তাঁহার জীবনের এক প্রধান বস্তু। বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীত্ব কাহারও জীবনের প্রধান বস্তু বলিলে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু প্রতি বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীত্ব বলিয়া একটী বস্তু বা গুণ আছে, কিন্তু তাহার জীবনের basisটী ভারতীয়। ভারতের সত্য, ভারতের culture বাঙ্গালী বাঙ্গালীভাবে ফুটাইয়া ও ফলাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রকাশের শক্তি প্রচুর, প্রকাশ ভঙ্গীটিও খুব স্বচ্ছ ও লীলায়িত, দেখিলেই প্রকাশের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভারতের বাঙ্গালী সংস্কৃতি দান করিতে হয় কিন্তু ভগবান এখন পর্য্যন্ত তাহাকে সে পর্য্যায়ে দাঁড় করান নাই। বোধহয় বা সে পর্য্যায়ে দণ্ডায়মান না করাইয়া কেবল তাহাকে অগ্রদূত করিয়া ভগবান ভারতের আত্মাকে একটী সম্পূর্ণ নূতন রূপেই ফুটাইয়া তুলিতে চান। ভারতের প্রতি প্রদেশ সেই রূপকে ভারতবর্ষ বলিয়াই চিনিবে তবে বাঙ্গালীর হৃদয়ের মিষ্টতা ও আবেগের উষ্ণতা নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহা যে বাঙ্গালীর গড়া এটুকু আন্তরিক স্বীকৃতি তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের উচিত আমাদের প্রকাশের সৌন্দর্য্য ও লীলার বিশিষ্টতা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেন অবিরাম সেই মাঠেই বাস করি যেখানে ভারতের আত্মা প্রাদেশ পথে ধাবিত হয় নাই। তাহা করিলে আমাদের গতিটি কেহ বন্ধ করিবে না, উৎসমুখ উন্মুক্ত থাকায় আমাদের শক্তির বেগ সদা পুষ্ট থাকিবে কিন্তু আমরা পূর্ণ। আমাদের basis বাঙ্গলা নহে আমাদের basis ভারতবর্ষ ইহা আমরা জানি তবে সব সকল অবস্থায় দেখিব আমাদের basis ভারতবর্ষ এবং আমরা ভারতবাসী। তাহা হইলে বাঙ্গালী বনাম ভারতবাসী লইয়া দ্বন্দ্ব করিবার কোন কারণও আমরা খুঁজিয়া পাইব না। বাঙ্গালী বলিলে তখন আমরা ভারতীয় জাতীয়তা হারাইয়া ছোট হইয়া যাইব না। বরং বৃহত্তরের পূর্ণ পরিতৃপ্তিরূপে আমাদিগকে আনন্দদান করিবে। কিন্তু তাহা বাঙ্গালী বলিতে ক্ষুদ্রের আত্মশ্লাঘা জনিত আনন্দ নহে।

যোগের প্রতিষ্ঠা

—— :০: ——

যোগের প্রতিষ্ঠা সমতায়। যোগ সাধনায়—সমতার সাধনা অন্তরে। সমতা অন্তরেই প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। একেবারেই প্রতিষ্ঠা হয় না। একদিনেই শান্ত নির্দ্বন্দ্ব হওয়া যায় না। সুখ দুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, মান অপমান, পাপ পুণ্য, শত্রু মিত্র, নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি দ্বন্দ্ববোধগুলি—বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে যেগুলি প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে—বাহিরেরই স্পর্শে—বাহ্যস্পর্শের কৌশলে—আমাদের অন্তরে, কিন্তু

মনের মধ্যে উপনীত হইয়া বুদ্ধিকে দোলাচল করিয়া তুলিতেছে—সেইগুলির হাত হইতে একান্ত পরিত্রাণ একদিনেই সম্ভব নয়। শুধু মনেই দ্বন্দ্বের খেলা হয় তাহা নয়—প্রাণে শরীরেও দ্বন্দ্বসৃষ্টি নিতাই দেখি—প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বিরক্তি, রাগ দ্বেষ, উত্তেজনা অবসাদ, শরীরের রোগযন্ত্রণা ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণ বোধ প্রভৃতি, এ সকলও দ্বন্দ্ব - প্রাণের দ্বন্দ্ব, শরীরের দ্বন্দ্ব। যোগীকে এই সকলবিধ দ্বন্দ্বেরই একান্ত নিরসন করিতে হয়। অবশ্য একদিনে নয়।

চাই ধৈর্য্য। একজন বন্ধু যোগসাধনায় ব্রতী হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন সমতা কয়দিনে প্রতিষ্ঠা হইবে আর [illegible] পাওয়া যায় না। সাধন পথের সব বাধা না হইলে কোনও অবস্থাই স্থায়ী ও সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না জানিয়া বন্ধু [illegible] হইয়াছেন। বাস্তবিক নিরাশ হই[illegible] কিছুই নাই। ভগবান নিত্য স্থির তাঁর করুণা অন[illegible] প্রাণ নিয়মের মত তাঁর অজস্র দান সাধক অস[illegible] সকলেরই মাথায় ঝরিয়া পড়িতেছে সাধক সজ্ঞান [illegible] থাকিয়া নিয়মমত এই অজস্র দানে [illegible] নয়—এক আজ আমি সংযুক্ত হইয়াছি, ততটুকু [illegible] তাঁর অনন্ত করুণাই ভরাইয়া তুলিয়াছে [illegible] করিবে, আবার করুণার ধারা জীবনে নামাবে—যতটুকু প্রয়োজন, যে মুহূর্ত্তে আধারের ধারণসামর্থ্য যতখানি ততখানিই পাইব, তবু নিমেষে নিমেষে তিনি আমায় পূর্ণ আনন্দেই ভরাট করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ণত্বের মাত্রা নির্দ্দেশ ঠিক করা যায় না—এই অসীম পূর্ণত্বের খেলা জীবনে অনুভূত হইতে আরম্ভ হইলেই, ধৈর্য্য সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে—সমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সমতা স্থায়ী ও অটুট হইলেই যোগের খেলা সহজ, সুখকর ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে।

সাধক স্থিরধীর নিষ্ঠায় সমতার সবগুলি স্তর একে একে অতিক্রম করিবেন। রোগ শোক, সুখ দুঃখ কাহার জীবনে নাই—মানুষও সংসারে সহ্য করিয়াই চলিয়াছে—বিপদ সম্পদে অস্থির হই, আর যাহাই হই—সুখ দুঃখ আসিবে যাইবে দ্বন্দ্বগুলি সহ্য করিতে হইবে না করিয়া যে উপায় নাই। যোগীকেও প্রথমে সর্ব্বকিছু প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত, বাহ্যস্পর্শজনিত সুখ দুঃখের অনুভূতিগুলি দৃঢ়চিত্তে সহ্য করিয়া চলিতে হয়। কেবল অধিক বিচলিত না হই, একেবারে আত্মহারা হইয়া না যাই—দুঃখে একান্ত অভিভূত, সুখে উৎকট রকমের উল্লসিত হইয়া না উঠি—এইটুকুই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পা যতই টলিয়া উঠুক—অন্তরের ভিতরে একটা কিছু, কেউ একজন আছেন—তিনি নিত্য অক্ষুণ্ণ হইয়াই এই সমস্ত অনুভব করিতেছেন এরূপ বোধের সহায়েই যতখানি সম্ভব ধীর স্থিরভাবে জীবনের ঝড়ঝাপটগুলি সম্বন্ধে তিতিক্ষা-পরায়ণ হইতে হয়। ক্লেশ হইতেছে, হৃদয় ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আবার পুলক উচ্ছ্বাসে কখনও সমস্ত বুক [illegible] ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—টল টল হইবার উপক্রম হইলেও কোথাও টলিব না—স্থির ধীর শান্ত অথচ সচেতন ভাবে ত্রিবিধ অবস্থায় সহিষ্ণু ও শক্তিশীল রহিব যেহেতু আসলে আমি যে এই সবের চেয়ে অনেক শক্তিমান, মহত্তর, বৃহত্তর, জগতের সকল উৎপাত উপদ্রব আমার কাছে একান্ত ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইবে—এরূপ হইলেই তিতিক্ষার প্রতিষ্ঠা হইল। তিতিক্ষা সমতার প্রথম ভূমি।

তার পর দ্বন্দ্বগুলির উপরে গিয়া অবস্থান করিতে হয়। দ্বন্দ্বের খেলা ফুটিয়া উঠিতেছে—স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রাণে শরীরের সকল স্তরের উপরেই আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে—কিন্তু শুধু মন প্রাণ শরীরের উপরেই সেই ঢেউগুলি খেলিতেছে—আমি তাতে অভিভূত নহি, সেইগুলির সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিতেছি না—এগুলি হইয়া উঠিয়াছে তরঙ্গগুলি উঠিতেছে পড়িতেছে, আমারই বেড়িয়া বেড়িয়া ঘেরিয়া ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছে—কিন্তু আমার

ওরূপের একটির উপর সমস্ত নির্ভর করিলেই, কোটী জীবন কাটিয়া যায়, আমি যে সেই রূপের সাগরে স্থির থাকিব - ইহা কি সম্ভবে? কিন্তু সকল সাধনাই মা করাইতেছেন, সকলই আমার নিকট জোয়ার ভাটার মত আনাগোনা করিতেছে, ইচ্ছাময়ীই জানেন তিনি কি করিবেন।

মনুষ্যশরীররূপ ক্ষুদ্র আধারে যখন যে ভাবের খেলা চলে, তখন তাহার একটা ব্যাপক শক্তি আছে, অর্থাৎ তন্নিকটবর্ত্তী অতি পাষণ্ডের ভিতরেও সেই ভাবের কিঞ্চিৎ বিকাশ হইয়া থাকে, আধারভেদে তাহার ব্যক্তিক ক্রীড়া স্বতন্ত্র প্রকারের হয়। সাধুসঙ্গ এইজন্যই এত প্রশংসনীয়। গৌরাঙ্গকে স্পর্শ করিলেই লোকের প্রেমের উদয় হইত। এই ব্যাপকশক্তির ক্রীড়া অদ্ভুত রকমের। এ সকল কথা তোমাদের নিকট নূতন নয়। তবে জানা বিষয় আর পরীক্ষিত বিষয় দুইটার তারতম্য আছে। আমার সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে। সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা উপস্থিত না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলাম।

ভাগবত জ্ঞানটাকে সম্যক্‌রূপে ফুটিয়ে তুলতে হলে, বিশ্বাস জিনিষটাকে কিছুতেই ছাড়তে নেই, যেটাকে ইংরেজীতে faith বলে, এই faith জিনিসটার শক্তি অসাধারণ। অনেক সময়ে faith জিনিসটা অবলম্বন করেও আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও উন্নতি দেখতে পাই না, একটু তলিয়ে যদি সে সময় দেখা যায়, দেখবে faith নাই, আছে একটা সংশয়। যদি ধরা পড়লো তবেই মঙ্গল নতুবা তোমার সারা-জীবন এই faith খুঁজিয়ে মারবে।

বাংলাদেশে মানুষ ভজার একটা প্রথা আছে, সেটার ভেতর যে কি একটা রহস্য আছে তা ক্রমে বুঝবে। মানুষ অনন্তের প্রেমে কেমন করে মেতে উঠবে যদি সে মানুষকে হৃদয় মধ্যে না আঁকড়ে ধরতে পারে। ভারতের অবতারবাদের ভেতর কেবল এই রহস্যেরই খেলা চলছে, কে কবে অনাস্বাদ পদপ্রান্তে আশ্রয় পেয়েছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে মানুষকে না চিনেছে। কিন্তু এই মানুষকে ভালবাসতে হলে তোমার অনাবিল ভালবাসা, তোমার অকপট ভক্তি ও বিশ্বাসকে চাগিয়ে তুলতে হবে। এই যে প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাস এগুলি আমার সংস্কারগত জীবনের মধ্যে থেকে অশুদ্ধ হয়ে উঠেছে, এগুলিকে শুদ্ধ করে নেবার চেষ্টাটাই সাধনা। বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে যে সাধক মানুষের সমীপবর্ত্তী হয়েছে, সিদ্ধি তার কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। শুদ্ধ প্রেম ভক্তি বিশ্বাস লাভ করে জগতের বুকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা যদি একবার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ঠিক ঠিক হয়, তখন আর কোন নিয়মই সাধক থাকে না। বিষয়গুলি তোমাদের কাছে বিশেষ জটিল হবে না, প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি অতি সহজেই শিখবার বিষয়গুলি গ্রহণ করতে পারে। তোমাদের প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাস এইগুলিকে সাধনে শুদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করবে। আমি অনেকগুলি জটিল রহস্য জালের ভিতর আছি—তাই তোমাদের বেশী কিছু লিখলাম না, বিশ্বাস কর, আপনা আপনিই সকল বিষয় বুঝতে পারবে।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের বরিশালের বক্তৃতা বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির মঞ্চ হইতে বিপিন বাবুর বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর হুঙ্কার, অন্যে কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না, উহা কিন্তু আমাকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা অনেকদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, সরল কোমল ও সংকল্পে একান্ত আগ্রহসম্পন্ন চিত্তরঞ্জন ধীরে ধীরে বাংলার নেতৃসভায় যে আসন পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, শুনা কথা, তাহাতে তাঁহার আন্তরিক সেবা ভাব ভিন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠ কোন লোকের নিস্পৃহ স্বভাব পরিচয় পাওয়া যায় নাই। একথা শুনিলে অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন, নেতৃবর্গের প্রায় সকলে চিত্তরঞ্জন বাংলার দেশভক্তের প্রধান পুরোহিতরূপে যখন গণ্য হইতে চলিয়াছিলেন, তখনও নেতৃদলের মধ্যস্থানীয় দেশকর্মীকুল তাঁহাকে প্রধান দেশসেবক হিসাবেই দেখিতেন। প্রগাঢ় চিন্তাশীল প্রেমময় আত্মত্যাগসম্পন্ন হইলেও কোন একটা বিশেষত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া দৃঢ়চরিত্রসম্পন্ন হয় নাই। ফলকথা দেশের যতগুলি মৌলিক ও নিষ্ঠাসম্পন্ন পুরুষ বাঙ্গালীর নবজাতি গঠনে নিযুক্তমাত্র হইয়াছেন, তিনি আজীবন তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছেন—সমাজে সাধনার অন্তরে ও দেশসেবায়—এবং তাঁহার আন্তরিক সদিচ্ছা এবং সৌভাগ্যক্রমে অর্থের স্বচ্ছলতাই তাঁহাকে বাংলার দেশনেতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। এ-সকল কথা শুনিয়া আমি চিত্তরঞ্জনকে ঐরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহার ভিত্তিই টলিয়া গিয়াছিল যেদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, চিত্তরঞ্জন বিপিন বাবুর বিরুদ্ধে—শুধু বিরুদ্ধে নয়—বিপিনবাবুকে দ্বিখণ্ড করিয়া মহাক্রোধে নিজের স্বরাজমন্ত্রের জয়গান করিয়াছেন। সেইদিনেই আমাকে ভাবিতে হইল চিত্তরঞ্জন বুঝি বরিশালে প্রথমেই নিজের স্বাধীনতা অর্জন করিলেন—সেই দিনেই বোধহয় তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের সদ্য সাক্ষাৎকারের কথা মনোমধ্যে উদয় হইল, অনেকগুলি গভীর চিন্তাও আসিতে লাগিল, তাহা তখন চাপা দিলাম।

আমার চিন্তার মধ্যে কতকগুলি অন্ধ সংস্কারের ছায়া আসিয়া কখন যে পড়িয়াছিল জানিনা—কেন না বরিশালের বক্তৃতা পাঠ করিতে করিতেই প্রথমে ইহাই উদ্ভাসিত হইল, যে, একটা প্রবল—অতি প্রবল—অন্তঃস্রোত যেন চিত্তরঞ্জনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার চল চল কোমল ও মিষ্ট অন্তঃকরণ স্মরণ করিয়া মনে হইত, ঐরূপ অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভূতির সকল বিষয় স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় না যদি না একটা ধীর স্বচ্ছ নিষ্ঠাস্রোত তলে তলে অন্তঃকরণ বেড়িয়া স্বতঃই প্রবাহিত হইতে থাকে। ধরিয়া লইয়াছিলাম, তাঁহার অন্তরে ওরূপ প্রবল নিষ্ঠার স্থান নাই, নচেৎ ছাত্রজীবনে বিলাতের বাসা হইতে স্বাধীনতার চর্চ্চা করিয়া, কলিকাতায় প্রভু গোস্বামী বিজয়চন্দ্রের অমোঘ অধ্যাত্ম বীজমন্ত্র শ্রবণ করিয়া, জাতীয়তার প্রবল আকর্ষণসম্পন্ন স্বদেশীযুগের ধীর স্থির ও অপ্রমত্ত দেশনেতৃদিগের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া, গোস্বামীশিষ্য দেশনিষ্ঠ মহাচরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সাধনা ও সমাজ সূত্রে একাসনে স্থানলাভ করিয়া চিত্তরঞ্জন কেন একটা দৃঢ় বিশিষ্টতা-সম্পন্ন চরিত্রের পরিচয় দিতেছেন না!—ইহা আমার নিকট একটা গভীর রহস্যের বিষয় ছিল।

এখন দেখিতেছি, আমি নিজেই একটা মহাভ্রমে

পতিত হইয়াছিলাম। প্রথমে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ যেদিন মুক্ত হইলেন—চিত্তরঞ্জন চিত্তের প্রগাঢ় সেবা দিয়া যেদিন শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বোমার মামলায় লাঞ্ছিত দেশ-সেবীদিগকে মুক্ত করিয়া নিজের বাসায় স্থান দিলেন, সেইদিন হইতে আমার জাতীয় আত্মা চিত্তরঞ্জনকে জাতীয় অভিযানের একটা প্রধান সেনাপতি হিসাবে ধরিয়া লইয়াছিল। জাতীয় অভিযানের সেনাপতি সেনা ও যুদ্ধসজ্জার সৃষ্টি করিয়াই জাতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। কিন্তু কৈ—১৯১০ সাল হইতে অসি ত্যাগ করিয়া নীরবে নতশিরে যখন কর্ম্মীকুল দেশের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ণয় করিতে করিতে অজস্রধারে অপমান-স্রোত মস্তকে ধারণ করিতেছিলেন, কৈ—তখন কি তিনি অপমানের স্রোত ফিরাইবার জন্য কোন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, না একযোগে পথ নির্ণয়ের জন্য নিবিড় মনঃসংযোগে নিযুক্ত ছিলেন। আমার যতদূর জানা ছিল, তিনি সে-সময়ে মহোল্লাসে অর্থ উপার্জ্জন করিতে-ছিলেন, অন্তরের মধ্যে মধ্যে-মধ্যে একটা বেদনা দেশের ভবিষ্যতের জন্য কি না জানি না—বন্ধু বিপিনচন্দ্র, সখা অরবিন্দ প্রভৃতির সহিত বিচ্ছেদের একটা বেদনা অনুভব করিতেন। তখন আমার মনে হইত চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ প্রভৃতির চিত্তের মোহেই আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের মহৎ প্রাণ ও স্বদেশ চিত্ত তাঁহাকে টানিয়া দেশসেবার স্রোতের নিকট স্থাপন করিয়াছিল মাত্র। পূর্ব্বে যে কথাটি শুনিয়াছিলাম, যে, বোমার মামলায় প্রথম কয়েকদিনে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর অধিনায়কত্বে যখন লাঞ্ছিতপক্ষের পক্ষসমর্থন চলিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের আত্মীয়গণ মোকদ্দমার জন্য শেষ পর্য্যন্ত অর্থসঙ্কুলানের ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "এ সময়ে যদি আমি অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন না করি তাহা হইলে আমি অরবিন্দের নিকট মুখ দেখাইব কি করিয়া", ফলে তিনি আলিপুর মোকদ্দমা গ্রহণ করেন, বিনা অর্থে; —১৯১০ সাল হইতে সেই কথাগুলির আমি এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে থাকি যে বন্ধুপ্রেমজনিত স্বার্থত্যাগই চিত্তরঞ্জনে প্রতিফলিত, তিনি প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক নহেন। আমি ইহার পূর্ব্বে অতটা তলাইয়া দেখি নাই, বন্ধুপ্রেমেও আত্মহারা হইয়া যাঁহারা দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়েন, আমি ধরিতাম, তাঁহাদের দেশসত্ত্বা নিশ্চয়ই জাগ্রত। পরে, চিত্তরঞ্জনের ভিতর, বিশেষতঃ সেদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে আমার মনঃপূত কোন দেশের কার্য্য হয় নাই বলিয়া, তাঁহাকে বন্ধুপ্রেমিক সরল উদার মহাপ্রাণ অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠাহীন ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া লইয়া ছিলাম। এরূপ ভাবে চিবিয়া চিবিয়া চিন্তা করিতাম খুব কম, মনে করিতাম, অন্যের কথাগুলি আমাকে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বোক্ত মতপোষণের সহায়তা করিয়াছে কিন্তু অন্তরে আমি তাঁহাকে ঠিক অরবিন্দ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির গুণমণ্ডিত একটা মহাপুরুষ হিসাবেই দেখিতে চাহিতেছিলাম—সেটা তত পরিস্ফুট হয় নাই আমার নিকটেই—কিন্তু তাহা না দেখিয়া চিত্তরঞ্জনের প্রতি বিরক্তই ছিলাম।

চিত্তরঞ্জনের বন্ধুপ্রেমের তুলনা নাই। যদিও ইচ্ছা করিয়া আমি তাঁহাকে প্রেমময় আখ্যা দিতে রাজী নই, কেননা, আমার মতে প্রেমের জন্য স্বার্থ ত্যাগ ভিন্ন একটা অটুট ও নিরেট যে সার্থকতা তাহাও থাকা চাই যাহা তাঁহার ছিল না। এখন অতুলনীয় সাহসিকতায় দেশের জন্য তিনি আত্মাহুতি দিয়াছেন—তিনি ধন্য! কিন্তু এখনও কি তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, নিজেকে যেরূপেই দাও—প্রাণ-ত্যাগ নির্ব্বাসন উৎপীড়ন লাঞ্ছনা অর্থনষ্ট ইত্যাদি কিছু আশঙ্কাই তোমার সম্মুখে আসুক—যাহাকে তুমি ভালবাস, সত্য সত্যই হৃদয়ের কোন একটী জায়গায় যাহার জন্য এক কণা সামান্য প্রেম তুমি গোপনেও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছ, তাহার জন্য, অঙ্গুলি

বিপদ মাথা পাতিয়া যদি তুমি সাহসভরে হৃদয়ের দান অর্পণ কর একদিন নিশ্চয় তোমার পরামুক্তি হইতে পারে। যে সংবাদটী শ্রবণ করিয়া আমি এই ক্ষুদ্রকথা বলিতেছি, তাহাতে জানিয়াছিলাম তাঁহার কোন বন্ধুর দুঃখমোচন করিতে তিনি চান, করিলেনও—কিন্তু পন্থা আবিষ্কার করিলেন এরূপ যাহাতে সম্মান ও সাহস দুইই বজায় থাকে না। আত্ম সম্মান ও সাহস বলিতে আমি যা বুঝি [illegible] আমি দেখিয়াছি। যেমন চিত্তরঞ্জন [illegible] আমার [illegible] ঘটনার, নিম সাধক [illegible] [illegible] চিত্তরঞ্জন [illegible] কিছু দিন [illegible] স্বাধীনতা আছে, [illegible] অপ্রবৃত্তি [illegible] আমি [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] কি। [illegible] বরিষ চিত্তরঞ্জন [illegible] মুক্তি লাভ করিয়া হৃদয়ে স্বাধীনতার [illegible] প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা আমার জানা ছিল না। সেইজন্যই তাঁহার বরিশালের বক্তৃতায় আমার [illegible] লাগিয়াছিল।

তাছাড়া ১৯১৩-১৪ সালে যখন চিত্তরঞ্জন [illegible] দেশের নেতারূপে ফুটিয়া উঠেন তখনও আমি [illegible] খুব বড় অর্থ দেখিতাম না। ১৯১০ [illegible] সালের কন্ট্রোলের পর হইতে বাংলায় জাতীয় দল বলিয়া একটী রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিতেছিল। সেটী "বন্দেমাতরং" যুগের ও "কর্ম্মযোগীন" যুগের জাতীয় দল হইতে ভাবের গাঢ়তায় আশার উচ্চতায় স্বার্থত্যাগের মহিমায় রাজকোপের সম্ভাবনায় সকল বিষয়েই একেবারে নিম্ন স্তরের ছিল। একটা কর্ম্মের কুশলতা তাহার মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহা ভাবুকদের নিকট দশগুণ একেবারে mechanical ও ইউরোপীয় ধরণের শৃঙ্খলায় আদর্শ চিন্তা করিয়া কার্য্য করিয়া যাওয়া। কংগ্রেসের অবৈধতার প্রতিবাদ ও প্রমাণ করা ভিন্ন তাহার অন্য কোন কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যাইত না। রাজনৈতিক হিসাবে এই দলে তাঁহার স্থান হইল, আসন শেষে, ঠিক চক্রবর্ত্তীর নীচে। তিনি আসিয়া উহাকে একটু ভাবচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহাতে আমাদের ক্ষুধাই মিটে নাই। তাঁহার রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল যখন তিনি স্বাদেশিকতাকে রক্ষা করিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন আমি কিন্তু ধরিয়া লইতেছিলাম তাঁহার ভাবুকতা ও স্বাদেশিকতা সবই বিপিনবাবুর সংসর্গজাত। একদিন একটা মাসিক-পত্রে পড়িলাম, চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে রাজনৈতিক সিংহাসন দখল করিতে চান না, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে সাহিত্যিক জয়মাল্য লইতেও তিনি রাজী নন তবে ভাব এই, চিত্তরঞ্জনের শক্তি ও গুণাবলী দেওয়ায় বাধ্য হইয়া যদি তাঁহাকে সর্ব্বদিকের বঙ্গ সিংহাসন অধিকার করিতে হয়, তাহা সে বাংলার সৌভাগ্য। স্বদেশীধারা বর্জ্জিত বাংলা নহে। আত্মসম্মানবর্জ্জিত দাস কংগ্রেস অনুগত বাংলার রাজনীতিকে তিনি যদি স্বদেশী ও স্বাধীনতার বাণীতে বলাইতে পারেন তাহা হইলে তাহা কি বাংলার সৌভাগ্য নয়।

হাঁ সৌভাগ্য ত বটেই। কিন্তু তিনি যে তাহার উপযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার বিশ্বাস হয় নাই। সমস্ত জাতীয় দলটা ও সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রী ও নীতিবাদী সমগ্র দলটা যদি একবাক্যে তাঁহাকে দলপতি স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলেও আমার সে বিশ্বাস আসিত না। বস্তুতন্ত্রী ও নীতিবাদী সাহিত্যিকগণ সাহিত্যে জাতীয়তা আনিবেন কি, একটা শুষ্ক অস্পষ্ট ও অর্দ্ধদৃষ্টি দিয়া সাহিত্যকে দেখিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যাইহউক তিনি যে

তাঁহাদের সংস্পর্শগুণে জাতীয়তার ধাতু ধরিতে ধরিতে নিজের ধাতুর স্বরূপটী দেখিবার শক্তিভূমি অধিকার করিতেছিলেন তাহা আমি তখন জানিতে পারি নাই। জাতীয় স্বভাবের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তিনি যখন ইউরোপীয় Industrialism এর বিরুদ্ধে, কল কারখানার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে থাকেন, এমন কি দেশী মিলের কাপড় পর্য্যন্ত পরিলেও যখন আমাদের পাপ স্পর্শিতে পারে এ মতে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, গোড়া হইতেও যেমন তখনও তেমনই তাঁহার প্রতি বিশেষ নজর দিয়াই থাকিতে হইত। বিপিনবাবুকে বাদ দিলে, মনে হইত, ইনি অন্য সকল হইতে একটা বিশিষ্টতা অর্জ্জন—যেটা সত্য সত্যই আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা—করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু ওগুলি সবই যে বিপিনবাবুর প্রতিধ্বনি। বিলাত হইতে ফিরিয়া বিপিন বাবু এক উদ্ভট রাজনৈতিক মত প্রকাশ করিয়া এবং অর্থাভাবে নিজে তত পুরোভাগে না দাঁড়াইয়া যেন চিত্তবাবুকে দিয়া তিনি কাজ সারিতেছিলেন। কিন্তু তাহা নহে, মধুরচিত্ত চিত্তরঞ্জন চিত্তটী সকল সংসঙ্গা-দের মধ্যে অর্পণ করিয়া হৃদয়ে যে এক অদ্ভুত নিগূঢ় শক্তি অর্জ্জন করিতেছিলেন যদ্দারা তাঁহার হৃদয়ে সকল বৃহৎ জিনিষই সত্য ও সুন্দররূপে অনুভূত হইতেছিল। যেটা তাঁহার হৃদয়ের সার তাহাই তাঁর পথ নির্দ্দেশক হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তখন আর কোমলচিত্ত সরলপ্রাণ এবং বন্ধুপ্রেমে আবদ্ধ দেশকর্ম্মীবৎই ছিলেন না, সত্য সত্য আত্মপ্রতিষ্ঠ দেশ-নেতার আসন অধিকার করিতেছিলেন।

নন্-কো অপারেশনের সময়ে তিনি বাঙ্গালীর সর্ব্বাগ্রে নন কো অপারেশনে নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্বের ও তাঁহার এতাবৎ-কাল স্বদেশসাধনার মধ্যে আত্মার প্রভাব বড় স্ফুটিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে তাঁহার স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে যেরূপেই হউক সর্ব্বস্ব দিয়া তিনি আত্মপরিচয় পাইয়াছেন। তাহার নিদর্শন পাইলাম বরিশালে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠাজনিত ঝঙ্কারই দেশের সত্য ঝঙ্কার না হইতে পারে। তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিজের দৃষ্টি দিয়াই দেখিতে পারেন, বিপিনবাবুর কথাই বাংলার কথা, কিন্তু বরিশালের ঘটনায় দেখিলাম একটী মহাপ্রাণ দেশ সন্তানের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশমাতৃকা কি অঘটনই না ঘটাইতে পারেন। এজন্যই বলিতেছিলাম, চিত্তরঞ্জনের বরিশালের বক্তৃতায় আমি স্তব্ধ হইয়াছি।

সংশয় ও পরীক্ষা

—•:•—

সংশয় শত্রু, আবার সংশয়ই সহায়ক। কেন না, খণ্ড জ্ঞান আপনাকে সংশয় করিয়া করিয়াই ধীরে ধীরে আপনার পূর্ণতা বিধান করে। আমরা সকলেই চাই দাঁড়াইতে সত্যে, চলিতে সত্যে, সত্যকেই জীবনে গড়িয়া তুলিতে, অথবা সত্যেই জীবনকে গড়িয়া তুলিতে। সংশয় এই সত্যকেই আরও স্পষ্ট স্ফুট করিয়া ফুটাইয়া তোলে। অনেক সময়ে সংশয়াত্মাকে অতি ক্ষুদ্র খণ্ড সত্যকেই সমগ্র ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও

পরিতৃপ্ত থাকিয়া যাইতে পারি। এই জন্যই সংশয়ের আরও প্রয়োজন। সংশয় মিথ্যারই পরম শত্রু, সত্যের ত শত্রু নয়—বরং সত্যেরই, উদ্বোধক না হউক, অন্ততঃ উদ্দীপক। সংশয়ের কষ্টিপাথরে কষিয়াই সত্য মিথ্যার পরখ করিয়া লইতে হয়; মিথ্যার উপর নির্মম ছুরিকাঘাতে উহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে চিরিয়া দেখিতে হয়, যদি কোনও সত্যবীজ উহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে; ছাই চাপা আঁস্তাকুড়ে উজ্জ্বল মণিখণ্ড যদি সুরক্ষিত থাকে, ছাইএর রাশি ফুঁ দিয়া উড়াইয়াই উহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হয়। সংশয় এই ফুৎকার। বুদ্ধির আলোড়নে চিন্তার তোলাপাড়ায় যে সত্যখণ্ডগুলি কুড়াইয়া পাওয়া যায়, সেগুলি সংশয়ের আগুনে পরীক্ষা করিয়া না লইলে পরীক্ষিত সত্যের সুদৃঢ়ত্ব পায় না। সংশয় সত্যকেই দৃঢ় করে, মিথ্যার মিশ্রণ থাকিলে তাহাকে নিষ্ঠুর তাড়নায় নিষ্কাশিত করিয়া দেয়, অনেক কোণঠাসা সত্যকে অন্ধকার গহ্বর হইতে টানিয়া আনিয়া তাহাকে নির্মল ও সমুজ্জ্বল আলোকে জাহির করিয়া ধরে। এই জন্য সংশয়েরও প্রয়োজন আছে। বাস্তবিক সংশয় হইতেছে গুপ্ত সত্যৈষণাই—সত্যকেই খুঁজিবার জানিবার ফুটাইয়া তুলিবার লুকান প্রচেষ্টা মাত্র—সত্যেরই উল্টা দিক। পূর্ণ সত্যকে দেখিতে ও পাইতে হইলে তাহার সোজা ও উল্টা দুইটা দিকই বাজাইয়া লইতে হয়। লওয়া দরকার, অন্ততঃ লওয়া উচিত।

তবু গীতায় যে বলিয়াছেন—অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি—সে উক্তিরও মানে আছে। সংশয় সত্যের ঋণাত্মক অভাবাত্মক রূপই (negative aspect), অভাবকেই স্বভাব করিয়া লওয়া, স্বভাব বলিয়া ভ্রম করা উচিত নয়—উহা কি মৃত্যুকেই বরণ করিয়া লওয়া নয়? সংশয় যেন বুদ্ধির স্বভাবই না হইয়া উঠে—উহা ত একটা উপায় মাত্র, বস্তুকে সত্যকে বাজাইয়া, যাচাইয়া, কষিয়া মাজিয়া পরখ করিয়া লইবারই একটা ছল—উপায়কেই লক্ষ্য করা মহাভুল, ছল আসলে ছলই, ছলেরও অবশ্য একটা ঠাঁই আছে, একটা কার্য্য আছে, যদিও শূন্যে নিঃশেষ হইয়াই তাহাকে নিজের ঠাঁই করিয়া লইতে হয়, কারণ তাহার কার্য্যই হইতেছে "হাঁর" মুখের উপর অথবা নাকের ডগায় "না" কেই বড় বড় অক্ষরে সাজাইয়া ধরা—"হাঁ" যদি সত্যই দুর্ব্বল বা মিথ্যা পীড়িত থাকে, তাহা হইলে তাহা "না"র দলেই মিশিয়া যাইবে—আর "হাঁ" এরূপ পরীক্ষার পরখে গৌরবে উত্তীর্ণ হইলে আরও নিরেট, মুক্ত, দুর্ভেদ্য কবচেই শরীর আঁটিয়া আরও স্পর্দ্ধা-গর্ব্বে আপন আসনে দৃঢ়তর হইয়া বসিতে পারিবে—ইহাই সংশয়ের কার্য্য—অভাবাত্মক কার্য্য। আনন্দের দিক থেকে যেমন সুখ দুঃখ ফল বা ছল মাত্র—সুখ আনন্দেরই একটা বিশেষ কিছু হইয়া ফুটিয়া উঠিবার ফল, দুঃখ সুখকেই গাঢ়তর করিয়া তুলিবার একটা ছল বা প্রাকৃতিক কৌশল মাত্র—সুখ positive দুঃখ negative—সেইজন্য দুঃখকেই জীবনে বড় ও একমাত্র করা যায় না, করা উচিত নয়, অতি বড় দুঃখীর জীবনেও দুঃখ এক একটী মহামুহূর্ত্তে নিজেকে ভুলিয়া সুখের মধ্যেই আপনাকে তলাইয়া হারাইয়া ফেলে—সে যেন একটী বিজলী-পলকে শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জমাট বাধা গলাইয়া ভুলাইয়া দিয়া যায়। অভাব আসল তত্ত্ব নয়—একটা সাময়িক অবস্থা পর্য্যায় shifting stage মাত্র—ভাবকেই জমাইয়া তুলিবার জন্য। সেইরূপ সত্যের দিক হইতে সংশয় হইতেছে negative উহা চরম তত্ত্ব নয়, আমাদের মূল স্বভাবও নয়। যাহা আসল খাঁটি সত্যরূপ নয়, তাহার উপর সমস্ত স্বভাব ধর্ম্ম স্থাপন করাও যা, আর মৃত্যুর ছাপ নিজ ললাটে ষ্ট্যাম্প মারিয়া দেওয়া একই কথা। এদিক দিয়া গীতাকারের কথাটি মহামূল্য।

সংশয়ের positive দিক হইতেছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা সত্যেরই উদ্দীপন-শক্তি, তাহার মধ্যে আছে সত্যেরই প্রকাশাবেগ, ধারণ চাঞ্চল্য, শ্রদ্ধা সত্যেরই প্রকৃতিমূর্ত্তি। শ্রদ্ধা দিয়াই সত্যকে জাগাইতে হয়, অচল সত্যকে অন্তরে ফুটাইতে, বাহিরে ফলাইয়া ধরিতে হয়, শ্রদ্ধাই তপোবল, যাহার চাপ দিয়া অচল ও অমূর্ত্ত সত্যকে শক্তির মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে সচল ও সমূর্ত্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, উহাই সেই পরমাশক্তি, যাহা আত্মার মূলবীর্য্য, যাহার সহায়ে পুরুষ আপনার প্রকৃতির মধ্যে সম্ভাবনারাজিকে খেলাইয়া তুলে, আত্মা নিজেকে রূপে বিগ্রহে বাস্তব ও শরীরী করিয়া ধরে। অলক্ষ্য অথবা দুর্নিরীক্ষ্য নিরবয়ব আদর্শকে ছবির মত মনের পটে আঁকিয়া তোলা, কর্ম্মজগতে নানা উপকরণে প্রকরণে উহাকে অবয়ব

সিদ্ধ সত্য ঘটনায় পরিণত করা—এ সব শ্রদ্ধারই শক্তি, শ্রদ্ধারই কার্য্য। সংশয় ও শ্রদ্ধার মধ্যে একদিকে অহি'নকুলের সম্বন্ধ আবার অন্যদিক দিয়া উহাদের প্রথমটির দ্বিতীয়টির উপরেই একটা নিবিড় মুখাপেক্ষাও আছে। শত্রুত্বের সম্পর্ক—কেন না সংশয় শ্রদ্ধাকে বিনষ্ট অন্ততঃপক্ষে নির্বীর্য্য ও খঞ্জ করিতেই চায়—আবার গভীরতর দৃষ্টি দিয়া দেখিলে কিন্তু দেখা যায়, ধ্বংসের জন্যই ধ্বংস রূপ একান্ত ও নিছক দুরভিসন্ধিই তাহার নাই ত, শ্রদ্ধার ভিত্তিকে যাচাই বাচাই করিয়া নিরাপদ করিয়া দেওয়াই যে তাহার আসল উদ্দেশ্য—এই করিতে গিয়াই তাহাকে বিশ্লেষণের তীব্র ছুরিকা চালনা করিতে হইতেছে, কষ্টিপাথরে স্বর্ণপিণ্ডের যে অঙ্গ-ঘর্ষণ, তাহাতে সত্য স্বর্ণখণ্ডের একান্ত কোনও দুঃখই নাই, থাকিতে পারে না—কারণ তাহা ত তাহারই খাঁটিত্ব ও দীপ্তিকেই স্ফুটতর করিয়া জাহির করিবার জন্যই। মনের পাথরে বুদ্ধি বাজাইয়া সত্যকে সংশয়, বিশ্লেষণ ও সম্মার্জ্জনচ এই ঘর্ষণ—উহাতে জ্ঞান স্পষ্টতর, সত্য নিখুঁততর ও ভাস্বরতর রূপই পরিগ্রহ করে।

শ্রদ্ধার পরীক্ষা সংশয়ে। প্রেমেরও পরীক্ষা জগতে দেখা যায়। প্রেমের অনেক পরীক্ষা আছে, উপেক্ষা, উদাসীনতা, লাঞ্ছনা। তোমায় ভালবাসি, কিন্তু তুমি কি আমায় সেইরূপই ভালবাস? পরীক্ষা দাও। প্রথম উপেক্ষা, তোমায় আমি যেন দেখিয়াও দেখিতেছি না, তোমার কথা শুনিয়াও যেন শুনিতেছি না, তাহাতে কাণ দিতেছি না, মুখ ফিরাইতে গিয়া ঘুরাইয়া লইতেছি, আহারে বিহারে ব্যবহারে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষার হিমবারি শয়নে স্বপনে বানভাবে তোমার অঙ্গে ছিটাইয়া দিতেছি—অথচ অন্তরের মাঝে আছে ঠিক উল্টাই, একটা তীক্ষ্ণ অনুরাগবৃত্তিই, একটা তীব্র সান্নিধ্য ও মধুর লালসাই। ইহাই উপেক্ষা, উদাসীনতা আরও মর্ম্মভেদী। উৎকটতর বৈমুখ্য-ভাব শুধু না দেখা না শুনা নয়, একেবারেই সম্বন্ধ বর্জ্জন যেন তোমার কাছ হইতে লক্ষযোজন দূরেই ইচ্ছা করিয়াই সরিয়া দাঁড়াইয়াছি, তোমায় যেন কিছুতেই কোনও সম্বন্ধেই চাহিনা বলিয়া স্বেচ্ছাতেই সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি—একেবারে জন্মের মত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তোমার দিক হইতে পৃষ্ঠপরিবর্ত্তন করিয়াছি, কিছুতেই আর তোমার দিকে চাহিব না, তোমার দিকে মুখ ফিরাইব না, তোমার কথা পাছে কাণে প্রবেশ করে তাই কাণে তুলা গুঁজিয়া রাখিয়াছি, এই উদাসীনতা—বড় কঠোর, বড় নির্ম্মম, বড় নিষ্করুণ এ পরীক্ষা। কিন্তু এই শেষ নয়—আরও নিষ্ঠুরতর, আরও দুঃসহ পরীক্ষাও আছে। শুধু প্রত্যাখ্যান এক কথা—আর ইচ্ছাপূর্ব্বক নিদারুণ লাঞ্ছনা—তার চেয়ে শত সহস্রগুণ নিষ্ঠুর হৃদয়-পরীক্ষা। তোমায় শুধু চাহি না তাহা নয়, তোমার দিক হইতে সকল সম্বন্ধ শুধু গুটাইয়া লইয়াছি তাহাও কেবল নয়—তোমাকে পলে পলে বিষমুখী জ্বালাময় তীরবৃষ্টিপূর্ব্বক

অবিশ্রান্ত বিদ্ধ করিতেছি, ইচ্ছা তোমায় ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিব, তোমার অস্থিমাংস ছিঁড়িয়া গুঁড়াইয়া দিব, বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার বুকের রক্ত শোষণ করিব, আর ইচ্ছা করিয়া নিজের হাতে নিজের দাঁতে নিজেই রাক্ষস সাজিয়া তাহা করিব—ইহাই প্রেমের পরীক্ষার তৃতীয় স্তর—বিষম চরম স্তর। এই পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, প্রেম তাহার হইয়াছে, সিদ্ধ জগজ্জয়ী।

সত্য নিজেকে সংশয়ের মেঘে ছাইয়া আবার তাহাই দুই হাতে সরাইয়া নিজেকে সমুজ্জল দ্যোতনায় পুনরাবিষ্কার করে। প্রেমও নিজেকে এরূপ কঠোর কষ্টিপাথরে কষিয়া বিশুদ্ধ ও নির্মল করিয়া তুলে। ভগবান পরশমণি—বুদ্ধি আমাদের ত বিশুদ্ধ নয়, হৃদয় ত সম্পূর্ণ নির্মল নয়, তাই পরশমণি ছোঁয়াইয়া বুদ্ধি ও হৃদয়কে আমাদের পূর্ণশুদ্ধ পূর্ণস্বচ্ছ করিয়া লইতে হয়। জীবন সংগ্রামের আর কোন অর্থ নাই—গূঢ়ার্থ এইটুকুই—আত্মশুদ্ধি। শুদ্ধি না হইলে মুক্তি হয় না। সংশয় ও পরীক্ষার কুটিল পরীক্ষায় যে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়াছে, তাহারই বুদ্ধি হইয়াছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আধারভূত হিরন্ময় সহস্রদল ক্ষেত্র, হৃদয় তাহারই হইয়াছে আনন্দের পরম রস ও নিগূঢ় মাধুর্য্যঘন নিকষিত হেমতুল্য যে প্রেম তাহারই প্রস্ফুট লীলাপদ্ম—মুক্ত জীব ভগবানেরই স্বরূপ লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়। সে স্বরূপ—কারণের রূপ যাহা বিজ্ঞানময় আনন্দময়। হৃদয়ের আত্ম-সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিরও উৎসর্গ যখন আসিয়া সম্মিলিত হয় তখনই সেই জ্ঞান ও প্রেমের তীর্থ সঙ্গমে নিবিড় সলিলরাশি মন্থন করিয়া দলমল পারি-জাত পদ্মের মত মানুষের সেই চিদানন্দঘন সিদ্ধ-রূপটী প্রকট হইয়া উঠে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের পরিশুদ্ধি ও আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই বিরাট নিত্যরূপটিকে জন্মদান করাই সৃষ্টির লক্ষ্য। মানু-ষের বর্ত্তমান মন ও জীবন উহারই উপকরণ-সমষ্টি যোগাইয়া দিতেছে মাত্র। এই উপকরণ সমষ্টি দিয়া যে মহাশিল্পী নূতন রচনার জন্য তপঃরত, তিনিই সংশয় ও পরীক্ষার মহাস্ত্র ব্যবহারে মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণত্বকে ছাঁটিয়া কাটিয়া নিছক সত্য ও আনন্দ-মূর্ত্তিটিকে মানুষের মধ্যে নিপুণ হস্তে গড়িয়া তুলিতেছেন। অন্তর সংগ্রামের উদ্দেশ্য ইহাই। মানুষ, তুমি ধৃতি অবলম্বন কর। ভক্ত, তুমি আশ্বস্ত হও।

পুস্তক পরিচয় ও সমালোচনা

দু-ইয়ারকি—শ্রী প্রমথ চৌধুরী—মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। প্রমথবাবু এইখানির ভূমিকায় লিখ্ছেন—"যে রাজনীতিকে আমরা স্বদেশী বলি, মূলে তা বার আনা বিদেশী। সুতরাং বিলেতি রাজনীতির গতিগতির সন্ধান নিতে হলে বিলেতি ইতিহাস ও বিলেতি সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।" ফলতঃ, বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যিক প্রমথবাবু সাহিত্যের তরফ থেকে বিলেতি রাজনীতির তত্ত্বরহস্য বিশ্লেষণ করে'ই প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। দু-ইয়ারকি (Dyarchy) আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক ডিমোক্রেসির কথা নানা দিক থেকে তুলেছেন। "ডিমোক্রেসি ইউরোপের প্রথম কথা

প্রবর্ত্তক

ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ [একাদশ সংখ্যা

নিবেদন

: :

দেশের দুয়ারে দুইটি কাজ লইয়া আসিয়াছি দেশবাসী, সাড়া দাও।

দেশে বিশুদ্ধ জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা। তার জন্য বিদ্যাকেন্দ্র। চন্দননগরে গঙ্গাতীরে আদর্শ জাতীয় বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছি। ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে অর্থশিল্প, যোগ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ভারতের সনাতন পদ্ধতিতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি। সকল বিষয়ের প্রকৃষ্ট আয়োজন করিতেছি। বিদ্যাপীঠ আমাদের ছাত্রপূর্ণ হইয়াছে। ৩০।৪০ জন ছাত্র ইতিমধ্যেই আসিয়াছেন। নিত্যই আরও নূতন আবেদন পাইতেছি। তাছাড়া কলিকাতা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় একটী একটী নূতন কেন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে। জেলায় জেলায় এরূপ কেন্দ্র চাই। উপযুক্ত সাধক কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে এগুলির ভিতর দিয়াই সনাতন ভারতীয় প্রথায় অচিরে বাংলার শিক্ষা স্বরাজ (Educational স্বরাজ) সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে।

অন্নের জন্য কৃষিক্ষেত্র, বস্ত্রের জন্য বস্ত্রশিল্প। ভাগীরথীর হারাধন সুন্দরবনে শিক্ষিত কৃষক বাহিনী গড়িয়া তুলিতেছেন। ধান, কলাই, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়িয়া, এই সাধকের দল কৃষিকর্ম্মের সকল অভিজ্ঞতা অসীম শ্রমে অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাদেরই তত্ত্বাবধানে অচিরে বাংলার হাজার হাজার বিঘা জমিতে সোনা ফলাইতে হইবে। সোনালী মায়ের জঠরে বাঙ্গালীর যে অন্ন লুকান আছে—শ্রদ্ধায় ও পরিশ্রমে সেই সিদ্ধ অন্ন আহরণ করিতে হইবে।

"[illegible] বঙ্গ বয়ন ভাণ্ডারের" কথা আজ দেশবিশ্রুত। মৃত বস্ত্রশিল্পটির উদ্ধারসাধনে আমাদের অধ্যবসায় আজ সার্থক হইয়াছে। যুগোপযোগী ও লাভকর ব্যবসায়রূপে শিল্পটিকে দাঁড় করাইয়া তুলিতে পারিয়াছি। এ একরূপ অসাধ্য সাধন। এক্ষণে উপযুক্ত অর্থানুকূল্য পাইলে, এইটিকে বিস্তৃত করিয়া সারা বাংলার বৃহৎ বয়ন বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার সংকল্প করিয়াছি। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে, বাংলার একটী মহৎ অভাব দূর হইবে, বাঙ্গালীর সত্যই মুখোজ্জ্বল হইবে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকলবিধ উপায়েই আমরা দেশের লক্ষ্মীকে দেশেই বাঁধিতে কৃতসঙ্কল্প। ইতিপূর্ব্বেই আমরা কয়েকটি আশ্রম আমাদের নিজস্ব

সর্ব্বস্ব ঢালিয়া কয়েকটী কারবার স্থাপন করিয়াছি। চন্দননগরে চেয়ারের দুইটি কারখানা, কটগোলা, মেশিন্ প্রেস ও আমাদের প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি গুলিতে প্রায় লক্ষাবধি টাকা খাটিতেছে। প্রবর্ত্তক-পাবলিশিং হাউস হইতেই একখানি পাক্ষিক (প্রবর্ত্তক) ও দুইখানি সাপ্তাহিক, ইংরাজী (Standard Bearer) ও বাংলা (নবসঙ্ঘ), পরিচালিত হইতেছে। এই নবসঙ্ঘের মুখপত্রগুলি দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত ও পঠিত হইতেছে।

ফাঁকা কথা অথবা আত্মবিজ্ঞাপনে আমরা [illegible] বোধ করি। খাঁটি ও নিরেট কাজের [illegible] নীর উপরে যে কথা তাহাই মূল্যবান। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, এই দ্বাদশ বর্ষের তপস্যায় কাজের ভিত্তি পত্তন করিয়াছি। [illegible]

অভিজ্ঞতাটুকু অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাই লইয়া দেশের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছি। অর্থাভাবে মহাব্রত অসমাপ্ত রহিবে না ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দেশব্যাপী বিদ্যাপীঠের জন্য, কৃষি ও বস্ত্রশিল্পের জন্য, নূতন নূতন ব্যবসা সৃষ্টির জন্য আরও অর্থ চাই, মূলধন চাই। লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত ব্যয় করিয়াই জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থির ও অটল করিয়া তুলিতে হইবে। কথায়, উত্তেজনায় দেশের মুক্তি আসিবে না। তপস্যা চাই, অর্থ চাই, [illegible] চাই। দেশের কাজে দেশবাসীর [illegible] লজ্জা ভয় বর্জ্জন করিয়া দাঁড়াইলাম। [illegible] বুঝিও না, অহঙ্কার বলিয়া [illegible] না। [illegible] মর্ম্ম অবধারণ কর। আবার [illegible]

স্বরাজ-যজ্ঞ

স্বরাজ যজ্ঞের উদযাপন ক্রমেই [illegible] আসিতেছে। মানুষ, অর্থ, চরকা—মহাত্মাজি দেশের কাছে এই তিনটি জিনিষ [illegible] চাহিয়াছেন। দেশের চারিদিকে সাড়া পড়িয়াও গিয়াছে। মহাত্মার দিব্য দৃষ্টি সার্থক হউক। তাঁহার আকুল প্রার্থনা পূর্ণ হউক। ত্যাগ থাকিলে, তপস্যা থাকিলে, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা অটুট অটল থাকিলে সকল বাধা ধূলিসাৎ হইবে। যুদ্ধ জয় অনিবার্য্য ঘটিবে।

* * *

অবিশ্বাসী মন—আশঙ্কার শেষ নাই। যাঁহারা এ স্বরাজ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের হৃদয়

[illegible] উদ্দেশ্য হয়ত এখনও সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—কিন্তু দিনে দিনে হইবে আশা করিতে পারা যায়। কর্ম্মব্রতে আত্মশুদ্ধি যত অধিক হইয়া উঠিবে, অস্পষ্ট উদ্দেশ্যও তত পরিস্ফুট, উজ্জ্বল দিব্য ছবির মত জাতির মানসপটে দীপ্ত হইয়া উঠিবে। জাগরণ যদি সত্য হয়, সকল সংশয় ও অস্পষ্টতা সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত নিমেষে সরিয়া যাইবে। দুর্গম পথ অদূর গত সিদ্ধির বিমল ছটায় সমুজ্জ্বল হইবে।

* * *

কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি যেন না ঘটে। স্বরাজ বৎসরে আসুক আর নাই আসুক—সাধনার

অমরবীর্য্য ও নষ্ট হইবার নহে। দেশাত্মা আজ শুদ্ধি মুক্তি চাহিয়াছেন. সে সঙ্কল্প উপরের. ভগবানেরই দিব্য প্রেরণা মানুষের প্রাণে তরঙ্গলীলা তুলিয়াছে, ভাগবত প্রেরণা ব্যর্থ হয় না, সঙ্কল্প বৎসরে অথবা বৎসরের বাহিরে সত্য ঘটনায় পরিণত হইবেই, অচঞ্চল ধৈর্য্য আশয়ে, ত্যাগ ও শ্রদ্ধা অবলম্বনে জাতিকে জয়ের পথে, সত্যের পথে চলিতে হইবে। সে লক্ষ্য আত্মরাজ্য—সাধকের ভাষায় Kingdom of Heaven—ভগবানের দিব্য প্রকাশ।

মহাত্মা গান্ধীর কল্পনামান এই দিব্য রাজ্যের স্থির লক্ষ্যই আছে কিনা জানি না। ভারতের আত্মা তাঁহার কণ্ঠ দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ভারতের বাণীর ঝঙ্কার মধ্যে পরিণত, দেশাত্মার বাণী আজ মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে বাধ্য, দেশবাসীর হৃদয়ের একটী বেদনার বোধও আমরা বক্রাক্ষে দেখিব না—মায়ের অঙ্গ হইতে আজ সকল শৃঙ্খলার বন্ধন খুলিয়া ধরিব। বন্ধন দশা ও মিথ্যা মায়া যদি মায়ার কুহকজাল সে ভাবেই শক্তি ও জ্ঞানের ছুরিতে টুকরা করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় পথে, ভারতের চিরন্তন ধারাবলম্বনেই আমরা ভারতের মুক্তি বিধান করিতে চাই। সে পথ সাধনার পথ, তপস্যার পথ, সে ধারা জ্ঞান প্রেম শক্তির ত্রিভঙ্গিম লীলাধারা।

* * *

আমরা জানিয়াছি, পথ সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে কথাই থাকুক, মুক্তির প্রেরণাটি সত্য, আদেশ পাইয়াছি অন্তরের প্রেরণাকে সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে, কিন্তু ভারতের মুক্তি উপায় ভারতের তপঃ-দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়া লইতে হইবে—ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম শক্তির সহায়েই তাহা সিদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে। জাতির বর্ত্তমান অবলম্বিত পথে সেই দৃষ্টি ও শক্তির যথার্থ পরিচয় পাই, দেশাত্মার ক্রন্দন একটী মুহূর্ত্তের জন্য আমরা উপেক্ষা করিতে পারিব না। কিন্তু সেই দৃষ্টি কই? সেই শক্তি কোথায়? প্রেরণা সত্য, কিন্তু জ্ঞান ও শক্তির অভাবে অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা'রই গতি আমাদের হইবে। দেশবাসীকে জ্ঞান ও শক্তির সাধনাই করিতে বলি। স্বরাজ-স্পৃহা সত্য হইলে, জ্ঞান ও শক্তির সাধনা অবলম্বনে আমাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।

* * *

সে জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম বিদ্যাই মূল সত্য, ভারতের অন্তরাত্মা এই মূল সত্যের মধ্যেই আপনার চিরন্তন খুঁজিয়া লইয়াছে—এইখানেই পাইয়াছে সেই উৎসশক্তি যাহা জীবনের সকল খণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে, চির বন্ধন দশা মোচন করিবে, মায়ের চরণ-শৃঙ্খল চোখের নিমেষে খসাইয়া দিবে। ভাগবত জ্ঞানেই মুক্তির বিজয়মন্ত্র আমরা সন্ধান পাইয়াছি, এই ব্রহ্ম বিদ্যাশক্তি দেশের অন্তর প্রদেশে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই দেশের মুক্তি করামলকবৎ সহজ ও সুখপ্রাপ্য হইয়া উঠিবে ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। এই মূল জ্ঞানেরই পরশমণি স্পর্শে জাতির ভিত্তিতে প্রতিভা দিগ্বিদিকে সহস্র জ্বালাপ্রভা বিকীরণে জ্বলিয়া উঠিবে। অধ্যাত্ম ধর্ম্মের সোনার কাটি ছোঁয়াইয়াই অপূর্ব্ব দর্শন, সাহিত্য, চতুঃষষ্ঠী কলা থরে থরে ভারত-ভারতীর মনীষা-মন্দিরে ফুটিয়া উঠিবে। ব্রহ্মশক্তিই ভারতের মূল শক্তি।

* * *

এই মূল শক্তি লাভেই সর্ব্বাগ্রে জাতিকে তপঃ-পরায়ণ হইতে বলি। কুণ্ডলিনী শক্তি ঘুমাইয়া আছেন, ঋষির বজ্রমন্ত্রে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দাও, শক্তিরাণী মূলাধার কমল হইতে তেজস্বিনী ভুজঙ্গিনীর মত

ঘটে ঘটে পূর্ণ ঘটাইয়া তুলিতে পারিবে, শুধু স্বরাজ নয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জগৎ রাজ্য তোমাদের অনায়াসে করতলগত হইবে। এই ব্রহ্মবিদ্যা আর শক্তি সাধনার জন্যই জাতিকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। উদ্ধের বিজ্ঞানক্ষেত্রে এই আদেশই যে আজ জলদমন্দ্রের মত স্পষ্ট ও জ্বলন্ত ধ্বনিময় হইয়া বাজিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া তোমরাও এই অব্যর্থ আদেশমন্ত্র লাভ কর, তার পর শক্তির শুদ্ধ যন্ত্র স্বরূপ অকুণ্ঠ চিত্তে অসীম কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়। আমরা বলি না এক বর্ষ, দশ বর্ষ, বহু বর্ষ, অখণ্ড কালকে বুদ্ধির মানদণ্ড দিয়া পরিচ্ছিন্ন করিতে চাই না—সাধনা আমাদের সত্য হয়, নিশ্চিত হয়, সিদ্ধিও অনিবার্য্যক্রমেই নিখুঁত ও সত্য হইয়া আগত হইবে। সিদ্ধি সাধনার ফল—বীজ যেরূপ বুনিবে, সিদ্ধি তদনুরূপ হইবে, ইহা অবধারিত।

* * *

আমরাও স্বরাজই চাই, কিন্তু সে তোমরা যাকে স্বরাজ বল, সে স্বরাজ ইহা নয় স্বরাজ নয় স্বারাজ্য এবং সাম্রাজ্য—ইহাই ভারতের সাধনার সামগ্রী ভারতজাতির সনাতন লক্ষ্য ও জীবনব্রত—পাশ্চাত্যের কোনও সম্মোহন মন্ত্রে আমরা ভারতের এই চির ব্রত ব্যর্থ হইতে দিব না। এই সঙ্কল্পই আজ বিদ্যুৎ প্রভার মত আমাদের অন্তরে অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহার দিব্য সাধন মন্ত্র অন্তরদেবতা আমাদের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে স্বর্ণাক্ষরে সুস্পষ্ট বাণীরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এক্ষণে এই বাণীকে মূর্ত্তিদান করিবার জন্যই আমাদের সমস্ত তপঃশক্তিকে একত্র পুঞ্জক সংহরণ করিয়া তুলিয়াছি। সংযমে পরিশুদ্ধ অমোঘ শক্তিসঞ্চারে অচিরে ইহারই দেশব্যাপী কর্ম্মবিগ্রহ প্রতিপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। সে প্রেরণাও দিন দিন বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতেছে। জাতির অশুদ্ধ স্বরাজযজ্ঞ এই দিব্য মহাযজ্ঞে রূপান্তরিত করিয়া লইবার জন্যই আমরা এইবার তপঃপ্রয়োগ করিব। বাংলায় দিব্য রাজ্যই নিখুঁত করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে।

* * *

কল্পপটে আজ যাহা বীজরূপে ভাবস্ফুট, গূঢ়, জাগ্রত কর্ম্মে তারই দোতল মূর্ত্তি দেখিবার জন্য জাতিপুরুষই আজ উদগ্র নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন—বাহিরের তরঙ্গবিক্ষোভ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইও না, আত্মহারা হইও না, সমুদ্রগর্ভে মুক্তির মহাবন্যা ডাক দিয়া গিয়াছে, কত বিপুল দেশব্যাপী তরঙ্গমালা আসিবে যাইবে কত উত্তাল ঢেউ বিপুল গর্জ্জনে উঠিয়া আবার বিপুল গর্জ্জনেই আছাড়িয়া পড়িবে—হিমালয়ের অনন্ত নীলচক্রবাল ক্রীআস্বরী অন্তরের স্থিরাসনে আমরা স্পষ্টনেত্রে দেখিতেছি, ঐ দেখ এইবার মহাগগনে নব যজ্ঞের মহাডাক ছুটিয়া আসিতেছে—বাংলার স্থির আত্মপ্রতিষ্ঠ সাধকমণ্ডলী, এবার তোমাদিগকে অকুণ্ঠ উদ্যমে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। বিজয়তিলক দীপ্ত অঙ্গুলি স্পর্শে স্বয়ং মা'ই আজ তোমাদের ললাটপটে আঁকিয়া দিয়াছেন। বিত্তমুক্ত অধিকারগত কেবল চাই বিপুল যজ্ঞ যুক্ত লক্ষ লক্ষ সমিৎ উপকরণ, আর উৎসর্গমণ্ডিত অবিরল তপঃ-প্রভা। সেই তপঃপ্রভাই বিজ্ঞান শাক্ত যাহা সাধকের কর্ম্ম ও জীবনের সত্য রূপটিকে জাগ্রত ও বস্তুতন্ত্র করিয়া ধরিবে। আর তপঃশক্তি ও তপস্যার উপকরণের কথা নানা স্থানে নানাচ্ছলেই আমরা আঁকিয়া তুলিতেছি।

* * *

বাঙ্গালী, আমাদের কথা হেঁয়ালী বলিয়া উপেক্ষা করিও না—কথার আকাশমঞ্চে উঠিয়া হেঁয়ালীর ছন্দ গান তুলিতে আমরা বসি নাই। চিত্তরঞ্জন সত্য বলিয়াছেন, কবিত্বের দিন আজ আর নাই, কঠোর কর্কশ জীবন-সত্যকে আমাদের আজ স্বীকার

করিয়া লইতে হইবে। স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, শুধু ভাবের স্বপ্নের নেশায় জীবন খোয়াইলে পরিশেষে দারুণ অনুতাপে হৃদয় মরুময় হইবে—আশা কুহকিনী, তোমরাই ত আশার কুহকমন্ত্রে আপনাকে ভুলাইয়া জলের স্রোতের মত ভাসিয়া চলিয়াছ—স্বরাজ সাধনার আসল ও সত্য মন্ত্র—ভারতের সনাতন জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের সাধনায় মিলিবে, কর্ম্মকে টানিয়া উপরে জ্ঞানের আলোকে তুলিয়া ধর, বুঝ, দর্শন কর, শ্রবণ কর, কি ভারতের মিশন, ভারতের আত্মা কি বলিতেছে, দেশাত্মা আজ সত্য সত্য কোন বস্তু চাহিতেছেন। বাহিরের প্রমত্ত উত্তেজনা কল্পনা নয় অন্তরের সত্য ডাক—সত্য বাণী, ভারত মাতার সত্য রূপ প্রত্যক্ষ কর। তারপর অন্তরের নিগূঢ় শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া বৃহৎ সাধনার যে কর্ম্মতন্ত্র সেইটিকে কার্য্যে পরিণত কর। বাহিরের কথায় বাহিরের উত্তেজনায় মাতিতে আমরা নিষেধ করি—প্রত্যেকে আপন অন্তরে নিজপ্রকাশ কর্ম্মের শুদ্ধ নির্দ্দেশটি সংগ্রহ কর। কর্ম্মই সাধনানুষ্ঠান, কিন্তু এই জ্ঞান প্রেরিত, প্রেমে অনুপ্রাণিত, বিশুদ্ধ কর্ম্মই জাতীয় আত্মা চাহিতেছেন। আবিল উত্তেজনায় কিম্বা সঙ্কীর্ণ ভাবাবেগে জ্ঞানের সত্য ইঙ্গিতটি উপেক্ষা করিলে, এই সত্য কর্ম্মটির পথ কণ্টকপূর্ণ করিয়াই তুলিবে।

* * *

আত্মস্থ সাধকের কাছে আজ লক্ষ্য স্পষ্ট, পথ দিবালোকের মত উজ্জ্বল। কি করিতে হইবে তাহা লইয়া দ্বন্দ্ব করিয়া লাভ নাই—যাহা হইবে, সেইটুকুই করিতে পারিবে—ভিতরে যে, স্বরাজ না পাইয়াছে, স্বরাট্ না হইয়াছে, বাহিরে স্বরাজ অর্জ্জন তাহার কর্ম্ম নয়, প্রচেষ্টা চলিতে পারে, প্রস্তুতি কর্ম্ম (preparatory work) হইতে পারে, কিন্তু আসল কথা, স্বরাট্ সম্রাট্ না হইলে স্বরাজ্য নাই—স্বারাজ্যও নাই—সাম্রাজ্যও নাই। তাহার উপায়—যোগ, উৎসর্গ, সাধনা। যোগই অন্তর-বিজ্ঞানের মুখ খুলিয়া দিবে—অন্তর-বিজ্ঞানই সমস্ত বহির্জ্ঞান বহিয়া আনিবে—থরে থরে সাজাইয়া ধরিবে। এইজন্যই বাংলার নবতান্ত্রিক আমরা, চাহিয়াছি—সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বপ্রথমে Culture দেশব্যাপী নূতন শিক্ষা, নূতন Culture' এর প্রকাশ করিয়া তুলিব। তাহার জন্য যে বিচিত্র আয়োজন, তাহার চিহ্ন পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আমরা ফুটাইয়া তুলিতেছি। আর চাই জাতীয় জীবনের পার্থিব ভিত্তিটিকে সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে। অধ্যাত্ম ও জীবন, স্বর্গ ও পৃথিবী, মা ও মাটী আমাদের যুগল মন্ত্র। যুগপৎ এই দুই দিকের দুইটি চরম সত্যকে আমরা একত্র প্রতিষ্ঠা করিব। আর যাহা কিছু সে সব অবান্তর কথা, এই দুইটিরই মাঝখানের আনুসঙ্গিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অংশ প্রত্যংশ মাত্র—উপরের সত্য ও নীচের সত্যকে যদি মিলাইতে পারি—আর সব স্বার্থ করগত হইবে। ধর্ম্ম ও অর্থের যুগপৎ পূর্ণানুষ্ঠানে আমরা মুক্তি ও ভুক্তির স্থাপন করিব। ভারতের স্বরাজসাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার এই প্রকৃষ্ট পন্থাই আমরা অনুসরণ করিতে বলি।

বাঙালীর জাগরণ

— ২০২ —

বাঙালী বলে সে জাগিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে। বাঙালীর অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বলেন, পঞ্চাশ ও পয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা জানেন তাঁহারা কি চান। এত দীর্ঘ দিন যে জাতি জাগিয়া রহিয়াছে, এত দীর্ঘদিন ধরিয়া যে জাতির নেতা জাতির চাওয়াটিকে ধরিয়া আছেন, দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে জাতির জাগরণটা কিরূপ এবং কোথায় বসিয়া তাঁহারা জীবনযাপন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিপাহীবিদ্রোহ। বিনায়ক রাও দামোদর সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের First War of Independence বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঠিক বিনায়ক দামোদরের মতাবলম্বী না হইলেও আজকাল কেহ কেহ সিপাহীবিদ্রোহকে ভারত জাগরণের ভিত্তিভূমি বলিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈঠকে বসিয়া এরূপ আলোচনায় কল্পনার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে—বাঙ্গালীর কোন নেতাই ইহাতে সায় দিতে পারিবেন না। বাঙ্গালীর চিন্তাস্রোত লক্ষ্য করিয়া কোন ঐতিহাসিক যদি এ মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বাংলা কালিদাসের জন্মভূমি শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালী যেমন হাঁও বলেন না না'ও বলেন না, সেইরূপ নির্ব্বাক ও মৌন হইয়া তাহাকে ও-কথাও শুনিয়া যাইতে হইবে। ফলতঃ সিপাহী বিদ্রোহের সহিত বাঙালীর জাগরণের কোন সম্বন্ধ নাই।

বাঙ্গালার একটী প্রাণীও সিপাহী যুদ্ধে যোগ দেয় নাই বলিয়া আমরা একথা বলিতেছি না। দুই একজন বঙ্গবীর সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিলোপের সম্ভাবনায় বা তাঁহাদিগকে মনুষ্যকলঙ্ক দেশদ্রোহিতাদোষ হইতে মুক্ত করিতে আমরা এ কথা কহিতেছি না। সিপাহী যুদ্ধের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর হস্ত হইতে ইংরাজ জাতি ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হওয়ায় পরোক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের জাগরণের সহায় হইয়াছে, একথা স্বীকার না করিলেও আমরা বলিতেছি, কি সাক্ষাৎভাবে কি পরোক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহ বাঙালীর জাগরণের সাহায্য করে নাই। তবে বাঙালী জাগিল কোন ঘটনায় এবং বাঙালীর জাগরণই বা আসিল কোথা হইতে?

স্বতঃই প্রথমে রামমোহন রায়ের কথা সকলের মনোমধ্যে উদয় হয়। আমাদের মতে রাজা রামমোহনের সময়ে বাঙালী জাগে নাই, জাগিয়াছিলেন রাজা রামমোহন নিজে। আমরা বাঙালী জাগরণের কথাই তুলিয়াছি। ব্যাপকভাবে বাঙালী জাতিকে জাগাইয়াছিলেন অন্যজনে—তাঁহার বা তাঁহাদের কথা পরে বলিব। অনেকে যে সিপাহী বিদ্রোহ ও ভারতের জাগরণের সহিত একটা সম্বন্ধ আরোপ করিতে চান তাহার একটা গূঢ় কারণ আছে, সেই কারণটীর সামান্য আলোচনা করিলে আমরা এই জাগরণের প্রকৃতিটী বুঝিতে পারিব, তাহা হইলে এ জাগরণের মূল কে, মূল কি এবং ইহার নেতা কাহারা তাহা জানিতে আর কষ্টকল্পনা করিতে হইবে না।

ভারতজীবনে সিপাহী বিদ্রোহ একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। জাতীয় আত্মা যখন নিশ্চেষ্ট ও মৃতপ্রায়, জাতীয় আত্মা যখন কিছুতেই স্বচ্ছ অনুভূতি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না তখন

কতকগুলা স্থূল বিধি নিষেধে সে কোনরূপে ধুক্ ধুক্ করিয়া অর্দ্ধমৃত জীবনটা বাহিয়া চলিয়া যায়। যাইহ'ক তখন বিধি নিষেধেই তাহার সকল জীবনটী আটকাইয়া থাকে! জাতির ভাগ্য বিধাতা ক্রূর হাস্যে এরূপ অধম জীবন লইয়া সময়ে সময়ে খেলা করিয়া থাকেন। জাতির এইরূপ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় এই প্রকার বিধি নিষেধ ও আচার ব্যবহারে তাহার সমস্ত সম্মান সে পুরিয়া রাখে এবং সম্মান-হানি তথা জাতি-পাতের সামান্য আশঙ্কায় সে কোথা হইতে তাহার সুপ্ত বল বীর্য্য টানিয়া আনিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে আততায়ীকে আক্রমণ করে। ইহা যে বাঁচিবার জন্য তাহা নহে, ইহা অন্ধসুপ্ত জাতির স্বল্পকালীন একটা খেয়াল মাত্র। উপরের দিক দিয়া সিপাহী বিদ্রোহে আমরা অনেক লাভবান হইয়াছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর নিকট হইতে মহারাণীর হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হওয়ায় অনেকদিক দিয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি; তদ্ভিন্ন এতগুলি ভারতীয় পুরুষ অসিহস্তে যাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাহার প্রতি এরূপ মন্তব্যপ্রকাশে আমাদিগেরই কষ্ট হইতেছে—কিন্তু করা যায় কি, যে জায়গায় জীবনটী নাস্ত করায় আমরা এরূপ মরিয়াই আছি, তাহাকে মস্ত আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া আমরা যদি স্বহস্তে আত্মহত্যা করিতে থাকি তাহা হইলে তাহার সুখ্যাতি করিয়া সত্যের উপাসনা করা হয় না। আমরা সতীদাহের মতই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করি না কেন জীবনটীকে স্বর্গে না তুলিয়া জীবনকে ভস্মে ঢালিবার জন্য যে সেই-আয়োজন তাহা আর রক্ত মাংসের মনুষ্যকে বুঝাইতে বেশী কষ্ট হয় না।

যাইহ'ক অনর্থক বিধি নিষেধের জন্য মাথা খুঁড়িয়া জাতি যখন মরিতে যায় তাহার মধ্যে নিশ্চয় তখন একটা ব্যথার সঞ্চার হয়। এইরূপ মরম ব্যথায় তাহার চৈতন্য হইলে, বলিতে হইবে, ঐরূপ অপমৃত্যুর চেষ্টাই তাহার প্রকৃত জাগরণের নিমিত্ত স্বরূপ, বিশেষতঃ সিপাহীবিদ্রোহ ও বঙ্গদেশে ভারতের সাড়া খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সংগঠিত হওয়ায় ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একটা প্রলোভন আমাদের আসিতে পারে। ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা একটা জাতীয় আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারি। সিপাহীবিদ্রোহের সহিত জাতীয় জাগরণের একটা সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলে ইংরাজ আগমনরূপ ভারত জাগরণের অন্যতম কারণটী, কিছু ফিকা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহা কুলাইতেছে না। আমরা মোটামুটি বুঝি, জাতীয় জীবনটাকে যাহারা আ-ঘাটায় বাঁধিয়া রাখেন এবং সেই আ-ঘাটায় যতকিছু বড় বড় কার্য্যই ঘটিয়া যাউক না তাহার সহিত জাতির সত্য জীবন প্রকাশে বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই। জাতীয় জীবনের ভাগ্য-বিধাতা যেন কোশলে সেগুলিকে জাতির মূল জীবন-গতি হইতে সরাইয়া অন্যত্র রাখিয়া দিয়াছেন—সেগুলি ঐরূপেই মরিয়া যাইবে। দূরে অসির ঝঞ্ঝনা মেঘের আড়ম্বর বা বিদ্যুতের কড় মড় কিছুই সাক্ষাত্-ভাবে তাহার জাগরণের সহায়স্বরূপ হয় না। জাগরণের সূত্র আসে অন্য দিক দিয়া।

ঠিক বিধি নিষেধ ও আচার ব্যবহারে যাহারা জাতীয় জীবনটীকে বাঁধিয়া রাখে তাহারা উহার জন্য শত স্বার্থত্যাগ করিলেও যেমন তাহার উদার আত্মটীর দর্শন পায় না তেমনই ঐ বিধি নিষেধের হাত হইতে কেবল রক্ষা পাইবার জন্য যে সকল আয়োজন হইয়া থাকে সেগুলির মধ্যেও জাতীয় জীবন বিকাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ে মদ্য ও মাংসের শ্রাদ্ধ করিয়া ধর্ম্মত্যাগ ও জাতিত্যাগ করিয়া যে সকল মহারথী নিজদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন মনে করিতেন, তাঁহারাও জাতির নিদ্রাঘোর অবস্থায় উচ্চ আল স্বপ্ন-মূর্ত্তিমাত্র। জাতির

জাগরণ উহাতেও নাই এবং ইহাতেও নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারের অধিকাংশই জাতির উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালের উদ্দাম নৃত্য মাত্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে। এই গণ্ডগোলের মধ্যে ঐ দুইটীকে যাঁহারা ঠিক ঠিক বাছিয়া লইতে পারেন তাঁহারাই ঠিক জাতীয় উদ্বোধনের স্পন্দগুলি ধরিতে সক্ষম হন। উনবিংশ শতাব্দীর যে-অংশ জাতীয় উদ্বোধনের কেন্দ্রস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রাজা রামমোহন রায় তাহার একজন প্রধান ও অতিপ্রাচীন নিদর্শন। এক্ষেত্রে রাজা রামমোহন ও তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ রেখা টানিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় চাহিয়াছিলেন—তন্ত্র সাধনা করিয়া বেদান্তের আলোচনা করিয়া ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া রাজা রামমোহন রায় চাহিয়াছিলেন দেখিতে জীবনের মধ্যে কোন্ স্রোত ধিকি ধিকি বহিয়া চলিতেছে। সে-সময়ে তাঁহার জীবন মধ্যে যে সকল গূঢ় স্রোত অবগত হইতে তাঁহাকে যে যে ধর্ম্মের আলোচনা করিতে হইত, যে যে লোকের সহিত সদালাপে ব্যস্ত থাকিতে হইত, যে যে আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া জীবনটাকে পুষ্ট ও স্বাধীন রাখিতে হইত, তাহার উপর যখন বিধিনিষেধী ও আচারীরা প্রবল আক্রমণ করিতেন তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাহাদের ভণ্ডামী প্রকাশ করিতে হইত এবং অনেকটা অনিচ্ছাস্বত্বে প্রকাশ করিতে হইত, তাঁহার আচরিত অনুষ্ঠানগুলিও সময়োপযোগী সত্য আচরণ। তিনি অন্যবিধ আচরণের অর্থাৎ তৎকাল প্রচলিত বিধিনিষেধ ও কণ্টক গুলি একান্ত ক্রূর সামাজিক প্রথার অসারত্ব যতটা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন নিজের অবলম্বিত আচরণকে তিনি ততটা পরিষ্কাররূপে সমর্থন করেন নাই—বিনা সকল জাতি মিলিয়া একত্র উপাসনা করা যাহা তান্ত্রিক চক্রে তখন সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইত। তান্ত্রিকদিগের শৈব বিবাহ এবং অখাদ্য ভোজন ইত্যাদি বার বার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া তিনি নূতন কোন প্রথার পত্তন করেন নাই। মোট্ কথা, তিনি চাহিয়াছিলেন জানিতে জীবনের স্রোতটাকে—যে জীবন বিধি নিষেধের ছাওয়ায় একান্ত তরল ও স্থূলভাবে বহিয়া যায় সে জীবনটা ত্যাগ করিয়া তিনি গভীরের স্রোতটী ধরিতে চাহিয়াছিলেন।

এইরূপে যাহারা গভীরের দিকে কোন টান অনুভব করিতেন তাঁহাদের ব্যষ্টিগত জীবন দিয়াই আমাদের জাগরণের সূত্র আবিষ্কার করিতে হইবে। তাঁহাদের জনে জনের জীবন সাধন—জীবনের গভীর প্রদেশ প্রবেশ করিবার অন্তঃসাধনা তবেই আমাদের কাজে লাগিবে। তাঁহাদের শত বৎসর পঞ্চাশ বৎসর ও পরকালিক বাসরের টান ও চাওয়ার স্মৃতিটুকু লইয়া তাহাদের জাল জীবনটা আকড়াইয়া ধরিলে আমাদিগকে মহাবিপদে পড়িতে হইবে। আমরা পথভ্রষ্ট হইব। রাজা রামমোহনের সাধনা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শেষ-জীবনের সাধনার মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা জাতীয় জাগরণের অনেক সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি। কিন্তু তাহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে যে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে তাহার বাহিরের কাঠাম ধরিয়া যদি আমরা জাগরণের চিত্র আঁকিতে থাকি তাহা হইলে অন্ধ-কারের কি গভীর গর্ত্তেই না আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে একটা স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতায় জীবনের অনেক কিছুর স্বাধীন সম্ভোগের জন্য আমরা নিজ-দিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করি, অনেক কিছুর স্বাধীন বিকাশও তথায় হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে জাতির মূল জীবন স্পর্শই করিতে পারে না, জাগরণ ত কোন্ কথা! অতএব ঐ দিকে জাতির উদ্বোধন

সম্ভবপর করিতে গিয়া জাতিটাকে ব্রাহ্ম সাজাইবার চেষ্টা করিলে কি উৎকট কাণ্ডই না হইবে।

ফলকথা, উনবিংশ শতাব্দীতে দেশের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে সেগুলি জাতির জাগরণের চিহ্নস্বরূপ নহে। জাতির জাগিবার পূর্ব্বে উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইয়া সে যে-সব চিন্তা করিয়াছে তাহার কিছু সমাজ ও নব সমাজ বিধানরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেগুলি ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্য সমাজ ইত্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারা স্থূল জীবন সম্ভোগের অবাধ ক্ষেত্র স্বরূপ স্বেচ্ছাচারী সর্ব্বত্যাগী সম্প্রদায় অপেক্ষা শতাংশে ভাল। এ-রূপ বিলাত ফেরতা বা বিলাতী ধরণ-ধারী সিভিল সম্প্রদায়ের কার্য্য ও সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহীদের কার্য্য একই আত্মঘাতী জিনিষের এ-পিঠ ও ও-পিঠ মাত্র। তথাপি ব্রাহ্ম সমাজের মূলে একটা উচ্চাঙ্গের সাধন প্রণালী বর্ত্তমান থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত আরামোদী ব্যক্তিদিগের উহাতে অবাধ প্রবেশ আছে, তজ্জন্য বলিতেছিলাম তাহার ভিতর দিয়া জাগরণের সূত্র খুঁজিতে যাওয়া ও অন্ধকার গভীর গর্ত্তে প্রবেশ করা একই কথা।

তবে জাগরণটা কোথা হইতে আসিয়াছিল? ইহা নিশ্চয়, কতকগুলি ব্যক্তি জীবনের অন্তর্ম্মুখী সাধনা হইতে দেশের প্রাণে যে একটা অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহার জন্য ঐ সকল বিশিষ্ট আত্মাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্যস্থল হইবে। তাঁহাদিগকে বেড়িয়া, তাঁহাদের সাময়িক সাধনোপযোগীর ব্যবহারগুলিকে অবলম্বন করিয়া যাহারা বাসা বাঁধিয়া আছেন তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়াই চলিয়া যাইতে হইবে। এক্ষেত্রে কেবল রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রই নাই—অনেক নৈষ্ঠিক আচারী সন্ন্যাসী গোস্বামী রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক অন্তরের দ্বার মুক্ত করিয়া আমাদের হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন। ইঁহারাও ব্যষ্টিভাবে আমাদের লক্ষ্যস্থল এবং ইঁহাদের অন্তর্ম্মুখী প্রেরণাটুকুই আমাদিগের জাগরণের সাহায্য করিয়াছে, ইঁহাদের চিত্ত ও প্রাণের বহির্বিকাশী খেয়ালগুলি ধরিয়া যে সব type দাঁড়াইয়া যাইতেছে সেগুলি ভস্মের ভস্মাবশেষ মাত্র। ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রাণ ও মনকে মথিয়া মথিয়া বাহিরের প্রতি একটা অবসাদ আনিয়া আমাদিগকে ব্যাপকভাবে অনেকটা সজাগ করিবার সাহায্য করে, তাহাও বিপরীত দিক দিয়া।

সকল অন্তঃসাধনাকে এক দেহভূমে স্থান দিয়া পরমহংস রামকৃষ্ণ যে অন্তঃসাধনার বাণী ফুটাইয়া গিয়াছেন, স্বামীজির পরিশ্রমে ও অবলম্বনে যে বাণী এখন পর্য্যন্ত বেলুড় মিশনে ধ্বনিত হইতেছে, আমাদের অন্তঃসাধনার সনাতন চিত্রাবলী ফুটাইয়া তাহা আমাদের মনোহরণ করে বিশেষভাবে, কিন্তু সেখানকার ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগকে আসিতে হয় গৃহে, সংসারে, বাহিরে—তাহার মিশনের বেড়া-দেওয়া সংসারকেও ছাড়াইয়া। সে সব জায়গায় যদি আমরা তাহাকে পাইতাম তাহা হইলে বলিতাম কেবল ব্যষ্টি ভিন্ন একটা সমষ্টিও আমাদের জাগরণের সত্য নিদর্শন ও নায়কস্বরূপ। আমরা জাগিয়াছি সত্য সত্যই, ক্রমে ক্রমে ব্যাপকভাবেই আমাদের জাগরণ হইয়াছে। বহু ব্যষ্টি অন্তরের সাধনা দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ জাগরণ তাঁহার দ্বারা সার্থক হইবে যিনি তাঁহার অন্তর ও বাহির উভয়ের সাধনা দিয়াই আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিবেন, আমাদের জীবনের মূলকেন্দ্রে লইয়া যাইবেন। জাতি এখনও এই অধিষ্ঠান ভূমির অনেক দূরে। তাহার বাহিরে থাকিয়া সে যে-জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে তাহা এখনও বাহির দিয়া ধরা যায় না, তাহা কেবল জানাজানিরই সামগ্রী। আমরা কেবল জানিয়াছি আমরা কি চাই।

যোগের খেলা

:০:—

আমার এই শরীর ছাড়া, মন ছাড়া, আর একটা কিছু 'আমি' আছি—সেই আমার বড় আমি, সত্য আমি, পাকা আমি—এই বোধটুকু হইতেই যোগ আরম্ভ করা যাইতে পারে—যোগ হইতেছে সত্য ও বৃহৎ জীবনটিকেই পাইবার উপায়—সত্য কেবল শরীর নয় মন নয়, তাই বলিয়া এগুলি একেবারে অনর্থক, ঘোর মিথ্যা, তাহা নয়—এগুলি আসল যে আমি তারই বহিঃপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজেকে বাহিরে ফুটাইয়া দিয়াছেন—মনরূপে, শরীররূপে—আত্মারই আবির্ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে এইগুলির ভিতর দিয়া। এগুলি আত্মারই প্রতিকৃতি, প্রতিকৃতির যে আসল মৌলিক কায়মূর্ত্তি—সে এ নয়। যোগের উদ্দেশ্য এই সত্য দিব্যমূর্ত্তিকে প্রথমে জ্ঞানে চিনা, জানা, বসে দীক্ষায় তাহাকেই ধরা, ছোঁয়া, তার পর প্রাণে জীবনে, শরীরে পর্য্যন্ত তাহাকেই পাওয়া হওয়া।

কিন্তু চেতনা যতক্ষণ শুধুই দেহগত, বা মনোগত, ততক্ষণ উপরের এই স্বরূপের যেন কোনও আভাস বা পরিচয় পাওয়া যায় না—মনে হয় যেন ইহাই সব এই মন বুদ্ধি, এই চিন্তা চেষ্টা, এই শরীর [illegible] এ ছাড়া আর আমার কিছুই নাই, কিছুই নয় বাকী একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা একটা মহাশূন্য, অন্ধকার—সে অন্ধকার ভেদ করিতে সাহস হয় না, তাহার কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়—এত জমাট নিবিড় সে অন্ধকার। সাধক প্রথম ধ্যানাভ্যাস কালে বাহির হইতে ভিতরের দিকে চক্ষু ফিরাইলে এরূপ ঘোর জমাট অন্ধকারেরই সম্মুখীন হন—হতাশ হইবার কিছুই নাই—সে অন্ধকার আর কিছুই নয়, আমাদের মায়েরই ঘোমটা তিমিরময়ী মায়ারূপ, এই অরূপ রূপ উন্মুক্ত করিলেই সত্যের জ্যোতির্ময়ী খুলিয়া যাইবে।

ইহা ত গেল গোড়ার কথা। কিন্তু খুলিবার একটু গূঢ় রহস্য আছে—সেই রহস্যটুকু আয়ত্ত করিতে পারিলে, যোগপ্রকাশ সুখসাধ্য ও সহজ হইয়া উঠে। যোগ, সরল সুস্পষ্ট সত্যেরই প্রকাশ ক্রম, আমার শরীর সত্তা, মানস সত্তার পিছনে, নিগূঢ়ে, যে বিপুল অসীম আত্মসত্তা আছেন তাঁহারই জাগরণ ইচ্ছা [illegible] যদি জাগিতে চাহিয়া থাকেন, আত্মপ্রকাশে [illegible] হইয়া থাকেন, দেখিবে যোগের [illegible] জীবনে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ

নিজেই [illegible] খাস পশ্চাৎ [illegible] আন্তরিক [illegible] যোগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ জ্ঞানের [illegible] দিয়া খেলায় [illegible] আরম্ভ করে।

[illegible] এই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, [illegible] গূঢ় রহস্য কথায় [illegible] যোগেই [illegible] হয়, [illegible], অপর কিছুই করা হয় না—যোগকে পাইতে হইবে না, যোগই আমার সবখানি পাইবে, ভরাইয়া তুলিবে, আপনি ছাইয়া ফেলিবে, কেবল আমি তাহার অন্তরণে বাধা না দেই, তাহার প্রকাশ পথে নিজের কল্পনার, বাসনার, সংশয়ের গণ্ডী টানিতে চেষ্টা না করি—যোগের সরল আত্মপ্রকাশটিকে নিবিড় স্বীকৃতি দিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে কোনও কুণ্ঠা না রাখি। এইটুকুই যথেষ্ট, মানুষকে ত' ইহার বেশী কিছুই করিতে হইবে না—যোগ আপনিই ফুটিবে, জগতের আত্মপুরুষ --universal soulই আজ যোগকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন—স্বয়ং প্রকৃতি-রাণী তাঁহার নিগূঢ় গর্ভে যোগেরই বীজাঙ্কুর পাইয়া বিচক্ষণা হইয়া উঠিয়াছেন—এ যুগে মানুষকে শুধু

আপনার চক্ষুটিকে ফিরাইয়া ধরিতে হইবে —অন্তরের পানে, আপনার চাওয়াটিকে ঊর্দ্ধমুখী অগ্নিশিখার মত সজাগ করিয়া ধরিতে হইবে, প্রকৃতির কেন্দ্রমূলে, যেখানে সব বাসনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে সেইখানেই কেবল শ্রদ্ধার নিবিড় তাপশক্তি অনুক্ষণ প্রয়োগ করিতে হইবে। আর কিছু করিবার নাই। যদি স্বীকৃতি (acceptance) থাকে, উৎসর্গ থাকে, শ্রদ্ধা থাকে—যোগের পরশে আমার সাধনা অবশ্য ধারা নিশ্চয় [illegible] [illegible]।

এই জন্যই সমতার কথা, [illegible] ity'র কথা— সমতা চাই [illegible] [illegible] ভিতরে নামিয়া আসিতে [illegible], [illegible] ধারণা করিবার জন্য চাই [illegible] আধার, চাই সমতা [illegible] নহিলে [illegible] অভাবে যেমন [illegible], ইহাদের [illegible] সবেগ [illegible] [illegible] পারে, আধার [illegible] [illegible] পারে [illegible] জন্য আগে সমতার ধারণসামর্থ্যের প্রয়োজন। সমতাকেই সপ্তাঙ্গ যোগের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ বলা হইয়াছে—কেন না সমতা ভিত্তিটিকে পাকা করিয়া গাঁথিয়া তোলে। ভিত্তি যদি নিরেট পাকা করিয়া না গড়া হয়, তবে প্রাসাদের যে কোন মুহূর্ত্তে পতন সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ভাবেই রহিয়া গেল। যোগের সাহায্যে মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক নব নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় তাহার মূল ভিত্তি যাহাতে কাঁচা ও ক্ষণভঙ্গুর না হয় —সেই দিকে তীব্র দৃষ্টি প্রয়োজন।

সমতার ত্রি-স্তরের কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা কহিতে চেষ্টা করিয়াছি—সাধনা যে বিশিষ্ট ক্রমাবলম্বন পূর্ব্বক চলিয়া থাকে, তাহা নয়,—বরং এ সাধনায় কোন বিশিষ্ট ক্রম, ভঙ্গী, প্রকরণের বন্ধনই নাই, প্রকৃতির অবাধ লীলার তালে তালে সহস্র ঋজু ও বঙ্কিম ধারা সৃষ্টি করিয়াই বিচিত্র ছন্দে অগ্রসর হয়, ইহাতেই প্রকৃতির আনন্দ, তাঁহার স্বাভাবিক গতির উল্লাসই যোগের গতি নির্ণয় করে, তবুও এ কথা সত্য, যখন ফিরিয়া দেখা যায়, অতিক্রান্ত পথের বুকে তাঁহার যে স্পষ্ট গতিচিহ্নগুলি আঁকা রহিয়া গিয়াছে, উহাদের মধ্যে একটা দিব্য শৃঙ্খলাচ্ছন্দই প্রত্যক্ষ করি—এ ছন্দ তাঁহারই অন্তর্নিহিত স্থির শান্ত জ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষেরই লীলাচ্ছন্দ—সে ছন্দ শাশ্বত, অনাহত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, বাহ্য বিশ্বের নিয়মগুলি যেমন, এই অধ্যাত্ম জীবনের অনুশাসক নিয়মগুলিও তেমনি তাঁহার এই লীলাচ্ছন্দের তালময় মাত্রা বৈচিত্র্য মাত্র।

আত্মসমর্পী যোগীর কাছে বিশ্বের অনাহত সুর-লহরী প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ অবস্থা বড় মধুর। যেন এক অগাধ মিষ্টমধুর স্রোত শুধু আমার জীবন নয় সারা বিশ্বজীবন ছাইয়া রহিয়াছে, তরঙ্গে তরঙ্গে দিকে দিকে একটা শান্তিময় আলো, অথবা আলোময় শান্ত উছলিয়া দিতেছে, সুখ দুঃখ জলোচ্ছ্বাসেরই মত উঠিয়া পড়িয়া ভাসিয়া মিলাইয়া যাইতেছে— একটা অহৈতুক স্থির, গভীর ও গাঢ় শান্তিরস বুদ্ধি, হৃদয়, মন, প্রাণ শরীরে পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিতেছে। যেন জড়াবিষ্টের মত চলিতেছি ফিরিতেছি—অথচ সে কি মাধুরীভরা অপরূপ পরশ—অন্তরে মূর্ত্তি পাইয়া বসিয়াছে—জ্ঞান হারায় নাই—বরং আরও উজ্জ্বল-বর্ণ, আরও গাঢ় ঘন, আরও রসপূর্ণই হইয়া উঠিয়াছে। যোগজীবনে এই অপূর্ব্ব ভাগবত আবেশ অনুভূত হইলেই বুঝিতে হইবে, রূপান্তর আরম্ভ হইয়াছে।

উপরে যে সত্য পুরুষ আছেন—তিনি যখন এইরূপে জাগ্রত সত্য হইয়া উঠিয়াছেন, মাথার উপরে স্ফুট হইতে স্ফুটতর মূর্ত্তি পরিগ্রহণে চৈতন্যময়কেই খুঁজিয়া পাইয়াছি, তাঁহারই অব্যর্থ ইঙ্গিত ইশারাগুলি বিদ্যুৎ লেখার মত করপটে ফলিয়া উঠিতেছে—আর তাঁহারই ইঙ্গিতে, শক্তিতে, চলাফেরা, খেলাধূলা, কথা ও কাজ —সেই বিশ্বসুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বিশ্ব-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হৃদয়টী ঐরূপ মনুষ্যগঠনের একটী সংস্কারস্বরূপ ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি অন্যরূপ ছিল—তখন বিশ্বশুদ্ধ লোকেরই শিক্ষাদানপদ্ধতি বক্রগতি অবলম্বন করিয়া চলিত—কিন্তু তাঁহার স্নেহকোমল অন্তঃকরণ তাঁহার নাতি দুইটীর পক্ষে একটী আদর্শ গৃহ ও আদর্শ বিদ্যালয়রূপেই পরিগণিত হইত। পিতৃহীন নাতিগুলির বালক মনের উপর কোনরূপ চাপের কারণ না হওয়ায় বালক সুরেশ ও তাঁহার ভ্রাতা বিকৃত হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া যেন সুপথে তাঁহাদিগকে চালিত করিলে তাঁহারা শেষ জীবনে আরও শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন, এইরূপ মতবাদ কিছু কিছু শ্রবণ করা যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয়গণের মধ্যে কেহই উচ্চ বড় না হওয়ায় অনেকে তাঁহার গার্হস্থ্য শিক্ষাপদ্ধতির উপর কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত সাধারণভূমিতে বিচরণ করিতেন না। জাতির কর্ত্তব্যবোধে তিনি যত আগ্রহ দেখাইয়া বাঙ্গালীকে বর্ণমালা শিখাইতেন, ততোধিক আগ্রহ তিনি পোষণ করিতেন অন্তঃকরণমধ্যে অন্তঃকরণের ছায়াতলে যাহারা বাস করিত তাহাদের সম্পূর্ণ মানসিক উন্নতির জন্য যে বর্ণমালা শিখাইতেন তাহা অন্যরূপ, নিজের ছায়াতলে তাহাদিগকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া—লোকতঃ অধঃপাতে যাইলেও সে সময়েও ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি অপেক্ষা করিতেন, কবে ঐ আত্মীয় নিজ অভিজ্ঞতা বলে বুঝিবেন, একজন অতি নিকট পরম আত্মীয় বৃহত্ত্বের ও মহত্ত্বের সকল বীজ ধারণ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি তিনি তাহা ইচ্ছা করিয়াই করিতেন, হৃদয়ের কোন দুর্ব্বলতা তাঁহাকে এরূপ প্রশ্রয়দর্শক হিসাবে পরিণত করে নাই। তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতেন অন্য কোনরূপে মানুষকে প্রকৃত মানুষ করা সম্ভব নয়। যেদিন সুরেশচন্দ্র অর্দ্ধনিশা অন্যত্র কাটাইয়া সন্ত্রস্ত হৃদয়ে তিরস্কারের অপেক্ষা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন—দাদামহাশয়ের প্রশ্ন মধ্যে উত্তপ্ত হৃদয়ে সেদিন তিনি দাদামহাশয়ের সকল চাওয়াটী বুঝিবার প্রথম অবসর পাইয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই সুরেশচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেইদিন হইতেই বিদ্যাসাগর তাঁহার হৃদয়ের বর্ণমালা বুঝিবার প্রথম পড়ুয়া সংগ্রহ করেন।

এতদিন বিদ্যাসাগর বালক ও কিশোর সুরেশচন্দ্রকে তাহার বাল্যের কিশোরের এমন কি উদ্দাম প্রথম যৌবনের সকল ভোলা আপন-মন পথেই বিচরণ করিতে দিয়াছিলেন। তাহাতে সুরেশ যেরূপে প্রাণিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছে। দাদামহাশয়ের কাছে থাকিয়া, বিবিধ প্রকার সজ্জন ও বিদ্যানুরাগীর দর্শনলাভ করিয়া, নিজ মনে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া বা না করিয়া তিনি এমন একটি বালকে পরিণত হইয়াছিলেন যাহার মধ্যে, আমরা অন্ততঃ, বিদ্যাসাগরের কোন প্রভাবই লক্ষ্য করি না, আবার যৌবনের প্রথমপাদে যেদিন সুরেশচন্দ্র তাঁহার দাদামহাশয়ের চাওয়াটির সন্ধান পাইলেন যাহাতে তিনি বুঝিলেন, বৃদ্ধ আজীবন জ্ঞান আহরণ করিয়াই ইহাই বুঝিয়াছে যে সকলকে ছাড়িয়া দাও তাহার নিজ নিজ পথে—সুরেশকে ছাড়িয়া দাও তাহার নিজের পথেই, সে অধঃপাতে যাইতেছে যাক, ঐ অধঃপাতের মধ্যেই স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে সে বুঝিবে কিরূপে সে জীবনের উদ্ধপথে চলিতে পারে, জীবনের উদ্ধপথ এইরূপেই সে অধিকার করুক।

বৃদ্ধের করুণার্দ্র অন্তঃকরণে মনুষ্যের আত্ম-গতি লাভের সার সত্যটুকু তাহার সমগ্র ও নিছক সত্যটুকু লইয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল এই কয়টী শব্দে "এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় সব ছিলি রে!" এবং সে ধ্বনি সুরেশের অন্তঃকরণ সাগ্রহে শ্রবণ করিয়াছিল। তিনি মধ্য

পরিবর্তনের পথে চলিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের ছাঁচ গ্রহণ করেন নাই। তৎপর দিনই হয় ত তিনি তাঁহার আমূল পরিবর্তনের কথা লইয়া বন্ধুদিগকে ব্যস্ত করেন নাই—তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না—কিন্তু সেই দিন হইতেই তিনি হৃদয় মধ্যে তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প বুঝিয়াছিলেন। অতি গোপনে তাহা ধারণ করিয়া—জীবনের শেষ পর্যন্ত—তিনি জীবনকে যে ধারায় লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে সুরেশচন্দ্রের নিজস্ব [illegible] করিয়া ফুটিতে পারিয়াছিল। সকলে তাহা জানে না। তিনি বলিতেন, 'কাগজের চাপে পড়িয়া কাগজের পরে যে ধারে বিশ্রাম ছিলাম [illegible] জানিলাম না আমার লেখার [illegible] হৃদয়ের কথা [illegible] পড়িয়া [illegible] করিয়া আমাদের [illegible] নাই।

বিদ্যাসাগর ও সুরেশচন্দ্রের সম্বন্ধ আমরা নির্ণয় করিয়াছি। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য [illegible] হইয়াছে [illegible] কতকগুলি কথা যা জানিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা বলিয়াছি নাই। সুরেশচন্দ্রের মরণ পর্যন্ত "সাহিত্য" পত্র। যুবক সুরেশ সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই "সাহিত্যের" চাপে—সাংসারিক সকল অসচ্ছলতা মাথায় লইয়া তিনি সাহিত্য প্রকাশ করিয়া যাইতেন—তাঁহার প্রাণের "সাহিত্যের" জন্য ব্যস্ত থাকায় তাঁহার আত্মপ্রতিভা অন্তঃকরণ "সাহিত্যের" ভালমন্দের বিচারকষ্টির মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে অনন্ত ধারা অবলোকন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তিনি ব্যক্ত করিবার অবসর পান নাই। উপরন্তু তাঁহার মাসিক "সাহিত্যের" আদর্শ দিয়াই সকল জিনিষ ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে এ লীলা শেষ করিতে হইয়াছে।

মাসিক "সাহিত্য" রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্টতা ভালবাসিত না; মাসিক সাহিত্য ঢঙ্গা ও ফাঁকা বিশ্বপ্রেমিকতা পছন্দ করিত না, মাসিক সাহিত্য চলতি ভাষার অপকৃষ্টতা দেখিত ও ভাবের অভাবসত্ত্বে ভাষা বাঁকাইয়া ভাব ভঙ্গ প্রকাশ করিতেছি বাংলা নবীন কবি যে বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দিত তাহা সে একেবারেই দেখিতে পারিত না অতএব মাসিক সাহিত্য একান্ত কঠিন হস্তে শাণিত অসি লইয়া [illegible] কদলীবৃক্ষের ন্যায় বেশ মোলায়েমভাবেই কাটিয়া [illegible]। আর যিনি অসি ধরিয়া এই যজ্ঞ সমাপন করেন তিনি স্বয়ং সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের শ্রী বজায় রাখিতে ও কত যত্ন করিয়াছেন তাহা বেশ প্রতীয়মান হইতে পারে, "সাহিত্য" সম্বন্ধে সজাগ থাকিয়া বাবদপে যে উহা সুসিদ্ধ করিতেছে তাহাও অনেকের মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনি— তিনি জানিতেন বাংলার মধ্যে বাঙ্গালীজাতির মধ্যে একটী মহাপরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জন্য, বাঙ্গালী যুবক কবি তাহারই জন্য, তাহাদের প্রাচীন বন্ধন যেন এলাইয়া দিয়া তাহারই ডাক শুনিতে যে যেরূপে পারে বসিয়া গিয়াছে। কেহ কলিকাতার বন্দনশালার ছায়া লইয়া, কেহ কোকিল ও দোয়েলের স্বরভাঙ্গা ভাষার কোনরূপে টানিয়া ধরিয়া, কেহ ইবসেনের দৃশ্যতত্ত্বের নতি সূক্ষ্ম ও বস্তুগ্রহণ চেষ্টা ধরিয়া বাংলায় যেন কোন বৃহৎ ভবিষ্যতের জন্য এলো-মেলো ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বাহিরের দিক দিয়া ইহা দেখিতে বড়ই বিশ্রী। ভদ্রলোকেরা তাহা স্বীকার না করায় তিনি কচাকচ তাঁহাদিগকে কাটিয়া যাইতেন, তবে নিজে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া—বেলুড় মঠে, রাজনীতিক গহ্বরে, স্বাধীন দ্বারে, দরিদ্রবন্ধুর অন্তঃপুরে, কখনও তাঁহার হৃদয়টী উজ্জ্বল আলোয় পূর্ণ করিতে কখনও অভাবের বোধ আরও অভাবপূর্ণ করিতে তিনি সর্বত্র বিচরণ করিতেন, —ছুটাছুটি করিয়া নয়—ধীরে সঙ্কটিকে নিশ্চে-

বেগকে আরও ক্ষিপ্রতর করিয়া তুলিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। আসমুদ্র হিমাচল বালক বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে আজ যে উত্তাল তুফান উঠিয়াছে, তাহার সুশৃঙ্খল ও সুপরিচালিত অভিব্যক্তির জন্য তাঁহাকেই আমরা অভিনন্দন করিতেছি। দেশের বিপুল হৃদয়াবেগ যাহাতে অনাচার ও অত্যাচারের পথে না ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আত্মশুদ্ধির জন্যই প্রযুক্ত হয়, ইহারই জন্য মহাত্মাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও নিপুণ নেতৃকৌশলে সংযম ও তপস্যার মন্ত্রশক্তি ছড়াইয়া দিয়াছেন। মন্ত্রশক্তি নিষ্ফল হয় নাই, চারিদিকেই নূতন চাঞ্চল্য, তাহার অনিবার্য্য লক্ষণচিহ্ন।

ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষিত সংখ্যা ত মুষ্টিমেয়—আঙ্গুলের পর্ব্বে গণিয়া শেষ করা যায়। ভারতের বিপুল প্রাণ মূর্ত্তি লইয়া পড়িয়া আছে, ভারতের পর্ণকুটীরে,—ছিন্নকন্থা, জীর্ণদেহ, অস্থিচর্ম্মসার, এক বেলাও দুই মুঠা উদর পূরিয়া যাহাদের অন্ন জুটে না—সেই ভারতের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, দুলে, কুলী মজুর—ইহারাই ভারতের প্রাণ, শক্তি, ইহাদেরই দধীচির হাড়ে বজ্রবীর্য্য লুকাইয়া আছে, যাহাকে বাঁচাইতে জাগাইতে পারিলে ভারতবর্ষ অমর হইবে, জগতে অপরাজেয় হইবে, মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যুৎ-মন্ত্রে এইখানেই তপঃ-প্রয়োগ করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাই আজ নির্ভর করেন—ভারতের শিক্ষিতের উপরে নহে—এই বিপুল জনশক্তির জাগরণের উপরই তাঁহার সকল আশাভরসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ফল ফলিতেছে—তপস্যা ব্যর্থ যায় নাই—ভারতের কৃষক, শ্রমিক, মজুর কুলী, মাঝি লস্কর সকলের প্রাণেই আজ নূতন আশার উন্মেষ, নূতন শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

চাঁদপুরের দুর্ঘটনা, শত শত নিরীহ প্রাণীর অকাল মৃত্যু, কুলীদিগের অসীম ধৈর্য্য, প্রতিজ্ঞা ও হৃদয়বলেরই সাক্ষ্যচিহ্ন রক্তাক্ত অক্ষরে আঁকিয়া গেল। চাঁদপুর চট্টগ্রাম মহাত্মা গান্ধীরই অদৃশ্য তপঃশক্তির জয়—বলিব নয় ত কি?

এ যুগ কুলীর জাগিবার দিন, মজুরের মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইবার দিন, মাঝি লস্করের হৃদয়েও আত্মসম্মান আত্মমর্য্যাদার উন্মেষ, সংহতি শক্তির আভাস, স্বাধিকার স্পৃহার প্রস্ফুরণের দিন। এ যুগকে আমরা সম্মান করি, অভিবাদন করি—কেন না, এ যুগ ভারতের বিশাল প্রাণশক্তিরই জাগরণের আহ্বানে পূর্ণ, জাতির সর্ব্বাঙ্গেই আজ বিদ্যুৎ স্পর্শ করিবার সন্ধি মুহূর্ত্ত উপস্থিত—কোন অঙ্গ আজ আর বাকী রহিবে না—অখণ্ড প্রাণ আজ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বের প্রাণেরই তালে তালে নর্ত্তন করিবার জন্য—এমন যুগে যুগ-নেতা সেই হইবে, যার কণ্ঠে যুগদেবতারই শঙ্খরোল কর্কশ ঝঙ্কারে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। লেনিন, গান্ধী—এমনই যুগ-পুরুষ নহেন কি?

পূর্ব্ববঙ্গের শ্রমিকের ধর্ম্মঘট-কথা আমরা এই দিক হইতেই পাঠ করিয়াছি। চাঁদপুরের কুলীনির্য্যাতন মর্ম্মবিদারক দুর্ঘটনা—লজ্জাকর কথা—বাঙ্গালী ডায়ারের কীর্ত্তিকাহিনী—সে সব কাহিনী পুনরুচ্চারণে ফলোদয় নাই—জাতির আত্মশুদ্ধির জন্য ভগবান্ যেন আজ কঠোর বজ্রাঙ্কুশ লইয়াই তাড়না করিতে দাঁড়াইয়াছেন—জাতির অন্তরক্ষত গলিত নালীঘার মত দরবিগলিত ধারায় ফুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে—বাঙ্গালী চরিত্রের ভিতরেও ঘটনায় পড়িয়া কি কলঙ্ককর স্বভাব ফুটিয়া পড়িল, কমিশনর কিরণচন্দ্র তাহার নির্লজ্জ পরিচয়ই দিয়াছেন—সে সব কথার পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক, বাঙ্গালীর জাতীয় অন্তরপুরুষ কবে পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবেন?

সে কথা যাক—বাঙ্গালীর পরিণামে আমরা নিরাশ হই নাই। পূর্ণচন্দ্রের অঙ্ককলঙ্ক বাধা দেয়—বাঙ্গালীর জাতি-আত্মা কিন্তু ভিতরে ভিতরে শুদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয়ই করিতেছেন। বাঙ্গালীর অশ্বিনীকুমার,

কামিনীকুমার, হরদয়াল, নির্ম্মলচন্দ্র— বাংলার প্রাণেরই মঙ্গলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ— বর্দ্ধমানের দামোদরের বন্যায় যাহা দেখিয়াছি, পূর্ববঙ্গের ঝড়ে যে হৃদয়-রঙ্গের পরিচয় পাইয়াছি, আজও সেই স্বর্ণধারা ইঁহাদের দ্বারা অক্ষুণ্ণস্রোতে রক্ষিত হইবে। অখণ্ড বঙ্গের আজ একটী অঙ্গুলীপর্ব্বেও বেদনা বাজিলে, বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রী অবিচ্ছিন্ন সুরে তাহাতেই বাজিয়া উঠিবে। ঘটনার পর ঘটনায় এই সমবেদনার করুণ লেখা বাঙ্গালী জাতির মরমে মরমে গাঁথিয়া গিয়াছে, সে বন্ধ অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। অর্থ সম্পদ সংহত আত্মসংযত সেবাব্রত সম্বন্ধ চালিয়াই বাঙ্গালী আর এই জাতীয় দুর্দ্দিনে জাতীয় [illegible] প্রতিকারে অগ্রসর হইতে পারে, দিন দিনই [illegible] প্রস্ফুটতর পরিচয় পাইয়া আমরা আশায় [illegible] উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছি। ভগবান [illegible] সুদিনে বাঙ্গালী অখণ্ড মন্দিরে মিলন স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলুক।

আর ধন্য মহাপ্রাণ এণ্ড্রুজ সাহেব, যিনি এই হতভাগ্য জাতির জন্য দৈত্যের মত পরিশ্রম করিতেছেন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেবতার মত উদার অপরূপ প্রেমের অপরূপ চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন— চাঁদপুর শ্মশানক্ষেত্রে ধনী দরিদ্র মুচি মেথরের সঙ্গে বুকে বুক মিলাইয়া এণ্ড্রুজ সাহেব যে মহাপ্রাণতার আদর্শ আঁকিয়া তুলিলেন, তাহা প্রত্যেক [illegible] নূতন যাত্রীর আশা করি অনুকরণযোগ্য হইবে। মানুষ জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষেই মানুষ—এই সরল খাঁটি মনুষ্যত্বের আদর্শ যিনি ফুটাইয়া ধরিবেন, তিনিই প্রণম্য, ভারতবাসী উদার জাতি, তার বিশাল হৃদয়ে খাঁটি মানুষ কোন দিনই অনাদৃত হন নাই।

তার পর, গবর্ণমেন্টের কথা। স্যর হেনরী হুই-লার কৃতী পুরুষ, গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে চুণের জলে ভিজাইয়া যে অপূর্ব্ব রিপোর্টখানি তিনি বাহির করি-লেন, দেশবাসী তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এ দুঃখ তাঁহার ঘুচিবে— দেশ না বুঝুক—তাঁহার ভাগ্যচক্র প্রসন্ন হইয়াই তাঁহাকে নূতন উপাধিভূষিত করিয়াছেন। আসল কথা এই, লর্ড রিডিং বলুন, আর বাংলার লর্ড রোনাল্ডসেই বলুন—নিরীহ প্রজার জাতি আমরা, আমাদের হৃদয়বেদনার গুরুভার আমাদেরই বহন করিতে হইবে। তাঁহারা স্বয়ং যতই উচ্চহৃদয় গুণো-[illegible] অনতিক্রম্য, ইচ্ছা থাকিলেও [illegible] করিয়া দিবার ক্ষমতা [illegible] দেন নাই। আশার মরীচিকায় [illegible] বাঙ্গালী বারবার [illegible] হইয়া ফিরিতেছে [illegible] আমাদের [illegible] এবং একমাত্র [illegible]।

[illegible] কাঁদিয়া বারবার বঞ্চিত হইতে হইবে আমাদিগকে। শাসন-মঞ্চের উচ্চাসন হইতে [illegible] সমবেদনা সঠিক ভাবে নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। মানুষের উপর অভিমান বৃথা— সংবাদপত্রে গায়ের ঝাল ঝাড়া ছাড়া আর ত কিছু ফল নাই— আমরা ভগবানের মুখ চাহিয়াই জাতিকে একনিষ্ঠ আত্মসাধনায় নিরত হইতে বলি। তপস্যাই আমাদের সকল দুর্ভাগ্য বিমোচনের একমাত্র উপায়।

তার পর ভাবিবার—কুলীদিগের repatriation গভর্ণমেন্ট না করুন দেশনেতৃবৃন্দ তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। আজই দেড় হাজার কুলীর স্থানান্তর সংবাদ পাওয়া গেল—অনেকগুলি প্রাণক্ষয়, রোগ, অনশন, যন্ত্রণার একশেষ হইবার পর, আজ এই বেচারাদের আশু বিপন্মুক্তি সম্ভাবনায় আমরা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম— অচিরে সমস্ত কুলীই গৃহাগমন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিতে পারিবে—ইহা একরূপ ধরিয়া লইলাম। দুর্দ্দিন কিন্তু এইখানেই শেষ হইবে না

এই তের হাজার নিরীহ প্রাণী, পেটের দায়ে আড়কাটির কবলে পড়িয়া, একবার যখন আপনাদের ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছে, তখন আর তাহারা কাঁদে পা দিতে ফিরিবে না—জন প্রতি ।০ আনা বেতনের হারে মানুষের দিন চলে না, তার উপর চা-বাগানের মালিকদের নৃশংস অত্যাচার—অবস্থা চূড়ান্ত রকমেই অসহ্য হওয়াতেই, তাহারা প্রাণের দায়েই পেটের কথা ভুলিয়া বাগান ছাড়িয়াছে—কিন্তু এই তের হাজার প্রাণীর পেটের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাঁড়িতে ভাত চাই—নহিলে ধর্ম্মঘট হরতাল সব কিছুরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, এই মুহূর্ত্তেই এই হাজার হাজার পেটের ব্যবস্থা না করিলে, বাধ্য হইয়াই সমাজে চুরি, ডাকাতির প্রসারতা ঘটিবে—নেতৃবৃন্দকে ঘটনার আশু ফলটি সামলাইবার পরই—আর তিলমাত্র বিশ্রাম না করিয়া—ইহাদের ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপায় এখন হইতেই চিন্তনীয়—এসব সম্বন্ধে তাঁহারা কি চিন্তা করিতেছেন ?

এ একটা মাত্র কাজ—এরূপ কাজ বিস্তর—কিন্তু কাজের মানুষ কই ? মানুষ থাকিলেও অর্থ কই ? অর্থ থাকিলেও মানুষ ও অর্থের সংযোগ কই ? বাঙ্গালীর এক মুহূর্ত্ত বসিবার সময় নাই—জীবন সংগ্রাম নির্দ্দয় প্রচণ্ড তালে জাতির বুকের উপর পিষিয়া পড়িতেছে—জাতির সকল দিক চাহিয়া সকল দিক রক্ষা করিবার স্থায়ী ও নিরেট, এবং যথার্থ ফলপ্রসূ চিন্তা ও ব্যবস্থা করিবে—তেমন বুদ্ধি ও ইচ্ছা, শক্তি ও সংহতি প্রবৃত্তি কই ? দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনায় শেলাঙ্কুশ হৃদয়ে কতই বিঁধিতেছে—জাতির চক্ষু এই স্থায়ী কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দিকে কবে আকৃষ্ট হইবে ? আশু ঘটনার প্রতিকার চাই—ঘরের মটকায় আগুন লাগিলে আগুন ত নিভাইতেই হইবে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি আগে ভাগে স্থায়ী প্রতিকারোপায় চিন্তাও যে না করিলেই নয়। সাময়িক ঘটনার উত্তেজনায় এই জন্যই আমরা প্রমত্ত হইতে নিষেধ করি—মানুষ, অর্থ, সংহতি চাই, স্থায়ী, ভবিষ্যৎদর্শী, অটুট কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান রচনার জন্যই।

আমরা বিশ্ব জাতির অভিজ্ঞতা ফলে বুঝিয়াছি, রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত হইলেই স্বরাজ আগমন হয় না—মানুষের দুর্দ্দশার স্থায়ী প্রতিকার ঘটে না। কিছু সুবিধা নিশ্চয়ই হয়—কিন্তু ইউরোপের আদর্শে পলিটিকাল স্বরাজ আমরা চাহিব না—ইউরোপ যাহাতে ব্যর্থকাম হইয়াছে, ইউরোপ যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, সেই সব উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত কুঁড়াগুলি সাগ্রহে কুড়াইবার লোভ—এমন উঞ্ছবৃত্তি যেন আমাদের ঘুচিয়াই যায়—জাতির দুর্দ্দশার প্রতিবিধান তাহাতে ত ঘটিবে না। আমরা আত্মকর্ম্মের উপরই আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব। আত্মকৃত তপস্যা দিয়াই নিজদিগের ভবিষ্যৎ তৈয়ারী করিব—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রসারে জাতির স্থির জীবন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া দিব—যে শিক্ষায় জাতির জাগরণ শুধু চপল ও ক্ষণস্থায়ী প্রাণের চাঞ্চল্য মাত্র না হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, ভারতের চিরদীক্ষায়, শক্তিপূর্ণ ও স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তাহারই দেশব্যাপী ব্যবস্থা করিব। দেশাত্মার উদ্বোধনের জন্য, দেশবাসীকে কেবলি বৎসরের পর বৎসর, দুর্দ্দিনের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতে আর আমরা দিব না—বঙ্গভঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগ, চাঁদপুর অনেকই ত সহ্য করিলে,—আর ঘটনার দাস হইয়া ইচ্ছা, শক্তি, বুদ্ধি, অর্থ কেবলই সাময়িক আবেগ-তরঙ্গে ঢালিও না—এস, এমন কর্ম্ম ও সৃষ্টি করি—যাহাতে আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশার আমূল পরিবর্ত্তন সংসাধনে সমর্থ হই।

অর্থ সংগ্রাম

—:০:—

মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থিত কোটী টাকার মাত্র ২০ লক্ষ ইতিমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে—এখনও ৮০ লক্ষ বাকী, এই বাকী টাকা আর প্রায় একপক্ষ কালের মধ্যে সংগ্রহ না করিতে পারিলে বেজওয়াদা প্রোগ্রামের মুখরক্ষা হইবে না, দেশের মাথা হেঁট হইবে—ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর পক্ষে পক্ষকালের মধ্যে কোটী মুদ্রা সংগ্রহ একান্ত দুরূহ নয়—নিষ্ঠাশীল দেশসেবকগণের যত্ন ও শ্রমে এই রাশী মুদ্রা অচিরে সংগৃহীত হইয়া উঠিবে—এরূপ আশা করিতে পারা যায়। তপস্বীর কম্বুকণ্ঠে যে আদেশবাণী নির্গত হইয়াছে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ অর্থে যদি তাহাই অপরিহার্য্য হয়, দেশ তাহার অস্থিকঙ্কাল বিদীর্ণ করিয়াও উহার পূরণ করিয়া দিবে—এটুকু ত্যাগবল ভারতবর্ষে এখনও আছে—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—মহাত্মার ভিক্ষাভাণ্ড অপূর্ণ রহিবে না।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজি গত সংখ্যার ইয়ং ইণ্ডিয়ার স্তম্ভে দেখাইয়াছেন, এই অর্থের সাধারণের হিতার্থ, তথা চরকা বিতরণ এবং জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনা কার্য্যে উপযুক্ত সুফলজনক বিনিয়োগই করা হইবে—"Questions have been persistently asked as to why this large sum is required. The answer is simple. It is a profitable investment, not for purely personal, but for public good. The amount will be devoted chiefly to distributing spinning wheels and conducting national schools." অর্থাৎ "পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করা হইয়াছে—এই বিপুল অর্থে হইবে কি? উত্তর খুব সরল—ব্যক্তিগত লাভোদ্দেশ্যে নয়, সাধারণের মঙ্গলকর কর্ম্মেই ইহার প্রকৃষ্ট নিয়োগ হইবে। এই রাশীকৃত টাকা মুখ্যতঃ চরকার প্রচলন এবং জাতীয় স্কুল পরিচালনা কার্য্যে ব্যয় করা হইবে।" তারপর বলিতেছেন—"We have, say, six crore homes, if broken down families may deserve so sweet a name. We must provide these families with spinning wheels, and enable them to become real homes. One crore of rupees is surely the least amount required for establishing home-spinning on such a basis as to become self-propagating. Similarly, if we are to reconstruct our educational system, we shall need more than one crore of rupees for the purpose."

স্থানাভাবে ইহার আমূল অনুবাদটুকু উদ্ধৃত করিলাম না—মোট কথা, প্রায় ছয়কোটী নিঃস্ব পরিবারে চরকা চালাইয়া তাহাদের জীবিকা সংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া—যাহাতে এই সূতাকাটা গৃহশিল্পটি দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া অতঃপর স্বতঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে—তাহারই আয়োজন করিতে ন্যূনপক্ষে এই কোটী মুদ্রাই প্রয়োজন হইবে। এইরূপে আবার যদি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্গঠন করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য এক-ক্রোড়েরও আরও বেশী টাকার দরকার হইবে। কথাগুলি খুবই স্পষ্ট—ব্যাখ্যান্তর প্রয়োজন নাই—মহাত্মার কণ্ঠে ঘোরাল জটিল কথা কোনও দিনই ফুটিতে দেখি নাই। মহাত্মা চাহিয়াছেন—দরিদ্র-দেশের জীবিকার সংস্থান এবং জাতীয়শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে—উদ্দেশ্য সরল, সাধু, স্পষ্ট, দেশোন্নতিস্পৃহা

সত্য সত্য যাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এরূপ কাহারও সঙ্গে মহাত্মার অন্তর্গত উদ্দেশ্য ও তপস্যা সম্বন্ধে কোন কালেই বিরোধ বা সংশয় নাই—কিন্তু কথা ত শুধু উদ্দেশ্য লইয়া নহে, পন্থা ও কার্য্যসিদ্ধি লইয়াও একটা কথা আছে। মহাত্মার অবলম্বিত পথ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কতটুকু কার্য্যকরী, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার ভার বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই উপরে আছে। চরকাই মহাত্মার প্রধান অস্ত্র—কিন্তু এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে জাতির অর্থসমস্যার কতটুকু মীমাংসা হইবে—তাহা ভাবিবার বিষয়।

ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে দশ কোটারও এক বেলারও পেটভরা অন্ন সংস্থান নাই। চরকা কাটিয়া ছয় আনা, উর্দ্ধ পক্ষে আট আনা দশ আনা দিন মজুরীও হইতে পারে, এরূপ যদিই বা ধরিয়া লওয়া যায়, "চরকা-প্রপাগেণ্ডা"র পূর্ণ কৃতকার্য্যতায় এই কোটী কোটী নিঃস্ব গৃহস্থ পরিবারের একটা নূতন জীবিকা উপায় অবশ্যই হইবে—গুজরাটে পঞ্জাবে এ পর্য্যন্ত চরকায় সুতাকাটা পুরা দমেই চলিয়া আসিয়াছে—বোম্বাই'এ কিছু কিছু চলিতেছে, মাদ্রাজে ও বাংলায় উৎসাহ খুবই শ্লথ—কাজ অতি ঢিমে তেতালাতেই চলিয়াছে, চরকার প্রস্তুত ও সংগ্রহ ধুম বিশেষতঃ বাংলা দেশে অবশ্য খুবই পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই উৎসাহ-বহ্নি ম্লান হইয়া আসিল, এক্ষণে গৃহকোণে স্তূপীকৃত সূতাকাটার চাকাখানি ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, এমন হয়ত ঘরে ঘরেই দেখিতে পাইবে—দোষ বাঙ্গালী স্বভাবেই দাও, আর যাহাই কর—চরকা অন্ততঃ বাংলায় চলিল না—জাতির অন্ন অর্থ সমস্যার ধ্রুব নিষ্পত্তি ইহাতেই আছে, এমন নিঃসংশয় ধারণা বাঙ্গালী অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনমতে মনে বসাইতে পারিল না। আমরা বলি, এক্ষেত্রে, দোষ শুধুই চরিত্রগত নহে—বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, অন্নসংস্থানে যথেষ্টই পরাঙ্মুখ, অকর্ম্মণ্য, স্বীকার করিলাম—তত্রাপি বাঙ্গালীর ধাতু আমরা ভাল করিয়াই বুঝি—একটা নিশ্চিত কোনও ধারণা বা প্রেরণা একবার তাহার হৃদগত হইলে, সে তাহার চরম না দেখিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে—একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবেই—অগ্নিকন্দুক লইয়া যাহারা খেলিয়াছিল, সূতার চাকা তাহাদের হাতে ও ধাতে ঠিক সহিল না—ধরিলও না। ক্রটী ব্যবস্থাপত্রেই কিছু রহিয়া গিয়াছে—নতুবা বাংলার মা লক্ষীদেরও প্রাণে পশ্চিমা জননীদের সমান তালে চরকার গান ধ্বনিল না কেন? বাংলার জীবন সংগ্রামের মীমাংসা তাহা হইলে চরকার মধ্যে নাই—অন্ততঃ পাওয়া গেল না।

প্রকৃত পক্ষে, আমরা শুধু বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ওকালতি ছলেই কথাগুলি বলিতেছি না—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত চরকা ও তাঁতের আন্দোলনের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ইহা লইয়া আমরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছি; ব্যবসার হিসাবে চরকার সূতায় কাপড় করিতে হইলে উহা এখনও দুঃসাধ্য একথা বহু পরীক্ষা ও অর্থব্যয়ের পর আমরা নিশ্চয়রূপেই বুঝিয়াছি। উত্তেজনার যুগে ঢাক পিটিয়া যেমন তেমন করিয়া পাকাইয়া থাই থাই সূতা বাহির করিতে পারিলেই বস্ত্র সমস্যার মীমাংসা হইল না, অর্থ সমস্যার কথা ত দূরে থাকুক। মহাত্মা গান্ধীর অদ্ভুত তপস্যা ও ব্যক্তিত্ব প্রভাবে ভারতে চরকা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা পাইলে আমরা পরম সুখীই হইব—জাতীয়ত্ব ভাবসৃষ্টির উপকরণরূপে ইহাকে প্রযুক্ত করিতেও আমরা বিশেষ কোন আপত্তি দেখি না—কিন্তু চরকার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে ৭০০ মাইল দূরে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রাণান্ত হইবে কবে, তাহা আমরা এখনও আন্দাজে দেখিতে পারি নাই। চরকার সাহায্যে দেশের দারিদ্র্য সমস্যা দূর হইবে না—ইহা আমরা বারম্বার বলিয়াছি। দেশের বস্ত্র সমস্যাও কতটুকু দূর হইবে, তাহাও বিচার্য্য বিষয়।

গত সপ্তাহের ইয়ং ইণ্ডিয়াতেই গুজরাট শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে গান্ধী মহারাজ সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"The great variety of charkas showed that India's inventive genius was being profitably utilised. Let not the reader however imagine that there was among these specimens a charka with more spindles, yielding corresponding larger outturn of yarn"—উক্তিটুকু অবশ্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সারল্যেরই পরিচায়ক কিন্তু চরকার উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রস্তুত করিতে না পারিলে, পুরাতন প্রথানুসারে চরকা চালাইয়া শুধু হাতের সংখ্যাধিক্যে সূতা সমস্যার নিরাকরণ কতদূর হইবে সে সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর সন্দিহান। ইতোপূর্ব্বে এক বিগত সংখ্যা প্রবর্ত্তকে আমরা বলিয়াছিলাম আমাদের নিজেদের উৎসাহ দানে যে চরকার কল নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহা হইতে একত্র পাঁচ ছয় থেই সূতা বাহির হইতে পারে, কিন্তু তাহা সেরূপ ব্যাপকভাবে [illegible] তাহা কার্য্যকরী হওয়া অসম্ভব দেখা গেল। আমে-রিকার প্রস্তুত চরকাকল সম্বন্ধেও নানা কিছুর সংবাদ শোনা গেল না—অন্ততঃ আমাদের কাছে তাহা পৌঁছায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, ছাপরার ভদ্রলোকের আবিষ্কৃত কলের সূতাও এ পর্য্যন্ত দেখা ঘটে নাই। এরূপ অবস্থায়, আমরা চরকার সূতায় বস্ত্র সমস্যার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হইয়াছি—ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। আর মোটা খাদার স্তূপে স্তূপে তৈয়ারী হইলেও, একটা জাতির বস্ত্র প্রশ্নের সমাধান উহাই, ইহা মানিয়া লওয়া আমাদের সাধ্যাতীত—ইহাও আমাদের অবশ্য স্বীকার্য্য। তা ছাড়া, দৈনিক ॥০।৵০ মজুরী এই ১২।১৪ ঘণ্টা পরিশ্রমে এই মোটা খাদির উপযোগী সূতাতেই হয়ত সম্ভবে, বাঙ্গালীর সাধারণ ভদ্র পরিধানের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের সূতা কাটিতে দৈনিক মজুরী বস্তুতঃ শুঁকিতেই শুকাইয়া যায়। গান্ধী উল্লিখিত ছয় কোটী দরিদ্র পরিবারের—ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশগুলির কথা ঠিক বলিতে পারিব না—বাংলার অভাব ও স্বভাব যতদূর জানি তাহা হইতে বলিতে পারি—বার চৌদ্দ ঘণ্টা যাহারা পরিশ্রম করিতে পারে, তাহারা যে সূতা এদেশে কাটিবে, সেরূপ সরু সূতা প্রস্তুত করিবার যে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক, সেই কয়েক আনা পয়সার জন্য এতখানি সময় ব্যয় করিতে দিবে না—ব্যবসায়ান্তরের চেষ্টা দেখিবে।

সুতরাং মহাত্মাজির প্রতি আমাদের সুগভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, নিজদিগের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারাগুলিকে একেবারে শুষ্ক জলাঞ্জলি দিতে এখন পারি না—তখন একথা আমাদের বলিতেই হইবে—মহাত্মাজীর কষ্টি acid test—চরকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেশকে অন্ততঃ বাংলা দেশকে নিরুৎসাহ হইতে দেখা যাইবে—তাহার কারণ, সোনা আর যাহাই হউক [illegible], বাঙ্গালা আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি—দেশের বস্ত্র সমস্যার পূর্ণ নিষ্পত্তি চরকায় সম্ভব হইবে না। যাহাতে সত্য সত্য আমরা কার্য্যসিদ্ধি পাই, তাহার দিকেই মনোযোগ দিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি—নিজদিগের সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই, দেশকেও কোন কথা বলিতে হইলে, সেই অভিজ্ঞতালব্ধ পথটিকেই অনুবর্ত্তন করিতে বলিতে বাধ্য হইব।

কোনও পাশ্চাত্য পলিটিকাল যাদুমন্ত্র উচ্চারণ না করিয়াও একথা বলিতে দোষ নাই—আমরাও দেশের উন্নতিই চাই—জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার দুইটি মুখ্য উপায় আমরাও জানিয়াছি, একনিষ্ঠ হৃদয়ে কয়েক শত তরুণসমষ্টি আমরা উহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। দেশ যে প্রেরণা দুইটি পাইয়াছে, তাহার দুইটিই পরম সত্য—চাই জাতীয় শিক্ষা—আর জাতির অর্থ, অন্ন,

যন্ত্র সেই আবশ্যকতা পূরণ করিবার জন্যই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, চাই কি তার পুরোভাগে মুখ্যভাবেই যাহা দরকার তাহা হইতেছে—গ্রন্থকার প্রসঙ্গান্তরে যাহা বলিয়াছেন—"যে চশমাখানি দিয়া দেখিতে হইবে তাহা ভারতীয় ভাবে অনুরঞ্জিত হওয়া চাই।" মনস্বী-লেখক এই ভারতীয় ভাবের বিশেষত্ব রাষ্ট্র-চিন্তার দিক হইতে খুব গাঢ় ও সঠিকরূপেই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও সুন্দর রূপেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিলাম না—"ভারতীয় বিধানে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কেবল সংযোগই সাধিত হয় নাই, উহাদের মহামিলনই সাধিত হইয়াছে। ইহাতেই ভারতীয় নীতিবিজ্ঞান জীবনের উপযোগী ও অনুকূল হইয়াছে। ব্যষ্টির ও সমষ্টির মূল সূত্র খুঁজিয়া বাহির করায় ভারতীয় কৎবিজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছে। গ্রীক নীতিবিজ্ঞানের ধারা সম্বন্ধে লেখক Dr. Harold Hoffding'এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—গ্রীক আদর্শে ব্যক্তি সমষ্টির অধীন—কিন্তু ভারতীয় নীতি বিজ্ঞানের ধারা ইহা হইতেও উচ্চতর আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করিয়া সমষ্টিত্বের সহিত অভিন্নতা স্থাপন ভারতের আদর্শ। ভারতীয় আদর্শ ব্যক্তি সমষ্টির অধীন (Subordinate) নহে। ব্যক্তি সমষ্টিতে অবগাহন করিয়া সমষ্টির সহিত একীভূত।" অন্যত্র, "বিশ্বব্যাপী নারায়ণের প্রীতির জন্য চিত্ত সমর্পণ ও কর্ম্মসাধনে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তিও সমষ্টি স্বরূপ নারায়ণে অবগাহন করিয়া সমষ্টির সহিত এক হইয়া যায়। ব্যক্তি ও সমষ্টির একীভূত অবস্থাই ভারতীয় আদর্শ। ইহাই গ্রীক নীতিবিজ্ঞান হইতে ভারতীয় বিজ্ঞানের বিশেষত্ব।"—গ্রীক আদর্শ ইউরোপের জীবন ও আদর্শের মূল বীজ—পাশ্চাত্য ভাবের দুষ্ট ভাব হইতে দেশের রাষ্ট্রসাধনাকে সংরক্ষণ করিতে হইলে ভারতের সাধকগণকে এই মৌলিক আদর্শগত বিভিন্নতা সুস্পষ্ট করিয়া অবধারণ করাই চাই। এই গভীর তুলনামূলক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থখানি এ পক্ষে চিন্তাশীল পাঠকের উপযোগী প্রচুর চিন্তা-খাদ্য যোগাইবে।

অবশ্য স্বর্গীয় স্বামীজির সত্য বুদ্ধি এক্ষেত্রে মৌলিক বৈদিক আদর্শেরই মর্ম্মটুকু ধরিতে পারিয়াছে। ভারতের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়াও গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন—"বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার হইতেই ভারতীয় অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে।.....বৌদ্ধধর্ম্মের উদাসীনতায় ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। সমাজের সহিত যোগাযোগ নষ্ট হয়। নির্ব্বাণের মোহমুগ্ধ আকর্ষণে স্বতন্ত্রতা অবশ্যম্ভাবী। এই স্বতন্ত্রতার ফলে সামাজিক অনুৎসাহ; এই অনুৎসাহের ফলে জাতির পতন। এই অস্বাভাবিক ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ইহার মূর্ত্তি প্রকট হইল।" "জাতিগঠনের চেষ্টা থাকিলে বিরোধ পরিহার করিয়া, স্বতন্ত্রতা দূর করিয়া সম্মিলন-শক্তি বলে জাতিকে সংহত ও সংবদ্ধ করা হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই।" "বিদেশীর ভূমি ও স্বর্ণলোভ নয়—প্রতিরোধ শক্তির অভাবই ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ। প্রতিরোধ শক্তির অভাবের মূলে সম্মিলন-শক্তির অভাব—কাপুরুষতা নহে"—তেজস্বী তত্ত্বদর্শী সন্ন্যাসীর এই অত্যন্ত সত্য সিদ্ধান্তগুলি দেশবাসী নিজ চিন্তা দিয়া প্রণিধান করিয়া দেখিও, বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব রাজনীতি ভারতের সনাতন রাষ্ট্রনীতি নয়—আশা করি, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতিও নহে।

ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই আষাঢ়, ১৩২৮ [দ্বাদশ সংখ্যা

প্রশস্তি

সত্যের [illegible] আলোক [illegible] স্মরণ মন্দিরে। অশ্রুদেবতা [illegible] সত্যসংকল্প [illegible] বারে, নরমুক্তি [illegible] কোটি কোটি প্রাণ বলি।

কায়মনোবাক্যে আমরা [illegible] কামনা করি মিলন—হিন্দু মুসলমানে, মুসলমানে [illegible] মানে হিন্দুতে। এ মিলন [illegible] মিলন—[illegible] করে, অন্তর-দেবতার [illegible]।

কায়মনোবাক্যে আমরা প্রার্থনা করি হিন্দু মুসলমানে মিলন হোক। আমরা প্রার্থনা করি হিন্দু মুসলমানে মিলন হোক—জালিয়ানওয়ালাবাগকে সামনে রেখে নয়, খিলাফতের ভিতর দিয়ে নয়, রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে নয়—হিন্দু মুসলমানে মিলন হোক অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজনে—মিলনেরই আনন্দে—সেই মিলনই সত্যি হবে—সেই মিলনই দেশকে মুক্তি দিতে পারবে—আনন্দ দিতে পারবে—অমৃত দিতে পারবে—আর কোন মিলন নয়।

কায়মনোবাক্যে আমরা প্রার্থনা করি হিন্দু মুসলমানে মিলন হোক—রাজনৈতিক ডিপ্লোমাসির চালের [illegible] দিয়ে নয়। হিন্দু মুসলমানে মিলন হোক বাংলার [illegible] শ্যামল অঞ্চলের ওপরে দুই সন্তানের [illegible] মতো। হিন্দু মুসলমানে মিলন হোক সেখানে বাংলার গ্রামে পল্লীতে, নদীর কূলে, [illegible] স্নিগ্ধ ছায়া বিছিয়েছে সেইখানে—যেখানে দিনের শেষে সন্ধ্যাকালে বাংলা মায়ের ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে ওঠে সেইখানে—বঙ্গজননী, হিন্দু মুসলমানে মিলন করে দাও, যেখানে তোমার বাতাস তোমার [illegible] তোমার দেশে তোমার ভাষা সহজ হয়ে দিন [illegible] সেইখানে। সহজ মানুষ সহজ মানুষের সাথে মিলিত হোক। হিন্দু মুসলমানে মিলন হোক—রাজনৈতিক সুরাপান করে নয়—সহজ হিন্দু আর সহজ মুসলমানে মিলন হোক। সেই মিলনই সত্যি হবে। সেই মিলনই দেশকে সমাজকে মুক্তি দিতে পারবে—আনন্দ দিতে পারবে—অমৃত দিতে পারবে আর কোন মিলন নয়। যে মিলন দরকারকে সামনে রাখে, সে-মিলন একদিন না একদিন বিরোধকে জাগিয়ে তুলবেই।

দেশযজ্ঞ

মডার্ণ রিভিউ পত্রে মিঃ পিয়ার্সন লিখিয়াছেন—

"Now just as in Ireland, the main industry is agriculture, so is it in India, and therefore the chief problem of India is the same as that of Ireland, namely, how to enable the countrymen, without journeying to satisfying to the full his economic, social, intellectual and spiritual needs The means are two fold, first economic, secondly educational Of these apparently the economical is the most urgent"

অর্থাৎ আয়র্লণ্ডের ন্যায় ভারতেরও কৃষিই প্রধান জীবিকা-শিল্প। সুতরাং ভারতের মুখ্য সমস্যা আয়র্লণ্ডের মত একই শ্রেণীভুক্ত। ইহা হচ্ছে—প্রতি-বাসী মানুষটির আর্থিক, সামাজিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনগুলি পূর্ণমাত্রায় কিরূপে পূরণ করা যায়—অথচ তাহার জন্য তাহাকে স্থানান্তর গমন করিতে হয় না। দুইটি উপায় আছে প্রথম আর্থিক, দ্বিতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত। তন্মধ্যে আবার অর্থনৈতিক উপায়টিই সব চেয়ে জরুরী বেশী রকমের।

মিঃ পিয়ার্সন ভারতহিতৈষী মহানুভব ব্যক্তি। তাঁহার মনীষাশক্তি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংযোগে ভারতের মূল অবস্থাটির অবধারণ পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধানোপায় নির্ণয় করিয়াছে। আর্থিক সমস্যা ও শিক্ষা সমস্যাই বর্ত্তমান ভারতের মুখ্য সমস্যা। এই মূল সমস্যা দুইটির নিরাকরণ হইলে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অচিরসম্ভব হইয়া উঠিবে।

তিনি আরও বলিতেছেন—

"It is now no longer necessary to discuss whether swaraj is attainable or not in India. Our observation tells us it is already in being. Wherever a man or woman refuses to be enslaved, wherever inner freedom and self mastery are highly valued there we have true swaraj It is however, more than ever necessary to discover a practical policy which shall be an outward expression of that true independence which is a proof of character and is the outcome of self-respect and discipline."

অর্থাৎ স্বরাজ ভারতের লভ্য কি অলভ্য এ লইয়া তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন আর নাই। আমাদের দর্শন বলিয়া দিতেছে স্বরাজ ইতঃপূর্ব্বেই সত্তার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে যেখানে নরনারী দাসত্ববদ্ধ থাকিতে আর স্বীকৃত নয়, যেখানে সেখানে অন্তরমুক্তি এবং আত্মশাসনের মূল্য হৃদয়ঙ্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানেই আমরা সত্য স্বরাজ পাইয়াছি। যাহা হউক একটা জিনিষ কিন্তু এইক্ষণেই আমাদের খুঁজিয়া লইতে হইবে—সে হইতেছে একটী কার্য্যকরী নীতি—যাহা হইবে এই সত্য স্বাধীনতারই বাহ্য অভিব্যক্তি—চরিত্রের প্রমাণ স্তম্ভস্বরূপ, আত্ম সম্মান এবং আত্ম সংযমেরই বাহ্য ফল।

কথাগুলি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই অন্তরমুক্তির কথা প্রবর্ত্তকের স্তম্ভে আমরা পত্রে

পথে ছত্রে ছত্রে কহিয়া আসিতেছি। স্বরাজ আমরা পাইয়াছি—অন্তরে যাহা মণিকোটায় থরে থরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাহিরে তাহার রূপমূর্ত্তিট প্রকাশ করিয়া তোলা, কার্য্যজগতে উহাকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরা—ভাবকে মূর্ত্ত করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। এই কর্ম্মমূর্ত্তিটি আমাদের নিকট দিন দিন উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর হইয়াই দেখা দিতেছে। ভারতের স্বরাজ ধর্ম্ম ও সনাতন স্বভাব অনুকূল না হইলে উহার ব্যর্থতা অনিবার্য্য। স্বরাজ পাইয়াছি—তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে, সনাতন নীতি অবলম্বনেই বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই অধ্যাত্ম নীতির কথাই আমরা বর্ত্তমানে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব। নীতিটির সুনির্ণয় হইলে সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতির ধারাবাহিক সুশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইবে।

মনীষী পিয়াসন সাহেব যে দুইটি কথা টানিয়া দিয়াছেন আমরা সেই দুইটি কথা বেশ করিয়া জাতির মধ্যে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছি দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া। পরীক্ষান্তে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি ভারতের জীবন সাধনা সফল করিয়া তুলিতে হইলে এই দুইটা দিকেই সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীকৃত করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের শিক্ষাস্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিতে না পারিলে দেশের অন্তরমুক্তি নাই। অপর দিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল অটল ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে না পারিলে, ভিত্তির অভাবে গৃহমন্দিরের মত আমাদের সকল প্রচেষ্টাই ধরাশায়ী হইবে। মর্ত্ত্যের বুকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মর্ত্ত্যের উপকরণকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াই উহা করিতে হইবে। শিক্ষাস্বরাজ ও আর্থিক স্বরাজ যুগপৎ গঠন করাই জাতীয় কর্ম্মের নির্দ্দেশ মাত্র। এই অব্যর্থ ভাগবত নির্দ্দেশ বাঙ্গালীকে নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলন ফলে, জাতীয় শিক্ষার কথা আজ দেশের বুকের ভগী-অশ্রুপাত করিয়াই বসিয়াছে। গুজরাটে, বাংলায়, অন্ধ্র দেশে, মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি জাতীয় ইনষ্টিটিউশন ইতিমধ্যেই সৃষ্ট হইয়া পরিচালিত হইতেছে। চারিদিকে জাতীয় স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। এগুলি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। হিন্দি ভাষা ও চরকা কাটা বর্ত্তমান উদ্যোগ বর্ষের শিক্ষার মুখ্যাঙ্গ স্বরূপ করিয়া এই বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা। মহাত্মাজীর প্রার্থিত কোটী মুদ্রা সংগৃহীত হইলে, চরকা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ আরও জাতীয় স্কুল কলেজ সৃষ্টির সুসংহত আয়োজন চলিবে, এরূপও আশা করা যায়। তবে স্বরাজ প্রাপ্তিই যখন মুখ্যতম লক্ষ্য, তখন এই শিক্ষান্দোলনকে তাহারই পৃষ্ঠস্তম্ভ বলিয়া দেখাই মহাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। এই জন্য এই শিক্ষাসংগ্রাম ঠিক জ্ঞানার্থ নহে, রণযজ্ঞেরই কুচ-কাওয়াজ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

এরূপ শিক্ষানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই তাহা নহে। চাতুরী ও পরস্পৃহা লোকচক্ষে দগ্ধাঙ্কন করিতে হইবে, বিরুদ্ধ সংস্কারগুলির মূলোৎপাটন করা অত্যাবশ্যক। উকীল গড়া ও কেরাণী গড়িয়া তুলিবার যে বিরাট কলটি দেশজোড়া হইয়া পড়িয়াছিল, গান্ধীর ইঙ্গিতে তাহার মায়াস্বপ্নটুকু নিশাস্বপ্নেরই মত টুটিয়া গিয়াছে। সরকারী উপাধির আকর্ষণ এখনও হয়ত দেশে বহুস্থানে প্রবলমাত্রায়ই আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার অসারত্ব সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি দেশের কুত্রাপি আর দৃষ্ট হয় না। আর কিছু না হউক দোষযুক্ত প্রণালীটিকে সমূলে ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে একটা নূতন কিছুর প্রবল সৃজনাকাঙ্ক্ষা মহাত্মা দেশে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। একটা আব-হাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে—পুরাতনের "প্রেষ্টিজ" অনেকখানিই অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেও আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্র-সৃষ্টি বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া আমরা এখনও আদৌ মনে করিতে পারি না।

হইবে। ভারতের তরুণ জীবনে উহারই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষার উহাই উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম। যে শিক্ষায় ভারতের বালক বালিকার হৃদয়ে দেশাত্মার রূপচ্ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠে, যে তপস্যায় ভারতের সন্তান ভারতের সনাতন স্বভাব অনুবর্ত্তন করিতে শিখে, ব্যষ্টিকে সমষ্টির সঙ্গে একাত্ম অনুভূতিপূর্ণ করিয়া ব্যক্তির ভিতরে জাতি আত্মার জীবনধর্ম্ম সম্পন্ন ও মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতে পারে, সেই শিক্ষার অনুশীলনে জাতির প্রতিভা ব্যক্তির মধ্য দিয়া জাগ্রত, স্ফুট ও চরিতার্থ হয়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় দলে দলে আপনাকে মুক্ত ব্যাপ্ত বিকশিত করিয়া তোলে—সেইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন আমাদের করিতে হইবে। উহা আদর্শ কিন্তু তাহাকে নিখুঁত করিয়া তুলিবার সম্বল আমরা এখনও পাইয়াছি। সাধনা জীবনেই মূর্ত্ত হয় জীবন্ত হয় সাধনাকে কার্য্যে দিবার গূঢ় কৌশলটুকু তাঁহাদিগকে আয়ত্ত হউক।

এমনি উদার প্রাণ শিক্ষকের প্রকাশ দেশের তরুণ মণ্ডলীর ভিতরে ধরাইয়া তুলিতে হইবে।

সাধকই শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিবে। বাংলার নূতন শক্তির কেন্দ্র—প্রত্যেক জেলায় জেলায় এই সাধকগণ বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়া তুলিবেন। ইঁহারা আত্মজীবনে এই সনাতন সাধনাকেই ফুটাইয়া তুলিবেন। প্রতীককে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের জীবনে সাধনা প্রকাশ হইবে। ইহাই বিদ্যাপীঠ। ভাগবত মন্ত্রে জীবন ভরাইয়া সেই মহাশক্তি আধারে আধারে প্রকট করিয়া ধরাই এই বিদ্যাপীঠগুলির মুখ্য কর্ম্ম। ঢাক ঢোল বাজাইয়া কর্ম্ম হয় না—কর্ম্মী নীরব আত্মনিয়োগেই দেশের আবহাওয়া দিনে দিনে পরিবর্ত্তন করিয়া তুলিবেন। পল্লীতে পল্লীতে ইঁহারা ভারতীয় শিক্ষার বীজ পুঁতিবেন। নিজ জীবন দিয়াই ইঁহারা দেশের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আনিবেন—গ্রামের যত সুকুমারমতি বালক বালিকার, ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাঙ্গনে আনন্দে স্বচ্ছন্দে খেলার সঙ্গে সঙ্গে জীবন গড়িয়া উঠিবে। এরূপ অগণ্য শিক্ষাসাধককে অচিরে বাংলার সমুদয় পল্লীক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিতে হইবে। দৃঢ় নিষ্ঠায় ইঁহারা শুধু জাতির ভবিষ্যৎ বীজ রক্ষা করিবেন। স্বাধীন ভারতকে ইঁহারাই স্বহস্তাঞ্জলি দানে দিনে দিনে শ্যামল তপঃক্ষেত্রে অভিষিক্ত ও মুক্ত করিবেন।

চাই অসীম ধৈর্য্য। পূর্ব্বোক্ত সাধনার সামগ্রী—কালের গণনা করিয়া সাধনার হানি করিব না—তপস্যা সত্য হউক, উৎসর্গ নিখুঁত হউক—ভারতের মুক্তি অনিবার্য্য। কে আছ বীর সাধক তিল তিল করি। এমনি জীবনপাত করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিক্ষায় দীক্ষায় গঠন করিবে, অন্তরের স্বভাবের আত্মজীবনের সাধনবলে বাহিরে রূপদান করিয়া তুলিবে। ঘটনার ভবকাবর্ত্তনে দিশাহারা হইও না অবস্থার প্রতীকার করিতে হইবে—কিন্তু ভিতর হইতে তাহার প্রকৃষ্ট কৌশলটুকু আয়ত্ত করিতে হইবে—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্—সেই কৌশলই যোগ ভারতের মুক্তি সাধনার গূঢ় মন্ত্র এই যোগের ভিতরেই নিহিত আছে। যোগীই চিরদিন ভারতের জাতীয় শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন—আজও যোগীর হস্তেই দেশের শিক্ষাভার পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে হইবে।

কেবল মনে রাখিতে হইবে—এই যোগ, ভারতের অতীত সাধনার চেয়ে এক ধাপ অগ্রসর - ভারতের অতীত যোগসাধনা ছিল ব্যষ্টির মুক্তির জন্য, বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে সমষ্টি-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে—সমষ্টিগত মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য। দেশব্যাপী এই সমষ্টিগত মুক্তিমন্ত্র উদাত্ত সাহসে প্রচার কর—যোগীর ভয় নাই, সংশয় নাই, যোগীর জীবনে পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বন্দ্ব নাই, যোগীর জয় পরাজয় নাই—প্রচার কর জীবন দিয়া—প্রমাণ কর তপস্যাকেই ঘটে ঘটে

মূর্ত্তিমান করিয়া—জাতীয় শিক্ষার মহাযজ্ঞ বিপুল মর্য্যাদায় দেশের বুকে ব্যাপক ভাবে আরম্ভ করিয়া দাও। শিক্ষা সমস্যার নিরাকরণ এবার করিতেই হইবে।

আরও চাই অর্থ প্রতিষ্ঠান। এই জাতীয় শিক্ষার দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্যই বিপুল অর্থের আবশ্যক। দেশের বুকের রক্ত-জল-করা সঞ্চিত অর্থ দেশের কাছ হইতে একবার গ্রহণ করিতে চাই। দেশেরই হাতে দ্বিগুণিত করিয়া একদিন তাহা ফিরাইয়া দিব। দেশের জন্য কৃষি, শিল্পে, ব্যবসায়ে এই অর্থ চালিয়া, সনাতন ভূমিখণ্ডে, রাশি রাশি পণ্যদ্রব্যে, অক্ষয় অর্থ-ভাণ্ডারে পরিণত করিয়া দেশের হাতে উহা প্রত্যর্পণ করিব। স্বদেশ-ব্রত আমরা স্পষ্ট করিয়াই মুক্ত করিয়া তুলিয়াছি— কার্য্যসিদ্ধি কাল সাপেক্ষ।

ঋগ্বেদ

পঞ্চম মণ্ডল

প্রথম অধ্যায়—প্রথম সূক্ত।

বুধ গবিষ্টির বাত্রেয়ৌ॥ অগ্নিঃ। ত্রিষ্টুপ্॥

১। অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি
ধেনুমিবায়তীমুষাসং।
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ
সিস্রতে নাকমচ্ছ॥

লোক সমূহের ইন্ধন (১) দ্বারা অগ্নি (২) জাগ্রত হইয়াছেন, (দুগ্ধ দ্বারা) পুষ্টিকারিণী ধেনুর (৩)ন্যায় যে উষা (৪) আগমন করিতেছেন, তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া এই অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছেন। প্রবল দেব শক্তির ন্যায় প্রদীপ্ত শিখারাজি বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে হইতে স্বর্গাভিমুখে (৫) প্রসারিত হইতেছে।

১। (১) উৎসর্গ, আত্মাহুতি। (২) তপঃশক্তি। (৩) রশ্মি, জ্ঞানের আলো। (৪) জ্ঞানোদয়। (৫) দিব্য জ্ঞানের লোক। মানুষ তাহার আধারের প্রতি অঙ্গ ইন্ধনের মত উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে তপঃশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। উপর হইতে জ্ঞান-উষার আলো ধেনুরূপে যেন নামিয়া আসিতেছে, তপঃশক্তি তাহারই দিকে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। দুগ্ধ যেমন পুষ্টিকর, জ্ঞানের প্রকাশও তদনুরূপ তপঃশক্তির পরিবর্দ্ধক। তাই এই তপঃশক্তি হইতেই জ্ঞানদীপ্তি আপনাকে ছড়াইতে ছড়াইতে সত্যলোকে উঠিয়া চলিয়াছে।

২। অবোধি হোতা যজথায় দেবানূর্ধ্বো অগ্নিঃ

সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ।

সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্দেবস্তমসো

নিরমোচি ॥

(১) হোতা দেবতাদিগের যজ্ঞবিধানের নিমিত্ত জাগরিত (২) হইয়াছেন, প্রাতঃকালে সুমনা তপঃ অগ্নি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির শক্তি লোহিতাভ দেখাইতেছে, অন্ধকার হইতে মহান (৩) দেবতা নির্মুক্ত হইয়াছেন।

২। (১) তপঃশক্তি জাগিয়া আর সকল শক্তিকে আহ্বান করিয়া আনে, সোমযজ্ঞের হোতা এই তপঃশক্তি। (২) দিব্যজ্ঞান প্রথম খুলিতে থাকে তখনই যখন বিশুদ্ধ প্রসন্ন মনবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তপঃশক্তি উপরের সত্যের দিকে চলে। (৩) তপঃশক্তিকে আত্মোৎসর্গে যতদিন প্রজ্বলিত করা হয় নাই ততদিন তাহা অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল; এখন সেই শক্তি উজ্জ্বল লোহিত কিরণে, কর্ম্মের দীপ্ত তেজে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। যদীং গণস্য রশনামজীগঃ শুচিরংক্তে শুচি-

ভির্গোভিরগ্নিঃ।

আদ্দক্ষিণা যুজ্যতে বাজয়ন্ত্যুত্তানামূর্ধ্বো

অধয়জ্জুহূভিঃ ॥

অগ্নি যখন তাঁহার পুঞ্জীভূত শক্তিকে রজ্জুগ্রন্থির ন্যায় উন্মোচন করেন, তখন নিজেকে বিশুদ্ধ করিয়া (১) পবিত্র কিরণ মালায় শোভা পান। দক্ষিণা প্রচুর ঐশ্বর্য্যে বিবৃদ্ধমানা হইয়া স্বকর্ম্মে নিযুক্তা হন, এবং অগ্নি যজ্ঞশিখা দ্বারা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ঊর্দ্ধে প্রসারিতা সেই দক্ষিণার স্তন্যপান করেন।

৩। (১) বেদে চারিটি শক্তির কথা উল্লেখ আছে। (১) ইলা (২) সরস্বতী (৩) সরমা (৪) দক্ষিণা। ইলা — Revelation (দিব্যদৃষ্টি); সরস্বতী—Inspiration (দিব্যশক্তি), সরমা—Intuition (দিব্যস্মৃতি); দক্ষিণা Discrimination (বিবেকশক্তি)। এখানে দক্ষিণা শব্দে উহারই প্রকৃতি নির্ণয় করা হইয়াছে-- জ্ঞানের প্রতিষ্ঠান হইতেছে সদসৎ বিবেক। তপঃশক্তি একে একে তাহার সুপ্ত বলপুঞ্জকে জাগ্রত করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে আর জ্ঞান ও বিবেকমূর্ত্তি লইয়া সত্য হইতে মিথ্যাকে, ঋত হইতে অনৃতকে পৃথক করিয়া দিতেছে, শক্তির প্রেরণাকে বিশুদ্ধা করিয়া তুলিতেছে। তপঃশক্তি যেন বৎস আর জ্ঞানোদয় যেন গাভী। বিবেক তাহার শুদ্ধি, তাহার আলো তাহার ঐশ্বর্য্য লইয়া আমাদের সমস্ত চেতনা ভরাইয়া দিতে চাহিতেছে, আমাদের তপঃশক্তিও ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণা দিয়া সেই সব টানিয়া আপনার মধ্যে লইতেছে।

৪। অগ্নিমচ্ছা দেবয়তাং মনাংসি চক্ষূংষীব সূর্যে

সঞ্চরন্তি।

যদীং সুবাতে উষসা বিরূপে শ্বেতো বাজী

জায়তে অগ্রে অহ্নাং ॥

আর একত্ব-অনুভূতিজাত শক্তি লইয়া ভারতের সকল বাহ্যিক অবসাদ ও মৃত্যুর কারণ ঐ বৈদেশিক শাসনশক্তিকে উচ্ছেদ কর, উহাকে দেশীয়ের হস্তে আনয়ন কর। যাই হ'ক এইরূপে সে কার্য্যের গতি নির্দ্দেশ করে।

কিন্তু কি পরিবর্ত্তনই না তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে! লোকমান্য তিলক ও বিপিনচন্দ্র—গোঁড়া ও উন্মার্গ সংস্কারী ধীরে ধীরে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। বিপিনচন্দ্র শেষ বয়সের কেশবচন্দ্রকে উচাইয়া কতটা "হিন্দু" হইয়া উঠিয়াছেন, আর লোকমান্য জাতিনির্ব্বিশেষে অ'ব্রাহ্মণো'চিত সাম্যব্যবহারে বিলাতগমনে এবং অন্যান্য উচ্চভাব পোষণে অতি উন্মার্গগামীকেও পরাস্ত করিয়াছেন!—তবে উভয়েই উপর বজায় রাখিয়া।

রাজনীতি করিতে করিতে ভদ্রলোককে লাঙ্গল ধরিতে হইয়াছে, সকল জাতির মৃতের অঙ্গ স্পর্শ করিতে হইয়াছে, সকল জাতির সহিত একত্র ভোজন করিতে হইয়াছে আজকাল মেথরের অঙ্গস্পর্শে নিজদিগকে ধন্য মানিতে হইয়াছে। ভারতবাসী মুসলমান ও ক্রিশ্চিয়ান প্রাণ খুলিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদিগকেও অতি স্বর্গীয় হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা গাহিতে হইতেছে—কিন্তু সবই ন্যাশনেলিজমের ছাওয়ায় থাকিয়া। রাজনীতিটা একান্ত বিবাহিত ও সন্ন্যাসীদের ব্যবসা না হইলে ন্যাশনেলিজমের ভিতর দিয়া অসবর্ণ ও অসসম্প্রদায় বিবাহের কথাও আমাদিগকে শুনিতে হইত। শুনিতেছি না কি?

এইরূপে রাজনীতি সমাজসংস্কার ও ধর্ম্ম সংস্কারকে কার্য্যতঃ বসাইয়া রাখিয়া নিজে যে পুরোভাগ অধিকার করিয়াছে তাহাতে সে এমন কতকগুলি কার্য্য করিয়া যাইতেছে যাহাতে সে যদি শীঘ্র সমাজ ধর্ম্ম রাজনীতি ও অর্থনীতি সকলের আবশ্যকতা ও সর্ব্বসার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটা বিরাট সমন্বয়ভূমির সৃষ্টি না করে, তাহা হইলে সে আর কিছুতেই আত্মসম্মান বজায় রাখিতে পারিবে না। নিজের প্রাধান্যস্পৃহা বর্জ্জন করিয়াই তাহাকে এ কার্য্য করিতে হইবে, নচেৎ সুমীমাংসা হইতে পারে না।

তাহাকে এ কার্য্য করিতেই হইবে কেননা সে কার্য্যদ্বারা প্রকাশ করিতেছে ধর্ম্ম সংস্কারের অদ্ভুত বর্জ্জন ভিন্ন একটা বিরাট ধর্ম্মসমন্বয় চাই। সমাজ বিষয়েও এমন সকল সংস্কার চাই যাহাতে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে সকলকে একাসন দিলে চলিবে না, আরও অন্তঃপুরে তাহাকে সকলের জন্য একাসন পাতিয়া দিতে হইবে। অর্থনীতিকে অবশ্য সে মানিয়া লইয়াছে কিন্তু অর্থনীতির মূল সূত্রকে বারম্বার অবহেলা করিলে একা অর্থনীতিই তাহাকে পিষিয়া মারিয়া আত্মপ্রাধান্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইতে পারে। জাতির নিকট লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা লইয়া সেই অর্থকে সংহত করিয়া অর্থনীতির রাজ্যে তাহার শক্তি বিকাশ না করিয়া রাজনীতিক আন্দোলনে ব্যয় করিলে দীর্ঘ দিন অর্থনীতি নীরব হইয়া থাকিবে না।

অতএব এই যুগসন্ধিকালে সকল অস্পষ্টতা ছিন্ন করিয়া যদি জাতির অগ্রগতি একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিতে চায় তাহা হইলে জাতির সত্তা ন্যাশনেলিজম তাহাকে সত্য করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, জাতির অধ্যাত্মপুরুষের নির্দ্দেশ তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিয়া কোনরূপে কথা শুনিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে সমাজ বা অর্থনীতি, অভাবে সমাজ ও অর্থনীতি, তাহাকে কোণঠেসা করিতে পারে। অর্থনীতির সহিত সমাজের খুব অধিক সম্বন্ধ, যদি সমাজসংস্কারটা কেবল সামাজিক প্রথা পরিবর্ত্তনে ব্যাপৃত না হইয়া কোন মূল ভিত্তির উপর সমাজ বা লোক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

সামাজিক প্রথা পরিবর্ত্তনেও সমাজ অর্থনীতির সাহায্য চায়। আমরা আজ যে লক্ষণ দেখিতেছি, রাজনীতি করিতে গিয়া যদি এ দর্শনটী আমাদের হারাইয়া যায় যে দেশাত্মা একটা সম্পূর্ণ একত্ব অন্তর্ভুক্ত সমাজ ও তাহার অবাধ ও স্বাধীন প্রকাশ অক্ষুণ্ণ [illegible] করিতেছে তাহা হইলে রাজনীতিকে [illegible] হইতে হইবে। খুব সম্ভবত সমাজ [illegible] অধিকার করিবে। শিক্ষা ও অর্থনীতি [illegible] নীতিকে পুষ্ট করিতেছে, [illegible] করিতে পারে।

রাজনীতি আসুর বলের কথা [illegible] অভ্যন্তরে জাতির যে মহাশক্তি [illegible] শক্তি লইয়া সে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে চায়, কিন্তু ইহা ইচ্ছা মাত্র পর্য্যবসিত রাখিয়া নিজের মনগড়া পথে চলিলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। তাই রাজনীতি [illegible] আসুর বলের জন্য জাতির অধ্যাত্মপুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করুক এবং তাহা হইতে বলসঞ্চয় করিয়া জাতির ধর্ম্ম সমাজ অর্থনীতি ও [illegible] বাধা সমস্ত করিয়া তুলুক অর্থাৎ [illegible] নহে [illegible] তাহাকে [illegible] মধ্য দিয়াই [illegible] এই সমন্বয় [illegible] পরিবর্ত্তনের [illegible] রাজনীতির [illegible]

শিক্ষক-সভার কথা

(বিদ্যাপীঠের চিঠি)

বিগত ৭ই মে ১৯২১ সালে সেনেটে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের একটা সভা হয়েছিল। এই সভার কার্য্যবিবরণী-পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেখানে যে সব প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তার মধ্যে প্রথমটারই আমরা এক্ষেত্রে আলোচনা করব।

এইখানে একটা কথার আমাদের মীমাংসা করে' নেওয়া দরকার—যেটা আমাদের এই কর্ম্মশিক্ষার ভবিষ্যৎ অতি-প্রচলন-নিবন্ধন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য যাঁরা কর্ম্মশিক্ষার প্রচলনে সাধারণের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প হ'লেও, সেদিককার কথাটা একেবারে নাকচ করা আমরা ঠিক বিবেচনা করি না। [illegible] দলে কর্ম্ম [illegible] দেবতার বেদী জুড়ে বসে [illegible] একটু চিন্তা আসবে তাতে আর সন্দেহ কি—বিশেষ যখন এই কর্ম্মের বন্যায় গা ঢেলে দিয়ে পাশ্চাত্য নিজের ভিতরের দিকটা থেকে ক্রমে ক্রমে সরে পড়ে গিয়ে এখন সে দিকটাকে একেবারে নেই বলে'ই উড়িয়ে দিতেই চেষ্টা দেখছে। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে এই ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্ম-প্রেরণার ঢেউ যে একেবারে আমাদের হঠাৎ বহু দিনের স্বভাবধর্ম্ম থেকে উল্টে দিতে পারবে না এটা নিশ্চয়ই। তবে একটা ভাব একবার মানুষের মাথার ভিতর ঢুকলে—সেটা যদি কোন বাধা না পায়—তবে সে শেষে সব উল্টে দিতে পারে এও আবার ঠিকই।

কিন্তু স্বদেশীর পূর্ব্ব থেকে—এই আধুনিক বাংলা দেশের কথাই যদি বলি—জাতির অন্তরতম প্রদেশ থেকে যে তরঙ্গমালা দেশের উপর আছড়ে এসে পড়ছে—অশুদ্ধ বা অনুশুদ্ধ প্রাণ-মন-দেহের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেলেও, সেটা এত ভিতর দিকে টানা, এত ভাব ও প্রেরণায় মাখা, যে আমাদের এখানে একটানা বহির্মুখী কর্ম্মের নদী বহে যাবে—(যদিও কর্ম্মজীবনের মস্ত একটা বড় জিনিস)—তা মনে হয় না। আমাদের ছেলেরা থেকে মহাত্মারা পর্য্যন্ত তাদের হৃদয় ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করবার জন্যে সব রসটা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য জায়গা থেকেই সংগ্রহ করে' আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কপালটাকেই বেশী করে' স্পর্শ করছে, সে যে একেবারে ভেতরের ফল্গুপ্রবাহটাকে চেপে শুকিয়ে দিতে পারবে এমন মনে হয় না—ভেতরের দুএকটা ঢেউয়ের আঘাতের প্রক্রিয়া দেখলেই এ কথাটা আমরা বেশ বুঝতে পারি। আর এই অন্তর-স্রোতের যে শেষ নেই এ'ও নিশ্চয়ই, এমন কি তার অন্তরতম প্রদেশের শব্দ বা রূপচ্ছটা এখনও আমাদের পৃথিবীতে, তথাকথিত বুদ্ধি জগতে, এসে এখনও পৌঁছায়ই নি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

যে পরিবর্ত্তনটা শিক্ষক-সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ'য়ে আহ্বান করেছেন, সেটা যদি ছেলেদের বাপ মা আর সব শিক্ষক, তাঁদের সমস্ত শক্তি ও সৎ-ইচ্ছা দিয়ে, করতে চান, তা'হলে সেটা খুবই সার্থক হবে সন্দেহ নেই। তবে আমাদের দেশের লোকের কর্ম্ম-শিক্ষার এমন কি সত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব সংস্কার ছিল তার অর্দ্ধেকের বেশী এখনও আছে, আর শিক্ষকদিগের শিক্ষা দিবার আগ্রহটাও যে বেড়েছে তাত মনে হয় না। বাপ মা মনে করেন, ছেলেরা সেই ১০টায় ৫টায় স্কুল করবে, শব্দস্ফুরণ-মাত্রেই "ba বে cla ক্লে" আরম্ভ করবে, সেই বড় বড় থামওলা টেবিল চেয়ারের আসবাবখানায় বসে টানাপাখার তলে পাঠ অভ্যাস করবে, সেই তারা ভয়ে ভয়ে মা বোনের আঁচল ধরে' বেড়াবে, তাদের গলায় লৌকিক ধর্ম্ম আচার ব্যবহারের নাগপাশটাও, তাদের আকাশের আলো আর স্বাধীন বাতাস থেকে একই রকম দূরে রেখে দেবে, আর ছেলে অমনি নতুন নতুন জাতীয় বিদ্যালয়ে গিয়েই তার বহু পুরুষের দাসভাব ছেড়ে একেবারে দেব মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হবে! এরকম বন্ধ্যার পুত্রলাভের ইচ্ছা হয়ত ভগবান সফল করতে পারেন কিন্তু মানুষে পারবে বলে' ত মনে হয় না। আমাদের হাবড়া জেলার বিদ্যাপীঠের ছেলেরা নিজেদের ক্ষেতের উৎপন্ন শাক সব্জী নিয়ে বাজারে বিক্রয় করতে যায় বলে' সে দেশে একটা হুলস্থূল পড়ে গেছে—যদিও ছেলেরা অনেকেই জাতিতে কৃষক। ২৪ পরগণার কলতায় আমরা নিজহাতে চাষবাস করতে গিয়ে যে লাঞ্ছনা পেয়েছি তা আমরাই জানি—যদিও আমাদের নির্ব্বাক কর্ম্ম-সাধনার শেষে প্রতিরোধী দেশকেই পরিবর্ত্তিত হ'তে দেখেছি। আর বাংলা দেশের চারি ধার ত ঘুরতে কোথাও বাকী রইল না, পৃথিবীর অর্দ্ধেকটাও ত তন্ন তন্ন করে' দেখলুম, এ সব দেখে শুনে আমার মনে ঠিক হয়েছে, যে, সকল প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটা জাতিরই ভেতরের একটা চিত্র—এবং আমাদের দেশে যে হীনকরী শিক্ষা প্রচলিত আছে তা আমাদের আপনাদেরই অজ্ঞাত চাওয়া ভিন্ন অন্য কিছুর ফল নয়।

ঠিক এই সময়ে যে সকল কর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ঠিক ঐ কাজগুলোতেই লোকের আপত্তি আছে। কৃষি, বস্ত্রবয়ন, কামার, ছুতার ও সোণার প্রভৃতির কাজ, যা এখনি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, সেগুলো সকলে পছন্দ করে না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেই একজন বলেছেন যদি এই কাজগুলিই শিখান হয় তা'হলে ছেলেরা ত আপন আপন বাপের লোকের কাছ থেকেই শিখতে পারে—অন্ততঃ

একটু উঁচু ধরণের কৃষি শিল্প ভিন্ন অন্য কিছু তিনি ছেলেদের শিক্ষা দিতে রাজী নন। ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ কথাগুলি শিক্ষা দিতে পারেন, এই বিলাতী শিক্ষা ও কল কব্জা হজম করে' দেশের উপযোগী যন্ত্র তন্ত্রের আবিষ্কার করে' এমন প্রতিভাবান পুরুষ আমাদের দেশে খুব কমই আছেন—কৃষি সম্বন্ধে কেহ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। এই রকম অবস্থায় যেটা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সেটা আমাদের কৃষক, কর্ম্মকার আর সূত্রধরের কর্ম্মেরই একটু মাজাঘষা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এবং এই কর্ম্ম শিখিবার জন্য সূত্রধর ও কর্ম্মকারের মত লোকের সঙ্গে ছেলেদের মেশামিশি খুবই আবশ্যক হবে। কারণ যারা কর্ম্ম করে' খায় তাদের কথা 'সোনা' আর যারা সরকারি কৃষি বা বয়ন বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে তাদের কথা সব 'রূপো' না হ'লেও, দস্তা বা নিকেল সেটা নিশ্চয়ই। কর্ম্মশিক্ষা থেকে সরকারী বিদ্যালয়গুলি "জাবদা আর খতিয়ানকে" বরখাস্ত করে' ছেলেদের মাথা ভারি তালপত্রের সিপাই করে' রেখেছে। কারণ আমাদের দেশের জুতাসেলাইকার হ'তে চণ্ডীপাঠক ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই স্বাধীন ব্যবসায়ী বা শ্রমশিল্পী একটু শিক্ষানবিশী করে'ই যে কলে কুলী বা তার সর্দ্দার হয়ে ঢুকবে সে সুবিধা সকলের নাই এবং আমাদের দেশের লোক সব কুলী হয়ে যাক এটাও আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত।

সত্য সত্য আমরা বিদ্যালয়টাকে জীবনের বাইরে রেখে চিন্তা করতে পারি না, পরন্তু সেটাকে জীবনের এক অখণ্ড গতিভঙ্গীর মধ্যেই পেয়েছি এবং আমরা মনে করি বিদ্যাপীঠটা, সাধারণ ও মনীষীদিগের মধ্যে, জীবন ও জ্ঞানের চলাফেরা করবার একটা প্রণালী। এবং আমরা আরও মনে করি যে বিদ্যাপীঠের সার্থকতার সম্ভাবনা সেই দিনই আসবে যেদিন বিদ্যালয় তার বলশালী শিকড়গুলি—সমাজের, ধর্ম্মের, উৎসবানন্দের, সমস্ত জীবনটার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারবে। সকলের সঙ্গে মিশতে, মিলতে তাই আমরা, অনেক শিক্ষকের মত, ভয় করি না।

অন্য কিছু না হ'লেও বর্ত্তমানে যতটা শিক্ষা দেওয়া এদিকে সম্ভব হয়—তা না মানা হ'লেও—এতে আমাদের কর্ম্মবিতৃষ্ণা যে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত করবে তা নিশ্চয়ই। আর যদি কলকে আমাদের দেশে এনে বসাতে হয় আমাদের মতন করে', তা'হলে উপরচাপা একটা শিক্ষা না এনে ভিতর থেকেই বর্ত্তমানটাকে শুদ্ধ ও পূর্ণ করে' তোলাই যুক্তিযুক্ত। নইলে শিক্ষা ব্যবস্থার [illegible] ভয়ঙ্কর সংস্কারই আবশ্যক হয়ে পড়বে। অনুমোদিত শিক্ষক (Approved teacher) এর কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলবেন, যদি সত্যই তাহা সম্ভব এখনই সেইরূপ কর্ম্ম শিক্ষা দিতে হয় তাহ'লে আমাদের কৃষকের ক্ষেত্র ও কর্ম্মীর কর্ম্মশালাকে আশ্রয় করতেই হবে—যদি না বিদ্যালয়কেই কর্ম্মশালায় পরিণত করা যায়। তবে বিদ্যালয় কর্ম্মশালা গড়ে' তুলতে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা অনেকেরই হাতে নেই, যার জন্যে অনেককেই হয়ত পুরাতন ভাষা বা Typewriting আদি শিখিয়েই দায় হ'তে খালাস নিতে হবে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষার যে লক্ষ্য বা তার চাইতে বেশী দোষ ত্রুটী আছে তা ব্যাখ্যা করে' বলতে সকল হেড মাষ্টারই পেরেছেন, কিন্তু দোষের গোড়াটা কোথায় তা কেউ বলেন নি। তাই তাঁদের প্রতিকারের সব উপায়ই যে 'না' হবে সেটা বলাই বাহুল্য। লোকে মনে করে কতকগুলো কল কব্জাতে ছেলেগুলোকে জুড়ে দিলেই জনে জনে ফক্ (Foch) এডিসন, পাসতার, টেলার—হয়ে দাঁড়াবে। কলের যদি এতই ক্ষমতা থাকত তা'হলে ভগবানকে একটা বড় ষ্টীম ইঞ্জিন বললেই সকল লোকে মহা মহা জীবনের [illegible] চিন্তা থেকে অব্যাহতি নিত। আর কল

যদি জীবন দিতে পারত, জীবনকে গড়ে তুলতে পারত, তার সকল সমস্যার মীমাংসা করে' দিতে পারত, তাহলে আর আজ এডিসনের দেশ থেকে টোগোর দেশ পর্য্যন্ত, স্বামী (Sammy) সাবুরাই কালা ধলা রক্ত পীত জনে জনে মহাত্মারা ধ্যান করতে বসে যেত না। মানুষ যার সৃষ্টি করেছে, মানুষ তাকে চালিয়ে নিজের সুখ সুবিধা করে' নিতে পারে, তার চর্চ্চা করে' আপন ক্ষমতা ও শক্তি বাড়াতে পারে কিন্তু [illegible] নিজে কখন কিছু, এমন কি তাকে সৃজন করবার ক্ষমতা [illegible] দিতে পারবে না [illegible]। [illegible] শক্তির উৎস আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] চাই, [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] নেই [illegible] [illegible] কি অমৃত [illegible] [illegible] [illegible] শক্তি [illegible] [illegible] [illegible] দিতে হবে, [illegible] শিক্ষা [illegible] পুস্তকাগারে পর্য্যবসিত [illegible] [illegible] বা অন্য যে কোন জায়গায় খুঁজে পাবে কি না [illegible] কেমন করে' এ চর্চ্চা হয়, [illegible] [illegible] পারে, তার ভঙ্গীটা কি, সেই [illegible] [illegible] দেখে না। আমরা যদি যে পদ্ধতিতে শেখান হয় সেটাকে একেবারে উপাদেয় পরিবার মাধ্যাকর্ষণের বাইরে ফেলে দিতে হবে, সেটাই আমাদের সর্ব্বনাশ করছে। রাশী রাশী key, আর dictionary আর একটু খটকা লাগলেই মাষ্টার যেখানে নেমকো চাকরের মত বসে আছে, ছেলেদের ঠোঁটের উপর থেকে সন্দেশটা মুখে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে, সেখানে যে সব পঙ্গু হবে তাতে কোন ভুল নেই। দোষ ত এই খানেই, দাসমনোবৃত্তি ও এইখানেই—সেটা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেও নি আর তাদের হাত এড়ালেও যাবেও না। আমরা যে আমাদের সমাজধর্ম্মের মত কিছু বিদ্যালয় থেকে শিখিনা, তা শুধু নয়— আমাদের কোন শক্তিরই বিকাশ হয় না যার দ্বারা আমরা পরেও হয়ত একটা কিছু বুঝতে বা করতে পারতুম। এই ছেলেকে কেন সব বলে' দেওয়া হয়? কেন তাকে আপনা আপনি শিক্ষা করতে সাহায্য করা হয় না? কেন তাকে 'ক' 'খ' পড়বার সময় থেকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না যে তাকে পৃথিবীর সব সত্যগুলো জয় করে', পান করে' বড় হতে হবে — সেটা সে নিশ্চয়ই পারে এবং যা পাবার চায় পাবার আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাষ্টারেরা দু'একজন ছাড়া — যে কেবল Scientific subjects শিক্ষা দিতে জানেন না তা নয় তারা কি [illegible] বাণী কি বা কা, কি পুরাতন কি নূতন [illegible] বিষয় শিক্ষা দিতে জানেন না।

এই এক চিরদিন বলদের মত মুখস্থের বোঝা বওয়া পদ্ধতি কি সাহিত্য কি বিজ্ঞান সব জায়গায়ই চলেছে। শিক্ষাদিবার পদ্ধতিটা সব জায়গায়ই সমান; ছেলে যেখানে আপন আনন্দে কেড়ে কেড়ে খায়, দেখে বিচার করে, ঠেকে, ভুল করে' শিখে, সেইখানেই ছেলে মানুষ হয়, না হ'লে নাদাপেটা পিলেরোগা বা মোমের পুতুল হয়ে ফুলের ঘায়েই মূর্চ্ছা যায়। এ কথাটা কি মাষ্টারদের মাথায় ঢুকবে না? খালি কি ফ্রান্সের মত * গুণ্য সূত্র ধরে' কেবল অসহায় বিবর্ণ-তালিকাটাকে বজায় রেখে আমরা অধঃপথেই যেতে পারবো।

তারপর ষ্টেট এডুকেশন বলতে যদি বুঝায় সবাইকে কেটে ছেঁটে মাঝারি রকমের একটা Citizen তৈরি করা, তাহলে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় চক্রের অনন্ত পরিধি বিস্তার যে একেবারেই চাই না তা বলবই। কল যখন মানুষের জীবনের উপর কর্তৃত্ব

* ফরাসী দেশের শিক্ষাসংস্কারের কথার সঙ্গে আমাদের শিক্ষাসংস্কারের কথার এবং তার সঙ্গে পরস্পরের মনস্তত্ত্বের কতটা সাদৃশ্য তা ভবিষ্যতে প্রবন্ধান্তরে দেখাবার ইচ্ছা রইল।

করতে আস্‌বে তখন তার মুখে চুণকালী দিয়েই আমরা ফিরিয়ে দেবো। মুক্ত মানুষ তৈরী করবার দিক দিয়ে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমরা বেশী কিছু আশা করি না।

তারপর যেখানে মুক্ত 'হাওয়ার' কথা, সেখানে প্রশ্ন উঠে প্রথমে মাষ্টারকে নিয়েই—সে কি নিজে স্রষ্টা হয়েছে, কবি হয়েছে, মনীষী হয়েছে—সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট থেকে আমরা কিছুই আশা করি না।

তারপর আধ্যাত্মিকতার কথা—যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় চুপ দিয়ে খুব বুদ্ধদারের কাজই করেছে, আর যেটা কলের হাতে গিয়ে পড়্‌লে আমরা বিধাতার অমর বর রদ্ করেও মরে' যেতুম—তার জন্যে যে একটা Positive Spiritual activity'রই atmosphere চাই, সেটা যে কেউ ওখানে বসে করতে পারবে, তা মনে হয় না।

তাই আমাদের মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি বাঁচ্‌তে হয়, সত্যই দেশের উপকার করতে হয় যতটা শিক্ষা বলে' জিনিষটার নিকট থেকে আশা করা যায়, তা'হলে তাকে চিরে চিরে বিন্দু বিন্দু করে' সব বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে। নইলে যতদিন না রাম আসে রাবণের থাকাটাও একটা পৃথিবীতে দরকার হয়ে থাক্‌বে।

এই জন্যই ত আমরা নিজেরা একেবারে উল্টা দিক থেকে আরম্ভ করেছি। আমরা ধর্ম্ম অর্থ এক করে' যে বিদ্যাপীঠ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি সেখানে আমরা পদ্ধতিটাকে আমূল বদলে ফেল্‌ছি—সেখানে মাষ্টারের চাইতে আমরা হাওয়ার উপর বেশী জোর দিয়েছি, বাহিরের কথার ছড়া ছেড়ে দিয়ে ভিতরের শুদ্ধতার মাঝে জ্ঞানের নিজ উৎসটিকেই সেখানে জাগিয়ে তুলছি, দেহ, মন, প্রাণ, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সকল শিক্ষার পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য এই নূতন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই সুদূর আসামে বসে, হাতে কেতেড়ে বিদ্যাপীঠ গড়ে' তু'লে যে অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধি অর্জ্জন হচ্ছে, তার আলোকে দিন দিন এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে—বাংলার শিক্ষাসমস্যার সত্য মীমাংসা আমাদের অবলম্বিত এমনই নতুন পন্থাতেই হবেই হবে।

ইতি—

অর্থ-শক্তি

—:০:—
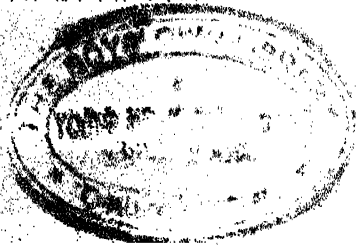
যুদ্ধই ত আমরা আরম্ভ করিয়াছি—এ যুদ্ধ অধ্যাত্ম-যুদ্ধ—ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য চাই মানুষ, চরিত্র, অর্থ এবং উপকরণ। মানুষ চাই—দলে দলে সহস্রে সহস্রে—যুদ্ধ করিবে, সে ত মানুষ, লোক সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ভারতের সাধনার মর্ম্ম রক্ষার জন্যই মহাসংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছি, ভারতের সভ্যতাশক্তি ধ্বংসের কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্যই অন্তরের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, চাহিতেছে অগণন যোদ্ধা, যাহাদের মধ্য দিয়া আপনার জয় ঘোষণা করিবে। কিন্তু সংখ্যায় অকুরন্ত মুণ্ড মালায় কার্য্যোদ্ধার হইবে না, চাই হৃদয়, চাই চরিত্র। এই আর্য্যযুদ্ধে আর্য্যবীরের

চাই আর্য্য চরিত্র—ভারতীয় সনাতন ধর্ম্ম ব্যতীত আর্য্য চরিত্র গঠন অসম্ভব—এই বিপুল স্বদেশযজ্ঞ যদি ব্যর্থ না করিতে হয়, আর্য্য সাধনার প্রতিষ্ঠা-ব্যবস্থা গভীর ও ব্যাপক ভাবে এই মুহূর্ত্তেই করিতে হইবে। আর চাই অজস্র সমৃদ্ধ উপকরণ—আমরা আমাদের ধন-সম্পদ, ধর্ম্মযুদ্ধ রসদ অভাবে পঙ্গু না হয়, সে দিকে তীব্র দৃষ্টি আমাদেরই রাখিতে হইবে।

শত্রু আমাদের মানুষ নহে, মানুষের মন। বাধা মানুষের সৃষ্ট যন্ত্রতন্ত্র; ভারতের সভ্যতা এই যন্ত্র তন্ত্রের বিরুদ্ধেই রণঘোষণা করিয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষ চায় অধ্যাত্ম শাসন—আত্মতন্ত্রই সে আচারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিবে। এই জন্য আমরা সহস্রবার পুনরুচ্চারণ পূর্ব্বক কহিতেছি—রাষ্ট্রযন্ত্রের পূজা আমরা করিব না—রাষ্ট্রকল ইউরোপ গড়িয়াছে ভাঙ্গিয়াছে আজও তার কোনও সমস্যার সমাধান হয় নাই, ভারতেও উহার পরীক্ষা হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃতিরই গূঢ় অনিচ্ছা বারম্বার গঠিত মন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, মন্দিরে যে দেবতা বসাইতে পারি দেবতা বসাইতে গিয়া বিরাট দৈত্যপুরুষকেই যে ভ্রমে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছি। ভুল আজ সংশোধন করিতে হইবে—আপনারই উপর নির্ভর হইয়া—নূতন যুগকে আর আমরা একই বিরাট ভ্রমের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে ব্যর্থ হইতে একেবারেই দিব না।

প্রেরণা পাইয়াই দেশ যদি প্রমত্ত হয়, প্রেরণা ব্যর্থ হইবে, অন্ততঃ খুব অল্পপ্রসূই হইবে—পর্ব্বতের মূষিক-প্রসবে হাস্যোদ্দীপনার কাজ কি—মূলসূত্রটুকুই ধর—সেই সূত্রেই সমগ্র কর্ম্মতন্ত্র অব্যর্থ শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করিয়া তোল—উদ্দেশ্য শুধু কর্ম্ম নয়, হৃদয়ের তরঙ্গাবর্ত্তন নয়, কিছু ত হইতেছে বলিয়া মনস্তুষ্টি, আমরা ক্ষুদ্র চিত্তেরই পরিচয় মনে করি—চিন্ময়ের উপরে দাঁড়াইয়া শুদ্ধ-জ্ঞান-দৃষ্টি দিয়া যে কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবে, সেই হইবে সিদ্ধ কর্ম্ম—দেশাত্মা আজ সিদ্ধ কর্ম্মের বীজমন্ত্রই সাগ্রহে অন্তরে অন্বেষণ করিতেছে—শক্তিরের উত্তাল আবর্ত্তন তাহারই অস্ফুট দ্যোতনা প্রকাশ; যাহারা জাগিয়াছ, স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধা শক্তি আহরণে তৎপর হও। শক্তির সুপ্রতিষ্ঠা না করিয়া সমরোদ্যম বাতুলতা নহে কি?

তপস্বী গান্ধী দেশাত্মারই প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, যে বিপুল আদেশমন্ত্র তাঁহার কণ্ঠে বাহির হইয়াছে, দেশাত্মারই বাণী বলিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া না লইলে, দেশাত্মার মর্য্যাদা বুঝি ধূলালুণ্ঠিত হইয়া যায়! জাগ্রত হও, দেশ, ভারতসিংহের বাণী আজ বর্ণে বর্ণে সফল করিয়া তোল—আমাদের উপেক্ষায়, প্রত্যাখ্যানে, বাণী যদি ব্যর্থ হয়, জানিও রুদ্র অভিশাপ মায়ের চক্ষু দিয়া অগ্নিবর্ষণ করিবে; প্রকৃতিকে অমর্য্যাদা করিতে নাই, পূর্ণ স্বীকৃতিমধ্যে প্রকৃতির ইচ্ছানুসরণেই প্রকৃতির শুদ্ধি ও মুক্তি বিধান আমাদের করিতে হইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধ অনুবর্ত্তন করিতে আমরা তীব্র স্বরেই বারণ করিতেছি—ভাবোত্তেজনা পরিহার পূর্ব্বক স্বচ্ছচিত্তে অবধারণ করে—দেশাত্মার ডাকের মূল তথ্য কি, নির্দ্দেশটি গভীর ভাবেই পাঠ করিয়া লও—মুক্তি মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি—বাঙ্গালী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়াছে আজ নয়, জয়ে পরাজয়ে যেখানে আসিয়া আজ আমরা দাঁড়াইয়াছি, দৃঢ়পদে সেইখানে ভূমি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—জয় যখন সন্নিকট, আবার একই পূর্ব্ব যুদ্ধাভিনয়ে বৃথা কালক্ষয় করিতে যাইব কেন—নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি যখন করিয়া তুলিয়াছি, এইবার তাহারই উপরে দাঁড়াইয়া বিজয়-সিদ্ধি সম্পূর্ণ আহরণ করিতে হইবে।

দেশকে স্ব-পদে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—ইহাই ত আমাদের সঙ্কল্প। এইজন্য প্রথম কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি—শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। স্থানাভাবে বিশদ

ভাবেই উল্লেখ করিয়াছি—ভারতের প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা অর্থে আমরা কোন্ ভাবের শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি—দেশ যে জাতীয় শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা বলিয়া আজ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠ, আমরা তাহার মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিয়াছি—জাতীয় শিক্ষা সনাতন মন্ত্রে অপূর্ব্ব উপায়েই আমরা প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিব—কেবল চাই দেশের আনুকূল্য, হৃদয় কোণে একটু-খানি স্থান, বিন্দু পরিমাণ স্থানটুকু পাইলেও, তাহা-কেই কেন্দ্র করিয়া আমরা দিকে দিকে শিক্ষায়তন সমষ্টি অচিরেই গড়িয়া দিতে পারিব।

অর্থ সাধনা ইহারই জন্য। বাংলায় অন্নসমস্যার সুমীমাংসা করিতে হইবে—বিদ্যা সাধনা মানস সাধনা, কিন্তু প্রাণ রক্ষা না করিলে, কোন্ সাধনা সফল হইবে? জাতির প্রাণ যে আজ কণ্ঠাগত, কেমন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে হইবে দেশ এখনও তাহা ভুলিয়াই রহিয়াছে, প্রাণের দরদ না বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলে প্রকৃতির ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা বজ্রের মত মাথায় পড়িবে, সময় থাকিতে সাবধান হওয়া চাই, অভাবে economic failure আজ না হয় কাল অতল সাগরে সব সিদ্ধি ঢাকি-শুদ্ধ ডুবাইয়া দিবে—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার ত নাই।

বিদ্যাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দেখিলাম—চাই অগাধ অর্থ। প্রাণ রক্ষার জন্য চাই অগাধ অর্থ। এত অর্থ কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিবে? সমস্যা ত ইহাই, দেশ কর্ম্ম ও উত্তেজনাস্রোতে প্রখরবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে, অর্থ ব্যয় জলের মত হইবে, তাহারই জন্য মহাত্মা আজ কোটী মুদ্রা সংগ্রহ-তৎপর, দেশের শুষ্ক অস্থিকঙ্কালগুলি ঠেঙ্গাইয়া ঠেঙ্গা-ইয়াও আহরণ সুরুল করিতে হইবে—কিন্তু এমন করিয়া আমরা কতদিন চলিতে পারিব—দেশের অর্থশক্তি কতদিনে এই বিপুল গুরুভার সহ্য করিতে পারিবে? সূতা-সমস্যা ও শিক্ষা-সমস্যার নিষ্পত্তি উদ্দেশ্যেই মহাত্মার দৃঢ় সঙ্কল্প, ব্যয়ানুরূপ স্থায়ী সুফল আসলে হইবে কি?

টাকার যেন শ্রাদ্ধ দেশে চলিয়াছে—খুলনার দুর্ভিক্ষ, চাঁদপুরের কুলী, স্বরাজ্য ভিক্ষাভাণ্ড—দেশের দান-বৃত্তি অবসন্নপ্রায়, অভাব ত চতুর্দ্দিকে—কেবল চাঁদা আর চাঁদা, ধূমাবতী যেন আজ "ময় ভুখাহুঁ ভুখাহুঁ" রবে দেশে হা হা করিয়া ফিরিতেছে, রাক্ষসীর তর্পণ করিতে পারিবে এমন উৎকট শব সাধনাই যদি আজই আরম্ভ না কর—শুদ্ধ অর্থাভাবে দেখিবে আকাঙ্খার স্বর্গ আকাশেই ঝুলিয়া রহিবে, দেশের অর্থশক্তি কেবলই অজস্র ক্ষয়ে এমনি করিয়াই যদি নিঃশেষিত হইয়া যায়, কি স্থায়ী সুফল হইবে, আবার জিজ্ঞাসা করি—বল ত?

অর্থনীতি দেশকে রক্ষা করা দূরে থাকুক—অর্থ-ভঙ্গই ইহার অনিবার্য্য শেষ পরিণাম—সেই পথেই আমরা গা ভাসাইয়া চলিয়াছি; পরিণাম দৃষ্টি ত হারা-ইয়াছি, চলিয়াছি কোথায়, তাহার নিরূপণের সামর্থ্যও নাই, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—যদি এই মুহূর্ত্তেই স্থির ও শুদ্ধ নীতিটি না ফুটাইয়া তুলিতে পারি—কিন্তু হায়, অর্থকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সে ব্যবস্থা আয়ো-জন দূরে থাকুক চিন্তা পর্য্যন্ত আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জাতির দুর্দ্দশা ভাগ্য মুছাইবার দিন কি এখনও আসে নাই—দেখিয়া শুনিয়া এই সংশয়ই জাগিয়া উঠে। চৈতন্য আমা-দের ফুটিয়া উঠিবে কবে?

অর্থ সমস্যা নিরাকরণের পন্থা খুঁজিবার জন্য দেশাত্মাই আজ আমাদের ভিতর মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে। প্রথম কথা, এই জলস্রোতের মত অর্থ ক্ষয় রদ্ধ করিতে হইবে—দেশের বিক্ষিপ্ত ব্যষ্টি সম্পদ—জাতীয়-সম্পদ আজ প্রকৃত কোথায়—জাতির ধন-ভাণ্ডার ত রিক্তহস্ত, ব্যষ্টির বিক্ষিপ্ত অর্থশক্তি আছে, কিন্তু ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্বই যেমন জাতিত্ব নয়,

Russia since the new years has turned sharply backwards in her evolution towards communism." তাই লেনিনের নিজ মুখেই কোন লেখক এমন কথাগুলিই শুনাইয়া দিয়েছেন—"In order to improve the relations between the workers and the peasants, we must change our policy towards the peasants and allow them their own part of their farms. Some of their crops we shall take, but we shall allow them to possess the rest of it, and shall respect their proprietorial rights. We shall have to agree to free trade. We shall have to admit the right of private property in the case of the small craftsman until in ten years or so, great socialistic industries can be established. We must develop our trade with capitalistic countries, for without foreign assistance, we can make no progress. We must improve the position of the peasant and leave him free to attend to his farm."

কাজেই দেখা যাইতেছে—"The surrender comes in two chief ways, but each of them will entail other big consequences.

[illegible]

sion of foreign capital on a concession basis, is likely to mean a very intimate penetration of the economic life of Russia. The second surrender is still more vital. To allow the peasants (apart from a tithe in kind) to trade freely in food is to withdraw nine-tenth of the population from the influence of socialistic economics."

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতাংশগুলির অনুবাদে স্থান সঙ্কুলান হইবে না, তাই উহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। কথা হইতেছে, রুষিয়ার নব পরীক্ষা এখনও, অতএব, ভরসার বস্তু নহে—অবশ্য বলশেভিষ্টগণের economic destiny'র সহিত এই অপূর্ব্ব মহাযুদ্ধ, পরিণামে জয়ে হউক পরাজয়ে হউক, জগতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট যুগান্তর উপস্থিত করিবেই—এদিকে মানুষের এমন বিপুল বিক্রম ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে এই নূতন- লেনিনের ভবিষ্যৎ দশ বৎসর তাঁর আশা-স্বর্গ কতখানি রুষিয়ার মাটির উপর গড়িয়া তুলিতে পারিবে—তাহাও এখন অনিশ্চিত বিবেচনার অধীন রাখাই সঙ্গত—বলশেভিজম সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে; আজ শুধু আমরা এইটুকুই দিব্যনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পারি—পূর্ব্ব লেখকের কথামত "The end of Bolshevism, as the world understands Bolshevism" ইহা স্বীকার্য্য না হইলেও, বলশেভিজমে ভারতের অন্তরাত্মার সায় নাই, কেন নাই সে কথা বিশদরূপে ভবিষ্যতে দেখাইতে চেষ্টা করিব—রুষিয়ার communism ঠিক এসিয়ার, আর ভারতের সনাতন সমষ্টিজীবন একেবারেই নহে—বলশেভিজমে অনেক সত্য থাকিলেও এই মূল সত্যটি সেখানে উপেক্ষিত—মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের

[illegible]

তাহাকেই একান্ত করিয়া নয়, উহাকে মানুষের অনন্ত জীবনেরই সোপানরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলে—অন্ততঃ, ভারতের জীবনের ভাগবত অর্পিত সম্পদ—ইহাই আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি—

ভারত-শক্তির যে বিরাট জীবনপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চলিয়াছি তাহা বৈশ্যতন্ত্র নয়, শূদ্রতন্ত্রও নয়, বিদ্যা অবিদ্যা, লক্ষ্মী সরস্বতীর সামঞ্জস্যই উহাতে নিহিত থাকিবে। ভারতের culture যেমন, তেমনি তাহার অর্থশক্তিও সনাতন সংঘনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কয়েকটী কথা

—০ঃ—

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা গবর্ণমেণ্টকে রাজবন্দীদিগের এবং নজরবন্দীদিগের মুক্তির কথা ধারাবাহিক ভাবে বলিয়া আসিতেছি, তাহা বহু পক্ষের চক্ষে খুব মধুর প্রসঙ্গ না হইলেও, আমাদের অনেকজন দেশবাসী যে বিনষ্ট কারাবরণ ভোগ করিতেছেন, বনে জঙ্গলে অনশনে অনিদ্রায় দিন যাপন করিতেছেন, তাহা কেমন করিয়া নীরবে আমরা সহিয়া থাকি? মর্ম্ম বেদনায় বুক যে ভরিয়া আছে, তাঁহাদের পুত্র পরিজন এখনও যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন, এই নিদারুণ মর্ম্মগাথা বারম্বার কর্তৃপক্ষগণের গোচরে আনিয়া তাঁহাদের সকলের মুক্তির পথ যতদিন না সুগম করিয়া তুলিতে পারি, ততদিন যে এই দিক দিয়া আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইতেছে না। কিন্তু আমাদের সমধিক আশা, গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাও বাঙ্গালার অগ্নিযুগের সকল ঘটনার একটা পরিসমাপ্তি করিতে চান; সকলেই স্বাধীন মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া দেশ এবং দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করুন—গভর্ণমেণ্টেরও ইহাই ইচ্ছা। তাই গভর্ণমেণ্টও অবশিষ্ট রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে এবং পলাতক যুবকদিগকে মুক্তিদান করিতে বিশেষ বিরোধী নন, এবং এই ভাবেরই পক্ষে, তবে ঘটনা একটু অবস্থাচক্রে পড়িয়া ইহার যে অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহাতে সাধারণের অধীর হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়।

বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা রাষ্ট্র-স্বাধীনতা আনয়ন উদ্দেশ্যে পুরাতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাণে গবর্ণমেণ্টের নূতন বাণী পৌঁছিয়াছে; তাঁহারা আজ যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, দেশে বা বিদেশে, কারাগারে বা মুক্ত আকাশের তলে, তাঁহারা স্পষ্ট অবধারণ করিয়াছেন যে অনিশ্চিত পন্থা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার যে প্রচেষ্টা তাহা কখনও কার্য্যকরী হইতে পারে না; অন্তরের নির্দ্দেশ পাইয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন, যে, একমাত্র অধ্যাত্ম সাধনার মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ জাগিবে, তাঁহাদের পুরাতন ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই নূতন সাধনা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং একমাত্র এই অধ্যাত্ম সাধনাই তাঁহাদের ভবিষ্যত জীবনের কর্ম্মসৃষ্টির ভিত্তিভূমি হইবে, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

যাঁহারা দেশে বা বিদেশে এখনও পলাতক অবস্থায় রহিয়াছেন ও যাঁহারা রাজকীয় বিধির শাসনে এখনও দ্বীপান্তরবাস বা কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদেরই কয়েকজনের বিষয়ে এখানে আমরা উল্লেখ করিতে চাই। অধ্যাত্ম সাধনায় আমরা যে নূতন বাণী শুনিয়াছি, তাহারই বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি হইবার
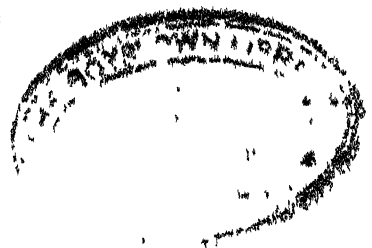
পূর্ব্বেই আমাদিগের কয়েকটী বন্ধু ঘটনাচক্রে এবং গবর্ণমেণ্টের আদেশে আমাদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিলেও, অধ্যাত্ম সাধনার যে বীজ একদিন তাঁহাদিগের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা এখন বিরাট মহীরুহরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগের চরিত্রে অদ্ভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, এই পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাইয়াই আমরা গভর্ণমেণ্ট সমীপে তাঁহাদিগের বিষয় নিবেদন করিতে সাহসী হইয়াছি। এবং আমাদের আশা ভারতের বড়লাট লর্ড রিডিং মহোদয় আমাদের কথার সারবত্তা এবং সত্যতা অবধারণ করিয়া আমাদের নিবেদন অপূর্ণ রাখিবেন না। তাহাতে রাজা এবং প্রজা উভয়েরই মঙ্গল।

প্রথম রাসবিহারী বসুর কথা, ভারতবর্ষের বিপ্লব যুগের অন্যতম নেতা রাসবিহারী বসু দিল্লীতে পাঞ্জাবে বেনারসে—একটীর পর একটী আগুন জ্বালাইয়া, অবশেষে ভারতবর্ষে অবস্থান করা যখন তাঁহার পক্ষে নিরাপদ বোধ করিলেন না, তখন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই বা অন্য কোন কারণেই হউক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাজশক্তির অগোচরে জাপানে চলিয়া গিয়াছিলেন। আজ প্রায় ছয় বৎসর জাপানে বাস করিয়া তাঁহার স্বদেশানুরাগ উথলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এবার আর তিনি বিপ্লববাদী পুরাতন রাসবিহারী বসু নন, তাঁহার বন্ধুর নিকট যে সমস্ত পত্রাদি দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার অন্তর-পরিবর্ত্তনের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি; গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ এবং সুবিধা দেন, তিনি যখন আসিবেন তখন নূতন হইয়াই আসিবেন। নূতন অধ্যাত্ম সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক সহায়তা করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এদিকে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা রোগ শয্যায় শায়িত, ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশঙ্কাও করিতেছেন, রাসবিহারী বসু যদি এ সময় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন, তাঁহার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে হয়ত একবার দেখিবার সুযোগ পাইবেন। রাসবিহারী বসু তাঁহার বন্ধু শ্রীমতিলাল রায়কে তাঁহার সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য লেখায়, মতিবাবুও তাঁহার কথামত আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন, এখন শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার মুক্তি সংবাদ আসিলে, তাঁহার পিতা একটু শান্তিলাভ করিতে পারেন।

তারপর অমৃতলাল হাজরার কথা। ইনি রাজা-বাজার বোমার মামলায় ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছিলেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আট বৎসরের অধিক কাল তাঁহার দ্বীপান্তরে কাটিয়াছে। সম্প্রতি আন্দামান দ্বীপ হইতে আমরা তাঁহার যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহারও মনের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ দ্বীপান্তর বাসের পর তিনি গত ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীমতিলাল রায়ের একখানি পত্র পাইয়া প্রাণে নূতন আশা পাইয়াছেন, হতাশার পর আবার যেন মরা গাঙ্গে জোয়ার আসিয়াছে, আন্দামানে অবস্থান কালে তিনি কয়েকখণ্ড প্রবর্ত্তক পাঠ করিয়া যে নূতন আলোর সন্ধান পাইয়াছেন, সেই আলোকেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন আলোকিত করিতে চান। তাঁহাকেও অচিরে মুক্তিদান করিলে গভর্ণমেণ্টের তাঁহার নিকট হইতে আশঙ্কা করিবার কোন কারণ থাকিবে না, ইহাও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু আন্দামান দ্বীপের চীফ কমিশনারের কার্য্য দেখিয়া আমরা নিতান্তই স্তম্ভিত হইয়াছি। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাইয়া মতিবাবু অমৃত-লাল হাজরাকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী তিনি মুক্তির জন্য স্থানীয় চীফ কমিশনারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু চীফ কমিশনার তাঁহার মুক্তি

বিষয়ে কোন আদেশ দেন নাই, বা তাঁহার আবেদন ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণও করেন নাই। ইহা বাস্তবিকই নিদারুণ কঠোর ব্যবহার। তবে অমৃতলাল সম্প্রতি জেলের বাহিরে আন্দামান দ্বীপে বসবাস করিবার অধিকার পাইয়াছেন। বিচক্ষণ বড় লাট বাহাদুরকে আমরা ইহাঁর বিষয় জানাইতেছি, তিনি যেন ইহার বিষয় অচিরে সুবিচার করিয়া সম্রাটের ঘোষণাবাণীর সম্মান রক্ষা করেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি নিরুদ্দেশ, মাস চারি মাস পূর্ব্বে আমরা তাঁহার খবর পাইয়াছিলাম, তাহাতে কোন ঠিকানা বা খবর কিছুই ছিল না, এই কয়েক মাস যাবৎ আমরা ... একটু বিশেষ মন দিয়াও উহার সম্বন্ধে কোন খবর পাইতেছি না। তাঁহার বিষয়ে আমরা ... কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আশ্বাসবাণী পাইয়াছি কিন্তু তাঁর অবস্থান বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বড় নিরাশাভাব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তিনি কি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন না। তিনি ব্যতীত আরও কয়েকজন আছেন, যাহারা তাঁহারই ন্যায় বনে জঙ্গলে দিনাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার পত্র পাঠ হইতে যেমন তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে পরিচয় পাইয়াছি এইরূপ আরও দুই চার জন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। গভর্ণমেণ্টও যখন শান্তই ইহার একটা সুমীমাংসা করিতে চান, তখন ব্যাপারকে অধিক দিন বিলম্বিত না করিয়া, যদি Royal Clemencyর ঘোষণাপত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সকল পলাতক আসামী সম্বন্ধে সাধারণভাবে ক্ষমা (amnesty) ঘোষণা করেন, তাহা হইলে সকল পলাতক যুবকই কোনরূপ আশঙ্কা না করিয়াই স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দভাবে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক দেশের কোলে ফিরিয়া আসিয়া সমাজ, ধর্ম্ম এবং স্বদেশের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। আমাদের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে হয়। আর যাহারা এখনও কারাগারে বা আন্দামানে দিন কাটাইতেছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট যেন সাধারণভাবে ক্ষমা ঘোষণা করিয়া সকলের মুক্তিদান করেন। যে পথই অবলম্বন করুন সকলেই উচ্চ দেশসেবার অভিলাষ লইয়া কর্ম্মতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, আবার তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া সমাজের হিতার্থে কর্ম্ম করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আর একটী কথা গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের বলিবার আছে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কোন কর্ম্মই গুপ্ত নহে। প্রকাশ্যভাবে শিক্ষা, সমাজ এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সকল সাধক আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁহারা দেশের সর্ব্বত্র প্রকাশ্যভাবে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতেছেন এবং অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন। এরূপ অবস্থায় পুলিস আমাদের সকল কার্য্য কেন সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে তাহা বুঝি না। সম্প্রতি অতর্কিতভাবে আমাদের ময়মনসিংহ জেলায় মেলেন্দাহ বিদ্যাপীঠে পুলিস হঠাৎ উদয় হইয়া কেন খানাতল্লাসী করিলেন, তাহা একটা গূঢ় রহস্য। বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে কোন বিপ্লবভাব শিক্ষা দেওয়ার আশঙ্কা পুলিস রাখেন নাকি? ইহা হইতে আমাদের মনে হয়, অধস্তন কর্ম্মচারীদের অতি কার্য্যতৎপরতার জন্য এরূপ হইয়াছে। উচ্চ কর্ম্মচারীবৃন্দ এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের অধস্তনদিগের এই কর্ম্মতৎপরতা এখন হইতেই যদি বন্ধ না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জটিলতার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকিতে পারে। সকল কথাই আমরা খুলিয়া লিখিলাম, এখন গভর্ণমেণ্ট সকল বিষয় সুবিচার করিলেই আমরা সুখী হইব।

সমালোচনা

—:•:—

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ—শ্রীঅনাথ নাথ বসু প্রণীত—প্রকাশক—ইউনিয়ন বুরো। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

শিশির কুমার—গত যুগের বাংলার অন্যতম শিরোমণি। সেই যুগের বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর দানের তুলনা নাই। আজও অমৃত বাজার পত্রিকাখানি কলিকাতার জাতীয় দলের কণ্ঠভূষণস্বরূপ তাহার সাক্ষী বহন করিতেছে। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য—এই মহাবোধটুকুও যখন একেবারেই সুপ্ত ছিল, সে সময়ে শিশির কুমার তাঁর স্বদেশগত-প্রাণ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত এই রাষ্ট্র চৈতন্যের স্ফুরণে অপূর্ব্ব শ্রম ও কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। লোকমান্য তিলক মহারাজ যাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধনে অগাধ শ্রদ্ধা করিতে পরম গৌরব অনুভব করিতেন—ভারতের রাষ্ট্রজাগরণে তাঁহার আবদান সত্যই যে মহামূল্য, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? নীরবে নিষ্কাম হৃদয়েই শিশির কুমার দেশযজ্ঞে তিল তিল করিয়া জীবনাহুতি দিয়া গিয়াছেন—শিশির কুমার ছিলেন গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগী; এমন অক্লান্তকর্ম্মা নির্ভীকহৃদয় বীরকর্ম্মী সকল আদর্শরূপে উদয় না হইলে সত্য দেশোন্নতি নাই। বাঙ্গালী আজ স্বদেশ-সাধনে যে সমুচ্চ স্থানারূঢ়, তাহার পশ্চাতে যে সব অপরূপ উৎসর্গনিষ্ঠা ও তপশ্চর্য্যা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, শিশিরকুমার, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় তাহার অনেকখানি যোগান দিয়াছেন—অথচ এমন সরল, স্পষ্ট সাত্ত্বিকতায় ভরা সে তপঃনিষ্ঠা, এমন নীরবে নিরাড়ম্বরে তাঁহার সেই নিরবচ্ছিন্ন উৎসর্গানুষ্ঠান। শিশিরকুমারের জীবনীর সঙ্গে বাংলার অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত—সেই নীল হাঙ্গামা, সেই স্বায়ত্তশাসন প্রচেষ্টা, সেই ইলবার্ট বিল—শিশিরের নির্ভীক লেখনী দেশের ভাগ্যচিত্রে কত রেখাঙ্কনই না করিয়া গিয়াছে। প্রথম কংগ্রেস গঠনকালে শিশির কুমারের অভিমতটি উল্লেখযোগ্য—"যাহারা দেশের প্রকৃত শক্তি, সেই সাধারণ জনসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া জাতীয় মহাসমিতি গঠনের চেষ্টা ভিত্তিহীন প্রাসাদ নির্ম্মাণ চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল হইবে।" শিশির কুমার নিজে ছিলেন আদর্শ লোকসেবক। আজ মহাত্মা গান্ধীর তপস্তেজে কংগ্রেসের ভাব পরিবর্ত্তন না হইলে—সেই অপূর্ব্ব লোকসেবকের কথাগুলিও বর্ণে বর্ণেই ত সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান্ ভারতবর্ষকে অন্তরমুখী করিয়া তুলিতেছেন, তাই রক্ষা।—শিশিরকুমারের জীবনীলেখক বিপুল তুলিকায় বিশদ ভাবেই তাঁহার জীবনকথাগুলি আদ্যোপান্ত সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কৃতকার্য্যও হইয়াছেন বলিতে পারি। আর তাঁর সেই ধর্ম্মজীবন—শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত ভক্তের সে অপূর্ব্ব কাহিনী—তাহা ত সমালোচনার সামগ্রী নহে—অমিয় নিমাই চরিতের শিশির কুমার বাংলার হৃদয়মণি হইয়াই চির পূজ্য আছেন ও রহিবেন—সে কি আর বলিতে হইবে? গ্রন্থখানির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

প্রবর্ত্তক

ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ আষাঢ়, ১৩২৮ [ত্রয়োদশ সংখ্যা

উদ্যোগপর্ব্ব

:·:

৩০শে জুন ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হইয়াই থাকিবে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ পর্ব্বের উহা একটা পরিসমাপ্তির দিন। কোটি টাকা দেশের পক্ষ কোষে সংগৃহীত হইল। কোটি মানুষের হৃদয় স্বাক্ষর সম্বলিত জাতীয় মহাসভার সভ্যতালিকাও প্রস্তুত হইল। বিশ লক্ষ চরকাও ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। সুনিপুণ সেনাপতির ন্যায় গান্ধী দেশকে ব্যূহবদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছেন। মহাত্মার উদ্‌ঘোষিত অধ্যাত্ম যুদ্ধ এইবার কোন ধারায় পরিচালিত হইবে, উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে দেশ ও জগৎ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব ইত্যাদি। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এ এক অভিনব যুগপর্ব নয় ত কি?

এ যুদ্ধের বাহিরের উদ্দেশ্য ভারতের রাষ্ট্রভাগ্য পরিবর্ত্তন। কংগ্রেসের স্বরাজ্য রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র—বাহিরের শৃঙ্খলা—জাতির জীবন সংগ্রামে এরূপ বহিঃশৃঙ্খলারও প্রয়োজন আছে—দেশের প্রকৃতিই এরূপ রাষ্ট্ররাজ্য স্বাধিকারগত করিতে চাহিয়াছেন—তাই মহাত্মা গান্ধীর মত ধার্ম্মিক সভ্যতার জন্মশত্রুও আজ দেশাত্মার বর্ত্তমান স্বভাবের সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়া পার্লিয়ামেণ্টারী স্বরাজতন্ত্রই তাঁহার জাতিগত সাধনার উদ্দেশ্যভূত করিতে বাধ্য হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ভিতরের দৃষ্টিটুকু কুড়াইয়া তোলাই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য তাঁহার প্রেরণার মূলে জাতীয় আত্মশুদ্ধির পুণ্য সঙ্কল্পই বিদ্যমান, এই কথাটুকুই তাঁহার ভাষায় ও কর্ম্মে মুহুর্মুহু প্রকাশ হইয়া পড়ে, তপস্বী সাধক জাতিকে তাঁহার তপোমন্ত্রেই আসলে উদ্বুদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, সকল বহিরায়োজনের ভিতর দিয়া এই মূল অন্তর লক্ষ্যটির উপরেই যদি এই আত্মবিস্মৃত জাতির দৃষ্টিটুকু কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠে, তবেই মহাত্মাজীর তপস্যার প্রকৃত সাফল্য—নতুবা ভয় হয় "কাদা ঘাঁটাই সার হ'লো মাছ ধরা আর হ'লো না"—বলিয়াই মহাত্মাজীর সঙ্গে জাতির অন্তর-পুরুষকেও একদিন ব্যর্থতার বৃশ্চিক দংশনে করুণ-করুণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিতে না হয়।

কথা হইতেছে—এই যে বিরাট উদ্যোগপর্ব্ব, এই যে তীব্র যুদ্ধঘোষণা, আসলে আমরা চাই কি?

বাহিরের দিক দিয়া বলিতে হইলে, কথা বেশী কিছু নহে; ভারতবাসী আমরা চাহি জালিয়ানওয়ালাবাগের যথেষ্ট প্রতিবিধান ও ক্ষতিপূরণ, হিন্দু মুসলমানে চাহি আমরা খলিফতের যোগ্য প্রতিষ্ঠা, চাহি আমরা ভারতের স্বরাজ, স্বাধিকার, এই বৃটিশ আমলাতন্ত্র আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তৎস্থলে জাতীয় আত্মশাসন-তন্ত্রের পরিপূর্ণ প্রবর্ত্তন—national self-government ই আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য। চিত্তরঞ্জন যখন বলিলেন—স্বরাজ স্বরাজই, swaraj is swaraj তাঁহার আবেগপূর্ণ কথার ভাবমগ্ন ভাবে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলাম বটে, কিন্তু জাতির মনীষা-বুদ্ধি তাহাতে ত পরিতুষ্ট হয় নাই, হইবার নয়, চিন্তাশীল বিপিনচন্দ্র যখন রাষ্ট্রীয় স্বরাজতন্ত্রের পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বুদ্ধির তাহাতে কথঞ্চিৎ সায় সম্ভব পর হইলেও, জাতীয় হৃদয়ের সহিত তাহার মর্ম্মাত্মক যোগ খুব অল্পই খুঁজিয়া পাওয়া গেল, ফলে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই জাতি কর্ত্তৃপথে অগ্রসর হইতেছে, সরল ও ঋজু রেখাটি আজিও স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হইয়া জাতীয় চিৎ-ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার উপর যখন মহাত্মাজির কণ্ঠে অগত্যা পার্লিয়ামেণ্টারী গবর্ণমেণ্টেরই অনুকূল সম্মতিসূচক অভিমতটুকু বাহির হইল, তখন আমরা স্তম্ভিত না হইলেও, ভারতের ভাগ্যদেবতার অদৃষ্ট পরীক্ষা সম্বন্ধে মুহূর্ত্তের জন্য একটু সংশয় ও শঙ্কাসঙ্কুল হইয়াই উঠিয়াছিলাম—ইহা স্বীকার না করিলে মিথ্যা কথাই বলা হইবে।

আমাদের আধিকার করিতে হইবে, এই দ্বন্দ্বের মূল কি, সত্যই আমরা কেন এমন দোদুল্যচিত্ত, জাতি যে সব আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে জাতিরই অন্তরাত্মার একটা অকুণ্ঠ ও পরিপূর্ণ সায় কেন ফুটিয়া উঠিতেছে না, ফুটি ফুটি করিয়াও জাতির ইচ্ছা ও জ্ঞান, আদর্শ ও উপস্থা কেন এখনও নির্দ্বন্দ্ব মিলন খুঁজিয়া পায় নাই, আমরা চাই জাতির বহিঃ-সমস্যার মীমাংসা, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই ভিতরের অন্তর-সংগ্রামটুকুর একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া লইতে না পারিলে, যজ্ঞ ত নিরঙ্কুশ হইবে না, বাহির ভিতরেরই প্রতিচ্ছবি, অন্তরে ক্ষত থাকিতে বাহিরের প্রলেপ-লেপন বিশেষ স্থায়ীরূপে কার্য্যপ্রসূ হইবে না, ইহা বালকেরও অধিগম্য। এই সংগ্রাম মুহূর্ত্তে, 'প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে', আমরা উভয় পক্ষীয় সেনামধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনের মত ব্যাকুল প্রশ্নেরই সর্ব্বাগ্রে চরম নিষ্পত্তি করিয়া লইতে চাই নতুবা অন্ধপথে অন্তরস্থ সংশয় আনিয়া মহাযজ্ঞ পণ্ড করিতে আমরা একেবারেই রাজী নহি। জীবন যোগেরই লীলাভূমি, জাতির বিস্তৃত জীবনক্ষেত্রে আজ যে অপরূপ যোগলীলা প্রকট হইতে চাহিতেছে তাহা নিশ্চিতভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, অংকর্মবাদনাস্তিত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই পাঠ ও সংশ নির্দ্দেশটুকু জানিতে পাইতে হইবে।

এই জন্যই আমরা চাই প্রথমে আত্মদর্শন। জাতি আজ অনেক যে সাধুবাদ ইহাদের একটা বর্ণও মিথ্যা নয় শুদ্ধি বাহিরকে মুক্তি হয় না, সেই জন্যই ত মহাত্মা। মহাত্মার দক্ষিণ আত্মশুদ্ধির মন্ত্রবচনই শুনাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আমরা এই তপোমন্ত্রের পরিপূর্ণ সাধনাই চাই জাতিকে আত্মজ্ঞানে শুদ্ধির সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। একেবারে আমূল অন্তর-পরিবর্ত্তনই আমাদের অভীষ্ট সাধ্য, কেন না মানুষের মত জাতিও আসলে একটা গোটা ও অবিভাজ্য সত্তাবস্তু, এই অখণ্ড জাতি মানুষ—গোটা দেশাত্মাটিরই পূর্ণ আত্মশোধনের প্রবল সঙ্কল্প আমাদের মধ্য দিয়া মূর্ত্তি হইতে চাহিতেছে, জাতির শুধু রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনটুকু নয়, সে ত বাহিরের বেশান্তর, সে ত হইবেই, হইতে বাধ্য, ভিতরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাহিরেও তাহার রূপ ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িবেই, কিন্তু ধর্ম্মে কর্ম্মে সমাজে শিক্ষাদীক্ষার জীবনের

সর্ব্বাঙ্গীন সাধনার মধ্য দিয়াই এই নূতনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না হইলে ভারতের ব্রত একেবারেই অপূর্ণ রহিয়া যাইবে—চাই জাতি-সত্তার আমূল রূপান্তর গ্রহণ—অখণ্ড পরিবর্ত্তন যোগেই লভ্য।

তবে এ যোগ, যাহা আমরা বারে বারে শতচ্ছন্দে কহিতেছি, ব্যক্তিগত যোগ নয়, ব্যক্তিসাধনায় ব্যক্তিগত মুক্তিই অধিগম্য, আমরা ব্যক্তিমুক্তির জন্য বিন্দু লালসা রাখিতে চাই না, ভারতবর্ষের যে যুগান্তরের সাধনায়, এ তো আজ স্পষ্ট ও প্রমাণিত সত্য [illegible] আত্মা [illegible] নিশ্চয়ক, [illegible] ইচ্ছাতেও আমরা জন্ম মরণের সঙ্গে বন্ধন খুলিবার পথ [illegible] সেই আশা [illegible] [illegible] ভারতবর্ষে হইয়াছে তাই এবার সেই আত্মার জাগরণের জন্য এই ভারতবর্ষকেই আবার ভগবান চিহ্নিত করিয়া লইয়াছেন, [illegible] সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠান করিয়া ভারতবর্ষেই দেখাইতে হইবে। তাহার জন্য সর্ব্বপ্রথম কাজ [illegible] আত্মদর্শন।

ভারতবর্ষ ইউরোপের মত জাগিবে না—ভারতের আত্মা একটা অনন্যসাধারণ স্বতন্ত্র ব্রত লইয়াই অধিষ্ঠিত, সেই ব্রত ভঙ্গ করিলে চলিবে না, প্রথমতঃ [illegible] সম্ভবই হইবে না, ভুল শতবার সহস্রবার হইতে পারে, কিন্তু সহস্র এক বারে দারুণ বজ্রাঘাতেই সে ভুল ভাঙ্গিতেই হইবে, ভাঙ্গিবেই, কেন না, আত্মার জন্মনিষ্ঠাকে চির ব্যর্থ করিতে পারে, এমন চরম অভিশাপ বিধাতার ভাণ্ডারেও নাই, আমাদের কেবল দেখিতে হইবে, ভুল করিবামাত্রই যেন সংশোধন করিয়া লইতে পারি, অভিজ্ঞতার শিক্ষা মর্ম্মে মর্ম্মে মাখিয়া লইয়া তাহার আলোকে স্বচ্ছ সত্য দৃষ্টিটিকেই দিনে দিনে জাগরূক করিয়া ধরিতে পারি, এবার ভারতের জাগরণ যেন মহাজাগরণই হয়, ভগবানের ইচ্ছাই তাই, সেই অবার্থ ও মহতী ইচ্ছার সহিত আমাদের জাতীয় সমষ্টি-ইচ্ছাটিকে যেন ঠিকে ঠিক দিয়াই চলিতে শিখি। ভারতের সত্তায় ভগবানের কোন্ ইচ্ছাটুকু ফুটিয়া উঠিতে চায়, সেইটুকুকে জানা ও পাওয়াই আত্মদর্শনের প্রথম ও মৌলিক অনুষ্ঠান। আর সব ইহারই আনুষঙ্গিক অনুকরণ প্রকরণ মাত্র।

জাতিকে সর্ব্বাগ্রে আমরা এইখানেই দৃষ্টি নিয়োগ করিতে বলি. ভারত শক্তির প্রাণ ও মর্ম্ম হইতেছে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম আর কিছুই নয়, বাহ্য ও অন্তঃকরণগুলির উপরে যে দিব্য স্বভাবটি ঝলমল করিতেছে সেইটিকেই [illegible] ধরা, তাহাকেই জাগরিত হওয়া, সেইখানে বাহির ও ভিতর সবটুকুকেই উঠাইয়া লওয়া—নূতন ও অলৌকিক ভাবের পরিবর্ত্তন পাইবে [illegible] সেইখানেই। ভারতবর্ষ পশু শক্তির সহায়ে জাগিবে না ইহা যেমন সত্য কথা, মহাত্মা গান্ধীর কল্যাণে এ কথা যেমন আজ সেরূপ অবিশ্বাসযোগ্য হওয়া আর নাই, তেমনি ইহাও আমাদের জানিতে হইবে, প্রমাণ করিয়া তুলিতে হইবে, জাতীয় জীবনে পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, যে আমাদের সত্য মুক্তির জন্য মানসবল ও নৈতিক বলই যথেষ্ট নহে, মানস-রাজ্য স্বপ্নরাজ্যই, নীতির শক্তি খণ্ড শক্তিই, ভারত অনন্তের উপাসক, সত্য-সূর্য্যের পূর্ণ প্রকাশই তাহার অন্তর ঠাকুরের একান্ত লক্ষ্য—soul force ই ভরসা নিঃসন্দেহে, আত্মাত্মবলম্ পরম বলমেব— কিন্তু সে আত্মবল প্রকৃত কি তাহা বুঝিবার জন্যও গাঢ় তপস্যারই আদেশমন্ত্র আসিতেছে, সকল স্থূল উপায় ও সূক্ষ্ম উপায়ের পিছনে অন্তরালে—যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়করী মহাশক্তির লোল ইচ্ছা শাণিত খড়্গের ন্যায় ঝক্ ঝক্ ঝুলিতেছে—সেই দীপ্ত বিজ্ঞান-খড়্গেই আমাদের বন্ধন মোচন করিতে হইবে। অধ্যাত্ম যুদ্ধ—কথাটি খুবই সত্য কথা—কিন্তু জাতিকে তাহার মর্ম্মার্থ টুকু ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

সংশয় মহাশত্রু, সংশয়ই ত সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন তুলে, গান্ধীর নৈতিক ও মানসযজ্ঞও এতদিন গাঢ় সংশয়েরই বক্ষ ছিল, আজ তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্যোগ-সাফল্যে চমৎকৃত কে নয়, স্বয়ং পণ্ডিত মদনমোহনও আজ আবার ভারত-সিংহের কণ্ঠগর্জ্জনে যোগদান করিলেন, বিলাতে কমন্স সভার সভাপতি কণ্ঠই না বিচলিত, প্যারীতে ডিউক অব কনটের মুখেও এমন কথা বাহির হইয়া পড়িল—এ জাতিকে কে আর দাবিয়া রাখিতে পারিবে—জাতির স্বাধীনতা সঙ্কল্প যখন এমন অটুট ও অখণ্ড ঐকাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-পুলতাত ভারত ভ্রমণান্তে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত পূর্ব্বই গভীর তম রেখাপাত করিয়াছে সন্দেহ নাই একটা বিরাট জাতির এমন ব্যূহবদ্ধ বয়কটে তিনি পরম চমৎকৃত স্পষ্টই বুঝা যায়, ভারতের বৃহৎ নগরনগরীগুলির মধ্য দিয়া যখন তিনি শোভাযাত্রা করিলেন, ১৮৭০ সালে বিজয়ী জর্ম্মণ আগন্তুকগণের ন্যায়, কৌতুক ছলেও জানালা খুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে কেহ বড় উৎসুক হয় নাই। ভারতের ঐক্য সঙ্কল্প ও জাগরণ উদ্যমে ফরাসী মন্ত্রীপ্রবর মঁসিয়ে ক্লেমেন্সোরও প্রশংসোক্তির কথা জনশ্রুতি মুখে পরিশ্রুত হওয়া যায় গান্ধীজির আরব্ধ শ্রদ্ধা-যজ্ঞেরই যখন এতখানি প্রত্যক্ষ সাফল্য, ভারতের অধ্যাত্ম শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে কি এমন সংশয় ও অবিশ্বাস থাকিতে পারে, তাহাতেই বরং আমাদের মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ আজ মহত্তর জ্ঞান যজ্ঞই চাহিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অধ্যাত্ম সংগ্রামেই জয়যুক্ত হইতে হইবে—কিন্তু জয়মন্ত্র মনের মধ্যে নাই, মন, প্রাণ, শরীরের জাগরণে সারা বিশ্ব ত জাগিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মানবজাতির শান্তি ও পরিপূর্ণ মুক্তি নাই কেন—ইহাই প্রশ্ন—পাশব শক্তির তুলনায় মনঃশক্তি উচ্চতর সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই আমাদের সবখানি নয়—মনের দাবী প্রাণের শরীরের উপর সম্পূর্ণরূপে খাটে না—চিন্তায় মনে মুক্তি চাই, কিন্তু তারও উপরে যে বিজ্ঞান-শক্তি, জাতি সেই অলৌকিক দিব্যশক্তির পরিচয় ও সহায়তা না পাইলে, জাতির মনেরও প্রকৃত মুক্তি নাই জীবনের বাহিরের মুক্তির কথা ত ছাড়িয়াই দাও। এই বিজ্ঞাননিয়ন্ত্রিত নূতন কর্ম্মতন্ত্রই শ্রীঅরবিন্দের প্রকাশ্য। ধীরে ধীরে অথচ অব্যর্থ ক্রমে আমরা সেই অমোঘ ও সিদ্ধ কর্ম্মতন্ত্রটি জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছি। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম ও মুখ্য আশা বাঙ্গালীরই উপর, বাঙ্গালা জাতিকে এই নূতন কর্ম্মতন্ত্র পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে

উত্তেজনাপ্রিয় দেশ একটা গমগমে আবহাওয়ার মধ্যেই বেশ তাজা থাকে—এইটাই হইয়া উঠিয়াছে আমাদের জাতীয় স্বভাব। সে সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি সকলক্ষেত্রেই—স্বভাবকেই প্রশ্রয় দিয়া দিয়া জাতি এ পর্য্যন্ত কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু আর এই-রূপ অগ্রসর হওয়া সমীচিন নহে—বাহিরের injection না লইয়াও যাহাতে আমরা গরম থাকিতে পারি, তাহারই আয়োজন এইবার একনিষ্ঠ ভাবেই করিতে হইবে। সে আয়োজন আর কিছুই নয়—সত্যকে নিষ্মম ভাবেই ফুটাইয়া তোলা—মনে রাখিতে হইবে সংগ্রামেই আমরাও রত আছি—কিন্তু এই উদ্যোগপর্ব্বে একটা কথা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না—ভারতজাতিকে প্রস্তুত হইতে হইবে স্বরাজেরই জন্য নয়, স্বরাজ যে আমরা চাহি না এমন কথা বলা বাতুলতা মাত্র, স্বরাজের, রাষ্ট্রীয় স্বরাজেরও একটা গৌণ ও সাময়িক প্রয়োজনও থাকিতে পারে—নহিলে দেশাত্মা তাহা চাহিবে কেন—কিন্তু ইহাকেই যদি আমরা একান্ত করিয়া ধরি, আসল লক্ষ্যটির সঙ্গে সঙ্গে আসল পথটি হইতেও আপনার অজ্ঞাতসারেই বিচ্যুত

হইয়া পড়িবই—জাতির যে ভাগবত উদ্দেশ্য ও ব্রত, উহারই পথে তাহাতে অনর্থক কালবিলম্ব ঘটিয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য নয়—উহা একটা উপায়, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। মানবের সত্য মুক্তি ও পূর্ণত্বই আমাদের লক্ষ্য—আজিকার এই তপঃশক্তি যাহাতে শুধুই ধ্বংস সম্বন্ধে ব্যয়িত হইয়া না যায় তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে—নূতন সৃষ্টিই আমরা চাই—নির্মাণেরও নিখুঁত চিত্রটুকু, যতটুকু পাওয়া যায় নয়, সম্পূর্ণভাবেই আঁকিয়া তুলিয়া আমাদের এই অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হইতে হইবে—নতুবা শিবহীন দক্ষযজ্ঞই হইবে পরিণাম।

দেশের জনসাধারণ সহজে আমাদের এই মহান দর্শনের মর্মকথা আজই উপলব্ধি করিতে পারিবে না—সেই জন্যই ত একমুঠা মানুষকে একেবারে নূতন অন্তঃকরণ লইয়া সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। প্রথম যোগ, তার পর এই সংঘ, এমন কত সহস্র লোকের মধ্যে যোগের বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে শতজন দিব্য মানুষ অখণ্ড বোধে অনন্ত কাল অসীম ধৈর্য্যে এই সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিবে—কে জানে? জাতির মধ্যে এই যোগপ্রকাশ বিস্তৃত ভাবে প্রচার করিবার জন্যই আমাদের এই বিপুল শিক্ষা ও অর্থ-যজ্ঞ—ইহারই উপরে জাতির দৃঢ় ও স্থায়ী স্বরাজ প্রতিষ্ঠান নির্ভর করিতেছে। জাতি এখনও মুগ্ধ একটা খণ্ড আদর্শে—জীবনগতির একটা নির্দিষ্ট রেখায়—কেন না ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতাই তার স্বভাব। স্বরাজ আদর্শের জন্য যে আন্দোলন তরঙ্গ তাহাতেই যদি সে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আদর্শটুকুও অচিরে ব্যর্থ হইয়া পড়িবে—আমরা কোনও আদর্শের অনুগত করিয়া জাতির জীবন-লীলাকে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহি না—অগ্রে আদর্শ নয়, উদ্দেশ্য নয়, অগ্রে চাই একদল নূতন মানুষ—যোগী, তপস্বী, সাধক—ভারতের সনাতন শক্তি যাহাদের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। ইহারাই নূতন শিক্ষায় নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবে—বিপুল ও সংহত জীবন প্রতিষ্ঠান রচিয়া ভারতের সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়া ধরিবে।

শিক্ষা

—০—

প্রথম, মনের শিক্ষার কথা।

মানসিক শিক্ষা—বুদ্ধি ও সংস্কারগত।

তারপর হৃদয় বা চিত্তের শিক্ষা।

তারপর প্রাণের শিক্ষা।

তারপর দৈহিক শিক্ষা।

সকল শিক্ষার শেষে থাকিবে অধ্যাত্মশিক্ষা।

সকল শিক্ষার মধ্যে থাকিবে অধ্যাত্মশিক্ষা।

প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার মধ্যে যতটা থাকিবে অধ্যাত্মশিক্ষা ততটা প্রত্যেকে পূর্ণ ও সার্থক।

প্রত্যেক শিক্ষার মধ্যে যতটা অধ্যাত্মশিক্ষা প্রকট হইয়া উঠিবে ততটা সেই শিক্ষা মুক্ত, স্থায়ী ও মঙ্গলকর হইবে।

প্রত্যেক শিক্ষা যতটা অধ্যাত্মশিক্ষার দিকে লইয়া যাইবে ততটা সেই শিক্ষা সার্থক।

প্রত্যেক শিক্ষা যতটা অধ্যাত্মশিক্ষার পথ সরল ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিবে ততটা সেই শিক্ষা প্রযুক্ত।

যে শিক্ষা আত্মার উদ্বোধনের সহায় নয় তাহা অশিক্ষা। যে শিক্ষা আত্মিকশিক্ষার পথের অন্তরায় সে শিক্ষা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

* * *

কিন্তু প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার আছে একটী একটী বিশিষ্ট ও স্বপ্রতিষ্ঠিত সার্থকতা।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলে মৃত্যুই আসিবে।

মনের যে শিক্ষাপদ্ধতি, আধ্যাত্মিকশিক্ষাপদ্ধতি হইতে তাহা একেবারেই ভিন্ন।

চিত্তের যে শিক্ষাপদ্ধতি তাহা মনের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে একেবারেই ভিন্ন।

প্রাণের ও দেহের যে শিক্ষাপদ্ধতি তাহাও বিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তরের একটী একটী স্বধর্ম্ম ও স্বভঙ্গী আছে। প্রত্যেক দেহের একটী একটী বিশিষ্ট ন্যায় (Logic) আছে।

সেই ন্যায় ও ভঙ্গী ও ধর্ম্মানুসারেই বিশিষ্ট স্তরের বিশিষ্ট শিক্ষা দিতে হইবে। Mental Logic মনের যে ন্যায় তাকে মানসিক ন্যায় বলে। চিত্তের যে ন্যায় তাহাকে চৈত্তিক ন্যায় বলে। (Sentimental Logic)।

প্রাণের যে ন্যায় তাকে প্রাণিক ন্যায় (Vital Logic) বলে। দেহেরও বুঝিবার, অধিকার করিবার একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে।

আত্মারও বুঝিবার পাইবার বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে।

* * *

মন বুঝে, অনুমান প্রমাণ ও Generalisation সহায়ে। চিত্ত বুঝে সংস্কার ও অনুভূতি দিয়া। প্রাণ বড় হয় জলিয়া জলিয়া। দেহ বড় হয় কর্ম্ম করিয়া ও জড়াইয়া ধরিয়া। আত্মা সত্তা দিয়া জানে ও পায়। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি থাকিলেও সকলের মূল Conditions ও ভিতরের কথাটি এক।

* * *

আত্মার জানিবার পদ্ধতি গাঢ় হইয়া তাহার একাংশের অধিক প্রকটতায় জন্মে মানসিক শিক্ষাপদ্ধতি। মন আত্মার একাংশের অধিকতর বস্তুতন্ত্রস্বরূপ। আত্মার পদ্ধতির একাংশ জমাট হইয়া অনুভূতি দিয়া জানার ভঙ্গীটীর সৃষ্টি করিয়াছে। চিত্ত আত্মার একাংশের আরও গাঢ়তর স্বরূপ। প্রাণের শিক্ষাপদ্ধতি আত্মার একাংশের জানিবার বিশিষ্টস্বরূপ। দেহের শিক্ষাপদ্ধতি আত্মার একটী ভঙ্গীর বিশিষ্ট ও গাঢ়তম স্বরূপ। সকল পদ্ধতি ও জানাই পরস্পরের ধারা পথ।

* * *

শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মাকে সকল স্তরে সার্থক করিয়া তোলা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য দেবজীবনকে মানব আধারে ফুটাইয়া প্রকাশ করা। এই শিক্ষার প্রকাশে ভগবান মূর্ত্ত হইয়া উঠিবেন।

ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়া অনন্তের দিকে অভিযান— ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টির জন্য জীবনধারণ—প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়ের জন্য সঙ্ক- উচ্চ হইতে উচ্চতরের দিকে প্রয়াণ করিতে যাহা শিখায় তাহা হৃদয়ের শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।

* * *

হৃদয়ের শিক্ষার দ্বারা ছাত্র অর্জ্জন করিবে—বীরত্ব ও প্রেম। হৃদয়ের শিক্ষায় আরও জাগিয়া উঠিবে বোধ (Intuition) ও অনুভূতি। হৃদয়ের শিক্ষার জন্য ছাত্রকে বীরত্ব, প্রেম ও বোধের আবেষ্টনে (atmosphere), লীলানিকেতনে রাখিতে হইবে। শিক্ষার জন্য চাই হাওয়া (atmosphere)। ছাত্র দেখিয়া, শুনিয়া, অনুভব করিয়া, অভ্যাস করিয়া বীরত্ব ও প্রেম অর্জ্জন করিবে। এমন হাওয়া তৈরী করিতে হইবে, যাহার ভিতর থাকিলে ছাত্র আপনা আপনি

সেবা করিতে, সহানুভূতি করিতে শিখিবে। এমন হাওয়া তৈরী করিতে হইবে যাহার ভিতর থাকিলে ছাত্র স্বতঃই বীর হইবে।

এমন হাওয়া বিদ্যাপীঠে প্রবাহিত হইবে যেখানে দুর্ব্বলও বল পাইবে, ভীরুও সাহস পাইবে, স্বার্থপরও ত্যাগী হইবে—আপনার গণ্ডী পরিবর্দ্ধিত করিয়া। সেবা করিয়া করিয়াই ছাত্র সেবা করিতে শিখিবে। ভালবাসিয়া বাসিয়াই ছাত্র ভালবাসিতে শিখিবে। শ্রেয়ের দিকে ছুটিয়া ছুটিয়াই ছাত্র শ্রেয়কে পাইবে। বীর হইয়া হইয়াই বীর হইতে শিখিবে।

প্রথমে দেখিবে তাহার শিক্ষক বীর তবে ছাত্র বীর হইবে।

প্রথমে দেখিবে তাহার সহপাঠী বীর, তবে ছাত্র বীর হইবে।

প্রথমে দেখিবে তাহার শিক্ষক প্রেমিক, তবে ছাত্র প্রেমিক হইবে।

প্রথমে দেখিবে তাহার সহপাঠী প্রেমিক তবে ছাত্র প্রেমিক হইবে।

হৃদয়ের সকল গুণই ছাত্রের দেখিয়াই জাগ্রত হইবে— অভ্যাস দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

* * *

বিদ্যাপীঠে সকল ছাত্রই শিক্ষক, সকল শিক্ষকই ছাত্র, এইরূপে সকলে সকলকে সম্মান করিতে শিখে। বিদ্যাপীঠে একটী পাঠ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আধ-গত হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ছাত্র অপরকে তাহা শিখাইতে পারে।

বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ছাত্র হিসাবেই অজানাকে ছাত্রের ভঙ্গীতে জানিতে প্রয়াসী।

* * *

বিদ্যাপীঠে "মেস" নাই।

পরের মাকে মা,—

পরের বোনকে বোন,—

পরের ভাইকে ভাই,—

পরকে আপনার করিতে শিখে—ছাত্র পরের ঘরে থাকিয়া। এইরূপে ছাত্র পরের হৃদয়ে আপন স্থান, আপন হৃদয়ে পরের স্থান করিয়া লয়।

বিদ্যাপীঠের ছাত্র পরের গরু বাঁধে।

পরের জমি চাষ করে।

পরের মোট বয়।

পরের গৃহ ও পুষ্করিণী পরিষ্কার করে।

পরের মার অসুখে পা টিপে। এইরূপে তাহার আপনার গণ্ডী বাড়াইয়া থাকে।

* * *

বিদ্যাপীঠের শিক্ষকগণ সকলেই বীর। তাঁহারা যাইবেন অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে—তাঁহারা সকল বিপত্তির সম্মুখে সত্য বলিবেন।

তাঁহারা যাইবেন দুঃস্থকে সেবা করিতে।

মৃতের সৎকার করিতে।

মহামারীতেও রুগ্নকে পরিত্যাগ করিবেন না। ছাত্রকেও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। এইরূপে সে হইবে সাহসী ও পরোপকারী।

* * *

দেশ অন্ন সমস্যার মীমাংসা করিতে চলিয়াছে। শিক্ষকও এই সমস্যা মীমাংসার জন্য তপঃরত। বালককেও সেই তপস্যা গ্রহণ করিতে হইবে। বালক চিনিবে দেশ।

সকল ছাত্রেরই বিশিষ্ট শয্যা, গৃহ, পুস্তক ও সজ্জা আছে। কিন্তু সকলেরই তাহাতে ভোগাধিকার।

ছাত্রের বিশিষ্ট অর্থ সামর্থ্য আছে। কিন্তু সকলেই তাহা আবশ্যক হইলে পাইবে। সকলের পরিচ্ছদ সকলে পরিষ্কার করিবে আবশ্যক হইলে। সকলের গৃহ মার্জ্জন করিবে সকলে আবশ্যক হইলে। সকলের শয্যা রচনা করিবে সকলে আবশ্যক হইলে।

এইরূপে ছাত্র সঙ্ঘজীবন অনুভব করিবে।

*　*　*

দেশ বিদেশে গিয়া ছাত্র ঐতিহাসিক কথা সংগ্রহ করিবে।

দেশ বিদেশে গিয়া ছাত্র ঐতিহাসিক কারুকলা দর্শন করিবে।

অতীত স্মৃতির মুখে দাঁড়াইয়া সে অতীতকে ভাল বাসিতে শিখিবে। ইত্যাদি—

*　*　*

ধ্যান করিয়া সে তাহার অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে।

শিল্প কলার চর্চ্চায় সে তাহার অনুভূতির প্রকাশ ও বর্দ্ধন করিবে—সে সত্য সুন্দর ও মধুরকে জানিবে ও পাইবে।

*　*　*

Personation Prestige, Force of Example, চিত্রন এই চৈত্তিক (sentimental) শক্তিগুলির ব্যবহার এই স্তরে আবশ্যক।

বাঙালীর জাগরণ

বাঙালীর জাগরণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে ১১শ সংখ্যায় যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সাধারণতঃ আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় বাঙালীর জাগরণের নিদর্শন স্বরূপ ঘোষিত হইয়া থাকে, তাহার অন্তঃসারশূন্যতা যেন ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অন্ততঃ অন্যের নিকট আমরা এইরূপে প্রতিভাত হইয়াছি, যে, আমরা অন্তঃকরণে সেগুলির প্রতি একান্ত মর্য্যাদাসম্পন্ন নহি, কাজেই বাঙালীর জাতীয় জীবনগঠনে তাহাদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা সক্ষম হই নাই।

বেশ! ব্রাহ্ম সমাজে, সমাজ সংস্কারে, রামকৃষ্ণ মিশনে, রাজনীতিক আন্দোলনে ও স্বদেশীর আগমনে যে নূতন বার্ত্তা মুখরিত হইয়া বঙ্গাকাশ পূর্ণ করিয়া আছে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ উপযুক্ত রূপেই হওয়া উচিত। আমরা ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চাই এইভাবে, যে, আমরা জানি বাঙালীর জাতীয় চেতনা-মূলক কার্য্যগুলি আমাদের দেশে একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে—আমরা এখন একটা নূতন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু সেই অবস্থার স্রোতে কোন-রূপে দেশশুদ্ধ প্রবহমান করিতে আমরা যদি কৃতসঙ্কল্প হই, তাহা হইলে, দেখি, তাহা আমাদের একান্তই সাধ্যের অতীত হইয়া পড়ে। এই যে আমাদের শক্তির অল্পতা, ইহার দিকে মনোনিবেশ করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, বাঙালী জাতি যে কেবল জাতি-শুদ্ধই জাগে নাই তাহা নহে, যাঁহারা মনে করেন তথা-কথিত জাতীয় উদ্বোধনের ক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহারা উদ্বুদ্ধ ও দেশকে তাঁহাদের মনোমত স্থানে লইয়া যাইতে অবশ্যই অধিকারী, তাঁহারাও আদৌ জাগ্রত নহেন। জাতীয় উদ্বোধনসাধনতৎপর মহাপুরুষ-দিগের সন্নিকটে বাংলার যেটুকু আকাশ ও যেটুকু বাতাস ধ্বনিয়া ও নড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারা সেই স্থানটুকু ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তথায় থাকিয়া সাধনরত হইয়া মহা-পুরুষদিগের সাধনার চরম প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক

অনাবিল শাশ্বতঃ জীবনস্রোতে নিজে প্লুত পরিপ্লুত হইয়া দেশের জীবনস্রোত পূর্ণ ও সু-খাতগামী করিতে কেহই বড় সচেষ্ট নন—চেষ্টা থাকিলেও ব্যষ্টি সম্প্রদায় প্রদেশ ও দেশগত সংস্কার আমাদিগকে এতটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যে, সেগুলি অতিক্রম করিয়া মূল বিশ্ব-শক্তির আস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা ঐ খণ্ড ধর্ম্ম-গুলিকে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত করিতে পারি না।

কেন? ব্রাহ্ম সমাজ আমাদের জাগরণের প্রথম আভাস—আজ ব্রাহ্ম সমাজের যত কিছু ত্রুটি, যত দিক অপরিপূর্ণতাই দেখি না কেন, আমাদের প্রাণ মর্ম্ম হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সংস্কার—সতের দিকে ঋতের দিকে বুদ্ধির দিকে বিকাশের দিকে মানব-অন্তঃকরণ যত চিন্তা যত মনোযোগ যত আবেগ যত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে—নিজকে পূর্ণ করিতে খণ্ড খণ্ড ভাবে উহারা প্রত্যেকে যত চেষ্টা করিয়া থাকে সবই, এক-কালে, স্তূপাকারে, যাহার দিকে এবং যাহার প্রেরণায় সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল তাহার কথা বাঙালী জাতির অন্তঃকরণে ধারার মত বহিতেছে কি? রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ অন্তরে যে মহাবস্তুর সন্ধানে ধ্যান ও কর্ম্মরত ছিলেন, সেই বস্তুকে অজ্ঞান রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্ণ বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা যে-সঙ্কল্প পোষণ করিয়া চলিতেন, সেই পথে অগ্রসর হইয়া ভিতরের ধারা অবলোকন পূর্ব্বক ভিতরের জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেম স্রোত বর্দ্ধিত ও শক্তিশালী করিয়া বঙ্গসমাজকে—যুগ-যুগের অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজকে নবস্রোতে ভাসমান করিবার সে দৃঢ় সঙ্কল্প আমরা যে কাহারও ভিতর দেখিতেছি না।

সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন যে তাঁহারা যোদ্ধা—পুরাতনের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে; পুরাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে পুরাতন তিল-মাত্র ভূমিদান করিবে না—মহাভারতীয় দুর্যোধনের ভীষণ বাক্য তাঁহারা কেহই ভুলিতে পারেন নাই। তজ্জন্য রাজা ও মহর্ষির পার্শ্ব বহিয়া যে ইচ্ছাস্রোত বহিয়া গিয়াছে, নব সমাজ সৃষ্টি করিয়া পুরাতন সমাজ ধ্বংস, রূপান্তরিত ও পূর্ণ করিতে যে শুভ ইচ্ছা তাঁহা-দের মধ্যে উদয় হইত, তাহা এরূপ বিক্ষিপ্তভাবে কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মদিগকে অধিকার করিয়া বসিল যে, তাঁহারা উঁহাদেরই কার্য্য করিতে গিয়া কেবল সমাজেরই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কোন্ সমাজ ভাল আর কোন্ সমাজ মন্দ, কিরূপ সমাজপ্রথা শুভ ও কিরূপ সমাজপ্রথা অশুভ ইহার যতকিছু চিন্তা ইউরোপ ও আমেরিকায় হইয়া গিয়াছিল বা হইতেছিল, তাহা তাঁহাদিগের লক্ষ্যভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহারা দেখিতে ভুলিয়া গেলেন, ভারতবর্ষ ও ভারতী-য়েরা কিরূপে চলিয়া থাকে—যে শক্তি সমাজ গড়ে ও ভাঙ্গে সেই শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার দৃষ্টি দিয়া সমাজ ভাঙ্গা ও গড়ার যে কৌশল, তাহা অবগত হওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিল না। কাজেই তাঁহারা অল্পশক্তি ও ক্ষীণবীর্য্য হইয়া কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা নূতন সমাজ চান তাঁহারাই যখন দৃষ্টিবিভ্রমে এরূপে পঙ্গু হইয়া পড়ি-য়াছেন, দৃষ্টির সেইরূপ অস্পষ্টতা রাখিয়া দুই একটা সামাজিক প্রথা যাঁহারা পরিবর্ত্তন করিতে চান, তাঁহারা যে হীনবীর্য্য হইবেন তাহাতে আর কোন কথা!

কেহই পুরাতনে সন্তুষ্ট নন—আপাতঃদৃষ্টিতে বঙ্গের সমাজ-প্রথা ও ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে-চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় সেই অসম্পূর্ণ ও পুরাতনমন্য দেশ বা জাতি কেহই চান না। পুরাতনের মূল রূপটী আবিষ্কার করিয়া যুগোপযোগী রূপপ্রকাশে যত্নবান যিনি বা যিনি নূতন সমাজচিন্তার মধ্যে এক অতি নবীন সমাজরূপ দেখিয়া পুরাতনের ও দেশের ধাতুর সহিত মিলাইয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক—উভয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষেত্র চান, কেহ নিজের মত সমাজ করিয়া বা কেহ পুরাতন সন্ন্যাসী সমাজ উদ্ধার ও

সময়োপযোগী করিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কার্য্য ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—বাঙালী জাতির জীবনের মূলে ও অন্তঃস্থলে যে শক্তিপ্রবাহ বিরাজ করিতেছে, তাহা কোন কারণেই মন্দীভূত হইতে পারে না। শক্তির স্বল্পপ্রবাহের সহিত জাতির সকল অঙ্গে বেদনা অনুভূত হয়, সে সত্য আবিষ্কারে ব্যাপৃত হইয়া থাকে—তাহাকে জাতীয় জীবনস্রোত অনাবিল ও বেগবান রাখিতেই হইবে। জাতীয় জীবন অনাবিল ও বেগবান হইলে, মনে হয় যেরূপ সমাজ, যেরূপ চিন্তা, যেরূপ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, জাতির অঙ্গ শোভা সম্পাদন করিবে, তাহার একএকটীর জন্য সমাজ সৃষ্টি করা, সন্ন্যাসী সঙ্ঘ করা বা রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করা অগ্রেই আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। এগুলিকে সত্য জাতীয় জীবনের চিহ্নস্বরূপ কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহা সকলই আমাদের মন-গড়া চেষ্টা, যে মন জাতীয় মূল শক্তিস্রোত হইতে বহুদিন দূরে দূরে থাকিয়া অনেকটা ক্ষীণসামর্থ্য হইয়া উঠিয়াছে। জীবনকে জাতিগত করিয়া জীবনের মূল শক্তি উদ্ধারপূর্ব্বক তেজঃ ও বীর্য্যে যদি আমরা অটুট হইয়া না উঠি, জ্ঞানে উদ্ভাসিত ও বিকাশে টলমল হইয়া দেশের অজ্ঞানের মূলকে যদি আমরা স্পর্শ ও আঘাত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরাও উদ্বুদ্ধ নহি এবং আমাদের আশ্রয়স্থল সমাজ, মিশন বা কংগ্রেস ও সমিতি, জাতির জীবন বিকাশের সত্য নিদর্শন স্বরূপ নহে।

রামকৃষ্ণ মিশন নিজদিগের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে জীবনের সত্য আবিষ্কারে ব্যাপৃত। জীবনের সত্য আবিষ্কৃত হইলে সকল সত্যই সেই জীবনে প্রতিফলিত হইবে। সে জীবন কিরূপ সমাজ, সঙ্ঘ বা মিশনে সুসম্বদ্ধ হইবে তাহা সেই উদ্বুদ্ধ জীবনই দেখিতে পাইবে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় লইলে, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাতার অন্তরের ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিলে, বুঝিতে পারি, মিশনের আকারে কাঞ্চন ও কামিনী সম্পর্কশূন্য ছায়াতলে মানব জীবন আশ্রয় না লইলে জীবনের পূর্ণ সত্যদর্শন সম্ভবপর নহে। উদার মহাসত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন দেশমাতাকে একান্ত অনাসক্ত ভাবেই তাঁহারা সেবা করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে দেশ বিস্মিত কিন্তু উদ্বুদ্ধ নহে। স্বামীজির বজ্রনির্ঘোষ দেশের অন্তঃস্থলে পৌঁছিয়াছে, তৎপরে অন্তরের প্রতি তরঙ্গে দেশকে উদ্বুদ্ধ সংযুক্ত ও উচ্চ পথাবলম্বী করিতে যদি আমরা যত্নবান না হই, প্রাচীন সাম্প্রদায়িক ভাবে আত্মোপলব্ধি ও [illegible] পথেই যদি আমরা চলি, তাহা হইলে দেশের [illegible] ও আত্মার নিয়ামক, এমন কি সমষ্টীভূত, হইতেই আমরা পারিব না। তজ্জন্য এরূপ মিশনের দিকে খুব আশা লইয়া থাকিয়াও আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি না, ইহা জাগ্রত জাতির জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ।

আমাদের রাজনীতি প্রথমে বিলাতী প্রথামতে প্রতিবাদ আন্দোলন করিয়া, ক্লাব সভা ইত্যাদি স্থাপন করিয়া, অস্পষ্টভাবে কংগ্রেসের কেন্দ্রমূলে কিসের জন্য যে স্থান লইতেছিল তাহা সে তখন বোঝে নাই। বিবিধ অভাব অভিযোগ, রাজনীতি অর্থনীতি ঘটিত দেশবাসীর সুবিধা অসুবিধা, ইংরাজ ও দেশীয়ের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার ভিতর দিয়া কংগ্রেস এবং রাজনীতি কিছুই বুঝিতে পারে নাই—তাহার চরম পরিণতি কোথায়, কিসের জন্য সে এরূপে ভারতীয় জাতীয় জীবনের মধ্যে স্থান পাইবার অধিকার পাইল।

ক্রমে স্বদেশী আন্দোলন ও বর্ত্তমান নন-কো-অপারেশন আন্দোলন পর্য্যন্ত আসিয়া দেশের উত্তেজনা, আবেগ, ভাব, চিন্তা, নীতি, ধর্ম্ম, এমন কি আধ্যাত্মিকতার সাহায্য পাইয়া সে পুষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার এখনও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বলিতেছি, জাতি যে জীবনমূল স্পর্শ না

করিলে তাহার কোন কার্য্যই পূর্ণ সিদ্ধি ও দিব্য অভিব্যক্তি প্রাপ্ত করিতে পারে না—উহাকে সেই জীবনকেন্দ্রে লইয়া যাইতে কোন সাধক রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ন্যায় একনিষ্ঠ ভাবে নিযুক্ত আছেন কি না তাহাই সন্দেহ। আন্তর বল, গাঢ়-চিন্তা, স্থির-ভাবুকতা রাজনীতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—ভারতীয় ভাবে ভারত-নেশন প্রতিষ্ঠার মিশন স্থাপন—এখনও করিতে পারে নাই। জাতি গঠন করিব—জাতিকে পাইয়াছি, তাহাকে বিশ্বে প্রকাশ করিব, এ স্পষ্ট কথা তাহার মুখে শুনিতে পাইতেছি না। অতএব ইহারও, আমরা যে বাঙ্গালী জাগরণের কথা বলিতেছি, তাহার সহিত খুব কমই সম্বন্ধ।

সকল প্রকার রাজনীতিক ভাব। আন্দোলন, প্রথা প্রতিষ্ঠান, সভা সমিতি লক্ষ্য করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাহা-কেও প্রস্ফুট জাতীয় জীবনপুষ্প আখ্যা কিছুতেই দেওয়া যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশ-মাতার বেদনা-বিজড়িত আত্মবাণী যাহাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল, তাহারা দৃঢ়মুষ্টি হইয়া সমিতি গঠন করিল—চিরকালের জন্য মাতার সহিত জাগ্রত ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে যে গভীর সাধনা তাহার একান্ত আবশ্যকতা তাহাদেরই মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল, কিন্তু বজ্রমুষ্টি তাহাদের একমাত্র নিয়ামক হইয়া তাহাদের সকল ভবিষ্যৎ আবার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। কোথাও দুই এক ক্ষুদ্র মণ্ডলী নব জাতীয় সাধনার প্রবর্ত্তক হইয়াছেন কি না তাহা ভবিষ্যৎ ভাল করিয়া বলিবে, কিন্তু তাহার জন্য যে গভীর আত্মনিয়োগ ও বিচিত্র সাধনপ্রণ আবশ্যক তাহা অনেক উত্তেজনা আবেগ, ভাব চিন্তা পরিপাক করিয়াই আসিতে পারে। নীরবে এরূপ সাধনা ও নিষ্ঠা লইয়া কেহ আছেন কি?

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশমাতার হৃদয়-ব্যথা যাহাদের চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহারা কত ভাব-বন্যায় না দেশকে প্লাবিত করিয়াছে, বুদ্ধি স্পর্শ করিয়া কত নব নব চিন্তাই না দেশে উদ্ভূত হইয়াছে কিন্তু তাহা অন্তরের বল সংগ্রহেই একান্ত উপযুক্ত হয় নাই। অন্তরকে গুটাইয়া দেশবাণীর সহিত যুক্ত ও নিজকে সংহত করিয়া একটা নিবিড় আন্তর ধারা সৃষ্টি পর্য্যন্ত বোধ হয় তাহাতে হয় নাই—দুই এক স্থানে হইয়াছে কি না তাহাও ভবিষ্যৎ বলিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সমিতি, স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর রাজনীতি, স্বদেশী আন্দোলনের বহু দেশগত প্রতিষ্ঠান যতই কেন আমা-দের ভিতর ভাবস্রোতের আবির্ভাব ঘটাক, তাহার ভিতর নব ভাবসমুদ্র যে জ্ঞান-সূর্য্য আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহা নাই। তাহারা সেরূপ জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্র হয় নাই, তজ্জন্যই সেগুলিকে আমরা জাতির উদ্বোধনের কেন্দ্র বলিতে পারিব না।

আমরা বলি সকলগুলিই একটী উচ্চ স্থানীয় দ্যোতনার ফলস্বরূপ। কেহই অমর্য্যাদার পাত্র নহে, সকলেই আরাধনার সামগ্রী। তবে দেবতা হিসাবে নহে, তাহাদের মধ্যে যে জাগ্রত দেবতা বাস করিতেছেন তাঁহাকে জানিবার জন্য, আমার মধ্যেও যে দেবতা বাস করিতেছেন তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান এবং উভয়ের সহিত যোগযুক্ত ও একাত্ম হইবার জন্য যে সাধনা—এই দুইটী যথায় স্থান পাই-য়াছে, তথায়ই আমাদের প্রকৃত স্থান—আমাদের জাতীয় জীবন যজ্ঞের তাহাই দিব্যপীঠ, বেদী। ইহাই বাঙ্গালী জাগরণের সত্য নিদর্শন হইবে। দেশ দৃঢ়-নিষ্ঠ হইলে এরূপ সাধনকুঞ্জ জাতির মধ্যে উদয় হইতে বিলম্ব হইবে না।

রূপান্তর

—:০:—

উৎসর্গ আরম্ভ হয়, মনে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে ; কিন্তু প্রাণেই তাহার সঙ্গীন গ্রন্থী—এই গাঁটটুকু পার হইতে না পারিলে উৎসর্গ পূর্ণ হয় না, মানুষের মুক্তি আসে না। যাঁহারা উৎসর্গযোগের একনিষ্ঠ পন্থী, তাঁহাদের এই কথাটা খুব ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সাধনা লইয়াছি, সে সাধনা জীবনে সম্যক্ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে না কেন, তলাইয়া দেখিলেই সাধক বুঝিবেন, দোষ সাধনার নহে, মানুষের vital centre, যে প্রাণচক্র, সেখানে ত উৎসর্গের আগুন জ্বলিয়া উঠে নাই, প্রাণের শুদ্ধি না হইলে বিরাট যৌগিক সৃষ্টি ফুটিয়া ওঠা একেবারেই অসম্ভব। এই প্রাণের শুদ্ধি নির্ভর করিতেছে, ভোগের উপর নয়, ভোগকে উপরে তুলিয়া তুলিয়া, ভোগকেও উৎসর্গ করিয়া। কথাটা ভাল করিয়াই বুঝিতে হইবে।

বিদ্রোহী প্রাণকে নিগ্রহ নয়, যোগশক্তি দিয়াই বশীভূত করিতে হইবে। প্রাণ হইতেছে কামনা বাসনার ক্ষেত্র। যোগশক্তি এই ক্ষেত্রটিতেও যতক্ষণ না নামিয়া আসিতেছে, বাসনার নিবৃত্তি নাই। মন বুদ্ধি সমঝদার আছে, তাহাদের বুঝাইলেও বুঝাইতে পারা যায়, কতক, কতক কেন, অনেক খানিক বিচার ও বিবেকশক্তির প্রয়োগে শুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারা যায়, মন বুদ্ধি উপরের সহিত ঘনিষ্ঠ ও সন্নিকৃষ্ট, একটু শান্ত স্থির হইলেই উপরের আলোক ও শক্তি উহাদের উপর আসিয়া সহজেই প্রতিফলিত হয়, উহাদিগকে তপঃশুদ্ধ ও নূতন করিয়া তোলে—প্রাণের বেলায় তাহা হয় না—প্রাণ সহজে জ্ঞান বুদ্ধির শাসন মানিবার লোকই নহে, উন্মাদ প্রাণকে বশে আনিতে হইলে প্রত্যক্ষ ভাগবত শক্তির অবতরণই একান্ত আবশ্যক। এ যুগে মানুষের মন, অন্তঃকরণ, তাহার হৃদয় ও বুদ্ধি যতখানি স্বচ্ছ ও যোগের অনুকূল, প্রাণ সেরূপ নহে, এই জন্যই মানুষের আদর্শে ও তাহার স্বভাব-জীবনে এতখানি পার্থক্য। জীবন যোগময় করিবার সাধনাই সব চেয়ে কঠিন অনুষ্ঠান। কিন্তু দেবজ্যোতিকে জয়লাভ করিতে হইবে এইখানেই।

যখন প্রথম যোগগ্রহণ করা যায়, একটা অপরূপ মুগ্ধ আবেশে মন প্রাণ মজিয়া যায়, কি এক অপূর্ব্ব নেশায় নূতনত্বের অনির্ব্বচনীয় পুলকে সারা বুকখানি ঢেউ খেলাইয়া দুলিয়া উঠে, ঢুলু ঢুলু ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা সাধক বেশ অনুভব করে, সে এক রঙ্গিণ স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে সবই নূতন ও অপূর্ব্ব, নবানুরাগের লাল নেশায় হৃদয় তখন ভরপুর. কিছুই আর দৃকপাত থাকে না—মানুষটা খুবই এক রোখা বেগে রঙ্গিণ প্রদর্শনীর পর্দ্দার পর পর্দ্দা খুলিয়া খুলিয়া নব সৌন্দর্য্যের হাটে চলাফের করিতে থাকে। এ অবস্থা বেশ, কিন্তু স্থায়ী হয় না নূতন আবেগতরঙ্গ দুইদিন পরে কিছু থিতাইয়া উঠে তখন চক্ষে পড়িতে থাকে—একে একে ভিতরে পুঞ্জীভূত সংস্কারের নিজমূর্ত্তিগুলি ; জীবন্ত প্রেত পুরু ষের মত সেগুলা অন্তরে কি যন্ত্র-গোল কোলাহ সুরু করিয়া দিয়াছে, কোথায় অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য আ কোথায় আমি, স্বভাবের দুর্নিবার ঝড় ও চাঞ্চল্যে নিজে নিজেই কাঁপিয়া উঠিতে হয়, সুপ্ত প্রাণে মূর্চ্ছিত ক্ষুধাগুলা যেন নূতন পরশ পাইয়াই শতগুণ প্রচণ্ড বেগে সাধককে তাড়া করে, তাহাকে বেড়িয়া ঘিরিয়া ধরে। সাধক বেশ তখন অনুভব করে সাধনা প্রথম যেমন দেখিতে ও শুনিতে সহজ, সব টুকুই তেমনি নয়। "মধুর বজিবে বাঁশ্রী ভেসে যাব রঙ্গে

তাহা হয় না—খুব সংশয় ও ভয়ের মধ্যেই তাহার সেই প্রথম মুগ্ধ চমক ভাঙ্গিয়া যায়—সাধনা, সে বড় বিষম সাধনাই জীবনে আরম্ভ হইল, ইহা বুঝিতে তাহার আর বাকী থাকে না।

তখনই ভাবের নেশা একটু পাতলা করিয়া ভিতরের দিকে চক্ষু ফিরাইবার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়, সাধক যেন বিষম ফেরে পড়িয়াই অন্তরস্থ হইতে শেখে, ব্যষ্টি ভাবের সাধনা লইয়াই যাঁহাদের যোগারম্ভ তাঁহাদের ত কথাই নাই, সমষ্টি সাধনার একনিষ্ঠ সাধকের ভিতরেও তখন ব্যষ্টিপুরুষেরই আত্মস্থ হইবার একটা দারুণ চেষ্টা (desperate attempt) স্ফুরিয়া উঠিতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই উহা উঠে। খুব সৌভাগ্যশালী সেই, যে এ অবস্থায় নিজ সাধনার গুরুভার আপনার স্কন্ধে না বহিয়া—ভিতরে বা বাহিরে, ভাগ্যবান ভিতরে ও বাহিরে যুগপৎই জগদ্‌গুরুকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হাতেই সম্পূর্ণরূপে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়—ভগবান নিজে হাত ধরিয়া সাধককে এই বিষম সঙ্কট অবস্থা পার করিয়া না দিলে, প্রকৃত পক্ষে আত্মকৃত সাধনজালেই অনেককেই একেবারে আটকাইয়া পড়িতে হয়, অবশ্য তাহাতেও পতন নয়, একবারও যে আপনাকে হারাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য অকপট সরলান্তঃকরণে ভাগবত শরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জীবনে পতন নাই,—কিন্তু বড় বেদনার মধ্যেই নিদারুণ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই সে ভুল একদিন ভাঙ্গে,—প্রাণের সহিত এই নিষ্ঠুর সংগ্রাম আপনাকে করিতে নাই—প্রাণ অসুরবৃত্তি, এই মত্ত মাতঙ্গকে ভাসাইয়া লইতে হইলে উপরের দৈব গঙ্গারস্রোতেই গঙ্গাধরের মত জটাজুট বাহিয়া নামিতে মাথা পাতিয়া দিতে হয়—নতুবা ফের বড় গুরুতরই হয়—জটিল সংগ্রাম অবস্থাটাই অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া চলিয়া সাধককে কত অস্থির ও যথেষ্ট বিলম্বিত করিয়াই তোলে।

বিপদের এইখানেই শেষ নয়। এমনও ত কত ক্ষেত্রে দেখা যায়, মনে হয় বেশ আছি, সাধনমার্গে বেশ দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়াই চলিয়াছি, উৎসর্গও ত নিখুঁত ত্রুটিশূন্য, মনবুদ্ধি খুব সজাগ ভাবেই প্রহরায় নিযুক্ত, কিন্তু আসলে হয় ত তখন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না, যেটা দৃঢ়নিষ্ঠতা বলা হইতেছে, সেটা একটা উপরের দিব্য আরোপ, হয় ত একটা দিব্য প্রভাব, কোনও উচ্চ যোগশক্তিমান্ পুরুষের দিব্য তপঃশক্তি হৃদয়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মন ও হৃদয় মুগ্ধ ও আবেশাচ্ছন্ন, অহং-বুদ্ধি কালীয় নাগের মত কুহকমন্ত্রে সম্মোহনেই ফণা গুটাইয়া লইয়াছে, অন্তঃকরণকে অপূর্ব্ব আবেশে জড়াইয়া বেড়িয়া বেড়িয়া কি এক অলক্ষ্য শক্তিসঞ্চারে সবটুকু যেন বেশ শৃঙ্খলিত, দুর্দ্ধর্ষ প্রাণশক্তিও যেন সহজে সংযমে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে—আপাততঃ ইহাতে বেশই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকা যায় বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহাতেও চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা নহে, কেন না এই যে নিষ্ঠা ইহা অন্তরপ্রতিষ্ঠ অটুট নিষ্ঠা নাও হইতে পারে, নিষ্ঠার চমক একদিন ত ভাঙ্গিয়া যাইবেই—তখন উলঙ্গ আত্মমূর্ত্তি বিকট অস্থিকঙ্কালগুলি লইয়া জলুস মুখসখানি খুলিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—অহিফেনমুগ্ধ শক্তি ও আনন্দ কিছুই লোভনীয় ও স্থিরবস্তু নহে—সারা জীবনও আত্মসমর্পণের ধন্না দিয়া এমন করিয়া যদিও বেশ কাটাইতে পারা যায়, তাহা হইলেও ইহা নিরাপদ নহে—যে আত্মসমর্পণ অখণ্ড সত্তায় উৎপন্ন হয় নাই, ফুলঝুরির মত যতই রঙ্গিণ ও উজ্জ্বল ভাববৈচিত্র্যপূর্ণ তাহা মনে হউক না কেন, মূল তাহার দৃঢ় নয়, ভাবের নেশায় আত্মা-মাটির উপর অচল ও অনন্ত স্থায়ী উৎসর্গের প্রতিষ্ঠা হয় না। একদিন এমন ঝড় আসিবেই, যখন সব মিথ্যার পত্রচুলা একটা ঝটকাতেই নিশ্চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া দিবে। নিরাপদ নয় এই জন্যই—কেন না, অহং ও প্রাণ ইহাতে মুগ্ধ

আর এক পথ আবিষ্কৃত করিয়াছিল, ভারতের তান্ত্রিক সাধক। তান্ত্রিক গোড়া হইতে সন্ধি করিতে গররাজি হইয়াছে—প্রাণ, তুমি ভোগ চাও, আচ্ছা ভোগই গ্রহণ কর,—যত ইচ্ছা, যত সাধ, প্রাণ পুরিয়া সাধ মিটাইয়াই ভোগ করিবার অধিকার দিলাম—ভোগেই যোগায়তে—ভয় লজ্জা কুণ্ঠা জলাঞ্জলি দিয়া পূজার উপচার সংগ্রহে তান্ত্রিক ভোগরাণীর তর্পণে অগ্রসর হইয়াছিলেন—উৎকৃষ্ট ভোজ্য পানীয়, উৎকৃষ্ট আরাম বিলাস, উৎকৃষ্ট রমণী—বীরতান্ত্রিক কোথাও বিমুখ হয় নাই—তন্ত্রের শক্তিসাধক সিদ্ধকাম হইয়াছিল কি না, কে জানে,—ভিতরের আসল লক্ষ্য ছিল প্রাকৃত ভোগের পূর্ণতর্পণে ভাগবত ভোগধর্ম্মটিকেই—মুক্ত ভোগ, দিব্য ভুক্তিকেই উদ্ধার করিয়া তোলা—মন বুদ্ধির শরম কাটাইয়া প্রাণের উদাত্ত ভোগের মধ্যে একটা মস্ত ইঙ্গিত লুকাইয়া আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রাণের আপনার গভীর ভিতরে তাহার মূল স্বভাবের সত্য উদ্ধার—সে বোধ হয় একেবারেই হয় না, হইবার নয়, তাই ভারতের তান্ত্রিক সাধনারও চরম পরিণাম কুশলপ্রদ হয় নাই।

কামই ভোগৈষণার কেন্দ্র কথা। কাম কি? প্রথম ইন্দ্রিয়বৃত্তি—উহা অধম—সর্ব্ব নিকৃষ্ট রূপ। তার পর রূপ রস। ইহা মধ্যম। ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য চাই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ঘর্ষণ, স্পর্শন, মন্থন। স্থূল স্নায়ুর, রক্ত মাংসের উৎকট লীলা—মানুষের মধ্যে যে কামজীব আছে এই রিরংসা-তরঙ্গের মধ্য দিয়াই সে আত্মতৃপ্তি করিতেছে। কিন্তু মানুষের আরও একটু উপরের স্তরে আছে—সূক্ষ্মতর রসজীব—সূক্ষ্ম মানস ভোগেই তাহার অধিকার—নয়নে নয়ন রাখিয়া এই ভোগোল্লাস,—জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল,—নয়নে রূপকে রাখিয়া, সেই রূপকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঘেরিয়া ঘেরিয়া রসের অপূর্ব্ব মঞ্জরী রচিয়া, বুকের মধ্যে বুকের পরশে, চুম্বনের রক্তরাগে, আমার মানসী প্রতিমাকে রাঙাইয়া সাজাইয়া যে অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও সুখ—ইহা প্রেমের ভোগ—হৃদয়ের, ভাবের, অন্তঃকরণের ভোগ। দেখ, ভোগজগতে কেমন ক্রমপ্রকাশ সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এখানেও আছে উপকরণের অপেক্ষা, এখানেও যে পুলকোচ্ছ্বাস সে সহেতুক, জন্য আনন্দ, এখানেও আছে পাইবার ও হারাইবার আলো ও ছায়া, বিরহের বিচ্ছেদের সংশয় ও আশঙ্কা। কারণ, এখানেও গভীরতম সত্যটি ঠিক জানা হয় নাই, পাওয়া হয় নাই, প্রকৃতির পূর্ণতম স্বরূপটি হওয়া হয় নাই।

প্রকৃতির সাধারণ যে স্তর, তাহাকেই ঠাকুর বলিয়াছিলেন কামরাধা; মানুষের সাধারণ জীবনে যে প্রাণশক্তির খেলা, উহা এই কামরাধারই ভোগ, ইহাই আদি ও মূল, কারণ এই আদি রসেই ত রসলীলার প্রতিষ্ঠা। এখানে সাধক প্রাণ-প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়াছে, বলিতেছে পুরুষ ভোগ করিতেছে প্রকৃতিকে, কিন্তু আসলে প্রকৃতি, প্রাণ-শক্তিই ভোগ করিতেছে প্রকৃতির বস্তুরাজিকে (object), পুরুষ সুপ্ত, মায়াচ্ছন্ন, প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রকৃতিরই ভোগ—উহা ভোগ নয়—ব্যভিচার। এই ব্যভিচারকেই মোহোন্মত্ত মানুষ ভোগ বলিয়া আত্মপ্রতারণা করে। কৌশলী যোগী প্রাণ-বৃত্তি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লন, প্রাণ-বৃত্তিটি একটী উপায়, যন্ত্র, (means or instrument) মাত্র—যোগী যন্ত্রের সহিত identification আত্ম-অধ্যাস করেন না, পরন্তু অন্তরের সূক্ষ্ম প্রদেশে উঠিয়া শক্তির, প্রকৃতিরই সহিত আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন, হৃৎকমলে ভাবময়ী মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, পূজা করেন, আরতি করেন, ইহাই কালী সাধনা, তন্ত্রের শুদ্ধ মাতৃসাধনা—অথবা আরও নিগূঢ়তর যোগের লক্ষ্যে স্বয়ং কালীরূপা শক্তিরূপা আপনাকে অনুভব করিয়া, প্রেমরাধারূপে ঊর্দ্ধস্থ বিজ্ঞানময় আনন্দময়

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে রত হয়েন। ইহাই বৈষ্ণব জগতের সখী সাধনা মাধুর্য্য সাধনার মূল মর্ম্ম—সাধক এখানে প্রকৃতিভাবের ভাবুক—প্রেমিকা রাধিকার সহচরী সখী, অথবা শ্রীরাধিকা স্বয়ং-ই।

লীলার ক্ষেত্র—প্রাণ ও হৃদয়। প্রাণে কামনার খেলা, প্রেমের পবিত্র মধুর লীলা হৃদয়েই অনুভব করিতে হয়—হৃদয়ই রাসমঞ্চ, রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ—প্রেমের শ্রীবৃন্দাবনধাম। এই বৃন্দাবনে আনন্দের ডাক (call of Ananda) মুরলী কণ্ঠে নিনাদে পবি-শুদ্ধ-ভক্ত প্রেমিক তাহা গাঢ়রূপে শ্রবণ করেন, আকুল হৃদয়ে লীলাবল্লভের সন্ধানে যেপথে অভিসার করেন, শ্যামসুন্দর মদনমোহনরূপ স্বপ্ন নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া অপূর্ব্ব পুলকে উল্লসিত হন, আনন্দলীলারঙ্গে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রীতি বিধান করেন। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ—এ বাণী সত্য, বাঁশীর অশান্ত করা প্রাণমন উদাসকরা পাগল করা ডাকও সত্য—কারণ বাঁশীর বাদক যিনি তিনি যে সত্যেরও সত্য, বিজ্ঞানময় পরম পুরুষ, বিজ্ঞানেরও ঊর্দ্ধে যে পরম তুরীয় ধাম, গোলোক—সেই আনন্দলোক হইতেই দূরাগত এই মোহনসঙ্গীতচ্ছন্দ তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে—হৃৎমধ্যে যুগে যুগে চির নূতন রূপে রসে গোপ গোপিকাকে প্রেমলীলায় মাতাইয়া তুলিতেছে। প্রেমের তাপে বিরহের আগুন দিয়া দিয়াই ভোগকে তপঃশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আসক্তি যখন সম্পূর্ণ অগ্নিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, রস যখন সাধনার আঁচে হইয়া উঠিয়াছে ঘনঘনীভূত, একটুও তারল্য তাহাতে আর নাই, ঘনীভূত, গাঢ়ঘন রতিরস ঘনবীর্য্য ও অমূল্য অপূর্ব্ব রসায়ন ও সত্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই পাইয়াছি নিকষিত হেমতুল্য দেবদুর্ল্লভ নিত্য প্রেম—নিত্য ধারায় প্রতিষ্ঠা তখনই জীবনে ধ্রুব ও সার্থক। সেই ত আসল ও প্রকৃত রূপান্তর।

ধর্ম্মঘটের নিষ্পত্তি

শ্বেতব্যবসায়ীর লুব্ধতা ও বাঙ্গালী চাকরের নর্ম্ম রতা যখন নিরীহ কুলীদিগের কঙ্কালসার দেহের উপরে অশনি পাত করিয়াছিল, তখনই বুঝা গিয়াছিল বাঙ্গালী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিবে। সহরে সহরে হরতাল করিয়া ও রেলষ্টীমারে ধর্ম্মঘট ঘটাইয়া বাঙ্গালী ইহার যে প্রতিবাদ করিয়াছে তাহা ভারতে রাজনীতি-আন্দোলনের এক অপূর্ব্ব ঘটনা।

প্রায় মাসাবধি ভদ্র অভদ্র, ব্যবসায়ী শ্রমিক মাথা পাতিয়া নীরবে সকল অসুবিধা বহন করিয়া আসিতেছে, অধিকন্তু তাহারা ধর্ম্মঘটকারীদের সকল ভার বহন করিতেছে। মাস পূর্ণ হইবার সময়ে সময়ে আমরা চারিদিকে ধর্ম্মঘট নিষ্পত্তির সাড়া শুনিতে পাইতেছি। অনেক গুলি পথে ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে।

ধর্ম্মঘটের মূল কারণ যখন কুলীদিগের উপর অত্যাচার, তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন ষ্টীমারে ধর্ম্মঘট হওয়ায় কুলীদিগেরই যখন স্বদেশগমনে অসুবিধা, তখন এ ধর্ম্মঘট সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। ধর্ম্মঘটের মূলে, চারিদিকে অসুবিধা ঘটাইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি একটা চাপ দিয়া উহাদের নিকট

কুলীদের পথ-খরচ আদায় করিয়া লইবার যদি মতলব থাকিয়াও থাকে, অনেকে বলেন, উহা এত দীর্ঘদিন চালান অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। কেননা উহাতে গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা দেশের লোকেরই ক্ষতি অধিক হইতেছে।

কিন্তু তবুও ধর্ম্মঘট যখন এখনও থামে নাই এবং যাহারা পুনরায় কাজে যাইতেছে তাহারা যে একান্ত পেটের দায়েই কাজে যাইতেছে বা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ভাবনা ভাবিতে অক্ষম হইয়া পুনরায় যে তাহাদিগকে কার্য্যগ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন একবার ভাবিয়া দেখিলে হয় এইরূপ ধর্ম্মঘটে কিরূপ নিষ্পত্তি আমাদের বাঞ্ছনীয়।

সসম্মানে নিশ্চয়ই। চাকর ও মনিবের স্বার্থ লইয়া যে-লড়ালড়ি তাহাতে কেবল 'প্রপেগাণ্ডার' ভাব লইয়া হস্তক্ষেপ করা কংগ্রেস সুবিবেচনার কাজ মনে করেন না, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ধর্ম্মঘট সেরূপ নহে।

ধর্ম্মঘটকারীরা কুলীদিগের ব্যাপারে জাতীয় অপমান বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। এতটা প্রকট ও লজ্জাকর অপমান কেহ ভোগ না করিলেও সকলকেই জীবনের মধ্যে অনেকবার এইরূপে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। তাহারা পেটের দায়ে ও কাহারও সহায়তার অভাব দেখিয়া এতদিন তাহা সহ্য করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ মনিবের দ্বারা এক আধ জনের উপর এরূপ অত্যাচার হইলে তাহা নিবারণ করা কাহারও সাধ্য নহে, কিন্তু সকলেই ইহার প্রতীকার চাহে। সকলে একজোট না হইলে ইহার প্রতীকার হয় না। কুলীদিগের উপর অত্যাচার লইয়া কংগ্রেসকমিটি ও ভলাণ্টিয়ারেরা যখন প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিল, তখন ষ্টীমার ও রেলের চাকর একটা ভরসা স্বতঃই অনুভব করিতেছিল। তখন তাহারা কংগ্রেসের কর্ম্মী ও ভলাণ্টিয়ারের সহিত একযোগে কুলীদিগের জয়গান করিতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস চায় গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়া কুলীদের জন্য সুবিবেচনার করাইতে, ইহারাও চায় সেই সুযোগে মনিব বাধ্য করিয়া নিজেদের এতদিনের পুঞ্জীভূত অভাব অভিযোগ ও অপমানের একটা বোঝাপড়া করিতে। কুলীদের অপমানের সহিত সহানুভূতি ইহার মূলে অবশ্য বিশেষ ভাবেই বর্ত্তমান আছে।

দেশের মধ্যে আমরা যদি এরূপ অবস্থার লোক দেখি, তাহাদিগকে জাগ্রত দেশধর্ম্ম নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে। কংগ্রেস তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। কংগ্রেসের অন্তরগত ইচ্ছা দেশ শাসন করা। পূর্ব্ববঙ্গে বরিশাল, চাঁদপুর ও অন্যান্য স্থানে হরতালের সময়ে দেশ শাসনের অনেক ক্ষমতা কংগ্রেস কমিটির হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। যে কংগ্রেস সভা এতটা শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল সে এইরূপ লাঞ্ছিতদের জন্য পরিশ্রম না করিয়া পারে না।

কিন্তু কংগ্রেসের নিজহস্তে দেশ শাসনশক্তি গ্রহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও আবশ্যক হইলে খেত ব্যবসায়ীর সহিত যেরূপ উচ্চ সম্মানে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবেন স্থির করিয়া বসিয়াছেন, এদের ক্ষেত্রে ততটা উচ্চ সম্মান আদায় করিয়া বিবাদ মিটান বোধ হয় সম্ভবপর হইবে না, হয়ও নাই। অতএব একদিকে রেল ও ষ্টীমারে কোম্পানীর ইচ্ছা, তাহাদের চাকরেরা মাথা হেঁট করিয়া সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে তাহাদের নিকট গমন করুক, অন্যদিকে সমাজের প্রতিভূস্বরূপ কংগ্রেস সমাজের অন্যান্য কার্য্যে তাহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে বলিতেছে। যাহাদের দু-বিঘা জমি ছিল তাহারা কাজ ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সমাজ কৃষি ও কৃষির মজুরি ভিন্ন অন্য কার্য্যে তাহাদিগকে স্থান করিয়া দিতে পারে না।

আমাদের সমাজের অর্থশক্তি তত প্রচুর নহে। আমাদের সমাজও তেমন উদার নহে। আমাদের

কুলীরা আসামে থাকিয়া এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নূতন সমাজের পত্তন করিয়াছে, যাহাতে তাহারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে নিজদিগের জাতের মধ্যে স্থান পায় না। রেল ও ষ্টীমার অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া দেশে রাজত্ব করিতেছে, তাহার কেনা গোলামকে আমাদের সমাজ কেবল আহার ও পরিচ্ছদ দিয়াও গ্রহণ করিতে পারে না।

অতএব মাত্র একটী পথ, ইউরোপীয় ধরণে মাত্র একটী পথ আমাদের সম্মুখে খোলা আছে। শ্রমজীবী [illegible] সঙ্ঘবদ্ধ রাখিয়া সেই সঙ্ঘকে যথেষ্ট [illegible] [illegible] উন্নত [illegible] হইবে। [illegible] আমরা চাহি [illegible] আবশ্যক [illegible] হইবে [illegible] আমাদের [illegible] গঠন করিয়া [illegible] রাখিয়া তাহাদিগকে [illegible] [illegible] সকলদিন ভারতের শাসননীতির পরিবর্তন না করিতে পারিবে, ততদিন ইহাতে বাঙলার কোন [illegible] আর [illegible] পাইবে না।

আমাদের একমাত্র সম্মানের ও একমাত্র বাঞ্ছনীয় পথ উন্মুক্ত আছে, যদি মহাত্মাজী তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্নবস্ত্রের ভার লইতে সক্ষম হন। আজ যাহারা গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে হয়ত দুদিন পরে তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

গ্রামবাসী কি সহোদরের মত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারিবে? ফিজী-প্রত্যাগতদের ন্যায় তাহাদিগকে বিতাড়িত না করিলেও তাহারা যে ইহাদিগকে একান্ত আগ্রহে বরণ করিয়া লইবে, তাহা ত মনে হয় না।

গ্রামের এখন সকল জিনিসটাই নিজের স্বার্থের উপর, অন্যের স্বার্থহানি ঘটাইয়া নিজের স্বার্থপুষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে। গ্রাম জানে না, যে যে-গ্রামে জন্মাইবে তাহার সুখ, সুবিধা, সম্মান ও উন্নতির জন্য সেই গ্রামবাসীর একটা কর্ত্তব্য আছে। এই জ্ঞান যখন তাহার ফোটে এবং সত্য সত্যই যদি গ্রামমণ্ডলী অর্থপ্রতিষ্ঠানে, কৃষি ও শিল্পপীঠ গঠনে একান্ত কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ ধর্ম্মঘটের সসম্মান নিষ্পত্তি সম্ভবপর হইবে। নচেৎ কংগ্রেস ও সহরবাসী কিছুদিন স্বার্থত্যাগ করিবার বা শ্রমজীবী অল্পদিন সংহত শক্তির পরিচয় দিবার পরে, ধর্ম্মঘটের আপনা আপনি নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—অসম্মানে অর্দ্ধসম্মানে বা কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনাতীত অনুগ্রহ বিতরণে। নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম্মঘটের নিষ্পত্তি করিতে হইলে, নিজের গৃহ এবং গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। কোন কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে হইলে তাহার ভিত্তি অনেক দিক দিয়াই সুদৃঢ় করিতে হয়।

অর্থ সাধনা

—:o:—

ইংরেজী "মুসলমান" পত্র মহাত্মাজীর কোটি মুদ্রার আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছেন— কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :—

"But India showed by her subscriptions that she would not be content with a mere passive wish to be free. Only those who intimately know the economic condition of India, can see

clearly what a world of meaning the subscription of a hundred lakhs of rupees signifies. But average annual income calculated in Lord Curzon's time, did exceed Rs 30. The present-day monthly income of an Indian is probably higher by far, but it cannot be far more than Rs 3. For such people, with such a low economic standard, with a wages scale which is far short of the living wage; which indeed does not assure to them even one full meal, and that of their cheap variety a day for such people to subscribe a hundred lakhs is an event indeed"

অর্থাৎ ভারতবর্ষ এই অর্থ সংগ্রহ প্রবল দেখাইয়া ছিল যে সে আর স্বাধীন হইবার অপেক্ষা। আক ... টুকু লইয়াই পরিতুষ্ট নহে। যাঁহারা ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে অভিজ্ঞ, কেবল তাঁহারাই ...পে, বুঝিতে পারিবেন, এই কোটী টাকার সংগ্রহটুকুর ভিতরে কতখানি অগাধ মর্ম্মব্যথাই না ...। লর্ড কর্জ্জনের সময়ে আমাদের বার্ষিক আয় গড় পরতায় দেখা গিয়াছিল ৩০৲ টাকার অধিক হয় না। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর জন প্রতি মাসিক আয় সম্ভবতঃ আরও অনেকখানি উঠিয়াছে, কিন্তু যতই উঠুক, ৩৲ তিন টাকার অধিক নয়, ইহা অবধারিত। এ হেন জাতি, যাহার আর্থিক মানদণ্ড এতখানি ছোট হইয়া পড়িয়াছে, যাহার শ্রমমূল্যের হার জীবিকা-মূল্যের চেয়ে ঢের কম, যাহার ফলে তাহাদের দিনান্তে এক বেলা পেট ভরিয়া অন্ন, তাহাও যার পর নাই যাহা তাহা দিয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়াও—জুটিবার কোনও নিশ্চয়তা পর্য্যন্ত নাই—এ হেন জাতির পক্ষে এক ক্রোড় টাকা চাঁদা তুলিয়া দেওয়া বাস্তবিক একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা!"

যাঁহারা এই কোটী মুদ্রার পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত বিশ কোটী টাকার হিসাবতালিকাটুকু বসাইয়া কটাক্ষচ্ছলে তুলনায় অগ্রসর হন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ও "মডার্ণ রিভিউ"-এর কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The money test, which is the test of sacrifice, is perhaps the surest test as to the wish and determination of a people in regard to a certain question, the opinion on which we desire to have. Judging by that test then, India's determination to free herself is clear beyond dispute. There are people, who foolishly argue that while only one crore and odd was subscribed to the Congress Fund, twenty crores were subscribed to the Government of India Loan and that therefore the Government of India enjoys greater affection and is regarded by the country with greater appreciation than the Congress is. The wiseacres who argue like this forget that while subscriptions to the Congress Fund are a real test of sacrifice, subscriptions to the Loan are exactly the opposite of such a test; and sacrifice determines comparative popularity. Nor can we forget that in this effort at sacrifice all classes, all creeds and all professions have freely partaken. The fair sex has given their ornaments as have the accumulating

rich and the struggling poor their quota to the Fund"

ইহারও বঙ্গার্থ টুকু অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

"অর্থের পরীক্ষা, যেমন উৎসর্গের পরীক্ষা, তেমনি বোধ হয়, ইহাই, জাতির কোন বিষয়ে আমরা অভিমত জিজ্ঞাসু হইলে, সেই বিষয়ে তাহার আকাঙ্খা ও সঙ্কল্পেরও সর্ব্বাপেক্ষা খর ও অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ। সেই কষ্টি পাথরে বিচার করিয়া দেখিলে, ভারতের স্বাধীনতা পাইবার দৃঢ় সঙ্কল্পে আর কিছুমাত্র বিমত থাকিতে পারে না। এমন লোক আছে যাহারা সন্দেহের ভাবে ... করে, যখন কংগ্রেস ফণ্ডে ন্যূনাধিক কোটি টাকা মাত্র সংগ্রহ হইয়াছে তখন গবর্ণমেণ্টের ঋণ বিশ কোটি টাকা বা তদধিক হইল, তখন কাজে কাজেই বুঝিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টই অধিকতর প্রতিপালন এবং কংগ্রেসের অপেক্ষা, দেশ তাহারই প্রতি সহানুভূতি অনুরক্ত। এরূপ বহির্দৃষ্টিকরণ বিচারের অভিমতে ভুলিয়া যান, কংগ্রেসের নাম চাঁদাদান বাস্তবিকই ত্যাগের পরিচায়ক, পক্ষান্তরে ঋণের জন্য যে অর্থ, তাহাতে বরং ঠিক ইহার বিপরীত বস্তুই সূচিত হয়। আর ত্যাগের মানদণ্ডেই ত কোনটি কতখানি লোকপ্রিয় তাহা নির্ণীত হইবে। আমাদের ভুলিলে চলিবে না, যে এই বিরাট ত্যাগ-যজ্ঞে সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়, সকল ক্ষেত্রের মানুষই স্বেচ্ছা ও স্বতঃ প্রণোদিত যোগদান করিয়াছে। মাতৃজাতি তাঁহাদের অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া দিয়াছেন, ধনী মহাজন যেমন সঞ্চিত ভাণ্ডার মুক্ত করিয়াছেন, আবার দরিদ্র জনও দুর্ভাগ্যের সহিত লড়িতে লড়িতে তাহার বিশিষ্ট অংশটুকু এই ফণ্ডে অর্পণ করিয়াছে।"

কথাগুলির উপর টীকাটিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। ভারতবাসীর স্বরাজ-পণে সংশয় করিবার কিছুই নাই—অন্ততঃ এইটুকু আজ খুব স্পষ্টরূপেই জাতির চিত্তে দৃঢ় প্রমাণ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। জাতির জাগরণ চারিদিক দিয়াই ক্রমশঃ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। সাধনা যেমন, সিদ্ধিও তদনুরূপ ত হইবেই।

গান্ধীজির ডাকে দেশ আজ মহোৎসাহে যে অর্থ যোগাইয়া দিল, তাহার নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীমতী নাইডুর উক্তি হইতে যতটুকু আভাস পাওয়া যায় এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই অর্থে মহাত্মা দেশে চরকা ও খাদির বিস্তৃত প্রচলন করিবেন, অস্পৃশ্য ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা করিবেন, জাতীয় শিক্ষা দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সেইখানে বয়নশিক্ষার ব্যবস্থাটিও হইবে প্রধান ব্যবস্থা, পরিশেষে মদ্যপান নিবারণের জন্য আন্দোলনেও ইহার ব্যয় হইবে। প্রচেষ্টাগুলি সবগুলিই মহৎ ও পুণ্যময়, এগুলি সফল হইলেই আমরা সার্থক হইব—মহাত্মা দেশে যে প্রাণপূর্ণ বিপুল আন্দোলন বহাইয়াছেন, তাহার খরপ্রবাহে দেশের অনেক আবর্জ্জনা ধুইয়া যাইবে, তাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি কোনদিনও নিরস্ত থাকিবার নয়, উদ্যোগপর্ব্ব এক প্রকার সাঙ্গ করিয়াই একবার তিনি বিদেশী বয়কটে মনোনিবেশ করিয়াছেন—তপস্বীর বজ্রকণ্ঠে এইবার যে শঙ্খধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেশ-প্রাণকে আত্মপরীক্ষায় ফেলিয়াই শুদ্ধ করিয়া তুলিবে—চাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। গান্ধীজির জয় হউক।

ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে নন-কো-অপারেশন সংগ্রামে বাংলার সহিত মহাত্মার একটু আধটু মত পার্থক্য ইতস্ততঃ পরিলক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। দলাদলি আমাদের জাতীয় রোগ, জাতির সেই অন্তরশুদ্ধি এখনও কি আসে নাই, যখন অখণ্ড নিষ্ঠার মন্ত্র-সিদ্ধির জন্যই সমস্ত তপঃশক্তি একত্র করিয়া সংগ্রামরত হইতে হইবে, জয়ই যে আমাদের করিতে হইবে, আত্মানৈক্যের দিন আর নাই, জাতীয় যজ্ঞের যে কঠিন পর্ব্বে আজ দেশ দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যদি এতটুক

দুরাশা মাত্র। যাঁরা জাতীয় মূলধন একত্র করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে উহার নিয়োগ করিবেন, তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে, দেশের ধনশক্তি বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ প্রণালী তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, দেশব্যাপী বাণিজ্য ও কৃষি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান বিস্তারই তাঁহাদের লক্ষ্য হউক—এই সমাহৃত অর্থের একটী কপর্দকও যেন অনাবশ্যক বিলাসিতায় ব্যয়িত না হয়, উপস্থিত ব্যয়ের দিন আমাদের নয়, এখন সঞ্চয় করিতে হইবে, উপার্জ্জন করিতে হইবে, জাতির ঋদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া চলিতে হইবে—অর্থক্ষেত্রে অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার একান্ত প্রয়োজন—বাঙ্গালীকে [illegible] মুখটি বুজিয়া দশটি দীর্ঘ বৎসর অক্লান্ত [illegible] একনিষ্ঠভাবে খাটিয়া যাইতে হইবে—তবে মা [illegible] ভূষণা কমলা বরদারূপে নূতন জাতির কণ্ঠে দিবে মালা পরাইয়া দিবেন। ব্রতশীল সাধক—মায়ের জন্য এই দুর্জ্জয় তপঃব্রত লইয়া কে কে এই বিপুল অর্থসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে অগ্রসর হও—বিদ্যাপ্রচারক ও লোকশিক্ষককে যেমন হইতে হইবে তপস্বী যোগী, এই অগণ্য অর্থসাধককে তেমনি যোগী তপস্বী হইতে হইবে। দারুণ economic failure জাতির শিয়রে নিয়ত বিভীষিকা মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উত্তেজনা প্রিয় দেশের খোরাক যোগাইতে যোগাইতে অনেক সৎকর্ম্মীকেও দেউলিয়া হইতে হইয়াছে—এরূপ লক্ষ্মীছাড়া কর্ম্মসৃষ্টি আর আমরা একেবারেই প্রশ্রয় দিতে রাজী নহি। এবার স্বাবলম্বী আত্মশক্তি সম্পন্ন [illegible] মহানন্দে জয় করিব—বাঙ্গালা দেশকে লক্ষ্মী, [illegible], বিদ্যা [illegible], ঐক্য ও তপস্যার ভিত্তির উপরেই অটুট [illegible] করাইয়া দিবে।

পুস্তক পরিচয়।

মহাজন সখা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহাজন—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত।

ইহাতে ব্যবসার রীতিনীতি নানারকম ব্যবসার কথা [illegible], ব্যবসার কর্ত্তব্য, দোকানদারী, রেলে মাল চালানের রেট ও নিয়ম, মোটামুটি নানারকম ব্যবসায়ের জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, কেমন জিনিষ হয়, কোন সময় খরিদ করা উচিত, পত্র লিখিবার প্রণালী প্রভৃতি বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব।

মহাজন—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত।

ইহাতে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মোকামের বিবরণ অর্থাৎ কোন মোকামে কিরূপে যাইতে হয়, কি কি জিনিষ পাওয়া যায়, কত সিকার ওজন, মাল খরিদ ও চালান কিরূপে করিতে হয়, আড়তদার ও মহাজনদিগের নাম ধাম সহ বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৩॥০ টাকা।

ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৮ [চতুর্দ্দশ সংখ্যা

বয়কট

মহাত্মা গান্ধী এইবার বয়কট ঘোষণা করিয়াছেন। রণনিপুণ সেনাপতির শান্তি নাই বিশ্রাম নাই অথচ উৎসাহে আবার নবোদ্যমে অবলম্বন করিতে দেশকে আহ্বান করিয়াছেন — এইবার একেবারে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া দেশকে অগ্রসর হইতে হইবে—সংগ্রাম ক্রমশঃ ভাবরাজ্য হইতে নামিয়া বস্তুতন্ত্র হইতে চলিল—বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যে অস্ত্র খুঁজিয়া আনিয়াছিল, নানা কারণে তাহা পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ ও শক্তি পায় নাই, মহাত্মার হাতে আজ তাহাই নূতন প্রাণ ও তেজঃমণ্ডিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—দেশের ভাগ্য যদি সত্যই সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে, প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও নিষ্ঠার অভাব হইবে না। ভারতবাসীকে এইবার জীবন সংগ্রামের কঠোর কর্কশ খুব শক্ত পর্ব্বটিতেই আসিয়া পৌঁছিতে হইয়াছে—যুদ্ধব্রতে দেশবাসী কতখানি সত্যই যোগ্য হইয়া উঠিল এইবার তাহাই নির্ণীত হইবে।

এ বয়কট আর্থিক অস্ত্র। আমাদের শাসকজাতি বৈশ্য-ক্ষত্র জাতি, বৈশ্য শক্তিই তাহার প্রাণ, বৈশ্য শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষাত্র বীর্য্য দিয়া এই জাতি আত্মরক্ষা করিতে জানে — ভারতের সহিত ইংলণ্ডের একটা মর্য্যাদাপূর্ণ বোঝাপড়া করিতে হইলে, এই অর্থনৈতিক বয়কটই উপযোগী উপায় বুঝিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্য মিলন যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডকে তাহার অনেকখানি স্বার্থ ছাড়িয়াই শুদ্ধ সম্বন্ধে দাঁড়াইতে হইবে—ভৃত্যে প্রভুতে মিলন হয় না—জাতিগত সমতার সুপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই স্বার্থসামঞ্জস্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বিরোধ মিলনেরই পূর্ব্ব ব্যাপার—আজিকার এই সংগ্রাম ভবিষ্যৎ মিলনকেই দৃঢ় ও সত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। ভারতের আত্মসংরক্ষণের জন্যও এই প্রাণময় অস্ত্র সঞ্চালনের একটা আবশ্যকতা আছে—নাহলে দেশাত্মা যোগ্য প্রতিনিধিকে নষ্ট করিয়া এমন শুষ্ক শব সন্ধানে এতখানি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবেন কেন?

৬০ কোটী টাকা এক বস্ত্র-শিল্পেই ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ প্রতিবৎসর চালান দেয়—এই টাকা এখনই বন্ধ করিতে পারিলে বণিকজাতির তহবিলে হাত পড়িবে—সহস্র আন্দোলনে যে সুফলের আশা নাই, এই একমাত্র উপায়েই তাহার আশু নিষ্পত্তির ষোলআনা

সম্ভাবনা—বাঙ্গালী একদিন ইহাই বুঝিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যেই বর্জ্জন, পিকেটিং, স্বদেশী—বাঙ্গালীর নিজের মধ্যে কিন্তু বৈশ্যবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণ তখনও হয় নাই - তা'ছাড়া বাঙ্গালী জাতি অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সাড়া ও সহানুভূতি সেদিন পায় নাই — আজ মহাজনী গুজরাট ও বোম্বাই যদি এক পৃষ্ঠায় পূর্ণাগতে তুলিয়া লয়—ব্যর্থতার সম্ভাবনা খুব কম—এ'ও ধ্বংস-যজ্ঞেরই একটা দিক -বড় দিক কিন্তু জাতির স্বভাব-শুদ্ধির জন্য অনেক কিছু সাময়িক স্তব অতি বাহুল্যের প্রয়োজন আছে। এই ঘোরতর অর্থনৈতিক সংগ্রামে ভারতবাসীর সাফল্যলাভ যদি ঘটে, জাতীয় স্বভাব অনেকখানিই পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে -নিশ্চিত ও বিরাট সত্য সৃষ্টি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই।

মহাত্মা তারিখ ধরিয়া দেশকে ধীরে ধীরে বয়কোপ যোগী শিক্ষাদীক্ষায় গড়িয়া তুলিতেছেন— এবার তাঁহার নির্দিষ্ট দিন ১লা আগষ্ট—মহাভাগ তিলক মহারাজের জন্মদিন। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নামাঙ্কিত "স্বরাজ্য ফাণ্ড" যেমন ৩০শে জুলাই তারিখে কোটী মুদ্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তেমনি তাঁহারই ঐ আসন্ন জন্মদিনে ভারতবাসীকে বর্জ্জন-প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ করিয়া তুলিতে হইবে—১লা তারিখ হইতে আর কাহাকেও বিলাতী বা বিদেশী বস্ত্র পরিচ্ছদে অঙ্গসজ্জা করিতে দেখিলে বড়ই লজ্জার কথা হইবে - এমন কথাই মহাত্মাজী ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন—ধনীশ্রেণী মোটা খাদি ব্যবহারে লজ্জা নিবারণ করিবেন -সঞ্চিত বিলাতী মালগুলি হয় পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা অ-বর্দ্ধিত মূল্যে জন সাধারণের মধ্যে চারাইয়া দিতে হইবে—ইহাই গান্ধী মহারাজের নূতন আদেশ। নূতন বিলাতী অর্ডার সমস্তই অবিলম্বে নাকচ করিয়া দেওয়া চাই—অনিচ্ছুক হইলে বস্ত্রমহাজনগণের উপর কড়া পিকেটিং এরই ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে—শুনা যায় এ সম্বন্ধে গান্ধী মহারাজের সহিত বোম্বাইএর মহাজনগণের যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে এ পর্য্যন্ত মোট ছয়জন মাত্র ব্যবসায়ী তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছেন—অবশিষ্ট সকলে ঘোর চিন্তারত—দেখা যাউক নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাত্মাজী কতখানি সাফল্য লাভ করেন—সত্যই এইবার দেশের অগ্নিপরীক্ষারই দিন- ভগবান্ দেশকে ত্যাগের, সত্যের শক্তিদান করুন।

বাংলার যজ্ঞ ব্যর্থ হইয়াছিল—সেদিন ব্যবসায়ী মহাজনের কোনও সাড়া পাওয়া যায় নাই— বাংলায় সংকটের সুযোগ পাইয়া আমেদাবাদের কলওয়ালাগণ লোলুপ লালসাবহ্নি চরিতার্থতা সাধনে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল- দেশের চারণও কত অবিশুদ্ধ ছিল- স্বদেশী শালমোহর মুদ্রিত বিলাতী শাঁইট কাটাইতে কাহারও সঙ্কোচ ছিল না আজ গান্ধীজির পুণ্য প্রভাবে দেশ আত্মশুদ্ধির পথে অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে— পশ্চিম ভারতের কলওয়ালাগণের উপরে মহাত্মার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি প্রভাব বড় সামান্য নয় আশা করা যায় বিদেশীবস্ত্র বর্জ্জন সূত্রে নাগে দেশে কাশ্মীর ম্যানচেষ্টার লাঙ্কাশায়ারের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে না- দেশীয় বস্ত্রশিল্পেরই পুনরুদ্ধার চাই— তাহার জন্য দেশের জন' সাধারণের স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি সম্যক মনোযোগ রাখিয়াই কার্য্য করা হইবে - দেশপ্রতিনিধি গান্ধিজির নিকট দেশ এরূপ বিধি ব্যবস্থারই প্রত্যাশা করে ইহা বিচিত্র নয়—এবার কোন কারণেই দ্বিতীয় অর্থ-নৈতিক ব্যর্থতা জাতির জাগরণ ইতিহাসের উপর একটুকু চিহ্নপাত না করে—সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতে হইবে—বারম্বার আশাভঙ্গে জাতির উৎসাহাগ্নি ম্লান হইয়া পড়িবার অনেকখানি সম্ভাবনাই নাই কি?

তবে যাঁহারা শুধু ভাবোচ্ছ্বাসের উপর জোর করিয়াই সাফল্য প্রত্যাশা করিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নাই একথা বলাই বাহুল্য।

দেশের জন্য আত্মত্যাগ মহৎ সামগ্রী; উহা জাতীয় উত্থানের অমূল্য উপাদান—কিন্তু এই বস্ত্রযজ্ঞের একটা বস্তুতন্ত্র দিকও আছে—সেটাও একটা খুবই প্রয়োজনীয় দেখিবার দিক—দেশনেতৃগণের দৃষ্টি সেদিকেও পূর্ণাকৃষ্ট হওয়া চাই। প্রাণ যখন জাগে হিসাব করিয়া জাগে না সত্য কথা—কিন্তু জড় বস্তুর একটা হিসাব আছে, গণনা আছে—এই গণনার দিকটাতে দৃষ্টির অভাব ঘটিলে, শুধু উন্মাদনাময় ভাবতরঙ্গের উপর সন্দীপন কখনও জয়যুক্ত হইবে না। পরন্তু কতক দিন এমন কি হয়ত অনেক দিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও পরিশেষে ভগ্নাশা পড়িতে হইবে। এজন্য অনুষ্ঠানক্ষেত্রে খুব [illegible] দেশকে সম্বন্ধ সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

গণনাবিদ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতে যে ন্যূনাধিক দুইশত আশী কোটী গজ কাপড় আন্দাজ প্রতি বৎসর প্রয়োজন হয় তন্মধ্যে ১৯১৯ সালের গণনানুসারে ৭৮ কোটী ১০ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে আমদানী করিতে হইয়াছে—সুতরাং এই বিলাতী আমদানী বাদে ভারতবাসী প্রায় একশত ১০ কোটী গজ কাপড় অন্য উপায়ে পাইয়াছে। ঐ বৎসরে দেশীয় মিল সমূহে উৎপন্ন প্রায় ২০ কোটী ১০ লক্ষ গজ কাপড় ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। সূতাও ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল প্রায় ১৮ কোটী [illegible]০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক— অবশ্য উহা সুচিক্কণ সূতা নয়—কাজেই উহা বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। ভারতে ১৯১৯ সালে সূতা আমদানী হইয়াছিল মোট ১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র। এই এক কোটী দশ লক্ষ পাউণ্ড বাদ দিয়া ভারতের প্রস্তুত মোটামুটি ১৩ লক্ষ পাউণ্ড সূতা যদি আমরা দেশেই আটকাইয়া রাখিতে পারি, প্রতি পাউণ্ড সূতায় ৪।০ গজ কাপড় ধরিয়া আমরা পাইতে পারি আরও প্রায় ৫৮ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কাপড়। ইহার উপর ভারতে প্রস্তুত যে কাপড় বাহিরে রপ্তানী হইয়া যায়, আগে আত্মসংরক্ষণের জন্য উহাও ধরিয়া রাখিতে পারিলে ভারতবাসীর ব্যবহারের জন্য বিদেশী বস্ত্রের প্রয়োজন একেবারেই হয় না—ইহা হিসাব করিয়া কড়া ক্রান্তি গণিয়াই দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা হিসাবী লোক—ভারতের উৎপন্ন সূত্র-বস্ত্রে ভারতের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র সরবরাহ অসম্ভব বিবেচনায় বয়কটে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদের কথার অসারত্ব এরূপ বিশেষজ্ঞের চুলচেরা হিসাবে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতে পারে। যে এক কোটী দশ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বিদেশাগত, তাহার অভাব দেশেই পূরণ করিয়া তোলা একেবারে অসম্ভব নয়। অবশ্য গান্ধীজি এইসব বিবেচনা করিয়াই চরকার প্রচলনে মনোযোগী হইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ চরকা দেশে সজোরে চলিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুশৃঙ্খলার সহিত সেই চরকা-উৎপন্ন সূতার সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলে, এই সূত্রাভাব কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত না হইবে- এমন নহে।* এদিক দিয়া গান্ধীজির প্রশংসনীয় উদ্যম যতটা সফল হয় ততখানিই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই- কিন্তু আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ফলে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাই

বাধ্য হইয়াছি, যে আদিম চরকা ব্যবসায় হিসাবে চলিতে পারে না—যতখানি চলে চলুক—উহার উৎকৃষ্টতর সংস্করণ হইলে অবশ্য কথা নাই—কিন্তু এখন এই কোটী পাউণ্ড চিক্কণ সূতা যেমন তেমন করিয়াই ভারতেই যতদিন না প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে—ততদিন বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঘুচিতে পারে না। কথাটা বয়কটপন্থীগণকে ভালরূপই বুঝিয়া লইতে হইবে।

বস্ত্র বয়কট সম্বন্ধে এই কথা। কিন্তু শুধু বস্ত্রেই আমাদের অর্থরাশি জলস্রোতের মত বিদেশে বাহির হইয়া যাইতেছে না—বস্ত্রের পর চিনি, তারপর লবণ, সিগারেট, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি। গান্ধীজির তীক্ষ্ণদৃষ্টি

এদিকেও আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—তবে তিনি মহাকর্ম্মী, একটার পর একটা করিয়া অনুষ্ঠানাঙ্গগুলি সুনিষ্পন্ন করিয়া তুলিতে জানেন। ৫০ কোটী টাকার নির্গম স্রোত রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিলেও, ভারতের আর্থিক স্বাস্থ্য অনেকখানি প্রকৃতিস্থ দশা ফিরিয়া পায় —গান্ধী মহারাজ চরকার প্রচলনে একান্ত মনোযোগী আছেন, তেমনি সুক্ষ্মতর হিসাব করিয়া সমধিক ফল-কর্ম্মী উপায়ে কোটী পাউণ্ড মূল্যের সরবরাহ ব্যবস্থা যদি করিয়া তুলিতে পারেন তাহা হইলে দেশের বহু সমস্যার নিরাকরণ আর দুরাশার মধ্যে থাকে না। বয়কট একদিকে অর্থ-নির্গম বন্ধ করুক, অন্যদিকে ভারতবাসী তাহার লজ্জানিবারণের জন্য কলা ও হস্তশিল্পের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্যক উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সূতা ও কাপড় প্রস্তুত করিয়া তুলুক। বস্ত্রশিল্পেও দি স্বাধীন হইয়া উঠিতে পারি, সেই জয়শক্তির আমাদের ধীরে ধীরে অন্যান্য সকল বিষয়েই অনন্যনিরপেক্ষ ও আত্মাবলম্বী হইয়া উঠিবার আশা ও বলদান করিবে।

ভারতবর্ষের আর্থিক আত্মপ্রতিষ্ঠার উপর তাহার বাহিরের স্বারাজ্য সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। বস্ত্রে, অন্নে, পণ্যশিল্পে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবেই আমাদের স্বাবলম্বন গ্রহণ করিতে হইবে। বয়কট হইতেছে অর্থনীতিক ভাঙ্গনের দিক—আর্থিক ক্ষেত্রে, আমাদের পরনিষ্ঠা ঘুচাইতে গেলে তীব্র আঘাতেই সে মোহ ভঙ্গ করিতে হইবে। ভারতবাসী যে আত্ম-অভাব পূরণে অক্ষম, তাহার আসল কারণই এই মোহ ও অজ্ঞানতা, আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস, আপন দুরবস্থা বিষয়ে ঘোরতর অনভিজ্ঞতা। আপনার অবস্থা বুঝিলেই তাহার নিরাকরণের জন্য সম্যক্ ইচ্ছা জাগিয়া উঠিবে—ইচ্ছাই শক্তি—ভারতবর্ষে এই প্রবল স্বাবলম্বন ইচ্ছা ও শক্তি জাগাইয়া তোলাই গড়নের দিকের কাজ—সেই কাজই মুখ্য ও আসল কাজ—গান্ধীর বয়কট সফল হইলে ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া এই গড়নের পথটিকেই নিষ্কণ্টক ও সুপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। গঠনের অনেক দিক। জাতি আমাদের ভাঙ্গিয়াছে আজ নয়—জাতিত্বের প্রতিষ্ঠাই মূল, সেই মূল একবার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে জাতির সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়াই স্বাস্থ্য ও জীবনের তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিবে। নন্-কো অপারেশন জাতিকে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটা বিপুল প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। জাতিকে বাহিরের নিষ্ঠুর অবস্থাচক্রের নিষ্পেষণে পিষিয়া পিষিয়া আজ স্বভাবের ধারে অন্তর্ম্মুখী করিয়া তুলিতেছে। জাতির মনোরাজ্যে এই অনুবাদ আজ আর সংশয়ের সামগ্রী নয়।

সমাচ্ছন্ন জাতির আপাদমস্তক সর্ব্বশরীরে একটা প্রবল বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলা করিতেছে—গান্ধীর এই আর্থিক বর্জ্জনাভিযান সফল হইলে, এই জাগরণোচ্ছ্বাস আরও অনেকখানিই জমাট ও বস্তুতন্ত্র হইয়া জাঁকিয়া বসিবে—ভাবপ্রতিষ্ঠান ও অর্থপ্রতিষ্ঠান এই দুই ভিত্তির উপরেই ত জাতীয় জীবন দৃঢ়মূল হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

আমরা সৃষ্টির দিক হইতেই এই দুই বিষয়েই প্রাণপণ আত্মনিয়োগ করিয়াছি। গান্ধীজির নন্‌কো-অপারেশন বা বিদেশীবর্জ্জনে আমরা ভগবানের অভিপ্রেত ইঙ্গিতই লক্ষ্য করিলেও, আমাদের অভ্রান্ত প্রেরণা আজ সৃজনমুখী—বাংলায় রুদ্রযজ্ঞ—আজ করিয়াই আমরা দিব্য নির্ম্মাণপথের অভিযাত্রী হইতে আদিষ্ট হইয়াছি। বিধাতার অলঙ্ঘ্য আদেশ ব্যর্থ করিবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা আমাদের নাই—দেশে এই মহাশক্তির অবাধ বলেই আমরা নূতন ভাবক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিব। জাতীয় ভাব—সে যে সত্যবস্তু—একটা শক্তিপূর্ণ সনাতন জিনিষ—ভারতের সনাতন ধর্ম্মেই তাহার আসল ও মূল প্রতিষ্ঠা—সাধনার ভিতর দিয়াই ভারতের অন্তর-জাগরণ সত্য সত্য সফল হইয়া উঠিবে—এই জন্য এক বিপুল নূতন সাধনার মহা

তরঙ্গই দেশে সর্ব্ব প্রথমে বহাইয়া দিতে চাই—মহা তরঙ্গ আসিতেছে, আমাদের কেবল যন্ত্রস্বরূপ বাধাগুলি মুখ হইতে সরাইয়া দিতে হইবে—উৎস-মুখ একবার খুলিয়া দিতে পারিলেই সহস্র গঙ্গাস্রোত মত মুক্ত অজস্র ধারাতরঙ্গে ঢেউ খেলাইয়া এই মহাদেশ প্লাবিত করিয়া দিবে—আমরা দিবানেত্রে দেখিয়া ধীর ধৈর্য্যে এই সৃষ্টিপ্লাবনেরই অবস্থা প্রস্তুত করিয়া দিতে চাই।

এই একই সৃজন শক্তিকে ফলাইয়া ধরিয়া আমরা এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে লক্ষ্মী মায়ের পুণ্য প্রতিষ্ঠাও করিব। দেশের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রগুলি মায়ের লুকান অন্বেষণ রাখিয়াছে, উহাকে সুশৃঙ্খলার সহিত অসীম শ্রদ্ধায় ও শ্রমে, উদ্ধার করিয়া আনিব, দেশের উদার বক্ষে যত কাঁচা মাল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেগুলি ধীর নিষ্ঠাভরে সহস্র হস্তে কুড়াইয়া আনিয়া, সহস্র সহস্র অঙ্গুলিতে তাহা হইতে বিচিত্র শিল্পসামগ্রী রচিয়া তুলিয়া আপনাদের পণ্যাভাব আপনারাই মিটাইয়া লইব। জেলায় জেলায় বস্ত্রভাণ্ডার খুলিয়া আমাদেরই ছেলেরা দেশের বস্ত্রসমস্যা পূরণ করিয়া তুলিবে। কর্ম্ম একদিনের নয়, এক মাসেরও নয়, দীর্ঘ দীর্ঘ বৎসর অক্লান্তকর্ম্মী সহস্র আত্মার বিন্দু বিন্দু উৎসর্গ একত্র করিয়াই জাতির সিদ্ধ লক্ষ্মীসম্পদ্ চির-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—এতখানি নিষ্ঠা, এতখানি শ্রম, এতখানি উৎসর্গ ও ধৈর্য্য লইয়া কাহারা এই মহা নির্ম্মাণযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিতে সাহস রাখ, স্পর্দ্ধা রাখ আপন অন্তরে অখণ্ড ঐক্য ও অলঙ্ঘ্য প্রেরণা খুঁজিয়া পাইয়াছ কাহারা—তাহাদেরই আজ এই নব যজ্ঞের পৌরহিত্য গ্রহণ করিতে হইবে। পথ একবার প্রস্তুত করিয়া যদি তুলিতে পার, তোমাদের তপস্যা নির্ম্মিত সেই সিদ্ধ পথে তখন অগণ্য যাত্রী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তোমাদের মহোৎসাহে পশ্চাদনুসরণ করিবে। ওগো নূতন যোগী তপস্বীর দল, সর্ব্বস্বহারা বীর কর্ম্মীদল—আর কয়েকটা বর্ষ অসীম ধারণসামর্থ্য লইয়া বাংলার এই নবসৃষ্টির ভিত্তিপ্রতিষ্ঠান অনবদ্য ও সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোল—জয়লক্ষ্মী তোমাদেরই কণ্ঠে বরমাল্য দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কর্ম্ম-প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ এবং কর্ম্মপ্রবণ। এখানে অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা ধর্ম্মের নামে পাগল আর কর্ম্ম করতেও খুব তৎপর, কিন্তু সব জিনিষকে তলিয়ে ঠিক করে বুঝে জ্ঞান দিয়ে অধিগত করে কর্ম্ম করা বাংলার স্বভাব নয়। এখানে আমরা সাধারণ লোকের কথাই বলছি, খুব অল্পসংখ্যক যাঁরা ইংরাজী শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্যের তর্ক এবং দর্শন শাস্ত্র পড়েছেন, তাঁদের কথা হয়ত একটু স্বতন্ত্র। বাংলার সাধারণ যে লোক তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ধর্ম্মের স্রোত বইতে দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি ভক্তির উপর আশ্রয় করে মানুষ আপনাকে ভাসিয়ে দেয় আবার কর্ম্মেও মেতে যায়। চৈতন্য যুগ থেকে আমরা বাংলায় এই রকম ভক্তিপ্রাবল্য দেখে আসছি। প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি নিয়ে মানুষ খুব

খুব বড় বড় কর্ম্ম করে তুলতে পারে, একজনকে পিছনে রেখে তারই উপর ভর করে মানুষ সেখানে কোনরকম না ভেবে কর্ম্ম করে চলেছে, কেননা সেই ব্যক্তির উপর কর্ম্মীর অসাধারণ ভক্তি আছে— কোন দিন সে ভাববে না, যে, যে-কর্ম্ম সে করে চলেছে তার পরিণাম কি এবং তার সুদূরপ্রসারিত কি সার্থকতা বা আছে। নির্ভরতা খুব শ্রেষ্ঠ উপায় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে মানুষ কতদূর এবং ক'দিনই বা কর্ম্ম করবে? এমন একটা অবস্থা আসতে পারে, যেদিন তার ধূ[illegible] হয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, কারণ এরূপক্ষেত্রে অনেক স্থানেই মানুষের শক্তি হয় তামসিক আর এই তামসিক শক্তি নিয়ে মানুষ চিরকাল তার কর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে না, একদিন যেদিন তার ভক্তির প্রাবল্য কমে যাবে, তখন যে কর্ম্ম এখন সে খুব উৎসাহসহকারে করে চলেছে, তার মধ্যে শিথিলতা আসবে, ক্রমে তা ভেঙ্গে পড়বে।

* * *

কর্ম্ম করার আর একটা দিকও আছে। সে হচ্ছে কর্ম্ম না করে থাকতে না পারা, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা যেমন তেমন কর্ম্ম পেলেই তা নিয়ে মেতে যান। বাংলায় অধুনা যে কর্ম্মীর দল দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীর। অনেক ছেলে স্কুল ছেড়ে বেরিয়েছে, তাদের ত একটা কিছু করা চাই, তাই নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্ম ভিতর থেকে না ধরতে পেরে, সামনে যা আসছে তাই নিয়েই তারা ছুটেছে; কেহ চলেছে গ্রামে গ্রামে "প্রপেগেণ্ডা"র কাজ করতে, কেহ কেহ উৎসাহের সহিত গ্রাম্য সেবা সমিতি গঠন করতে লেগে গিয়েছে, কেহ বা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অনশনক্লিষ্ট গ্রামবাসীর জন্য ও আসাম প্রত্যাগত কুলীদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে দরিদ্র নিঃসহায়দের দুর্দিনের অন্ন সংস্থান করে দিচ্ছে। আবার কারা ও বা ধর্ম্মঘট ব্যাপার নিয়ে, হরতাল নিয়ে খুব লাফালাফির সহিত কর্ম্ম করছেন। অবশ্য জাতি যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, নানা ক্ষেত্রে এইরূপ নানা কর্ম্মীর দল আবশ্যক নাই, এরূপ আমরা বলি না; এই সব যুবকসংঘ মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে যে জীবনী শক্তি ঢেলে দিচ্ছেন, তা খুবই সময়োপযোগী, তাতে জাতি যে সজাগ হয়ে উঠছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দুঃখ, এই সব কর্ম্মীর দল জানেন না, তাঁহারা কিসের জন্য কর্ম্ম করছেন, ইহাতে জাতীয় জীবনের কি সার্থকতা আসবে, ইহার সম্যক জ্ঞান কাহারও নাই। যাঁহারা এইরূপ কর্ম্ম তরঙ্গে প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম বা উচ্চ কোন কর্ম্মপ্রেরণা দেখেছি, কিন্তু কি জানি কেন তাঁদের এই নিঃস্বার্থ কর্ম্ম, তাদের আন্তরিক পরিশ্রম তেমন সুফল প্রসব করছে না, তাদের পরিশ্রমের মধ্যে হয়ত এমন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, যার জন্য সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হচ্ছে বা খুব স্বল্প সিদ্ধি এনে দিচ্ছে। কয়েক বৎসরের কর্ম্ম তরঙ্গের মধ্যে থেকে আমরা বেশ বুঝেছি, শুধু কর্ম্ম করবার জন্য কর্ম্ম নিয়ে মেতে থাকলে কিছুই ফলোদয় হবে না, বৃথা শক্তি ক্ষয় হবে মাত্র।

* * *

কর্ম্ম হচ্ছে সাধনা, জীবনে যা কিছু করছি সমস্তই ভগবানের জন্য, এই জ্ঞানে কর্ম্ম করতে হবে। একটা কিছু করা চাই বলে যে, সম্মুখে যা আসবে তাই নিয়ে লেগে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমি কর্ম্ম করবো আমারই অন্তরাত্মার পূর্ণ নির্দ্দেশে, ভিতর হ'তে যে প্রেরণা আমার জাগবে, আমি সেই মতই কর্ম্ম করে চলবো; তবে সমস্যা হচ্ছে, সম্মুখে যে অসংখ্য কর্ম্ম স্রোত ভেসে আসছে, তার মধ্যে কোনটি আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তাহারই নির্ণয় করা। মানুষের প্রকৃতি এমনই ভাসা ভাসা অবস্থায় থাকতে চায়,

যখনই উপরের স্তরের সে হয়ে গিয়েছে, যে কোন একটা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা তাহার সাধ্যাতীত। কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, বড় জোর কোন একজন নেতার উপর নির্ভর করে সে নিশ্চিন্ত, ইহাতে তাহার দেবত্ব বিকাশের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যত্বও পূর্ণ বিকাশ পায় না। গড্ডলিকা প্রবাহে কর্ম্মতরঙ্গে আপনাকে ভাসিয়ে দেওয়াই মানুষের সাধারণ স্বভাব, এই স্বভাব যতক্ষণ অপরিতৃপ্ত থাকে, ততক্ষণ সে স্বচ্ছন্দরূপে তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে কর্ম্ম করে, কিন্তু যেখানে শক্তির মূলে কোন প্রতিবন্ধক, সেইখানেই তাহার কর্ম্মোৎসাহ কমে পড়ে, এরূপ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মনে হয়, মানুষ যেন নিজের বাসনা চরিতার্থের জন্য আত্মপ্রসাদ লাভের জন্যই কর্ম্ম করে। কর্ম্ম করবার মধ্যে যেখানে উপরের প্রেরণা নাই, উপরের প্রেরণা অনুধাবন করবার মত সামর্থ্যও নাই, শুধু নেতাদের উপর চিন্তার ভারটা দিয়া সবর মন্ত্রণা কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়, ইহাতে কর্ম্মের যে আত্মপ্রসাদ তাহা লাভ হয় না, কর্ম্ম সেখানে জীবনকে প্রাপ্ত বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে, কিছুদিন এইরূপ কর্ম্ম করে যখন সে দেখে তাহার জীবনের উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে না, তাহার মনে প্রাণে শান্তিলাভ হচ্ছে না, এমন কি তাহার বুদ্ধিরও সন্তুষ্টি আসছে না, তখন নিরাশ মনে ভগ্ন হৃদয়ে সে তাহার জীবনের সকল সামর্থ্য ব্যয় করে' সকল উৎসাহ ক্ষয় করে' প্রত্যাগমন করে' দেখে তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ পথ বন্ধ, উপায় নাই, অবলম্বন নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই—পূর্ণ ভগবৎ-সাধনায় জীবন ভরপুর করে' না তুলতে পারলে, জীবনের যাহা কিছু বাসনা কামনা সমস্তই ভগবৎ-চরণে উৎসর্গস্বরূপ প্রদান করতে না পারলে, ব্যর্থতায় এমনি শূন্যে হাল্কা করে' বেড়াতে হবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

* * *

উপরে দু'রকম কর্ম্মের কথা বলেছি, এক হচ্ছে ভক্তিকে আশ্রয় করে কর্ম্ম করা, আর এক হচ্ছে শক্তিকে আশ্রয় করে কর্ম্ম করা, কিন্তু উভয়েরই ত্রুটী এবং বিচ্যুতি আছে; জ্ঞান না থাকলে কোন কর্ম্মই পূর্ণ হয় না। দেশে কর্ম্মীর ত অভাব নেই, অসংখ্য মানুষ কর্ম্ম করবার জন্য উন্মাদ হয়ে একজন নেতার আদেশে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি ছুটাছুটী করছে, কিন্তু এই কর্ম্ম করাই ত সব নয়। শুধু বর্ত্তমানের উপরের স্তর দেখলে মনে হবে খুব কর্ম্ম হচ্ছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ভবিষ্যতের দিকেও ত দৃষ্টি রেখে কর্ম্ম করতে হবে, এইখানেই অনেক নেতার বিচক্ষণতার অভাব প্রকাশ পায়, কারণ হচ্ছে এই, তাঁরা যোগের মানুষ নন। একটা শক্তিকে কেন্দ্র করে' অনেক কিছু কর্ম্ম হতে পারে, ভক্তিকে আশ্রয় করেও বড় কাজ হতে পারে, কিন্তু তাতে কি হবে? বর্ত্তমানের কাজ হচ্ছে পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করা, জগতের ভবিষ্যৎ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে, কর্ম্ম করবার অনেক মানুষ পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্য কর্ম্মের জন্য চাই যোগের মানুষ। যোগের মানুষ না হলে যে বিরাট কর্ম্মের ভার এসে পড়বে তাহা সাধারণ বুদ্ধিজীবী বা হৃদয়জীবী মানুষ, যত বড় নেতা বা কর্ম্মীই তিনি হউন না কেন, তাহার পক্ষে অবধারণ করা সম্ভব হবে না।

* * *

ভারতকে ভবিষ্যতে যে বিপুল বিরাট কর্ম্মভার নিয়ে দাঁড়াতে হবে, তারই সূচনাস্বরূপ সমগ্র জগতে মস্ত একটা আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে। আগামী ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জগতে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন আসবে, সব ওলট পালট হয়ে যাবে, তার পর যে জগৎ উঠবে, তাতে ভারতের সভ্যতাই হবে জগতের সভ্যতা। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের কাজ [illegible]

জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্য। ভারতের কাজ তাই পূর্ণ মানুষ তৈয়ারী করা, নীরব আত্ম সাধনার মধ্য দিয়ে এই কার্যাই আরম্ভ হয়েছে। যোগীর পক্ষে সবই সম্ভব, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা বিচিত্র সৃষ্টিও করে' তুলতে পারে। তবে তিনি চান যোগের মধ্য দিয়েই জগতে এক নূতন সৃষ্টি। যোগের প্রকাশস্বরূপ পরিপূর্ণ কাজের উপরই জগতের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম নির্ভর করছে - সে কাজ খুব বিস্তৃত। পূর্ণ মানুষের দ্বারা যে কর্ম্ম সৃষ্টি হবে তাহাই ভবিষ্যৎ জগতের কাজ। পূর্ণ মানুষ না জন্মালে কাজও কখনও পূর্ণ হয় না; শুধু ভক্তি এবং শক্তি নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের অভাবে সে সব কাজ স্থায়ী হয় নি, আর শুধু ভক্তি এবং শক্তির দ্বারা জগতে যে কাজ হয়েছে, তাহা ভগবৎ-কার্য্যের কতটুকু ক্ষুদ্র অংশ। কিছু গড়ে উঠেছিল, পূর্ণ জ্ঞানের অভাবে সব ভেঙ্গে গেছে। এখন চাই অধ্যাত্ম-জ্ঞান, প্রগাঢ় প্রেম এবং অসাধারণ শক্তি, তবেই পরিপূর্ণ কর্ম্ম হবে। জ্ঞান পূর্ণ হলেই, কর্ম্ম পূর্ণ মূর্ত্তি পাবে। আজ তারই সাধন চলেছে। হে বাংলার নবীন, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও, তাকেই আশ্রয় করে নীরব সাধনার মধ্য দিয়েই কর্ম্ম করে যাও, বাহিরের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ো না, ভিতর হতেই ভগবানের দিব্য মূর্ত্তি ফুটে উঠতে দাও, তোমার সাধনায় যে নূতনের সৃষ্টি হবে, তাহা জগতেরই হবে এক অপূর্ব্ব সম্পদ।

দেশ-হৃদয়

বর্ত্তমান বাংলার যে-চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে তাহাই কি দেশ-হৃদয়ের পরিচায়ক? বাংলার শান্ত ও পরিব্যাপ্ত যে দেশ হৃদয় আসমুদ্র হিমাচল স্পর্শ ও পূর্ণ করিয়া নীরবে ও নিরাড়ম্বরে ভারতের হৃদয়বেদী অধিকার করিতেছে—যাহার অন্তরতম প্রভাবে বিশ্ববিমোহন নব দেশপ্রীতির তরঙ্গ-হিল্লোলে বিশ্বের বুক অন্তরে অন্তরে ভরিয়া উঠিতেছে, বাংলার দেশ-কোলাহল, প্রভাতপূর্ব্ব মুখর কাকলীর ন্যায়, আজ কি তাহারই পূর্ব্বাভাস কীর্ত্তন করিতেছে?—না আকস্মিক বাত্যাপীড়িত সশঙ্ক দেশ হৃদয় বুকফাটা আর্ত্তনাদের মুখ-দ্বার বন্ধ করিয়া বিপুল আয়োজনে আপনার প্রাণরক্ষার ব্যাপৃত! ইহার সদুত্তর মিলিবে কি?

দেশের বর্ত্তমান কার্য্যে ইহার সদুত্তর মিলিবে কি? ১৯২০ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রচণ্ড গান্ধী-প্রবাহ পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া বাংলার তটে যে-শিলাখণ্ডে আছাড়িয়া চূর্ণ তুষার-কণায় পরিণত হইয়াছিল আমরা কি তাহারই দিকে তাকাইব? না ডিসেম্বরের পর হইতে বাংলার সপ্তমাসব্যাপী আশা-উদ্যম-ভরা কার্য্যাবলীর মধ্যে যে প্রাণের পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে তাহারই মধ্যে এই গূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার হইবে? যেদিকেই দেখি, এ-যে সশঙ্ক ভারতপ্রাণ নীরবে বা আস্ফালন করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে চাহে! ইহার তাৎপর্য্য অবশ্য প্রকাশ করিলে ভাল

হইত, কিন্তু ডিসেম্বরের পূর্ব্বের ও পরের দেশ-হৃদয় যদি রুদ্র বাত্যাপীড়িত সশঙ্ক দেশপ্রাণকে নিবিড় আলিঙ্গন করিয়াই থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত বিদ্যুৎ-বল তেজঃদীপ্ত শুভ্র বীর্য্যকণা জমাট বাঁধিয়া দেশের বুকে যে অগ্নি-গোলক জমা করিতেছে, তাহার সহিত এই দেশ-হৃদয়ের যোগাযোগ করা যায় কিনা তাহার নির্ণয়ই বোধ হয় অধিক কার্য্যকরী।

স্বদেশীর ঢেউ এড়াইয়া বা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বদেশীর ঢেউ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবহারজীবীদিগের নিবিড় সম্মিলন-চক্রে যখন দেশের প্রাণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তখন সে প্রাণে কিছু আতঙ্ক ছিল বই কি! বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থী সাহসের ভরা-পালে বুক ফুলাইয়া জীবন-তরী ভাসাইয়াছিলেন—তেজঃ-বীর্য্য-বীরত্ব-মহত্ত্ব-ভরা তাঁহাদের দেশে তাঁহারা সদাই বিচরণ করিতেন, কিন্তু এক-দুই-তিন পদ অগ্রসর হইয়াই বিষম ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তাঁহারা যে-মনের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে নবযুগের অভিনব সদ্‌গুণ-রাজির উজ্জ্বল আভাস বর্ত্তমান থাকিলেও সময়ে সময়ে যে আতঙ্কের—যে দুর্ব্বল শিহরিত আত্মার নিদর্শন আমরা নির্ব্বাসিত ও রাজবন্দীদের মধ্যে দেখিয়াছি, তাহা বিরল হইলেও, তাহাই বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিতেছে, আমাদের প্রাণে যে-দুর্ব্বলতা—বিভিন্ন প্রকার তার অভিব্যক্তি—অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সুখে বিচরণপূর্ব্বক শতচ্ছলে বিস্তৃত হইতেছিল, যাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, তাহাকে তাঁহারাও সমূলে উৎপাটন করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের ত্রুটিটুকু যে বিশেষভাবেই সকল প্রকার স্বদেশী ও রাজনীতি ব্যবসায়ীর অন্তঃকরণে বর্ত্তমান ছিল তাহাও ঐ সুযোগে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

কিন্তু ১৯১০ সালের পরের বাংলা ধিকি ধিকি বাংলার প্রাণময় সত্তা বহন করিয়া যে রাজনৈতিক চক্র গড়িয়া ও যে রাজনীতিক অন্তঃকরণ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সে-যেন মনে করিয়াছিল রাজনীতির প্রশস্ত পথে আশ্রয় লইয়া সে ভীতির হাত এড়াইয়াছে—বাংলার একটা বিষম তাল সে সামলাইয়া লইয়াছে। এইরূপে সাহসদৃঢ় অতি বুদ্ধিমানের দল বাংলায় যখন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের কঠিন বাহ্যিক আবরণে গান্ধীপ্রবাহ আছাড় খাইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

আবার বাংলার স্বদেশীযুগের ভাব-উচ্ছ্বাস দমিয়া দমিয়া যে কঠিন আবরণে সভয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজনীতি-অতিরিক্ত মার্গে নিজের পুষ্টি ও রস-সংগ্রহ লাভ করিয়া একটা নির্ভয় আত্মসত্তা বুকে ধারণ করিয়া চলিতেছিল, প্রবল ভাব-বন্যার ধ্বনি মুহুর্মুহু শ্রবণ করিয়া সে যখন গুহাবদ্ধ আর থাকিতে পারিল না, গুহা ত্যাগ করিয়া প্রবলের সহিত সমান মাপে কলকল হাস্যে ও দম দম দাপে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন নিজের নিকট সে যত গুরু গম্ভীর গাঢ় নিরেট সবল বোধ হউক না কেন, আতঙ্কের উন্‌ সুরা তাহার গমন-উচ্ছ্বাসগীতিতে বাহির হইয়া পড়িতেছেই।

অবশ্য একই গুহা হইতে বা একই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া 'শান্তিশৃঙ্খলা' বিধায়িনী ভাব-ধারার অবতরণ হয় নাই, বাংলার 'লিবারেল' খুব লিবারেল বা উদার ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি যে কড়া পাহারার স্বপ্নে মগ্ন আছে তাহার সহিতও ইহাকে সংযুক্ত করা যায় না, কিন্তু দেশের সেবক Servant পত্র ত কেবল শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দরের মতামতের যন্ত্রস্বরূপ হইল, নায়ক পত্র শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ও অমত প্রকাশ করিবে, (কল্পনা না সত্য?) মধ্যপন্থী বেঙ্গলী দলাদলি অতিক্রমণ পূর্ব্বক বিমল সহযোগ নীতি প্রচার করিবে, গান্ধীপন্থীদিগের স্বরাজ-সূর্য্য কিরণ বিকীরণ করিবার পূর্ব্বেই বাংলার "স্বরাজ" পত্র সহযোগ-অসহযোগ-স্বাবলম্বন মিশ্রিত দেশসেবার মধু পুষ্করিণী খনন করিবেন, তাহার তীরে আরোহণ

করিয়া প্রতি কার্য্যে স্বহস্তে জয়পতাকা প্রোথিত করিবার অপূর্ব্ব উল্লাসে কুলীয় প্রীতি সহানুভূতিকে ভিত্তি করিয়া বাংলার যে ধর্ম্মঘট, ভাবপ্রাণ বাংলার সন্তানের মাপে তাহার নিষ্পত্তির মাপ মাপিয়া লইতে প্রতি অসহযোগীর যে গলদঘর্ম্ম, যে উত্তেজনা সঞ্চারণের প্রয়াস -- এ সব দেখিয়া আবার আর এক কথা মনে পড়িয়া যায়, আতঙ্ক ত বটেই, কিন্তু দেশচিন্তায় ব্যস্ত-ব্যস্ত আতঙ্কিত অন্তঃকরণ কখনও শান্ত নীতি ও উচ্ছলতাকে ভিত্তি করিয়া, কখনও বা তাহার কথা ভুলিয়া যে অসম্পূর্ণ ক্ষীণ উত্তেজনাসার ও আত্মাবমাননা অভিব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহার সহিত বাংলার পরিপূর্ণ বিশ্ববিজয়ী দেশ হৃদয়ের বুঝি কোন সংযোগই নাই। একটা মস্ত ভেদ টানিয়া বোধ হয় একটার পর আর একটিকে বসাইতে হইবে। জীবনের বহির্লক্ষণ ধরিয়া আমরা যাহা বলিতে চাহিতেছি, আমরা ইচ্ছা করি, জীবনের ভিতর দেখিয়া নিজের দেশ-হৃদয়টী লক্ষ্য করিয়া আমাদের কথার অসত্যতা সকলে প্রমাণ করুন।

কিন্তু বিজয়ী দেশ হৃদয় চায় অনন্ত প্রবাহ, পরিপূর্ণ দেশ-হৃদয় দেশের মূল প্রকৃতি ও বিরাট সত্তায় মগ্ন ও পূর্ণ থাকিয়া অন্তর মধ্যে অনন্তমুখী ভাব ও শক্তি এবং সহস্রমুখ বিশ্বাসের মুক্ত উৎসে সদা পরিপূর্ণ ও ঢলঢল অবস্থায় বিরাজ করে। জাতির আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রশক্তিসাধনার মূল স্পর্শ পূর্ব্বক যে এত ধীর এত প্রশান্ত অথচ এরূপ নির্ঘাত ভাবে সে সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, যে, বর্ত্তমান বাংলার দেশ-কার্য্যের ভিত্তিতে প্রবেশ করিলে তাহার সন্ধান না পাইয়া আমরা অন্য কোন অপরিচিত সত্তার অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা আবার বলি, আমাদের ভুল হউক কিন্তু তাই কি?

আমরা স্বদেশের প্রাক্কাল হইতে যে অনন্তময় সত্যদর্শী মহাদেবতার অবতরণ হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলাম। দেশের সকল পরাণ ভাব শক্তি ও জ্ঞান, সাধনার পথ স্বতন্ত্র একটীর পর একটী খুলিয়া আমরা ভারতীয় সাধনার যে কেন্দ্রধারা হৃদয়মাঝে অবধারণ করিয়া চলিতেছি। দেখিতেছি স্বয়ং ভারতমাতা মহাবিষ্ণুর ইচ্ছাময়ী শক্তিরূপে ভুবনমোহিনী পূর্ণ, লোল জিহ্বা, খড়্গা অট্টহাসিনী চিন্ময়ী সত্তার রূপাবরণে অলক্ষ্যে ভারত, বিশ্ব, বিশ্বের চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া চলিতেছেন। এ সব দেখা শুনা জানাজানির দিব্য ও স্পষ্ট পরিচয়ে তোমরা যদি নিজদিগকে পরিচিত করিতে পার, আমরা ধন্য হইব। সে অসমসাহসিক তেজোদীপ্ত সাধনরত ভগবানের যন্ত্ররূপে ভারত-ভূমে অবতীর্ণ নিবিড় আত্মীয়গুচ্ছে সরস অন্তর-জীবনের সহিত বিশাল বিরাট অমরবীর্য্যময় নির্ঘাত ব্যক্তি-জীবন প্রকাশসূচক দেশকর্ম্মের পরিচয় যে অন্য রূপ। তাহার হৃদয় যে অভূতপূর্ব্ব, যে দেশ-হৃদয় গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার পরিচয়স্থল বোধ হয় অন্যত্রই।

দিব্য ভাব

আমাদের আছে তিনটি জিনিষ—শরীর, প্রাণ আর মন। শরীরটা চায় শুধু ভোগ—কেবল আহার, নিদ্রা, মৈথুন—শরীরের ইহাই স্বধর্ম্ম, প্রাণ শরীরেরই বশীভূত, মনও এইখানে হামাগুড়ি দিয়ে মরিতেছে—আসল কথা এই শরীর, প্রাণ ও মনকে আমাদের একেবারে নূতন পথে ফিরাইতে হবে। সাধারণ

মানুষ যাহা করে, তার উল্টা পথ ধরিয়াই যোগীর জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয়—যোগীর অসাধারণ জীবন—অসাধারণ উপায়েই নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইবে।

সাধনার প্রথম কথাই হইতেছে এই—এই শরীর, প্রাণ, মন হইতেছে বাহিরের রূপ—ইঁহাদেরই ভিতরে উপরে আছেন সত্য মানুষ। এই স্বরূপ মানুষ আর রূপমানুষ দুই মানুষেরই আভাস যোগাইয়া আমরা জন্ম জন্মান্তর কাটাইয়া আসিতেছি। ফলে এইটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে নিশ্চিত নয়। কিন্তু আজ আমাদের বুঝিতে হইবে এই অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা চাই। বাহিরটাকে অসীম আদরে সযত্ন করিয়া বাঁচাইয়া তোলা—সেও যেমন ঠিক নয়, তেমন আবার উহাকে নির্মমভাবে টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে—এ কথাও আমরা বলিতে চাই না। বাহিরের এই জাগ্রত মানুষটি—তাহার ন্যায্য অধিকার যেটুকু, অর্থাৎ উহাকে সজীব [illegible] বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই উহার পাওনা। এ কথায় বাহিরের দাবী যত বড়ই হউক, সে কথায় কাণ দিলে পতিত হইবারই সমূহ সম্ভাবনা। ভিতরটাকে জাগাইয়া, ভিতরের শক্তি এবং আনন্দ দিয়াই বাহিরটাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়া যাওয়া যেমন সহজ, জীবনে ফলাইয়া তোলা তেমনি শক্ত ও সাধনাসাপেক্ষ।

সঙ্কল্প চাই—সত্য মানুষটিই হইয়া উঠিবার জন্য। মনের মানুষ একেবারে চিরদিনের জন্য মরিয়া যাউক—মন না মরিলে বিজ্ঞান ফুটে না—আমরা মানুষের মধ্যে এই বিজ্ঞানময় মানুষটিকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে চাই। পুরাতনের আমূল পরিবর্তন না হইলে সম্পূর্ণ রূপান্তর হয় না। রূপান্তর আসলে এই নব জন্ম। মানুষকে একেবারে একটা নূতন জন্মই পাইতে হইবে। শরীর-মানুষ, প্রাণ-মানুষ, মনোমানুষ—আরও উপরে নিগূঢ়ে যে নিত্য মানুষ—সেইই নূতন মানুষ। দেবভাবই এই মানুষের নিত্য জীবন ধর্ম। দেবজন্ম অর্থে দেবতার এই নিত্যধর্মেই গড়িয়া উঠিতে হইবে। দেবতার জাগরণ হয় বিজ্ঞানে, কারণে। দেবতা কারণের সত্তা। দিব্যভাব কারণেরই ভাব।

মনের উপর কারণ। আমরা মন লইয়াই ছোট বড় সংসার পাতিয়া ঘরকন্না করি। মনের বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়াই জিনিষকে জগৎকে দেখি, বুঝি, বিচার করি, চিন্তা করি—ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মনই জীবনের অনুভূতিগুলি আহরণ করে, সজ্জিত করে, রূপরস বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া ভোগ দখল করে—মনই ত আপনার গণ্ডীর ভিতরে সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য ভাল মন্দের দ্বন্দ্বসৃষ্টি করিয়া সেই আত্মকৃত দ্বন্দ্বজালে আপনাকেই জড়াইয়া মরে। মনের মুক্তি চাই, তার অর্থ অগ্রে মন হইতে আমাদের মুক্তি চাই। মনকে একেবারে ছুঁড়িয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া চাই। মনের উপরে দাঁড়াইয়া যেদিন জয়ডঙ্কা বাজাইয়া দিতে পারিব সেই দিনই মনকে মুক্তির মণিকোঠায় তুলিয়া লইয়া তাহারও স্বভাব ধর্মের আমূল পরিবর্তন পূর্বক তাহাকে ধর্মান্তর গ্রহণ করাইবার অধিকার জন্মিবে। মন নূতন দিব্য ধর্মে দীক্ষিত হইলেই নব জন্মের সূচনা হইল বুঝিতে হইবে। মনই ইন্দ্রিয়পতি—প্রাণের, শরীরেরও উপর কর্তৃস্থানীয়—এই মন রাজা, উপরের আনুগত্য স্বীকার করিলে, ধীরে ধীরে অন্যান্য যন্ত্রগুলিও তবেই দিব্যশক্তির অনুকূল হইয়া উঠিবে।

যত গোল মন লইয়াই ত। এই মনকে শাসন করিবার শ্রেষ্ঠ পথই হইতেছে—উপরে উঠিয়া যাওয়া। মনের উপরে থাকা যায়—অভ্যাস হইয়া গিয়াছে মনের সঙ্গে মিশিয়া থাকা, অভ্যাস ওলট পালট করিয়া দেওয়াও যায় না কি? পুরাতন অভ্যাসটুকু উল্টাইয়া নূতন অভ্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। মনের সুখ দুঃখ চিন্তা কল্পনাগুলির সঙ্গে আপনাকে জড়াইয়া

ফেলিব না—প্রাকৃত সেগুলির হৃদয়ের উপরে—প্রবল বেদনার আঘাত বুক ছিঁড়িয়া দিলেও, সে তীক্ষ্ণ শেল সবলে উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে—দ্রষ্টা পুরুষ হইবে নির্ব্বেদ, অচঞ্চল, উদাসীন, ভোক্তা মাত্র—প্রকৃতির সৃষ্ট তরঙ্গগুলি নিরুদ্বেগ হৃদয়ে সহ্য করিবে, ঘটনা, বিষয়, ভাব, সব কিছুরই অন্তর্নিহিত যে মধু রস তাহার বিচিত্র আস্বাদ গ্রহণ করিবে। এই দ্রষ্টা, ভোক্তা পুরুষেতে অবস্থান অভ্যাসসিদ্ধ করিয়া তোলাই প্রথম কথা। মনের উপরের এক স্বচ্ছ উর্দ্ধ ভূমাতে দাঁড়াইয়াই এই অভ্যাস দৃঢ় ও স্থির করিতে হয়।

এ অবস্থায় একটা বিশেষ ভাব গ্রহণ করা বড় সাহায্যকর। ভাব বড় মধুর, শুষ্ক সাধনাকে সরস করিয়া তোলে। ভাবে থাকিতে হইবে। মনকেও এক ভাবমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। একটা ভাব আশ্রয় না করিলে কিসের উপর ভর করিয়া জীবনের দ্বন্দ্বময় ঢেউগুলি কাটাইয়া ধীরে ধীরে জীবনটিকে অমর দেবময় করিয়া তুলিতে পারিবে প্রকৃতির নীচের তীব্র টান—রিরংসার অধোমুখী প্রবল আকর্ষণ—তাহার হাত এড়াইয়া উপরে টানিয়া তুলিতে হইলে, উপর দিক হইতে একটা প্রবলতর বিপরীত আকর্ষণই চাই—সেই উজান তোড়ে গা ভাসান দিলে তবেই না সবখানি একদিন অমৃতপূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই উর্দ্ধ স্রোতে অবগাহনই ভাব সাধনা। নিষ্ঠাশীল সাধককে আমরা এই ভাব সাধনাই আশ্রয় করিতে বলি। ভাবই দিব্য জীবনের বেদিকা-স্বরূপ।

ভাব কি? ভাষায় যাহা ব্যক্ত হয় না, মন যাহার আভাস পাইয়া অভিভূত, প্রাণ মুহূর্ত্তে আবেশাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এই দারুণ চিরবিদ্রোহী রক্তমাংসে পর্য্যন্ত এক অপার্থিব রসাবেশে জারিত, শোধিত হইয়া উঠে—কেমন করিয়া সে জিনিষকে বিবরণযোগে প্রকাশ করিব—অথচ এই ভাবই ত অধ্যাত্ম জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। সাধককে বাঁচিতে হইলে ভাবেই বাঁচিতে শিখিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক জীবন রক্ষার জন্য যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্নপান যোগাইতে হয়, তেমনি অধ্যাত্ম জীবটিরও নিত্য পুষ্টির জন্য নিত্য আহার্য্যেরই আত্যন্তিক প্রয়োজন—ভাবই সেই অধ্যাত্ম আহার্য্য—অন্তরপ্রসূত সেই সুধা রস পান করিয়াই ভিতরের নিগূঢ় প্রাণীটিকে নিত্য সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আকুল কণ্ঠে যে গান গাহিতেন "যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়" তাহা তলাইয়া বুঝিবার জিনিষ। ভাব শব্দারই মনসঞ্জাত যেমন ভাব তেমনি লাভ, অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যে ধনী সাজিতে হইলে, ভাবের ভাবুক হওয়া চাই—ভাবানুরূপ দানই বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান সাধকের হৃদয়ে ভরিয়া দেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি' মানুষ যেমন ভগবানকে ভজনা করে, ভগবানকেও তেমনি মানুষকে ভজনা করিতে হয়—এই ভগবানে মানুষে যে সম্বন্ধ সূত্র উহাই সূক্ষ্ম ভাব যোগ। ভাব যোগ অবলম্বন করিয়াই ভাগবত পরশ পাওয়া যায়। ভগবান যখন মানব হৃদয়ে অলক্ষ্য কৌশলে পদাঙ্গুষ্ঠ দান করেন, তখনই হৃদয় জাগিয়া উঠে—হৃৎপদ্মের প্রকাশেই ভাগবত প্রকাশ বুঝিতে হয়—ভগবান সাধকের হৃদয় জুড়িয়া অধিকার করিয়া বসেন—ভাবের মধুর আবেশে।

শক্তির দর্শন স্পর্শন করিতে হয়—এই ভাবাশ্রয়েই। ভাবুক যোগী মায়ের আবাহন করেন, হৃদয়ে মায়ের পূজার সিংহাসন রচনা করেন, মাকে প্রেমের পীঠে স্থাপন করিয়া মহোল্লাসে আত্মনিবেদন করেন। আত্মসমর্পণ উদার যোগ, কোন .. তন্ত্রে উহা গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না, কিন্তু একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত দিব্য ক্রম আপনিই ফুটিয়া উঠে—সাধকের অন্তরের গোপন স্তরে একটা গূঢ় উৎস খুলিয়া যায়, শক্তিমূর্ত্তি রূপে রসে উছলিয়া সাধকের নিকটে প্রকাশ হন।

প্রাণীর সঙ্গে বিচিত্র অথচ বিশিষ্ট একটা দিব্য সম্বন্ধই সাধক আবিষ্কার করিয়া লয়। ভাবযোগের এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা গোপন কথা—উত্তমরহস্য—জীবের সঙ্গে ভগবানের একটা দিব্য সম্বন্ধ আছে, সেই নিগূঢ়, সনাতন, অথচ নিত্য নূতন রসসম্বন্ধটুকু খুঁজিয়া পাওয়া, সেইটিই প্রত্যক্ষ করা, শুধু পরোক্ষ দর্শনে জানা পাওয়া নয়, অনুভূতির মধ্যে উহাকেই গাঢ় ঘনীভূত করিয়া ধরা, হৃদয়ের এ লীলাবৃত্তি তাহার চরম ভোগ ও চরিতার্থতা সেই সম্বন্ধটুকুর ভিতর দিয়াই আস্বাদন করাই এ রস সাধনার মুখ্য লক্ষ্য ও প্রগাঢ় পরিণতি।

এইখানেই ভক্তিযোগের আত্যন্তিক সার্থকতা। জ্ঞানেই সাধনার ভিত্তি পাকা করিতে হয় নাহলে শুধু অন্ধ ভক্তি বিশ্বাসের একটা গভীর সার্থকতা থাকিলেও সেই সার্থকতাই চরম সামগ্রী নয়—ভক্তিকে জ্ঞানের মধ্য দিয়াই চমকাইয়া না তুলিলে ভক্তির পূর্ণ পরিপক্কতা হয় না। আবার উল্টা ভুল করিলেও চলিবে না। জ্ঞান মূল হইলে কি হয়, মূলই ত সবখানি নয়—শুষ্ক জ্ঞানযোগ উদার উজ্জ্বল বটে—কিন্তু ভক্তির রসপরশ না পাইলে সে জ্ঞান সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠে না। প্রেমই ত জ্ঞানকে অনুভবের মধ্যে ঘনীভূত, গাঢ় রসালিঙ্গনে, নিবিড় ভোগে ভরাট করিয়া জমাইয়া তোলে—বিজ্ঞান পদ্ম যেমন ভগবানের নিত্যপীঠ—হৃৎ পদ্ম তেমন তাঁহার লীলামঞ্চ—বিহারক্ষেত্র—এই লীলাকুঞ্জেই ভাগবত প্রকাশ আনন্দে, রসরঙ্গে, অনন্তবিচিত্র ও মাধুর্য্য লহরীতে ভরপুর হইয়া উঠে।

ভাবের বিচিত্র স্তর। মানুষের প্রেম ত একদিনেই পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। প্রেমের পরিশুদ্ধি বড় বিচিত্র ক্রমেই সংসিদ্ধ হয়। সাধারণ প্রেম—সে ত প্রেম নয়—প্রাণেরই ভোগবৃত্তির ক্রমপ্রসারণ—প্রাণ চায় কামতৃপ্তি, এই প্রাণিক প্রেম কামেরই একটু উচ্চতর সংস্করণ মাত্র—এ প্রেম চায় ভোগ, আত্মেন্দ্রিয়েরই তর্পণ—"আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি কাম বলি তায়।" এখানে বিনিময়ে আত্মদান নাই—দেওয়া নাই, আছে কেবল নেওয়া—আমার তৃপ্তির জন্যই তুমি আছ, তোমায় ভালবাসি, সে তুমি আমার বলিয়া, আমার ভোগের পাত্র, আমার ইন্দ্রিয় তর্পণের আধার বা উপকরণ এই জন্যই। এখানে প্রেমের গান—আমার জীবন তোমার তরে নয়—তোমার জীবনই—আমার তরে। উৎসর্গ এ প্রেমের ধর্ম্ম নয়—উৎসর্গ আকাঙ্ক্ষা একতরফা, পাত্রের, (object)এর, বিষয়ীর (subject)এর দিক হইতে নয়। বলিতে পার, ইহা আসুরিক প্রেম—অধম প্রেম—আসলে প্রেম নয়—কামেরই হৃদয় সংস্করণ।

সাধারণী প্রেমের উপর সমঞ্জসী প্রেম। বিনিময়, সামঞ্জস্যই এই প্রেমের কেন্দ্র ধর্ম্ম। আমি তোমায় ভালবাসি, সে তুমিও আমায় ভালবাসিবে বলিয়া আমার প্রেমের পরিবর্তে তোমার প্রেমের সম্পূর্ণই প্রত্যাশা রাখি, আমার হৃদয়দান বিনিময়ে তোমার হৃদয়দান পাইব বলিয়াই—এখানে দোকানদারী আছে, হৃদয়ের হাটে ভালবাসার বেচাকেনা আছে, বণিকবৃত্ত এ প্রকার প্রেমের সহজাত বৃত্তি—বিনিময়ধর্ম্মী এ প্রেম মধ্যম প্রেম। তোমার সুখ আমি চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমারও সুখ হউক—তোমার তরে আমার জীবন, কিন্তু তাই বলিয়া, এমন কি সেই জন্যই আবার আমার তরে তোমার জীবনই নয় কি? আমি দিব—আর তুমি না দিলে চলিবে কেন? এ সব প্রশ্ন এই সামঞ্জসী প্রেমেই শোভা পায়। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের একটা দান প্রতিদান, তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেওয়া নেওয়ার সামঞ্জস্যই ইহার লক্ষণ—শুদ্ধ হইলে এ প্রেমও অত্যুৎকৃষ্ট ও বিমল সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে না পারে এমন নয়—সাধনার ক্রমাভিব্যক্তি অনুসারে মানবহৃদয়ের এই শুদ্ধতারও উৎকর্ষ ঘটে—

মানুষের মন উন্নতিধর্ম্মী, তাহার হৃদয় ক্রমশঃ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছ হইয়াই চলিয়াছে—শতাব্দী পর শতাব্দীর বিবর্ত্তনে এই মানুষ-প্রেমেরও ক্রম পরিণতিই হইতেছে—ইহা ত সত্য কথা। কিন্তু এই স্তরে যতক্ষণ, ততক্ষণ এ প্রেম শ্রেষ্ঠ প্রেম নয়, দিব্য প্রেম হইতে পারে না।

দিব্য প্রেম হৃদয়েই প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু তাহার উৎস উপরে এক নিগূঢ়তর লোকে আনন্দ জগতেই এই দিব্য প্রেমের জন্ম। হৃদয়ে আসিয়া এ প্রেম বিলসিত হয়, খেলা হয় এখানে, কিন্তু পাবন সেইখানে, সেই জনলোকে—আনন্দময়ের নিজ ক্ষেত্রে। দিব্য প্রেমেই আত্মসমর্পণের, উৎসর্গের চরম ও পরম সার্থকতা—কারণ উৎসর্গই এই প্রেমের আদি, মধ্য ও শেষ, সবখানি কথাই। আপনাকে ঢালিয়া ঢালিয়া, লুটাইয়া লুটাইয়াই এই প্রেম সার্থক হয়, সমর্থ হয়, মত্ত বিভোর হইয়া জন্ম জন্মান্ত কাটাইয়া দেয়—বিনিময়ে কিছুই চায় না—বিনিময়ের কথাই এখানে মনে আসে না—দিয়াই যে চরম সুখ এখানে খুঁজিয়া পাইতেছি প্রত্যর্পণের, প্রতিগ্রহণের ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও তাহার উপর কোন চিহ্নপাত করি বার অবসরই পায় না। তোমায় ভালবাসি—এই আমার আত্যন্তিক সুখ—এ সুখের কি আর শেষ আছে, তল আছে; যে আর কিছু চাহিব, পাইবার আশা রাখিব?—পাইবার চিন্তাও সেখানে স্পর্শ করে না—তোমায় ভালবাসিয়াই যে আমি ভরিয়া আছি, আর ত কিছুর স্থান সেখানে একেবারেই নাই। বিনিময়ের কথা যদি জোর করিয়া টানিয়া আন, ত আমার সহজ অবলীলা উত্তরেই তোমায় সন্তুষ্ট হইয়া যাইতে হইবে—বিনিময় ত আমি চাহি না—কেনা বেচা দোকানদারী করিতে ত আমি আসি নাই—ভালবাসি—সে তুমি ভালবাসিবে বলিয়াই—ছিঃ ছিঃ এমন কথা ত মুখে আমার উচ্চারণ করিতেও নাই—ভালবাসি ভালবাসি, কেন তা জানি না—ভালবাসিয়াই যে অনন্ত সুখই পাই—তুমি যদি ভাল না বাস, শুধু তাই নয় তুমি যদি আমার প্রতি ঘৃণায় তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাও—আমার স্বেচ্ছাকৃত হৃদয়দান যদি দারুণ অবজ্ঞাভরে দুই হাতে ঠেলিয়া ফিরাইয়াই দাও, সেও আমার সুখ—দুই পায়ে আমার হৃদয়খানি দলিয়া গেলেও জানিব তোমারই চরণালিঙ্গনে আমি ধন্য হইয়াই উঠিলাম। সে অপরূপ সুখ—তোমার স্বেচ্ছাদত্ত অপমান লাঞ্ছনাও যে আমার প্রিয়তমের কৌতুক-রঙ্গ বলিয়াই অনুভব করিতে পারি—সেই ত আমার জন্মসিদ্ধ স্বভাবধর্ম্ম। এ প্রেমে আনন্দ ছাড়া কথা নাই, ভয় নাই প্রিয়তমের হাতে দেওয়া গরলও যে সুধার মতই বলিয়া আকণ্ঠ পান করিতে পারি—প্রিয়তমের প্রীতিতেই যে আমার প্রীতি—তার চেয়ে প্রীতি যে আর আমার কিছুতেই নাই। ইহাই দিব্য প্রেমের কথা। আমাদের বধূরা আর বাড়ী যায় আমাদেরই আঙ্গিনা দিয়া' সমর্থ প্রেমিকের মুখে এমন অভিমানের কথাও শুনিবে না—এ স্বর্গের উর্দ্ধের প্রেম—এ আনন্দময়ের নিজস্ব প্রকাশ দিব্যভাব সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানেরই আপন ধর্ম্ম।

মন বিজ্ঞান, আনন্দ—মনে, হৃদয়ে দিব্যপ্রেমের রূপ ও খেলা, বিজ্ঞানেই উহার সত্য ও স্বরূপটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায়, আর আনন্দেই উহার চরম উৎস ও পরিণতি—এ ত্রিধাম ভরিয়া দিব্যভাব মানুষকে মাধুর্য্যে মহিমায় অতুল পূর্ণত্বে ভরাট ও ঋদ্ধিমান করিয়া তোলে। সাধনার পরম লক্ষ্য—এই দিব্যভাব। আত্মসমর্পণযোগী এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াই চলিবেন। দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই চাই। অসাধারণ জীবন যাহাদের, সেই আত্মহারা দিব্যোন্মাদ চির প্রেমিককুলকেই এই দিব্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কালী অবশ্যই করিবেন—প্রেমিক সাধক, সৃষ্টিছাড়া এই পাগলামী লইয়াই যদি জন্মগ্রহণ

করিয়া থাক—মা নিজেই তোমায় নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন—চিহ্নিত বরপুত্র তোমারই মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব ও নিরবচ্ছিন্ন দিব্যলীলা প্রকট করিয়া তুলিবেন।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশে গিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষ পলিটিক্স ক্ষেত্রে তাঁহার কি পদার্থ দিয়াছেন কেহ জানি না, আবার আজ রবীন্দ্রনাথ বহুকাল বিদেশে থাকিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, এখন ভারত সবিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে কিনা তাহা এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। বেদীর আসন হইতে নিজে নামিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে যখন বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তখনই বুঝা যাইবে ভারতবর্ষ এক্ষণে কবির কিরূপ সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রস্তুত আছে।

কবি কিন্তু বর্তমান ভারতের নিন্দাস্তুতির অতীত। বর্তমান ভারতের সম্বর্দ্ধনা বা নিন্দা কবির নিকট যে বড় মূল্যবান তাহা নহে—কবি বর্তমানের সত্যে মুগ্ধ, আবার বর্তমান সত্যকে ভবিষ্যতের মহাসত্যে পরিণত করিতে কবির দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে যে পথে চালিত করিবে তিনি সেই পথেই চলিবেন। তাঁহার সেই পথ কবির জলন্ত অক্ষরে উদ্ভাসিত হইয়া দেশের বক্ষে আঁকিয়া যাইবে—দেশ বর্তমানের সুবিধা অসুবিধা, মান-সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি তাহাতে ব্যথিত হয়, কবি যে তাহাতে বড় বিচলিত হইবেন তাহা বোধ হয় না।

অন্ততঃ তাহা কবি-সুলভ নহে। আজ কবিবর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগনীতির বহুল প্রশংসা করিয়াও আত্মতুষ্টির সহিত তাঁহার অগ্রগমনের যে আভাস দিয়াছেন, সেই অগ্রগমন ও সেই মানস-দৃষ্টি মহাত্মার গতি ও দৃষ্টিকে বাধা করিতেও যদি নিযুক্ত হয় কবিবর বোধ হয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। কবির সুন্দরের অঙ্গস্পর্শে আমির সত্যদৃষ্টি অনেকটা কাব্য-কুয়াসাচ্ছন্ন হইলেও কোন কবিই তাহা স্পষ্ট করিবার ভাষায় ব্যক্ত না করিয়া পারেন না—ভিতরের ছবি সময়-অসময় স্থান পাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া খুব স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ হইয়া থাকে। কবির কবিত্ব যেমন আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাঁহার সত্য দৃষ্টির অকৌশল প্রকাশও তেমনই আমাদিগকে পীড়িত করিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টির সত্যতা ও কবিত্বের স্থায়িত্বই পরিশেষে জয়ী হইয়া থাকে। এইরূপ সত্য-অনুভূতিসম্পন্ন কবি জননায়কের আসন পরিগ্রহ করিলে তাঁহার রাজনীতি বা দেশসেবার পদ্ধতি এরূপ অভিনব ও সুন্দর বিচিত্রতাসম্পন্ন হয় যে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু এখন না হউক পরিশেষে সকলকে তাহাই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কবির আসন এতই উচ্চ।—এই উচ্চ আসন হইতে আমাদের কবি বর্তমানকে সে-কথা যেরূপ ভাবে শুনাইবেন, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সেইরূপই হইবে; কিন্তু তাঁহার বার্ত্তা যে মহাসত্যের ঘোষণা করিবে তাহা সুনিশ্চিত। সেই বার্ত্তার জন্য ভারতবর্ষ আজ অপেক্ষা করিতেছে।

কবি সম্বন্ধে আমাদের এরূপ উক্তি বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই

দেশমাতার মহাপ্রকাশে কবি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশ-গাথা বাঙালীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাহাকে অভিনব স্বদেশ-পথে চালিত করিয়াছিল, স্বদেশ ও স্বদেশী সমাজ তখন তাহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, রবীন্দ্র তাঁহার এই মানস প্রতিমা চারুকাব্যে যেরূপে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা ভাবপ্রবণ বাঙালী হৃদয় দিয়া একেবারেই বরণ করিয়া লইয়াছিল, ভাবাধিক্যে তাহারা রবীন্দ্রকে সর্ব্বপ্রকার দেশ অনুশীলনের মহাগুরু বলিয়া ধরিয়া লয়। কিন্তু দেশের নামে জগতের হিংসা-উৎপীড়ন-বিদ্বেষভরা দেশবপু যখন বাংলায় সমধিক পূজিত হইতে লাগিল, সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা যখন সাহসভরে অনর্থক অনর্থপাতে আগুয়ান হইল, তখন রবীন্দ্র তাহার মাথায় অতি জোরেই লগুড়াঘাত করিয়াছিলেন। কুয়াসা-ঘেরা কাব্যমঞ্চ হইতে কবির এই নির্ম্মম প্রহারের অর্থ তখন খুব কম লোকেই বুঝিতে পারিয়াছিল। কেবল ও ভঙ্গচিত্ত ব্যক্তিগণ দুর্গম দেশপথ হইতে পরিত্রাণ পাইতে আকুল হইয়া উঠেন, তাঁহারাই তখন তাঁহার কথা বিশেষভাবে শুনিতে চেষ্টা করেন—মহাকবির বিশ্বপ্রেমভরা দেশসেবার বার্ত্তা এরূপ শোচবর্গের মধ্যে পড়িয়া আরও অবোধ্য হইয়া উঠে, ফলতঃ কবি কোন বীরহৃদয় তখন স্পর্শ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অতি বড় বীর আজ তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতেছে, বিশেষ সাধনা করিয়া দেশ-সত্তার উপরে বিশ্ব-সত্তার আবির্ভাবে এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, বিশ্বসত্তার অধিষ্ঠিত যে দেশজ্ঞান তাহাই দেশের সহিত জগৎকে রক্ষা করিতে পারে, নচেৎ মাত্র দেশবোধ জাতিস্বষ্টির সহিত জাতিবিদ্বেষের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে শান্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে অশান্তি সৃষ্টিরই বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

আমরা জানি না, বর্ত্তমানের আন্দোলনে এইরূপ কোন সঙ্কীর্ণতা, [illegible] করিয়া কবি মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কি না, [illegible] কবি কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ খুব স্পষ্ট করিয়াই দেখিয়া লইয়াছেন, তাঁহার বিশ্বভারতী তাঁহার হৃদয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাবে আসন পাতিয়া বসিয়া আছে—দেশমাতার সত্যরূপেই তিনি কবির নিকট পরিচিত। যেরূপ মানস-সাধনায় তিনি এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, সেরূপ সুকল্পনায় তিনি ভাবরাজ্যের কেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়া আজ শক্ত ও নির্ম্মমভাবেই হয় ত সকলের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারেন, যে সকল কার্য্য ও যেরূপ পরিচিত হৃদয় তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার নব রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তাঁহার নিকট সেইগুলির প্রাধান্যই হয় ত অধিক হইবে। স্বদেশীর সময় অপেক্ষা এখনে তাহার ভাববস্তু খুব ঘন ও বস্তুতন্ত্র অনুসারে চালিত, ইহার শৃঙ্খলা, নিবিড়তা ও অব্যর্থ সন্ধানে মহাকবি বর্ত্তমান-অতিরিক্ত কোন অভিনব পন্থার নির্দ্দেশ করিতে হয়ত সচেষ্ট হইবেন, দূর ভবিষ্যৎ কুয়াসার ন্যায় হৃদয়ে জমিয়া জমিয়া স্বদেশীর সময়ে কবিকে বিদীর্ণ করিয়া যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন হয়ত তাহা সেরূপ ধোঁয়াটে হইবে না—সে এখন ঘন আকার ও চক্ষু কর্ণ ও বুদ্ধির নিকট বাস্তব ও অনুকরণযোগ্য মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পাইতে পারে, তবে সে যখন ভাবুক ও কবির আত্মোপলব্ধি হইতে নিঃসৃত হইবে, তখন মঙ্গল ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়া বর্ত্তমানের বিপুল প্রচেষ্টার মধ্যে আত্মশুদ্ধির যে প্রতিজ্ঞা বর্ত্তমান, তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার নির্দ্দেশ অপেক্ষা তাহার অভিনব পন্থারই সুব্যক্ততা অধিক পরিলক্ষিত হইতে পারে। দেশকে ইহার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বর্ত্তমানে অভিভূত দেশবাসী তাঁহার হৃদয়-কথা শ্রবণ করিবার সকল গুণে ভূষিত কি না তাহাও এখন সাহস করিয়া বলা যায় না। বাংলার তলে তলে মনীষার স্রোত যে দিকে ধাবিত হইতেছে বর্ত্তমান বাঙালীকে কিন্তু তাহার দিকে মনঃসংযোগ করিতে বড় দেখা যায় না। স্বদেশীর উত্তেজনায় পরে

তাহাকে মৃতের স্থায়ই পরিলক্ষিত হইয়াছিল, আজ আবার নন্-কো-অপারেশনে তাহাকে সামান্য জীবন্ত দেখা যাইতেছে, কিন্তু শতাব্দীব্যাপী মনীষাগঙ্গায় স্নাত হইয়া প্রতিভোদ্দীপ্ত বাঙালীর হৃদয় যে কথা কহিতে নিজকে প্রস্তুত করিতেছে, তাহার জন্য অন্তরে জাগিয়া থাকা ভারতবর্ষে কেন বঙ্গভূমিতেও সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না, মহা সন্দেহের স্থল। ইহার জন্য দেশবাসীও যেরূপ দোষী, মনীষীবৃন্দও তদ্বৎ দোষশূন্য নহেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষায় দেশের মনীষাগঠনের মৌলিক ধারা বর্ত্তমান নাই ইহা সত্য, তাহা হইলেও আত্মসম্বিতে পূর্ণ ও স্থিতধী হইয়া বিরাট পুরুষগণ যদি পার্শ্বভূমি জ্ঞান চঞ্চল করিয়া তুলিতেন, ভাবের ধারা গ্রহণ করিবার মত লোক দেশে অল্প হইত না। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আত্মচেষ্টায় বোলপুরে তাহার একদিকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা কিন্তু বাঙালী মনীষার সকল দিক নহে। বাঙালীর ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সকল প্রকার বঙ্গীয় অভিব্যক্তির মহত্তায় পরিপূর্ণ বাঙালীর পরিচয় আমরা সকল দিক দিয়া দেখিতে চাই।

কিন্তু ঐ বোলপুরই আকর্ষণস্বরূপ বোধ হয় সকলকে টানিয়া আনিবে। এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাভাব হৃদয়ে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতে পারে। মহাজ্ঞানী বিবেকানন্দের জীবন একদিন বেলুড়মঠের সকলকে এই বিশ্বাসে পূর্ণ করিয়াছিল, আজও তাহার ধারা বর্ত্তমান। এইরূপে সত্যের দিকে বৃহত্তের দিকে এক প্রকার আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিলে এবং তাহারই ভিতর দিয়া দেশের সাধারণ আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির সহজ ও স্বাভাবিক পথ আবিষ্কৃত হইতে না দেখিলে, সে পথ মহান্ হইলেও বর্ত্তমানের হইবে না, আবার বর্ত্তমানে তাহাকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত না হইলে তাহাকে বিপথগামী হইতেই হইবে। মহাত্মা গান্ধী অতএব সাধারণ ভূমিতেই দেশকে স্বরূপ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার অন্তরের প্রতিজ্ঞা, তাঁহার বিমল অন্তরের বল দিয়াই দেশের সাধারণ দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা বিধৌত করিয়া তিনি তাহার স্বচ্ছ সত্যা স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিবেন। তিনি এইরূপে কার্য্য করিতে গিয়া হয় ত সাধারণের দ্বারাও অভিভূত হইতে পারেন, মহাকবির দিব্যদৃষ্টি যদি সেই অভাব পূর্ণ করিতে পারে, তাঁহার ঐরূপ অবশ্যসম্ভাবী ত্রুটি সংশোধন করিতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি দেশের মহা উপকার করিবেন। দেশের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অগ্রসর দেশ ইউরোপীয় দেশ সভ্যতায় অভিভূত হইয়া একটা বিকৃত দেশের সন্ধানে ব্যস্ত হইতে পারে, তাহাকে কিন্তু নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া দিব্য বিশ্ব-পন্থার কথা যদি তিনি কন, তাহা হইলে কিছু দিনের জন্য বর্ত্তমান তাহাকে failure 'ফেলিওর' আখ্যাই দিতে থাকিবে।

কিন্তু এত বড় বড় মনীষী কবি ঋষির অপূর্ব্ব সমন্বয়ক্ষেত্রে মহাপুরুষগণকে এই যে কিঞ্চিৎ ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে, ইহার জন্য দেশ যতদিন না দুঃখ করিতে শিখিবে ততদিন আমরা মহাপথের সন্ধান পাইব না, দেশের প্রতিভা বাহিরে বিস্তৃত হইয়াই আবার এই অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে, প্রতিভা অন্তরের দিকে ধাবিত হইয়া নিবিড় হইতে না শিখিলে তাহার দ্বারা পারিপার্শ্বিকতা প্রস্তুত হয় না—একটা মনীষার স্রোত আমরা লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু তাহা এখনও সৃজনকর্ত্রী উর্ব্বরশক্তি লইয়া দুকূল ভাসায় নাই। প্রতিভা অন্তর্ম্মুখী ও প্রতীভাশালী ব্যক্তি আত্মসম্বিতে পূর্ণ না হইলে ইহা হয় না। ইহারাই দেশকে প্রস্তুত করিবে। রবীন্দ্রনাথ—নূতন রবীন্দ্রনাথ যদি দিব্য উদারতায় ও বিপুল আকর্ষণে প্রতিভার বহির্ম্মুখী মায়া আজ কাটাইয়া দেন, অথচ তাহাকে প্রাণে মারিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে আমরা পরম উপকৃত

সংঘ সাধনার মধ্যেই ভবিষ্যৎ ধননীতির প্রকৃষ্ট ভিত্তিটি খুঁজিয়া পাইয়াছি—সংঘ সমিতি নয়, যৌথ মণ্ডলীও নয় —অধ্যাত্ম ভাব ও তপস্যার উপরেই সংঘের প্রতিষ্ঠা—এই সংঘ প্রতিষ্ঠা সফল হইলে, উহারই যে কার্য্যকর্ম্মী অর্থনীতি ফুটিয়া উঠে, সেইটিকেই আমরা বিশিষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেছি।

হালে ঘোলে খিচুড়ি পাকাইয়া কোন দিনই কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—ব্যবসায় বৈশ্য-নীতি ধরিয়াই পরিচালিত হওয়া চাই, ব্যবসার সঙ্গে স্বদেশী, স্বরাজ, দেবাদশ্ম জড়াইয়া অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করিয়া লাভ নাই। মাত্র যোগশক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই যে সংঘপ্রতিষ্ঠা হইবে তাহার আত্মবল ও আত্মপ্রকাশই হইবে সংঘের একমাত্র লক্ষ্য—সংঘকে ধনসম্পদে আত্মপরিতৃপ্তি ও আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলা ছাড়া দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাহাকে কিছুকালের জন্য দূরে পরিহার করিয়াই চলিতে হইবে—সংঘ সুপ্রতিষ্ঠ হইলে সেই সুপ্রতিষ্ঠ সংঘই হইবে দেশের নবজীবনের সৃষ্টি ও পুষ্টিকারক সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধ যন্ত্র। তৎপূর্ব্বে অত্যন্ত কঠোর আত্মনিষ্ঠ ভাবেই সংঘের আত্মসংস্থান ও আত্মপুষ্টির দিকেই অনন্যদৃষ্টি হইয়া আমাদের তিল তিল করিয়া তপস্যা করিয়া যাইতে হইবে।

একটা বিপুল ও অনবদ্য অর্থপ্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য ধনধর্ম্মের যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, ভিতর হইতেই সেই পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। নহিলে শুধু ভাবতরঙ্গের (sentiment) উপর ভর করিয়া অর্থনৈতিক নিয়ম ও বিধান (economic laws) ব্যতিক্রম করিলে, আর্থিক প্রকৃতি একদিন দারুণ প্রতিশোধই গ্রহণ করিতে একটুকুও ছাড়িবে না। হিসাব অঙ্কের কি প্রয়োজন নাই? হরণ পূরণের হিসাবের কড়া ক্রান্তি টানিয়াই যদি না চলা হয়, আজ না হউক কাল অর্থভঙ্গই হইবে অনিবার্য্য পরিণাম। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বাঁধিতে হইলে, তাঁহার নিখুঁত পুঁজাঙ্কসরণ পুরাদস্তুর শৃঙ্খলা ও সংযমের গণ্ডীর মধ্যে গুছাইয়াই রাখিতে শিখিতে হইবে—নতুবা মায়ের আশীর্ব্বাদে চিরবঞ্চিত হইয়াই আমাদিগকে রহিতে হইবে—সে কথা বলাই বাহুল্য। আর্থিক অংশভঙ্গ (economic failure) এড়াইবার দ্বিতীয় পথ আর নাই—খুব হুঁসিয়ার ও একনিষ্ঠ হইয়াই অর্থসিদ্ধি আহরণ করা চাই।

ধনধর্ম্মের যে পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি, কথাটা গোড়াতেই বলিবার বিষয়। অর্থ-জগতের বর্ত্তমান স্থিতি ও গতি যে পন্থাটিকে ধরিয়া বিধৃত ও পরিচালিত, সেইটিকেই অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখা অনেক ক্ষেত্রে হয় ত এক্ষণেই সম্ভবপর হইবে না। একটু সন্দেহ রাখিয়াই কথাটা স্থাপন করিতেছি, কেন না, বর্ত্তমান ধনজগৎ এখনও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলেও, তাহার একটা সুপ্রতিষ্ঠ গঠন ও সংস্থান হইয়া আছে—সেই গঠন ও সংস্থানটিকে অবলম্বন করিয়া যে সব ক্ষুধিত জন্মমুখা শক্তিগুলি ভোগতৃপ্তি মিটাইয়া লইতেছে, সাক্ষাৎ বা আমলের উহাদের সে ভোগদখল সহজে ছাড়িবার পাত্র উহারা একেবারেই নয়—নূতনের ইঙ্গিত ইশারা দূর হইতে দেখিয়াই উহারা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামেই রত হইবে—তাহাদিগকে হটাইয়া, উহাদের আশ্রিত স্বার্থ-রাজ্যে একটা দারুণ উৎপাত ও ঘোরতর শান্তিভঙ্গ সৃষ্টি করিয়া কতটুকু অগ্রসর হওয়া এখনই সম্ভবপর হইবে—তাহা এখনও বিবেচনাসাপেক্ষ। তাহা হইলেও সংগ্রাম করিতেই হইবে—পুরাতন প্রতিষ্ঠান যদি সত্যই বর্জ্জনযোগ্য হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহাকে আজ না হউক কাল, একেবারে সবখানি না হয়, ধীরে ধীরে সরাইয়া সরাইয়াই সুকৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। পরিণামে কিন্তু এই অশুদ্ধ অর্থধর্ম্মকে সম্পূর্ণ ও আমূল শোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়াই

থাকিবে স্থির ও ধ্রুব লক্ষ্য।

স্বদেশী যজ্ঞের ব্যর্থতার মুখ্য কারণ, উহাতে অর্থ-জগতের বর্ত্তমান স্বভাবধর্ম্মের সহিত একটা অন্ধ সংগ্রামই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতুল বীর্য্যও অন্ধভাবে প্রযুক্ত হইলে কঠিন দেওয়ালে আপনার মাথা ঠুকিয়াই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়—বাঙ্গালী জাতিকে অর্থসংগ্রাম অঙ্গসম্পন্ন রাখিয়াই যে ফিরিতে হইয়াছিল, তাহার হেতুই এই, প্রকৃতির যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করিয়াই চলিতে হয়, নহিলে প্রকৃতির অপরিহার্য্য প্রতিশোধের জন্য আকণ্ঠ প্রস্তুত হইতে হইবে—বাঙ্গালী এই দুইটির কোনটিই সেদিন করিতে শিক্ষা করে নাই—রাষ্ট্রনৈতিক জয় কতকটা হইলেও, অর্থনীতিক জয় আমাদের একেবারেই হয় নাই, একথা আমাদের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কমলার পূজা আমরা করি নাই, তাঁহার আসনপীঠ লইয়া আমরা স্থূলহস্তে টানাহেঁচড়া ধস্তাধস্তি মাত্র করিয়াছি, মায়ের একনিষ্ঠ পূজারী যাহারা, তাহাদের হস্ত হইতে এমন অলক্ষণাক্রান্ত আসুরিক যজ্ঞের ফলে বরাবদান ছিনাইয়া লওয়া যায় না—আমাদেরও তাই হেঁটমুখে হতাশ্বাস লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল।

আজও গান্ধী মহারাজ কমলার অশুদ্ধ আসনতলে স্বহস্তে আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন—অশুদ্ধকে শোধন করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য—দৃঢ় পণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে জয়লক্ষ্মী অঙ্কশায়িনী হইতে পারেন না—এমন কথা আমরা বলি না—সে নিষ্ঠুর স্পর্দ্ধা যেখানেই থাকুক, খসিয়া পড়ুক—অভিশপ্ত জাতির আত্মধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার এই প্রবল বাসনা ক্রত পরিশুদ্ধ হইয়াই উঠুক—ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা ও বিশ্বাস করি—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা একই ভুল যেন দুইবার না করিয়া বসি—বিরাট চক্ষু-ও-চিত্তকুহকের মুগ্ধ অবতারণাকেই যেন আমরা শক্তির স্থির ও স্পষ্ট শুভ পরিচয় বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রমে না পড়ি, সেদিকেই তীক্ষ্ণ ও সতর্ক সাবধান দৃষ্টিই আমরা আকর্ষণ করিতে চাই—নহিলে, পরিণাম চিন্তা করিতেও যে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ধ্বংসমন্ত্রের যে বিশিষ্ট প্রয়োজন তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়াও, সংগ্রামতন্ত্রেরই অনুগত করিয়া যে দশনটুকু খুঁজিয়া পাই, সেটুকু বলিতে কোন দিনই আমরা কুণ্ঠা প্রকাশ করি নাই—আজও যেন না করি। সংগ্রামে গতিবেগই একমাত্র জয়নীতি নয়—গতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিরক্ষার সমস্ত আয়োজন করিয়া যাওয়া চাইই চাই—নতুবা চক্ষুর পলক পালটিতে না পালটিতেই ধূলি ছিটাইয়া কোন্ অলক্ষ্য পথে শত্রু আবার সমান ভাবেই গুপ্ত বেশে ভোগার্থ অনুপ্রবিষ্ট হইবে কে বলিতে পারে?—বহিঃশত্রু, অন্তঃশত্রু—শত্রুর ত আমাদের অবধি নাই—আর্থিক জগতে দাবীদার যে অসংখ্য মূর্ত্তি—শ্বেত, পীত, আত্মীয়, প্রতিবাসী অনেক জাতিই লুব্ধ হৃদয়ে, শ্যেন চাহনিতে ও তড়িৎতুল্য তৎপর কৌশলে ভারতের অরক্ষিত মার্কেট মনঃসুখে জমাইয়া তুলিবার জন্য লোলিহান লালসা বিছাইয়া ফিরিতেছে ঘুরিতেছে—তাহাদের হাত এড়াইতে হইবে কত সুকৌশলে, গভীর শিল্পনৈপুণ্যে ও বিচিত্র শক্তি প্রকাশে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। প্রতিজ্ঞাবল বড় বল বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই চাই এই সব বুদ্ধিসম্পদ, শ্যেনদৃষ্টি ও অব্যর্থ স্ফূর্তি-শ্রী। ভারতের অর্থযুদ্ধের সেনাপতিকে হইতে হইবে নেপোলিয়ান বা শিবাজীর চেয়েও প্রতিভাশালী ও কূটকৌশলী—নতুবা এ ঘোর সংগ্রামে জয় আনিয়া দিবে কে?

ধ্বংসের পশ্চাতে—আমরা বলি অগ্রভাগে—জাতির অনুকূল করিয়াই না হয় বলিলাম—সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি অব্যাহত পশ্চাতেই, চাই সৃষ্টিযজ্ঞেরই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি—বয়কট অসহায় জাতির রক্ষাকবচ (protective tariff) সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইলেও, এই

রক্ষাকবচটিকে স্থির ধারণের জন্যও চাই যে সৃষ্টিরই নিত্যশ্রী, একটা মূলসম্পদ্। এই ভিত্তিসম্পদের উপর দাঁড়াইয়াই ত, সংগ্রাম, জন্মাবধি ছেদহীন বেগনিষ্ঠায় চালাইয়া যাওয়া একমাত্র সম্ভবপর—গান্ধীজির কোটী মুদ্রা কয়দিনের রসদ যোগাইবে—তারপর কি আবার এমনি পঞ্জরভঙ্গ?—নহে ত শূন্যে পা রাখিয়া জয়যুদ্ধ করা কিছুতেই চলে না। ক্ষয়নীতির উপর ভর করিয়া চলা বুদ্ধিমানের ত কাজ নয়ই, শক্তিমানেরও পক্ষে বেশীদিন সম্ভবপর হইবে না—ইহা আমরা চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া গভীর বিশ্ব অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি না কি? পরায়ত্ত লক্ষ্মীসম্পদ আত্ম[illegible] করিতে হইবে—[illegible] সকলেরই অবশ্য স্বীকার্য্য কথা তবু এই সর্ব্ববাদীসম্মত পরিচিত কথাটার মধ্যেও আবার কথা আছে—আত্ম-ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য বীর্য্য ও কৌশল উভয় অস্ত্রে বর্ম্মে সন্নদ্ধ হইয়াই যেন দাঁড়াইতে পারি—তিন মাসে কি তিন বৎসরে জানি না—ভারতের আত্মসংস্থান—অন্ন, বস্ত্র, প্রয়োজনীয় পণ্য আত্মসিদ্ধ হইয়াই গড়িয়া উঠুক—গঠনের প্রতিষ্ঠান, সে কি তবে এইক্ষণে এই মুহূর্ত্তেই প্রয়োজনীয় নয়?

আমাদের অর্থনীতিটিকে গভীর ও প্রকৃষ্ট অবধা সেই আয়ত্ত করিতে হইবে—মরণমুখী জাতিকে বাঁচাইয়া তুলিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে উপায় কৌশল তাহারই প্রয়োগ উপযোগ করা চাই—জাতি আপনার সিদ্ধি গতিতেই শিখুক—মুখ্যভাবে, না, আমরা বলিতে চাই—সর্ব্বতোভাবেই। বিপুল অর্থপ্রতিষ্ঠান দৃঢ় স্থাপন না করিয়া আমরা যেন একটা পা'ও শূন্যের উপর বাড়াইয়া না দেই—এই মুহূর্ত্তে না হয় পরমুহূর্ত্তে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া মাটিতলে লুটাইতে হইবে—সে দুর্গ্রহ জাতির দূর হউক—ভগবান জাতির অলক্ষ্মীবুদ্ধি ঝাঁটাইয়া দূর করিয়া দিউন—জাতি শুধু আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে তাহাই নয়—জাতিকে আপন মাটির উপর আপনার নিত্য সৃষ্টিনিষ্ঠা ও প্রতিভাশ্রীর উপর ভর করিয়াই নির্ম্মাণ করিতে হইবে—আমাদের অর্থনীতিও হইবে নির্ম্মাণেরই নীতি—তাহার অঙ্গোপাঙ্গ অধিকরণ প্রকরণ সে হাতে হেতেড়ে করিয়া গড়িয়াই দেখাইবার জিনিষ—দেশের মাটি আছে, জাতির শ্রমশক্তি আছে, বুদ্ধি কৌশল আছে, ভারতের শূন্যপ্রায় অস্থিকঙ্কালে যেটুকু ধনরস এখনও অবশিষ্ট আছে, সেই বিক্ষিপ্ত রসবিন্দু জমাইয়া তুলিতেই হইবে বটে—কিন্তু সে এই নির্ম্মাণের জন্যই। জাতির শক্তি কৌশলকে মুক্তি দিতে হইবেই—তাহারই জন্য প্রকৃষ্ট ক্রমেই এই সমাহার করিতে হইবে। ইহাকেই ত আমরা বলিয়াছি সংঘের সমাহার নীতি।

কেবল মনে রাখিতে হইবে, আমরা ক্যাপিটালিজম চাহি না—ঐ নির্দ্দয় আসুরিক যন্ত্র একেবারে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া না লইলে ধনশক্তির মুক্তি নাই। আবার আর্থিক প্রকৃতির সঙ্গে লেনিনের নির্দ্দয়তর সংগ্রামনীতিও বিষবৎ পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। এই জন্যই ত অধ্যাত্ম সংঘের উপরেই সবটুকু ভরসা ঢালিয়া দাঁড়াইয়াছি—অর্থজগৎ নূতন ধর্ম্মে নূতন নীতি দিয়াই পুনর্গঠন করিতে হইবে—ভোগ ও উৎসর্গ, আয় ও ব্যয়, ঋণ ও ঋদ্ধি, অর্থনীতির এই সমুদয় অংশ প্রত্যংশগুলি নূতন প্রাণ দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। প্রেরণা অন্তরে দিব্য শক্তিযুক্ত হইয়াই জন্ম লইয়াছে, তপস্যা অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কমলা মায়ের হিরণ মন্দিরটি ধীর নৈপুণ্য ও ধৈর্য্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া আমরা গড়িয়া দেখাইতেই চাই। মা আশীর্ব্বাদ করুন।

* * *

বিদায় কালে

বরিশালের শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার ঘোষ গ্রেপ্তারের সময়ে অশ্রুসিক্ত জনমণ্ডলী সমক্ষে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন :—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

আজ বড় আনন্দের দিন,—জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীনিত্যগোপাল হুকুম দিয়াছিলেন কাজে নাম্‌তে হবে, তাঁরই ডাকে কাজে নেমেছিলাম, আজ আবার তিনিই কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হতে ফিরিয়ে বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। আজ কি আনন্দ! দীন দরিদ্র পর-পদানত ভারতের কল্যাণের জন্য আজ আবার কিছু দিনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র ছেড়ে তাঁর সমাধিক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবো। সমাধি অর্থ সর্ব্বভাব পরিত্যাগ—এই সর্ব্বভাব পরিত্যাগের নামই নন্‌-কো-অপারেশন। ব্রিটিশ বুরোক্রেশির সকল সম্পর্কত্যাগের ভিতরই রয়েছে আমাদের সকল সফলতা। সকলে সকল পরিত্যাগ ক'রে ঐ বাহির হইতে ঘরে ফিরে আসুন, ঐ ঘরে ফিরে আসাই আমাদের সকল সাধনা। ওরে ঘরে আমার মা আছে রে। আপনাদের কাছে অনেক কথা বলেছি, শুনে রাখুন, আমার কথা কিছু বলিনি, আমার গুরু যা শিখিয়েছেন তাই বলেছি। আমি স্বেচ্ছায় কাজে বেরইনি, সব ছেড়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেম, কিন্তু বৃন্দাবন থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ কাজ করার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন, তাই শ্রীগুরুর আদেশে সকলকে আহ্বান করেছি, সবাইকে ঘরে ফিরতে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেছি। এতদিনে যদি ফিরে [illegible] [illegible] [illegible] লাভ হয়ে যেতো আস নাই, আমার দুঃখ নেই, আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু জেনে রেখো, সবাইর আস্‌তে হবে। জানি ঐ সকল স্কুল কলেজ বন্ধ হবে। উকিল বাবুগণ! অনেক গা'ল দিয়েছি ভালবেসে গা'ল দিয়েছি, পতিত জাতি উদ্ধারের জন্য অপ্রিয় কথা জানায়েছি, কিন্তু আজ ব'লে যাচ্ছি যাবেন না, ঐ আদালত মুখো আর হবেন না। আজ জগজ্জননীর কাছে নিবেদন করে যাই, কেউ যেন ঐ পথে যেতে আর সাহসী না হয়। জেলে যাচ্ছি, জেল কেন যদি সাগরে ডুবে যাই সেখানেও চর পড়্‌বে, সেখানে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বলতর ভারতের মহান্‌ চিত্র দর্শন করবো—শ্রীগুরু ভারতের সে মূর্ত্তি দেখিয়েছেন। আর কতদিন কে ফাঁকি দিয়ে থাকবে? পারবে না, বুঝে লও দেশ তোমাদের নয়, এ দেশ কা'দের তা প্রতিপদে অনুভব কর। উকিল! চরণে ধ'রে শেষ কথা বলে যাই, যাবেন না আদালতের দিকে, ষ্টীমার অফিসে যেন কেউ চাকরীতে না যায়, পেসেঞ্জার ষ্টীমারে উঠো না—আমলা কর্ম্মচারী কাছারীর দিকে যেতে নিষেধ ক'রে যাচ্ছি। সহরের জল, আলো, মেথর সব বন্ধ হয়ে যাক, সহর বাসের অযোগ্য হোক, সহর ছেড়ে লোক গ্রাম বৃন্দাবনে চলে যাক। স্বরাজ হলধরকে সঙ্গে ক'রে মথুরায় আসবে, ঐ হলধর কৃষক নিয়ে স্বরাজ সহরের বুরোক্রেসিকে ধ্বংস করবে। কারো ভয় নেই—শুধু দেখ, একলা মহাত্মা গান্ধি সকল কাজ করার শক্তি রাখেন। স্বার্থের পুঁটুলি নিয়ে আর বুরোক্রেসীর সেবা করো না, করতে পারবে না। কৃষ্ণ মথুরায় থাকেন না, ব্রজে থাকেন বৃন্দাবনে, ঐ গ্রাম বৃন্দাবনে যেথায় সহজ সরল ভাব। violence করবেন না, সে যে বহির্ম্মুখীন ভাব, অন্তর্ম্মুখীন হ'তে হবে।

যোগ শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ

সব নিরোধ করুন। সংসারের উজান স্রোতে নাও বেয়ে—সাবধান! violence না হয়।

আজ এ আনন্দের দিনে মা'দের বলে যাচ্ছি, মা! তোমরা রণোন্মাদিনী মুক্তকেশী সর্ব্বমঙ্গলারূপে আজ জাগ্রত হও। আমার প্রাণে, আমার জীবন মরণের সারসর্ব্বস্ব শ্রীনিত্যগোপাল! নূতন জগৎ পত্তন করবে, স্বাধীন ভারতের নূতন চিত্র আমার কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে জাগিয়েছিল। গোপাল! তোমার চরণ ভিন্ন আর গতি নাই—কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, তুমি আমায় ক্রোড়ে ধারণ করো। আর কারো মুখের দিকে তাকাইও না। তোমার মুখ চেয়েই রুদ্র কঠিন আঘাতে মানুষের ভুল ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেছি, মানুষ অপরাধী বলতে পারে, কিন্তু তোমার চরণে আমি ঠিক আছি—There is no other king than God.

মুসলমান! প্রাণ খুলে আন্দোলনে যোগ দাও খোদার আসনে মাটীর মানুষ সাজাতে যেও না। আনন্দে স্বাধীন ভাবে দিন কাটাও—উচ্ছৃঙ্খল হয়ো না—অশৌচ যেন ভঙ্গ না হয়। দোকানদার ভাইগণ! এ আন্দোলন গৌরনিতাইর আন্দোলন—আপনারা এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকবেন না। আমার বাজারের মা'দের কাছে আমার কথা বলবেন, তারা আমায় স্নেহ করতেন, তাদের ভয় নেই, তাদের উত্থানের জন্য ভগবান জেগেছেন! বরিশালবাসী! আমার শেষ নিবেদন—কথা অনেক শুনেছেন, রাত ১০টা অবধি জেগে অনেক আলোচনা শুনেছেন, এখন ধীর স্থির ভাবে কাজ করুন। (পশ্চাতে কুলমহিলাদের দিকে ফিরিয়া) মা! তোমরা বেরিয়ে পড়, রাস্তায় সন্তান বিপন্ন আর কতদিন চুপ করে ঘরে থাকবে? চণ্ডীর পুনরভিনয় হোক। ছেলেগুলিকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে আর বিপন্ন করো না। স্বামী ভ্রাতাদের আর অফিস আদালতে যেতে দিবেন না, এ কালী মায়ের হুকুম।

—বরিশাল হিতৈষী।

পুস্তক পরিচয় ও সমালোচনা

—:০:—

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ৪।এ মোহন লাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

দেশোদ্ধারের জন্য যাহারা জীবনপণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ অগ্রণী। "যুগান্তর" বিপ্লববাদের মধ্য দিয়া ভারতে স্বরাজ স্থাপনের অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। যুগান্তরের লেখা পড়িয়া স্বরাজপন্থী বাঙ্গালী যুবকদিগের অন্তঃকরণে এক বিশেষ যুগান্তর উপস্থিত হয়—ফলে তাঁহারা যুগান্তরের পথ ধরিয়াছিলেন। এরূপ যুবক বাংলায় এখন অসংখ্য—তাঁহারা আজ শুনিয়া লউন, যে, যুগান্তরের প্রাণ ছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; উপেন্দ্রনাথের সরল, তীব্র, জলন্ত, স্পষ্ট ও স্বচ্ছ লেখা না থাকিলে "যুগান্তর" বাংলায় যুগান্তরই আনিতে পারিত না।

যুগান্তরের লেখা লিখিয়া ও মানিকতলার বাগানে লেখার মত কাজ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এই স্বনামধন্য নির্ব্বাসিতটী এক্ষণে তাঁহার হৃদয়খানি একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যে হৃদয় দেশপ্রীতির তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নিজেকে একেবারে সার্থক করিবার জন্য বিপ্লববন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, সেই হৃদয়টী তিনি নির্ব্বাসিতের আত্মকথায় সুচারুরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ উপেন্দ্রনাথের এই হৃদয়টুকু চিনিয়া লইবেন।

তবে একটু সাবধান করিয়া দিই। স্বাধীনতায় উৎসর্গপ্রাণ উপেন্দ্রনাথদিগের জ্বলন্ত নিদর্শনে বাঙ্গালী যুবক, তোমাকে অলক্ষ্যে কানাইলাল অধিকার করিয়া বসিয়াছিল—আলিপুর মোকদ্দমার সরকারী সাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীর মুক্তিবিধানকর্ত্তা শ্রীমান কানাইলালের তুমি প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছিলে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিবার সময়েও তোমার "মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই"—তুমি প্রফুল্ল কমলের মত স্বাধীনতার আনন্দে সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত, এ হেন কানাই-সুলভ চরিত্র তুমি লাভ করিয়াছিলে—অন্ততঃ এরূপ চরিত্রের আস্বাদ তুমি সর্ব্বদা ভোগ করিতে, এই চরিত্রের স্পর্দ্ধা বক্ষে বহন করিয়া তুমি অকূলে তরী ভাসাইয়াছিলে, আলিপুরে তোমাদের পূর্ব্বগামীদিগের চিত্র তোমার মধ্যে হুবহু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তোমাকে দেখিয়াই বোধ হইত, যেন "অন্য কালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদার-চেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষ সকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক, সরল চাহনি, সেই তেজঃপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোরবিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা বিমর্ষতা, ভাবনা বা সন্তাপের অভাব সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের, নূতন জাতির নূতন কর্ম্মস্রোতের লক্ষণ"— *। তোমরা যদি একান্ত গদগদ অন্তঃকরণে হৃদয়ে তেজ গর্ব্বের নিশান উড়াইয়া উপেন্দ্রের আত্মকথা পড়িতে চাও, সাবধান করিয়া দিই, তুমি একটু নিরাশ হইবে। হয়ত উপেন্দ্রের দিকে বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিবে। এরূপ সরল পিচ্ছিল নরম ঢেউখেলান অন্তঃকরণ তোমাদের গুরুর দেখিয়া তুমি হয়ত স্তম্ভিত হইবে। কিন্তু তুমি বই না পড়িয়া পার না, হঠাৎ বুঝিতে পারিবে তোমারও তলায় তলায় ঠিক ঐ অন্তঃকরণটী বহিয়া চলিতেছে। তুমি চিনিতে পার নাই—তোমাদের অন্তঃকরণ লইয়া বাকা ও ভাষায় রঙ্গস্থলে অনেক ঢেউ তিনি খেলাইয়াছেন, ভগবানের বিরাট ইচ্ছা তোমার অন্তঃকরণে পশিয়া তোমাকে যে বিরাট করিতে পারেন সে আশা তোমায় বহুবারই দিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে একেবারে তাহার ইচ্ছাময় করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য এইবার একেবারে তাঁহার ও তোমার অন্তঃকরণটা খুলিয়া ধরিয়াছেন, কেবল তাহাকে ভাগবত ইচ্ছাময়ই করিয়া তুলিতে।

উপেন্দ্রের কথা পড়িয়া তাঁহার ইচ্ছা তোমার ভিতর ফুটিয়া উঠিবে, কেননা ভগবান বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা আহরণ করিতে পাঠাইয়া অমন অন্তঃকরণ দিবেন না। অতএব হে পাঠক, উপেন্দ্রনাথের আত্ম-কথাটী ভাল করিয়া পড়িয়া দেখুন। এই পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ। স্বাধীন ভারতের এক অমূল্য পরিচ্ছেদ।

* কারাকাহিনী—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ শ্রাবণ, ১৩২৮ [পঞ্চদশ সংখ্যা

উৎসব-বাণী

আবার অরবিন্দ উৎসব। এবার এই দ্বাদশবর্ষ সম্পূর্ণ করিল। দ্বাদশবর্ষের একনিষ্ঠ সাধনা আজ যুগাঙ্ক চিহ্নিত করিয়াছে। দ্বাদশবর্ষ আমরাও একাগ্র নিষ্ঠায় উৎসবানুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছি—সে ছিল বিরহোৎসব—আজ পর্য্যন্ত তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে তাঁহারই তপো-দীপ্ত সিদ্ধ যোগপথ ধরিয়া চলিয়া বর্ষে বর্ষে ভাবঘন প্রেরণায় এই বিরহোৎসবই সম্পন্ন করিয়াছি—এবারও তাহাই করিলাম—কিন্তু যুগব্যাপী বিরহ-যজ্ঞ আজ সিদ্ধির গূঢ় প্রকাশ-চাঞ্চল্যে ব্যাকুল ও তরঙ্গলোল হইয়াই দেখা দিল—হৃদয় আজ কেন দুরু দুরু দোদুল কম্পমান হইয়া উঠিল, সঙ্কল্প আজ চিরন্ময় ভুজঙ্গের মত স্তব্ধ ফণা তুলিয়াই বসিল—ঘোরতর তপশ্চর্য্যা এইবার করিতে হইবে—কেন না, আর ত বিরহোৎসব নয়—আসন্ন বর্ষে বাংলায় অরবিন্দযজ্ঞ অরবিন্দের জাগ্রত সাক্ষাৎকারেই যে আমাদের করিতেই হইবে।

নূতন জাতিকে তাই এবার আমরা বর্ত্তমান আগষ্ট হইতে কর্ম্মের ব্রত গ্রহণ করিতেই বলি—বাংলার অরবিন্দকে এবার বাংলায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে—গুপ্তধন যে সিদ্ধমন্ত্র, মা বঙ্গজননীর কৈর্গনিবিড় কর-পরিবেষ্টে যে তাহা লুকান আছে—মায়ের রুদ্ধ মুঠা মায়ের বরেণ্য সন্তান আসিয়া খুলিয়া লউন—মায়ের শূন্য ক্রোড়টুকু আমরা আদিষ্ট প্রহরায় শ্যেনদৃষ্টিতে ও নিখুঁত নিষ্ঠায় এ পর্য্যন্ত আগুলিয়াই ত আসিয়াছি—শূন্য ক্রোড় কিন্তু চিরদিন শূন্য পড়িয়া থাকিবার জন্য ত নয়—দিব্যদৃষ্টি যদি ব্যর্থ না হয়, দিব্য দৃষ্টিযোগেই আজ অরবিন্দের চিহ্নিত ভারপ্রাপ্ত জাতি আমরা কি প্রত্যক্ষ করিতেছি—প্রত্যক্ষ করিতেছি, মায়ের ক্রোড় পূর্ণ হইবার দিন আবার অদূরাগত—গত বৎসরের যজ্ঞে এই আমাদেরই উৎসবক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দ্বীপান্তর-প্রত্যাগত বারীন্দ্রের বিষাণ-কণ্ঠে যে ভবিষ্যৎ-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—অরবিন্দের বঙ্গপ্রত্যাগমনে আর দেড় বৎসর মাত্র বাকী—সেই দেড় বৎসরেরও একটা ভরা বৎসর আবার দেখিতে দেখিতে অতিক্রান্ত হইয়া গেল—আর অর্দ্ধ বৎসর বাঙালী তপঃস্নিগ্ধ রও—মায়ের স্তন্যাগ্রে ক্ষীরবিন্দু নিবিড় স্নেকোচ্ছ্বাসে ঐ যে উথলিয়া উঠিতেছে—না, দিব্য দর্শন আমাদের কোন দিন ভুল হয় নাই—আজও ত সে এক চুলও ভুল হইবার নয়—অরবিন্দ ১৯২২ সালে আসিবেন—আবার বলি, নূতন

জাতি গভীর তপস্যায় প্রস্তুত হও, শুদ্ধ ও নিখুঁত হইয়া উঠ—তাহারই জন্য ত আমরা ব্রত গ্রহণে আদেশ করিতেছি।

এবার সত্যই জানিও—যে অরবিন্দ আবার বাংলায় ফিরিবেন—সে দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বের পরিচিত অরবিন্দ একেবারেই নয়—বাংলার জাতীয়-যজ্ঞের তরুণ পুরোহিত, দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুরু, ভারতের পরীক্ষিত সেনাপতি—সে অরবিন্দ ত আমাদের মাথার মণি, হৃদয়ের আরাধ্য ঠাকুর—সে অরবিন্দ আমাদেরই সত্তার মধ্যে মিশাইয়া মিলাইয়া আছেন—সে অরবিন্দ আজ তাঁহার ব্যক্তিঘটে আর পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মানব রেখায় আত্মপ্রকাশ করিবেন না—মানুষ অরবিন্দ, মনোময় অরবিন্দ, এই দ্বাদশবর্ষ অতিমানবের বিজয়ী সত্তার ডাক শুনিয়াই তাহাতেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলেন—কাল পূর্ণপ্রায় হইয়াছে—তপস্যাও সিদ্ধপ্রায়, মানবের মধ্য দিয়া অতিমানবেরই জীবন্মূর্ত্তি (Superman) প্রকট করিবার জন্য প্রকৃতির যে গভীর গর্ভধারণা, অরবিন্দের আধার লইয়া তাহারই প্রথম ছাঁচসৃষ্টি সফল করিতে তিনি চাহিয়াছেন—নূতন অরবিন্দ এই পূর্ণ মানুষত্বের সাধনারই জলন্ত বিগ্রহ—এই মানব-গুরুর জীবন দিয়াই ভারতবর্ষ মহামানুষ গঠনযুগ বিশ্বমানবের জন্য জগতে বহিয়া আনিবে।

এই অরবিন্দকে চিনিয়া লও—ইহাই অদ্যকার উৎসবের প্রথম বাণী। বাংলার তরুণ-সংঘ, তোমাদের ইহাই প্রথম ও মৌলিক ব্রত—অরবিন্দকে তোমরা ত জানিয়াছ পাইয়াছ, আর একবার জান, পাও—এবার একেবারে নূতন ভঙ্গীতেই তাহা করিতে হইবে। হৃদয়বান জাতি আমরা, হৃদয়ের অরবিন্দকে হৃদয় দিয়াই চিনিয়া ধরিয়া আছি, হৃদয়ের পরিচয় যে নিখুঁত ও অব্যর্থ, কিন্তু সেইখানেই পরিতুষ্ট হইয়া রহিতে আমরা নিষেধ করিতেছি—হৃদয়ই সহায়, আবার হৃদয়ই না হয়েতর অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া বসে —হৃদয় যদি অন্ধ প্রেমনিষ্ঠাতেই ভরাইয়া বসিয়া থাক, এবার তীব্রোজ্জ্বল জ্ঞানজ্যোতিঃতে তাহা উদ্ভাসিত করিয়া তোল—হৃদয়ের ঠাকুর তোমার এবার বিজ্ঞানময় সত্য পুরুষকেই খুলিয়া ধরিবার জন্য নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন—এই দিব্য আকর্ষণের উর্দ্ধমূল সূত্র ধরিয়াই মনের পরপারে একেবারে উঠিয়া যাও—দেহের, প্রাণের, মনেরও পিছনে, উপরে যে সৎ-পুরুষ—সেইখানেই আসল স্বরূপ-মানুষটির সত্য দর্শন ও স্পর্শন মিলিবে—মনের উপরে যে বিজ্ঞানভূমি—সেই ঊর্দ্ধ রাজ্যের মহাবার্ত্তাই অরবিন্দের নবসত্তার পরিচয়মন্ত্র—বাংলার ভবিষ্যৎ কেন্দ্রজাতি তোমাদেরই সর্ব্বপ্রথমে এই ধ্রুব ও অব্যর্থ বিজ্ঞানমন্ত্র কর্ণ, প্রাণ, মন, না শুধুই তাহাই নয়, হৃদয়-মর্ম্মেরও উপরে যে নিবিড়তর মর্ম্মপুরুষ তাহারই অতীন্দ্রিয় অঙ্গসত্তায় অঙ্গ মিলাইয়া পূর্ণরূপে আত্মসত্তার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইবে। এবারকার জানা পাওয়া—সত্তা দিয়াই জানা ও পাওয়া। এই জানাই ত বিজ্ঞানের জানা—বিজ্ঞানের সত্যেই এবার হৃদয়ের সত্যকে তুলিয়া ধরিয়া চরম মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইবে।

তার পর—আপনাকেই পাইতে হইবে—ব্যর্থ হইবে তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান, ব্যর্থ এই অরবিন্দ পরিচয়, যদি তোমার আত্মনিষ্ঠা না থাকে। আত্মার জানাই না সত্তার জানা ?—অগ্রে যদি এই অখণ্ড আত্মশ্রদ্ধা না প্রতিষ্ঠা কর—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, বড় বড় মহাপুরুষ, দেবপুরুষই হউন না কেন—তোমার কাছে সকলেই চিরদিন ব্যর্থ হইয়াই রহিয়া যাইবেন—ভগবান যে অগ্রে ভিতরে, অন্তরে, তার পরে বাহিরে জগতে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, রূপের মহিমাছটায় আত্মহারা হইয়া অরূপেরই দিব্য-সমুদ্রে যদি অবগাহন করিতে না পার, রূপও তোমার কাছে নিরর্থক হইয়াই রহিবে—ভগবান, মানুষ, আদর্শ, সত্য—সবই অন্তরেরই চিরন্তন রতনসামগ্রী—

বাহিরের পরশমণির ছোঁয়ায় ত দোষ নাই, কিন্তু সে ছোঁয়ার পরিণাম-মূল্য কি, যদি উহা তোমারই দিব্য অন্তরমণিকে ম্লান খনিগর্ভ হইতে জ্ঞানৌজ্জল্যে দীপ্ত করিয়া না দিয়া যায়? অজ্ঞানতার মিশ্র ছায়াচ্ছাদন অখণ্ড ইচ্ছায় উৎপাটন করিয়া ফেল—সত্য জ্ঞান সূর্য্য যদি ঝলমল করিয়া উঠে—সব ভেদ-বুদ্ধি গলিত তুষারের মত তিরোহিত হইবে, দিব্য জ্ঞানই বেদান্তের অমরত্ব চৈতন্যময় করিয়া জীবনকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে পারে। আত্মনিষ্ঠা হইতে ভাগবত পাওয়া অন্তরে ভগবানকেই পত্তাক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া তোল—অরবিন্দের সত্য পরিচয় তোমার অন্তর চৈতন্যেই দিব্য বেশায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

উৎসবের দ্বিতীয়মন্ত্র—আত্মসৃষ্টি মন্ত্র। অরবিন্দ চাহেন মানুষের আত্মারই জাগরণ—দেহের, প্রাণের, মনের খেলা দেশ অনেক ত খেলিয়াছে, এখনও খেলিতেছে, বাঙ্গালীর জাতিসত্ত্ব এই সব স্তরের ভিতর দিয়াই ত একটা একটা করিয়া প্রত্যেকটি পর্ব্ব অতিক্রম করিয়া আসিল আজ অরবিন্দের মধ্যে বাংলার জাতি-আত্মারই নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে—সেই কেন্দ্র অধ্যাত্ম-কেন্দ্র—জাতির অধ্যাত্ম কেন্দ্রেই তাহার প্রাণ মন সমস্তই নূতন প্রেরণা-উৎস খুঁজিয়া পাইবে। সৃষ্টিই ত আমাদের করিতে হইবে—চাই সত্য সৃষ্টি—সত্যসৃষ্টি আত্ম-বিজ্ঞানের পূর্ণত্ব না হইলে, হয় না—এই জন্যই আমাদের উপর অরবিন্দের অলঙ্ঘ্য আদেশমন্ত্র—জ্ঞান প্রতিষ্ঠান নিখুঁত করিয়াই আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাবের ঠেলা-ঘোরে জাতি অনেক ধাপ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে—জয় পরাজয়ে কিছু আসে যায় না, পতিত জাতি জাগরণের জন্য যখন জাগিয়া উঠে, অনেক কিছু বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়াই ত তাহাকে দাঁড়াইতে ও চলিতে হয়—এইবার দ্বাদশবর্ষের প্রলয় ও সৃষ্টি যজ্ঞের পর জাতির জাগ্রত ও সুপ্ত চেতনায় যে অভিজ্ঞতারাশি স্তূপে স্তূপে জমিয়া উঠিয়াছে, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া, জাতি অরবিন্দের অধ্যাত্ম-সৃষ্টি তলাইয়া বুঝিবার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা—অধ্যাত্ম-শক্তিই আধারগত করিয়া নূতন নির্ম্মাণ করিতে হইবে—গান্ধীর পূর্ব্ব-যজ্ঞের পর অরবিন্দের উত্তর-যজ্ঞের জন্যই দেশ এবার প্রস্তুত হইয়া উঠুক। রুদ্র শক্তির উপাসনা বাঙ্গালী জাতি সাঙ্গ করিয়াছে—বাঙ্গালীকে এইবার স্রষ্টা হইতেই হইবে। এই আত্মাই সৃষ্টিশক্তির উৎস। পূর্ণযোগের শক্তি-মন্ত্রেই বাঙ্গালীকে এই তপঃশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

উৎসবের তৃতীয় মন্ত্র—সংঘ-মন্ত্র। এই সৃষ্টি-শক্তিরই জীবন্ত ক্ষেত্ররূপে সংঘ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি—বাংলার ধ্বংসযজ্ঞের অবসান করিয়া নব যজ্ঞপীঠ প্রতিষ্ঠা করিতে, আত্মারই অবিচ্ছেদ্য সূত্র ধরিয়া সংঘের প্রতিষ্ঠা—মানুষ এখানে উপলক্ষ মাত্র—অলক্ষ্য দৈবী শক্তিই অন্তরালে থাকিয়া বিচিত্র কৌশলে আত্মার মণিমালা দিব্য মণি-সূত্রেই গাঁথিয়া তুলিয়াছে। সংঘ আত্মারই অখণ্ড প্রকাশ—স্বরূপতঃ একটী অখণ্ড আত্মাই হিরণ্ময় তপস্তাড়নায় বহুধা বিচিত্র হইয়া ফুটিয়াছিল, ভাগবত আকর্ষণে উহারাই দিনে দিনে পলে পলে আবার একত্র গাঁথিয়া উঠিয়াছে—একটী সত্তারই বিভিন্ন খণ্ডগুলি জোড়া লাগিয়া যখন একটী অখণ্ড তাল হইয়া আবার জমিয়া উঠিয়াছে, তখনই নামরূপের রঙ মিশাইয়া তাহাকে বলা হইয়াছে দেবসংঘ—প্রকৃত পক্ষে উহা আত্মারই স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্মপ্রকাশ—বহু অবয়বে আপনারই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিচিত্র আস্বাদনের জন্যই সংঘাত্মার এই লীলাসৃষ্টি। অরবিন্দের মহান বিজ্ঞানমন্ত্রেই যেমন মানুষের আত্মার উদ্বোধন, তেমনি তাঁহারই গোপন হৃদয়-স্পর্শে সংঘাত্মার আত্ম-চৈতন্য ও পরিপূর্ণ রূপপ্রকাশ—বিজ্ঞান ও হৃদয়—যুগপৎ এই যুগ্ম

সাধনায় নূতন জাতিকে বরসিদ্ধি আহরণ করিতে হইবে।

ভগবানের নূতন লীলাকেই আমরা সার্থক করিয়া তুলিতে চাই, তাহারই জন্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে বারবার বলিতেছি—সত্যকে আপনার মধ্যে জাগ্রত করিয়াই ত দেশের মধ্যে জাতির সঙ্ঘ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হয়। অহঙ্কার চাই না, চাই বিরাট স্পর্দ্ধা—দিব্য সত্যের জাগরণের জন্ত মন ও হৃদয় যাহারা নিরঙ্কুশ অকুণ্ঠায় পাতিয়া দিয়াছে, দেব-শক্তি তাহাদের যাচাই করিয়াই তবে সিদ্ধিদান করিবে, ইহা ধ্রুব জানিও। ভাগবত লীলাই যাহারা চায়—সেই স্পর্দ্ধিত আকাঙ্ক্ষীদিগের উপর বিধাতারই বজ্রতাড়নায় তাহাদের বীর্য্য পরীক্ষা হওয়া চাই—অহঙ্কার থাকিলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—সে স্পর্দ্ধা ত শূন্যগর্ভ অভিনয়ের কথা মাত্র। আজ কঠোর পরীক্ষার জন্যই অন্তর-জগতে বিপুল আয়োজন চলিয়াছে—বিচিত্র বাহিনী প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, তপস্যার সৃষ্টিটিকে ক্ষুদ্র করিয়া দিবার জন্য, বিশ্বাসের ধ্বজা ধূলায় লুটাইয়া দিতে নানা দিকে নানা শক্তি প্রাণপণে উদ্যোগী হইয়া উঠিবে—ইহা এতটুকুও বিচিত্র নয়—আপনারই ভিতরে ও বাহিরে এই বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জ কাতারে কাতারে হানা দিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই অসংখ্য বাধা ও সংশয়ের স্তূপ—ইহা ভগবানেরই স্বহস্তকৃত—ভগবান দিব্যযজ্ঞ নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক করিয়াই পূর্ণানুষ্ঠান করিতে চাহিয়াছেন—কঠোর সংগ্রামান্তে জয়দান করাই তাঁহার অভিপ্রেত—এই বিপুল বিক্ষোভ ও বিভীষিকা, ইহা শেষ জয়েরই পূর্ব্ব চিহ্ন—মা যে আজ অভয়া বরদাত্রী রূপে ছদ্মবেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন—সত্যনিষ্ঠা যদি অটল থাকে, ইচ্ছা ও উৎসর্গ যদি খাঁটি হয়, নিরেট হয়—ভগবানের সবখানি বুকে ধরিবার যে শক্তি, সেই মহাশক্তির অবতরণে সকল বিক্ষোভ বিপর্য্যয় চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া যাইবে—মায়ের বিভীষিকা মূর্ত্তি বিগলিত হইয়া মায়ের সহাস প্রসন্ন দিব্যরূপ অন্তর বাহির ভরাট উজ্জ্বল করিয়া অচিরে আত্মপ্রকাশ করিবে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনযজ্ঞই সফল করিয়া তুলিবার জন্য আজ আমরা দৃঢ়পণ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছি—আমরা ত ক্ষুদ্র আত্মজয় চাহি না—উৎসর্গ যজ্ঞের প্রধান তত্ত্বই ত আপনার ভস্মাবশেষ করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া—যজ্ঞ ত বন্ধ্যানষ্ট নয়, যে ব্যর্থ হইবে, সিদ্ধি দানে কুণ্ঠিত হইবে, অক্ষম হইবে—অমোঘ বেদনায় জীবন দিয়াই আমরা জয়যজ্ঞ করিব—ভগবানের জয়েই শ্রীঅরবিন্দের চরম জয়—সেই চরম ভাগবত জয়ের জন্যই আমাদের ধ্যান ও কর্ম্ম, ব্রত ও তপস্যা। আপনাকে এই অতুল শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রচৈতন্যে অগ্নিময় করিয়াই দেশ, জাতি, মানুষকে অগ্নিময় করিয়া তুলিতে চাই—এই অগ্নিময় অধ্যাত্মযুগই তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে—ভারতের বর্ত্তমান যুগান্তের অব্যবহিত পরেই বিজ্ঞানময় সিদ্ধযুগ আবর্ত্তন করিবে—সেই মহাযুগই অরবিন্দের যুগ—এই অরবিন্দ-যুগ প্রতিষ্ঠার জন্যই নিখুঁত আয়োজন আমাদের পূর্ণোদ্যমেই এবার সুসিদ্ধ করিতে হইবে—চক্র পূর্ণ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ ও দিব্য ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেই শ্রীঅরবিন্দের আশীষ-বৃষ্টি মূর্ত্ত হইয়া ফলিয়া উঠিবে—আজিকার উৎসবযজ্ঞ আমাদের এই যুগব্যাপী জীবন-যজ্ঞেরই একটা মহামূল্য মহানুষ্ঠান—আত্মার অন্তঃকেন্দ্রে আজ যে অতুলনীয় জয়-শক্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি, মহানের বিরাট সত্তা ভরিয়া তাহারই থরে থরে আবির্ভাব আকুল প্রতীক্ষায় ও ধীর ধৈর্য্যেই ফুটাইয়া তুলিতে চাই—আদেশ এবং প্রেরণা পাইয়াছি—উৎসবচ্ছলে আজ উঁহারই ঘোষণামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি—হে আমার অভিযাত্রী দিব্যজাতি! ঐ যে ভগবানের আদেশ, প্রেরণা—ইহারই সাফল্যের উপর দেশাত্মার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অর্দ্ধ বৎসর মাত্র সময় বাকী—এই অত্যল্প সময়টুকুর

ভিতরেই আদেশটুকু পূর্ণ, প্রেরণাটুকু সার্থক করিতে হইবে।

তার পর—আবার এমনি জন্মোৎসবে—সারা জাতিকে একদিন ডাক দিব—কিন্তু সেদিন আর বিরহোৎসব নয়—সেদিন হইবে বাংলার সিদ্ধপীঠে—চিরাকাঙ্ক্ষিত শ্রীঅরবিন্দের মিলনোৎসব।
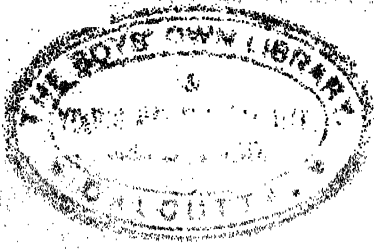
সংঘের কথা

নিজেদের মধ্যেই সংঘ নিয়ে বেশ আলোচনা আন্দোলন চলেছে। সংঘের গভীরতর অর্থ যতই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে, ততই যা হয়েছে তার উপর অনেকের মনে সংশয় উদয় হওয়া স্বাভাবিক এবং এরূপ সংশয় অমূলক কিনা সেও বিচার্য্য বিষয়।

সংঘ সৃষ্টি সার্থক করতে হলে, যে সত্য দৃষ্টির প্রয়োজন তা একদিনে লাভ হয় না, যুগ যুগান্তর ধ'রেই উহা অধিকার করে' যেতে হয়। এই দিব্যদৃষ্টি লাভ না করে' যে নির্ম্মাণ, তার মধ্যে ভুল থেকে যাবারই কথা, এই অবিসংবাদিত সত্য অখণ্ডনীয়।

* * *

কিন্তু সব মানুষের প্রকৃতি সমান নয়। ভগবানের ইচ্ছাতেই কেউ কেউ মনন মাত্রেই দিব্যদৃষ্টির ক্ষীণ রশ্মি বিকাশেই, আত্মপ্রকাশ করে' বসে। এবং তার পর ভিতরের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সৃষ্টিকে মেজে ঘসে, প্রয়োজন মত ছেঁটে কেটে অন্তরের অনুরূপ করে' গড়ে তোলে। গাঁথকরার মত ঠুকঠাক্ করে' গড়ে যাওয়া এদের স্বভাব, কামারের একবারে গড়বার ধৈর্য্য এদের না থাকলেও—মূলতঃ এরা ধৈর্য্যহীন নয়, সত্য দিয়েই এরা সৃষ্টিকে সার্থক করতে চায়। সেই জন্য অসংখ্যবার নির্ম্মাণকে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্পর্দ্ধা এবং সহিষ্ণুতা ইহাদের আছে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। সংঘসৃষ্টির ইহাও একটী ভঙ্গী। এ ভঙ্গী সত্য ভঙ্গীই।

* * *

এইরূপ ভঙ্গী নিয়ে যেখানে সংঘ নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলেছে—সেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বাধা বিঘ্ন সর্ব্বক্ষেত্রেই অতিক্রম করে' চলতে হয়—কিন্তু এখানের যে বড় বিঘ্ন উহা হচ্ছে অহংকার এবং আসক্তি। কেন না, যতখানি জ্ঞান বিকাশ ঘট্‌লে এই দুই বাধাকে উল্লঙ্ঘন করে' যাওয়া সহজ হয়—ততখানি জ্ঞানলাভ এক্ষেত্রে না হ'লে, আত্মসৃষ্টির মাঝেই সাধকদিগকে আবদ্ধ হয়ে পড়্‌তে হয়, এবং বাহিরের আলো ইহারা সহ্য করতে পারে না, কাজেই বিপুল চীন জাতির মত নিজের আচার আচরণই সত্য, আর সব মিথ্যা ব'লে নিজদিগকে দিন দিন সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলে, পরিণামে অকাল মৃত্যুই ইহাদের অদৃষ্টে ঘ'টে থাকে।

* * *

যেখানে ইহার অন্যথা হয়—সেখানে ইহার পশ্চাতে কোন বৃহৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য ক'রছে ইহা অবধারিত। মানুষের স্বভাবসরল দৃষ্টি বাহিরের রূপ দেখে সহজে এই সত্য অধিকার ক'রতে পারে

না। অনেক সময় সংঘ নির্ম্মাণের কেন্দ্রশক্তি লোক-লোচনের বিষয়ীভূত না হ'য়েই স্বকার্য্য সাধন করে, এইরূপ সংঘের কর্ম্মতৎপর সাধকগুলিকে দেখ্‌লে স্বভাবতঃই মনে হয়, ইহারা নিজেদের স্বভাব অনুসারেই নড়াচড়া করছে—খুব সহজ এবং সচ্ছন্দ গতিতে, ইহারা কিন্তু একজন মহাযন্ত্রীর ক্রীড়নক। সাফল্যের বিজয় মুকুট যখন ইহাদের মস্তকে শোভা পায়, তখনই সাধারণ লোকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ইহাদের জ্ঞানমণ্ডিত চরিত্রের অনুসন্ধান পায়। আমি এইরূপ সংঘকে উদ্দেশ ক'রেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করেছি।

*　　　*　　　*

সংঘ পাশ্চাত্যের অনুকরণে কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গড়ে উঠে না। আদর্শ, সমাজ, ধর্ম্ম রাজনীতি প্রভৃতি সাধনের ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট নীতি নীতির সাধনে মানুষ যে সমষ্টির সৃষ্টি করে, উহাও সংঘ নয়। সংঘ তপস্যার ধন। মানবাত্মার অবিভাজ্য সম্বন্ধকে মূর্ত্ত ক'রে, বিশ্বের বুকে নূতন সমাজ, নূতন ধর্ম্ম নূতন রাজ্য গ'ড়ে তুলতেই সংঘের সৃষ্টি। বুকের রক্ত ঢেলে যে কোন পরাধীন দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানতার গভীর আঁধার ভেদ ক'রে, মানুষের অন্তরতম শুদ্ধ সত্তাটিকে ফুটিয়ে তু'লে, যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, যে মিলনের স্বর্গীয় আনন্দ, তা নর শোণিতে পৃথিবী রাঙিয়ে তুললেও পাওয়া যায় না, এখানে শরীরপাতের মূল্য নাই, আছে আত্মার উদ্বোধনের।

*　　　*　　　*

এই আত্মাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হ'লে, চাই একটা কঠোর তপস্যা—এই তপস্যার নামই যোগ। ভারতের ধর্ম্ম প্রাচীন যুগে এই তপস্যার ভিতর দিয়েই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতো। অধুনা ধর্ম্ম ভগবানের কথঞ্চিৎ বিধান বাস্তবে পালনেই সিদ্ধ হয়, আরও তার বিকৃতি তীর্থে, মন্দিরে, মালা তিলকে, আচার আচরণে,—পরন্তু আপনার মধ্যে যে অপাপবিদ্ধ পরমপুরুষ আছেন, তাঁকে জাগিয়ে তোলা, অলৌকিক অসাধারণ তত্ত্বরূপে কৌপীনধারী সাধুপুরুষেরই সাধ্য হ'য়ে উঠেছে। হিন্দু সমাজ সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে মণিহারা ফণীর মত নিষ্ফল গর্জ্জন করছে—জগতের অন্যান্য জাতির অধ্যাত্ম সম্পদ্ না থাক, জীবনসম্পদে তারা ঐশ্বর্য্যবান, আমরা দুকূল হারিয়ে, অকূলে ভাসছি—এই নিঃসহায় জাতিকে গৌরবময় ক'রে তুলতে হ'লে, অধ্যাত্ম শক্তিতেই এর ভবিষ্য তুলতে হবে।

*　　　*　　　*

এই অধ্যাত্ম আহরণ হবে যোগে। সেই জন্য যোগকেই আমরা জাতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ড ক'রতে চাই। আমরা যে মিলনের গান গাই, যে ঐক্যের বাঁশীতে ফুঁ পাড়ি, তা সত্য ক'রতে হ'লে, বর্ত্তমান শরীর প্রাণ, মনের আমূল পরিবর্ত্তন চাই, পুরাতন কাপড়ে নূতন তালি যেমন নিরর্থক—তদ্রূপ এই ব্যাধি মৃত্যু বাসনা কামনা সংস্কার কলুষিত জর্জ্জরিত আধারে—সে মহান সত্যকে অবধারণ করার প্রয়াস বৃথা। হৃতজন্মের এই আধারকে নূতন ক'রে, সত্যের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য যোগেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। যোগের সাহায্যেই সেই উৎকৃষ্ট পরাজ্ঞান আমরা অধিকার ক'রতে পারবো।

*　　　*　　　*

বিজ্ঞান লাভ হ'লে সেই ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষের মত জীবনের ভঙ্গী উল্টে যায়, আর সেই উন্নীত জীবনের মূল তখন ভাগবত প্রবাহের অমৃত আহরণে নিজেকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলে, এই দিব্য অবস্থায় জীবন যখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন জানবে বিজ্ঞানে অবস্থিতি সত্য হয়েছে এবং এইরূপ ভাগবত জীবনের যে বাহন্সৃষ্টি, উহাই সংঘ। সেই জন্য সংঘ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে দিব্য জীবন গঠনের প্রয়োজন আছে।

—এই দিব্য জীবন লাভের তপস্যা ক'রতে গিয়ে যে সমষ্টি সৃষ্টি হয়, জীবন যদি সিদ্ধ হ'য়ে উঠে—সঙ্গে সঙ্গে সংঘও সত্য হ'য়ে উঠবে।

* * *

এইরূপ যে সংঘ, তাহার সকল আনুকূল্য সকল উপাদানই অন্তর্জগৎ থেকে আহরিত হয়, বাহিরের যে অভিব্যক্তি উহা বিস্তারের পাওয়ার লক্ষণ মাত্র, বাহিরের দিকে অধিক ঝোঁক পড়া, অভাব অনটনে, অবস্থা বিপর্য্যয়ে অপেক্ষা ও অস্থির হয়ে উঠা যেখানে অধিক ক'রে প্রকাশ পায়, সেখানে জীবনকে নিখুঁত ক'রে [illegible] [illegible] সংঘের যদি বিস্তারের কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে [illegible] একপাদের মত নিজের শিকড় দিয়ে রস টেনে নিয়ে নিজেকেই প্রবুদ্ধ ক'রে তুলে। উদ্যান বাগানবাড়ী ভাব এ ক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োজন নাই। যাহারা সর্ব্বদা নিজেকে ও আকাঙ্ক্ষাকে লক্ষ্য ক'রে থাকবে, অটুট শান্তিতে নিজেকে ভরিয়ে সর্ব্বদিক দিয়ে নিঃসংশয় হয়ে উঠবে—সর্ব্বাগ্রে চাই দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যাপ্তি সে তো স্বভাবসিদ্ধ।

* * *

কিন্তু বিস্তৃতি চাই—ইহাত জীবনের লক্ষণ। যত অধিক লোকের মধ্যে এই নূতন প্রবাহ ছুটে চলে—ততই যোগ মুক্ত হয়ে উঠে। ইহা খেলার মতই সচ্ছন্দ, ইহার মধ্যে কৃচ্ছ্রতার স্থান নাই—দৌড়ধুপ প্রচেষ্টারও প্রয়োজন নাই।

কতখানি ত্যাগ, কতখানি শক্তি, কতখানি উদারতা থাকলে—মানুষ আপনার মধ্যে অপরকে, অপরের মধ্যে আপনাকে দেখতে সমর্থ হয়—তা অনুমান করা শক্ত নয়, সংঘ সত্য হয় না যদি সেখানকার মানুষগুলি পরস্পর থেকে এক হয়ে না যায়,—সেইজন্য সংঘের মধ্যে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বড় কাজ নয়, প্রকৃত গুণের অভাবে বরং ইহাতে প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। মানুষ যদি নিতে হয়—তা নিতে হবে খুব বাচাই ক'রে—ভিতরের দিক থেকে দেখে শুনে—নিজের লোক চিনে বেছে নেওয়ার অভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে।

* * *

প্রচার সহজ—তদনুযায়ী নির্ম্মাণ বড় সহজ নয়। বিশেষ সংঘ ইহা এক অপার্থিব বস্তু। সেখানে যারা মিলিত হবে, তাদের মধ্যে থাকবে একটা অনাবিল প্রেম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, পরস্পরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন জেনেই তারা যে একত্র হয়েছে, সেখানে একজনের দোষ ত্রুটী অপরাধ ধ'রে অন্যজন নির্লিপ্ত সমবেদনার গুঞ্জন করে না, তীব্র প্রতিবাদের স্পৃহায় উন্মাদ হয়ে উঠে না, সকল ভুল সকল ভ্রান্তি—সেখানে কোন বিশেষ ব্যক্তির নয়—উহা সংঘের, সেই জন্য সবে সকলেই উহা সংশোধনের জন্য সাধনা করে—যোগ নিলেই যে সে সংঘের হবে এমন কোন কথা নাই—তবে যোগ না নিলে সংঘের হওয়া—বন্ধ্যা-নারীর পুত্র তুল্য একেবারেই অসম্ভব।

* * *

সংঘ সৃষ্টির পথে অন্তরায় উৎপাদন করার প্রচুর উপাদান নিজেদের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। দুইরকম প্রকৃতির মানুষকে খুবই চোখে চোখে রাখতে হবে। প্রথম যাদের নিজের দিকে অধিক টান আছে, অথচ সংঘের একান্ত অনুগত মিত্ররূপেই সংঘের উন্নতি কামনা করে। খুব গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, জ্ঞানে অজ্ঞানে ইহারা সংঘের রক্ত চুষেই নিজেদের বাসনাকেই পুষ্ট ক'রতে চায়, যখনই ইহাকে ব্যাঘাত প'ড়বে—তখনই এরা সংঘের প্রবল শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে। অপর এক প্রকৃতির মানুষ যারা আধখানি সংঘের সঙ্গে জড়িয়ে রেখে অপরার্দ্ধটা দিয়ে ব্যক্তিগত [illegible] ভোগ ক'রে যায়, যখন যেদিকে সুবিধা তখন সেই

দিকেই ঝুলে পড়ে, ইহারা জ্ঞানপাপী—ত নৌকায় পা দিয়ে চলা এদের স্বভাব, সকলের অতর্কিতে ঘরের শত্রু বিভীষণের মত ইহারা সংঘের মূল প্রতিষ্ঠানটীকে শতচ্ছিদ্র করে' দেয়, ভরা ডুবি করতে এরা সিদ্ধহস্ত।

* * *

প্রথম প্রথম সকল সংঘের মধ্যেই এরূপ শত্রু অবস্থান দেখা যায়, কেননা প্রকৃতি অপরিত্যাজ্য। তবে অধিক দিন এইরূপ গলদ সংঘের মধ্যে থেকে গেলে সে সংঘের ধ্বংস অনিবার্য্য। শীঘ্র শীঘ্র এই সকল দোষ অপসারিত না হওয়ার প্রথম কারণ—যে পূর্ণ দৃষ্টি থাকলে মানুষের সত্য পথ সহজেই ধরা পড়ে তাহার একান্ত অভাব—দ্বিতীয় কারণ সত্য দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য আছে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এতদ্ব্যতীত আরও অন্য অনেক কারণ আছে—উহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে—আমরা স্বভাবতঃ বড় এক রোখা। ভিতরের হিরন্ময় দিব্য শক্তির দর্শন পাবামাত্রই—আমরা এত অন্তঃশক্তির বলেই সব করবো এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি, বাহিরকে বিচার করে' পরখ ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার প্রয়োজন বোধ করি না, তা ছাড়া কর্ম্মের আকর্ষণেও আমরা অনেক সময় আত্মহারা হ'য়ে পড়ি, কর্ম্মের গতিকে ক্ষিপ্র এবং ইহার পরিধি বিস্তারের দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়ে ফেলি, এইরূপ অবস্থায় অন্তরের মণিকোটার দিক থেকে দৃষ্টি স'রে গিয়ে বাহিরের সুবিধা ও সুযোগের দিকেই চিত্ত আমাদের আকৃষ্ট হয়, এই অবসরে সংঘের মধ্যে মারের প্রবেশ কিছু অসম্ভব নয়।

* * *

বিনা অভিজ্ঞতায় আবার এই সকল ভুল সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু অধিক উদাসীন হ'লে কেবল অভিজ্ঞতার জন্য যদি সংঘের বুকে উপর্য্যুপরি ছুরিকাপাত হয়—তবে সংঘের প্রাণ মুমূর্ষু হ'য়ে উঠে—সেই জন্য সংঘাত্মাকে এইদিকে খুব সচেতন থাকতে হবে।

সংঘের উপযোগী আধার তাঁরাই—যাঁরা ভিতরের মণিকোটায়—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভগবানের সন্ধান পেয়েছেন, যাঁরা অন্তরের রসাভিষেকে অভিষিক্ত হ'য়ে বাহিরের প্রলোভনে নিরুদ্বেগ হ'তে পেরেছেন—যাঁরা "আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং", মানুষের আনুকূল্যে ও প্রতিকূলতায় অবিচল, নির্ম্মম দ্বন্দ্বহীন মহাপুরুষ, যাঁদের চিত্ত "আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে", যাঁরা "নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ" হয়ে বিশ্বহিতের জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছেন—সংঘসৃষ্টির আগে এই দিব্য মানুষেরই অভ্যুদয়ই আমরা দেখতে চাই।

কেশবচন্দ্র ও সমাজ সংস্কার

(১)

ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারের মূলপ্রেরণা, শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনের তিরোধানের পর হইতেই ভারতে সমাজসংস্কারের স্রোত মন্দীভূত হইয়া যায়। শেষবয়সে ব্রহ্মানন্দ যখন ভারতে সমাজ-দোষ নিবারণ কৌশলের সহিত ভারতীয় অধ্যাত্ম জীবনের সমন্বয়ে বিশেষ মগ্ন হইয়াছিলেন, তখনই লোকতঃ সমাজ-জীবনে তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার তিরোধানের

পূর্ব্ব হইতেই সমাজ সংস্কার, বিধবাবিবাহ অসবর্ণবিবাহ স্ত্রীস্বাধীনতা জাতিসাম্য প্রভৃতিতে সুচিহ্নিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় করিয়া আসিলেও তাহার মূল যেন দিন দিন শিথিল হইয়াই পড়িতেছে — ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক তন্ময়াবস্থার উচ্চ দিকটা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সংস্কারপন্থীদিগের মধ্যে যে প্রতিবাদভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই আজ পর্য্যন্ত সমাজসংস্কারের ক্ষীণ জীবনটুকু সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

সমাজসংস্কারের খরস্রোতে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মানন্দ শেষ জীবনে ভাবের আধিক্যে সংস্কারের গতিটা কিছু মন্থর করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমের যে আলোক লাভ করিয়া সমাজশরীরে দিব্যজ্যোতিঃ সঞ্চারিতে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার জীবনসঞ্জীবনীসুধা মহাপ্রাণ কেশবকে একেবারে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, তাই তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণ ও হিন্দুশাস্ত্রের আলোক পাতে নব সমাজসুধা পান করিতে অন্তরে-অন্তরে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে চাহিয়াছিলেন সমাজজীবনের গতি,—মানবের স্বসত্তার স্বাধীন ভাব কাহারও চাপে যাহাতে পঙ্গু হইয়া না পড়ে, তাহার অনন্ত বিকাশের সকল বাধা যাহাতে দূরে দূরেই থাকিয়া যায়, এই শুভ ইচ্ছা লইয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র প্রথমে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। নিজদিগের ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে জীবনবিকাশের ও স্বাধীন জীবনগতির সামান্য বাধার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তিনি নিজ সমাজেরও বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তাঁহার জীবন খুব খরবেগেই চলিত, তাঁহার অন্তর খুব স্বচ্ছ ছিল, ইউরোপের নব জীবনতত্ত্ব ও নব সমাজতত্ত্ব তাঁহার নিকট উহার সত্য স্বরূপ লইয়া আগমন করিয়াছিল। এই সব ইউরোপীয় সত্য সম্পদের মহাভাণ্ডারে মুগ্ধ কেশবচন্দ্র অমিতবলে দুই হস্তে দুইদিক রক্ষা ও দুই বিপক্ষকে সংযত করিয়া যে পথ গিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনের প্রথম কার্য্য।

সমাজের ব্যষ্টি জীবনের প্রত্যেক গতিটীকে অবাধে অগ্রসর করিতে তিনি সর্ব্বদা সজাগ থাকিতেন, তাঁহার তেজঃ তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা একটা মূল জীবনতত্ত্বকে সত্যরূপে পাইয়া তবে এত অমোঘবীর্য্যে নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছিল—ইহাই তাঁহার ভিতরের সত্যদর্শনের মহাভাব ও মহাতেজঃ। ইহার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাকে সাহায্য করিতে ও ইহার অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে অনেক প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে—তাহাদের কার্য্যই ছিল সাহায্য করা, তাঁহারা কেবল চালাইতে জানিত। অবশ্য যাহার প্রেরণায় তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, যে ভাবের বিকাশস্বরূপ তাঁহারা গণ্য হইতে পারিত সেই ভাবটাকে পূর্ণরূপে ধরিতে পারিলে তাঁহাদের অবস্থা যে কিরূপ হইত এখন অনুমান করা যায় না।

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ প্রথম কার্য্য সম্পাদন করিয়া, জীবনগতি ও গতিঐশ্বর্য্যের সকল তৃপ্তি পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া জীবনের মধ্যে স্পষ্ট মহানীতিসন্ধানের আবশ্যক অনুভব করেন। ভিতরে শিখা লইয়া একটা আগ—সকলকে দগ্ধ করিবার মত কেবল এক তেজঃ-স্ফুলিঙ্গের মধ্যে জীবনকে সমগ্র কিছুতেই দেখা যায় না। তা'ছাড়া পশ্চিম হইতে বিদ্যুৎ-আলোক মহাপ্রাণ কেশবচন্দ্রকে স্পর্শ করিয়াছিল, পশ্চিমের ন্যায় তাহা সমগ্র সমাজকে উদ্বেলিত ও উত্তেজিত করিতে পারে নাই; বাহিরের পারিপার্শ্বিকতা ভিতরের অগ্রগমনের তালে তাল রাখিতে পারিলে হয়ত তিনি অতি শীঘ্র জীবনকে অত অন্তরের দিকে ধরিতে পারিতেন না, এইরূপে জীবনকে অন্তরের দিকে ধরিতে দিয়া যুদ্ধের সাথে মাতোয়ারা ও অতৃপ্ত সংস্কার-বাসনা-কামনালক্ষ তাঁহার সাহায্যকারীদিগের সহিত তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, তাঁহারা কেশবকে বুঝিতে পারেন নাই, কেশবও

জননায়ক ও ভাবনেতার সুসিদ্ধ ও সুকৌশল নীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি সত্যকে অধিকার করিবার জন্য আর সকলই ছাড়িতে পারিতেন। ভারতীয় আবহাওয়ার মধ্যে যে অধ্যাত্মজীবন ধর্ম্ম-সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি সকলেরই মূলতত্ত্ব থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছিল এবং চারিদিকের বিদেশী ও বিকৃত অন্য প্রেরণার বিরুদ্ধে যে অধ্যাত্মজীবন ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিতেছিল, ব্রহ্মানন্দ কেশব তাহার প্রথম সাক্ষাতেই একেবারে অধীর হইয়া উঠেন,* তাঁহার জীবনের তেজঃগতি একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। যাহার স্পর্শ তাঁহার জীবনকে এরূপ বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত, তাহাকে জয় করিয়া তাহার মধ্য দিয়া নিজের জীবনগতির নব বিধান উদ্ধার করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হন, ফলে তাঁহার নূতন জীবন আরম্ভ হয়।

এই নূতন জীবনের কেন্দ্রভূমি তিনি স্পর্শ করিয়াছিলেন কিনা, তিনি সত্য সত্যই ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ থাকিতেন, না নব আনন্দধাম অধিকারের জন্য আগ্রহ-আনন্দেই তিনি জীবনশেষ করিয়া গিয়াছেন, এ সব প্রশ্নের উত্থাপন ও মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই। তবে তাঁহার প্রথম জীবনটা নিঃশেষ হইয়া একেবারে একটা নূতন জীবন—ভারতীয় অধ্যাত্ম-আলোকে পূর্ণ হইবার ক্ষেত্রস্বরূপ একটা খাঁটি দেশীয় জীবন তাঁহার মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দের ভাবের সহিত গতি মিলাইয়া তাঁহার অধিকাংশ সহযাত্রী যদি চলিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে হয়ত ব্রহ্মানন্দের ঈপ্সিত নব বিধান সত্য সমাজবিধানে পরিণত হইতে পারিত, তাহা না হইয়াও যদি তাঁহার সহিত গভীর ও সত্য সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াও তাঁহারা চলিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহাদের সংযোগে সমাজ-সংস্কারগতি বৈচিত্র্য লাভ করিতে পারিত, এত পঙ্গু ও নগণ্য হইয়া তাহাকে কাটাইতে হইত না। তাহা না করিয়া কেশবের প্রতি তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, পশ্চিমের জীবন-গতি যেরূপ আধারে স্ফূর্ত্ত হইলে তাহা কাজের মত কিছু করিয়া যায় সেরূপ আধার প্রস্তুতের অন্তর-সাধনা আর তাঁহাদের রহিল না, যাহা রহিল তাহার সব সারটুকু গোস্বামী প্রভু বিজয় চন্দ্র ভাসাইয়া লইয়া নিজের চক্রে বিচিত্র ভাব-অনুশীলনের আধাররূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

কাজেই সমাজ-সংস্কার বলিয়া আজ যাহা পরিচিত, তাহা উপরের অতি ক্ষীণ সামান্য প্রবাহ মাত্র। ইহা লইয়া দেশে বিপুল সামাজিক প্রতিষ্ঠান কিছুতেই সম্ভব হয় না। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব কেহ একেবারেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। একান্ত পশ্চিমা মার্কা সমাজসংস্কারস্রোতকেও যে কিরূপে অস্বীকার করা যায় তাহা বুঝা যায় না।

(২)

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল হইতেই তথাকথিত সমাজ-সংস্কার জাতির জীবনে তত কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, রাজনীতি ও জাতিগঠনের মূলতত্ত্ব বিষয়েই জাতি বিশেষ ব্যাপৃত, কিন্তু যখনই গবর্ণমেণ্টের দমননীতির বলে বা অন্য কোন কারণে জাতি কিছু বিরাম চাহিয়াছে, অমনি সমাজ সংস্কার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া বিধবা বিবাহ, যবতী বিবাহ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথের বিবাহবিধি প্রণয়নের চেষ্টা, এমন কি শ্রীযুক্ত প্যাটেলের অসবর্ণবিবাহবিধিপ্রস্তাব সকলগুলিই, জাতি যখন জাতির মূল ভিত্তির সন্ধান ও রাজনীতিচর্চ্চা হইতে কিঞ্চিৎ বিরত হইয়াছে, অমনি তখন মাথা তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু ইহাদের এই অবসর মত আত্মপ্রকাশের চেষ্টার মধ্যে বেশ বুঝা যায় জাতির মূল জীবনকে নূতন আলোক দেখাইয়া সমাজবদ্ধ করিবার মহানীতির বশে ইহারা চালিত হয় নাই। এই মহা-

ভেদ করিয়া সমাজের মধ্যে এক দিব্য মহানীতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। তাহাই সমাজসংস্কার, আর অন্য যা' তাহা তাহারই ক্ষীণ ও কোন কোন স্থানে বিকৃত প্রতিধ্বনি মাত্র।

বিজ্ঞান-সাধনা

স্বভাবকে পাইয়াছি, স্বভাবই শিখিয়াছি, এই স্বভাব দেহের, প্রাণের, মনের—স্বভাবের ভিতর দিয়াই ত তার অন্তরের যে আসল সত্য, মূল ধর্ম্ম সেইটিই উদ্ধার করিতে হইবে। আমাদের মন এই মূল সত্যটিকে ঠিক নিরূপণ বা রূপদান করিতে পারে না—মন খুব স্বচ্ছ হইলে উপরের সত্যটিকে আভাসে প্রতিফলিত করিতে পারে বটে কিন্তু সত্যকে নিছক সত্যরূপেই পাওয়া, আর তার বিজয়ীশক্তি জীবনে নামাইয়া, জীবনকে তাই দিয়াই নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা, জীবনে উহাকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরা—এ করিতে হইলে আমাদের মনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়া উপরে উদাসীন অর্থাৎ উদাসীন হইয়া বসিতে হইবেই—মনকে পদে পদে পলে পলে অতিক্রম (transcend) করাই হইতেছে বিজ্ঞানলাভের পথ। মন থাকিতে বিজ্ঞানও নাই, সত্যলাভও নাই। মনকে ছাড়িতে হইবে, বুদ্ধিরূপে তার যে স্বচ্ছ হিরণ্ময় চিন্তাপাত্র, সে উজ্জ্বল সোণার ডালিটিকেও বিদীর্ণ করিয়া উপরে চলিয়া যাইতে হইবেই,—এই যে উপর জগতের কথা ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিতেছি, তার নাম রূপ ভাব গুণ সবই মনের অনুরূপ না হইলেও বিচিত্র সত্য রূপেই জানা যায়, পাওয়া যায়—সে সত্যেরই জগৎ, একটা প্রত্যক্ষ সৃষ্টিই—অনির্দ্দেশ্যম্ অলক্ষণম্ শুধুই নয়। বেদের শূন্য, শঙ্করের মায়ানুভূতি সত্য অনুভূতি হইলেও সত্যের সত্তার নিঃশেষ ও সবখানি অনুভূতির নয়—সত্যের পরিপূর্ণ রূপ বিজ্ঞানেই লভ্য—কারণ বিজ্ঞানই অনাবৃত চিন্ময় ভাবমণ্ডল ও রূপমণ্ডল—সেই ত অখণ্ড মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ-নিবিড় সূর্য্যমণ্ডল—বেদে যাহাকে বিষ্ণুর বিরাট চক্ষু বলা হইয়াছে—চিন্তাশক্তি উহারই বিকীর্ণ রশ্মিপুঞ্জ—তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

বিজ্ঞানেই নিত্যসৃষ্টি—কারণ জগৎ সে ত উদ্ভট রহস্য জগৎ কিছু নয়—এই বাহ্য সৃষ্টি ও সূক্ষ্মসৃষ্টি যাহা কিছু, তাহারই আসল নাম, আসল রূপ যেখানে, সেই স্বরূপ ছাঁচ সেগুলি নিত্য বস্তু, এই নিত্য স্বরূপজগৎখানিই কারণ জগৎ—আমাদের আসল সত্তা, আসল প্রাণ সব সেইখানেই গূঢ়রূপে অবস্থিত—বিজ্ঞান লাভ অর্থে আমাদের এই গূঢ় সত্তা-বস্তুটিরই পুনরুদ্ধার কথাই ব্যক্ত করা হয়। সে সত্য আত্মবস্তু ত স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বপ্রকাশ, চন্দন কাষ্ঠ ঘর্ষণে ঘর্ষণে তার অন্তরের নির্ম্মল সৌরভটুকুই যেমন বাহিরে ফুটিয়া পড়ে, সাধনার মন্থনে তেমনি বিজ্ঞান-চৈতন্যই স্বতঃক্রমে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। সাধনা বিজ্ঞানকে মাত্র ভিতর হইতে বাহিরে ফুটাইয়া প্রকাশ করে, যাহা আপনি জ্যোতির্ম্ময় তাহার আবরক বিঘ্নগুলি ঘষিয়া ঘষিয়াই নিঃশেষ করিয়াই জ্ঞানসূর্য্যকে মনের, প্রাণের, দেহেন্দ্রিয়ের কাছেও তদ্রূপ উপযোগী ভাবে ও রূপে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া ধরে। এই অর্থেই

বিজ্ঞানের জন্য সাধনার প্রয়োজন আছে, নতুবা বিজ্ঞান স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য, আত্ম-প্রকাশই তাহার ধর্ম্ম—আত্মপ্রকাশের পথটিকে স্বচ্ছ, সুগম ও নিরঙ্কুশ করিয়া তোলাই সকল যোগ ও সাধন-তন্ত্রের আসল ও একমাত্র লক্ষ্য।

মন লইয়া আমরা যে সংসার পাতিয়া বসিয়াছি, সে মনই সবখানি সত্য নয়, মনের নিজ ধর্ম্মেই তার যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় না কি? মন বলিতে এখানে মানুষের সাধারণ অন্তঃকরণ খানিকেই সমষ্টিভাবে লইয়া বলিতেছি—অন্তঃকরণ বুদ্ধি, মানস, হৃদয়, সূক্ষ্মপ্রাণ এই সবেরই সমষ্টি। মন চায় কি? মন চায় জ্ঞানের পর জ্ঞান—অনন্ত জ্ঞানই, হৃদয় চায় রসের পর রসের ভোগ—অনন্ত ভোগই, প্রাণ চায় শক্তির পর শক্তির খেলা—অনন্ত শক্তিই—এই অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, ভোগের আকাঙ্খা আমাদের আছে, প্রাপ্তি নাই, সাধনা দিনের পর দিন চলিয়াছে, সিদ্ধি নিত্যই দূরগামী, এই রহস্যটুকু তলাইয়া বুঝিতে গেলেই মনেরই ইঙ্গিতে এক নূতন রাজ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া যায়—কোথায় গেলে এই অনন্তের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত, সিদ্ধি সাধনাকে নিত্য আলেয়ার আলোর মত ফাঁকি না দিয়া ধরা দিয়া তাহাকে সফল করিয়াই তোলে—সন্ধান ত তাহারই করিতে হইবে—জগতের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা সব মানুষের এই ভূমার সন্ধান করিতে গিয়াই বিচিত্র প্রয়াস প্রণালী ত—অনন্তের এই নিজস্ব ক্ষেত্র—ঋতম্‌—সেই দেবরাজ্যই বিজ্ঞানরাজ্য—বিশুদ্ধ সত্যের ভূমি।

মন এই রাজ্যকে ইঙ্গিতে লক্ষ্য করিয়া জানাইতেছে, অথচ যাহাকে স্বরূপে ফুটাইয়া দেখাইতে পারিতেছে না—গুরু ও শাস্ত্র একবাক্যে অভ্রান্ত স্বরে বলিতেছে সেই বস্তু ত মনেরই মন—মনসো মনঃ—এই মনের মনকে পাইবার জন্যই মনকে উন্নয়ন করিতে হইবে—মন-রাজ্য উত্তীর্ণ হইবার সহজ পথই হইতেছে উপরের মনটিকেই অগ্রে জাগ্রত করা। কথাটি বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে—মন ও বিজ্ঞান যদি দুইটি একেবারে পৃথক বস্তু হইত, উভয়ের ভিতর কোথাও সংযোগসূত্র একেবারেই খুঁজিয়া না মিলিত, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে সত্য লাভ অসম্ভব হইত—কেন না বর্ত্তমান মানুষ সে ত মনেরই জীব, একেবারে মনছাড়া বস্তু তাহার ধারণাগম্য করিতে আত্ম-সূত্র ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া ব্যতিরেকে গত্যন্তর থাকিত না—ফলে অনেকক্ষেত্রে হইয়াছিলও তাহাই—ধর্ম্মজগতে অতীন্দ্রিয় স্পর্শে লোলুপ মানুষ নীচের পানে আর ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিবার অবসর পায় নাই, কোন উপায়ে মনের আকর্ষণ-কেন্দ্র হইতে ছিটকাইয়া পড়িতে পারাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল—এ কিছু বিচিত্র নয়, ব্রহ্মচৈতন্যের স্পর্শে এই ক্ষুদ্র মন অগাধ সুষুপ্তিতেই ঘুমাইয়া পড়িবে, একান্ত ও একমাত্র স্বাভাবিক—এইজন্য যোগীজনসেব্য কঠোর সাধন পন্থার শেষ ক্রমে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণই হইয়া উঠিয়াছিল মধ্য যুগের ভারতের লক্ষ্য। ব্রহ্মেরই এই জগল্লীলা সম্পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক করিয়া তুলিবার যে গূঢ় কৌশল, মানুষ এই জন্য তাহা ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারে নাই।

ব্রহ্মকে সত্যকে এইজন্য আমাদের ধরিতে হইবে, পাইতে হইবে—বিজ্ঞানেরই মধ্য দিয়া—অর্থাৎ বিজ্ঞানের মধ্যে যে এক মহা মন আছে, সেই মন দিয়াই এই নীচের মনটিকে উপরে তুলিয়া লইতে হইবে, উপরেই ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—দিব্য মনের ছাঁচেই উহাকে রূপান্তরিত করিয়াই এই প্রতিষ্ঠা দান করা সহজ ও একমাত্র সম্ভবপর। সাধারণ যে মন—তাহার অর্দ্ধেকখানি প্রাণে, ইন্দ্রিয়ে নিমজ্জিত, অবশিষ্টটুকু সত্য মিথ্যায় মিশ্র খণ্ডপূর্ণ, এই মনেরই অন্তঃস্থলে অনুশীলন ফলে আর এক মন জাগিয়া উঠে—উহা ভাবময় মন, সাধারণ মনেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ

এই মন, তবে উহার গভীরতর, স্বচ্ছতর ও সমধিক তলস্পর্শী সংস্করণ মাত্র। এই মনকেই শুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে—একটা নিত্য মনের রাজ্য অন্তশ্চেতনায় সহসা খুলিয়া যায়—ইহাই দিব্যমনের নিখুঁত প্রতিরূপ (corresponding mould)—এই নিত্য-মনে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইলে, বিজ্ঞান রাজ্য দর্শন স্পর্শন আর তেমন দুরায়ত্ত ও সঙ্কটপূর্ণ থাকে না। সাধারণ মনেই আমরা সচরাচর চলাচল করি, উহাতেই থাকিয়া জীবনকার্য্যগুলি সম্পন্ন করি- ভাবুক, মনীষী, শিল্পী, কবি—ভিতরের ভাবমনটিকে লইয়াই কত রঙ্গীন খেলার লহরী ফুটাইয়া তোলেন—সাহিত্য দর্শন, চারুকলায় সেই ভাবমনেরই বিচিত্র প্রতীকচ্ছবি বিশ্বমানুষ থরে থরে সাজাইয়া তুলিতেছে- যোগী স্পর্শ পায়, দর্শন করে নিত্য মনের—অন্তর সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র এই নিত্য মনই। এইখানেই দাড়াইয়া বিজ্ঞানকে গ্রহণ, ধারণ ও আলিঙ্গন করিতে হয়, আবার এই স্তর হইতেই উহাকে তুলিয়া বিজ্ঞান মণ্ডলের নিজ ক্রোড়গত যে দিব্য মন - উহাতে উহাকে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয়।

বিজ্ঞান-সাধনার এই গূঢ় সূত্রটিকে ধরিতে না পারিলে, সাধনা শুধু স্বপ্ন-সারই হইবে—ভাব-ময় যে মন, এই মনটির শোধন হইতেই আরম্ভ করা বিধেয় - কারণ, একটু চিন্তাশীল স্থিতধী যিনি, তিনিই স্বল্পায়াসেই আপনার এইটুকু অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া এই ভাব-মনের রহস্যগুলি ধরিতে ও বুঝিতে পারেন। ভাবুক জানেন—এই মনের মধ্যে এমন সব আভাস, অনুভূতি, চেতনা-রশ্মি সব আসে, যাহা ইন্দ্রিয়ের, যুক্তির সাহায্যে ঠিক অবধারণ ও নিরূপণ করা যায় না—পাশ্চাত্য দার্শনিকরা আজ যে intuition, tertium organon প্রভৃতি নব-বৃত্তি সবের কথা ইঙ্গিতে আভাসে ধরিতেছেন, কহিতেছেন, সে সব ঠিক তর্কবুদ্ধির (rational intellect) জাত নয়, প্রাণেরও নয়—এ সব এক নিবিড়তর স্বপ্ন-পুরীরই প্রেরিত দূত ও বার্ত্তাবহ—মানুষ আজ স্পষ্ট প্রত্যয় দিয়া এই সব তর্ক ও ইন্দ্রিয়াতীত ভাববৃত্তিগুলির উপরে ধীরে ধীরে আস্থাবান হইয়া উঠিতেছে—যোগসাধনায় এই স্বাভাবিক অনুশীলনধারাই স্ফুটতর ও কেন্দ্রমুখী হইয়া প্রবহমান হইতে আরম্ভ করে।

এইজন্যই আমরা সাধকদের জন্য ভাবযোগ অবলম্বনের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। ভাবযোগ- বিজ্ঞান-সাধনারই পূর্ব্বযোগ—উহার প্রশস্ত সোপান। ভাব বিশেষ স্বরূপ করিয়াই উপরে উঠা স্বাভাবিক ও সহজ পন্থা। ভাব—দিব্য ভাবের পূর্ণানুভূতি একদিনে আসে না, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—ভাবসাধনার ক্রমগুলি ধীর নিষ্ঠায় অতিবাহন করিয়া চলা খুব দুঃসাধ্য ও ক্লেশকর কিছু নয় - কেবল প্রাণশুদ্ধির জন্য সঙ্কল্প ও অন্তর্বাসনা অবিরল নিরত রাখিলেই ত হইল। ভাব-সংশুদ্ধি চাই—এই ভাব দিয়াই ত ভাবময় ভগবানকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে—তাঁহার পরশ যেখানে পড়িবে, সেই হৃদয়মঞ্চখানি শুদ্ধ স্বচ্ছ করিয়াই বিছাইয়া রাখিব না? এই শুদ্ধিই ত যোগের প্রথম ও মূল কথা—প্রেমে, নিষ্ঠায়, ভক্তিসাধনায় এই শুদ্ধি আসে। আবার জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ সেও এই একই জিনিসের বিভিন্নভঙ্গী—নিষ্কাম ও কর্তৃত্বশূন্য দেশসেবা, দেবসেবা মানুষসেবায় হৃদয় শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ উজ্জ্বল হইয়াই উঠে। ধ্যানে মননে, গাঢ় আত্মচিন্তার দ্বারাও বুদ্ধি দিন দিন নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানধারণ ও প্রকাশক্ষম হইয়া উঠে। সাধনার ভঙ্গীবৈচিত্র্যে কিছু আসিয়া যায় না—আসলে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু থাকিলেই যথেষ্ট—সে আর কিছু নয় হৃদয়ের অকপট উৎসর্গ, নিষ্ঠা এবং অনাহত আকাঙ্ক্ষার অগ্নি—এই আকাঙ্ক্ষা—ভাগবত জীবন-লাভেরই জন্য নিরবচ্ছিন্ন ইচ্ছাধারা ছাড়া আর কিছুই নয়—ইহাই অভীপ্সা—aspiration—এই

অনির্ব্বাণ তপাগ্নি জ্বালিয়াই আত্মশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়।

মানুষের দিক্ হইতে এইটুকুই দরকার, আর এইটুকুই ত সম্ভব। সত্য সত্য মানুষ আর কি সাধনা করিবে, না করিতে পারে? "সাধন ভজন সব অকারণ, শুধু জীবন খোয়ান"—সাধনার নেশা, বিষয়ের নেশার মতই সমান অপকারী ও ভগবৎ লাভের পরিপন্থীই হইয়া উঠে, যদি ভিতরে ভাবের ঘরে এতটুকুও চুরি থাকে। সেইটুকুই কেবল দেখিয়া লইতে হইবে। আকাঙ্ক্ষাটুকু খাঁটি ত, উৎসর্গে কোনও খাদ আছে কি, সত্যই, একান্ত সত্যই ভাগবতজীবন লাভের জন্য দেহ, মন, জীবন—সর্ব্বস্ব ঢালিতে চাহিয়াছি ত? বাস্ এইটুকুই যথেষ্ট। এই খাঁটি ভাবটুকুই আমার আর যাহা কিছু সাধারণ গলদ ও অশুদ্ধি, সব নিঃশেষে একান্তভাবেই নিরসন করিয়া দিবে। ভগবানই ত তখন স্বয়ং সাধক, তাঁহার করুণাস্নাত স্নেহপ্লাবনে দিন দিন বিধৌত ও বিশুদ্ধ হইয়াই উঠিব—তাহাতে বিন্দুপরিমিত সংশয় পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তরে অবস্থান করিতে দিব না।

এই অগ্নিময় শ্রদ্ধাশক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনা। শ্রদ্ধাং ভগবতি চ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অনন্ত ভগবানে, শ্রদ্ধা তাঁহার অনন্ত শক্তিতে—সাধনার জন্য আর কোনই সম্বল ত প্রয়োজন নাই—শ্রদ্ধাই অমোঘ বীর্য্যশক্তি জীবনে সঞ্চার করিয়া দিবে—বীরযোগী তাহার অখণ্ড শ্রদ্ধা ঢালিয়াই জয় হইতে জয়ে, সিদ্ধি হইতে সিদ্ধিতে আপনাকে, জাতিকে, জীবনকে, মানুষকে লইয়া চলিবে। কারণ, শ্রদ্ধা আসলে কি? শুধু হৃদয়ের অসংখ্য ভাবের একটা ক্ষণভঙ্গুর বীচিবিক্ষোভ নয়—শ্রদ্ধা খেয়াল নয়, স্বপ্ন নয়, ধারণা চিন্তা মাত্রও নয়—শ্রদ্ধা যে সত্তারই শক্তিশক্তি ও সৃজনশক্তি—শ্রদ্ধা ঢালিয়াই ত পুরুষ তাহার প্রকৃতিকে শাসন করিয়া চলিয়াছে, শ্রদ্ধা—আত্মারই কেন্দ্র প্রতিমূর্ত্তি—বিজ্ঞানময় যে নিত্য সং-পুরুষ তিনিই হৃৎপদ্মে শ্রদ্ধাময় হইয়া জীবনকে জগৎকে পরিচালন করিতেছেন—শ্রদ্ধাময়োঽয়ম্ পুরুষঃ—শ্রদ্ধাময় পুরুষ বিজ্ঞানপুরুষই—হৃদ্‌বিহারী—উপরে যিনি চিন্ময় সত্যঠাকুর, হৃদয়ে তিনিই ভাবের ঠাকুর রসপুরুষ—ভগবান্। ভাবযোগে—এই ভাগবত নিষ্ঠাকেই কেন্দ্র করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয়।

তারপর, ভাগবত স্পর্শ। ভিতরের শ্রদ্ধাই উপরের ভগবানকে ডাকিয়া আনিবে। মানুষ যদি সত্যই ব্যাকুল হয়, ভগবান স্থির থাকিবেন কতক্ষণ? ভগবানের দিক হইতে সাড়া পাওয়া—সে খুব বেশী কথা কিছু নয়। ভগবান ত কল্পনার পুতুল নন, যে মনগড়া রঙে তাঁহাকে ইচ্ছামত রাঙাইয়া তুলিবে, আবার ইচ্ছামত উড়াইয়া দিবে—ভগবানকে ত জানিতে পাইতে কিছুই কষ্ট হয় না, যদি শ্রদ্ধা খাঁটি হয়, অটল হয়, আকাঙ্ক্ষা অনাবিল হয়, এই শ্রদ্ধাই চাই, ভগবান তাঁহার স্বরূপেই আমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবেন, আকাঙ্ক্ষার নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিস্রোত আমার সর্ব্বাঙ্গ দহিয়া দহিয়া গলিয়া গলিয়া একটা অগ্নিমূর্ত্তিতেই পরিণত করিয়া তুলুক—এমন আকুল লোল লালসা জাগুক—যেন উহাই আমার সবখানি গ্রাসে গ্রাসে গিলিয়া ফেলে, বুকখানি উহারই অনন্ত প্লাবনে দুকূল ভাঙ্গিয়া তলাইয়া যায়—আপনাকে যে মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণরূপে হারা হয়া ফেলিব, গলিয়া গলিয়া নিঃশেষে ফুরাইয়া যাইতে পারিব—সেই মুহূর্ত্তেই না অপার্থিব আবেশে আমায় মূর্চ্ছিত করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আমায় এক নূতন জগতে উঠাইয়া লইবে—সেই ত বিজ্ঞান-জগৎ—যেখানে অহং-এর কৌটা কাটিয়া প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ, সেখানে আপনাকে নিশ্চিহ্নরূপে খোয়াইয়াই উলঙ্গ হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়—সেই হিরণ সূর্য্যমণ্ডল—আলোর, অমিয়, তেজের খনি—মানুষ পুড়িয়া যায়—পুড়িয়া দেবতাই হয়।

সেই বিজ্ঞানই এবার জাগ্রত হউক। ভগবান্

আগুন, মানুষকে অগ্নিময় করিয়াই আগুন। মানুষের সব সোণার সাধ আকাঙ্খা, মানুষের সবটুকু অহঙ্কার ও আসক্তি চিরদিনের জন্য জ্বলিয়া খাক হইয়া যাউক—দেবতা আগুন মানুষের জ্ঞানে, তাহার হৃদয়ে, তাহার প্রাণে, তাহার ইন্দ্রিয়গুলির পর্ব্বে পর্ব্বেও তাহার রক্ত-মাংসের অণু-পরমাণুর মধ্যে পর্য্যন্ত ও ভাগবত ঢল অবতরণ করুক, অনুপ্রবিষ্ট হউক। তারপর, সেই অণুতে পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট মহাসত্তা অব্যর্থ আকর্ষণে সারা-মানুষটিকেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ করিয়া উপরে টানিয়া তুলুন। সেখানেই যে সে খুঁজিয়া পাইবে নূতন মন, যাহা দিব্য মন, নূতন বুদ্ধি যাহা দিব্য বুদ্ধি, নূতন ইন্দ্রিয়গুলি খুলিয়া সেখানে তাহার মধ্যে নূতন সত্তাই জন্ম লইয়া বসিবে, প্রাণকোষ, শরীর কোন পর্য্যন্ত পরতে পরতে নবধাতু দিয়া সেইই পুনর্গঠন করিয়া লইবে। বিজ্ঞান তার জ্যোতির্ম্মণ্ডলে এই নূতন মানুষকেই রূপদান করে, যাহা এখানে বিকৃত বা অসম্পূর্ণ তাহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ ও অনবদ্য করিয়াই গড়িয়া তোলে—বিজ্ঞানের দান সত্য মানুষ—যেমন ভাবের দান ভাব মানুষ, প্রাণের দান প্রাণ-মানুষ। এ সকল কথা এত বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়া ভাবিয়া তবে সেই বিজ্ঞান-পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে—এমন ভ্রান্ত ধারণা যেন কখনও কাহারও না আসে—বিজ্ঞান-সত্য তোমার আমার নিত্য সত্যই, স্বরূপেরই লব্ধ সত্য—যাহা সত্তার মধ্যেই আছে, তাহাকে শুধু জগজ্জয়ী শ্রদ্ধা দিয়া আবিষ্কার করিয়া লও—ভগবান প্রকৃতির আধারে শরীর, প্রাণ, মন ফুটাইয়া জগৎ ভরিয়া এবার বিজ্ঞান রূপই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন—আকাঙ্খা যাহার ঊর্দ্ধমুখী, একনিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত, বিজ্ঞান বল, আনন্দ বল, সবই তাহার সহজায়ত্ত, নিঃসংশয়েই জানিও। সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহার সাধনাকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে সিদ্ধিযুক্ত করিতেছেন। জগন্মাতা তাঁহার হৃদয়ে নিবিড় এলোকেশী চিদ্‌ঘন স্বরূপেই অবতীর্ণা। এরূপ সহজসাধক বীরযোগীই নূতন সত্যলীলা জগতে সার্থক করিয়া তুলিবে।

রাষ্ট্রনীতি

এক্ষণে আমরা রাজনীতি অপেক্ষা রাষ্ট্রনীতি শব্দ অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি; ইংরাজের শুভাগমনে 'নেশন' শব্দের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি, নেশন শব্দের ভাব আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, প্রথমে আমরা জাতি শব্দে তাহার প্রতিধ্বনি করিতে আরম্ভ করি, পরে রাষ্ট্র শব্দে তাহার জমাট ভাব আমাদের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এইরূপে রাজনীতি যে ভাব প্রকাশ করিত, তাহা যখন ঘন হইয়া রাজনীতির অন্তরের ছাবটী লইয়া আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখনই আমাদের মুখ হইতে রাষ্ট্রনীতি শব্দ বাহির হয়—যে ভাবে চালিত হইয়া আমরা রাজনীতি নাম উচ্চারণ করিতে থাকি, তাহাই ভাস্বর রূপজ্যোতিঃ লইয়া রাষ্ট্রনীতি শব্দে এখন আমাদের উচ্চারণ সার্থক ও কৃতার্থ করিতেছে। এই রাষ্ট্রনীতিকে সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করা কঠিন, কিন্তু বাঙ্গালী তাহা অপার ও

কার্য্যে প্রতিফলিত করিতে যেন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

ইহার জন্য বাঙালীকে বিশেষ সাধনা করিতে হইয়াছে—সাধনার সময়ে অনেক বিভীষিকাময় নির্ম্মম বাক্যের আঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। রাজনীতিতে মাতোয়ারা বঙ্গবাসী জাতির প্রাণের ধারা সম্যক অবগত না হইয়া যখন তরল উচ্ছ্বাসে বাংলার হৃদয়সমুদ্র উদ্বেলিত করিতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী বর্দ্ধমান প্রাদেশিক সভায় হঠাৎ বলিয়া উঠেন,—পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। এই শব্দ বজ্রের ন্যায় রাজনৈতিক বাঙালীর প্রত্যেক পঞ্জর চূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। অব্যর্থ সন্ধানযুক্ত ঋষিবাক্যের মহিমার ন্যায় ঐ কয়টা শব্দ বাঙালীকে দিব্য চৈতন্য প্রদান করে। বাঙালীর প্রাণ সূক্ষ্ম ও বিমল ধারা লইয়া তখন ধ্যানের বস্তু হইয়াই ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষে সমুত্থিত উত্তেজিত বাঙালী প্রাণ-লইয়া তখন ধারার সন্ধানে ব্যস্ত হয়, একটা স্থূল প্রাণমনমাতান পথ সম্মুখে দেখিয়া কলহাস্যে তাহাই বরণ করিয়া লয়, কিন্তু দৈবক্রমে ধ্যান ও ধারণায় জাতির সূক্ষ্ম প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও তাহার ধারাবোধ বাংলার একস্থান উজ্জ্বল করিতেছিল—তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী বাঙালীর উপরের রাজনৈতিক প্রাণ ও ভিতরের এই সূক্ষ্ম সাধনার পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহার মহাপ্রাণ বৃহৎ ও বিরাটের প্রতি আকর্ষণযুক্ত হইলেও তখনকার সেই ক্ষুদ্র কিন্তু মহা আকর্ষণযুক্ত বাঙালীর সূক্ষ্ম সাধনায় তিনি বিমোহিত হইয়া পড়েন—তাই বর্দ্ধমান প্রাদেশিক সভায় যখন সমগ্র বাংলা একত্র হয় অথচ তিনি জাতির মৌলিক প্রাণের কোন সন্ধান তাহাতে পান নাই, তখন স্থূল আঘাতে তিনি বাঙালীর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করেন, বাঙালীকে বলা হয়—পরাধীন জাতির কোন রাজনীতি নাই। রাজনীতিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও যে জাতি আত্মজ্ঞানের নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহার শৃঙ্খল খণ্ড ভাঙিয়া দিয়া তিনি তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন।

এ যেন সেই উপনিষদের যুগ পড়িতেছে। উপনিষদে শিষ্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তিনি পূর্ণব্রহ্ম উপলব্ধি করিবেন, ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে প্রথমে প্রাণ-ব্রহ্মের উদ্ধার করেন, পরে মন ব্রহ্ম, পরে বুদ্ধি ব্রহ্ম ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সঙ্কল্পযুক্ত ঋষিসন্তান ব্রহ্মরূপে প্রাণকে মনকে ও বুদ্ধিকে পাইয়া ভুল করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বার বার ফিরিতে হয়—আর এখানে প্রাণের মধ্যে কোন সঙ্কল্প লক্ষ্য না করিয়া, প্রাণের মধ্যে জাতির মৌলিক প্রাণের সন্ধান না পাইয়া, বাঙালীজাতি সূক্ষ্ম জাতি-প্রাণ ও তাহার ভাব-শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প নয় দেখিয়া বার বার সাধনার বেদী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এরূপ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ভগবানের শুভ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু কি নির্ম্মম সে প্রত্যাখ্যান, ভগবান কি নির্ম্মম দূত পাঠাইয়াই না সেই দরিদ্রারে বিপথগামী মনকে অজস্র রক্তস্রাবে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বাঙালী যখন দেখিল, জীবন বলিয়া যে বস্তু তাহার নিকট পরিচিত হইয়াছে, রাজনীতি শব্দে যে জীবন নিজের পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেই জীবন সভা সমিতি ও কংগ্রেসে পুষ্ট করিতে যখন সে অগ্রসর, সম্মুখ পশ্চাৎ ও পার্শ্ব হইতে তাহাকে জীবন বলিয়া—তাহার নিজের মৌলিক প্রাণ বলিয়া অস্বীকার করিতে তাহার বন্ধুরাও পশ্চাৎপদ নয়, তাহারা জীবনকেন্দ্রস্বরূপ প্রাদেশিক সভার উচ্চ মঞ্চ হইতে তাহার প্রত্যক্ষ সম্পদকে ঝুটা বলিয়া প্রখ্যাত করিতেছে, তখন তাহাকে সত্য সত্যই দিশেহারা হইতে হইয়াছিল; ঐ শব্দের মধ্যে আশ্বাসন করিবার মত কিছু খুঁজিয়া লইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিতে হইয়াছিল।

কিন্তু "যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে",

বাঙালী ঐ শব্দে—পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই ঐ শব্দ কয়টীতে তাহার জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ আবিষ্কার করে। পরাধীনতার মোহ আবরণে আচ্ছন্ন বাঙালী মোহজালের মধ্য দিয়াই রাজনীতি গ্রহণ করিয়াছিল—রাজনীতি রাজনীতিরই জন্য এই বিশ্বাসে সে অগ্রসর হইত—কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রদর্শিত রাজনীতিক কর্ম্মেই তাহার বিজয়মাল্য গাথা এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী সে হইয়াছিল। পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই—পরাধীন জাতির সত্তা সত্য তখনকার প্রচলিত রাজনীতি অবলম্বন কামনা থাকে, তথাপি পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই এই বাক্য যখন উচ্চারিত হইল, তখনই প্রতিপন্ন হইল তাহার সমগ্র জীবন আবেদন ও নিবেদনের থালা সাজাইয়াই ব্যয়িত হইয়াছে, তখন আবেদন ও নিবেদনকে বিশেষভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া সুরতালযুক্ত করিয়া সভা সমিতি ও কংগ্রেসের মঞ্চে উচ্চগ্রামে গীত হইবার প্রয়াস তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল—লজ্জায় তাহার মুখ মলিন হইল, তাহার স্ফীত বক্ষ কুঞ্চিত হইল, বদন ঝুলিয়া পড়িল। এত দিনের জীবন সাধনা আবেদন ও নিবেদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে ইহা আর সে অস্বীকার করিতে পারে না—সে যে পরাধীন জাতি ইহা শেলের মত তাহাকে বিঁধিতে লাগিল।

বাঙালী পরাধীন, বাঙালীর রাজনীতি দাসনীতি, ইহা যেদিন বাঙালী বুঝিয়াছিল—সেই দিনই সে অন্তর কাঁদিল, বাঙালীর অন্তরাত্মা ফুলিয়া ফুলিয়া অবিরাম ইহার দীর্ঘ প্রতিবাদ করিতেছে। তাহার হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া গেল, তাহার কবি ব্যথা বিজড়িত কণ্ঠে বাঙালীর আন্তর প্রতিবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল, প্রচলিত রাজনীতি অবলম্বন করিয়া যে রাজচক্র বাঙালী অধিকার করিবে স্থির করিয়াছিল তাহা তাহার অন্তস্থল হইতে মুছিয়া গেল, রাজনীতি শব্দ অন্তর দিয়া আর সে উচ্চারণ করিল না, রাজনীতি মুখে ত্যাগ করিল না—রাজনীতির ভিত্তি অনুসন্ধানে সে ব্যাপৃত হইল, সে সকল বিষয়ে স্বদেশী ঘোষণা করিয়া দিল। রাজনীতির স্বদেশী সংস্করণ রাষ্ট্রনীতি তখন তাহার নিকট ধরা দিতে আরম্ভ করিল।

এখনও যাঁহারা বলিয়া থাকেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশীর সময়ে বাংলার নেতা ছিলেন তাঁহারা স্বদেশী যুগের রাজনীতিক বাংলাকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। স্বদেশীর মধ্যে যুগের যত কিছু পরিবর্ত্তক উপ[illegible] হউক না কেন, জাতির অন্তর দেবতা দিবা নিশি ভিত্তির সন্ধানেই ব্যস্ত ছিল, [illegible] তথাকথিত ভুয়া রাজনীতিটাই পাইয়াছিল, আর তাহার সিদ্ধ ফল আহরণ করিতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যাপৃত ছিলেন তথাপি বাঙালীর জাতি আত্মা তাঁহাকে ও রাজনীতিকে ভ্রূক্ষেপ করে নাই,—প্রতিবাদ, দীর্ঘ প্রতিবাদ, বিচিত্র প্রতিবাদ, স্বাধীনতা স্বাধীনতা—সর্ব্বান্তর, আবৃত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল, তাহার সে যুগের যাহা কিছু সার বস্তু—রাজনীতি, বাচনিক রাজনীতি, ভাষা রাজনীতি, সে সমস্ত ও অতি নির্ম্মমভাবেই ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার আসনে যে মূর্ত্তি আসিতে পারে তাহা রাজনীতিরই ভিতরকার ছবি, রাষ্ট্রনীতি।

স্বদেশী যুগ ও তাহার পরের বিপ্লব যুগ মুখরিত হইয়াছিল প্রতিবাদে, প্রতিবাদের অগ্নি নালিকা ঝলকে ঝলকে অগ্নি বমন করিয়াছিল, কিন্তু আত্মোপলব্ধি, ভিতরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা তাহার ভিতরের সঙ্কল্প ছিল, সে-সঙ্কল্প হইতে সে তিলমাত্র বিচলিত হয় নাই।

বাঙালীর যে সূক্ষ্ম সাধনা প্রতিভার আলোকে জাতিপ্রাণের মৌলিক সূক্ষ্ম পথগুলি প্রতিফলিত করিয়া তুলিতেছিল, প্রথমে তাহা তাহার ভিতরের অভাব পূরণ করিতে আগ্রহান্বিত হয়। জাতির মনোজগৎ প্রাণের বিপুল ক্ষুধায় বিক্ষুব্ধ ছিল, মনের

স্বপ্ন প্রদেশে বিচরণ করিবার ধৈর্য্য তাহার ছিল না, তথাপি জাতির মন জাতির স্বপ্ন মানস সাধনার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই, তাহার বিচিত্র ভঙ্গী নবরূপ-কাব্য কলা বিজ্ঞান তাহাদের কোমল ও তীক্ষ্ণ আলোক পাতে তাহার অন্তরের মহামহিমা গাথায় চিত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে প্রতিফলিত করিতেছিল, তাহা মৌলিক এক জাতীয় ভিত্তির চিত্র জাতির চক্ষে অনুক্ষণ ভাসাইয়া রাখিয়াছে উত্তেজনার রঙ্গীন নেশায় সে চিত্র যখন উ[illegible] না হইলেও জাতির চক্ষু তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই, একটা জাতীয় ভিত্তি, তাহার উপর সৌধ তাহার সমস্ত চক্ষু, এ দৃশ্য তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাষ্ট্রনীতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে চিত্রের স্বপ্ন সে দেখিত, এ চিত্র স্পষ্ট না দেখিয়াও তাহার পূর্ব্ব চিত্র ভুলাইয়া গিয়াছে, এক নব চিত্রের সন্ধান তাহার মিলিয়াছে- সে তাহার নাম দিতে চায় রাষ্ট্রনীতি—আজ এই রাষ্ট্রনীতি সত্যমূর্ত্তি লইয়া তাহার নিকট উদয় হউক।

কিন্তু তাহার বিলম্ব আছে। বাংলার স্বপ্নসাধনা বাঙালীকে ভুয়া জিনিষের বিরুদ্ধে উত্থিত করিয়াছে, স্বপ্ন সাধনা উত্তেজনা রঙ্গীন চক্ষুর সম্মুখে জাতির একটা বিরাট ভিত্তির চিত্র দেখাইতেছে—তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু তাহার অন্তর ভরাইয়া তাহাকে খাটি মূল সম্পদে পূর্ণ করিতে সে পারিতেছে না। জাতির অন্তরটা মূল সম্পদে পূর্ণ করিয়া এমন একটা শক্তির বেগ তাহাতে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে যাহাতে তাহার স্রোতে নব নব ধারায় অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এক বিরাট সৌধ তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠে। এই গঠন বা সৃজনশক্তির মহানীতিকে আমরা রাষ্ট্রনীতি নাম দিতেছি। এই রাষ্ট্রনীতির সম্যক প্রতিষ্ঠা মহা সাধনাসাপেক্ষ।

জাতির উত্তেজিত প্রাণকে অনন্তের অজস্র যোগাযোগ অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে শীতল ও শান্ত করিতে হইবে, প্রাণের অধিকার হইতে মনকে কাড়িয়া লইতে হইবে, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া বৃথা চঞ্চলতা ও আন্দোলন হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, মনটাকে স্থির করিয়া অনন্তের প্রতিভা আলোকে তাহাকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে—পরে অনন্তেরই আবির্ভাবের জন্য তাহাকে দিব্য প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে। সাধনাবলে এই অবস্থা লাভ করিলে, অনন্তের সহিত একাত্ম হইয়া জগতে দিব্যনীতির প্রকাশ হইতে থাকিবে- এই সমস্ত নীতির মূল নীতি রাষ্ট্রনীতি, বাঙালীকে এই রাষ্ট্রনীতি বুঝিবার জন্য ভগবানের ডাক আসিয়াছে তাহাকে এই রাষ্ট্রনীতিই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

দিব্য ঋদ্ধি

দিব্যঋদ্ধি আত্মজীবনেরই সহজ আত্মপ্রকাশ। এই ঐশ্বর্য্যের স্বতঃপ্রকাশ ব্যতিরেকে জীবনের সিদ্ধি নাই, অর্থসমস্যার ও চরম ও সম্যক্ নিরাকরণ নাই। কথাটা বুঝাই। অর্থ জগতের মূল[illegible] সঙ্গীন প্রশ্ন ত এই একটী—আয় ও ব্যয়ের হরণপূরণ টানিয়া ব্যয়ের অঙ্ক আয়ের অঙ্কে যাহাতে অভিভূত ও নিমগ্ন হইয়া যায়। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়—ইহাতেই অর্থভঙ্গ—economic failure, অর্থপ্রতিষ্ঠানের bankruptcy

ঋদ্ধি-শক্তি কোন্ পথে কোন্ উপায়ে আগম হইবে?

একটা অবশ্যস্বীকার্য্য উত্তর—ভারতের মত কৃষি-প্রধান দেশে, মাটিই ত মূল ঋদ্ধি, মাটির মধ্যেই মা আমাদের অন্নসম্পদ লুকাইয়া রাখিয়াছেন, উহাকেই যোগ্য শ্রমে খুঁড়িয়া তুলিয়া আন। সত্যই ভারতের ঋদ্ধিসমস্যা এইখানেই বার আনা মীমাংসনীয়—দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি শস্যফলা করিয়া তুলিতে হইবে, ব্যাভি-চারী উৎপাদন সমূলে, অন্ততঃ যথাসম্ভব উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে, আপনার ঘরে চাবি দিয়াই দেশের অজস্র অন্নলুণ্ঠন এই মুহূর্ত্তেই স্তম্ভন করিতে হইবে। যে অলক্ষ্মী বুদ্ধি আপনার স্বজনকে প্রাণে বধিয়া বিজাতির হাতে ঘরের লক্ষ্মীকে তুলিয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, যে বিপরীত দুর্ম্মতি স্বভাবালস্যে বিকৃত শিক্ষায় শ্রমবৃত্তি ও স্বাধীন অন্নসৃষ্টিকে হীনবৃত্তি বলিয়া ব্যর্থ বিজ্ঞতায় মুণ্ড সঞ্চালন করে, সে অদূরদর্শী অলক্ষণাক্রান্ত জাতীয় স্বভাব-দোষ ভগবান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গ্রাস করিয়া নির্ম্মূলে ধ্বংস করুন—দেশের যুবকশক্তি কর্ম্মোত্তেজনার বৃথা স্নায়ুচাঞ্চল্য পরিবর্জ্জন করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম শ্রমে দেশের মাটি ফলাইয়া অন্নোদ্ধার করিতে লাগিয়া যাউক—ইহাই ত আমরা চাই। অন্ন সমস্যাই ঋদ্ধিসমস্যার প্রধান সমস্যা—সর্ব্বাগ্রে উহারই মীমাংসার জন্য আমরা কৃষি সাধনেই অভিনিবিষ্ট হইতে চাহিয়াছি।

অন্নে বস্ত্রে প্রাণ ও মান রক্ষা করিতে হইবে। দেশের বস্ত্র সমস্যার মীমাংসায় গান্ধী মহারাজ যে হোমানল আরম্ভ করিয়াছেন, দেশ কেবলই তাহাতে উত্তেজনামূলক সহানুভূতি ও স্বীকৃতিপরিচয় দিয়াই কি তুষ্ট রহিবে? বস্ত্র-রপ্তানী নিরুদ্ধ করিতে হইবে, চরকায় সুতার অভাব কথঞ্চিৎ মিটিবে, হিসাব করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ভারতেই প্রস্তুত করিয়া তোলা দুরূহ হইলেও খুব অসাধ্য সাধন নয়—দেশের প্রদত্ত কোটি মুদ্রার শুধু চরকা না ঘুরাইয়া যদি কল-প্রতি দশ লক্ষ টাকা হিসাব ধরিয়া দশটি মাঝারী ধরণের বঙ্গলক্ষ্মীর মত সুতা-কল নূতন গড়িয়া তোলা হয়, তাহাতে সুতা-সমস্যার এই মুহূর্ত্তেই সুরাহা হইয়া যাইতে পারে—ক্যাপিটালিজমের মদিরা গণশক্তির কর্ত্তৃত্ব-চালনায় রাখিয়া দিলে এড়াইতে পারা যায় না তাহা নয়—বস্তু-জগতে বস্তুতন্ত্র সংগ্রামে, আদর্শকে এক তিল নামাই-বার কথা বলিতেছি না, আদর্শকে অবস্থানুগত ব্যবস্থা-বৈচিত্র্যে ফলাইয়া তুলিবার কথাই আমরা বলিতে চাই—জাতির মোহভঙ্গ পূর্ব্বক ভাবশুদ্ধির জন্যই গান্ধীর উগ্র প্রেরণার সার্থকতা আমরা পূর্ণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিলেও আসল বস্ত্র-সমস্যাটির সম্যক্ ও অবিলম্ব নিরাকরণের উপরেই সমধিক শক্তিনিয়োগ করিতে কহিতে ইচ্ছা করি—ভাব-শুদ্ধির প্রত্যক্ষ উপায় শিক্ষা—কর্ম্মজগতে অর্থজগতে কর্ম্মধর্ম্ম ও অর্থধর্ম্মের ব্যভিচার ঘটাইয়া যে শুদ্ধিচেষ্টা, তাহাতে সিদ্ধিলাভও যদি ঘটে, সে সিদ্ধিতে প্রকৃতির একান্ত প্রসন্ন দৃষ্টি পাওয়া যাইবে কি? ক্রিয়ার যেমন প্রতি-ক্রিয়া আছে, তেমনি আবার প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া চলিলে—সে কুটিল চক্রাবর্ত্তের অভিনিবৃত্তি কোথায়, তাহা আমরা এখনও দেখিতে পাইতেছি না বলিয়াই এত কথা বলিতেছি। দোষদুষ্ট ধনধর্ম্মকে অন্তরপথে পূর্ণগ্রাসে গলাধঃকরণ করিয়া একেবারে শুদ্ধ ধন-নীতি সৃষ্টি করিবার যদি পন্থা থাকে, সেই পন্থাটী যতই আপাতদুর্ব্বোধ্য হউক, উহারই অব-লম্বনে জাতির শ্রেয়ঃপথটি গড়িয়া দেওয়া যায় না কি?

ভাবজগতে ভারত যত উচ্চৈশ্বর্য্যের অধিকারী হউক, বর্ত্তমান ভারতের হীনাবস্থার অনেক কারণের মধ্যে ইহাও বড় অল্প কারণ নয়—ভারতে বস্তুবিজ্ঞান নাই, বস্তু কৌশলের শিক্ষা, দীক্ষা, তন্ত্র আমরা অনেক দিনই হারাইয়াছি, বর্ত্তমান ভারতে organisation,

তাঁত ও চরকা সম্বন্ধেও আমরা কয়েকটি কথা বলিতে চাই। বস্ত্রশিল্পের দুইটি দিক দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের শিল্পপ্রতিভা খেলে, সূক্ষ্ম চতুরকৌশল ও অঙ্গুলী নৈপুণ্য চারু পণ্য রচিয়া তুলে, সেখানে আমরা খুব গোঁড়া রকমেরই সরল ও নিরাড়ম্বর গৃহশিল্পের পক্ষপাতী না। মানুষের শিল্পবুদ্ধির যে দিকটা সুষমায় সৌন্দর্য্যে মনোমত সৃষ্টিচাতুর্য্যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে চায়, সেখানে যন্ত্রাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, এমন কি সত্যই ক্ষতিকর কেন না, যন্ত্রের প্রাণহীন একঘেয়ে ও কাটাছাঁটা কলের শুষ্ক চাপে এত অপূর্ব নিত্য বিচিত্র ও কমনীয় প্রাণখেলা ফুটিয়া উঠিবার কিছুই অবসর পায় না এবং অনুশীলন অভাবে দিন দিন শুকাইয়া নিষ্পিষ্ট হইয়াই যায়। কাপড় শুধু পরণের জন্য ত বটেই, কিন্তু তাহার রচনায় মানুষের সূক্ষ্ম শিল্পময় অঙ্গুলীচালনার যথেষ্ট সুযোগ থাকা উচিত। তাঁত হাতেই যত চলে তত ভাল—কল এখানে যথাসম্ভব দূরে পরিত্যাজ্য। চরকার কথা কিছু অন্যরূপ। সূতার সমগুণাপন্ন সুচিক্কণতাই প্রধান লক্ষ্য বিষয়—সেখানে বিচিত্র অঙ্গুলিশিল্পের ক্ষেত্র তেমন কিছু নাই—যেটুকু আছে সে শ্রম ও সময়ানুরূপ মূল্যপ্রদ নহে—এ সব ক্ষেত্রে কলই প্রশস্ত—যত অধিক সূতা স্বল্প শ্রমে ও কালে উৎপন্ন করিয়া তোলা যায় ততই মঙ্গল—বস্ত্রসমস্যার নিরাকরণে আমরা কল ও হস্তশিল্পের ভিতরে একটা সর্ব্বদিকদর্শী সুযুক্তি ও সুকৌশলপূর্ণ সামঞ্জস্যই দেখিতে চাই। অন্যান্য পণ্যশিল্প সম্বন্ধেও এইরূপ সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি ধরিয়া চলাই একাধারে শুভকর ও ফলপ্রদ নহে কি?

অন্ন, বস্ত্র, পণ্যের সৃষ্টির দিকটাই সব কথা নয়। আপনার সব অভাব একটা মানুষ যেমন পূরণ করিয়া উঠিতে পারে না—জীবননীতিকে যত সরল ও সাদাসিধে (plain living) করিয়া তোলাই হউক না কেন—একটা জাতির পক্ষেও অনেকাংশে সেই কথা খাটে। মানুষের সাহচর্য্যে মানুষকে জীবনলীলা খেলিতে হইবে—শুধু প্রয়োজনের দিক দিয়া নয়, প্রেমের, আনন্দের, জ্ঞানের, সত্তার দিক দিয়াও—নহিলে পৃথিবীর লীলানাট্য ব্যর্থ, অন্ততঃ নিতান্ত বিরস হইয়াই উঠে। বৈশ্য-ধর্ম্মে দান প্রতিদান পণ্য ও মুদ্রা বিনিময় চিরপ্রসিদ্ধ নীতি—সে নীতিকেও অযথা লঙ্ঘন করিতে নাই, তাহাতে বিশেষ ফলোদয়ও আছে কি? বর্ত্তমান অশুদ্ধ বাণিজ্যকে তাই বলিয়া কেবল বজায় রাখিয়া দেওয়ার যে নীতি তাহারও প্রশ্রয় দেওয়া আমরা কল্যাণকর মনে করি না—অশুদ্ধকে শোধন করিয়া তুলিতে হইবে। তবে অগ্রে সেই অশুদ্ধ স্বভাবের মূল কেন্দ্রটিকেই ধরিয়া নিরসন করিতে হইবে। বর্ত্তমান বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আমূল পরিশুদ্ধি ও রূপান্তর চাই—তার অগ্রে চাই বাণিজ্য ও ব্যক্তিধর্ম্মেরই আমূল শোধন ও রূপান্তর। বাণিজ্যনীতিকে প্রথম অন্তর্বাণিজ্যকে আমরা বিশুদ্ধ বিনিময়ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিতে চাই। এই জন্যই আমরা মূলে সংঘতন্ত্র ধরিয়া কাজে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছি। যথা, সংঘের ক্ষেত্রোৎপন্ন খাদ্য, সংঘের শিল্পপণ্য সংঘের বিচিত্র ও বহুধা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রের পরস্পর আদান প্রদান পূর্ব্বক পরস্পরের প্রয়োজন পূরণ করিবে—ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধের মধ্য দিয়া একরূপ পরস্পরগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠ হইবারও সাহায্য ইহাতে হইবে। বাণিজ্যও এখানে আত্মার ও হৃদয়ের অনুকূল ধর্ম্মে আপনাকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবে—তাহা করিতে হইলে উহার মধ্যে বর্ত্তমানে যে হলাহলের মিশ্রণ আছে, তাহাই ত অগ্রে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফুরাইয়া ফেলিতে হইবে। সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রগত আত্মৈক্য ও হৃদয়মিলন যেমন যেমন ঘনীভূত হইয়া উঠিবে—তেমনি তেমনি এই বাণিজ্যনীতির শুদ্ধ সত্য ও নিষ্কলঙ্ক রূপটুকু প্রকাশ হইব।

পড়িবে। সংঘের বাহিরে যে জগৎ, তাহারও সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ রাখা অপরিহার্য্য—তবে এই বাহ্য বাণিজ্যের রীতি নীতি সাধারণতঃ বর্ত্তমান প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধাচারী হওয়া সম্ভবও নয়, ফলকরও নহে। এখানে আপাততঃ সন্ধি করিয়াই চলিতে হইবে।

কিন্তু মূলে চাই অর্থশাস্ত্রেরই আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তন। ব্যষ্টিরই হউক, সমষ্টিরই হউক—অর্থশক্তির শুদ্ধি ও মুক্তি চাই। অর্থ প্রাণশক্তিরই মূর্ত্ত প্রতীক উহা একেবারে জড় নহে, মানুষের প্রাণ উহাকে নিজের মমতা মাখাইয়া প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছে—অর্থের পিছনে অর্থপতির বাসনা, আসক্তি, ইচ্ছাগুলি মাখাইয়া জড়াইয়া অর্থকেও কলুষিত করিয়া তুলে। সে অর্থে দেশ, দেবসেবা ঠিক ও নিখুঁত ভাবে হয় না। অর্থের অর্জ্জনে ও নিয়োগে চাই অর্থ-স্বামীর প্রাণের শুদ্ধ উল্লাস এবং স্বাধীন উৎসর্গ। সে উল্লাস ও উৎসর্গ হইবে যোগেরই সহজ অভিব্যক্তি—যোগযুক্ত জীবনে অর্থ বিশিষ্ট সিদ্ধিরূপেই প্রকাশ পায়। যোগের পূর্ণতার ফলে অন্তরৈশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলিরই স্বতঃপ্রকাশরূপে বাহ্যৈশ্বর্য্যও নৈসর্গিক অর্থোপায়গুলিকেই উপলক্ষ করিয়া দিন দিন স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি পায়। ভগবানে যাহার নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা আছে, তাহার জীবনে ত শ্রমের, কৌশলের, শৃঙ্খলার, প্রতিভার কিছুরই অভাব থাকিবার যো নাই। অজগর ভুজঙ্গ যেমন তাহার শ্বাসাকর্ষণে তাহার আহার্য্য টানিয়া লয়—যোগী তেমনি স্বীয় তপঃশক্তির নিপুণ ও অব্যর্থ প্রকাশে সহজ শৃঙ্খলায় আয় ব্যয়ের হরণ পূরণ মিলাইয়া লয়। সেখানে ব্যসন নাই, কিন্তু শুদ্ধ বিলাস থাকিতে পারে, ত্যাগ শৃঙ্খলা সংযম সেখানে আছে, নাই দৈন্য, নাই হীন স্বার্থ, অমিতব্যয়িতাও নাই, কার্পণ্যও নাই। দারিদ্র্যও সেখানে যদি দেখ,

বুঝিও যোগীর তপঃস্পর্শে রাজৈশ্বর্য্যরূপে যার জন্যই গুপ্ত ছদ্মবেশে অপেক্ষা করিতেছে। আপনাকে অতিক্রম করিয়া আপনার ভিতরে যে অপার্থিব পূর্ণতা পাইয়াছে, ইচ্ছার নিরুদ্ধ স্তম্ভন বা প্রতিঘাত না থাকিলে, অচলা লক্ষ্মীশ্রী তাহার বাহিরের সংসারেও অচিরে আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। ধনজগতের যে বর্ত্তমান শৃঙ্খলা, সে শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইলেও প্রয়োজন ও আয়োজনের একটা উচ্চতর ও অপ্রাকৃত নূতন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইবে। আজিকার যে কঠোর অর্থসংগ্রাম—সে এই অসীম সিদ্ধিরই আত্মপ্রকাশ সাধনা। লালসায় বা বুদ্ধিচেষ্টায় এই সিদ্ধি পদে পদে বঞ্চিত ও প্রতিহত হয়। শ্রদ্ধা যে মুহূর্ত্তে নিখুঁত হইবে, দিব্য ঋদ্ধি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই যোগজীবনে প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিবে। বাধা সে ত সিদ্ধিরই পচ্ছন্ন আহ্বান-মন্ত্র, বাধা ঠেলিয়াই শক্তির বিকাশ। চারিদিকে যখন বাধার তুফান আত্মপ্রতিষ্ঠানটিকে টলমল করিয়া তুলে, আর বুঝি রক্ষা হয় না, তখনই ভগবান সহসা শ্রদ্ধাকে জয়যুক্ত করেন, বুদ্ধির অজ্ঞাত এক তৃতীয় শক্তি আবির্ভূত হইয়া সব সামলাইয়া লয়, ইহা যোগীর কাছেই প্রত্যক্ষ হয়। অর্থশক্তিরও একটা রূপান্তর আছে, সে রূপান্তর মন, বুদ্ধি, প্রাণ অতিক্রম করিয়া যখন সিদ্ধ শ্রদ্ধা লইয়া দাঁড়াই, তখনই খুঁজিয়া পাইতে পারি। ব্যষ্টির জন্যই যাহাদের সাধনা নয়, সেরূপ সংঘসাধকগণের সংঘসাধনায় ভাগবত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও উৎসর্গের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্দত্ত সিদ্ধসম্পদেরও প্রস্ফুট প্রকাশ স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় থরে থরে ফুটিয়া উঠিবে। ভিতরে যেন কোনও সংশয় না থাকে—অন্তর বিজ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হউক; শ্রদ্ধায় যেমন এই বিজ্ঞানের প্রকাশ, শ্রদ্ধাতেই তেমনি সিদ্ধলক্ষ্মীরও জাগ্রত প্রতিষ্ঠা দেখিয়া দিনে দিনে স্তম্ভিত হইবে।

ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই ভাদ্র, ১৩২৮ [ষোড়শ সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট

ঃঃ

গত বৎসরের এ দিনে শ্রাবণের আঁধার বড় নিষ্ঠুর ভাবেই হৃদয়ে আঘাত দিল। কেননা যে দেবতার মণ্ডপ বুকে ধরে' এত দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ তপস্যা করেছি, তার চলনসারিণী [illegible] ধরবার এইবার একটি বড় সন্ধানে জীবনের সব ভার নিয়েছিলুম, দেবতার আদেশের চিন্তা নাই। রুদ্র ঝঞ্ঝার মত সমস্ত কর্মের আহ্বান সব যেন উল্টে পাল্টে দিলে, উদ্দেশ্য ধারা গেল, ছিন্নমূল তরুর মত মাটির বুকে আছড়ে পড়ে', শ্রাবণের বারি ধারার সঙ্গে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করতে করতে বাংলা মায়ের শ্যামল কোলে এসে পৌঁচেছি। দ্বাদশ বর্ষের দীর্ঘ পরিচ্ছন্ন জীবনে একটা নূতন বিপ্লব এনে দিয়ে গেল—সম্মুখে তারই নূতন অভিনয় দৃশ্য।

উৎসবের সাফল্য সত্য। সত্যই এ যুগের পরম সিদ্ধি। অষ্টসিদ্ধিও এখানে তুচ্ছ নগণ্য। জীবনের পুঞ্জীভূত অশুদ্ধতা, দৌর্ব্বল্য, ক্ষুদ্রতা, সব থেকে মুক্ত হয়ে নূতন জীবনে অন্তরের সত্যই আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ব্যষ্টিনীতি এ জীবনে একেবারেই সত্য নয়। সমষ্টি-আত্মার আকুল ক্রন্দনে, একনিষ্ঠ তপস্যার, দেবতার নিপুণ কৌশলে, সাধনার স্পর্শকে মহাসত্যে জীবন পরিপূর্ণ। পূর্ব্ব দর্শন যেন স্বপ্ন। বিচ্ছিন্ন বিভক্ত ব্যষ্টির অস্তিত্ব আজ অবিভাজ্য। বিপুল আধারে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুনির্ম্মিত সৌধ যেন গড়ে ওঠা, পরিত্যক্ত উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সংবর্দ্ধনা উদ্বোধনে আহূত দেবতার আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য মাথায় "একনিষ্ঠ" পুরোহিতবৃন্দ সর্ব্বস্ব দিয়েছে আজ নিঃস্ব হয়ে গেল, এই তাদের শেষ। পুরুষ জীবন নিস্পন্দগতে নিহিত। যজ্ঞ সার্থক, দেবতার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হয়েছে। জীবনগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসব ভঙ্গীর কষ্ট এত পরিবর্তন। অব্যক্ত আদেশ প্রতি ব্যষ্টির অন্তরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। চাঞ্চল্য উত্তেজনা, আড়ম্বরের পরিবর্ত্তে সমষ্টি আত্মা আজ ধ্যানমগ্ন। উৎসব লক্ষণ—সে কেবল ব্যষ্টির সমাবেশেই পরিদৃষ্ট।

প্রতি ব্যষ্টি, সেও আবার একাত্ম সমষ্টির অঙ্গীভূত বিভূতি। আকাশের ধারা বর্ষণ মাথায় করে' দেব মন্দিরে সে অপরূপ মিলনচিহ্ন অনির্ব্বচনীয়। আত্মায় আত্মায় নিবিড় আলিঙ্গনে যেন এক অপার্থিব পরিণয়

শিক্ষার কথা

আমেরিকা

বহুদর্শী শিক্ষকেরা ছেলেদের সামনে ক্রমে ক্রমে বড় বড় বাধা এনে ফেলেন। এগুলো গুরুতর বাধা, তাদের বাধা দেবার শক্তিটা অর্জন করে, ছেলেদের সেগুলোকে জয় করতে শিখতে হয়। হাত পা [illegible] প্রথমে অজানাটাকে ঘিরে জড়িয়ে ধরে, তারপর মন আর বুদ্ধি সেটাকে আক্রমণ করে। আমাদের কাছে যে শিক্ষাগুলো একেবারে অসম্ভব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাধন, তেমনি [illegible] সাহিত্য একেবারে বাদের মধ্য দিয়েই [illegible] সাহিত্য বিশেষতঃ পুরাতন সাহিত্য [illegible] [illegible] থাকে। আর গড়া Modelling এর সঙ্গে পুরাতন সাহিত্যের খুব একটা নিবিড় সম্বন্ধ পাতান হয়। নতুন নতুন জিনিস গড়ে নির্ম্মাণ করতে গিয়ে ছেলেদের মনের ধৈর্য্য আর ইচ্ছার অদম্য শক্তি [illegible]। শিক্ষার মধ্যে তারা [illegible], [illegible] এবং চিন্তা মন বুদ্ধির [illegible] একটা সমন্বয় সাধন করেছে।

বাল্য শিক্ষার মধ্যে ছাত্র, প্রাথমিক শিক্ষার ছোট খাট নৈতিক ও বুদ্ধির অধীনতাগুলো (শিক্ষকের নিকট) ভেঙ্গে বড়লোকের স্থিরপ্রজ্ঞা লাভের দিকে যখন ছোটে, তখনও তাকে সেই কাজ ধরে করেই সব শিক্ষা লাভ করতে হয়। খালি তখন বাধাগুলি থাকে আরও উঁচু আর নানা রকমের, লক্ষ্যটা থাকে আর একটু দূরে—সেটাকে অধিকার করতে হবে, খেলাগুলো আর সরল থাকে না—ক্রমে জড়ান গোলমেলে আর যৌগিক হয়ে পড়ে। শিক্ষকের কথা, তার আবশ্যকতাও ক্রমে ক্রমে কমে এসে ছেলে মেয়েদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারটাকেই বড় করে তোলে। এই রকম করেই লেখাপড়া চলতে থাকে।

ছেলেরা পৃথিবীতে একলা থাকলে যেমন নিজে নিজের কাজ নিজেরা করে, তেমনি করেই তাদের কাজ করতে আর পড়তে শেখান হয়। সামনে বিরাট বাধা ক্রমে [illegible] পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে ছোট বড় নানা গভীর খাত, শিক্ষার ও জীবনের বাস্তব আঘাত [illegible] আছে। ছেলেকে আনন্দের আবেগে সেগুলোকে অতিক্রম করে যেতে শেখানো হয়। এই কঠোর সাধনায়ও তারা কষ্ট অনুভব করে না—তাদের জীবনে আনন্দ আছে, কাজে আনন্দ আছে, বাধাটাকে অতিক্রম করতে পারলে বুকটা যখন ফুলে উঠে, তখন তারা পথের সব কষ্ট ভুলে যায়। এই রকমের আত্মবিশ্বাস আর আত্মশক্তির বিকাশ-সাধন করবার চেষ্টাই বিদ্যালয়ের সব চাইতে বড় কাজ। কাজের কথাই হউক আর ভাবের কথাই হউক কোনটাই একেবারে ছেলেদের কাছে সব [illegible] বলে দেওয়া হয় না। আমেরিকার কি ছাত্র, কি শিক্ষক সকলেই একেবারে তৈয়ারী কথাটা ভালবাসে না। [illegible] সত্য হউক আর একটা অনুমান প্রমাণের কথাই হউক কোনটাই তারা নিতে চায় না, যতক্ষণ না সেটাকে বস্তুতন্ত্র কর্ম্ম বা চিন্তার ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে।

* * *

বিজ্ঞান শিক্ষার সময়ে, বিশেষতঃ, ছেলেদের, শেখবার সব কথাগুলি আবিষ্কার করেই নিতে হয়। কলকারখানা বা পরীক্ষাগারে গিয়ে আসল দর্শন করে

ও সমাবেশে ফুটিয়া উঠিবে—দিব্য শক্তিরই লীলা। যোগে, উৎসর্গে সমতার প্রতিষ্ঠা, স্থির ও নিষ্কম্প চৈতন্যে জ্ঞানের স্বচ্ছ ও সজীব প্রকাশ, জ্ঞানেরই জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘনমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত আধারটিকে জ্বলন্ত শক্তিবিগ্রহে পরিণত করিয়া তুলিবে। শক্তি লাভ হইবে উপর হইতেই, তুরীয়েরই লীলা জীবনে, প্রাণে, স্থূলে পর্য্যন্ত অবতরণ পূর্ব্বক নূতন জন্ম সম্পন্ন করিয়া তুলিবে।

জ্ঞান বলিতে আমরা অবশ্য ভাগবত বোধকেই লক্ষিত করিতেছি। কারণ ভাগবত জ্ঞানই মূল, আর সব জ্ঞান এই মূল জ্ঞানেরই অনুবৃত্তি, ব্রহ্মজ্ঞানেই জগৎ-জ্ঞান সত্য ও সুন্দর। জগৎ ও ব্রহ্মকে পরস্পর পরিচ্ছিন্ন করিয়া যে জ্ঞানসাধনা, তাহাতে সিদ্ধি নাই—একই সত্তা রূপভেদে আধার ভেদে বিচিত্র, এই সত্য বিশিষ্টরূপে যে সাধনায় জাগ্রত ও সত্য হইয়া উঠে, উহাই বিজ্ঞান যোগ। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও দিব্য জ্ঞান—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সহায় ব্যতিরেকে অথবা ঐ গুলিকে মাত্র গৌণ উপকরণ রূপে ব্যবহার করিয়া এই বিজ্ঞান বৃত্তি কার্য্য করে। প্রাকৃত মানুষের কাছে, যে মূল বস্তু রহস্যে আবৃত, অজ্ঞাত, ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট তাহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎকেই আমরা দেখি, শুনি, ঘ্রাণ ও জানি, অন্তঃকরণে তাহারই পর্য্যালোচনা করি, অনুমানে কল্পনায় উহারই পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং বিচারে বিতর্কে উহারই শুদ্ধি সম্পাদন করি। বিজ্ঞানযোগী এই স্থূল প্রকাশের সীমা অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মতর রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন—অদৃশ্য শক্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও অনুভূতিপুঞ্জ উপলব্ধি করেন, স্থূল জগতের পিছনে, গোপনে যে সকল বিশ্বদেবতা উহাকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহাদের নাম, রূপ, ক্রিয়া ও নিয়ম-নীতি সব সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক সজ্ঞান পূর্ণাঙ্গসরূপে উহাদিগকে সার্থক করিয়া তোলেন। ভাগবত রহস্য, পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব, সচ্চিদানন্দের ত্রিগুণময়ী লীলা-তত্ত্ব, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মানব, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ—সমস্ত সত্তাই প্রত্যক্ষ হয়—সত্তায় ও প্রকাশে, ভাবে ও রূপে, নিত্য ও লীলায় যত কিছু গোপন ও ব্যক্ত তত্ত্ব, ইচ্ছামাত্রই অন্তর্য্যামী ভগবান তাহা বিজ্ঞান-সাধকের অন্তরে খুলিয়া ধরেন—অন্তর্য্যামী যিনি তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, এই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের শরণ গ্রহণেই জ্ঞানযোগে সিদ্ধি সম্ভবপর। "জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" দীপ্ত জ্ঞানশিখা প্রকাশে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই অজ্ঞান আঁধার দূর বিদূরিত করেন।

জ্ঞানের চতুর্ব্যূহ। দৃষ্টি, শ্রুতি, স্মৃতি, প্রতিবোধ। দৃষ্টিই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি (revelation), স্বয়ম্প্রকাশই উহার লক্ষণ। প্রাচীন ঋষিগণ বেদ সত্য দর্শন করিতেন। তাঁহারা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা—সত্যকে উহারা প্রত্যক্ষ করিতেন—বিচার বুদ্ধি, প্রমাণ কল্পনা, যুক্তি বা অনুমান প্রভৃতির প্রয়োগ প্রয়োজন একেবারেই ছিল না। সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভব সাক্ষাদ্দর্শনই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য ও নির্ভরস্থল। সত্যকে দেখিলে, তাহার নাম না জানিয়াও তাহার স্বরূপ ও রূপ উভয়ই সম্যক্ জানা ও পাওয়া এই দৃষ্টি জ্ঞানের পরিচয়।

শ্রুতি উহাও জ্ঞানেরই বিশিষ্ট ভঙ্গী। ভগবানের বাণী সত্য-মন্ত্র আদেশ সূক্ষ্ম কর্ণে প্রতিশ্রুত হয়, ঋষিগণ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, আবার মন্ত্রশ্রোতা। মন্ত্রে, শব্দ-ছন্দে, সঙ্গীতের অনাহত রাগরাগিণী ঝঙ্কৃত, লীলায়িত, ঋষিগণ উহা শ্রবণ করিতেন, চেতনার পরতে পরতে উহাদের ছন্দানুসরণেই সত্যের বিচিত্র নাম অধিগত করিতেন। বস্তু দর্শন না করিয়াও এ যেন শুদ্ধ নাম শ্রবণেই বস্তুরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলা—ইহাই শ্রুতি, inspiration। বেদ আবার শ্রুতিও বটে—কেননা, সত্যের রূপদর্শন যেমন তেমনি সত্যের নাম শ্রবণ ও বৈদিক ঋষিগণের জ্ঞানপ্রকাশের সনাতন প্রণালীর অন্তর্গত ছিল।

স্মৃতি—শুদ্ধ ভাব-স্মৃতি, স্মৃতি শুধু অতীতের সংস্কার ও চিন্তার পুনরুদয় নয়, শুদ্ধা স্মৃতি ভবিষ্যতেরও অনুস্মারক। গভীরে যে জ্ঞান পূর্ব্বকল্পিত বা চির-বিদিত হইয়াই আছে, বাহিরের অথবা ভিতরের প্রতিঘাতে উদ্দীপনায় ভাবপটে উহার পুনঃ প্রকাশশক্তিই এই যৌগিক স্মৃতিবৃত্তি। এ যেন উন্মেষমাত্র বিস্মৃত কথা সহসা অনুভূতিগত হওয়া জ্ঞাত জিনিসকেই আবার তুলিয়া আনিয়া জ্ঞানগোচর করা, নিদ্রিত চৈতন্যকে পুনর্জাগরিত করিয়া তাহার ভিতরে জ্ঞাতব্য বস্তু বা ভাবের পরিচয়টুকু খুঁজিয়া পাওয়া।

প্রাতিবোধ Intuition—উন্মেষণ প্রেরণাশক্তি—সত্য হইতে সত্যকে পৃথক করে, তাহার স্বরূপ সত্তাকে স্পষ্ট করিয়া অবধারণ করায়, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও অজ্ঞাত প্রমাণ প্রতিমাগুলি নিরূপণ করিয়া লয়, Intuition ঘনীভূত চিৎশক্তি বিবেকের সাহায্যে উহা আপনার পরিচালনা ও দিগ্‌ভ্রম নিবৃত্ত করে—দর্শন শ্রবণ জ্ঞানের যথার্থবৃত্তি, স্মৃতি প্রাতিবোধ উহাদের পরিচালক ও সহায়ক। কিন্তু এই চতুঃশক্তির যুগপৎ পূর্ণপ্রয়োগেই জ্ঞানপ্রকাশ সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে।

পরন্তু জ্ঞানই বিজ্ঞানযোগের প্রধান উপাদান হইলেও, উহাই একমাত্র উপাদান নয়। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম—তিনটিই যেখানে তৃপ্ত ও সার্থকতা পায়, সেইখানেই বিজ্ঞানময় সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানে সত্যকে প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু প্রেমে, আনন্দেই উহাকে স্পর্শ করি, ধারণ করি, নিবিড় করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরি, আবার শক্তি ব্যতিরেকেও জ্ঞান পঙ্গু, প্রেম বন্ধ্যা নিস্ফলা বলিতে হইবে। শক্তির প্রকাশেই কর্ম—জ্ঞান ও প্রেম—ভাগবত লীলাপ্রকাশেরই অন্তর উপকরণ, কর্ম্মেই উহা প্রাণ পায়, মূর্ত্তি পায়। ভাগবত জ্ঞানে ভাগবত প্রেমে হৃদয় ও বুদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন দীপ্ত ও পূর্ণ হইয়া রহিবে—কিন্তু প্রাণে খেলিবে দিব্য তেজঃ—সূর্য্য ও মিত্রের সঙ্গে বায়ু ও অগ্নিরও তর্পণ চাই—সকল দেবতা সম নিষ্ঠায় জীবনের মধ্যে পূজা পাইবে, তবেই জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ, সকল অঙ্গ ভরিয়া ভগবানের পরিপূর্ণ আবির্ভাব হইবে—সত্যকে পূর্ণ ও অখণ্ড সত্তা-রূপেই, তবে আমরা অনুভূতিতে চৈতন্যময় করিয়া তুলিতে পারিব।

একটা উদার আলো, একটা নিথর শান্তি, একটা নিবিড় তেজঃ—ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে সাধারণ জীব প্রকৃতির বর্ত্তমান গুণগুলি পর্য্যন্ত জাগাইয়া তুলাইয়া এইরূপে নব গুণধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব আর ক্ষুদ্র খণ্ড প্রকাশ ধর্ম্মে নয়, অনন্ত অসীম শুভ্রজ্যোতিতে উহা রূপান্তর পায় সমস্ত সত্তাটি দিন দিন নির্ম্মল ও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। তমঃ হয় শান্তি—অনন্ত ও প্রসারিত আনন্দের প্রশান্ত কলস্রোতে ভাসি, ডুবি, ব্রহ্মেরই বিরাট কোলে সিন্ধুগর্ভে মীনের মত পুলকোল্লাসে সন্তরণ করি—তবে এ শান্ত অপ্রবৃত্তির নিষ্ক্রিয় শান্তি নয়, শান্তি ব্রহ্মেরই গূঢ় কেন্দ্রে যে চিরচঞ্চল শক্তির উৎস, সেই শান্তেরই প্রতি ভাব বিদ্যুৎপ্রকাশে নব নব কর্ম্মপ্রেরণা উদ্ভূত হয়, আলোকে উজ্জ্বল, শান্তিতে সুবাত করিয়াই আমরা কর্ম্মরঙ্গে জীবনতরী ভাসাইয়া দিই—এই বিজ্ঞানজীবন অনন্ত জীবনেরই সাধনা, জ্যোতিতে, শান্তিতে, অবাধ প্রেরণায় ভাগবত লীলা স্ফুট হইতে স্ফুটতর, উদার হইতে উদারতর, পূর্ণ হইতে আরও নিবিড়তর পূর্ণত্বে সার্থক করিতে করিতেই আমরা অনন্ত অভিযানে ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞানযোগের আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নাই, পরিচ্ছেদ নাই—আকাঙ্ক্ষা যাহার জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাগবত স্পর্শ যে হৃদয়ে পাইয়াছে, শ্রদ্ধা যাহার অকুণ্ঠ অবিচল, তাহার জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যতিভঙ্গ হেথা হোথা যদিও কখনও ফুটিয়া উঠে, কিন্তু পতন নাই, অন্তরায় নাই—অমার ও ব্রহ্মচ্ছন্দে নিত্য সঙ্গীতময় তাহার জীবনোৎসব—সে

চলতি ভাষা বেশ আসে, তিনি চলতি ভাষাই চালাইয়া চলিয়াছেন, আর যিনি সাধুভাষার কিছু মর্ম্ম ও সারবত্তা বুঝেন তিনি তাহাতেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। আপাততঃ ইহাই বঙ্গভাষার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সাহিত্য-দর্পণে বাংলার হৃদয়-ছবি যেরূপে ব্যক্ত হইতেছে, তাহা বোধ হয় অন্য কোন দর্পণে এরূপে কিছুতেই দেখা যায় না। সাহিত্য দিয়া বাংলার এই ছবি দেখিলেই বুঝা যায়, বাঙালীর অন্তঃকরণে একটা গুরুতর প্রশ্ন জাগিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহার একটা সারবত্তা বুঝিতে পারে নাই, কোনরূপে তাহার জন্য অল্প কিছু পাইয়া একটা গতানুগতিক স্রোতে সে নিজকে ভাসাইয়া দিয়াছে।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, এই শত বর্ষে তাহার উপর দিয়া অনেক জিনিসই ভাসিয়া গিয়াছে, সাহিত্যে সেগুলি প্রতিফলিত হইয়াছে। অগ্নিময় জীবনের লক্ষণ—তাহার স্রোত যেন আগ্নেয় গিরির প্রস্রবণ, যে বস্তু তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহাকেই সে দগ্ধ করিয়া দেয়, সেই গাহার উপর গিয়া পড়ে তাহার কোন বিশিষ্ট রূপ সে প্রকাশ হইতে দেয় না। বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যে শত বর্ষে বহু বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটী যেন তাহার বিশিষ্ট সত্তা লইয়াই দাঁড়াইয়া আছে। বাংলায় চলতি ভাষা চালান হইল, তাহা পড়িতে পড়িতে যদি অনবরত মনে হয় সেটা চলতি ভাষা, সেটা আমার প্রাণের জলন্ত মূর্ত্তি নয়, তাহা [illegible] তাহা যে আমার উপর নিজের বিশিষ্ট সত্তা লইয়াই চাপিয়া বসিয়াছে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যায়—ইহা ঠিক সাহিত্যের স্বরূপ নয়, জাতির আত্মার প্রতিচ্ছবি উহাকে বলা যায় না। সাহিত্যটী ঠিক আত্মার প্রতিচ্ছায় হইবে। বুদ্ধি মন প্রাণ, খেয়ালে আকর্ষণে বা ক্ষুধায়, আত্মার সত্য রূপটী খণ্ড ও বিকৃত করিয়া তুলিলে সে তাহারই মত ভাষা খুঁজিয়া লয়, হয়ত কোন স্থানের মুখের কথার বা কোন দেশের ভাবের ধারা ধরিয়া তাহা ব্যক্ত হইতে প্রয়াস পায়। বিচক্ষণ সমালোচকেরা এগুলিকে প্রাদেশিকদোষদুষ্ট ও বিদেশীভাবাচ্ছন্ন বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

কিন্তু এক সময়ে জাতির আত্মাই যেন কথা কহিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। আজ তাহার নিজের ভাষা খুঁজিতে হইবে বলিয়া প্রচলিত সাহিত্যে প্রাচীন রচনাপদ্ধতি ও নূতন রচনাপদ্ধতি সকলের মধ্য দিয়াই আত্মার বিমল প্রকাশ তাহার ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। যিনি নূতন রচনা পদ্ধতিতে সেই প্রেরণার আংশিক অনুভূতি লাভ করিতেছিলেন তিনি তাহাকেই বড় করিয়া ধরিতেছিলেন, আবার প্রাচীন রচনাপদ্ধতিতে যে কয়জন উহার অনুভূতি লাভ করেন, প্রাচীনতার সহিত মিলিয়া সেই পদ্ধতি তাঁহার নিকট সন্দেহশূন্য হইয়া উঠে, এইরূপে অনর্থক বাকবিতণ্ডায় বাংলার সাহিত্য জগতকে মুখরিত করিয়াছিল, বিশ্ব খুব কম লোকেই সাহিত্যের আত্মকথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব উহার মতনটি বাহিরে বাহিরে কথঞ্চিৎ ভোগ করিয়া এখনে যে যাহার পথ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মধ্য দিয়া আমরা দেখিলাম বাঙালী জাতি আত্মোপলব্ধির একটী প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, সেই প্রেরণা কথাসাহিত্যের প্রচলিত বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইতে চায়, সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণ তাহাকে ধরি ধরি করিয়া ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না, এক রবীন্দ্রসাহিত্যে কতক অংশে আমরা তাহার কিছু রূপ দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যিকগণ ইহাকে ধরিয়া যদি জাতির হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিতে পারিতেন যে হৃদয় কেবল আত্মগত হইয়াই যখন ব্যক্ত হয় তখনই সাহিত্যের সত্যরূপটী ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে জাতির মধ্যে

ব্যাপকভাবে আত্মসাধনের উৎস খুলিয়া যাইত, জাতি আত্মার উপর নির্ভর করিয়াই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইত। সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলা, সাহিত্য সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিলে বঙ্গীয় সাহিত্যের রূপ তাহার সত্য স্বরূপে গিয়া পৌঁছিতে পারিত।

জাতির সত্য স্বরূপ যখন ভাষায় নিখুঁতভাবে ব্যক্ত হইবে, তখন সেই সাহিত্যকে একেবারে নব-বেশে গড়িয়া উঠিতে হইলে, তখন তাহার একেবারে নবজন্ম ও রূপান্তর। বাংলাসাহিত্যের রূপান্তরের ভাষা যে কিরূপ হইবে তাহা আত্ম-প্রতিষ্ঠ ও আত্ম-নিষ্ঠ সাহিত্যিকগণই ফুটাইয়া তুলিবেন, তাহার যতটুকু আভাস দেওয়া সম্ভব তাহা পরে দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব*

[বুদ্ধির জানাকে চিত্তের সংস্কারে পরিণত করার নাম শিক্ষা]।

ভূমিকা।

পুস্তকখানির পাঠকের অভাব হয় নাই। পর পর পনরটী সংস্করণ এবং বহু ভাষায় অনুবাদ সত্ত্বেও ক্রেতাদের অভাব এখনও মিটে নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষদিগের মন যে বইখানি পড়ে' একটুকুও বদলাইয়াছে তাহা মনে হয় না। প্রোগ্রামের শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে শিক্ষকদিগের বিষয়-তালিকার অতিরিক্ত কিছু শিখান অসম্ভব, তাঁরা আপনারা যেমন করে' শিখেছেন ছেলেদেরও সেই একই পদ্ধতিতে চিরদিন শিখিয়ে আসছেন। আর এটা স্বাভাবিকই।

---

* ডাক্তার লে বঁর ফরাসী Psychologie de l' Education হইতে।

প্রবর্ত্তকের দ্বাদশ সংখ্যার বিদ্যাপীঠের চিঠির প্রতিশ্রুতি মত ফ্রান্সের শিক্ষা ও তাহার সংস্কারের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বিশ্ববিশ্রুতখ্যাতি বৈজ্ঞানিক মহোদয়ের নিকট তাঁহার উপরি উল্লিখিত পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করিবার অনুমতির জন্য পত্র লিখা হইয়াছে। সম্মতি পাইলে পুস্তকখানি আমূল অনুবাদ করিব; নচেৎ সমালোচনা ব্যপদেশে যতটা বলা যায় সেই গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে, আপাততঃ নমুনা স্বরূপ ভূমিকাটুকুর অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমি বহুস্থানে বহুবার বলিয়াছি যে ফ্রান্সের জীবন সমস্যাগুলির সহিত আমাদের জাতীয় সমস্যার অনেক মিল আছে। বিশেষতঃ শিক্ষা সমস্যা ও শিক্ষা সংস্কার ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের এরূপ হুবহু মিল আর কোন দেশের সহিত পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ তুলনা করিয়াই শিখে ও জানে। তাই ফ্রান্সের কথার আলোচনায় কাহারও না কাহারও মনে একটা বস্তুতন্ত্র (positive) ভাব আসিতে পারে ইহা হয়ত দুরাশা নয়।

† Education is the art of transferring the conscient into the inconscient

এ ছাড়াও আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক বাধা আছে। বইখানিতে সেই সকল কারণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। তা' থেকে দেখতে পাওয়া যাবে কেন এত সৎ ইচ্ছা নিয়েও মানুষ একটুও কিছু করতে পারছে না। এই অসামর্থ্যের একটা নতুন উদাহরণ ভূমিকাতেই দিব। "আকাদেমী দে সিয়াস্ ও আকাদেমী দে মেদিসিনের" সভাসদ আচার্য্য লেয়ঁ লাবে এই বইখানির প্রথম সংস্করণ পাঠ করে' আমার সাথে একদিন দেখা করতে আসেন। তাঁকে আমি তখন একজন বড় 'সেনেটর' বলেই জানতাম। তিনি এসে বলেন যে তিনি মনে করেছেন সেনেটে আমাদের শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশে একটা বক্তৃতা দেবেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য লোবে মহাশয় বহুবার আমার বাড়ীতে এসে এ বিষয়ের আলোচনা করেন। অন্যান্য অনেক বন্ধুর সহিতও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক হয়। এই আলোচনার শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে, আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটা বদলাইবার পূর্ব্বে প্রথম শিক্ষকদিগের অন্তঃকরণটির পরিবর্ত্তন করাতে হবে, তার পর পরিবর্ত্তন করতে হবে ছেলের বাপ মার মনকে, তার পর ছেলেদের চাওয়াকে। কর্ম্মের গুরুত্ব দেখে খ্যাতনামা সেনেটর আপনার বক্তৃতা দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন।

পূর্ব্বতন সংস্করণ সমূহে বৈদেশিক শিক্ষা পদ্ধতির সম্বন্ধে আমি মাত্র দু'এক কথা বলেছিলাম কিন্তু এই কথাটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করে' নূতন সংস্করণের বহু অধ্যায়ে এই কথাটি বলেছি। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস, যেখানে সকল দেশের চাইতে শিক্ষার উন্নতি ও পূর্ণতা এসেছে, সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতিটার আমি বিশেষ করে' আলোচনা করেছি। অধ্যায়গুলি একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই বুঝতে পারা যাবে যে তাদের, শিক্ষা ও তাহার পদ্ধতির সম্বন্ধে ধারণা ও আমাদের শিক্ষার সম্বন্ধে ধারণা—এর মধ্যে কত বড় একটা দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র পড়ে' আছে। মনস্তত্ত্বের কয়েকটা কথা বেশ করে' হৃদয়ঙ্গম করে' নিয়ে আমেরিকার শিক্ষকেরা যখন পড়াতে যান তখন সহজেই তাঁরা ছাত্রের দর্শন, চিন্তাশক্তি, স্থিরপ্রজ্ঞা ও চরিত্রকে গড়ে' তুলেন। তাঁদের শিক্ষার মধ্যে বইএর স্থানটা খুব সঙ্কীর্ণ আর মুখস্থ করার স্থান একেবারেই নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক এর উল্টাটাই সত্য। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত ক্লাসের ছেলে মেয়েরা পড়া মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছুই করে না। যে একটা লোক, যাদের ভিতরে একটা খুব বড় রকমের বৈশিষ্ট্য আছে তারাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ছেলেরই সারা জীবন এই সংস্কারটা বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে। তাই আমাদের দেশে এক মুঠো বড় লোক আমাদের দেশের মুখটা জগতের সামনে কতকটা উজ্জ্বল করে' রাখলেও মাঝামাঝি লোক, যারা সত্য দেশের কর্ম্ম ও সভ্যতাকে বুকে করে' ধরে' রাখে, তাদের খুব অভাব। কি রকম করে' তারা জন্মাবে যদি আমাদের শিক্ষা তাদের না তৈরী করে' তোলে।

এই পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রমাণ পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই সেই সব প্রমাণ দিয়েছেন—যে আমাদের শিক্ষা বই মুখস্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের বিখ্যাত পলিটেক্নিক উচ্চ-শিক্ষালয়েও শিক্ষার পদ্ধতিটা ঐ একই রকমের। ছেলে মুখস্থ করে পরীক্ষার দিনের জন্য। কথাগুলো খালি স্মৃতির ভিতর দিয়ে অবচেতনার (চিত্তের) মধ্যে যায় ব'লে সেগুলো ভুলে যেতেও তাদের বেশী সময় লাগে না।

উপরি উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার গভীরতা যে কত সামান্য, 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্ মাইনস্' এম. এ,

পেলেত্তাঁ', ভূতপূর্ব্ব পলিটেক্‌নিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 'রেভিউ জেনেরাল দে সিয়াঁসের' ১৯১০ সালে ১৫ই এপ্রিলের সংখ্যায় অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে তা' থেকে একটু উদ্ধৃত করা হ'ল,—

শিক্ষাকে এক মাত্র পরীক্ষার দিকে কেন্দ্রীভূত করলে শিক্ষার বিজ্ঞানটাকে যেটা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করে—একেবারে ভেঙে ফেলা হয়। এমন শিক্ষায় মানুষের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুরই উৎকর্ষ সাধন হয় না। পলিটেক্‌নিক্ বিদ্যালয়ের ছাত্রের নিকট তার পাঠ্যটা অধিকার করা ছিল, আর কিছুই চাওয়া হয় না, তাকে নিজের কোন আবিষ্কার সৃজন করা কিছু পরীক্ষার জন্য দেখাতে হয় না ... তার সত্যি দামও কখন বোঝা যায় না ... স্মৃতি খুব মার্জ্জিত তার অতি সামান্য বুদ্ধি থাকলেও সে সকল বিষয়ে এমন কি অঙ্কশাস্ত্রেও অনেক নম্বর পেতে পারে। এই রকম ছেলেকেই পরীক্ষার প্রথম স্থানগুলি অধিকার করে বেরুতে দেখা যায়।

* * *

যদি আমাদের শিক্ষাসংস্কার প্রায়ই এক রকম অসম্ভব, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে এক খানা বই লেখবার আবশ্যকতা কি? আর রোজ রোজ গাদা গাদা শিক্ষা সম্বন্ধে কত বই বেরুচ্চে, যার পাঠকের মধ্যে অধিকাংশ হয়ত যারা পুস্তকগুলি রচনা করেছেন তাঁরাই।

ঠিক এই কথাটা আমি মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম যখন প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে—বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অবাধভাবে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে দেখে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে—আমি এই পুস্তক খানি লিখতে মনস্থ করেছিলুম। তা হ'লেও আমি পুস্তক খানা রচনা করতে বিরত হই নি, কারণ যেটা বল্লে ভাল হয় সেটা বলতে বিরত থাকা উচিত নয়, আর আমার মনে একটা দৃঢ় ধারণা হয়ে ছিল যে, যত বিলম্বেই হউক, একটা সত্যের বীজ, যত কঠিন পর্ব্বত শিরেই পতিত হ'ক না, একদিন না একদিন সেটা অঙ্কুরিত হবেই হবে।

পুস্তক খানা ছাপিয়ে আমার ভাগ্যে মন্দ হয় নি। হাজার হাজার লোক—যাদের কখন আমার পাঠক বলে' আশা করিনি এই বই খানা কিনেচে, আর এক এক জায়গায় এটার এমন একটা প্রসার হয়েছে যেটা একেবারেই আমি আশা করি নি। কিন্তু এ প্রসারটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর য়ে হয় নি সেটা নিশ্চয়ই—কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এত পুরাতন হয়ে পড়েছে যে তার পরিবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এক ধরণের লোক যাদের কথা আমি একেবারেই ভাবিনি, তারা এই বই খানা খুব আদর করে নিয়েছে।

আমার কথাগুলো অবশেষে দেখলুম সত্যি সত্যি এক জায়গায় গিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যেখান থেকে আমাদের ভবিষ্যতের সেনানায়কেরা তৈরী হ'য়ে আসবে। যুদ্ধবিদ্যালয়ের কথাই আমি বলছি, দুঃখের বিষয় ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত এ পর্য্যন্ত এসে পৌছায় নি। পণ্ডিতাগ্রগণ্য জেনেরাল বোনাল, কর্ণেল দে মাদুই এবং অন্যান্য আচার্য্য মণ্ডলী কতকগুলি প্রতিভাসম্পন্ন সেনানায়কের মধ্যে এই তথ্যগুলি সুরোপিত করেছেন—যে তথ্যগুলির কথা এই পুস্তকে বিশেষ করে' বলা হয়েছে।

যুদ্ধবিদ্যার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সেই শিক্ষার পদ্ধতি দরকার, যাতে সহজে স্থিরপ্রজ্ঞা, চিন্তাশীলতা, দর্শনাভ্যাস, ইচ্ছাশক্তি ও মনস্থৈর্য্য লাভ হয়।

এই সকল গুণ অর্জ্জন করে' তাকে অবচেতনার মধ্যে এনে ফেলা—যাতে সেই গুণগুলি আবার কর্ম্মের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়— তাকেই বলে শিক্ষার শিল্প।

সেনানায়কেরা যেটা খুব ভাল রকমই বুঝতে পেরেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যেরা সেটা ধরতে পেরেছেন বলে' মনে হয় না। অল্পদিন হল একথার

(সেনানায়কদের কথায়) একটা নতুন প্রমাণ পেয়েছি। "এতামাজর" গোয়ে, "এতুদ্ সুর্লা সিকোলোজি দে লা ত্রুপ এ ছ কমান্দমা (Study on the Psychology of Troups and the Command ment) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। বইখানিতে বিভিন্ন শিক্ষানবীশ সেনানায়কদের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি যে সব আলোচনা করেছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করেছেন—যেটা আমি আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিদ্যার সত্যগুলির উপর দাঁড়িয়ে প্রচার করেছিলাম। হয়ত বা একদিন সেনানায়কদের হাতেই বিশ্ববিদ্যালয় সেই পরিবর্ত্তনটা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে, যেটা আমাদের কাছ থেকে নিতে সে অস্বীকার করছে।

শুধু ফরাসী সেনার মধ্যে যে আমার শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব বিস্তার হয়েছে তা নয়। ১৯০৯ সালের ৮ই মে'র Naval and Military Gazetteএ লেখক প্রকাশ করেছেন—"গুস্তাব লে, বঁর মত শিক্ষার এমন সুন্দর সংজ্ঞা কেহ কখন দেয় নি। 'বুদ্ধির জ্ঞানকে চিত্তের সংস্কারের মধ্যে এনে ফেলাই শিক্ষার শিল্প।' "এতা মাজরের" কর্ত্তা ব্রিটনের জেনারেলরা এই তথ্যগুলি তাঁদের সকল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন।" লেখক সুন্দররূপেই নূতন পদ্ধতি কেমনভাবে বৃটিশবাহিনীর মধ্যে ব্যবহার হচ্চে তা দেখিয়েছেন। এঁরা বেশ বুঝতে পেরেছেন যে বুদ্ধি নয়, অবচেতনাই (সংস্কারই) মানুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত করে—যার জন্যে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানটাকে, বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি দিয়ে, সংস্কারগত করে তোলা অত্যাবশ্যক। অবচেতনার ভিতরপথেকেই, দৃঢ় সঙ্কল্প মানুষ গ্রহণ করতে পারে। "কর্ম্মপটুতা, তৎপরতা, harmony of action, এ সব শিক্ষা বিশিষ্টপদ্ধতির ভিতর দিয়েই সংস্কারগত হতে পারে।" ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করে আর কি বলা যেতে পারে।

ক্রমশঃ —

প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ।

বিপ্লব পন্থীর অস্ত্রশস্ত্র

রাজনীতিক তরঙ্গভঙ্গী শেষ হ'বার নয়। বাংলার স্বদেশীযজ্ঞ যে কোন কারণেই অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ভঙ্গ হ'বার উপক্রম কালেই, গুর্জ্জরকেশরী মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজমন্ত্রে দেশে নূতন প্লাবন সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধূমিত বহ্নির মত রাজরোষ আবার উদ্দীপ্ত, আবার দেশপ্রেমিকের নির্য্যাতন, কারাক্লেশ প্রভৃতি সংবাদে, দেশবাসী বিক্ষুব্ধ; মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দেশের এই উত্তেজনা স্রোত বুঝি রুদ্ধ হইবার নয়।

বর্ত্তমান আন্দোলন তবুও 'নন্-ভায়োলেন্স' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে অগ্নিযুগের রক্ত লীলা—প্রাণ নিয়ে ছিনি মিনি খেলার সম্পর্ক ইহাতে নাই। 'নিজ-বাস ভূমে পরবাসী' হ'য়ে থাকার বেদনা তো আছেই, তার উপর পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর কাতর অনুযোগ ব্যর্থ করে' লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থায় ব্যথার তীব্রতা বড়ই বেড়ে গিয়েছিল, সে দুর্ব্বিসহ যাতনায় অন্ত আজও হয় নি, তবে আত্মত্যাগের বিপুল

আনন্দের মাঝে বাঙ্গালীর জীবন অধিকতর শুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে—একটা নূতন দৃষ্টি তারা লাভ করেছে, দেশের সকল কাজই তাই এই নবীন জাতি একটা নূতন ভঙ্গীতে সিদ্ধ করতে চায়।

বর্ত্তমান কালে দেশসেবার সে নূতন প্রণালীর মধ্যে রাজনীতির কোনই প্রয়োজন নাই, সেইজন্য বিপ্লব যুগের দেশকর্মী যারা রাজানুগ্রহের আশাবাণী তাঁদের কর্ণগোচর হবামাত্র ভাগবৎ প্রেরণাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে এই শুভ সুযোগে [illegible] নূতনভাবে জীবন উৎসর্গ করবার [illegible] আশা পেতে [illegible] এদের অধিকাংশ কর্মীই [illegible] করে [illegible] অতীতের [illegible] অনেকের চিত্ত [illegible] সংশয়পরায়ণ [illegible] তাদের নিকট [illegible] এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি।

এই বিশ্বাস নিয়েই [illegible] উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিপ্রচেষ্টা আমরা ধারাবাহিক ভাবে করে এসেছি। এই কার্য্যে আমরা অকৃতকার্য্য হই নি। অন্তরীণবদ্ধ যুবকগণের মুক্তির পর, যারা রাজনৈতিক গুরুতর অভিযোগ মাথায় নিয়ে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গবর্জিত হ'য়ে—ছদ্মবেশে শত অসুবিধার মধ্যে জীবন অতিবাহন করছিলেন, তাঁদের মুক্তি প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, রাজশক্তির প্রসন্ন দৃষ্টি এ ক্ষেত্রেও আমাদের প্রচুর সহায়তা করেছে, গবর্মেন্টের নিকট এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সর্ব্বজন পরিচিত অমরেন্দ্র নাথের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আছি, তাঁর মুক্তিতে নির্য্যাতনযুগের দীর্ঘ অঙ্কে যবনিকা পাত হবে।

এই অবস্থায় রাজশক্তির দিক্ থেকে যুক্তিপূর্ণ একটা কথা আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে। নিরপেক্ষভাবেই আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে' আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করবো। উভয় পক্ষের কথাগুলির মধ্যে যে সত্য আছে তা উভয় পক্ষকেই পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাব ছাড়িয়ে বুঝে উঠতে হবে, আমাদের মনে হয় গবর্মেন্টের পক্ষ থেকে যে প্রশ্ন সঙ্গত ভাবে উত্থাপিত হয়েছে—তাও যেমন সত্য, অপর পক্ষের উত্তরগুলিও অবিশ্বাসপূর্ণ নহে।

গবর্মেন্ট বলেন—রাজনৈতিক বন্দীগণ বিপ্লবপন্থী [illegible] বাহির হয়ে গেল [illegible] অস্ত্রশস্ত্র তাদের নিকট ছিল, সেগুলির সন্ধান কেহই দিল না, তখন এ কথা মনে হওয়া কি খুবই স্বাভাবিক নয়, যে মুক্তির জন্য বিপ্লবপন্থীদের [illegible] উহা মুখের কথা মাত্র, পরন্তু অন্তরের [illegible] অবশ্য সকলেরই উপর এই সন্দেহ প্রযুক্ত নহে, কেননা, সকলেই কিছু অস্ত্রাদির সন্ধান রাখতেন না, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন নিশ্চয় আছেন—যারা রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন নাই, অথচ অশান্তি উপদ্রবের প্রধান সহায় অস্ত্রগুলি কেহই তো সমর্পণ করেন নাই, এরূপ ক্ষেত্রে গবর্মেন্টের মনে সংশয় উদয় হওয়া অসঙ্গত নহে।

রাজকর্ত্তৃপক্ষ বিপ্লবযুগের অনেক কথাই মন থেকে মুছে ফেলতে গররাজী নহেন। অস্ত্র সমর্পণকারীর উপর ও তারা কোন সংশয় রাখবেন না, এমন নিশ্চয় বাক্য আমরা তাঁদের নিকট থেকে পেয়েছি। এবং এ পর্য্যন্ত গবর্মেন্টের ব্যবহারাদির মধ্যে তিল মাত্র সংশয় করবারও আমরা কিছুই পাই নাই। অন্তরীণবদ্ধ যুবকগণ রাজানুগ্রহে মুক্তি লাভ করিলে, যারা ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছিলেন, তাঁরা যখন মুক্তি কামনায় আমাদের মধ্যস্থ মানলেন, তখন বাধ্য হ'য়ে এই বিষয় নিয়ে গবর্মেন্টের সহিত আমাদের অনেক পত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল, এই সময় গবর্মেন্ট এতৎসম্বন্ধে যে কথাগুলি আমাদের জানিয়ে ছিলেন—

সাধারণের অবগতির জন্য উহা আমরা অবিকল উদ্ধৃত করলুম।

"I am to say that Government considers that surrender of all weapons will afford the best proof of their sincerity. Any who wish to do this may kindly be instructed to deposit their arms with yourself so that they can be made over to me on later arrangement. No questions will be asked regarding any weapons so surrendered."

গবর্ণমেণ্টের কথানুযায়ী আচরণের উপর আমাদের আর তিল মাত্র অবিশ্বাস নাই এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। কেননা আত্মগোপনকারীগণের অতীত অবস্থানের ইতিহাস জানার দিক্ দিয়ে তাঁরা যে ঔদাস্য প্রকাশ করেছেন—অস্ত্রসমর্পণকারী ও যে সেই একই আচরণ লাভ করবে তাহা আমরা জোর করেই বল্‌তে পারি।

অন্তরীণবদ্ধ যুবকগণের মুক্তির পর, গবর্মেণ্ট নিজের মন থেকে অথবা কাহারও স্বীকারোক্তিতে এরূপ ধারণা করেছিলেন—যে অবশিষ্ট অস্ত্রাদির হিসাব পলাতক রাজনীতিক সংশয়ভাজন ব্যক্তিগণের নিকটেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহারাও যখন একে একে মুক্তি লাভ করছেন—অথচ ইহার কোনই নিরাকরণ হচ্ছে না, তখন এই সকল মারাত্মক অস্ত্রাদির সন্ধান কোন্ দিক্ দিয়ে পাওয়া যাবে—ইহা তাঁহাদের পক্ষে একটী মহা সমস্যার কথা হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান করে' জান্‌তে পেরেছি—তাতে কেবল ইঁহাদের উপরই এই রূপ সন্দেহ যুক্তিযুক্ত নহে। যাঁহারা অন্তরীণে বদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ থাক্‌তে পারেন, যাঁরা অস্ত্রাদির সংবাদ জানা সত্ত্বেও শীঘ্র শীঘ্র নিষ্কৃতিলাভের আশায় ইঁহাদের মাথায় এই বোঝাটা চাপিয়ে দিয়ে ছুটী পেয়েছেন—ইহা ব্যতীত আরও আমরা অনেক ঘটনা উল্লেখ করতে পারি—যাহা দ্বারা বিশদরূপে বুঝা যায়, অস্ত্রগুলি এমন অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছে—যার আর পুনরুদ্ধারের উপায় নাই। আমরা শেষোক্ত কথাটার উপরই অধিক আস্থাবান্।

১৯০৭ সালে নারায়ণগড়ে ছোট লাট বাহাদুরের জীবন বিনাশ কল্পে, বোমার প্রথম ব্যবহার থেকে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর অস্ত্র ব্যবহারের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। তারপর মানকুণ্ডু, চন্দননগর এই উভয় স্থানে বিপ্লবকারীদের নিষ্ফল প্রয়াসের পর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে ভুলক্রমে বোমার আঘাতে যখন দুইজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিরপরাধে প্রাণ দিল, অনুশোচনার চেয়ে নূতন অস্ত্রাবিষ্কারে নবীন জাতির হৃদয় উত্তেজনায় নেচে উঠেছিল। পুরাতন দল নির্ব্বাসন দণ্ডে আন্দামান যাত্রা করবার পর, পরবর্ত্তী বিপ্লববাদীগণ সর্ব্ব প্রথমে বোমাই ব্রহ্মাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিল, কেননা ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৪ সাল, এই তিন বৎসরে বাংলার বোমা ভারতের নানাক্ষেত্রে দশবার ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল: উহার মধ্যে দিল্লী মৌলবী বাজার, লাহোর, ময়মনসিং এবং কলিকাতার মুসলমান পাড়ায় যে বীভৎস দৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর সহসা রডা কোম্পানীর ৫০টী মজার পিস্তল ও ৪৬০০০ টাকার গুলি বিপ্লববাদীগণের হস্তগত হওয়ায়—রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ যে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, ইতিহাস সে কথা চিরদিন সাক্ষ্য দিবে।

অস্ত্রবলই বিপ্লববাদীদের প্রধান সহায়। গবর্মেণ্ট সেইজন্য এই সকল অস্ত্রসন্ধানে বিশেষ মনোযোগী হন। তাহার ফলে, ১৯১৫ সালে কলিকাতায় ৩টী, রংপুরে ২টী, বাকেশ্বরে ৩টী, বারাসাতে ২টী, ঢাকায় ১টী;

১৯১৬ সালে কলিকাতায় ৫টী, সালকিয়ায় ১টী, কুমিল্লায় ১টী, ঢাকায় ১টী, চন্দননগরে ৪টী; ১৯১৭ সালে বীরভূমে ৭টী, ঢাকায় ১টী, ময়মনসিংএ ১টী, ১৯১৮ সালে কলিকাতায় ২টী মসার পিস্তল গবর্মেণ্টের হস্তগত হয়। এই ৩৩টী পিস্তলের হিসাব খুব সম্ভব গবর্মেণ্টের খাতায় জমা হয়েছে। আমরা আর দুইটীর হিসাব খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলুম, ১টী ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় পূর্ব্ব থেকেই পরিত্যক্ত হয়েছে, আর একটী একেবারেই পাওয়া যায় নাই। মাত্র ৪১টী মসার পিস্তল হস্তগত হয়েছিল, অতএব একণে বাকী ৯টী পিস্তল বাংলার বিপ্লববাদীদের হস্তে আছে ব'লে বিশ্বাস গবর্মেণ্টের অমূলক নহে। আমরা কিন্তু [illegible] উক্ত দুইটী পিস্তলের মত বাকী ৯টী ও একই অবস্থা প্রাপ্ত হয় নি তাহা অবিশ্বাস করতে পারি না। কারণ বাংলা পরিত্যাগ ক'রে বিনায়ক রাওয়ের নিকট কয়েকটী পিস্তল ছিল। তাহার শোচনীয় মৃত্যুতে ঐ গুলির পুনঃপ্রাপ্তি অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে, এরূপ স্বর্গীয় [illegible], নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যোগেশ রায় প্রভৃতির নিকটও অস্ত্রাদি ছিল. তাঁহারা যে সকল ব্যক্তির নিকট এই সকল রেখে ছিলেন, তারা তাঁহাদের মৃত্যুর পর ভয়ে যে সে গুলি নষ্ট করে' ফেলবেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নাই। দলনীতির ভয়ে অস্ত্রশস্ত্র পথে ঘাটে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ আমাদের নিকট নূতন নয়, এইগুলির সংগৃহীকরণ এমন লোকের দ্বারা হয়েছে, যাঁরা হয়তো গবর্মেণ্টের আদৌ সংবাদ [illegible] নন, অতএব এই সকল অস্ত্রের পুনঃ ব্যবহার না দেখা পর্য্যন্ত অকারণ কাহারও উপর সন্দেহে আমাদের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। রাজ করুণা হইতে স্বদেশী যুগের একজন দেশসেবকও যেন বঞ্চিত না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এখনও যাঁহারা আত্মগোপন করে' আছেন, এ সংশয় যেন তাঁহাদের মুক্তির অন্তরায় না হয়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, অতীত যুগে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত বহু বিপ্লবপন্থী আজ মুক্ত জীবন নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা লঘু পাপে কঠোর রাজদণ্ড মাথায় করে' অনেকেই ভারতের কারাগারে, আন্দামানে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করে' তিল তিল জীবন ক্ষয় করছেন। রাজনৈতিক অপরাধীদের মুক্তি দিবার জন্য ভারত সম্রাট যে ঘোষণাবাণী প্রচার করেছিলেন, তা' থেকে এঁদের বঞ্চিত রাখার আমরা কোনই সার্থকতা দেখতে পাই না। সমাজের শত্রু শাসিত হোক, কিন্তু দেশ প্রেমের অমর প্রবাহে অভিষিক্ত উদার প্রাণ বাংলার উত্তম জীবনগুলি অকালে ছিন্নমূল তরুর মত মাটীর বুকে নিরানন্দে যদি যায়, তার চেয়ে দুঃখের কথা আর কি আছে। উচ্চ প্রেরণার প্রথম মুহূর্তে জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে হয়তো বিদ্বেষের আগুনই জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু আজ অধ্যাত্মজীবনের উন্নতিআশায় বাংলার নূতন জাতি গঠন উদ্দেশ্যে নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে, এই অবস্থায় সে যুগের সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি প্রার্থনায় কি আমরা সফলকাম হ'ব না? রাজকর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আমরা পুনঃপুনঃ এই দিকে আকর্ষণ করছি—মহত্ব প্রদর্শনে তাঁহারা যেন কৃপণতা না করেন, এই আমাদের শেষ অনুরোধ।

নতুন সত্যে তা' পরবর্তি রূপান্তর হবার মত তরল flexible করে'।

'এ যুগের এ নতুন সৃষ্টি স্বয়ং ভগবান করবেন, মানুষের এ কাজ নয়। তাই সাধকের নীচের সত্তার —মনে প্রাণে দেহে একেবারে নীরব সমর্পণ চাই, মানুষ নিজেকে নিস্তরঙ্গ করে সকল সত্তা মেলে ভগবানকে আপন আধারে গড়তে দেবে, তবে মানুষ দেবতা হবে, তবে তার দ্বারা নতুন সম্ভব হবে। সে নীরবতা কি ব্যাপার তা' তোমরা জান না। বিজ্ঞানের শান্তি যখন প্রাণে নামে, তখন মানুষের এই ক্ষুদ্র চঞ্চল প্রাণ গীতার 'অচলপ্রতিষ্ঠ' সমুদ্রের মত শান্ত হয়ে যায় অনন্ত আকাশের মত সীমাহীন হয়ে যায় অনুপম পূর্ণতায় পূর্ণ হয়ে যায়, তা' নামলে দেহের জড়ত্ব কঠিনতাও থাকে না, তাও হয় শান্ত অচল মহান ও বৃহৎ। সেই অপরূপ দেব আধারে ভগবানের জ্যোতি জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ একত্রে একতত্ত্ব হয়ে নামে ও লীলায় সৃষ্টি করে। এর নাম দেবজগৎ।"

'এই দেবত্ব পাবার জন্যে চাই সরল ঋজু ও খাঁটি সত্যকামনা, সব ছেড়ে দেবার সাহস ও বল এবং সত্যকে সহ্য করবার ক্ষমতা। যখন ডাক আসে, তখন আর দ্বিধা করতে নেই, সব চাইলে সব দিতে হয়, দ্বিধাহীন হয়ে অকপটে না দিলে সমর্পণ হয় না, সমর্পণ না হ'লে ভগবান নামে না। জীবের যা দুঃসাধ্য, ভগবানেরই তা' সহজ, ভগবান বিনা এ অসাধ্য সাধন মানুষের দ্বারা হবে না। তোমরা খাঁটি হও, ক্ষুদ্র তামস সৃষ্টির লোভ ছাড়, সত্যকাম সত্যতপা সত্যসাধক হও, তা' হলেই কেবল দেবজাতি সম্ভব হবে।"

তোমাদের—

বারীন্দ্র।

গান

ভুলে থাকা যায় না আর।
শ্বাসে শ্বাসে বইছ তুমি শক্তিরূপে প্রাণাধার॥
হৃদয়-ভরা তোমার প্রেমে—
ভাসিয়ে নে যাও তোমার টানে—
আঁখির আগুন কপাল জুড়ে
আলোয় ছাওয়া চারিধার।
ডাকি তোমায় সকাল সাঝে
শেষ করে' দাও তোমার মাঝে
ঢেকে পাওয়ার ল্যাঠা ভাঙ্গি
জীবে ব্রহ্মে একাকার।

মহাযজ্ঞ

সকল প্রকার আন্দোলনের মূল কথা মিলন। দেশের সহিত দেশ, জাতির সহিত জাতি, মানুষের সহিত মানুষের ঐক্যপ্রচেষ্টা নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। কোথাও বন্ধুত্ব, কোথাও আততায়ীতা। গোড়ার কথা পরস্পরের মধ্যে নিগূঢ়ে যে সত্য তাকেই আবিষ্কার করে' তোলা।

য়ুরোপের যুদ্ধারম্ভে রুশিয়া ছিল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিত্র, তার পর ঘটনাচক্রে রুশিয়ার নব শক্তির প্রকাশে সে এই উভয়ের শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল; আজ আবার দেখতে পাই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ভীষণ আক্রমণে রুশিয়া বিপন্ন হওয়ায় ইংলণ্ড তার সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করে' ধরেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তা নাকচ করা সম্ভব তো নয়ই, অধিকন্তু প্রকৃতির ইচ্ছাই যে এই মহামানবের ঐক্যকে মূর্ত্ত করে' ধরা। জগতের সর্ব্বত্র যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে—সে এই উদ্দেশ্যকেই সার্থক করে' তুলতে।

জীবনের উপরি ভাগটা দেখে এই কার্য্য তেমন চমক বলে' অনুমান হয় না, সেইজন্য যুদ্ধশেষে যুক্ত-রাজ্যের তদানীন্তন কর্ণধার শ্রীমান উইলসন চতুর্দ্দশ বিধানে সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়ে, জাতি সকলের মধ্যে ঐক্যসাধনের মানস করেছিলেন—ঘটনার চাপে বাহিরটা দোরস্ত হ'যে উঠলেও, মানুষের ভিতরে যে গোজামিল আছে—তার রূপপরিবর্ত্তন না হওয়ায়—উইলসন সাহেবের সে মহান্ উদ্দেশ্য যে কিরূপ ব্যর্থ হয়েছে—তা উল্লেখ বাহুল্য।

ঐক্য আছে অন্তরাত্মায়; জাতির জীবনে আত্মার বিজয় নিশান উড়িয়ে ধরে'ই ইহা সার্থক হবে, এই আত্ম-সাধনায় কোন জাতিবিশেষ সিদ্ধিলাভ করলেও যে রক্তপ্লাবন বন্ধ হ'য়ে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে এমন কোন কথা নাই; জগতের সকল জাতি যদি কখন অন্তর-দেবতার আদেশে সত্যরূপে জেগে ওঠে, তবেই এই স্বপ্ন সফল হবে। তদ্‌পূর্ব্বে আত্ম রক্ষার যে বীভৎস বাহ্য রূপ তা সকল জাতিকেই বরণ করে' নিতে হবে এবং যাদের জাতিস্বাতন্ত্র্য আছে, সেটা রক্ষা করবার জন্য যে বিকট আয়োজন তা থেকে কেহই বিরত থাকবে না।

বিটিশ সিংহের লাঙ্গুলের চাপে যে আয়র্লণ্ড ঢাকা প'ড়ে পিষ্ট হতে পারে, স্বাতন্ত্র্যানুভূতি প্রবল বলে' তারাও হিংসাকেই ধর্ম্ম বলে' গ্রহণ করেছে, জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য হত্যা তাদের নিত্য কর্ম্ম, মৃত্যুযন্ত্রণা আরামের।

মুখ আজ বিদ্রোহী - ইজিপ্টে ভারতে চির অশান্তি লেগেই আছে। আত্মপ্রকাশের অন্তরায় থাকতে কোন জাতিই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, আত্মপ্রকাশ সম্ভব না হ'লে মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়—আত্মার অফুরন্ত পুলকে দেহ প্রাণ মন নূতন হ'য়ে না উঠলে—প্রকৃতির গোপন ইচ্ছা সার্থক হবে না—জগতের সকল জাতিই তাই আজ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করছে—চারিদিকেই অশান্তি মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তপাত এ সকল ইহারই নিদর্শন।

রোমের বিজয় দম্ভ পরাভূত করে' য়ুরোপে বিভিন্ন জাতির আত্মপ্রকাশ; বাহুবল কোন জাতির স্বাতন্ত্র্য চূর্ণ করতে পারে না। রোমের পতন সে কথার জ্বলন্ত নিদর্শন। নীতিবিশারদ ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডকে যে আজ স্বীয় অঙ্গীভূত করতে পারল না—ইহা নূতন কথা নয়, কে জানে ওয়েলস্ স্কটল্যাণ্ড যতই যুক্ত হোক—কোন দিন জাতীয় অভিমানে তারা না উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

ইজিপ্ট, ভারত এগুলি মহাদেশ। ইহাদের বৈশিষ্ট্যের মাত্রা তুলনাহীন। নিজস্ব ধর্ম্মে, আদর্শে, সভ্যতায় ইহারা জগতে শীর্ষস্থানীয়। এই উভয় দেশের অশান্তি নির্ব্বাপিত হবার নয়। আত্মপ্রকাশের বহু অন্তরায় থাকতে শান্তির চিন্তা মহাপাপ। অষ্ট্রিয়ার অধীনতা পাশ ছিন্ন করে' ইটালীর স্বাধীনতা ইতিহাসের গৌরব পাঠ। গ্রীস, বলগেরিয়া, সার্ভিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি তুর্কীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে, আর ভারতের মত প্রাচীন জাতি চিরদিন হীন জীবন যাপন করবে এ কথা একেবারেই অসঙ্গত। সেই জন্য পঞ্জাবে [illegible] স্বরাজসাধনা আরম্ভ হয়েছে। [illegible] রাজরাজ স্বরাজ দানের প্রতিশ্রুতি [illegible] দিয়ে ঘোষণা করিয়েছিলেন [illegible] স্বাধীনতার ক্ষুধা যেমনই প্রবল হ'য়ে উঠেছে। বিলম্বে অনর্থ সৃষ্টির পূর্ণ সম্ভাবনা।

বুদ্ধি দিয়ে অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত কথা নয়। ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির মূল কথা রাজশক্তির অবিদিত নাই, কিন্তু ভারতের এই দাবী যতই ন্যায় সঙ্গত হোক, ভারতের সৌভাগ্য উদয়ে ইংলণ্ডের ভাগ্য চক্র অবনতির দিকেই বিবর্ত্তিত হবে, জাতিগত এতখানি স্বার্থত্যাগ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই জন্য এই নিরুপদ্রব অসহযোগীতার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে—সে চিন্তা উভয় পক্ষেরই মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। জগতে দুর্ব্বল যারা, তারা প্রবলের অত্যাচার বহুদিন ধরে' সহ্য করে' আজ মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—আয়র্লণ্ড যেমন ইংলণ্ডের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে'—পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে' বসেছে—সেইরূপ ভারতবর্ষও রিফর্মের পর রিফর্ম পেয়েও তৃপ্তি-লাভ করতে পারছে না—কথার ফাঁদে বদ্ধ না হ'য়ে তারা পূর্ণ স্বরাজ লাভের সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করেছে। ফাঁকি দিয়ে তাদের মন জোগান দেওয়া বুঝি আর সম্ভব নয়।

মানব জাতির ভিতর শান্তিময় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ তারা কেমন করে' সফল করবে—যারা, আত্ম স্বার্থের জন্য একটা প্রাচীন জাতিকে চিরদিন দুর্ব্বল করে' রাখতে চায়, চোখে ঠুলি বেঁধে স্বার্থের ঘানিতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঘুরপাক খেয়ে মরার চেয়ে—দাঁড়িয়ে মরে যাওয়া শ্রেয়ঃ আর কিছু না হোক, মরতে পারলে হবেই- তখন প্রতিপক্ষের ঘাঁড়ে তেল মর্দ্দন করতে না হয়—তাতেই মঙ্গল। প্রথম প্রথম মহাত্মা গান্ধীর নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের ইহাই ছিল মূল মন্ত্র।

আত্মমর্য্যাদায় যতখানি বুঝা যায়, ততই আত্ম-শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জাতীয় জীবনে যে তপস্যা যে ত্যাগের নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ আঘাত স্পর্শ করছে, তাতে ধীরে ধীরে ভস্মাবৃত অনল প্রকাশের মত, নির্বীর্য্য আধারে শক্তির বিদ্যুৎ রেখা ঝলক মেরে উঠছে, কিছু নাই থেকে—প্রবল জাতি গঠনের সকল উপাদানই আমাদের মধ্যে আছে, এ কথা আজ আমরা জানতে পেরেছি। জাতি আজ বুঝেছে—পশুবল বল নয়—তার চেয়ে বড় বল তপস্যার মহাত্মা গান্ধীকে পুরোভাগে রেখে সারা ভারতবর্ষ—তার চিরসিদ্ধ তপঃবলকে জাগ্রত করে' তুলছে জাতির সাধনার এই দৈব শক্তি যদি জাগ্রত হয়—তবে ভারতের জাতি জগতে অপরাজেয় হবে, এ কথা কিছু অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই তপস্যা কি? তপঃ শক্তির কথা কবিবর রবীন্দ্রনাথ থেকে ছোট বড় সকল কর্ম্মীর মুখেই আমরা অধুনা শুনতে পাচ্ছি।

তপঃশক্তি, ধর্ম্মবল নয়। ধর্ম্ম আচার আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রানুশাসন, দেব দেবীর পূজা, আরাধনা হোম, যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। তপস্যা এই সকলের কিছুই নহে। তাই বলিয়া ধর্ম্ম তপস্যার বিরোধী নহে, পরন্তু পরম সহায়ক, দেবদ্বিজে

ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যত শাস্ত্র তপঃ যজ্ঞে দীক্ষা লাভ করতে পারে, ধর্ম্মহীন ব্যক্তির পক্ষে উহা তত সহজ নহে।

ধর্ম্ম আচরণসাপেক্ষ—তপঃ স্বতঃস্ফূর্ত, প্রদীপ্ত অগ্নির মত অন্ধতম অন্তরের কলুষ বিনাশ করে। "তপসা ক্ষীয়তে পাপং" বুদ্ধির পাপ, মনের পাপ, প্রাণের পাপ, আধারগত সর্ব্ববিধ মালিন্য অপসারিত করে। জীবনের যজ্ঞবেদীতে একবার এই হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করলে সাধককে সর্ব্বস্ব ইহাতে আহুতি দিয়ে যেতে হয়। আহুতিপ্রাপ্ত প্রচণ্ড অগ্নি শিখা যত ঊর্দ্ধে উঠতে থাকে, ততই জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত অশুদ্ধতা দগ্ধ হ'য়ে যায়—দিব্য বিজ্ঞানসূর্য্য মানসে উঠে, হৃদয় প্রেমে ও আনন্দে প্লাবিত হয়, প্রচ্ছন্ন দুর্জ্জয় প্রাণশক্তি শত সিংহের বীর্য্যে গর্জ্জন করে' উঠে, মানবাধারে ভগবানের অনন্ত দান তখন নেমে আসে জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে, শক্তিরূপে, তপস্যা এই নব জীবনের সৃষ্টিপথ।

অবসাদহীন প্রেমানন্দপূর্ণ, বিজ্ঞানময় আধারে ভগবান আজ অবতরণ করতে চান—মানুষ পৃথিবীর ম্লান ছায়ায় বসে' আজ যে স্বপ্ন দেখ্‌ছে যে বিরাট মিলন চিত্র দিন দিন তুলির আঁচরে পরিস্ফুট করে' তুল্‌ছে, তাকে মূর্ত্তি দান করবে ভারতবর্ষ—বাংলাদেশ বিশেষ। আজিকার এই নব জাগরণের পিছনে যে উচ্চতর বিপুল শক্তি অপেক্ষা করছে তারই পিছনে কতভাবে কতভাবে এমন কত তরঙ্গ এক বিজয় অভিযানের জন্য সুসজ্জিত আছে তার আর ইয়ত্তা নাই। পশ্চাতে বা কালের যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপনের সঙ্গে সঙ্কেত ভাষা রেখে একটার পর একটা এমন লক্ষ তরঙ্গ ধেয়ে আসবে। এর ধর্ম্ম বাংলাদেশে কেবল বিক্ষিপ্ত ভাবের নয়—সমাগত নরনারী বাঁধা সে বন্ধন প্রাণের নিকোর, আনন্দের। ভারতের ভাব অগাধ। বিদ্যাপতিরা শান্ত সে কাজে নিজে পথে এগিয়েছে জগতের শক্তি তাকে পরাভব করতে পারে না।

পুস্তক পরিচয় ও সমালোচনা

মহর্ষি দধীচি—শ্রীহরিদাস মজুমদার বি. এল প্রণীত ও পূর্ব্বোক্ত সরস্বতী লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকটী আকারে ক্ষুদ্র, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। লেখক মহাশয় সহজ ও স্বচ্ছ বাংলায় মহর্ষি দধীচির জীবনচিত্র যেরূপ সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভূয়সী প্রশংসার পাত্র। প্রাচীন যুগের ঘটনা ও মহান চরিত্রগুলি বর্ত্তমান যুগের বালক বালিকার মনোবৃত্তির বোধগম্য করিয়া মনোহর ও ললিত বেশে সাহিত্যে স্থান পাইলে ধর্ম্ম, নীতি ও ইতিহাসের জ্ঞান লাভের সহিত উহারা যে প্রচুর আনন্দ লাভের অধিকারী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য নাই। বালকবালিকাদের ক্ষেত্রে বিষয় নির্ব্বাচন অপেক্ষা লেখার গুণই অধিক আবশ্যক, লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটীতে সাহিত্য ও কাব্যের রসসিক্ত করিয়া যেরূপ সহজ রচনাপদ্ধতিতে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে পুস্তকের গৌরব শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং মনে হয়, এই পুস্তকটী বহুদিন সাহিত্যে স্থানলাভ করিয়া কিশোর কিশোরীর আনন্দ বিধানে নিযুক্ত থাকিবে। এরূপ পুস্তকের যে আদর বৃদ্ধি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই আশ্বিন, ১৩২৮ [অষ্টাদশ সংখ্যা

স্বরাজ পথ

ভগবান ভিন্ন সৃষ্টি করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। সেই জন্য কিছু গঠন করিবার পূর্ব্বে নিজ নিজ অন্তরে এই ভগবানকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার কথা আমরা বলিয়া থাকি। ইহা নূতন কথা বা অসাধ্য কিছু নহে, বরং ইহাই স্বাভাবিক এবং সনাতন।

জগতের যাহা কিছু সেই সবের মধ্যেই ভগবান আছেন। তিনিই নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ফলভোক্তা। এই সহজ জ্ঞান হারাইয়া আমি-রূপ যে আত্মচৈতন্য, উহা যেমন অসত্য, তদ্রূপ এই 'আমি'র সৃষ্টি যে ভ্রান্তি-পূর্ণ হইবে সে বিষয়ে আর সংশয় কি?

সংশয় সাধনার শত্রু, আবার মিত্রও বটে। ক্ষুদ্রতার মধ্যে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যে আবদ্ধ, সংশয়ের কশাঘাতে সে নিত্য বিপর্য্যস্ত, ইহার আমূল নিরসনের প্রচেষ্টা সেখানে খুবই স্বাভাবিক। এইরূপ ক্ষেত্রে সংশয় সাধকের শত্রুরূপেই আবির্ভূত হয়, কিন্তু এই সংশয়ের অবস্থান কি অসম্পূর্ণ জীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ নয়? ব্যাধির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহা থাকিয়া যায়, ব্যাধির আরোগ্যে ইহার বিসর্জ্জন অবধারিত।

"আমি"কে ভগবানের পদে অভিষিক্ত করিয়া যে অহংকারের ছলনা—সংশয় সেখানে চিরশত্রু, প্রবঞ্চক উহা উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যে সত্যকে চাহিয়াছে, জীবনের প্রতিপদে সংশয়ের স্থান সে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। পূর্ণতার সীমা নাই, মিথ্যাও অশেষ, সেই জন্য পূর্ণ যোগীর জীবনই সাধনা।

সাধনার অভিব্যক্তি কর্ম্মে। জীবনের মুক্তি উহাও কর্ম্মহীন অবস্থা নহে। ভগবান যুগপত স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা। কর্ম্মের মধ্যেই তিনি রূপে রসে আপনাকে ভরাইয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন, তাই মানুষের ধর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য নয়, কর্ম্মের মাঝেই সে আপনাকে উপরে তুলিয়া ধরিতেছে; জড় সেও অলক্ষ্যে কর্ম্ম করে, সৃষ্টির পূর্ণতা বিধানে তার দানও নগণ্য নয়।

জীবনের উদ্দেশ্য সত্যকে পাওয়া, সত্য দিয়া নিজেকে নিখুঁত করিয়া গড়িয়া তোলা। এই সঙ্কল্প অটুট না রাখিয়া আমরা যদি কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হই, কর্ম্মের চাপে আত্মঘাতী হইব। কর্ম্মকে জীবনের উদ্দেশ্য করিলে, ইহার মূলে বাসনা থাকিয়া যাইবে, বাসনা মানুষকে ক্ষুদ্র করিয়া দেয়, সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলে, এই বাসনার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে, কর্ম্ম[illegible]

ব্যর্থ হইবে না।

এক্ষণে দেখা চাই এই বাসনা কি? বাসনার অভাবে কর্ম্ম করা সম্ভব কি না? বাসনা সকল কর্ম্মের জনয়িতা, এই সংস্কার আমাদের মনে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছে। বাসনা ত্যাগের সঙ্গে কর্ম্ম ত্যাগ অপরিহার্য্য, এবং মুক্তির বিরোধী বলিয়া কর্ম্মত্যাগ আমরা শ্রেয়ঃ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

বাসনা মনোবৃত্তির একটি বিশেষ ভঙ্গী। মনের চাওয়া জিনিষটির উপর ভোগে ইহার তৃপ্তি। বিষয়ের পিছনে যে আনন্দময় সত্তা আছেন বাসনার সে গভীর দৃষ্টি না থাকায়, উহা সে দেখিতে পায় না। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে দোড়াদৌড়ি করাই ইহার স্বভাব। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইলে ইহার উল্লাস, অপ্রাপ্তি ঘটিলে মনের উপর অবসাদ ঢালিয়া দেয়। বাসনা আঘাতের পর আঘাত দিয়া মনের উপর তরঙ্গ সৃষ্টি করে, প্রাণের যে উত্তেজনা যে উদ্যম—ইহা তাহারই ফল; সঙ্কীর্ণ মনপ্রাণের খেলা প্রকৃতির অধীন, মানুষী স্বভাবের গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ, তাই দুষ্পূরণীয় প্রবৃত্তির হাহাকার নিত্যকাল চলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র হইয়া থাকার মূলে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত অহংকার অহংকারের উৎপত্তি অজ্ঞানে, তপস্যার দ্বারা যদি এই ভ্রমঃ আবরণ অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে বাসনাশূন্য রাখিয়া কর্ম্ম করা অসঙ্গত ব্যাপার নহে।

জীবনের উদ্দেশ্য "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", ত্যাগের দ্বারা ভোগ। এই ত্যাগ জীবনের উপর উৎপীড়ন নয়, অনন্ত ভোগের মাত্রা সীমার মধ্যে টানিয়া যে অহংকার আমাদের ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে ছাড়িয়া চলা।

অহংকার অখণ্ড সত্তার দিকে পিছন করিয়া, মনের ঘরে নিজেই কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে। অনন্ত ভগবানের মধ্যে অহংকারের এই স্বাতন্ত্র্য, ইহার সর্বখানিই মিথ্যা; তাই জীবনের সকল কর্ম্ম শ্রমের মতই ব্যর্থ হয়।

সত্য জীবন ভাগবত। এক অখণ্ড সত্তা অনন্ত রূপে আনন্দ ভোগ করিতেছেন আমার মধ্যে তোমার মধ্যে, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে তিনিই বিরাজমান। এই অখণ্ড চৈতন্য—সদা জাগ্রত রাখিতে পারিলে, জীবনে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। আমি এক এবং স্বতন্ত্র, আবার যুগপৎ বহু ও বহুত্বের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে সে চৈতন্য উপাত্ত আমি, আমার এই নিত্য বহু স্বভাবের মধ্যে, আমি যদি অচল প্রতিষ্ঠা পাইতে থাকিতে পারি, তবেই অসংখ্য কর্ম্মের মাঝেও মাক্ত থাকিব।

কর্ম্ম প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডকে অপূর্ব্ব কৌশলে পরিচালিত করিতেছে কর্ম্মবন্ধনে, আত্মা কখন আবদ্ধ হয় না কর্ম্মের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাহার আছে। স্বভাবের আনুগত্য ছাড়িয়া, আধেয় ও আধারের মধ্যে যে সম্বন্ধ উহা উপলব্ধি করিয়া, ভগবানের সহিত নিজের অভিন্নতা স্পষ্ট করিয়া তোলাই মুক্তি—ইহাই ভাগবত মুক্তি।

এই সকল দার্শনিক প্রবচনে জটিল জীবন সমস্যা যে কিছু মাত্র সহজ হইয়া উঠে না, একথা আমরা জানি, এবং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেবল কথায় লেখায় যদি জীবনের সত্য উদ্বুদ্ধ হইত, তাহা হইলে জীবন আমাদের খুবই লঘু, খুবই অপদার্থ বলিতে হইবে। জীবন কেন জগতের একটি পরমাণুও এত মহত্বপূর্ণ যে তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণও শুধু কথায় সিদ্ধ হয় না—কেন না উহার মধ্যে নিখিল জগৎ অবস্থান করিতেছে। "The microcosm is one with the macrocosm"

চাই সাধনা—চাই তপস্যা, চাই জীবনপাত পরিশ্রম। জগৎ সত্য, দেবনিবাস। আমি যদি সত্য হই, দেবতা হই, এ জগতের উপর আমার অধিকার সত্য

হইয়া উঠিবে। বিশ্বের সকল ভোগ আমার দুয়ারে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইবে। আমার মধ্যে আমিই যখন অপ্রতিষ্ঠ, দণ্ডাহত, বাহিরের যন্ত্রণা সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া যে আমায় আহত করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আজ আমরা দুঃখ, উৎপীড়ন, নির্যাতনের প্রতীকার করিতে ছুটিয়াছি বাহিরের আঘাতকে, বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া প্রতিহত করিবার জন্য। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দিয়া, অথবা নিরুপদ্রবে উহা সহ্য করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগের পরিসমাপ্তি কোন দিন আসিবে কি না কে বলিবে? ইতিহাসের বুকে ইহার বিরুদ্ধ সাক্ষ্যই আমরা দেখিতে পাই।

ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণ হইতে অব্যাহতি আশায় কুইনাইনের ভবিষ্যৎ ফল বিষময় জানিয়াও আমরা উহা গলাধঃকরণ করি, জীবন ঠোঁটের আগায় আসিলে আপাততঃ রক্ষার উপায় বিচারের প্রতীক্ষা রাখে না। জলমগ্নপ্রায় যে, সে যে তৃণখণ্ড জড়াইয়া ধরে; আমরাও আজ আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন, মুমূর্ষু জীবনে বিন্দু-শক্তি সঞ্চারের প্রবল লোভে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছি, ভবিষ্যৎ চিন্তার সামর্থ্য এবং অবসর উভয়ই আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, মৃত্যুর সহিত প্রতি হাত লড়াই করিয়া চলাই উপস্থিত আমাদের ধর্ম্ম; প্রতিপদে অসংখ্য বিঘ্নকে চাপিয়া মাড়াইয়া আত্মসংশয়ের কুটিল নাগপাশ দুই হাতে সরাইয়া আমরা ছুটিয়াছি। কোন পথে? জানিনা উহা মরীচিকা কি না—মৃত্যু যখন অবধারিত, শিরায় শিরায় বিদ্যুতের আগুন ফুটাইয়া মরাই তখন শ্রেয়ঃ মানিয়াছি।

এই জাগ্রত জীবনের প্রবল উচ্ছ্বাস কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। এই খরতর ধারাপ্রবাহে, গঙ্গাস্রোতে বিপন্ন ঐরাবতের মত লাঞ্ছিত হইতে চাহিবে কে? বাংলার অতীত অগ্নিযুগে দর্শকের অযাচিত কৃপানির্দ্দেশ মাত্র হয় নাই, আজও উহা সমান ভাবেই অগ্রাহ্য হইবে। যিনি এই জাগ্রত জীবনের সহিত সমান ভাবে ছুটিতে পারিবেন, আর তার জীবনের মাঝে যদি কোন সত্য নির্দ্দেশ থাকে, তবেই ধীরে ধীরে উহা কর্ম্মীদলের অন্তরে প্রসর্পিত হইবে। অতীতের শক্তি এই ভাবেই সত্য আশ্রয় করিয়াছে, বর্ত্তমানের শক্তিপ্রবাহ এই ভাবেই সত্যে নিয়ন্ত্রিত হইবে। দেশাত্মার সহিত এই অভিন্ন অনুভূতি সর্ব্বতোভাবে আত্মজীবনে পরিস্ফুট করিতে না পারিলে দেশ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিবে না।

জীবনের তপস্যা তাই এই কর্ম্মের মাঝেই মূর্ত্ত করিয়া ধরা। যে সত্যের উপর আমার প্রতিষ্ঠা, সেই সত্যের উপর দেশকে তুলিয়া ধরার উপায়, দূরে দাঁড়াইয়া কর্ম্মকে ছোট করিয়া দেখা নয়, কর্ম্মীকে নীচে নামাইয়া ধরা নয়, দেশের জীবনে যে প্রেরণা অবতরণ করিয়াছে—তাহা সার্থক করা চাই, আজ উহা যত ভীষণ যত অমঙ্গলের কারণ বলিয়া অনুধাবন করিতেছ, গোড়ায় কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই নাই। আছে সত্য, আছে মঙ্গলময় শিবের ভুবনমোহন মাধুর্য্য। উপরের আবর্জ্জনা স্তূপ সরাইয়া ভিতরের মণিকোটা আবিষ্কার কর। দেশের জাগরণ, প্রলয়ের গর্জ্জন তুলিয়াই অগ্রসর হয়, ইহার মধ্যে আতঙ্কের কারণ কিছুই নাই। বাংলার বিপ্লবযুগেও যে আকাশ-জোড়া মেঘ দেখিয়া অনেকে মুখ ঢাকিয়াছিল, নবীনদের উৎসবের পথে ছুঁড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল—সে মেঘ কিন্তু অমৃত বর্ষণ করিয়াছে—সে নবীন জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়াই জীবন সংগ্রামে অমর হইয়াছে, আজিকার এই মহাযজ্ঞও ভবিষ্যৎ ভারতের অন্তর্বল বৃদ্ধি করিবে, অমঙ্গল সাধন করিবে না।

জাতির কর্ম্মরথ ছুটিয়াছে—মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যাহারা ইহার কাছি ধরিয়া টানিতেছে—তাহাদের অন্তরশুদ্ধির উপরই ইহার গতি নির্ভর করে। কর্ম্মের চেয়ে, কর্ম্মী যদি আপন আপন অন্তরের দিকে দৃষ্টি

রাখিয়া চলেন তাহা হইলে এই মহাযজ্ঞ যে নিষ্ফল হইবে না—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তাই প্রতি কর্ম্মীকে বাসনা হইতে, অহংকার হইতে মুক্তি পাইতে হইবে। আপনাকে ছাড়াইয়া সহকর্ম্মীদের সহিত একাত্ম হইয়া উঠিতে হইবে। আঘাতের উপর আঘাত দিয়া বিধাতা সেই বিরাট ঐক্যের দিকেই আমাদের লইয়া চলিয়াছেন, আজ ঘরকে পর, এবং পরকে আপন করিয়া লইতে হইবে, হৃদয়ের বল সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিতে হইবে।

কর্ম্মের লক্ষ্য মুক্তি। সে মুক্তি অহংকার হইতে মুক্তি, ব্যক্তিগত বাসনা হইতে মুক্তি। বস্তুতঃ জগতের কোন পদার্থই কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য সৃজিত হয় নাই, কেহ কোন বস্তু অধিকার করিয়া রাখে নাই, মন এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যও এ জগতে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং বিষয় বিশেষের অপ্রাপ্তির হেতুই যে বন্ধন, আর উহার প্রাপ্তিতেই যে আমাদের মুক্তি-লাভ ঘটিবে এমন কথা একান্তই মূল্যহীন।

চাই ঐক্য। পরস্পরকে পরস্পর হইতে যতই স্বতন্ত্র করিয়া দেখি না কেন মূলতঃ উহা সত্য নহে। সেই একজন প্রতি ক্ষেত্রে সমানভাবে বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কর্ম্মের পথে এই ঐক্য প্রসারিত করিয়া ধরিতে পারিলে, মুক্তির বাতাস আমরা অনুভব করিতে পারিব। আত্মার ব্যাপকতা যতই বৃদ্ধি হইবে, যতই আমরা সেই মহান্ ঐক্যে যুক্ত হইতে পারিব—ততই স্বাধীনতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

এ বিশ্ব ভগবানের ভোগনিবাস। যে অহংকার আমাদের এই বিরাট আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা ছাড়িতে পারিলেই আমরা মুক্তি পাইব। আপনার মধ্যে, এবং সকল জীবের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি না করিয়া যে কোনরূপ স্বাধীনতা অর্জ্জন কর, ভারতের আত্মা তাহাতে পরিতৃপ্ত হইবে না।

ব্যক্তিবের দিক হইতে এই উচ্চ দার্শনিক ভাগবত তত্ত্বের সহিত ভারতের বর্ত্তমান কর্ম্মের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর নহে। উহার জন্য অন্তরেই অন্বেষণ করিতে হইবে। ভারতের আত্মা বুদ্ধ শঙ্কর রূপে যে মুক্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা ভারত ভিন্ন অপর কেহ আসিয়া সিদ্ধ করিবে না। আত্মা সর্ব্বগত জানিলেই মুক্তি পাওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনার প্রয়োজন আছে, সৌভাগ্যের বিষয়, ভারত এ বিষয়ে উদাসীন নহে। যুগে যুগে, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, এই সকলের মধ্য দিয়া তাহার সাধনা চলিয়া আসিতেছে—একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা বেশ পরিষ্কারকরূপেই বুঝিতে পারা যায়।

খুব সম্ভব মহাত্মা গান্ধী এ কথা বুঝিয়াছেন, বিশ্ব মানবতার আদর্শ তাঁহার জীবনে খুবই স্পষ্ট, অথচ ভারতের দুর্দ্দশামোচনে তিনি অন্যের স্বার্থে আঘাত দিতে অকুণ্ঠিত। এ আঘাত বিদ্বেষের আঘাত নয়। মানুষের সত্যদৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে মহাপুরুষদের মাঝে মাঝে রক্তপাতেরও ব্যবস্থা করিতে হয়, কর্ম্মের বিচার বাহিরের রূপে নির্ণীত হয় না—অন্তরের ভাবের উপরই উহা নির্ভর করে।

রাগ দ্বেষের উৎপত্তি অহংকারে। অহংকার চায় অধিকার, এবং অধিকৃত বস্তুর হস্তান্তর হইলে প্রলয়ের আগুন জ্বলিয়া দারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে এই ভোগ ও অধিকারের মধ্যে যে ভগবান মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছেন—তাঁহার সহিত আমাদের ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা মিলাইয়া দিয়া—ভাগবত মুক্তি লাভ করাই আমাদের আদর্শ। ভারতের বর্ত্তমান কর্ম্মের পিছনে আত্মার সত্তা ইহাই খুবই স্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে—কর্ম্মীবৃন্দের পরিপূর্ণ শুদ্ধির উপরেই শুধু ভারতের মুক্তি নয়, মনুষ্য

জাতির মুক্তি নির্ভর করিতেছে।

কর্ম্মচিত্রের পরিবর্ত্তন হয়তো প্রয়োজন হইবে না —অন্তরে ভাবশুদ্ধি হওয়া চাই—আত্ম সাধনার জন্যই ভারতকে আজ সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, শস্য রক্ষা করিতে হইবে, স্বাবলম্বী হইতে হইবে। আত্মসাধনার জন্যই সে চরকা কাটিবে, তাঁত বুনিবে, খদ্দর পরিধান করিবে। এ সকল বাহিরের অভিব্যক্তি। অন্তরে কিন্তু আপনাকে বিনাইয়া বিনাইয়া অপরের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চলিতে হইবে। একের শক্তি অপরের সহিত গাঁট বাঁধিয়া দীর্ঘ করিলে চলিবে না ; সে তন্ত্রী যতই দৃঢ় হউক, উহা প্রকৃতির অগ্নি পরীক্ষায় টিকিবে না, রাসায়নিক মিশ্রণ করিয়া দেওয়া চাই। আমি তোমার মধ্যে গলিয়া যাইব, তুমিও আমার মধ্যে গলিয়া যাও, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কূট বুদ্ধি যেন এই মহা মিলনের অন্তরায় না হয়, ভগবানের মধ্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিন্তা অজ্ঞানতার পরিচয়— The ignorance which supposes the soul to be a separate entity in the Brahman.

আমাকে গলাইয়া তোমার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়াই অহংকার বিনাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়। স্বাতন্ত্র্য নষ্টের আতঙ্ক আসে অহঙ্কারে। আমি যদি সত্য হই, শাশ্বত হই, তবেই তো আমার বিনাশ নাই ; অগ্নি, মৃত্যু আমায় নষ্ট করিতে পারে না। এই আত্মার অমরত্বে যার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে-ই ভাগবত মুক্তির অধিকারী। সেই আপনাকে চক্রাকারে সম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে—সেই চক্রই ভাগবত সংঘ, সেই সংঘের মূর্ত্তিগুলি ভাগবত পুরুষ, ভগবানেরই দিব্যরূপ। তাই বলিতেছিলাম, অহংকারের সৃষ্টি অস্থায়ী—ভগবানের নির্ম্মাণ সত্য এবং অনাহত।

ভারতে ভাগবত সৃষ্টির সুযোগ আসিয়াছে। কর্ম্মের মধ্যে হে নবীন জাতি আপনাকে গুঁড়াইয়া দিব্য সংঘ গড়িয়া তোল; শুদ্ধ চরিত্র, দিব্যশক্তি অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি করিয়া, মণ্ডলে মণ্ডলে দেশকে ছাইয়া ফেল ; কোথাও বা শক্তিশালী গুরুশক্তিকে বেড়িয়া রাসচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তোল। অহংমুক্ত এই সকল অপূর্ব্ব চক্র জগতে দিব্য যুগ ফিরাইয়া আনিবে।

ঋগ্বেদ

(২)

৭। প্র প্র তাং বিপ্রমধ্বরেষু সাধুমগ্নিং
হোতারমীড়তে নমোভিঃ।
আ যস্ততান রোদসী ঋতেন নিত্যং
মৃজন্তি বাজিনং ঘৃতেন॥

লোকে যজ্ঞে এই জ্ঞানী সাধক (১) হোতা (২) অগ্নিকে উৎসর্গমন্ত্রে পূজা করিয়া থাকে। অগ্নি স্বর্গ এবং মর্ত্তকে সত্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন (৩)। সেই অশ্বরূপ (৪) অগ্নিকে লোকে ঘৃত দ্বারা সর্ব্বদা মার্জ্জিত করে।

(১) সাধন কর্ত্তা। যোগরূপ যজ্ঞে সাধক একে একে সকল প্রেরণা চিৎশক্তির মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন ; চিৎশক্তিই যোগকে চালাইয়া বাড়াইয়া পূর্ণতর করিয়া লইতেছে—অধ্বরেষু সাধুং। অধ্বর হইতেছে গতিশীল ক্রমবর্দ্ধনশীল যজ্ঞ।

(২) চিৎশক্তি অন্যান্য দিব্যশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) চিৎশক্তির যে সত্য প্রেরণা (ঋতং) তাহার দ্বারাই অন্তরের ও বাহিরের, মনের ও দেহের দিব্যরূপ গঠিত হয়।

(৪) অশ্ব হইতেছে প্রাণশক্তির রূপক। অগ্নি হইতেছে দিব্য প্রাণশক্তি। 'বাজি'র অন্য অর্থ পূর্ণভাব আধার—চিৎশক্তি সাধককে যাবতীয় সম্পদে ঋদ্ধ করিয়া তোলে।

(৫) জ্ঞান জ্যোতির সার। 'মৃজ' কথায় সেই জ্যোতির উজ্জ্বলতা উগ্রতা ও ঘনত্ব সূচিত হইতেছে। সাধক আপন অন্তরের জ্ঞানের আলোকে চিৎশক্তিকে মাজিয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল ও জীবন্ত করিয়া তুলিতেছে।

৮। মার্জাল্যো মৃজ্যতে স্বে দমূনাঃ কবি-

প্রশস্তো অতিথিঃ শিবো নঃ।

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভস্তদোজা বিশ্বাঁ

অগ্নে সহসা প্রাস্যন্যান্॥

উজ্জ্বল অগ্নিকে অধিকতর উজ্জ্বল করা হইতেছে। অগ্নি স্বগৃহে (১) অবস্থিত, কবিগণ কর্তৃক স্তুত (২), এই অগ্নি আমাদের মঙ্গলময় অতিথি (৩)। সেই শক্তিতে ওজস্বী (৪) সহস্রশৃঙ্গ বৃষ (৫) হে অগ্নি তুমি বিক্রমে অন্যান্য সকলকে অতিক্রম করিয়া থাক।

(১) তুরীয় লোক, সচ্চিদানন্দময় লোক। এইখানেই অগ্নির (চিৎশক্তির) নিজের প্রতিষ্ঠান, যথার্থ রূপ ও সত্তা।

(২) কবিপ্রশস্তঃ—কবি বা দ্রষ্টাগণই তাঁহাকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া দিতেছেন

(৩) চিৎশক্তি তুরীয় লোকে থাকিলেও, তাহার একটা প্রকাশ থাকে আমাদের এই আধারের ভিতরে, আমরা যে স্তরে সেই স্তরে। তাঁহার স্বরূপ তাঁহার নিজের গৃহে অলক্ষ্যে একটা সমুচ্চে থাকিলেও, অতিথি-রূপে তিনি আবার জাগ্রত্তে আমাদের মধ্যে আসিয়া দেখা দেন।

(৪) তদোজা—তদ্বৃত্ত সেই তুরীয় শক্তিতেই শক্তিমান।

(৫) স্রষ্টা পুরুষ।

৯। প্র সদ্যো অগ্নে অত্যেষ্যন্যানাবির্যস্মৈ

চারুতমো বভূথ।

ঈড়েন্যো বপুষ্যো বিভাবা প্রিয়ো

বিশামতিথির্মানুষীণাম্॥

যাহার নিকট তুমি তোমার চারুতম মূর্ত্তি যে মুহূর্ত্তে প্রকাশিত কর তদমুহূর্ত্তেই তাহার মধ্যে অপর সকল শক্তি অতিক্রম করিয়া (১), তুমি পূজ্য, তুমি বিরাট, জ্যোতিঃ তোমার সুদূরপ্রসারিত তুমি মনুষ্য-গণের প্রিয় অতিথি

(১) মানুষ স্বভাবতঃ চলে তাহার প্রাকৃতাত্মা ও প্রাকৃতশক্তি লইয়া। কিন্তু যখন সে সাধক হয় এবং যে মুহূর্ত্তে চিৎপ্রকাশ তাহার মধ্যে আবদ্ধ হয়, যেন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই প্রাকৃতাত্মা ও প্রাকৃতশক্তি ক্রমে দমিত হইতে থাকে।

১০। তুভ্যং ভরন্তি ক্ষিতয়ো যবিষ্ঠ

বলিমগ্নে অন্তিত ওত দূরাৎ।

আ ভন্দিষ্ঠস্য সুমতিং চিকিদ্ধি বৃহত্তে

অগ্নে মহি শর্ম ভদ্রং॥

হে চিরযৌবন অগ্নি দূর হইতে এবং নিকট হইতে সকল লোকেই তোমার জন্য বলি আনয়ন করিয়া থাকে (১)। আনন্দময় আত্মার পরম প্রসন্নতা আমার

মধ্যে উপলব্ধি কর। হে অগ্নি এবং তোমার সুখ-সন্তান তোমার মঙ্গল (২)।

(১) আধারের সকল স্তর, প্রতিষ্ঠানের সকল দিক হইতেই সকল রকম প্রেরণাদি আকর্ষণ করিয়া সাধক চিৎশক্তিকে অর্পণ করিতেছে। (২) চিৎশক্তিও এই রকমে বাড়িয়া উঠিয়া সাধকের অন্তরে একটা মহত্তর লোক স্থাপন করিতেছে।

১০। অগ্না বহ ভানুনো ভানুমন্তমাগ্নে তিষ্ঠ
যজত্রেভিঃ সমন্তঃ।
বিদ্বানপথীনামুর্বন্তরিক্ষমেহ দেবান্‌ হবিরদ্যায় বক্ষি॥

হে জ্যোতির্ময় অগ্নি অদ্য সমস্ত দেবতাগণের সহিত উজ্জ্বল পূর্ণাঙ্গ রথে আরোহণ কর। (১) বিশাল অন্তরীক্ষের (২) সমুদয় পথ তোমার পরিজ্ঞাত। আহুতি গ্রহণের জন্য দেবগণকে এখানে আনয়ন কর।

(১) দেহের প্রাণের মনের সকল শক্তি সমবেত করিয়া সিদ্ধির পথে চলিতে থাক।

(২) অন্তরের বা অন্তঃকরণের জগৎ।

১২। অবোচাম কবয়ে মেধ্যায় বচো বন্দারু
বৃষভায় বৃষ্ণে।
গবিষ্ঠিরো নমসা স্তোমমগ্নৌ দিবীব রুক্মমুরুব্যঞ্চমশ্রেৎ॥

হে অগ্নি তুমি বীর্যবান কবিরূপী (১) তুমি ধীমান্‌, তুমি বৃষ (২) তোমার প্রতি আমরা এই বন্দনাময় উচ্চারণ করিয়াছি। ঋষি গবিষ্ঠির উৎসর্গের (৩) দ্বারা অগ্নিমন্ত্র (৪) লাভ করিয়াছেন। গতি যার সুদূর বিস্তৃত তিনি দ্যুলোকের (৫) সেই হিরণ্ময় জ্যোতিতে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

(১) চিৎশক্তি দিয়াই সত্যের সাক্ষাৎ দৃষ্টি হয়, তাই অগ্নি কবি। চিৎশক্তি দিয়াই আবার সাক্ষাৎদৃষ্ট সত্য চিন্তায় রূপ নেয়, তাই অগ্নি মেধা বা মনীষী।

(২) বর্ষণ, সিঞ্চন বা সৃষ্টি করে যে পুরুষ শক্তি।

(৩) আত্মসমর্পণ। আধারের নিম্নতর স্তর সকলকে ঊর্ধ্বের কাছে আনত করিয়া ধরা।

(৪) স্তোম হইতেছে যে মন্ত্রশক্তি দ্বারা দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, আর ঋক্‌ হইতেছে যে মন্ত্রশক্তির দ্বারা জ্ঞানের আলোকে দেবতাকে আগাইয়া উদ্ভাসিত করা হয়।

(৫) সত্যং ঋতং বৃহৎ অথবা বিজ্ঞানময় লোক।
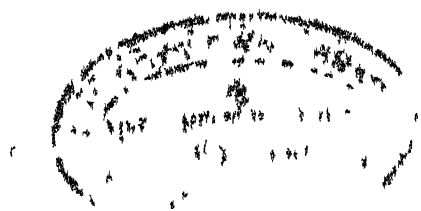
শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব (৩)

(প্রথম ভাগ)

শিক্ষা সংস্কারের কমিশন

প্রথম অধ্যায়

(বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যদের শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা)

(৪)

লেখা পড়া বেশী না জানলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের তবুও অনেক বুদ্ধি আছে। কিন্তু তাদের সৎ ইচ্ছা থাকলে কি হয়? তাদের কোন ক্ষমতাই নাই। যে উপায়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেই উপায়েই তারা শিক্ষা দান করে; বিষয় তালিকার বাহিরে এক পদও অগ্রসর হবার অধিকার নেই। এই বই খানির প্রথম কয়েক সংস্করণের পরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের নিকট থেকে যে সব হৃদয়-বিদারক পত্র আমার হাতে এসে পড়েছিল তা থেকে আমি বেশ বুঝতে পেরে ছিলুম যে এই ছোট ছোট শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষা পদ্ধতির মূল্য যে কত কম তা ভালই জানে, আর ছেলেরা যে আট দশ বৎসর বৃথা বিদ্যালয়ে সময় ক্ষেপ করে তাহাও তাদের জানতে বাকী নেই। কিন্তু কর্ত্তাদের কথা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে বাধ্য হওয়ায় এদের পদ্ধতিটা পরিবর্ত্তন করবার একেবারেই কোন অধিকার নেই।

হৃদয় ও বুদ্ধির শক্তি-নিচয়ের সাধনা করাকেই সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা বলে' জানি। হৃদয়ের শিক্ষার কথা বিশ্ব বিদ্যালয় একেবারেই ভাবেন না। বুদ্ধির শক্তি-নিচয়ের মধ্যে স্মৃতি ছাড়া আর কোনটিরই চর্চ্চা হয় না; বিচারশক্তি, বিবেচনা, মনন, কর্ম্মশৃঙ্খলা (method) এগুলি বিষয় তালিকা ভুক্ত না থাকায় সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত।

মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরেই ছাত্র পুস্তক অথবা প্রতিলিপিত নোট বই হ'তে মুখস্ত করে' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। একজন শিক্ষক একদিন আমায় বলছিলেন—"আমি ছেলেদের সামনে গাছপালা এনে তাদের উদ্ভিদ বিদ্যা শেখাই। কেবল গাছ পালার অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ডেকে দিয়েই আমার কর্ত্তব্য শেষ করতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু এটা কর্ম্ম সাহেবের কথা নয়।" এই রকমেই একমাত্র স্নাতক সভায় Physics, Chemistry সকলই শিক্ষা দেওয়া হয়।

দূর থেকে দু একটা যন্ত্র দেখিয়ে তাদের কানে ভয়ে একটু নাড়া চাড়া ক'রেই Experiment' এর কাজ শেষ ক'রে দেওয়া হয়। মুখে শতবার Experimental method' এর জন্যে বক্তৃতা করলেও কাজের সময় আমাদের দেশে সকলে এটাকে খুব উপেক্ষা ক'রেই থাকে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে আমরা বুঝতে পারব যে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস সকল বিষয়ই এই রকম ক'রে শেখান হয়।

মুখস্থের উপর জোর দিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসে বিজ্ঞান চর্চ্চা এবং স্বাধীন অনুসন্ধিৎসাকে (Independent Research) একেবারেই ধ্বংস ক'রেছে। অশেষ ধৈর্য্য সহকারে ছেলেরা বৃহৎ বৃহৎ বই মুখস্থ করে;—যার উপরই তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ, এমন কি শিক্ষকতা করা পর্য্যন্ত নির্ভর করছে। কাজে কাজেই তাদের নিজের নিজস্ব, নিজের সৃজনশক্তি, স্বাধীন প্রচেষ্টা এ সবই ধ্বংস হয়ে যায়। আমা-

দের পরীক্ষাগারের (Laboratory) অভাব নেই। তাদের সংখ্যা অত্যধিক বললেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু দিনের পর দিন বড় বড় ঘরগুলো প্রায় জন মানবশূন্য হয়েই পড়ে থাকে।

কখন কখন এক একটা ছাত্র ২৩ টাকা দিয়ে তৈরী করা পরীক্ষাগারে এসে তার thesis তৈরী করে। কিন্তু এটা এক রকম নিশ্চয়ভাবে বলা যেতে পারে যে তার এই প্রথম কর্ম্মই তার শেষ কর্ম্মে পরিণত হবে। এই রকম ব্যবস্থার অভাবে, পরীক্ষাগারগুলো জনশূন্য অপব্যয়ে অনর্থক হয়ে পড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদিগের যেটুকু স্বাধীনতা, ছাত্রদের বেলায় একেবারেই নারাজ। অতি সামান্য বৈশিষ্ট্য কোথাও দেখলে পরে সেটাকে কঠিন নিগড়ের মধ্যে বেঁধে চোখে চোখে রেখে, বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। বহু শতাব্দীর রাজ শাসনে ও ক্যাথলিক ধর্ম্মের গুরুভারে এক রকম আমরা দাসই হয়ে পড়েছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের যতটা দাস করেছে ততটা আর কোনো কিছুতেই হয় নি। এইখান থেকেই আমাদের উচ্চ বংশীয় লোকেরা শিক্ষা পেয়ে বেরিয়ে আসে, এদের কাছেই ছোট ছোট সকল লোককেই পড়তে হয়। তাই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে বেরোয়নি তারা যে পৃথিবীতে কিছু নয় এটা মনে করা স্বাভাবিক। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও অনেক অনেক বড় পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা দেশের মুখটা কম উজ্জ্বল করেন নি। এখনও দু একজন স্বাধীন তত্ত্বদর্শীর দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সে কয়জন? এরা কি রকম ক'রে কাজ করবে যদি এরা দেশের থেকে সাহায্য না পায়। এদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-বাহিনী সশস্ত্রে দণ্ডায়মান। এত বড় একটা যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পেরে এরা নিভৃত জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এই সব স্বাধীন-চেতা পণ্ডিতদের অভাব কি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা মিটবে?

(৫)

ফ্রান্সে হাজার হাজার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে যারা আমাদের শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথাটা বেশ বলতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে এত বড় একটা দেশেতে দশটা লোক আছে যারা এমন একটা সংস্কারের প্রস্তাব করতে পারে যেটা এখনই কাজে লাগান যায়, এবং তার অনুষ্ঠান করলে সত্যই সুফল ফলবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষা কমিশনের কথা শুনে সকলে শিক্ষা সংস্কার করতে ছুটে গেল। কিন্তু শেষ কালে যে প্রস্তাবটা দাঁড়াল (systeme des cycles) সেটা আগেকার শিক্ষার ব্যবস্থাটার চাইতে যে খারাপ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

ভূতপূর্ব্ব সচিব, আকাদমী ফ্রাঁসের সভাসদ মঃ হানোতো বলেন—"দু'এক বছর যেতে না যেতেই নতুন ব্যবস্থাটার উপর থেকে সকলের আস্থা চ'লে গেছে। এই নতুন ব্যবস্থা, আর পুরাতন মাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা, উভয়ের সংঘর্ষে শিক্ষার বিষম অসুবিধা হয়ে পড়েছে। এখন আমাদের যেদিকে হ'ক এক দিকে যেতেই হবে,—একটা কিছু ঠিক করা চাই-ই। কথার যাদুর শেষ হয়েছে। মুখস্থ করার দিনও ফুরিয়ে এল, এই মুখস্থ করে' করে' আমরা পুরুষানুক্রমে অসংখ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র, পরীক্ষা-প্রার্থী ও ডিগ্রি-লোলুপ মানুষেরই সৃষ্টি করে' আসছি। আমরা মনে করি লেখা পড়া শিখে আমরা সাধারণ লোকের চাইতে জ্ঞান-বুদ্ধিতে উঁচু হয়েছি। উঁচু এই মাত্র হয়েছি যে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধ'রে আমরা সেই এক কথা, এক পাঠ, এক রকম হাত পা মুখ নেড়ে বলতে শিখেছি। এই "অং বং" আর "হট্, মিট্, সিট্" মন্তর পড়তে পড়তে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল।—খালি

কপি-করা, পড়া আর মুখস্থ বলা।" আর আর সকলের মতনই বক্তা দোষগুলো স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাধির ঔষধ খুঁজে পান নি।

এই যে আমরা আমাদের অসুখটা ভাল করে ধরতে পারলেও তার ঔষধ একেবারেই খুঁজে পাচ্ছি না—এটা আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের ফল। এমন অনেক জিনিসই আছে যা ল্যাটিন জাতেরা কখন বুঝতে পারে নি, আর সম্ভবতঃ কখন বুঝতে পারবেও না।

অন্য অন্য জাত, যাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার গুলো ঠিক আমাদের মত নয়, তারা খুব শীঘ্র এই এ ব্যাধির ঔষধটা নির্দ্ধারণ করতে পেরেছে— যেটা আমাদের বোধেরও অনধিগম্য। সকলেই কানে আর চোখের সামনে দেখছে যে আমেরিকানরা তাদের শিক্ষার একটা সমাধান করলে। জাপানীরা – অতিঅত তাদের পেছন থেকে পেতাটা টেনে ধরেনি বটে – জার্ম্মণীর সব প্রতিষ্ঠানগুলো আস্ত দেশে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। সকলেই দেখতে পাচ্ছে, শিক্ষা বিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য, যুদ্ধ বিদ্যা এ সবেতে চল্লিশ বৎসর যেতে না যেতে তারা কত উন্নতি লাভ করেছে।

পাঠকদের যদি দেখবার দরকার হয়—আমাদের শিক্ষার সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে অন্য দেশের লোকের ধারণার কত তফাৎ—সেটা ইংরেজদের দুএকটা শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা পড়লেই বুঝতে পারবেন। নীচে আস্‌কিথ্, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্, লিট্‌লটন্ প্রভৃতি বড় বড় লোকের অধুনাতন বক্তৃতার দুচার ছত্র তুলে দিলুম,— "বিশ্ব বিদ্যালয় চায় না যে ছেলেরা কোন জিনিসের ভিতরে প্রবেশ না করে, কেবল সকল বিষয়ের উপর উপর একটু স্পর্শ করে বেড়ায়। এটা তার উদ্দেশ্যের একেবারেই বিপরীত কথা। বিশ্ব বিদ্যালয় কি রকম কাজ করছে সেটা বুঝতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় কি রকম করে ছেলেদের মানসিক শক্তিগুলো বিকশিত করছে, এবং তাদের জ্ঞানের সত্য স্পৃহাকে বাড়াচ্ছে তা দেখে বিচার করা যেতে পারে।" দেখে দেখে করে' করে', শেখার পদ্ধতি (Experimental method) টার সমর্থন করে' "ইটনের" অধ্যক্ষ বলেছেন- "এই করে' করে' শেখার একটা মস্ত বড় সার্থকতা এবং সুবিধা এই, যে কাজ করতে গেলেই পরস্পর ঠিক ঠিক চিন্তা করতে হবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে, মাপ যোগ দেখতে হবে, কাজ থাকতে থাকতে লোহার উপরে হাতুড়ির ঘা মারতে হবে – এলোমেলো থাকা চলবে না – তাতে দর্শন শক্তি বাড়বে আর বর্ণনাটাও কম পরিপুষ্ট হবে না।"

উপরের সব বক্তৃতাগুলোর সার সংগ্রহ করে' "নেচার" Nature পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন— "যদি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক হয়, তবে ছেলেরা যে কোন বই পড়ুক তাতে কিছু এসে যায় না। কতক-গুলো বিষয়ের—সেটা বিজ্ঞানেরই হ'ক বা সাহিত্যেরই হ'ক—নানা কথা মাথায় পুরে, মুখস্থ করে' রাখাকে এখন আর কেহই বিদ্যা বলে' মনে করে না।"*

(প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিদ্যাপীঠে আমরা "সাধারণ শিক্ষার' সময়ে সকল বিষয়ের সূত্রটা ধরিয়ে দিই। ছেলে তারপর সারা জীবন ধরে' জ্ঞানের "রিল"টা আপনি টেনে টেনে খুলে নেবে। এটা ঠিক সব বিষয়ের উপর উপর ছোঁয়া নয়, সকল বিষয়ের অন্তরটাকে—সূক্ষ্মভাবে হলেও—জীবন্ত এবং সত্যরূপে অনুভব করে' নেওয়া। "বিশেষ শিক্ষার" সময়েই ছেলেকে বিষয়টার ভিতর বাহির-পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে করে' বুঝে নিতে হয়।—অনুবাদক)

(৬)

উপরের কথাগুলি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে

আমাদের সংস্কারের ব্যবস্থাগুলোর কোন আবশ্যকই নেই। প্রোগ্রামই বদলাও আর ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসই (Baccalaureat) তুলে দাও ফল সেই একই থাকবে।

ফল একই থাকবে—আমি এ কথা বার বার বলছি—যত দিন না পদ্ধতিটাকে বদলান হ'চ্ছে। যেমন ক'রে শিক্ষকরা জন্মেছে তেমনি করেই তারা শিক্ষার বিস্তার করবে। তাদের অন্তরটাকে বদলাতে বলা আর তাদের জন্মকে বদলে আসতে বলা, এ দুই কথা প্রায়ই সমান। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের যেমন ক'রেছে তারা তেমনই হ'য়েছে।

তাই বলছি শিক্ষকেরই প্রথম বদলাতে হবে। কিন্তু সেটা করা এক রকম অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যেরা একথা স্বীকার না করলেও, শিক্ষাটা আমাদের হাতে নয় শিক্ষকদেরই হাতে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাটা এখন দার্শনিক আলোচনার মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবশ্যকীয় কোন পরিবর্তনই ফ্রান্সে সম্ভব নয়। জার্ম্মেণীতে যেমন ছেলেরা মাষ্টারের গুণ বুঝে তার কাছে মাইনে দিয়ে পড়ে, আমাদের দেশে শিক্ষকদের, বাঁধা ধরা গবর্ণমেণ্টের চাকরী উঠিয়ে দিয়ে, ছেলেদের মাইনের উপর নির্ভর করতে দিলে মন্দ হয় না।

শিক্ষায় এ রকম একটা স্বাধীনতা থাকাও খুব দরকার। যার যেমন জ্ঞান, যেমন কর্ম্মক্ষমতা, যেমন অনুসন্ধিৎসা (Research) ও শিক্ষা দিবার পদ্ধতি তার কাছে সেই রকম, ছাত্রের সংখ্যা আর মাহিনার ক্রম। এই রকম করে জার্ম্মেণীর বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সামর্থ্যবান লোককে আপনার কোলের উপর টানতে পেরেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ছেলেরা শিক্ষকদের মাহিনা দিত এবং যে কোন শিক্ষক এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে পারত, তা হ'লে হয়ত সৌখারিবিতে পড়েও আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষকেরা তাদের পদ্ধতিটা একটু বদলাত। হয়ত ছেলেদের বই আর নোট আর "ফরমূলা" দিয়ে বিজ্ঞান না শিখিয়ে বাস্তব জগতের সঙ্গে তাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিতে বাধ্য হ'ত। তখনই হয়ত শিক্ষকেরা বুঝতে পারত যে শিক্ষার গূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুতন্ত্র থেকে ভাবে নিয়ে যাওয়া (concrete to abstract)—যেমন করে' যুগ যুগ ধরে' প্রকৃতি মানুষকে ক্রম-জ্ঞান-বিকাশের পথে নিয়ে চলেছে।

এখনও এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে ফরাসী পার্লামেণ্ট একদিন ডেমক্রাসির নাম করে শিক্ষাটাকে ষ্টেট আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে মুক্তি দিতে সাহস করবে। কিন্তু এ রকম সস্তায় শিক্ষার দরকার কি—যে শিক্ষা কোন কাজেই আসে না? বরং ছেলেরা যদি আরও বেশী মাহিনা দিয়ে দরকারী বিদ্যা শিখতে পারত, তাহা হলে কত ভাল হ'ত। জাম্মাণদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও তার ফলাফল সকলেই দেখতে পাচ্ছে, আর আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় কি হচ্ছে, তা কারও বুঝতে বাকী নেই। একদিকে বিজ্ঞান আর শিল্পের উন্নতি বন্যায় মঁডল পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আর এক দিকে দিন দিন জ্ঞান আর মনুষ্যত্ব ভেতর থেকে যেন শুকিয়ে আসছে।

আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের ভারটা এত বেশী, যে এ রকম একটা সংস্কার ফ্রান্সে অসম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। আমরা "শিক্ষায়—স্বাধীনতার" দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না, আমরা শিক্ষাটাকে হাত পা বেঁধে ষ্টেটের প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের পায়ের তলায় নির্ম্মম ভাবেই ফেলে দিয়েছি। ষ্টেটই এখন একমাত্র ভগবান যাকে ফ্রান্সের লোকেরা, সম্প্রদায় (party) নির্বিশেষে পূজা করে। এমন একটাও লোক দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ষ্টেটের কাছ থেকে আমাদের জন্যে নতুন নতুন নিগড় [illegible] না না করছে

ষ্টেট ছাড়া যেন আমাদের জগতে আর কেউ নেই—আমাদের নিজের হাত পাও বুঝি নেই।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদানত হয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নেই। এই রকম হীন চেতা, উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারী (anarchist, কল্পনা প্রিয় ও বিকৃত মস্তিষ্ক অকেজো লোক তৈরী করবার ঐ বড় বড় কারখানাগুলো তত দিন মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকবে যতদিন না দেশের লোক—বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোন্ ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে বুঝতে পেরে—একেবারে এই শিক্ষার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছুটে দেবে, কিম্বা রোষে প্রজ্জ্বলিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার শিক্ষার সঙ্গে নিস্তব্ধ ভাবে চেলমান করে ধুলিসাৎ করবে। কিন্তু সেদিন আসবার হয়ত এখনও দেরী আছে।

পরিশেষে, আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে, শিক্ষার কথা প্রসঙ্গে যে কথাগুলো লিখেছিলুম সেই কথাগুলো বলেই এই অধ্যায়ের শেষ করব'। সে দিনও এটা সত্য ছিল—আজও এটা সত্য আছে, সম্ভবতঃ আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যেও এটা সত্য থাকবে।

"বিদ্যালয়ই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান যার ভেতর দিয়ে মানুষ তার সামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে। সকল দেশের লোকই নিজ নিজ পদ্ধতি অবলম্বন করে তার কোন না কোন একটা ফল পেয়েছে। বড় অনুশোচনার কথা যে আমাদের দেশে এই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার ভেতর দিয়ে আমরা জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধন করব', মানুষের জ্ঞান আর চরিত্রকে শুদ্ধ ও উন্নত করে তুল'ব—সেই প্রতিষ্ঠানটাই আমাদের বুকে রাক্ষসীর মত চেপে বসে জীবন শুষে পান করছে, জ্ঞানকে অসার আর চরিত্রকে উচ্ছৃঙ্খল করে' তুলছে।

কিন্তু এখনও এই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো—আমাদের কৈশোর ও যৌবনের কারাগার—যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এইটাই আশ্চর্য্য। আমি যারা কেবল ধ্বংসের স্বপ্ন দেখে তাদের দলভুক্ত নই। কিন্তু আমি যখন দেখি এ থেকে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে আর কি মহৎ উপকার হতে পারত, আমি যখন ভাবি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশটা কেমন করে' বৃথাই আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কত লোকের প্রতিভা একেবারে নির্ব্বাপিত হচ্ছে, চরিত্র হীন হয়ে পড়ছে, তখন আমার বৃদ্ধ কাটোর (Caton) কথা মনে পড়ে—রোমের শত্রুর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিও আমার এই অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হয়—বিশ্ববিদ্যালয়, তুমি অধঃপাতে যাও (Delenda est Carthago)।"

ক্রমশঃ

অতিমানুষের দীক্ষা

—:০:—

সত্য অনুভূতি লইয়াই আধ্যাত্মিকতা, ভাব জমাট হইয়া এই অনুভূতির পথ মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া দেয়—ভাববিভূতি জীবনের খুব উচ্চ ও সূক্ষ্ম প্রকাশ লক্ষণ, কিন্তু ভাব মনের উপরেই ক্রীড়া করে, ভাবরহস্য মন্থন করিলে বেশ বুঝা যায়, আমাদের এই উপরি-ভাসমান জড় চিন্তা ও সংস্কারপূর্ণ যে মন, তাহার পিছনে সূক্ষ্মতর ও গভীরতর মনস্তরেরই উহা সামগ্রী—সেই স্তরভরা গাঢ় মন উপরের জ্যোতিঃস্পর্শে জাগ্রত হয়,

উপরের বপাধারে সিক্ত ও চলমান হইয়া উঠে—অনন্ত স্বপ্ন, অনন্ত রহস্য, অনন্ত সুষমা-মাধুর্য্য-তারুণ্যে ভরাট ও জমজমা এই ভাবজগৎ—উহা আলোচনা সম্ভাবনার জগৎ, উহা কল্পনা-স্বপ্ন রহস্য-রাজ্য—প্রকৃত ও সত্য অধ্যাত্ম জগৎ উহারও উপরে নিগূঢ় —যেখানে অদক্ষ শান্তি ও স্থিরপ্রণ জ্যোতিঃ, যেখানে অমোঘ ও অশান্ত গতি নির্দ্ধারণ—সে মনেরও মন কিন্তু মনের চেয়েও গূঢ়-কল্প-রাজ্য—মনসো মনঃ—কিন্তু আবার মনসো জবীয়ঃ—সেই মন অতিরিক্ত মহা রাজ্যে উঠিয়াই অনুভূতি নিখুঁত হয়, সত্য হয়,—কেন না সেই খানে বৃহৎ, সেই ঊর্দ্ধপ্রতিষ্ঠ মহান ও সুমঙ্গল জ্যোতিঃসংঘাত বিজ্ঞানময় আসল জগৎ—অধ্যাত্ম জগৎ—অনুভূতি তথায় সত্য ধর্ম্মে, নিত্য ও শাশ্বত আনন্দে যুগপৎ স্থিরপ্রসন্ন ও লীলামধুর হইয়া উঠে। ভাবকেন্দ্র অতিক্রমণ পূর্ব্বক এই দিব্য বিজ্ঞানের আমাদের অধিকারী হইতে হইবে।

এ দেবজগৎ আমাদেরই কোন অন্তস্থলের গূঢ় সত্তা—সেই গূঢ় কেন্দ্রে লুকান চাবীটুকু খুঁজিয়া, ঘুরাইয়া, উহার দুয়ার খুলিয়া লইতে হইবে। সে চাবী—আকুল অধ্যাত্ম পিপাসা। অশান্ত অবিরল ঊর্দ্ধমুখী অগ্নিময়ী ইচ্ছাধারা—ভাগবত পরশেই উহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, ভগবানই চিহ্নিত গুরু শক্তি-রূপে সাধক-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেন, সেই অব্যর্থ শক্তিপূর্ণ বিদ্যুৎ-বীজ সারা অন্তর প্রদেশে দিনে দিনে সংক্রামিত হইয়া মন প্রাণকে অভিভূত, আচ্ছন্ন, অথচ সঞ্জীবিত করে, নূতন চক্ষু খুলিয়া দেয়, ভূতাবিষ্টের মত যেন কোন্ অপূর্ব্ব অথচ খুব বিশুদ্ধ আবেশ পরশে শুচি ও সংযত আধারপাত্রে কাহার জাগ্রত দর্শন ও বাণী প্রতীক্ষায় দিন হইতে দিনান্তর অতিবাহন করিয়া চলি—কে যেন অতি করুণ ও সপ্রেম স্বরে কোথায় যাইবার জন্য ডাকে—কোথা হইতে সে ডাক আসে ঠিক বুঝি না, জানি না, কণ্ঠস্বর খুবই চিনি চিনি অথচ চিনি না—তবু সে আমার চিরন্তন অতি পরিচিত সাধনার ধনই—সেটুকু বুঝি ধরিতে বুঝিতে একটুকুও বাকী থাকে না—সেই ডাক, সেই সুর, সে যে অনাহত, নিরন্তর, ব্যাকুলকর, অপূর্ব্ব নিবিড়, অনিবার্য্য সে চিরযুগযুগান্তের অযাচিত আকর্ষণ—সে টান, ডাক, সুর, ত একেবারেই অবহেলা করা যায় না। শুনিতেই হইবে, দূরাগত সে বাঁশীর গোপন বাদককে ধরিতেই হইবে, চিনিতেই হইবে, তাহার বুক ভরা এ গানের ছন্দ স্রোত—সে স্রোতোধারায় গা ভাসান দিয়া আমায় দিক হইতে দিগন্তরে লোক হইতে লোকান্তরে পাড়ি দিতেই হইবে—নহিলে আমার উপায় নাই—সে গায়, সে যে আমায় চায়—কোন্ অপরূপ পুরুষের জন্য তাহা না জানিলেও—তাহার গভীর আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়-তটে আসিয়া অবিশ্রান্ত অভিহত হইতেছে, অস্বীকার করিবার যো নাই—আমায় সেখানে যাইতেই হইবে—যাই, দেবতা, যাই।

বাসনার এতটুকু লেশ, কাঁচা কামরসের একটুকু আর্দ্র শ্লেষ্মা সূক্ষ্ম শরীরে অবশিষ্ট থাকিতে, আমাদের তৈজস ইচ্ছাশরীরটি অগ্নিবৎ শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। প্রাণ পুরুষই ত পরিপন্থী, পাপশক্তির কেন্দ্রদুর্গ, প্রাণ-পুরুষকে তীব্র ইচ্ছাগুণে পুড়াইয়া সম্পূর্ণ পাপমুক্ত করিতে হইবে। পাপপুরুষ সহজে প্রাণ-পুরুষকে ছাড়িয়া যায় না। কঠোর কষাঘাতে উহাকে আধার চ্যুত করিতে হইবে, প্রাণ-পুরুষের উপর তীব্র তপঃ প্রয়োগে উহাকে বাধ্য করিতে হইবে ঐ তার ছল-মূর্ত্তি আত্মবিক্রয় করিয়া এই মুহূর্ত্তেই তাড়াইয়া দিবার জন্য—তবুও কি সয়তান যায়! বিকট প্রেত-মূর্ত্তিগুলি সহ সাঙ্গচর পাপ-পুরুষ সাধককে ঘিরিয়া ফিরিয়া বীভৎস বিভীষিকা-নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়—সাধকের সাধন-শয্যায় নিশ্চিন্তে শায়িত ছায়া পুরুষ, উহাকে তীব্র গঞ্জনায় ও লাঞ্ছনায় গৃহ চ্যুত করিলেও, দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়াও রহিয়া রহিয়া অট্ট বিদ্রূপহাস্য

ও কুটিল ভ্রূভঙ্গ পূর্ব্বক ভীতি প্রদর্শনে সে কিছুতেই বিব্রত হয় না—সাধককে তখন মাতৃমন্ত্রে উদাত্ত কণ্ঠ ভরিয়া চিদাকাশ মাতৃনামে মুখরিত করিয়া তুলিতে হয়—মা'ই কালীরূপা রক্ষা-মূর্ত্তি প্রকাশ, কখনও দিগম্বরী চিন্ময়ী দশভুজাবেশে দশভুজে সাধককে সঙ্কট মুক্ত করেন—মায়ের বিদ্যুৎ পরশেই প্রাণপুরুষ পরম নির্ম্মলতা-প্রাপ্ত ও চির নিঃশঙ্ক হইয়া উঠে। শুদ্ধ প্রাণেই বিদ্যুল্লতিকাবৎ কুণ্ডলিনী মহাশক্তি প্রদীপ্ত হইয়া চক্রে চক্রে আরোহণ পূর্ব্বক সাধককে নব-রাজ্যে উত্তোলন করিয়া দেয়। তখনই আমরা পাই দেবদৃষ্টি, সত্য নাম ও রূপ লাভ করি, হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাদ্দর্শনে পরমতৃপ্ত ও মিত্রভাবে প্রভুভাবে তাঁহার নিবিড় আলিঙ্গন পরশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনু প্রাণ মন প্রাপ্ত হই—যেখানে তাঁহারই লীলা পূর্ণাংশে জগন্মঙ্গল লীলাচ্ছন্দে নিত্য সম্পাদিত হইতে আর কোন কুণ্ঠা কোথাও একেবারেই রয় না।

একটা নূতন ভিত্তির উপরেই আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনকে উত্তোলন করিতে হইবে। আত্মসমর্পণ যোগ পুনর্জ্জীবন যেমন অপূর্ব্ব ও বিচিত্র শিল্পে শোধন করিয়া তুলিয়াছে, উৎসর্গের পবিত্র ও উজ্জ্বল মহিমা-মন্ত্রে হৃদয়-মর্ম্ম দিনে দিনে প্রেমমধুর মিলননিষ্ঠ, স্বচ্ছ সুন্দর অথচ মঙ্গলমিশ্র ভাবমাধুর্য্যে ভরপুর হইয়া উঠিতেছে, উহাকে কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া জগদাদর্শ এক প্রফুল্ল জীবন ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান দলে দলে বিকাশ লাভ করিতেছে, তেমনি আজ বর্ত্তমানের এই ভাব ও কর্ম্ম, মিলন ও রসমাধুর্য্য অটুট রাখিয়া অভিনব শান্তি ও আলো ঢালিয়া এই সকলকে উপরের জ্যোতিঃ-লোকে উত্থাপন ও আয়ত্ত করিয়া ধরিতে হইবে। ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির মিলনে শুধু নয়, অখণ্ড আত্মার প্রকাশোদ্যমে যে সংঘজীবন, উহারই অধ্যাত্মবীজটিকে সমূলে উপরের ক্ষেত্রে টানিয়া তুলিয়া, নূতন চৈতন্যে এইবার উহাকে সম্পূর্ণতা দান করিতে হইবে। এই সম্পূর্ণতার জন্যই সিদ্ধ অভিষেক চাই—বিজ্ঞান এই সিদ্ধিরহস্য উপরের ক্ষেত্রে সংগুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তপস্যার অভিঘাতে উহার হিরণ্ময় দুয়ারটি খুলিয়া গিয়া যখন দরবিগলিত ধারায় আলো ও শান্তি উৎসারিত হইয়া সমস্ত আধার পদ্মগুলিকে জ্যোতিঃ-স্নাত ও আপাদমস্তক শান্তিশীতল করিয়া তোলে, তখনই বুঝিতে হইবে নূতন জীবনের সূচনা হইল, বিজ্ঞানময় যে সিদ্ধ অধ্যাত্ম জীবন, তাহার প্রকাশ এই মানুষ তনুর মধ্যেই পূর্ণ হইবে, কিন্তু তাহার জন্য চাই এই আত্মানসিক দীক্ষা—অতিমানুষত্বের অভিষেকহেতু আমরা অখণ্ড সংঘমানুষটির সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার পাইব

অতিমানুষ তোমার আমারই নিগূঢ় পূর্ণরূপটি—সে কিম্ভূত কিমাকার কিছু নয়, বিরূপ ঘুচাইয়া, সুরূপ ও স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তুলিবার যে উৎকৃষ্ট বিধি, সেইটুকু জানিলেই এ সকল সংশয় ও গোল চিরদিনের তরে মিটিয়া যায়, অখণ্ড আত্মা অরূপ নয়, সে অনন্ত রূপ, অনন্তেরও মূর্ত্তি আছে, নাম আছে, অনন্ত নাম শক্তি, অনন্ত রূপমূর্ত্তি লইয়াই শ্রীভগবান জগন্মণ্ডল সুপ্রকাশ করিয়া তুলিয়াছেন, মায়াদৃষ্টি অখণ্ডে খণ্ড, সত্যে মিথ্যাচ্ছবি সাজাইয়া ধরে বলিয়াই ত যত গণ্ডগোলের উৎপত্তি, মায়া ত নামে রূপে নাই, সে মায়া দৈবী মায়া, ভাগবত তপঃশক্তি, সৃষ্টি যে ভাগবত সত্তাই অন্য এক অপরা মায়া এই সত্য সৃষ্টির উপরেই অনিত্যত্বের কালো কজ্জল মাখাইয়া দারুণ ভ্রান্তি উৎপাদন করে, মনই এই মায়ার কেন্দ্রশক্তি, মনকে উপকরণ করিয়া এ দুঃখ ও দ্বন্দ্ব সকল সংসার বন্ধনের বিভীষিকা, বিভীষিকা দূর হয়, যখন, মনের সীমা চক্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, এক অতিমানস অসীম দিগন্তহীন জ্যোতিঃ-সমুদ্রে ছিটকাইয়া গিয়া পড়ি, যেখানে কেবল আলো আর আলো, মুক্তি আর শান্তি, সেই ত সত্যের নিজস্ব রাজ্য, দেবভূমি, যেখানে দেবতারা

আপনাকে স্থির ঐক্যে ও অটুট মহিমায় অথচ অসংখ্য রূপে নামে খুঁজিয়া লইয়াছে, মিলন যেখানে শুধু আর প্রেম-নিষ্ঠায় নয়, আনন্দের স্বচ্ছন্দ লীলাচ্ছন্দে উচ্ছল তাহার আনন্ত্য ফিরিয়া পাইয়াছে— দিকে দিকে জ্যোতিষ্মান্ দেবতারাই দিকপালরূপে ভাগবত শক্তি ধারণ পূর্ব্বক বিচিত্র ক্ষেত্রে বিশ্বরক্ষা ও শাসন করিতেছে—মানুষ এই দেবপতিগণের সহিতই এখানে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া নূতন চৈতন্যে ও ধর্ম্মে ফুটিয়া উঠে— এমনই দিব্য বিভূতিমান মানুষকেই আমরা অতিমানুষ বলি— আত্মায় যে দেবলোকেই সত্য করিয়া তুলিয়াছে, শরীরে উহারই স্বারূপ্য মানুষী গণ্ডীর মধ্যেও যাহার দিনে দিনে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছে।

অপর, মায়ার বিচিত্র ছলনা—প্রাণের মূলে যেমন মন, মনেরও মূলকেন্দ্রে তেমনি অহঙ্কার, অহংকারেই সকল বন্ধনের উৎপত্তি, মুক্তিরও সন্ধান অহং-ত্যাগ করিয়াই পাইতে হয়, উপায়—হৃদয়ে যে দেবতা আলোক সত্তে সমুজ্জ্বল হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ আত্মসংযোগ, দেবতা স্বয়ং অহংকারের ঘনগ্রন্থী উচ্ছেদ করেন, আলো ও শান্তির মধ্যে তাঁহার যে অবতরণ, সে উপরের সত্যে তুলিয়া নীচেরও পৃথ্বী মুষ্ঠান, নাভি, লিঙ্গ, গুহ্যে চৈতন্য যতক্ষণ বন্দীদশায় পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ মুক্তির কথা বৃথা আশা মরীচিকা বই আর কিছু নয়, দেবতার দর্শন ও স্পর্শন উদ্ধারও শুদ্ধ মনবুদ্ধিরই অধিকারগত, চিত্তাকাশ শান্ত ও নিষ্কম্প, স্বচ্ছ ও নিথর হইলেই, উহাতেই চিদাকাশের নির্ম্মল নীলপট ভাসমান হইয়া উঠে, সেই স্থির নীলপটে নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বলকান্তি কত অপরূপ দেবমূর্ত্তি, কত লোক লোকান্তরের স্বপ্ন প্রতিফলিত হইয়া উঠে, কখনও বা অমিয় নিছানি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সত্তা পুঞ্জে পুঞ্জে জমিয়া জমিয়া মণ্ডলে মণ্ডলে টলটল চলচল করিতে আরম্ভ হয়, মনে হয় বুঝি এইবার এই স্বপ্ন জ্যোতির্ম্মণ্ডল ধরিয়া স্বর্গীয় পথে একেবারে সরাসরি উপরে উঠিয়া চলিয়া যাই, ধরি ধরি করিতে করিতে আবার পিছলাইয়া নামিয়া পড়িতে হয়, এমনি কত উঠা নামা, আলোক-সমুদ্রে কত ভাসা ও ডুবি করিতে করিতেই নব অধ্যাত্ম জীবনের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা, আলোকের মধ্যে একেবারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হইলে এ অবস্থা দৃঢ় ও অচলা ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে বলা নিরাপদ নহে—সত্যভূমিতে পূর্ণপ্রতিষ্ঠ হইলে মায়ার, অহংকারের সকল ছল ছলনা চিরতরে নিবৃত্ত ও দিব্য জীবন তখন নিঃশঙ্ক ও স্বতঃ প্রকাশময় হইয়া উঠে।

অতিমানুষ দেবতারই রূপ—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয় লইয়াই দেবতার লীলা, দেবতারা জ্যোতিঃ'র সন্তান, জ্যোতির্ম্ময় তনু, জ্যোতিঃই তাঁহাদের মূল ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য তাঁহাদের হৃদয়-ধর্ম্ম, মাধুর্য্য আনন্দেরই দোহিত রস নির্য্যাস, এই রসই সোমসুধা, দেবজাতি সোমপান করিয়াই অমৃতত্বে অধিকারী, মানুষরূপ যখন আপনাকে অতিক্রম করিয়া তাহার বীজ-ভূত এই দেব-রূপে রূপান্তর পায়, তখনই সে এই দিব্য ঐশ্বর্য্য ও দিব্য মাধুর্য্যের বিভূতি ও ভোগাধিকার অর্জ্জন করে, অমৃতত্ব দুর্ল্লভ সামগ্রী হইলেও, উহাই মানুষের জন্ম-সম্পত্তি, এই কামজন্ম ত মানুষের আসল জন্ম নয়, এই স্থূল রক্তমাংস পিণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া যে জীব রূপান্তর পূর্ব্বক অবতীর্ণ হয়, সে কামজীব নয়, প্রাণজীব নয়,—মনঃজীব, অহং-জীবও আসলে নহে—মানুষও যে আলোর'ই সন্তান, আলো'র মধ্যে যে স্বর্ণবর্ণ হিরণ-মূর্ত্তি জ্যোতিঃ-জীব সব আছে, মানুষ উহাদেরই এক এক-জন, সেথায় সেই সুবর্ণলোকে মানুষের সত্যময় তনু সব থরে থরে সুরক্ষিত আছে, উহারই একটা একটা মায়া মূর্ত্তি, ভাবচ্ছবি অন্তঃকিরণ নির্গত হইয়া তরঙ্গ হইতে তরঙ্গীকৃত হইতে হইতে পরিশেষে এই স্থূলে ছায়াপাত করিয়াছে—স্থূল ত স্থূল নয়, সত্যের মধ্যে যে অপার্থিব নিরেট জমাটত্ব, যে জ্যোতিঃ-ঘন অটল

সৌন্দর্য্য ও নিটোল অঙ্গমাধুরী, তাহার কিছুই এখানে ফলিয়া উঠে নাই, সত্যের চুর্ণীকৃত কণিকাটুকু গলাইয়া গলাইয়াই মানুষের এই মর্ত্ত্য-মূর্ত্তির গঠন ও সৌষ্ঠব, এখানে যাহার খণ্ড ও বিকৃত ছাঁচ, তাহার খাঁটি ও অখণ্ড পূর্ণমূর্ত্তি যাহাতে, সে বস্তু কত অনবদ্য সুন্দর, মহাবীর্য্যশালী, অনন্ত মহত্ত্বে বিরাট ও সর্ব্বগুণ সামর্থ্যে শক্তিমান! অতিমানুষ এই মহামানুষ—অহং-কার ও কামের মন্থনে তাহার জন্ম একেবারেই হইবার নয়।

নূতন নর নারীকে এই অতিমানুষের জন্মদান করিতে হইবে। কোথায় সে মহান্ পুরুষ, সেই মহা-নারী—যাঁহারা হইবেন আমার দেব-পিতা আমার মহা-মাতা—আমি যে আজ সারা সংসার পাঁতি পাঁতি চুঁড়িয়া বিশ্বদর্পণে তাঁহাদেরই অন্বেষণ করিতেছি! হরগৌরীর মত বিভূতিমণ্ডিত গৃহপতি ও ঘরণীর গর্ভেই আমায় নবজন্ম লইতে হইবে—দেবতার আদেশে আমায় যে শিরোধার্য্য করিতে হইয়াছে অতিমানুষের অতিমানুষিক দীক্ষাই—আমার মহাজন্ম চাই মহানারীর ক্ষেত্রে, মহা-শিবের ঔরসে—দিব্য অমৃতত্বের বীজে—যে কাম ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ আনন্দের সে অপরূপ ভোগ মন্থনেই আমার ভোগতনু রচিয়া দেওয়া চাই। সে দিবে কাহারা? আবার সারা মানবমণ্ডলকে আহ্বানপূর্ব্বক বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি—কোন্ জগন্ময়ী শক্তিরূপা মহানারী, কোন্ মহাশক্তিধর দেব-পুরুষ মর্ত্ত্যের রূপে রসে লীলায় রাগে আমার অতিমানুষী ভাগবত তনুকে এই ভাগবত আনন্দ মন্থনে মাটির বুকেও জন্মদান করিতে পারিবে? আগাইয়া আইস তাহারা—আমার জন্মদীক্ষা পরিপূর্ণ করিবার মহাব্রত গ্রহণ কর।

ভাষা স্তব্ধ হউক—মানুষের কুণ্ঠিত ভাষায় আজিও যে অতিমানুষ অনভিব্যক্ত, তাহাকে ব্যক্ত করা যাইবে না। অতিমানুষকে নবীন জন্ম লইয়াই মর্ত্ত্যে আত্ম-সত্তা অব্যর্থ প্রমাণে প্রতিপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। সে মানুষ যে রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, ভাবে সুন্দর, কর্ম্মে সুন্দর, ভোগে সুন্দর, সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বতো-সুন্দর—সে যে দেবজাতিরই জাগ্রত বংশধর। চিন্তায় সে হিমগিরির মত সমুচ্চ মহিমাবান্, হৃদয়ে তার অনন্ত মাধুর্য্য, ক্ষুদ্র ও সকুণ্ঠ প্রেম করুণা সেথায় নাই—কিন্তু আছে সর্ব্বগত আত্ম-সত্তার উদার ও অমায়িক, ব্যাপক ও গাঢ়-গভীর রস-পাথার। অনন্ত ভোগ বিলাসের জন্যই তার মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ—অনন্ত রূপ, অনন্ত যৌবন, অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্যেই তার নিলয় সঞ্চরণ—জগৎকে ভোগময় উল্লাসময় আনন্দময় করিবার জন্যই তার বিগ্রহমূর্ত্তি,—অমৃতত্বে তাহার আদ্যন্ত প্রতিষ্ঠা, গঠন, অমৃতত্বে তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধি, অমৃতত্বে তাহার রূপে রূপে নিত্য রূপান্তর। এই অতিমানুষই মর্ত্ত্য-ভূমে জন্ম লইবে—নূতন মনপ্রাণ, নূতন ইন্দ্রিয় তন্মাত্রা, নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্তমাংস সৃজন করিবেন তাহার জন্য চিহ্নিত মাতা, চিহ্নিত পিতা,—নূতন বীর্য্য শোণিতে তাহাকে গড়িয়া তুলিবেন তাঁহারা, নূতন রাসায়নিক সংমিশ্রণে—নব বাক্ ফুটাইয়া নবজাত দেব-মানব শিশু মুক্ত জগতে যখন নিজে আত্মঘোষণা করিবে—তখনই পাইব অতিমানুষের যথার্থ ও নিরুপম পূর্ণ প্রতিমা—মানব ভাষায় ত তাহার স্বরূপ বিবরণ কুলাইবেও না।

এস মানুষ—সকল ক্ষুদ্র সংস্কার, তুচ্ছ ভোগ, স্বার্থ সংশয় ধুলায় লুটাইয়া এই অতিমানব জন্মের কথা শ্বাসে শ্বাসে সত্তা দিয়া টানিয়া লও—সত্তার মধ্যে উহা গ্রহণ কর। অতিমানুষিক দীক্ষা অতিমানস ভূমিতে উঠিয়াই সার্থক হইবে—অতিমানুষ যেমন আমারই উপরে, আমারই মধ্যে, না, আমারই স্বরূপে, অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া ছাইয়া আছেন, তাহার সেই গোপন অজ্ঞাতবাস তপস্তাপে নিরাবরণ করিয়া দিতে হইবে—উলঙ্গ জ্যোতিঃ-মূর্ত্তি লইয়া সে অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসুক—এই জড় দিবালোকে তাহার দিব্য

অন্তর্লোক বিলসিত উল্লসিত হউক—সাত্ত্বিকতে, সোমে, স্তোমে, দিনে দিনে তাহার অঙ্গপুষ্টি হউক—উপরে উঠিয়া, উপরের ব্রহ্ম কেন্দ্র হইতেই জ্ঞানঘন নূতন চিন্ময় তনু দিব্য নামে রূপে ভূষিত সমৃদ্ধ, দিব্য ভোগে ও লীলায় তৃপ্ত ও কৃতার্থ হউক। সঙ্ঘের মধ্যে মুষ্টিমেয়, মুষ্টিমেয়ের মধ্যে দুইটি চারিটি, তাহারও মধ্যে আবার একটী মহানর, একটী মহানারী—হয়ত এমনি করিয়া একটী মানব মিথুনের একটী দিব্যশিশুর জন্মদান সামর্থ্য ফুটিয়া উঠিবে—সে হউক—একটী যুগদম্পতি একটীই বীজরক্ষা করিতে পারিলেই দেবজাতির বংশরক্ষা হইবে—মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ সিদ্ধ সৃষ্টির মূল অক্ষুণ্ণ রহিয়া যাইবে—আদি মানুষের মত একটী শিশুই আবার অঙ্গবিভাগে নবীন যুগল সৃষ্টি করিবে—প্রলয়ান্তে নব যুগজগৎ নির্ম্মাণ ও পালন করিবে। প্রলয়ই আসিতেছে—জড় প্রলয় নয়, অন্তর প্রলয়—মানুষ, মহাদীক্ষা গ্রহণে অনন্তকোটী হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ একনিষ্ঠ করিয়া, কোথায় জানি না, কোন্ যোগ্য বীজে যোগ্য ক্ষেত্রে তাহাও অবগত নহি—অজ্ঞাত যুগ শিশুকে গর্ভস্থ হইতে অনুমোদন কর—অতিমানুষই গর্ভমুক্ত হইয়া ভবিষ্যৎ যুগ রক্ষা করিবে।

শিক্ষার কথা

আমেরিকা

(৩)

শিক্ষক সৃষ্টি—আমেরিকার লোকে সৃজন শিল্পশিক্ষার গুণাবলী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করলেও এই কর্ম্মকে ব্যবসায়-শিক্ষার স্তরে (Vocational Training) আনতে কর্‌তে একেবারেই নারাজ। তাদের মতে সৃজন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে "রূপস্" মানুষের জীবনে ফুটে উঠে। প্রকৃতি—বিজ্ঞান বা অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চার মত এটাও একটা সাধনা।

কেমন সুন্দর একটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ভাবটাকে রূপ দেওয়া হয়, আমাদের কাছে এটা এক রকম আশ্চর্য্যেরই কথা। প্রথমে ছেলেরা শিক্ষকের সঙ্গে জিনিষটার নিজ আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করে। তা' থেকেই জিনিষটার মাপজোপ, উপাদান, নক্সা সব বেরিয়ে পড়ে। জিনিষটার আবশ্যকতা, গঠন, পরিমাপ, উপাদান এই গুলোর মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সৃজনশিল্পের ভিতরের কথা। এ সম্বন্ধে জানাটা খুব স্পষ্টই হওয়া চাই। গঠনপ্রণালীটার একটা সুচিন্তিত চিত্র সামনে আগ্ দাগ্ না করলে নির্ম্মাণের সময় বার বার অগ্রসর হয়ে বার বার ফিরে আসতেই হবে। বিশেষ শিক্ষার দ্বারাই শিক্ষকদের এই রকম করে, চিন্তায় মূর্ত্তিকে বশীভূত করে, রূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠে। নিম্নের উদাহরণটা দেখলেই এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হবে :—

ধর একটা চেয়ার তৈরী করতে হবে। এটা সপ্তম বা অষ্টম বার্ষিক শ্রেণীর, চতুর্দ্দশ হইতে একাদশ বয়স্ক বালকদিগের জন্য। পাঠটী এই রকম করে আরম্ভ হয়—প্রথম, জিনিষটীকে পরিদর্শন করে' তার আবশ্যকতা সম্বন্ধে চর্চ্চা ; চেয়ারটীর কিরূপ ভাবে এবং কি জন্য ব্যবহার হবে, তা থেকেই এসে পড়ে

তার রূপ, সেটা উপবিষ্ট একটা মানুষের মতনই হওয়া চাই। রূপের পর বিভিন্ন অংশ তার পরিমাণ—'পায়া' কিরূপ হবে, পিছন ও সম্মুখের পায়ে কোন তফাৎ থাকবে কি না, যদি তফাৎ থাকে, কোনটা কিরূপ হওয়া দরকার, পায়াগুলি সোজা, বাঁকা, বা সকোণ (Angular) হবে এবং কত মোটা হওয়া উচিত, সামনের 'পাটা' কত চওড়া, পিছনের 'পাটা' কত চওড়া; সামনের 'পাটার' উপর শরীরের কোন অংশের ভর পড়বে, পিছনের পাটার' উপর কোন্ অংশের ভর পড়বে, বসবার সময় শরীর যে ভাবে থাকে সেই অনুসারে এই উভয় 'পাটার' মধ্যে কোন তফাৎ আবশ্যক হয় কি না, সিটটা (Seat) কিসের দ্বারা নির্ম্মিত হবে, কোন্ জিনিষে কত দর পড়ে বা বেশী কম আরাম হয়, 'থাড়ী' কত লম্বা, কত চওড়া হওয়া চাই— তার আকৃতিটাই বা কিরূপ হওয়া চাই, শরীরের যে অংশ থাড়ীর উপর থাকবে তাহার আকৃতিটাই বা কিরূপ। তার পর হাত রাখবার, ঘুরিবার ফিরিবার কোন সুবিধা করা যায় কি না, কোন্ কোন্ স্থানে অংশগুলিকে যুক্ত করতে হবে, কত সহজে এই সকল সুবিধারই সমাবেশ করা সম্ভব, যদি কোন কারুকার্য্য করা হয় সেটা পিছনে বা সম্মুখে কোন দিকে করা হবে, ইত্যাদি বিষয়ের পর্য্যালোচন এইভাবে চলতে থাকে। এই সকল data থেকে একটা নক্সা প্রস্তুত হলে সে নক্সা দেখেই সব কর্ম্ম সমাধান করতে সকলে এগিয়ে পড়ে। এই রকম করেই চিন্তা, বিচার বিবেচনা দিয়ে জিনিষ গুলোর মনোমত রূপকে খুঁজে বার করা হয়।

আমেরিকার লোকেরা কর্ম্ম শিক্ষাকে একেবারেই সাধারণ শিক্ষায় মূল্যবিহীন (Sans valeur educative) বলে মনে করে। যে কর্ম্মের অন্তর রূপটা, (মনোবিজ্ঞান) ছাত্রের কাছে উপলব্ধ হয় নি, সেটা করাতে কোন ব্যবসায় শিক্ষার সহায়তা হতে পারে, কিন্তু মানসিক শক্তি বিকাশের পক্ষে নিত্য পরিবর্ত্তনহীন কর্ম্ম একেবারেই অনুপযুক্ত। এইখানেই সৃজন শিল্পের অভিনব সার্থকতা। এই রকম করে কর্ম্ম সূত্র খুলতে খুলতে একেবারে তর্কের মধ্যে দিয়েই জিনিষটাকে মস্ত করে ধরা যায়। ছেলেকে সাবধানে চতুর্দ্দিক ভেবে জিনিষটা ধারণা করতে হয়, কি জন্য কি করা হচ্ছে সেটা অনুধাবন করতে হয়, আর কেবলই দেখতে হয় কেমন করে সহজে কাজটা হাসিল করবে। এ রকম শিক্ষা দিতে হলে কি রকম অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের দরকার— তাহা সহজেই বোধগম্য। দু একবৎসর 'নরম্যাল' স্কুল বা কর্ম্মশালায় কাজ করে এলেই সৃজন শিল্প শেখান যায় না। হৃদয় মন থেকে হাত পা পর্য্যন্ত সর্ব্বদিকেই একটা জীবন্ত প্রতিভা ফুটে বেরোনো চাই। এই সৃজন শিল্পটাকে শেখাবার জন্যে সারা আমেরিকাব্যাপী শিক্ষকদের শিক্ষালয় খোলা হয়েছে।

মাধ্য শিক্ষা (১৪ হইতে ১৮)।

আমেরিকার বিদ্যালয়ে মাধ্য শিক্ষার মধ্যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট শিক্ষার মাঝের ভেদ রেখাটা মিলিয়ে গেছে। মাধ্য শিক্ষার এই সমস্যা ইউরোপেরই মত আমেরিকারও দুর্মীমাংস্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেশের পুরাকালের হাই-স্কুলের পরিবর্ত্তে তারা এমন মাধ্য বিদ্যালয় গঠন করেছে, যেখান থেকে এককালে বাস্তব জীবনের কার্য্যকর্ম্মের ও উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান সকল দেশেই এই সমস্যা এসেছে, কেমন করে একান্ত আবশ্যকীয় সাধারণ-শিক্ষার (General culture) সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা-উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

একসঙ্গে, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার এবং কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করবার শিক্ষা দুটোকে সম্ভব

করে তোলবার জন্যে বিষয় তালিকাটাকে যথেষ্ট প্রসারতা দেওয়া হয়েছে। হাজার রকমের বিষয় তাতে যোগ করা হয়েছে—যেমন, 'এস্কাইল' (Eschyle) থেকে খাতারাখা ও কারখানায় শিক্ষানবিসী করা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নি। এই রকম একটা খিচুড়ীর মধ্য থেকে মোটা মুটী তিনটা ভাগ (course) বেরিয়েছে।—১ম। গ্রীক লাতিন বিভাগ, ২য়। লাতিন বিভাগ। ৩য়।—বিজ্ঞান বিভাগ। কিন্তু এই সকল শিক্ষার বিষয়গুলো একটা নিয়মের বন্ধ দিয়ে ছাত্রদের স্কন্ধে বেঁধে দেওয়া হয় না। ছাত্রেরা স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েই এগুলো পছন্দ করে নেয়। সত্যই এখানকার বিদ্যালয়ের বিষয় তালিকাটা একটা কাট ছাঁট 'বিভাগে' (section) ভাগ করা নয়। খুব গুটীকত বিষয় নিয়ে একটী "শিক্ষাবীজ" তৈরি করা হয় যেটাকে সকলকেই গ্রহণ করতে হবে, তারপর যেটাকে পূর্ণ করবার জন্যে অনেকগুলো বিশিষ্ট বিষয় স্বাধীনভাবে পছন্দ করে নেওয়া হয়—যথা, ইংরাজী তিন বৎসর, অঙ্ক দুই বৎসর, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, আধুনিক ভাষা ইত্যাদি।

কোন কোন বিদ্যালয়ে শতকরা সত্তর ঘণ্টা এই স্বেচ্ছা-নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির পাঠে নিয়োগ করা হয়,—কোথাও বা শতকরা চল্লিশ ঘণ্টা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, লাতিন পড়ায় ছাত্র সংখ্যা চিরদিন একই আছে।

সৃজন-শিল্পটা মাধ্য বিদ্যালয়কেও আক্রমণ করেছে। 'বস্টনে' বিশেষ শিক্ষার মধ্যে এটার নাম আছে, আর ছেলেরা সকল স্তরের শিক্ষায় এই বিষয়-টার চর্চ্চা করে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এটা তাদের এত আনন্দ হয় যে তারা অধিকাংশই এইটা পছন্দ করে নেয়। মেয়েরা রান্না, "ড্রেসান" ও, অন্যান্য গৃহকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। ছেলেরা সেই সময় কারখানায় কাজ করে। এই-খান ছাড়া ছেলে মেয়ে সকলের শিক্ষাটাই সমান। মাধ্য টেক্‌নিক্যাল স্কুলেও কাটাছাঁটা কোন ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখানেও যা শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা সকলেই গ্রহণ করতে পারে; সকল রকম জীবনের শিক্ষার প্রারম্ভই এখানে হওয়া সম্ভব। এখানে যে কোন একটা বিষয়, ধর, জ্যামিতি, কিরূপে শেখান হয় তা দেখলেই এটা বুঝতে পারা যাবে। জ্যামিতি ত বই পড়ে বা শিক্ষকের মুখের কথা শুনে বোঝা যায় না, তাই এই শিক্ষাটাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে স্বাধীন কর্ম্মের দরকার, সে কর্ম্মটা আবার চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই এবং হৃদয় ও দেহের পরিপোষক যথেষ্ট উপাদানও সেই কর্ম্মের মধ্যে লাভ করতে হবে। আমেরিকার জ্যামিতিটা পড়িয়ে, সেই মূর্ত্তীভূত সৃজন শক্তিটারই পরিস্ফুরণ করা হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য। জ্যামিতির বস্তুতন্ত্র অংশ (materials) গুলো simple, concrete, এবং তা' দিয়ে অসংখ্য 'নক্সা' করা যায়। (Elementary) প্রাথমিক জ্যামিতি শিক্ষার মধ্যে প্রমাণাদি করবার সাধারণ কোন নিয়ম নাই। প্রত্যেক প্রতিপাদ্যটাকে, অন্যগুলি হইতে ভিন্ন, একটা অভিনব উপায়েই সপ্রমাণিত করতে হবে। এই নব নব প্রমাণ করবার যারা বার করা, অঙ্কে Differential বা Integral calculus'এর কয়েকটা সাধারণ নিয়মের ব্যবহার অপেক্ষা বুদ্ধির অনেক বেশী শক্ত 'কসরং'।

* Plane Geometryশিক্ষাটা আমাদের বিদ্যা-লয়ের পদ্ধতিটারই মত। কিন্তু Solid Geometry শিক্ষার সময় আমেরিকানরা Intution'-টার এত ব্যবহার করে যে এখানে আমাদের সকলেরই অনেক কিছু শিক্ষা করবার আছে। Solid Geometry' ত খড়ি দিয়ে এঁকে বা উঁচু নীচু (relief) করে তৈরি করা যাবে না, তাই একটু জোরের দিয়ে মজুর একটা শক্তির সাহায্য নিতে হয়। বস্তুতন্ত্র লাইন, তল (plane), transparent circular

disc ও কাঠের figure এই সব দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টাকে 'খাড়া' করা হয়, তার পর ছাত্র theoretical demonstration করবার আগে প্রতিপাদ্য বা উপপাদ্য বিষয়টার সবটাকে Intuition দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে। আর এই প্রচেষ্টার শেষে কি রকম করে বিষয়টাকে প্রতিপন্ন করতে হবে তা জানতেও তার বেশী বাকী থাকে না।

(মঃ বুলীন ফরাসী হইতে)

আমার স্বপ্ন

—:০:—

আমরা সচরাচর যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি, যে সকল চিরপরিচিত বাক্যে সতত আমাদের মনোভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যেই যে কত গভীর অর্থ নিহিত হইতে পারে তাহা সকল সময়ে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। (বুঝিবার সময় না হইলে কোন জিনিষই বুঝা যায় না।) বহুদিন হইতে পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে সকল বাক্যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন, শব্দ-সমষ্টিরূপে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যে জিনিষ, আর সত্তা সত্তা মাখাইয়া বাক্য ও শব্দের ধারায় আপন অন্তরের যে শাশ্বতরূপটী জগতে সাজাইয়া ধরেন, তাহাকে অন্তরের দৃষ্টি দিয়া দেখা নিশ্চয়ই আর এক জিনিষ হইবে।

এ যে আর এক জিনিষ, তাহা আমরা তখনই বুঝি যখন বাক্শ্রবণান্তর আমাদের চিরপরিচিত ভাবরূপ দর্শনের আশা একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়া, বাক্য ভেদ করিয়া ও বাক্যমধ্যস্থ শব্দসমষ্টির ঝঙ্কারকে স্তব্ধ করিয়া একটী নূতন রূপ আমাদের অন্তঃকরণে ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া উঠে। কখনও বা বিদ্যুৎবেগেই তাহা হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে। এই বিদ্যুৎবরণী ও বিদ্যুৎশক্তিসঞ্চারিণী নব ভাব-প্রতিমার হর্ষোল্লাস গতিকাশ্য ভাষায় ব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব, তথাপি অনেক কবিই ভাষার নিকট তাঁহার স্মৃতির স্বীকৃতিটুকু নিবেদন করিয়া থাকেন।

আমি সেরূপ স্পর্দ্ধা লইয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইব না, তদ্ভিন্ন আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, যে বাক্য আমি বহুবার উচ্চারণ করিয়াছি —কতবারই না আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, যে, "জাতির সত্তা তোমার ভিতর জাগিয়া না উঠিলে স্বদেশ সেবার বিপুল আয়োজন সফল হইবে না—" সেই বাক্যটাই সেদিন যখন শুনিলাম তখন আমি একেবারেই বিচলিত হইয়া পড়িলাম। একটা একান্ত অজানা সত্তা লাফাইয়া লাফাইয়া এরূপ বিপুল কাণ্ডে আমাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল, যে আমি ক্ষণেকের নিমিত্ত জ্ঞানই হারাইয়া বসি। জাতির সত্তা জাগাইবার বার্ত্তা বহন করিয়া করিয়া আমি যে কিম্ভূতকার হইয়াছিলাম তাহা আমার জানা থাকে নাই—ঐ নূতন সত্তা হেলিয়া দুলিয়া কত শুষ্ক কাঠের বোঝা যে আমার ভিতর ফেলিয়া ছিল তাহার গণনা নাই। কিন্তু একটা বিকট চীৎকারে যখন তিনি তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে ধু ধু আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন আমি একেবারেই বিহ্বল। একান্ত ধ্যানী বুদ্ধের ন্যায় তিনি অগ্নিকুণ্ডে বসিয়া রহিলেন, আর

কাঠগুলা জ্বলিয়া জ্বলিয়া কত কি যে চিত্র আঁকিতে লাগিল তাহা কি বর্ণনা করা যায়।

শেষে হৃদয় জুড়িয়া এক অভিনব বেশ—তিনি মধ্যে ঠাকুরটী হইয়া বসিয়া আছেন, একটী মস্ত চাল-চিত্র তাঁর মাথার উপরে, সব গুলি চিত্রই উজ্জ্বল আভায় ছটা বিলাইয়া সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে—এ সময়ে বিহ্বলতা একটা মধুর বিস্মৃতিতে যেমনই আমাকে ঢলাইয়া দিল, অমনি বীরদর্পে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ আমার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এক্ষণে আমি সেই ঠাকুরটী—দূরে শ্রীঅরবিন্দের ছায়ামূর্ত্তি, আমাদের পরিচিত সু-অবয়ব নধরকান্তি কুঞ্চিত ও চিকণচিকুর রবীন্দ্রনাথ, আর এই রবীন্দ্রনাথে কি ভীষণ পার্থক্য। একটা আগুনের শিখা ধীরে ধীরে হিমালয় সদৃশ কাষ্ঠের স্তূপ জ্বালাইয়া সমস্ত স্তূপটা বেড়িয়া যখন তালে তালে গম্ভীরে রক্তচক্ষু অর্দ্ধ বিস্ফারিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ অধর ও ওষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া ঈষৎ চিবুক ঠেলাইতে লাগিলেন, আর দূরে অরবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া কুঞ্চিত ভ্রূ আরও কুঞ্চনের দ্বারা রক্ত অধরোষ্ঠ আরও সংযুক্ত করিয়া বঙ্কিম চিবুক হঠাৎ দীর্ঘে বিস্তৃত করিয়া নিমেষে সর্ব্বাঙ্গে যেরূপে কালি মাখাইয়া ফেলিলেন, দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ কুঞ্চিত চিকুর জটা ফুলাইয়া যেরূপে দুলিতে লাগিল, নধর দেহসমুদ্র হইতে শিরাবলী জাগিয়া জাগিয়া যেরূপে দেহসমুদ্র আচ্ছন্ন করিয়া বসিল, তাহা দেখিয়া একবার আমার পুরাতন শরীর জাগিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গে একটা কম্পন যেন বিধিয়া দিতেছে, ভয়ের কাঁটা বোধ হয় অগ্রে কখন শরীর বিদ্ধ করে নাই, আজ তাহা হইয়া গেল। থাক আবার বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে বিলীন হইলাম। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ উজ্জ্বলমধুর দৃশ্যে মনোহরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীঅরবিন্দের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে "স্বদেশের বাণীমূর্ত্তি তুমি" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি চালচিত্রে স্থান অধিকার করিলেন। অরবিন্দ কোথায় চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে আমি একবার আমার পুরাতন শরীর গ্রহণ করিলাম, আমার পুরাতন বোধ লইয়াই দেখি আমি কিছু নূতন নূতন, একেবারে স্থির—ভীতি চাঞ্চল্য বিহ্বলতা এ সকলকে অতিক্রম করিয়া আমি দাঁড়াইয়া আছি, সম্মুখে ধ্যানী বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি সুখাসীন, মধ্যে মধ্যে স্মিত হাস্যে বদন ঐ
এমন সময় দেখি চালচিত্র হইতে "নির্ব্বিন বোলর" টাঁর আকার ধারণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ধ্যানী মূর্ত্তির বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ বাহু বেড়িয়া আসিলেন। তদণ্ডেই উজ্জ্বল পুরুষ তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া বামদিকে স্থাপন করিলেন, আর তাঁহাকে দেখা গেল না। এই চিত্র দেখিয়া আমি গভীর রহস্যে নিমগ্ন হইলাম। রহস্য সমুদ্র হইতে আজও উঠিতে পারি নাই।

কিন্তু এ স্থানেও আবার নব নব চিত্রের সমাবেশ—এখানে আছি কেবল আমিই, উজ্জ্বল পুরুষ আমার সহিত রহস্য সমুদ্রে ডুবিলেন না। সমুদ্রের মধ্যে হিমালয় গিরিশ্রেণী অপেক্ষা সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণীর উপরে গৌরীশঙ্কর অপেক্ষা প্রায় সার্দ্ধগুণ উচ্চ শৃঙ্গ বিরাজ করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় সমগ্র গিরিশ্রেণী ও শৃঙ্গের উচ্চতম প্রদেশ আমার লক্ষ্যমধ্যে স্থান পাইয়াছিল। আমি সমুদ্রের উপরে শূন্যে দাঁড়াইয়াছিলাম, যথেচ্ছ থাকিবার আমার সুবিধা ছিল। পরিশেষে, দেখি গিরির শৃঙ্গটী পর্য্যন্ত লোকের বাসভূমিতে সুসজ্জিত, কিন্তু একটীও প্রাণী বিচরণ করিতেছে না, গৃহগুলিও জনমানবশূন্য বলিয়া অনুমিত হয়। গিরিশ্রেণী পূর্ব্ব ও পশ্চিমে লম্বমান। শৈলের পাদদেশ পর্য্যন্ত গভীর সমুদ্র। শৈলের পশ্চিম সীমার পর হইতে সমুদ্রের বর্ণ দুগ্ধফেননিভ, পূর্ব্ব সীমা হইতে বর্ণ কিছু পীত, আর মধ্যস্থলের পশ্চিম দিকে ধূসর এবং পূর্ব্বদিকে শ্যামকৃষ্ণ। উত্তর দিকের সমুদ্র আমার দৃষ্টির অগোচর।

এই বিচিত্র বর্ণের সমুদ্রের মধ্যে মনুষ্যবাসভূমিখচিত গিরিশ্রেণীর শোভা কিরূপ অপরূপ তাহা আমারই সম্পূর্ণ বোধগম্য হইতেছিল না। কেবল নিবিড় দৃষ্টি প্রয়োগে রহস্য শৈলের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দেখি, হঠাৎ একটী ক্ষুদ্র পানসী তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি প্রায় পশ্চিমদিকে চাহিয়াছিলাম, পানসী দেখিতে পাইলাম। পশ্চিম দিকের সাদা সমুদ্র তক্ তক্ চলাইয়া চলাইয়া—সমুদ্র নিস্তরঙ্গ এও বিচিত্র—ছোট্ট পানসীর গতি কি মনোহর! মাঝি নাই, মাল্লা নাই, আপন মনে পানসী জোরে চলিয়া আসিতেছে, শৈলের পশ্চিম প্রান্তের কিছু দূরে পানসীটী স্থির হইল। পানসীর মধ্যে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। কি সৌম্য মূর্ত্তি তাঁর, পক্ক শ্মশ্রু নাভি পর্য্যন্ত বিলম্বিত, পরণে আলখাল্লা, বর্ণ শ্বেতাভ গৌর, হেম চক্ষু ঈষৎ লোল, সুঠাম নাসার উপরে একটী চক্ষু জুড়িয়া একখণ্ড কাচ, কাচের সূতা নাভি পর্য্যন্ত [illegible] ছে। এ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি [illegible] দূর হইতে নমস্কার করিলাম। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম দৃষ্টি দিয়া আমার দিকে তাকাইলেন [illegible] পানসী হইতে অবতরণ করিলেন; আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করিয়া শ্বেত সমুদ্রে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যেই ধূসর সমুদ্রে আসিলেন, ঈষৎ দুলিতে লাগিলেন—শ্যামকৃষ্ণ সমুদ্রে আসিতে না আসিতেই নিমজ্জিত হইলেন। আমি বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময়ে অভি[illegible]ছি, এমন সময় আমার প্রকৃতি খুবই [illegible] আমি পূর্ব্ব দিকে চক্ষু বিস্তার করিলাম।

কি আশ্চর্য্য! আবার সেই পানসী—আবার সেইরূপ বেগে ঝড়ের ন্যায়ই ছুটিয়া আসিতেছিল। এবার কিন্তু একেবারে শৈলের প্রান্তভূমি স্পর্শ করিয়া পানসী দাঁড়াইল [illegible] অবতরণ করিলেন মহাত্মা গান্ধী—মহাত্মা গান্ধীর মস্তকে আবরণ নাই, বাঙ্গালী-সুলভ মুক্তশীর্ষ, গাত্রে এক খণ্ড উত্তরীয়, পরণে খুব ছোট্ট একখানি কাপড়; পর্ব্বতের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে শ্যামকৃষ্ণ সমুদ্রে অবতরণ করিলেন, একবার উচ্চচূড়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আবার পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন, তৎপরে ধীর পদে, যেন পদক্ষেপ গণিয়া গণিয়া, অগ্রসর হইয়া চলিলেন—আমি খুব দরে সরিয়া গেলাম।

তিনি যখন শ্যামকৃষ্ণ সমুদ্রের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়াছেন, সমুদ্র দুলিতে লাগিল, আমি সকল অবস্থাতেই সমুদ্রের উপরে অবস্থান করিতেছিলাম আমাকেও দোলন অনুভব করিতে হইল—নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে আন্দোলন কোথায়? ধূসর ও শ্যামকৃষ্ণ সাগরের মধ্যস্থল আলোড়িত হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব জলস্তম্ভ মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল, জলস্তম্ভে কিন্তু কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, সমুদ্রের আন্দোলনও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জলস্তম্ভ আর মাথা উঁচু করিল না, জলস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে [illegible] গান্ধীর কথা বিস্মরণ হইয়াছিলাম—অন্যদিকে তাক ইতে হইল, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—[illegible] জলস্তম্ভের দিকে চাহিয়াছি, কি অপরূপ দৃশ্য! গম্ভীর মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ অর্দ্ধনিমজ্জিত, তাঁহার নাভির নিম্ন হইতে জলস্তম্ভ উত্থিত হইয়াছে, জলস্তম্ভের উপরে মহাত্মা গান্ধী সমাসীন, চক্ষুর একটী কোণ নীচে কাহার দিকে যেন তাকাইতে চায়, আর সমগ্র চক্ষু [illegible] নেত্র শূন্যের দিকে তাকাইয়া। দেখিতে দেখিতে শূন্যোপরি এক শক্তি, [illegible] তাহার নিকট এক নীলকণ্ঠ শঙ্করও সমাবেশ হইল, মহাত্মা এক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে প্রসন্ন মুখে পর্ব্বত শ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সমগ্র গৃহ লোকপূর্ণ হইয়া উঠিল—এ [illegible]

মহাত্মা পুনরায় পর্ব্বতের দিকে তাকাইলেন—পত্র নাই, পক্ষীও উড়িয়া গিয়াছে—মহাত্মার বদন বিষন্ন হইল, চারিদিকে কি শব্দ হইতে লাগিল—এ যে সেই শব্দ, যে, "জাতির সত্তা তোমার ভিতর জাগিয়া না উঠিলে স্বদেশ-সেবার বিপুল আয়োজন সফল হইবে না।' মহাত্মা রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন, সকল শব্দ স্থির হইল, তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন, 'জাতির সত্তা তোমার ভিতর জাগিয়া না উঠিলে 'আমার' বিপুল আয়োজন সফল হইবে না।" সকলে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, অনেকেই লজ্জায় অধোবদন হইল, সকলেই গৃহে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। মহাত্মা ব্যাকুল, হঠাৎ রবীন্দ্রের দিকে চাহিতে গেলেন, রবীন্দ্র নিরাকৃত হইলেন, জনস্তম্ভ নিশ্চল হইল। মহাত্মা শূন্যে সমাসীন তখন গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, মহাত্মা কিন্তু গম্ভীর, প্রশান্ত ও প্রসন্নবদন, অদ্ভুত কৌশলে শূন্য অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিলেন, তথায় সমাসীন হইলেই গৈরিক পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল, নীলকণ্ঠ পক্ষীও সকলের নয়ন গোচর হইল—সর্ব্বত্র বাদ্যোদ্যম, আর ঐ গৈরিক পতাকা স্কন্ধে হাজার হাজার যুবক পর্ব্বত আচ্ছন্ন করিল, পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সকল স্থান উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন সর্ব্বত্র শ্রুত হইল "জাতির সত্তা আমার ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছে।"

হে বিধাতঃ, ঐ একটী বাক্যে কত অর্থই না ভরিয়া রাখিয়াছ, আমি যে তাহার এক কণাও দেখাইতে পারিলাম না! ইতি

শ্রীঃ—

পুস্তক পরিচয় ও সমালোচনা

:০:

স্বরাজ—বরিশালের প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষের বক্তৃতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বরিশাল অধিবেশনে স্বরাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে রাজনীতিক বাংলার স্বরাজসাধনার মূল সূত্রটী খুব সুন্দররূপেই ধরিতে পারা যায়। নন্-কো অপারেশন আন্দোলনের স্বরাজ আর স্বদেশী বাংলার সাধনার বস্তু বাঙ্গালীর হৃদয়নিহিত স্বরাজ, এই দুইয়ের প্রভেদ আমরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকি। বেদান্তমূল প্রেমরসসিক্ত বাঙ্গালীর স্বরাজসাধনায় মুহুর্মুহু দধীচির অস্থিদানে যে বিরাট আবির্ভাবের পূর্ব্বসূচনা গঠিত হইয়াছে, তাহার গঠন-আয়োজন ও তাহার ভাব পুষ্টি বাঙ্গালীর হৃদয় যেরূপে জুড়িয়া বসিয়াছে, সমগ্র ভারত নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনে এখনও সেরূপ বুকজোড়া ও সেরূপ বুকজুড়ান স্বরাজের মর্ম্ম অবগত হয় নাই। আন্দোলনধৌত হইয়া হৃদয়ের স্থির জ্যোতিঃ ফুটিতে থাকিলে বঙ্গীয় সাধনার স্বরাজ ভারতীয় হৃদয়ে নববেশে সমুত্থিত হইবে। ইহা সাধকদিগের অন্তর্জ্জগতের বস্তু; কোন বাঙ্গালী সাধনা করুন আর নাই করুন, এই অন্তর্চ্ছবির প্রভাব হইতে তিনি কিছুতেই মুক্ত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ যাঁহার হৃদয় বাঙ্গালীর প্রাচীন বৈষ্ণব সাধ-

নাথ ও শ্রীবিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত দেশপ্রেমমূলক বেদান্ত সাধনায় সরস ও উদার হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের স্বরাজসাধনার ছবি সেই সকল হৃদয়ে স্বতঃ প্রতিফলিত হইতে পারে। সেই সব আবার অধিকার করিয়াই ত নব বাঙ্গালীর নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিবে। তজ্জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নিবিড় দেশসাধক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রাচীন ও নবীন নেতৃগণ বর্ত্তমান কর্ম্মতরঙ্গে সংলিপ্ত হইয়াও স্বরাজের যে আদর্শচিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলেন, তাহাতে বাঙ্গালীর হৃদয় ফুলিয়া উঠে, প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হয়, আর সমগ্র ভারত বাঙ্গালীর এত নিরুপম স্বরাজ ব্যাখ্যায় উহার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া থাকে। কি বক্তা কি শ্রোতা কেহই এখনও বাঙ্গালীর এই স্বরাজমন্ত্রের তত একনিষ্ঠ সাধক হইতে সক্ষম হন নাই। ভারতের উত্তেজিত ও বিক্ষিপ্ত প্রাণ মনকে সংযত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এখন কর্ম্ম তরঙ্গে ভাসমান হইতে হইয়াছে, অতএব এ সময়ে বাঙ্গালীর স্বরাজ আদর্শের তত আদর হইবে না, কিন্তু ভারত পরিশুদ্ধ প্রাণ ও অন্তঃকরণ লইয়া যখন সত্য স্বরাজ সাধনায় নিযুক্ত হইবে, সেই সময়ে আদর্শের মহানতায় ও আদর্শান্বিত ভাবের গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে একবার প্রাচীন ইতিহাস দেখিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। সেই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন ও দেশবন্ধুর "স্বরাজ" ও শরৎবাবুর "স্বরাজ" তাহাকে অতি নিবিড় ভাবেই আলোচনা করিতে হইবে। এই জন্যই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে শরৎ বাবুর বক্তৃতাটী ছাপাইয়া সরস্বতী লাইব্রেরী ভবিষ্যতের জন্য দেশের ভাবধারা অবগত হইবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে স্বরাজপর্য্যায় পুস্তকাবলী ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। উল্লিখিত পুস্তক সেই পর্য্যায়ের ৫ম গ্রন্থ মূল্য ।০ আনা। সরস্বতী লাইব্রেরীর ঠিকানা—৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দীপক—কবিতাপুস্তক, শ্রীহরিদাস বিশ্বাস প্রণীত। লেখকের নিবাস চট্টগ্রাম এবং পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান চট্টগ্রামের জ্যোতিঃ অফিস, সারস্বত আশ্রম ও পল্লীসেবকসঙ্ঘ। মূল্য ছয় আনা। 'দীপক' কবিতাগুচ্ছ স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা আনিয়া নিজে হর্ষোজ্জ্বল এবং নিজেকে "বঙ্গজননীর স্বর্ণজন্মা অমর সন্তান, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সন্ন্যাসী সেবক মহাত্মা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী ঘোষের করকমলে অর্পণ করিয়া আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে গাহিতেছে

> "মহামিলনের যজ্ঞে হে ঋত্বিক সোমপায়ী মত
> শান্ত স্নিগ্ধ প্রাণরসে ঢালিতেছ তুমি অবিরত,
> নিঃস্ব হয়ে, রিক্ত হয়ে, তপস্যারি দেশের কল্যাণে
> উৎসর্গ করেছ নিজে অনাকুল দম্ভহীন প্রাণে,
> তোমার প্রার্থনা-পূত হোমশেষ জ্যোতির্ময় শিখা
> ভারতের ললাটেতে পরায়েছে শ্রেষ্ঠ রাজ টীকা"

সকল কবিতায় এরূপ উচ্চসুর রক্ষিত হয় নাই, তথাপি পাঠকগণ "দীপক" পাঠ করিয়া স্বদেশপ্রেমের প্রবাহ অনুভব করিতে পারিবেন। চট্টগ্রামে এখন যে স্বদেশী-স্রোত নির্ম্মল ধারায় প্রবহমান সেই স্রোত হইতেই এই দীপক পুষ্পটী সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের ব্যথায় প্রকৃতিরাণী চট্টলার হৃদয় মধ্যে যে দীপকরাগ ঝঙ্কৃত হইয়াছিল তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই হৃদয়ঙ্গম করিবার জিনিষ।

প্রবর্ত্তক

ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ আশ্বিন, ১৩২৮ [ঊনবিংশ সংখ্যা

সংঘ-সাধনা

—০—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আসিয়াছিলেন। আমাদের সংঘের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় সত্যানন্দ বাবু পত্রযোগে জানাইয়াছেন Dr. P. C Roy আপনাদের খুব সুখ্যাতি করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। "প্রবর্ত্তক" "Standard Bearer" যাহারা লিখে, তাহারা যে কাজের মানুষ নয়, এই ধারণা লইয়া খুব সম্ভব তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আমাদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার নূতন Revelation—ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অধিকাংশ লোকের ধারণা আছে, আমাদের জীবন দিয়া এইরূপ ধারণার কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলেও আমরা ধন্য হইব।

প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই কর্ম্মের যুগে এইরূপ প্রশ্ন নিত্যই আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে। বাহিরের ছাত্র রাখিয়া এই সকল কাজ কর্ম্ম শিখাইয়া ব্যাপক কর্ম্মসৃষ্টির আয়োজন আমরা করিতে পারি কি না? অথবা কয়েকজন পারদর্শী ছাত্র বাহিরে পাঠাইয়া সকল স্থানেই এইরূপ কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণে আমাদের আপত্তি আছে কি না? তাঁহার মত উদার উন্নতমনা গুণবান পুরুষকে ইহার উত্তরে একটা 'না' বলিয়াছিলাম, তিনি এই 'না' বলার রহস্য উপলব্ধি করিয়া আরও অধিক সন্তুষ্ট হইলেন—এইরূপ আমাদের অনুমান।

দেশে আজ কাজের সাড়া পড়িয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন দেশসেবার পুরাতন প্রণালী ছাড়িতে হইবে। নূতন ধারায় কর্ম্মসৃষ্টির একমাত্র উপায়, অন্তরকে জাগ্রত করিয়া তোলা। এই অন্তর জাগরণের আভাস মাত্রে দেশে অসংখ্য দল গড়িয়া উঠিতেছে, বিচিত্র এই, সকলেই আত্মসাধনার অপেক্ষা দলের পুষ্টিবর্দ্ধন ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনুকূল অবস্থা সৃজনের দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছেন। ইহার ফলে অন্তরের শ্রীবৃদ্ধি যত না হউক দলাদলির মাত্রা বাড়িয়া উঠিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া দলপুষ্টির প্রচেষ্টায় রত হইয়া আমরা আত্মসাধনার নামে, সঙ্কীর্ণতা ও নীচতাকে প্রশ্রয় দিই, এখনও অবস্থা তেমন গুরুতর হইয়া

উঠে নাই, অতএব এই সকল ছোট কথার বিবরণে বক্তব্য দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই, কাজের সত্য সঙ্কেতটী আমরা দেশের সম্মুখে ধরিব, ভিতরের সূত্রটা ধরিয়া উঠিতে পারিলে—অভেদ ভাবেই আমরা বাংলার সাধনক্ষেত্রে অবধারিত সিদ্ধি পাইব।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল স্রোতে পড়িয়া যাহারা কাজের মাঝে নাকানি চুবানি খাইতেছেন, তাঁহাদের জীবনে এখনও অনেক অগ্নি পরীক্ষা আছে —আত্মশুদ্ধির এই সুযোগে অনেকেই মানুষ হইয়া উঠিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা বলিতেছি ১৯০৫ সালে পীত বর্ণের উত্তরীয় মাথায় বাঁধিয়া মুক্তিমন্ত্রে যাঁরা দীক্ষা লইয়াছিলেন তাঁদেরই কথা। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আজকার যজ্ঞানুষ্ঠানে ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিপুণ হস্ত নব জাগ্রত বাংলার শক্তিকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলুক। আর আমরা, যারা—আজ রাজনৈতিক জীবনের দরে দাঁড়াইয়া নূতন ভঙ্গীতে দেশব্রত সাধনের সঙ্কল্প লইয়াছি, তাহাদের জীবন বেদের গোটা দুই কথা, জাতীয় সাধনার এই ঘোরতর সমস্যাযুগে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের মত অনেকেই হয়তো নূতনকে বুঝিবার জন্য উদ্‌গ্রীব নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আমরা যখন কাজে নামিয়াছিলাম, অন্নচিন্তা তখন এতখানি গুরুতর হইয়া দেখা দেয় নাই। সারা দিনটা দেশের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কিন্তু যথা সময়ে বাপের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দিন আমাদের চলিয়া যাইত। ধীরে ধীরে সংসারের ভার যে দিন কাঁধে আসিয়া চাপিয়া ধরিল, সেই দিন বুঝিলাম, দেশের কাজ বড় সহজ নয়, একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণপোষণের ভারেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গুঁড়ানাড়া হইয়া যায়, দেশ সেবার আর সময় কোথা? মুখের দুটা কথা বলা ছাড়া দেশ সেবার অন্য দান তখন জীবনে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহারা দাঁড়াইতে পারিয়াছে, ভগবানের দয়া সত্যই সেখানে মূর্ত্তিমান। তিনি দয়া করিলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, মূকও বাচাল হয়, আমরা তো তাঁহাকে চাহি নাই, তিনিই জোর করিয়া আমাদের চাহিয়াছিলেন, অতিথির বেশে জোর করিয়া দ্বন্দ্বময় সংসারের বুকে আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাই তাঁকে স্বীকার করিয়া চলা ব্যতীত আর আমাদের দ্বিতীয় গতি নাই।

তার পর অতিষ্ঠ সংসারভারপীড়িত জীবনের উপর ভর করিয়াই বাংলার বিপ্লবযুগ নামিতে আরম্ভ করিল, এই অবস্থায় নিজের কর্ম্মফলে, আর কোম্পানি বাহাদুরের অনুগ্রহে সর্ব্বনাশের চূড়ায় গিয়া পৌছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। পুরাতন পুড়িয়া ছাই হইল, সেই বিরাট ভস্মস্তূপের ভিতর হইতেই নবীনের কনককান্ত চক্ষু ঝলসিয়া ঝিকমিক করিয়া উঠিল, সে দিন এই নূতনের চরণমূলে বিনামূল্যে বিকাইয়া যাইতে আর দ্বিধা রহিল না, সে ছিল আত্মসমর্পণের যুগ, এ যুগ সকলের জীবনেই একদিন আসা চাই—কিন্তু সে কথা অন্য দিন বলিব।

নিজের বলিতে যাহা কিছু ছিল, বাংলার বিপ্লবযুগে একে একে তাহা শেষ হইয়াছে। এই নূতন করিয়া ঘর বাঁধার উদ্দেশ্য—জাতি ও ভগবানের জন্য ভিন্ন আর কি বলিব! কিন্তু এই জাতিবোধ, এই ভাগবত অনুভূতি অহংকারের শুদ্ধিবিধান করিল, গুণবৃদ্ধি হইয়া একজন দশজনে পরিণত হইল, দশজন শতজনে ছড়াইয়া পড়িল, এই সম্প্রসারণ কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হইবে তা কে জানে? এই ব্যাপ্তির মূলে কর্ম্মলক্ষ্য নাই, আছে ভাগবত ইচ্ছা। মনকে এক করিয়াই আত্মবিস্তৃতি সফল হয় না, আত্মাকেই ছড়াইয়া চলিতে হয়, তাই ইহা তপঃসাধ্য।

যেখানে হিসাব করিয়া ঐক্য স্থাপন হইয়াছে—বড় বেদনায় সে মিলনমন্দির ধরাশায়ী হইতে দেখি-

য়াছি। কাজ কর্ম্মের বাটোয়ারা করিয়া মিলিবার যে পথ, তাহাও রুদ্ধ হইয়াছে—আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দশজনের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপন তাহার ভিত্তিও তেমন দৃঢ় নয়, এই ঐক্যের প্রথম মন্ত্র আত্মসমর্পণ, ইহার সাফল্য আত্ম-উপলব্ধিতে, এই অধ্যাত্মযোগেই আমরা নূতনকে জানিবার, পাইবার বীজমন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি।

দেশকে এই জানার ধর্ম্ম, পাওয়ার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আপনাকে জানিয়া পাইয়া, অপরের সহিত একাত্ম হইতে হইবে। কোথাও পর আপন হইবে, আপন পর হইয়া যাইবে, আমাদের জীবনে ঘটিয়াছেও তাই, এখনও উহাই ঘটিতেছে, ভবিষ্যতেও ইহার অন্যথা হইবে না। ভগবানকে চাহিলে, আর সকল চাওয়া বন্ধ করিতে হইবে, যে ভগবানকে চাহে না, সে জনক, জননী, জায়া যেই হউক, আমার সহিত তাহার বিচ্ছিন্নতা আসিবেই, মনকে চক্ষু ঠারিয়া ইহার মধ্যে আর অন্য কোন সামঞ্জস্য নাই, দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া আমাদের অভেদাত্ম সাধনের অন্তরায়স্বরূপ এরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে। যে আমায় চায়, তাহাকে আমি যাহা চাই তাহা চাহিতে হইবে, সত্য ঐক্য সাধনের সম্বন্ধ হইবে ভাগবত, কোন পারিবারিক বন্ধন ইহাতে টিকিবে না।

সাধনা কঠোর। ফেলিয়া তুলিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া ভগবান মিলে না, এ কথা কে না জানে! আঘাত পাইয়াছি খুব, আঘাত পাইতেছি সাংঘাতিক, যদি অনন্তকে চাহিয়া থাকি, এ জ্বালা জুড়াইবে না, এই অন্তরাগুনের লেলিহান রসনার মুখেই আমাদের অনন্ত যুগ আহুতি দিয়া যাইতে হইবে, এই যজ্ঞাগ্নি আর যেন নির্ব্বাপিত না হয়, ইহার রক্তবর্ণ জিহ্বা আকাশ চুম্বন করুক, দক্ষিণা দেবীর স্তন্য পানে পুষ্ট হউক—ভারতে এই তপঃশক্তির সাহায্যেই আমাদের সব কিছু গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই সাধন পথের বিঘ্ন যে কেবল পারিবারিক বন্ধন তাহা নহে। স্বার্থের হাহাকার ধ্বনিই যে জীবনে অশান্তি আনিয়া দেয়, তাহাও নয়, আমাদের আছে অহংকার, তার ছলনা অসাধারণ, বাহিরে যে শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে ইহার প্রভাবই বাড়িয়া যাইতেছে, ধন চাহিলে অকাতরে তাহা দিতে পারি, পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাও ক্লেশের কিছু নহে, প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা নাই, কিন্তু তোমার সুরে সুর মিলাইয়া চলিতে চলিতে যে দিন মনে পড়িয়া যায়, আমার স্বাতন্ত্র্যের কথা, আমার বিভাজ্য ব্যক্তিত্বের গন্ধ, তখনই অন্তরে জ্বলিয়া উঠে বিদ্রোহের আগুণ, দীর্ঘ দিনের সমবেত সৃষ্টির মাথায় পদাঘাত করিয়া, আত্মরক্ষার হেতু তোমাকে ছিনাইয়া সরিয়া দাঁড়াই—গতি কি আমার বন্ধ হয়? স্বভাব কি আমি ছাড়িয়া চলি? না। আবার আমায় মিলনের ক্ষেত্র খুঁজিতে হয়, আবার নূতন মানুষের গলা ধরিয়া পক্ষের মত সেই একই সোহাগের রাগিণী আলাপ করি! হায় প্রবঞ্চক মানুষ, চিরদিন প্রকৃতির বানর সাজিয়াই দিন কাটিয়া যায়, একনিষ্ঠ তপস্যায়, আপনাকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া, একটি মুক্তাস্রাব বিন্দু সৃজন করিয়া তুলিতে পারিলে যে বিশ্ব নির্ম্মাণের শক্তি লাভ হয়, একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

আমাদের সকল কাজ, এই তপস্যার একটি নিখুঁত বিগ্রহ গড়িয়া তুলিবার জন্য। বাহির হইতে, কাজকেই ভাবের অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু ভাব যতই বৃহৎ হউক, সে লোকচক্ষুর অগোচরে অন্তরেই প্রসারিত হইয়া উঠে। যেথায় সেথায় অসংখ্য রূপে এই ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে বাহিরের বড় বাধা যে স্থান ও কাল, ইহাকে কুঁদিয়া কুঁদিয়া উহার স্থান করিতে হয়, কাজেই পৃথিবীতে এই যে কোলাহলের সৃষ্টি, সবই তো সেই ভিতরের অসীম ভাবের একটি ক্ষুদ্র কণা লইয়া। জাতি, ভাব দ্বারা-

ইয়া কাজের নেশায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে, তাই এত কোলাহলের মধ্যে আমরা নিম্মাণের চিহ্ন তেমন বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। বাঙালী কি এই সত্য কথাটা তলাইয়া বুঝিবে না?

আজ আমরা যে মিলন চাই—যে ঐক্য চাই—উহা কোনমতে কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া যেন না হয়। আমার অন্তরের টান যে দিন তোমার অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করিবে, তোমার ও আমার মধ্যে যেদিন বিরহের বৃশ্চিক দংশন অনুভূত হইবে, মিলনের তীব্র পিপাসায় উভয়েই যেদিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিব, সেই দিন জানিও জাতি নিম্মাণের সুর্ণাবর্ত্তে তোমার টান ধরিয়াছে। তোমার অখণ্ডত্বের চেতনার মধ্যে বহুরূপত্বের প্রেরণা জাগিয়াছে, বহু যে দিন একের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে সে দিন ভারতের সত্য কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। এই কথা শুনিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন, ইহার জন্য আর করিবার আছে কি? ভগবানের ইচ্ছা হইলেই তো তা সফল হইবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমরা কেবলই যন্ত্র নই, ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন মন, প্রাণ, বুদ্ধির একটি সমষ্টীভূত চেতনা নই—আমরা জনে জনে ভগবান। সাধনারম্ভে প্রকৃতির খেলা উপলব্ধির জন্য কিছুদিন প্যাসিভ হইয়া থাকিতে হয়, প্রকৃতির অধোমুখী আকর্ষণ তখন অতি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতির স্বভাবগতি ভেদকেই সৃষ্টি করে, ভেদে শক্তিনাশ হয়, শক্তিহীনের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য প্যাসিভ হইয়া থাকার সাধন পর্য্যায় হইতে সাধককে ধীরে ধীরে উচ্চগতি ও প্রেরণা লাভের জন্য ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া ধরিতে হয়, এই শক্তি ভাগবত শক্তি, এই শক্তির সাহায্যেই আমরা নিজেকে জানিতে পারি, নিজের সত্য দিয়া অপরের অস্তিত্ব আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। এই ভিতর দিয়া অন্তকে পাওয়ার গোপন রহস্য তখন সাধকের চক্ষে আর ধাঁধার সৃষ্টি করে না। নব অনুভূত অভিনব পন্থাই তখন জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠে।

পুরাতনের ভিত্তি উপাড়িয়া যে নূতন জাতি বাংলায় দিব্য সৃষ্টি নির্ম্মাণের তপস্যায় রত আছে—তাহাদের ধারণা, কেবল অন্ন সংস্থানের উপযোগী শিক্ষা দিতে পারিলেই জাতি বাঁচিবে না। ভারতের মাটী তুষারাচ্ছন্ন নহে, অনুর্ব্বরা নহে; আমরা মরিতেছি অনৈক্যে ভেদে, জাতিবোধের অভাবে। সর্ব্বাগ্রে এই ভেদ এই অনৈক্য দূর করিয়া দিতে হইবে, বাহি-রের দিক্ হইতে নয়, অন্তরের মিলন সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, জাতিকে অখণ্ড দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া হাজার হাজার লোককে একাত্ম করিয়া তোলা একটি কল্পনা বা স্বপ্ন মাত্র ভাবিয়া কেবল সেন্টিমেণ্টের সাহায্যে দেশের প্রাণশক্তি একত্র করিতে চাহেন যাঁহারা, তাঁহারা আপাততঃ উহাতে কিছু কৃতকার্য্য হইলেও, ভবিষ্যতে উহার ফল ভাল হইবে না; কিন্তু এইরূপ অন্তরগত মিলন লইয়া যদি সহস্র অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব হয়, জগতে তাঁহারা যে কি পরি বর্ত্তন আনিতে পারেন, তাহা আজ ভাবিয়া স্থির করাও সম্ভব নয়, আমরা বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলে এইরূপ প্রেরণাই কিন্তু লক্ষ্য করিতেছি।

ভারতের নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা মিলিত হইবেন, তাঁহারা পরস্পরকে পরস্পর পৃথক করিয়া দেখিবেন না। কিন্তু ইহা একেবারে হওয়া সম্ভব নহে। একাত্ম অনুভূতি লইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না। এতদ্ব্যতীত বৈচিত্র্যই জগতের নীতি, আবার এই বৈচিত্র্যের মাঝে একাত্ম হওয়ার সাধনাই সংসার গতি। স্বামীর সহিত স্ত্রী একাত্ম হইতে না পারিলে উভয়ের জীবনই বিষময় হইয়া উঠে। অখণ্ড সত্তার জ্ঞান হারাইয়া, আমাদের সংসার সমাজ শিক্ষা সাধনা সবই ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে।

সৃষ্টির মূল কথা জ্ঞান। জ্ঞানের প্রথম প্রতিজ্ঞা এই অখণ্ডবোধের শিক্ষা। আমাদের কর্ম্মের মাঝে আমাদের মিলনের মাঝে এই শিক্ষারই ফল্গুধারা প্রবহমান রাখিতে হইবে। ইহার অভাবে, অবস্থাচক্রে আমরা দুই দশ দিন মিলিতে পারি, কিন্তু সে মিলন স্থায়ী হইবে না। কোন কর্ম্ম বা সাধনা সমষ্টিভাবে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া চাই, যেন মিলনের পর আর আমরা ছাড়াছাড়ি না হই, উভয়ের অন্তরে অনর্থক আঘাত না লাগে, এই ভেদ, এই আঘাত, যদি কেবল সম্পর্কিত ব্যক্তির অন্তরে সাময়িক ভাবে বেদনার সঞ্চার করিত, তাহা হইলে ইহার মধ্যে তেমন গুরুতর দোষের কথা ছিল না, কিন্তু এই আঘাতের রেশ, এই ভেদের সুর, ততদিন চলিবে, যতদিন না ইহার একটা চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ হয়। ব্যাঘ্রের মত এই স্বভাব লাফাইতে লাফাইতে কত মানুষের অন্তর আক্রমণ করিবে, কত মহীয়সী প্রচেষ্টার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে। এ জগতে কোন কিছুই অনিত্য নয়, কোন ঘটনাই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার সামগ্রী নহে, গোজামিল দিয়া জীবনের কোন ছেদ পূর্ণ করা যায় না, প্রকৃতির কষ্টি পাথরে নিখুঁত আত্মপরীক্ষায় সকলকেই উত্তীর্ণ হইতে হয়।

তাই কাজ গৌণ—মূল কথা ঐক্য। অহংকারকে গুঁড়া করিয়া দাও। অসংখ্য অহংকারের রাসায়নিক শোধনে ও সংমিশ্রণে এক বিরাট ঐক্য সংঘ নির্ম্মাণ কর। মিলনের পথে যদি আসিয়া দাঁড়াও, জানিয়া রাখ, আত্মপ্রকৃতির মধ্যে অনেক কিছু অনৈক্য রাখিয়াই আমরা সাধনা আরম্ভ করিয়াছি, আর এই অনৈক্যের মৌলিক কারণও যথেষ্ট আছে, তবে লক্ষ্য আমাদের এক হওয়া চাই, জাতিগত উত্থানের দিনে আমাদের মিলনই চাই, তাই প্রতিপদে হৃদয়ের সবখানি শক্তি দিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে, আমরা এক, আমরা অভেদ। বিঘ্ন অনেক, বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আমাদের জয়কে অধিকার করিতে হইবে। পরাজয় মানিলে চলিবে না, স্বার্থপরতার কোন ছলনায় আমরা বিমুগ্ধ হইব না, হৃদয় রক্তাক্ত হইবে, নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে, পরস্পর পরস্পরকে পরম শত্রু জ্ঞান করিবে, তবুও আমাকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে হইবে, আমি তোমার, তুমি আমার, আমার যথা-সর্ব্বস্ব তোমার, তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমার, কখন তুমি তিরস্কার করিবে, আমি পাষাণ বুক বিছাইয়া সহ করিব, আবার কখন বা আমি হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে তীব্রবাক্যে তোমায় মর্ম্মাহত করিব—তুমিও তাহা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইও। আমার অপরাধ, তোমার বলিয়া মার্জ্জনা করিতে হইবে, তোমার সহস্র ত্রুটী আমি হাসিমুখে আমার বলিয়াই গ্রহণ করিব। আমাদের কর্ম্ম হইবে এইরূপ সাধনার ক্ষেত্র বিশেষ, ভাবের ঘরে ঐ সাধনা চলে না, তাই এই কর্ম্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ করা। এইরূপ সাধনক্ষেত্র চারিদিকেই নির্ম্মাণ হউক, যে ভীরু, যে লোভী, তাহার চিরদিন পতন হইবে, বীর্য্যবান পুরুষের জয় সর্ব্বত্র, অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হউক, সর্ব্বত্র মিলনের এই মধুর আলাপ যেন আমরা শুনিতে পাই, ঐ সুরই সান্ত্বনার সুর, আনন্দের ঝঙ্কার, শক্তির রাগিণী।

এই কঠোর সাধনায়, পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদের গোলযোগ নাই—একটু গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখা যায়, সমষ্টি আত্মার সহিত অবিচ্ছেদ প্রবাহ রাখিয়া স্বাতন্ত্র্যের বৈচিত্র্যের শুদ্ধ প্রকাশ ইহাতে বাধে না, বরং আপনাকে বৃহৎ করিয়া তোলার ইহাই অদ্বিতীয় উপায়। অহংকার এই সত্যকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই সত্যের প্রকাশে বৈচিত্র্য রক্ষা পাইবেই, অধিকন্তু প্রতি আধারে অনন্তের খেলা চলিতে থাকিবে। তখন সত্য সত্যই আর কোন

কাহারও প্রতি ঈর্ষা করিবে না। অনুভূতির বিভিন্ন স্তরে আছি বলিয়াই, পরস্পরের মধ্যে এতখানি ভেদ দেখিয়া হতাশ হইতেছি, মলতঃ যাহা সত্য তাহা লাভ করা সাধনসাপেক্ষ কিন্তু অসম্ভব নহে।

বাহিরের মানুষ সংসারের ছোট খাট উদ্দেশ্য লইয়া আপনাকে দিন দিন ক্ষুদ্র করিয়া তুলিতেছে, এইরূপ পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য লইয়া একত্র বহু ব্যক্তির সমাবেশ গোলযোগেরই সৃষ্টি করিবে, বৃহৎ ও সত্যের জন্য অল্প লোক লইয়া যদি সাধনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলেও উপস্থিত দেশজোড়া কাজ মূর্ত্ত না হইয়া উঠিলেও, ভবিষ্যতে কিন্তু এই তপস্যাই জয়যুক্ত হইবে।

আমাদের লক্ষ্য হউক ভগবান। শক্তি সাধনার অভিব্যক্তি হউক কর্ম্মে। কর্ম্ম যেন কোন দিন লক্ষ্য হইয়া না উঠে। শক্তিতে জীবন যেদিন পূর্ণ হইবে, জীবনের আবর্জ্জনা শক্তির বিমল কিরণে যেদিন অপসারিত হইবে, সেই দিন অন্তরে জাগ্রত হইবেন ভগবান, তখন আমাদের জীবন হইবে ভাগবত। এই আমাদের ঐক্যমূর্ত্তি যদি জাতিরূপে আবির্ভূত হইয়া উঠে, তবেই দেবজাতির স্বপ্ন সফল হইবে। এই মহান্ উদ্দেশ্য যেখানে জীবনের লক্ষ্য সেখানে এইরূপ মানুষেরই স্থান আছে অন্যের স্থান সে ক্ষেত্রে নাই বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

পূজো

—:০:—

সে দিন চতুর্থী। সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশের এক কোণে কাস্তের ফলার মত চাঁদের খণ্ডাংশ ঝিক্ মিক কর্‌ছে। খুব গুমোট, গাছের পাতাটি নড়ছে না। গঙ্গাতীরে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম।

* * *

একখানা সাদা মেঘে ভর ক'রে খানিকটা বাতাস নেমে এসে, আমার তপ্ত ললাটে হাত বুলিয়ে দিলে। তার পর হাওয়ার ঢেউ বয়ে যেতে লাগ্‌লো, মাঝি পাল তুলে গান ধ'রলে "এমন ক'রে হরের ঘরে কেমন ক'রে ছিলি উমা", আমি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছি।

* * *

আমার মন তখন খুব শান্ত ছিল। অতীতের ঝড় অনেক আগে বন্ধ হ'য়ে গেছে। ভবিষ্যতের কোন স্বপ্নে হৃদয় রেখায় রেখায় হিজিবিজি হ'য়ে উঠে নাই। হঠাৎ হৃদয় ধ্বনিত ক'রে কে স্পষ্ট ব'লে উঠ্‌লো "মা আসছেন প্রস্তুত হও", খুব সম্ভব চক্ষু আমার মুদ্রিত ছিল, চেয়ে দেখি সম্মুখের নব পল্লবিত আম্রশাখা দুলে দুলে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছে।

* * *

কোন্ পুণ্যবানের আঙ্গিনা আলো ক'রে, দশ প্রহরণধারিণী দশভূজা আবির্ভূতা হবেন? সে কি আমারই কুটীর প্রাঙ্গনে? অথবা এই অনন্ত নীল চন্দ্রাতপ তলে, পুণ্যতোয়া ভাগিরথী তীরে? প্রস্তুত হবো কি? ঘট পটের ব্যবস্থা করবো, না মৃণ্ময়ী প্রতিমা সম্মুখে রেখে, মায়ের উদ্দেশে চরণ যুগলে পুষ্পাঞ্জলী দেবো? সিদ্ধান্ত কিছুই হ'ল না। "মা আস্‌ছেন" কোথায়? প্রাণ বড় আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। "প্রস্তুত হও" কেমন ক'রে হবো? রূপের নেশায়

পাগোল হ'য়েই বাড়ী ফিরলুম।

* * *

সারা রাত অনিদ্রায় কেটে গেল। আজ পঞ্চমী। দিন যায় তবুও স্থির হলো না, মা কোথায় আসছেন ? প্রস্তুত হওয়ার কোন পথই খুঁজে পেলুম না। হতাশ মনে অপরাহ্ণে আবার সেই জাহ্নবী তীরে এসে দাঁড়ালুম। "মা আস্‌ছেন, মা আস্‌ছেন" রবে তখন সংসার যেন ভ'রে গেছে। পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলুম, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট পাতা হয়েছে, পল্লবমালা হাওয়ায় উড়ে মাকে আহ্বান ক'রছে, উচ্ছ্বাসময়ী ভাগিরথীর কলনাদে ঐ একই সঙ্গীত কাণে এসে সংবাদ দিয়ে গেল "মা আস্‌ছেন", কিন্তু আমার প্রস্তুত হওয়ার কি হবে ?

* * *

নিদ্রাহীন কান্না নিয়ে দীর্ঘ রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। দিগন্তের কোলে উষার সিন্দুর রেখা ঈসৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, আমি যেন অনন্ত জলধির তটে দাঁড়িয়ে, তখনও ক্রন্দন করছি, বাষ্পপূর্ণ নয়নে প্রাতঃসূর্য্যের রক্ত কিরণ স্পর্শে, নয়ন বিস্ফারিত করা মাত্র, কি দেখলুম, অপূর্ব্ব দৃশ্য সে, কি শুনলুম—সে ধ্বনি—সে সঙ্গীত, জীবনের তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে আমায় পাগোল ক'রে দিলে।

* * *

এক সুরে বাঁধা লক্ষ বাঁশীর সুমধুর মূর্চ্ছনা আমার কাণে এসে পৌঁছুলো—লক্ষ শতদল পদ্মের মকরন্দ সৌরভে আমার মন প্রাণ বিভোর হ'য়ে উঠ্‌লো—দেখলুম লক্ষ দ্বারে স্বর্ণ কলস শোভা পাচ্ছে, হরিতপত্র কদলীতরু সহযোগে সারি সারি পীতবর্ণের পতাকা উড়ছে, রজতশুভ্র সিংহপৃষ্ঠে এক অপূর্ব্ব শোভাময়ী দশভূজার কনকমূর্ত্তি সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে এসে, আমার গৃহে প্রবেশ ক'রলেন, লক্ষ সুন্দরী সালঙ্কার হস্তে লাজ বর্ষণ ক'রতে লাগলো, লক্ষ কণ্ঠে উলুধ্বনি, লক্ষ শঙ্খ তুমুল শব্দে দিঙমণ্ডল আলোড়িত ক'রে দিল, পুরমহিলাগণ মাকে বরণ ক'রে, একখানি হিরণ্ময় সিংহাসনে তুলে বসালেন। কেবল মাত্র নহবতের মধুর আলাপ তখন আমার কাণে বাজছে। "তব, চরণ-নিয়ে, উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা।"

* * *

আজ সপ্তমী। সব দ্বার আজ মুক্ত হ'য়ে গেছে। দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট বসান হয়েছে। আনন্দময়ীর আগমনে, ধরিত্রী কনককান্তি ধারণ করেছে। অষ্টমীর প্রভাতে গঙ্গাস্নান ক'রে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিলুম। দেবীর অধরে হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌লো। দিবা রাত্র জ্ঞান নাই, এক প্রকার অঘোর হয়েই অষ্টমীর পূজা শেষ হ'লো। নবমীর প্রভাত কিছু অনুজ্জ্বল, আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে, স্নানান্তে পুষ্পাঞ্জলী দিতে গিয়ে দেখি, প্রতিমার বদন কমল বিশুষ্ক, ললাট দিয়ে স্বেদবিন্দু ঝ'রে প'ড়ছে। সন্ধ্যায় আকাশ আরও মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, অশ্রুবিন্দুর মত দু এক ফোঁটা বারি বর্ষণও হ'লো, ঠাণ্ডা বাতাসে হিমাঙ্গ হয়ে, মায়ের চরণে লুটিয়ে প'ড়লুম। সারা রাত যুদ্ধ। কি বিকট, কি ভীষণ!! দেবীর অধরপুট দশনাঘাতে রক্তাক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, কেশরী কেশর ফুলিয়ে বিকট গর্জ্জনে ধরিত্রী টলিয়ে দিতে লাগ্‌লো—লুপ্তচৈতন্য হ'য়ে, জড়ের মত মায়ের চরণ জড়িয়ে শুয়ে রইলুম। রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে চক্ষু উন্মিলন করে দেখি, এক কৃষ্ণকায় পুরুষ রক্তনেত্র ঘূর্ণিত ক'রে বীভৎস চীৎকারে মায়ের প্রতিমা ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে' দিয়েছে। হঠাৎ কে আমায় শির স্পর্শ করে' বল্‌লে "উঠুন প্রভাত হয়েছে আজ বিজয়া", ভাল করে' চেয়ে দেখি তিনি পুরোহিত। সানাই গাইছে "আসিবে আবার তুমি আসিবে আবার।"

* * *

চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো। জয়

তো হ'লো না। পাপ পুরুষের মুণ্ড কেটে মা তো গলায় ঝুলিয়ে, তাথিয়া তাথিয়া নৃত্যে জগত ধন্য করে' দিলেন না! আকাশের পশ্চিম কোণে আবার ঐ কালমেঘে আসন করে' দিগ্‌বসনা মহাকালি বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। দশমীর এই পুণ্য প্রভাতে কঠোর সঙ্কল্পে হৃদয় বেঁধে আলিঙ্গন দিই—কিন্তু শক্তি সাধনার চরম সিদ্ধি আজও পাওয়া গেল না।

* * *

সেই সঙ্কল্পের মহামন্ত্র তোমাদের নূতন করে' শুনাতে চাই। আত্মপ্রকৃতির গতি নিরূপণের জন্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম অভেদ করে' ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের দীক্ষা লওয়া হয়েছিল। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার অভিপ্রায়ে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনের জাতিকে, দুর্য্যোধনের মন্ত্রেই অভিষিক্ত হ'তে হয়েছিল—সে মন্ত্র "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমির" মন্ত্র। প্রকৃতির অবাধ লীলায় আমরা কোন বাধাই দিই নি। কত ভেদ, কত সংশয়, কত পাপ, জীবনের উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে; এ সকলই অগুদ্ধতার নিরসন হচ্ছে বলে' এত দিন হৃষিকেশের দোহাই দিয়ে মাথা পেতে নিয়েছি কিন্তু ভেদের শেষ নাই, অন্ধকার অনন্ত। আজ জীবন সমুদ্র তোলপাড় করে' নূতন মন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে "শক্ত্যাং ভগবতী চ শ্রদ্ধা", শক্তি ও ভগবানে অশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ হও, শুদ্ধা ভাগবত শক্তির হাতেই জীবন উৎসর্গ কর, আর পাপ নয়, অন্ধকার নয়, ভেদ নয়; চাই সত্য, চাই শান্তি, চাই আলো। যে ইচ্ছা দিয়ে "ত্বয়া হৃষিকেশ" ব'লে নিশ্চিন্ত হয়েছিলে, সেই ইচ্ছাকে ঘুরিয়ে ধর, প্রতিদিন প্রভাতে উঠেই অগ্নিময় ইচ্ছাকে আরও জ্বালাময় কর, পাপ পুরুষ দগ্ধ হোক, জীবনের রন্ধ্রে এই অসুর থাকতে সব আমাদের ব্যর্থ হবে। বল ভাই, মায়ের প্রতিমা ঘিরে যে পুরুষ এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে তুমি দূর করবে, তার কোন ছলায় বিমুগ্ধ হবে না, সংশয়ের ঘনঘটা হৃদয় আবৃত ক'রে ধ'রলে, তপস্যার অগ্নিশিখা উজ্জ্বলতর ক'রে তুলবে। জীবন তোমার আলোকিত হোক। দোষ কারু নয়, ঐ পাপ পুরুষকে জাতির জীবন থেকে নির্ব্বাসিত ক'রতে পারলেই ভেদহীন নূতন সমাজ গড়ে' উঠবে, আবার বলি—তপঃ, তপস্যায় হৃদয় ঢেলে দাও।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

——:০:——

[শিক্ষা-কমিশনের কার্য্য বিবরণী—মনস্তত্ত্বের বিচিত্র চিত্র—শিক্ষা সংস্কার অসম্ভব কেন?]

(১)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষা-কমিশনের যে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে তার চাইতে পূর্ণতর, বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার বই আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এই সুবৃহৎ বর্দ্ধিতবপু পুস্তক পাঠে বেশ বুঝতে পারবেন আমাদের দেশে শিক্ষার মত এত বড় একটা সমস্যা সম্বন্ধে লোকের কিরূপ মূঢ় ধারণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক; পাদরীদিগের বিদ্যালয়ের নেতৃবর্গ, পণ্ডিত, বিদ্বান, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, ব্যবসায়বিদ্‌, ইত্যাদি সকলের স্বাধীন মতামত

ও সংস্কার প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়াই পুস্তকখানি গঠিত।

এই ছয়াংশে (six volumes) বিভক্ত নয়বপু পুস্তকখানি পাঠে সুধীজন শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে না পারলেও প্রস্তাবক জনগণের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এটা নিশ্চয়ই। এরা সকলেই বিদ্বান ও উচ্চ বংশ বা দেববংশ সম্ভূত। জাতীয় সদ্গুণাবলীর সহিত জাতীয় অগুণাবলীও পুস্তকখানির প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে সুপ্রকাশিত। অতি সুক্ষ্মদর্শী মনস্তত্ত্ববিদ্গণেরও এত ছত্রভাগ পাঠটির সকল শিক্ষাতত্ত্ব বহুবর্ণসাপেক্ষ।

লাটিন ভাষার আত্মার চিন্তাচক্রের মধ্যে আক্রম না করলেও সংস্কার প্রস্তাব সংখ্যা বড় কম হয় নাই। কিন্তু কোন প্রস্তাবেই সকলে একমত হন নাই। যথেষ্ট প্রমাণসহকারে বড় বড় লোকে অদ্ভুত-বিশ্বাসে বিপরীত প্রস্তাবপুঞ্জের সমর্থন করেছেন। একজন বলেছেন—গ্রীক-লাটিন বাদ দিলেই পূর্ণ সংস্কার সাধিত হবে। অপরজন তার পরেই বলেছেন "এই গ্রীক লাটিন শিক্ষার আরও বহুল-প্রচারেই শিক্ষা সমস্যার মীমাংসা হবে। বিশেষত লাটিন শিক্ষা ত চাইই কারণ—লাটিন প্রতিভার পরিচয়েই মানবমনে সাধারণ ও বিশ্বজনীন (general & universal) ভাবরাজি উপ্ত হয়।" বড় বড় পণ্ডিত (বৈজ্ঞানিক) এই সাধারণ ও বিশ্বজনীন ভাবটা কি যেটা লাটীনের ভিতরেই পাওয়া যায়, এবং সেটার স্বরূপ বা সংজ্ঞাটাই বা কি, তা বুঝতে না পেরে একমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষারই সমর্থন করেছেন। তার পর আবার তাঁদেরই মত প্রখ্যাতনামা বিদ্যার্ণবগণ উত্তর দিয়েছেন যে একমাত্র বিজ্ঞান চর্চায় মানুষ অতিশীঘ্র (মানসিক) বর্ব্বরতা প্রাপ্ত হবে এটা নিশ্চয়ই। এইরূপে জনে জনে স্ব স্ব ধারণানুসারে তর্ক-যুদ্ধে কেবল বিষয় তালিকাটিকে মথিত করেছেন।

কমিশনের সকলেই বিষয় তালিকাটির পরিবর্ত্তন একবাক্যে প্রার্থনা করলেও এই বিষয়তালিকাভুক্ত বিষয়ের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কেহ ভ্রমেও একটী কথা বলেন নি। পাঠকের হয়ত মনে হচ্ছে যে এইটাই প্রধান ও প্রাথমিক কথা—কিন্তু বিদ্যাদিগ্গজ আচার্য্যগণ এটাকে কর্ত্তব্য বলেই মনে করেন নি। সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে বিষয় তালিকাটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, আর, হয়ত তাঁদের ব্যাভিচার ভয়ে, পদ্ধতির উপর বিশ্বাস স্থাপন একেবারেই অনাবশ্যক মনে করেছেন। আপনারা সাক্ষাৎ আমাদের পদ্ধতির কারাগারে শিক্ষিত হয়ে নূতন পদ্ধতি যে সম্ভব এ কথা বিশ্বাস করতেও শিক্ষকরা ভয় পান।

এইটাই আমাকে বেশী আশ্চর্য্য করেছে যে এত গুলি মনীষীর মধ্যে একজনও জানেন না শিক্ষা ও সাধনার (Instruction & education) মনস্তত্ত্বটী কোন আইনের (law) উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এদের এ সম্বন্ধে, অন্ততঃ কারোও, স্পষ্ট ধারণা যে নাই তা নয়। অন্ততঃ একটী ধারণা তাঁদের ঘাড়ে এমনি ভাবে চেপে বসে আছে যে সেটার সম্বন্ধে আলোচনা করাটা তাঁরা নিষ্প্রয়োজন ভেবে রেখেছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ বদ্ধমূল ধারণাটী এই যে—"কেবলমাত্র স্মৃতির ভেতর দিয়েই সকল জ্ঞান চিত্তে প্রবেশ করে ও গ্রথিত হয়ে থাকে। তাই ছাত্রের একমাত্র স্মৃতির চর্চ্চা দ্বারাই তাহাকে শিক্ষিত ও সিদ্ধ করা যায়। তাই আমাদের চাই নিখুঁত একটী বিষয় তালিকা—আর কতকগুলি ঐ রকমের পাঠ্য। সকল পাঠ ও পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করাই শিক্ষার শেষ উপায়।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তার গোড়ায় এমন গলদ যে কত মারাত্মক ও হীনকর তা সহজেই বোধগম্য। এই রকম গোড়ার ভুলটাকে বজায় রেখে লাটিন জাতটা শিক্ষা দীক্ষায় এত পীড়িত হয়ে পড়েছে।

ভাবী মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এটা দেখে হাঁকরে থাকবেন যে এতগুলো জ্ঞানী, কর্ম্মপটু ও দূরদর্শী লোক একত্রে শিক্ষা-সংস্কার-আলোচনা কালে একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করেন নি যে ঃ

কেমন করে (কোন পদ্ধতিতে) জানবার বিষয়টা চিত্তে প্রবেশ করে ?

(২) কোন পদ্ধতিতেই বা সেটা সেখানে বদ্ধমূল হয় ?

(৩) কেবল স্মৃতি সহায়ে যে জ্ঞানটা চিত্তে যায় সেটার শেষে হয় কি ?

(৪) স্মৃতির সরু জাল দিয়ে বাঁধা জ্ঞানের বোঝাটা কি চিরস্থায়ী হয় ?

এই শেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে—স্মৃতির বোঝা স্থায়ী হয় কিনা তার সিদ্ধান্তটা পূর্ব্ব থেকেই এক রকম হয়েছিল। যদি এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকত তাহলে কমিশন অনায়াসেই তার নিরসন করতে পারত। দেশের যত বড় বড় আচার্য্য সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে মুখস্থ বিদ্যাটা পরীক্ষার কয়েক মাস পরেই অন্তর্হিত হয়, আর (experimentally) পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন যে স্মৃতির বোঝাটা একেবারেই অস্থায়ী।

সত্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতিটা একেবারেই দূষিত, অন্য পদ্ধতির সন্ধানই এখন একমাত্র কর্ম্ম। কমিশনরগণ তাঁদের বিষয় তালিকা ভাঙ্গা গড়ার কূট নৈয়ায়িক গবেষণা ত্যাগ করে যদি অন্যান্য দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন তাহলে সত্যই দেশের উপকার করা হ'ত। কিন্তু তাঁরা সেটা করেন নি তাই এই পুস্তকে আমরা সেটার চেষ্টা করব। আমরা দেখাব—বুদ্ধির জানাকে চিত্তের সংস্কারে পরিবর্ত্তিত করাই শিক্ষার শিল্প। পুনঃ পুনঃ জানা ও অজানার মধ্যের সম্বন্ধ শৃঙ্খলাটা নাড়া চাড়া করতে করতে চিত্তে অজানার এমন একটা সত্য সংস্কার হয়ে যায় যে তখন সেটা অজানার দল ছেড়ে জানার দলভুক্ত হয়। এখানে স্মৃতির কাজ সাধারণতঃ অতি অল্পই থাকে। বিচক্ষণ শিক্ষক এইরূপ নব নব সংস্কার সৃষ্টি করতে জানেন—আর অনাবশ্যক ও বিরুদ্ধ বিপজ্জনক সংস্কার উৎপাটন করতেও পারেন।

সেই জন্য মনস্তত্ত্বের দুএকটা গোড়ার কথা জানলেই সত্য শিক্ষাপদ্ধতিটা আপনিই ফুটে উঠে। এই দুএকটা গোড়ার কথা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম হলেই ধ্রুবতারার মত সর্ব্ব-বিপর্য্যয়েই এগুলি শিক্ষকের পথ নির্দ্দেশ করে। এই কয়টা কথা যেগুলো অন্যান্য দেশে লোকে আপনাআপনি ধরে নিয়েছিল আমাদের দেশে তা এত নূতন যে কেহ কেহ বুদ্ধির জানাকে চিত্তের সংস্কারে পরিণত করারূপ শিক্ষা-সংজ্ঞাটাকে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা আর চালাকী (paradox) বলেই মনে করেন।

২

কমিশনের সকল অনুসন্ধানই তাই একমাত্র বিষয়-তালিকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবে এই অভাগা বিষয় তালিকাটাকে পরিবর্ত্তন করবার জন্যে, এই সকল ব্যাধির কল্পিত কারণটির সংস্কারের জন্যে, লোকে কিন্তু আজিকার কার্য্য-বিবরণীর অপেক্ষা করে নি। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ বড়াধিকবার এই বিষয় তালিকাটিকে ভেঙ্গে গড়া হয়েছে। বার বার বিফল-কাম হলেও কেহই ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন নি।

আমরা যে শতাধিক বৎসর বিষয় তালিকাকে 'অদ্ভুত বিশ্বাসে' আঁকড়ে পড়ে আছি, এটা অপরের নিকট আশ্চর্য্যের কথা হ'লেও, আমাদের জাতীয় জীবনের এটা একটা দুরপনেয় ভ্রমের বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র। ভ্রমটি এই, যে আমরা মনে করি—যে "আইনের ঘায়ে (act of parliament দিয়ে) বড় বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করে আমরা এক দিনেই সব

আর মানুষের আত্মপরিবর্ত্তন একেবারেই অসম্ভব।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় এটা একেবারেই দেখতে পাচ্ছে না, এবং শিক্ষাকমিশনের সদস্যগণও তার চাইতে ভাল দেখতে পান নি, যে প্রোগ্রাম নয়, তার শিক্ষা পদ্ধতিটারই পরিবর্ত্তন করতে হবে। পুরাতন পদ্ধতিটা একেবারেই পরিত্যাজ্য। গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই 'তেন'র (Taine) মত বলে গেছেন—"বিশ্ববিদ্যালয়টা আমাদের একটা শত্রু, এটা আস্তে আস্তে আমাদের নীচু দিকেই নিয়ে চলেছে।" সাধারণে ভাবত যে "থাকগে ও একটা লেখাপড়া জানা পাগলের আড্ডা বই ত নয়।" অনুসন্ধানে লোকে জেনেছে আড্ডাটা তাদের জীবনে একটা মস্ত বড় সত্য বিষফলই প্রসব করেছে।

এই শিক্ষার অনুৎকর্ষতার সত্য কারণটা ধরতে না পারলেও শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে এই কমিশনের পূর্ব্বে অনেকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে মঃ হ্যারি দোভিল, আকাদেমী দে সিয়াঁসের প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন—"অনেক বৎসর ধরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে আসছি, আজ আমি অবসর গ্রহণ করতে চলেছি—বেশ, আমি আজ খোলাখুলি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছি যে বিশ্ববিদ্যালয় এরকম থাকলে আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধতমেই নিয়ে যাবে।" ঐ সভাতেই খ্যাতনামা রাসায়নিক ডুমা (Dumas) বলেছিলেন—'অনেকদিন থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এ শিক্ষা-পদ্ধতিটা আর চলবে না এবং এটাকে আজও চালালে জাতীয় অবনতিই এসে পড়বে।'

কিন্তু কেন এরকম বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের নির্ম্মম সমালোচনাতেও বিষয়-তালিকার পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন সংস্কার সাধিত হয় নি? কোন গূঢ় কারণ-সমষ্টি, সকল আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনকে চিরদিনই দূরে দূরে রেখে দিয়েছে?

৩

রাজনৈতিক বা শিক্ষানৈতিক কোন একটা প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাটা অনুভব করবার ক্ষমতা এবং তার সমালোচনা করার সামর্থ্য সকলেরই আছে। স্বল্পবুদ্ধি লোকেরও অপবাদ দিবার (negative criticism করবার) সময় বুদ্ধি প্রখর হয়ে উঠে। কিন্তু এ রকম লোকে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে যে সংস্কার করা আবশ্যক সেটা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারবে না। এই স্থান-কাল পাত্রের সম্ভাবনার ক্ষেত্রের উপরেই অতীতের সৃষ্টি শিকড় গেড়ে আছে। সম্ভব অসম্ভব বিবেচনাশক্তিটা কোন কোন জাতের বিশেষতঃ ফরাসীদের একেবারেই নেই।

কমিশনে যে 'গড়বার' (positive) প্রস্তাব অনেকে উত্থাপন করেছেন সেগুলো যে কেবল যুক্তিযুক্ত তা নয়, সেগুলো মেনে নিয়ে সহস্র চেষ্টা করলেও আমরা কখন তাদের কাজে পরিণত করতে পারব না। নানা কারণে, বিশেষতঃ 'সর্ব্বজয়া' লোকমত এদের বিরুদ্ধে থাকায়, এর কোনটার অনুষ্ঠানই আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি কদর্য্য হতে পারে, কিন্তু এটা লোকমতের "মতন" বলে এখন টিকে আছে—আর এই লোকমতের চাওয়াই সত্য সত্য এটার জন্ম দিয়েছে।

কতকগুলো সংস্কার-প্রস্তাবের উপর একবারটি চোখ বুলিয়ে গেলেই বেশ বুঝতে পারা যাবে কেন এ গুলোকে কর্ম্মে পরিণত করা এতটা শক্ত।

ধরুন, একজন যেমন প্রস্তাব করেছেন, স্কুলগুলোকে সহর থেকে বাহিরে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাওয়া একান্ত দরকার। তাতে ছেলেরা বেশী শুদ্ধ হাওয়া পায়, আর খেলবার বেড়াবার অনেক ফাঁকা যায়গারও তা'হলে অভাব হয় না। ইংরাজেরা অনেক দিন পূর্ব্ব থেকেই এই সংস্কারটা করতে আরম্ভ করেছে আর প্রস্তাবটাও কোনদিক থেকেই

নিন্দনীয় নয়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে যে বহুঅর্থ ব্যয়ে যে সকল বিদ্যালয়— পল্লীক্রোড়ে স্থাপিত হয়েছিল সেগুলো ছাত্রাভাবে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হচ্ছে, কারণ ছেলেদের বাপ মা একান্তই আপনাদের অঞ্চল-ব্যাসের মধ্যেই তাঁদের নয়নমানিকদের রাখতে চান। এ প্রস্তাব তাই কর্ম্মে পরিণত করা একেবারেই অসম্ভব। কেমন করে বিশ্ববিদ্যালয় বাপমায়ের এই স্নেহ-ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করবে?

আর একজন বলেছেন অনাবশ্যক গ্রীক লাতিন তুলে দিয়ে অত্যাদেশ্যকীয় প্রচলিত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হ'ক। পরিবর্ত্তনটা সাধিত হলে ভালই হয়। কিন্তু পরিবর্ত্তনটা কেমন করে সম্ভব হবে যখন ছেলেদের সেই বাপ মা'ই আবার ঐ শিক্ষাগুলিকে স্থায়ী করে রাখতে চান। তাঁদের হয়ত ধারণা গ্রীক লাতিন পড়লে না জানি ছেলে কি না হবে; অন্ততঃ এইরকম পুরাতন ভাষায় অভিজ্ঞতা যে একটা কৌলীন্য বিশেষ তা'তে আর তাঁদের কোন সন্দেহই নেই! গভর্ণমেণ্ট কেমন করে বাপ মায়ের এই কৌলীন্য-কল্পনা অপনোদন করবেন?

আবার একজন বলেছেন, ইংরাজবালকের মত আমাদের ছেলেদের, এতটা পাহারা আর বন্ধনের মধ্যে না রেখে, একটু মুক্তি দিয়ে আপনার পায়ে দাঁড়াতে দিলে মন্দ হয় না। এটা যে শুধু মন্দ হয় না তা নয় বরং খুব ভালই হয় কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই মূঢ় সাহসের পরিচয় দেবে যখন অনুসন্ধানে জানা গেছে যে আদালতের জজেরা এইরূপ স্বাধীনচিত্ত কর্ত্তৃপক্ষদের জরিমানায় জরিমানায় একেবারে দেউলিয়া করে দিয়েছেন। অভাগাদের দোষের মধ্যে দোষ তারা ছেলেদের আপনাআপনি খেলতে দেওয়াতে একদিন নাকি কার চোখে লেগেছিল—আর একদিন নাকি কার হাত ভেঙেছিল।

আর একজন সাদাসিধে লোক ছোট্ট একটা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবটা কিন্তু সব চাইতে বেশী ভোট পেয়েছে। প্রস্তাবটা হচ্ছে এই যে 'বাকালোরেয়ার' বদলে 'পথের পরীক্ষা' (Exam. of passage) নাম দিয়ে নতুন ৭।৮'টা 'বাকালোরেয়া করলে ভাল হয়, তা'হলে আর খারাপ ছেলেরা শেষ পর্য্যন্ত এসে হতাশ হয়ে ফেরে না। কথাটা শুনতে হয়ত মন্দ নয় কিন্তু কাজে এটা কতটা অসম্ভব। মঃ বুইস্ন্ নথাপত্রে দেখিয়েছেন যে ১০,০০০ ছেলে এক বৎসর ডিগ্রী পাশ দিতে গেলে অন্ততঃ ৫,০০০ ফেল করে অর্থাৎ প্রতি বৎসর ৫,০০০ যুবকের বিদ্যালয়ের জীবনটা একরকম ব্যর্থই হয়। ফলটা দেখলেই আচার্য্য ও ভাল ভাল বিষয়-তালিকার সার্থকতা সকলে বুঝতে পারবেন। সেকথা যাক, কিন্তু পাদ্রীদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অতি কষ্টে অর্দ্ধেক দেউলিয়া হয়ে যে সব গভর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে আছে তারা কি এক কথায় ৫,০০০ ছেলের মাহিনা ছাড়তে পারবে! যে জুরীতে এই রকম রায় দেবে তাকে ছেলেদের বাপমায়ের তাড়নায় আর কর্ত্তৃপক্ষদের চাপে শীঘ্রই হাসিমুখে, সকলের পড়ে সময় নষ্ট করবার, খোলা হুকুম দিতে বাধ্য হ'তে হবে। দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার কথাটা 'যৎপূর্ব্বং তৎপরং' হয়ে দাঁড়াবে।

কেহ কেহ আবার আমাদের ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতিটার সোজাসুজি নকল করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সত্য ইংরাজদের শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের চাইতে ঢের ভাল—এতে ছেলেদের চরিত্র গঠিত হয়, আত্মনির্ভরতা ও বৈশিষ্ট্য বাড়ে, ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, আর যেটা অনেকেই হয়ত ভাল করে জানেন: প্রচুর সংযমশিক্ষাও এর মধ্যে সম্ভব হয়ে উঠে! সংস্কারটা কল্পনায় অনিন্দ্য সুন্দর হ'লেও কাজে এটা করা দুরাশামাত্র। একটা জাতি যার পুরুষানুক্রমের

চরিত্রটা আমাদের হতে একেবারেই আলাদা তাদের পদ্ধতিটা কিরকম করে আমাদের জীবনে খাটবে? তা'ছাড়া এরকম সৃষ্টিছাড়া প্রচেষ্টা তিনমাসও টিকবে না। আমি এমন একজন অভিভাবককেও জানি না যিনি আপন পুত্রকে 'একলা' বিদ্যালয় থেকে ফিরে আসতে দেবেন, যিনি ছেলের জন্য টিকিট কেনবার একটা লোক ষ্টেসনে রেখে দেবেন না, যিনি ছেলের সঙ্গে সঙ্গে একজনকে পাঠাবেন না যে ছেলেকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখবে, মোটরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে দেবে, যাওয়ার সময় 'ওভার কোট' গায়ে দিতে ব'লবে, যখন ট্রেন আ'সবে তখন সাবধান করবে, গাড়ীর চাকার তলায় "ছুটে" গিয়ে পড়ে তার জন্য সাবধান করে দেবে বা রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মরা থেকে রক্ষা করবে।— একলা ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে খেলতে একটা চোখ কানা করে ফেলার কথা ত একেবারেই অভদ্র। যদি এই রকম পুরাণপন্থী বাপমায়ের ছেলেকে ইংরেজদের ছেলের মত যখন ইচ্ছা যেমন করে ইচ্ছা পড়তে আর কাজ করতে দেওয়া হয়, রক্ষক উপস্থিত না করে আপন ইচ্ছায় কঠোর ক্রীড়া সমূহে যোগ দিতে দেওয়া হয় যখন ইচ্ছা বাটী বা বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাহলে কাজটা সত্যসত্যই অন্যায় হবে না বটে—কিন্তু প্রথম 'আঘাতের' সংবাদেই অভিভাবক গোষ্ঠী—সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের সহিত এরূপ মর্ম্মভেদী বিকট আর্ত্তনাদ উত্থিত করবেন যে পার্লিয়ামেণ্টে শিক্ষাসচিব প্রশ্নের বাণে জর্জ্জরিত হয়ে মন্ত্রীত্বনাশ আসন্ন দেখে অচিরে 'পুনর্মূষিকোভব' মন্ত্রটা উচ্চারণ করতে বাধ্য হবেন। আমি একজন ভদ্র মহিলাকে জানি—তাঁর স্বামী আমার পরামর্শে ছুটীতে পুত্রকে একটু জার্ম্মাণ শিখবার জন্য জারমেনিতে অবকাশটা কাটাতে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন বলে, তাঁর স্ত্রী বার বার মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন—এমন কি তাঁর পুত্রকে একাকী বিদেশে পাঠান'র চাইতে সে ভদ্র মহিলা নাকি বিবাহবন্ধন ছিন্ন করাও শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন। "অষ্টাদশ বৎসর বয়সের আমার এই কোমল ছেলেকে একলা বিদেশ যাত্রায় ছেড়ে দোবো এমন ক্রূর হৃদয় পিশাচ না হলে এমন কথা মনে আসে না।" ক্রূরহৃদয় পিতা—বলা বাহুল্য অবিলম্বেই তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করেছিলেন।

হয়ত বা মাননীয়া ভদ্র মহিলা তাঁর অপত্যের একাকী ভ্রমণব্যাপারে সন্দিহান হয়ে অন্যায় কিছু করেন নি। পিতৃপিতামহের রক্তে বা শিক্ষার গুণের মধ্যে যে শক্তি যখন নেই তখন ছেলে ...... সামর্থ্য কোথা থেকে অর্জ্জন ক'রবে?

ইংরাজদের ছেলের কোথাও কেউ রক্ষক সাজা যেতে দরকার হয় না কারণ জন্মগত তাদের একটা শক্তি সংযম রক্তের সঙ্গে আছে—যা দিয়ে তারা রাস্তায় নিরাপদে, আপনি আপনাকে চালাতে পারে। তেমনি বোধ হয় অন্য কোন জাত নেই যারা এতটা সংযমী আর যারা প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনকে ......

ঠিক তাদের অন্তরে সংযম এত রকম একটা সংযম আছে বলে তারা দিবারাত্র চোখে চোখে না থাকলেও ঠিক থাকে। পুরুষানুক্রমের এইরূপ গুণাবলী কঠোর ক্রীড়া কসরৎ দিয়ে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে থাকে এইরূপ খেলায় যে আঘাত না লাগে এটা নয়—তবে ফরাসী পিতামাতা এরূপ ক্রীড়ায় কখন গোপালদের যোগ দিতে দিবেন না এটা নিশ্চয়ই।

যে দিক দিয়েই যাওয়া যায়—সেই এক কথায় এসেই মাথা ঠেকে যে ফ্রান্সে লোকমত উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করা একরকম অসম্ভব।

অতএব বড় বড় সংস্কারের কথা এখন 'থো' করে দেওয়াই ভাল। এ সব কথা নিয়ে কতকগুলো অনাবশ্যক বক্তৃতা ভিন্ন অন্য কিছু সম্ভবে না। বক্ত-

ক'রতেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষাটা ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়ে হলেও পদ্ধতিটা হয়ত একেবারেই ইংরাজী নয়। মার্সমেন, দেরোজারিও, এ্যালেকজাণ্ডার টমাসি'র পদ্ধতি কোরাণ ও পুরাণ মুখস্থ করা পণ্ডিতদের প্রপৌত্রদের হাতে এসে প'ড়ে, "জপাৎ জপাৎ সিদ্ধি'র পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। আর সরকারও যে তাতে প্রায় নিরপেক্ষ আছেন তাতে তাঁদেরও হয়ত উদ্দেশ্য আছে। হয়ত বা তাঁরা ক্রমেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচার করে ছিলেন। যাই হক এখন বিজ্ঞানটাকে (Scientific spirit) বাদ দিয়ে যে সাহিত্যিক শিক্ষা মুখস্থ আমরা করেছি তাতে বস্তু জগতে মাথা তুলতে আমাদের আবার ঢেলে সাজতে হবে।—

ইতি, অনুবাদক।

ভক্তিযোগ

ঃ০ঃ

যোগ ত্রিধা বিভক্ত। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম। আমি আজ ভক্তিযোগের কথাই বলিব। যোগের যে কোন ধারা অবলম্বন করা হউক। উহার মধ্যে ত্রিধারার আস্বাদ বর্তমান থাকিবে। কেননা উহারা পরস্পর নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। একটির সাধনায়, অপর দুইটির সাধনা হইয়া থাকে। কর্ম যোগের মধ্যেও আছে জ্ঞান আর ভক্তি। জ্ঞান যোগ ও ভক্তি এবং কর্ম ছাড়া নহে। এইরূপ ভক্তিযোগের সাধনাতেও, জ্ঞান ও কর্মের আস্বাদ পাওয়া যায়। কোন একটি যোগের দ্বারা ত্রিমার্গ-সাধনার মৌলিকত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভক্তিযোগের চরম সার্থকতা প্রেমে ও আনন্দে। জগদীশ্বর, প্রেম এবং আনন্দ দিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভক্তিমার্গে, ভক্ত ও ভগবান এক হইয়া যায়, সেইজন্য ভক্তের হৃদয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও প্রেমে ভরিয়া থাকে। অটুট ভাগবত শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিরূপে যখন আমাদের জীবনের সকল কর্ম পরিস্ফুট হইতে থাকে তখনই ইহা সম্ভব হয়, এই পরম ভাগবত শ্রদ্ধায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে ভক্তির পথই প্রশস্ত।

প্রত্যক্ষভাবে বিশুদ্ধ ভাগবত প্রেমে ও আনন্দে নিরবচ্ছিন্ন হৃদয় যখন ভরিয়া থাকে তখন জানিবে ভক্তির পূর্ণতা আসিয়াছে। কত দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে আমরা এই অবস্থা লাভ করিতে পারি। ভক্তির পূর্ণতা লাভে বহু অন্তরায় আছে। ভক্তির পথ সহজ আবার দুঃসাধ্যও বটে। সহজ কেননা, নিঃস্বার্থ চিত্তে, আপনার সবখানি কোন কিছুর উদ্দেশে দিয়া যাইতে পারিলেই, ইহার [illegible] হয়, কঠিন এইজন্য, সত্য আরাধ্য বিষয়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিলে, ভক্তি সার্বজনীন হইয়া উঠে না, এবং মুক্তির আনন্দও মিলে না। কিন্তু আজ যাহাকে ইষ্টদেবতা রূপে বরণ করিয়া লইয়াছি, উহা কোন দেবমূর্তি হউক, মানব, অথবা কোনরূপ আদর্শ হউক, প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া, কাল আবার আরও বৃহৎ ও মহৎ কিছুকে অবলম্বন করা সহজ কথা নহে। হৃদয়েরও একটা ধর্ম আছে, পূর্বপূজিত বিগ্রহ ছাড়িয়া নূতন প্রতীক গ্রহণের সময়, স্বভাবতঃ অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা আসিয়া থাকে, উভয়

দিক হইতে হৃদয়ে যে ঘাত প্রতিঘাত হয়, তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সাধনার পথে চির বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ ভক্তিকে সীমার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিলে, যেটুকু ভাগবত রস উপলব্ধি হয়, উহা নিতান্ত খণ্ড অনুভূতি, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ধ অনুভূতি হওয়াও বিচিত্র নহে ; বৃহতের সত্য আস্বাদ ইহাতে মিলে না, ভক্তি সাধনার এই গুরুতর সমস্যায় পড়িয়া অনেকেই জীবন ভোর কোথাও খণ্ডভাবে, কোথাও বা অন্ধ এবং মিথ্যা সাধনাতেই পরিতুষ্ট থাকিতে হয়।

কিন্তু অমৃতের কিছু আস্বাদ পাইয়া কে কোথায়—উৎসমূলে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করে ? কার হৃদয়ে না সত্যকে পূর্ণরূপে পাইতে আকাঙ্খার দাবানল জ্বলিয়া উঠে ? এতদ্ব্যতীত, এই আনন্দ এবং প্রেম মানুষকে ছাড়াইয়া কোন ভিন্ন বস্তু ত নহে। ইহারই প্রতিনিধি সে। সুতরাং অন্তরে যে স্বতঃসিদ্ধ আনন্দের আকর্ষণ আছে, উহার টানে আমাদের অনন্তের অভিযানে ছুটিতেই হইবে ; কিন্তু কোথা হইতে কোথায় ছুটিব, অন্তর দিয়াই কি অন্তরের সত্য দেবতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিব না, পরিপূর্ণ সত্যকে পাইবার জন্য হৃদয়কেই আমাদের পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে, অন্তঃসাধনাকেই প্রবল করিয়া ধরিতে হইবে। অন্তরের মণিকোটার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিতে পারিলে, সাধনার স্তর গুলিকে ভাঙ্গিতে হয় না, উপেক্ষাও করিতে হয় না, বরং ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক বাড়িয়া যায়—আমাদের মাথা স্বভাবতঃ ইহাদের দিকে নত হইয়া পড়ে। ভক্তির প্রসারতা যত বৃদ্ধি পাইবে, জ্ঞানদৃষ্টি তত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, অতীতের যে দান, উহার মধ্যে ভগবানের কল্যাণহস্ত আমরা নিশ্চয় দেখিতে পাইব, ইহার অন্যথা ঘটিলে বুঝিও, তুমি ভ্রান্তচিত্তে অহংকারের অনুসরণ করিয়াছ—যত কঠোর সাধনাই কর উহা ব্যর্থ হইবে। ভগবান সীমার আড়ালে লুকাইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন, ভক্ত যদি এই সত্য অনুভূতি গ্রাহ্য করিতে না পারে, রূপের চাপেই তাহাকে পিষ্ট হইতে হইবে, তদ্রূপ ভগবান হইতে কিছুকে অপসৃত বোধে, পাশ কাটাইয়া যতবড় সত্যের সাধনা হউক, উহা আরও ভয়াবহ এবং অধিক অজ্ঞানতার হেতু বলিয়া জানিও।

জগতের এমন কোন বস্তু নাই যাহার ভিতর তিনি অবস্থান না করিতেছেন। এ জগৎ তিনি ভিন্ন আর কিছু নহে, কোথাও তিনি অপূর্ণ নহেন, নিত্য পূর্ণ হইয়া অণু পরমাণুতে বিরাজ করিতেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন "মানুষী তনুমাশ্রিতম্" সকল আবরণের পিছনে সেই পরম ভাব যখন অবস্থান করিতেছেন, তখন সর্ব্বক্ষেত্রেই আমাদের উৎসর্গদাম সত্য হইতে পারে। বিকৃতাঙ্গ যে উহার মধ্যেও তিনি আছেন, মূর্খ সেও যে ভগবানের প্রতিনিধি, সকল বস্তু, সকল প্রাণী, সকল কর্ম্ম, সকল আদর্শ, সকলই সেই পরমপুরুষ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সাধকের চাই ইষ্টনিরূপণ করা (choice), ভক্তিযোগের নিষ্ঠাই পরম সহায়, বুদ্ধিভেদ জন্মিলে নিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া যায়, নিষ্ঠাভঙ্গে সাধকের পতন অনিবার্য্য। সাধনার কেন্দ্র যাহাই হউক, সার্ব্বজনীন ইষ্টদর্শনের ভাব অন্তরে রাখিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া চাই, আকৃতিগত পার্থক্যে ভক্তের হৃদয় দ্বিধাশূন্য হইবে, সত্যের স্পর্শে হৃদয় যদি একবার পুলকহিল্লোলে দুলিয়া উঠে, বাহিরের বৈষম্যে সাধকের হৃদয়ে ভেদ সৃষ্টি করিবে কেন ? সর্ব্বপদার্থে, সর্ব্বজীবে, সর্ব্বঘটনায় আমার ইষ্ট বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ সমদৃষ্টি লইয়াই আমাদের ভক্তি-সাধনা করিতে হইবে, দৃষ্টিগোচর সকল পদার্থই ভগবানেরই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অনুভূতিগ্রাহ্য সর্ব্ববিষয় ভগবানেরই লীলাশরীর, ভক্ত পূর্ণভাবে যখন জগতের সবকিছুকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন দিতে অকুণ্ঠ হয়, তখনই হৃদয় তার বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্ত সেথায় সাযুজ্য লাভ করিয়াছে,

ভক্তিযোগের ইহাই চরম পরিণতি, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই-খানে ভক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

ভক্তি সাধনার বিচিত্র ভঙ্গী। আমি মাত্র তিনটী প্রধান প্রণালীর কথা উল্লেখ করিব। প্রথম, ভগবানকে স্বতন্ত্র বোধে, কোন মূর্ত্তি, মানব, পশু, বৃক্ষ, যে কোন পদার্থকে সম্মুখে রাখিয়া উপাসনা করা। দ্বিতীয়, ভগবানকে সার্ব্বভৌম বোধে জগদ্ধিতার্থ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া চলা। তৃতীয়, তাঁহাকে অভেদ জানিয়া অন্তরের অসংখ্য বৃত্তিতরঙ্গ নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্য্যামীকে প্রকটিত করিয়া তোলা। ভক্তি সাধনার এই তিনটী স্তর, মূর্ত্তিউপাসনা, কর্ম্মসাধনা, অধ্যাত্মযোগ। যে কোন স্তরেই সাধন আরম্ভ হউক না, স্মরণ রাখিতে হইবে, বাহিরের আচার আচরণ অনুষ্ঠান বড় কথা নহে, মূল কথা ভাব লইয়া, ভাব ছাড়িয়া যে কর্ম্ম উহা বন্ধ্যা নারীর পুত্রতুল্য একেবারেই নিষ্ফল হইবে।

সাধনার সকল স্তরেই—অন্তরশুদ্ধির কথাই প্রথম। অন্তর বিশুদ্ধ হইয়া উঠিলে পৃথিবীর টান কমিয়া, ঊর্দ্ধের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ইহাই ভাগবদা-ভিলাষ (aspiration)। মূর্ত্তি উপাসনার উদ্দেশ্য অন্তরশুদ্ধি ও ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করিয়া তোলা। প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া একাগ্রচিত্তে অন্তরকে জাগাইয়া তুলিবারই তপস্যা হয়, প্রতিমাকে ইষ্টস্বরূপ অবধারণ করিয়া হৃদয়ে যে সুপ্ত শ্রদ্ধা আছে তাহাকে জাগ্রত করিয়া ধরিতে হয়, এই আকাঙ্ক্ষা, এই শ্রদ্ধা, ভাগবতপ্রেম ও আনন্দের অধিকারী করিবার জন্য আধারকে উপযোগী করিয়া তুলে। যে ক্ষেত্রে মূর্ত্তি পূজার এই অন্তর্নিহিত রহস্য অবিজ্ঞাত, সে ক্ষেত্রে প্রতিমাই বড় হইয়া উঠে, পূজার আড়ম্বর বাড়িয়া যায়, আচার আচরণের চাপেই পূজক চাপা পড়িয়া যায়, সাধনার প্রভাব না থাকায়, দেবমূর্ত্তি ম্লান হইয়া পড়ে, পরিশেষে অশ্রদ্ধা সহকারে উহা ইট পাথরের মত রাস্তায় গড়াগড়ি যায়, এইরূপ হওয়ায় প্রতিমা পূজার প্রয়োজনীয়তার মূল্য হ্রাস পায় না, এই মূর্ত্তি পূজার ভিতর দিয়াই কত মহাপুরুষ অন্তরের দেবতাকে জাগ্রত করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে সাধনার এই স্তর চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহার মধ্যেও যে সত্য আছে, যে আনন্দ আছে, যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা উপেক্ষা করিলে আমরা যে ভ্রান্ত এ কথা বলা বাহুল্য।

আধারকে ভগবান লাভের উপযোগী করিয়া তুলিবার এই একই উপাদান সংগ্রহের জন্যই কর্ম্মের অনুষ্ঠান। ভক্তি সহকারে যে কর্ম্ম উহার মধ্যে যুগপৎ প্রেম ও আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, কেননা ভক্ত, ভগবানের প্রীতির জন্যই শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। ভক্তিহীন কর্ম্মে প্রথমেই আনন্দ পাওয়া যায় না, কর্ম্ম করিতে করিতে অন্তরের ঠাকুর যখন জাগিয়া উঠেন—তখন কর্ম্মযোগী আনন্দের আস্বাদ পায়, কিন্তু ভক্তিযোগের অন্তর্গত যে কর্ম্ম—উহা প্রথম হইতেই নিঃস্বার্থ চিত্তে ভাগবত উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া—ভক্ত একপ্রকার আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এইখানে কর্ম্মের সহিত ভক্তির মিশ্রণ হইয়াছে। ভক্ত আতুরের সেবা করে, কেননা আতুরের আবরণে ইষ্টদেবতা লুকাইয়া আছেন, আতুরের মুখের হাসিটুকু ভক্তের উপভোগ্য উহা যে ভগবানেরই ভুবনমোহন হাসির ছায়া। এইরূপ দরিদ্রসেবা, বিশ্বমানবের কল্যাণকর্ম্ম, জাতীয়তা, সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হইতেছে ভগবান, প্রতীক উপাসনা হইতে নিখিলজনীন ভাগবত সেবারূপ এই কর্ম্মানুষ্ঠান বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের হৃদয়ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, ভগবান স্বয়ং সাধকের হৃদয়ে উপবেশন করিয়া তখন জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন।

মূর্ত্তি উপাসনা ও কর্ম্ম-সাধনার পশ্চাতে, আরও বৃহত্তর, মহত্তর সাধনপন্থা প্রসারিত রহিয়াছে।

উহাই হইতেছে অধ্যাত্ম সাধনা। মন্দির মধ্যে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত যেমন ভগবানের উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, বিবিধ আহার্য্য ও ঐশ্বর্য্য উৎসর্গ করিয়া, ইষ্টদেবতার প্রীতি সম্পাদনে অন্তরে বিমল পুলক উপভোগ করে, পুনঃ পুনঃ পুলক স্পর্শে হৃদয়ের আঁধার দূর করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে শনৈঃ শনৈঃ ভগবতলাভে অগ্রসর হয়, কর্ম্ম-সাধনার মধ্য দিয়া সাধক আত্মাহুতি দিতে দিতে অন্তর শুদ্ধ করিয়া যেমন প্রেম ও আনন্দের অধিকারী হয়, তদ্রূপ এই অধ্যাত্মযোগীও, হৃদয়ের অসংখ্য বৃত্তি অঞ্জলি অঞ্জলি বিশ্বপতির চরণে উৎসর্গ করিয়া, হৃদয় প্রেম ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলে। এই অধ্যাত্ম সাধনায়, কালের পরিমাপ নাই, সুযোগ সুবিধার প্রতীক্ষা নাই, আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, শ্বাসে শ্বাসে, সর্ব্ব অবস্থায়, হৃদয়ে সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, হর্ষ বিষাদ, কাম ক্রোধ প্রভৃতি তরঙ্গ উঠা মাত্র, ভগবানের চরণে সে দিয়া চলিয়াছে,—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, ভ্রমণে, সাধকের দৃষ্টি আছে অন্তরের দিকে, বৃত্তির পর বৃত্তি, অসংখ্য সমুদ্র তরঙ্গের মত কত বৃত্তিই উঠিতেছে পড়িতেছে—সাধকও নির্নিমেষ নয়নে, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে কেবলই দিয়া চলিয়াছে, এইরূপ করিতে করিতে, সকল বৃত্তি শুদ্ধ হইয়া অন্তর প্রেম ও আনন্দের হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন আর শত্রু থাকে না, মিত্র থাকে না, বিপদ থাকে না, ভয় থাকে না, বাহির হইতে যত আঘাতই চিত্তে আসিয়া আঘাত করুক উহা প্রেম ও আনন্দের সাহায্যেই পর্য্যবসিত হইবে। ভক্তের আরাধ্য ঠাকুর ধীরে ধীরে বাহিরে প্রসারিত হইয়া পড়ে, সে কি বিপুল ঐক্য, সে কি প্রেমের সম্বন্ধ, ঐক্য প্রতিষ্ঠার যত প্রকার নীতি ধর্ম্ম আছে, ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনের যত মহৎ প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত জগতে প্রচার হইয়াছে, তুলনায় কোনটাই ইহার সমকক্ষ নহে। ভক্তের চক্ষে সবই ভগবান, অশ্রদ্ধা নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, প্রীতির বাঁধনে জগৎ তখন তাহার আপনার হইয়া উঠে। এই শ্রদ্ধা, অন্তরে বাহিরে ভগবানের সহিত অভেদাত্মার অনুভূতি। জ্ঞান ও ভক্তির হরিহর মিলন এখানে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সাধকের হৃদয় শান্ত ও সমতাপূর্ণ হইলেও জগতে কোন বস্তু অপ্রাপ্য না থাকিলেও, প্রেম ও আনন্দের উল্লাসে সাধক জনহিতায় কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। জগতের যত ভেদ সে নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া লয়, নিবিড় ঐক্যে জগতে নূতন সৃষ্টি সে রচিয়া তুলে, বাহিরের বৈষম্য দূর করিবার জন্য কাহাকেও সে আঘাত করে না, নিজেও আহত হইয়া ফিরিয়া আসে না, অনাহত আনন্দের অপার্থিব শক্তির সাহায্যেই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। ভগবান যেমন অসংখ্য ভেদের মধ্যে অখণ্ড অভেদরূপে বিরাজ করিয়া লীলা করিতেছেন, ভক্ত তদ্রূপ জগতের সহিত আত্মস্বরূপে ঐক্য স্থাপন করিয়া পরমানন্দে জগদীশ্বরের মতই সৃষ্টির কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, ভক্ত ও ভগবান তো পৃথক কিছু নহে।

অনন্ত সত্তার অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিলেও, পরস্পরের সহিত যে সম্বন্ধ ভক্ত তাহা অবিকৃত উপভোগ করিতে পারে, ভক্তের স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, বন্ধু, দেশ, জাতি সবই থাকে, এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে, ভগবান স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে না, ভগবানেরই বিচিত্র লীলা—ভক্ত তাঁহার সহিত একীভূত থাকিয়াই ভোগ করে। ঐক্যের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিবিধ আনন্দের মধ্যে যে রস, যে ভোগ, তাহা উপভোগ করিতে করিতে দিব্য জীবনের বিশুদ্ধ রূপটি ফলাইয়া জগতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে, ভক্তি যোগের ইহাই মূল রহস্য।

সন্ন্যাসীর কথা

(প্রাপ্ত)

সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে আজ কে বসিয়া আছে? সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের নিপীড়নায় ভারত যে আজ জর্জ্জরিত—তবু তোমরা সন্ন্যাসীর আত্মকথা শুনিতে চাও, এ যে তোমাদের অসমসাহসিকতা।

সন্ন্যাসীর আবার আত্মকথা কি? যাহার সমস্ত কামনাই সম্যক সন্ন্যস্ত হইয়াছে— তাহার আর বলিবার কি আছে। যাহার নিজের অস্তিত্বই এক বিরাট অনন্ত অস্তিত্বের মধ্যে লীন হইয়াছে, তাহার আবার আত্মকথা কি? 'একের' কথাই তাহার আত্মকথা, 'সবার' কথাও তাহার আত্মকথা। তবু আজ সন্ন্যাসীর আত্মকথা শুনাইব -কি ভাবে যে শুনাইব তাহা আমি নিজেই জানি না—যাহা নিজেই আসিবে তাহাই শুনিতে হইবে, অধীর হইলে চলিবে না। আত্মকথা কি বানাইয়া নেওয়া চলে?

সন্ন্যাস যে ভারতের এক অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য তাহা আজ শিক্ষিতভারত মানিতে প্রস্তুত নহে। আজ ভারতের সন্ন্যাসী শিক্ষিত সমাজের কাছে একটা ভার বলিয়াই পরিচিত, তাহাদের অর্থনীতি বলে যে এমন লক্ষ লক্ষ সবল সুস্থ জীব, যে সমাজের উপকারে না লাগিয়া, কেবল সমাজের অন্ন ও বস্ত্র ধ্বংস করিতেছে উহাতে যে সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তাঁহারা মনে করেন যে, বেশ্যা ও শৌণ্ডিকও ভারতের সন্ন্যাসী অপেক্ষা ভারতসমাজের প্রয়োজনীয় সুখের উপকরণ। আজ সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যের মধ্যে যে এক প্রকাণ্ড ভেদের স্রোত বহিবার উপক্রম হইয়াছে, সে স্রোত রুদ্ধ করিতে হইবে। এখন হইতে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যের মধ্যে একটী মধুর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ভারতসমাজের যে কল্যাণ সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গৃহস্থ বলিয়া থাকেন প্রকৃত সন্ন্যাসী যদি হয় তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যত্ব, সেবকত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন, ভণ্ডামীর প্রতিষ্ঠা দেখিতে তাঁহারা রাজী নহেন—কেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে কি শিক্ষিত বাঙ্গালা পূজা করে না, স্বামী বিবেকানন্দকে কি সমগ্র ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র জগৎ পূজা করে না? কিন্তু তাই বলিয়া বিরজানন্দ, জ্ঞানানন্দ, জয়ানন্দ নাম ধারণ করিয়া গৈরিক পরিধান করিয়া যেই আসিবে তাহাকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে, এমন কি কোন দাবী আছে? সেটা শুধু অশিক্ষিত বর্ব্বরদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি বলি আছে বৈকি। এই 'সন্ন্যাসের আদর্শটাই' শ্রদ্ধার ও আদরের বিষয়, সন্ন্যাসীর দেহ বা বেশ তাহার বাহিরের ভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সন্ন্যাসীও ক্ষুধা পাইলে শাকান্ন আহার করে, তৃষ্ণা পাইলে জলপান করে, নিদ্রা আসিলে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে ও সময়ে সময়ে মেনকা রম্ভা উর্ব্বশী আসিয়া তাহাকেও অনঙ্গদেবতার শরণাগত করিয়া ফেলে। সুতরাং সন্ন্যাসীর এই বাহিরটাকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না—তাহার উপরের অংশ দেখিয়া বিচার করিতে বসিলে চলিবে না—যাহারা উপরের বস্তুটীকে দেখিয়া অন্তরের ভরে বিচার করিতে চায় তাহারা যে ভুল করিবে সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একজনই শ্রীঅরবিন্দ একজনই মহাত্মা গান্ধী হইল, কই দেশশুদ্ধ ত অরবিন্দ বা গান্ধী হইতে পারিল না। সকলেই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সকলেই যে স্বামী বিবেকানন্দ হইতে পারে না, তাহা কাহার না জানা

আছে? অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখাইবার আলোক যাঁহার কাছে আছে, তিনি হচ্ছেন অবতারী পুরুষ। তিনি অসংখ্যের ভাগ্য মোচন করিয়া দেন। তিনি মানুষের পশুত্বটাকে আয়ত্ত করিয়া, পশুকে মানুষ করেন ও মানুষকে ক্রমে দেবত্বে পরিণত করেন। আর যাহারা এই প্রকার অবতারী পুরুষদিগের সেবক, শিষ্য বা ভক্ত, তাহারা তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া থাকে বা যাহারা সেই পথে চলিতে চাহে তাহারাই জগতে শিষ্য সেবক বা ভক্ত বলিয়া অভিহিত। এই শিষ্য সেবকগণ গুরুর নির্দিষ্ট আদর্শের পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র—কেহ পারিতেছে, কেহ পারিতেছে না—কেহ এক আনা রকমের সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ বার আনা রকমের, আবার কেহ আদৌ পারিতেছে না- কেবল বাহিরের বেশেই বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়াই তাহাদের প্রতি অবহেলার, অসম্মানের, অবজ্ঞার কোন কারণ নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায় বলেন যে দেশের এ দুর্দ্দিনে তাহারা কোন সাহায্যই করে না, সুতরাং তাহারা সমাজ শরীরে দুষ্টব্রণ, বিস্ফোটক, তাহারা সমাজ সুখের কণ্টক মাত্র। এত ব্যর্থ জীবন লইয়া এই পতিত দলিত ভারত সমাজ চলিতে পারিতেছে না। কথাটা এক তরফা শুনিলে সত্য বলিয়াই প্রতীত হইবে—কিন্তু সে হেতুটী এতই লঘু যে সেদিক দিয়া এত বড় একটী আশ্রমের ভালমন্দ বিচার করিতে বসা উন্মাদের [illegible]! এই আশ্রমটীকে সম্যক জানিতে হইলে ভারতের তথা প্রাচীনভারতের অন্তরতমদেশ হইতে জ্ঞানের উপকরণ সন্ধান করিতে হইবে। সে ধৈর্য্য কয়জনের আছে?

শিশ্নোদরপরায়ণ পাশ্চাত্য জগতের অনুগামী বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ বলিতে চায় "সন্ন্যাস যে বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সন্ন্যাস যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে, আর সেই বৈরাগ্য ও ত্যাগই যে ভারতের অধঃপতনের কারণ—ধর্ম্মের মাত্রাধিক্যই যে ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল হেতু।" আমি একথা আদৌ স্বীকার করি না। ভারতে ধর্ম্মহীনতাই ভারতের পতনের কারণ, ধর্ম্মের গ্লানির ভিতর দিয়াই যে এই পুণ্য ভূমি আজ এই দশায় উপনীত হইয়াছে তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। চক্ষুষ্মান্ মাত্রেই তাহা দেখিতে পান ও সেই জন্যই সর্ব্বদা ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা ভারত সমাজে বার বার হইয়াছে। এই কথাটী ভারতসমাজকে স্মরণ করাইবে কে? সে এই গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, সে এই ভিক্ষান্নজীবী সন্ন্যাসী। সে এই কপর্দ্দকহীন, আশ্রয়হীন সন্ন্যাসীই করিবে, তাহারই উপর এ কর্ম্মের ভার ন্যস্ত। ভারতে ধর্ম্মস্থাপনের ভার স্বয়ং শ্রীভগবান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ক্ষেত্রে আনিবার ভার, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ভার সাধু সন্ন্যাসীর উপরই ন্যস্ত। তাহারাই এখনও বেদ বেদান্তের, ভক্তি উপাসনার, শ্রদ্ধা ও প্রেমের মূর্ত্তি লইয়া ভারতের দ্বারে দ্বারে নারায়ণ হরির, রাধাকৃষ্ণের নাম শুনাইয়া সুপ্ত ভারতবাসীকে জাগ্রত করিতেছে।

আজ যদি বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী না হইতেন, যদি তাঁহারাই ভারতের প্রাচীন সত্যকে নূতন করিয়া মানব সমাজে দান না করিতেন, তাহা হইলে যে বাংলায় এ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের, এ ভাবের বান ডাকিত না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ যদি শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পাষাণের অন্তরে "মা" যে বিরাজ করেন, না দেখাইতেন তাহা হইলে বোধ হয় ঈশ্বরের সাকারত্ব বিষয়ে শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেন। যাঁহারা মনে করেন যে আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুনই মানব জীবনের চরম সার্থকতা, যাঁহারা মনে করেন চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক জয় করা, অধিকার করাই জীবনের সার্থকতা, যাঁহারা মনে করেন সম্রাটত্ব বা ইন্দ্রত্বই জীবনের সার্থকতা—যাঁহারা মনে করেন ভোগ—পাশবিক ভোগই

মানবের ইহকাল ও পরকালের ইষ্টদেবতা, তাহারা ভারতের মর্ম্মকথা জানে না। ভারতের আত্মার কথা ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরাই জানিতেন ও সেই তত্ত্বের উপরই ভারত সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই তত্ত্ব যে দিন ভারতবাসী ভুলিল সেই দিনই ভারত সমাজের শান্তি ও শক্তির আসন টলিল।

ভারত সমাজের ভিত্তি টলিয়া উঠিল, ভারত সমাজের অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইল—বাহিরের দিকেই দৃষ্টি ধাবিত হইল, অন্তর হারাইয়া যখন ভারত বহির্ম্মুখী হইল সেই দিনই ভারতের দুর্দ্দশার আরম্ভ হইল, অন্তরে ও বাহিরে যতদিন সামঞ্জস্য ছিল, ততদিন ভারত সুখের, শান্তির আকর ছিল। ভারত যেদিন কেবলমাত্র ভোগের পথে বাহির হইয়া বিবেক বৈরাগ্য সাধনাদি হারাইয়া বসিল, সেই দিন ভারত শ্রদ্ধা হারা হইল, প্রেম হারাইল, যে দিন ভারত "সত্য" হারাইল, সেই দিনই ভারতের অধঃপতনের আরম্ভ হইল। যে দিন ভারত কেবল "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম" মুখে আবৃত্তি করিল, মনে সাড়া পাইল না, যে দিন ভারত শুধু উপরেই ধর্ম্মের আকার ধারণ করিল, আর অন্তরে অশুদ্ধির সিংহাসন পাতিল, সেই দিনই ভারতের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। যে দিন ভারত, উপনিষদের সত্যকে দূর করিয়া শাস্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমাজকে পরিচালিত করিতে যত্নবান হইল, যে দিন ভারত বিধি-নিষেধের গণ্ডী দিয়া প্রকৃতিকে সংযত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল, সেই দিনই ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। হইতে পারে যে তখন তাঁহারা আবশ্যক বোধে তাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা ক্ষণিকের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তাহার উপর একটা চিরন্তনের ছাপ মারিয়া, ছাড়িয়া দিয়া ভারতের অন্তরাত্মাকে আর ফুটিতে যে দেন নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার আজ আর কোন কারণ নাই। অকৃত্রিমতাই যে মানুষের শোভা, কৃত্রিমতা দ্বারা সেই শোভাকে নষ্ট করা যে অত্যাচার এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন? ছাই চাপা দিয়া কি অগ্নিকে চাপা যায়? ধর্ম্ম যে মানবের প্রাণ, ধর্ম্ম যে "সত্যে"ই প্রতিষ্ঠিত। এই সাধারণ কথাটা না বুঝিলে যে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, ইহাতেই ত মানব সমাজে এত দ্বেষ দ্বন্দ্ব, দুঃখ দৈন্য। এই সত্যকে জাগ্রত করাই যে মানব জীবনের সার্থকতা—যাঁহারা এই তত্ত্বটী ভুলিয়াছেন, তাঁহারা কবি হইয়াও কাঙ্গাল, তাঁহারা ধনী হইয়াও নির্ধন, তাঁহারা বিদ্বান হইয়াও মূর্খ। যে সত্যকে জাগ্রত করিয়া মানব জীবন সার্থক করিবে, সেই "সত্যের" উপাসকই ভারতের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী যে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত ও লোক সংগ্রহের জন্য শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, সকল বন্ধনকে বরণ করিয়া মুক্তির শোভা, মুক্তির ঐশ্বর্য্য জগতের সম্মুখে ধরিয়া রাখে, দেখায় তাহার সন্ন্যাসের ঐশ্বর্য্য, সে দেখায়—"দেখ আমার দুগ্ধফেননিভ শয্যাতেও যেমন সুখনিদ্রা হয়, প্রস্তর স্তূপের উপরও তেমনি সুখনিদ্রা হয়—দেখ আমার অনাহারেও যেমন অনাবিল আনন্দ, চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রাজভোগেও তেমনই আনন্দ—দেখ আমি জন্মমরণের অতীত, ভোগত্যাগের অতীত, মান অপমানের অতীত।" যাহারা আজ এই ভোগের যুগে এত বড় আদর্শ সমাজের সম্মুখে এমন করিয়া ধরিয়া আছে, তাহাদের তুচ্ছ করিও না, আদর্শকে খাটো করিও না। কেবল বিচার কর কি হারাইয়াছ। হারাইয়াছ সেই সৎ-এর ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, যদি তাহা না হারাইতে তাহা হইলে উপরের জিনিষটা না ধরিয়া এমন টানাহেঁচড়া করিতে না—তাহা হইলে খুচরা সুখেই পরিতৃপ্ত হইয়া মূল হারাইয়া জীবন ব্যর্থ করিতে না। সন্ন্যাসী উপরের ভাগটীকে ধরিয়া রাখিয়াছে শুধু পরিচয়ের জন্য, আর অন্তরের ভাবটি লইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া ভিক্ষার ঝুলি খোলে—তোমরা অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া নিজেদের অহঙ্কারের

জঞ্জাল তাহাদের ঝুলিতে সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে আপনাকে বল, ভিক্ষুককে দান করিয়া পুণ্য করিলে, বা একটা বিরক্তির হাত এড়াইলে, নিন্দার হাত এড়াইলে, কিন্তু দেখিলে না যে, সে তোমার গৃহের আবর্জ্জনার মধ্যে এক বিন্দু শঙ্কা রাখিয়া গেল। এইটা যদি দেখিবার চক্ষু থাকিত তাহা হইলে আজ কি এত পঙ্গু হইয়া থাকিতে।

পঙ্গু হইলে কেন? শুধু সত্যের মূর্ত্তিটী দেখিতে চাহিলে না বলিয়া – শুধু ভাবিলে আমি অসমর্থ জীব অজ্ঞ হীন, আমি কি 'সত্য'কে বুঝিতে পারি, না ধারণ করিতে পারি। এই কথা শুনিয়াই স্থির করিলে 'শাস্ত্রের বন্ধন চাই'। হাত পা মন সব ইন্দ্রিয়গুলিকে কঠিন নিগড়ে বদ্ধ না করিলে, নিপীড়িত না করিলে ঠিক পথে চালাইতে পারিব না।" কর্ম্মদেবতার লীলা ভূমি এই সংসারকে অনায়াসে মিথ্যা বলিয়াও যম নিয়মের বোঝা বাঁধিয়া নিজেকে এই মিথ্যা হইতে বাঁচাইবার ব্যর্থচেষ্টা করিয়া জীবন শোভাহীন শান্তি হীন করিলে। একুল ওকুল দুকুলই গেল—প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি এই তত্ত্বটী জানিয়া শুনিয়াও ধারণ করিলে না—প্রকৃতির পূজা করিলে না—তাই আজ সমস্ত ভারতে জীবনের সাড়া নাই। যে বাহ্যিক জীবনের সাড়া মনে উদয় হইতেছে, সে কেবল একটী শক্তিহীন চেষ্টার অভিনয় মাত্র। ভারত বাসী যেন একটা অন্ধকারের মধ্যে কবন্ধের মত হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে—সন্দেহের মধ্যেই, সত্যের মধ্যে হৃদয়ের সমস্ত রক্ত ঢালিয়া দিয়া "সত্যের" প্রাঙ্গণে দেউলিয়ার নাম লিখাইতেছে, জন্ম ব্যর্থ করিতেছে।

বড় বড় কথা কহিতেছে, লম্বা চওড়া নীতির সৃষ্টি করিতেছে, আইন গড়িতে মেম্বর হইতেছে, লাট হইতেছে কিন্তু ভারত যাহা চাহে তাহা পাইতেছে কি? মনে করিও না যে আমি ভাবিতেছি যে ভারত এই স্বরাজ চায়, যাহার জন্য অনেকেই প্রাণ দিতে ও নিতে উদ্যত—না না ভারতের ওটা নকল চাওয়া, ওটা উপরের চাওয়া—ভারত যাহা চায় তাহা ঐ আশ্রয়হীন, অন্নহীন, ভিক্ষাজীবী তোমাদের অনুগৃহীত অত্যাচারিত সন্ন্যাসী জানে—কারণ সে ভারতের আত্মার তত্ত্বেই মগ্ন। সে প্রথম চায় অন্তরের 'স্বরাজসিদ্ধি'।

তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ, একটী মূল সূত্র। শ্রীভগবান, মানব হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজ করেন? সেই সত্যটা ভাবিতেন বলিয়াই ভারতের ঋষি মুনিরা তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, সমস্ত বিশ্বমানবকে আহ্বান করিয়া অমৃত দান করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এ সত্যটী আজ যদি ধারণ করিতে যে তোমার হৃদয় আসনে বসিয়া শ্রীভগবান সর্ব্বদাই আত্মবিকাশ করিতেছেন তাহা হইলে তুমি আজ আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিতে না—তাহা হইলে কৃত্রিম নিয়মে তুমি আর আবদ্ধ হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে না—তাহা হইলে তুমি প্রাচীন ঋষিদের মতই পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া চলিতে, লোক সংগ্রহ করিবার জন্য সকল কর্ম্মবন্ধন হাসিমুখে বহন করিতে পারিতে।

ভারত হইতে যদি কোন মহামূল্য রত্ন হারাইয়া থাকে ত সে "চিন্তাশক্তি," ভারতবাসী হিন্দু জ্ঞানে অজ্ঞানে বলিয়া ফেলে আমরা প্রাচীন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আমাদের জন্য সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমাদের গতি নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের আর বিচার বা চিন্তা করিবার অধিকার নাই এবং এমনও অনেক আছেন যাঁরা মনু বা পরাশরের স্মৃতির বিষয়ে প্রশ্ন করাটাও পাপ ও নাস্তিকতা বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্র অনুসারে চলি বা না চলি, কার্য্যে মনু ও পরাশরের পিণ্ডী চটকাই বা বাপান্ত করি, তবু বলি যে শাস্ত্র আমাদের সনাতন সত্য তাহাকে মানিতেই হইবে। এই নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে বিচার-

বান দেখিবেন যে প্রাচীনের প্রতি একটু অক্ষম অর্থ-হীন শ্রদ্ধায় ভাবে আর একটী প্রকাণ্ড "চিন্তা-হীনতায়" ভারতে হিন্দুসমাজ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাই ভারতের সন্ন্যাসী আসিয়া আজ তোমাদের দ্বারে গাহিতেছে, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং, সেই বেদান্তের মহাবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "আত্মানং বিদ্ধি", চিন্তাশক্তি যাহাদের নাই তাহারা সংসারে কি করিতে পারে? ক্রমশঃ—

গান

কোথা থেকে এলে, কোথা যাও চলে,
কোথা গিয়ে ভুলে রবে গো।
প্রভাত গগনে, সাঁঝের কিরণে
ফিরে ফিরে তোরে চাবো গো॥

সেফালীর ঘ্রাণে,
আকুল পরাণে,
চেয়েছিনু তোরে সে কথা কে জানে।
হাসি মুখে দেখা, দিয়ে প্রাণ সখা,
কোথা গিয়ে ভুলে রবে গো!
প্রভাত গগনে, সাঁঝের কিরণে
ফিরে ফিরে তোরে চাব গো॥

জানাজানি মনে
হ'ল সঙ্গোপনে,
বাহিব তরণী সিন্ধু অভিযানে,
প্রাণ ভরা আশা, দিয়ে ভালবাসা
কোথা গিয়ে ভুলে রবে গো!
প্রভাত গগনে, সাঁঝের কিরণে
ফিরে ফিরে তোরে চাব গো॥

কি বহন করিতে হইবে?—অধিকাংশ দেশপ্রাণ বাঙালী এই সন্দেহের পীড়ায় খুবই যন্ত্রণাভোগ করিতেছে।*

বর্ত্তমান দৃষ্টির সহিত পূর্ব্বস্মৃতি মিলাইয়া বাঙালী একেবারেই আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। বিস্মৃতির মাঝে অন্তরের মজ্জায় যে তীব্র অভাব-অনুভূতি তাহাই যন্ত্রণার পর যন্ত্রণার তরঙ্গ তুলিয়া বাঙালীকে একেবারে মারিয়া ফেলিতেছে। এই মৃতপ্রায় বাঙালী আবার জাগিয়া উঠিবে, যন্ত্রণার মধ্যে সে অনন্ত যন্ত্রণার সমাবেশ দেখিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে আবার অনন্ত বিশ্বাস সে আপনাকে ধরিয়া রাখিতেছে। এই সূক্ষ্ম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর সূক্ষ্ম রহস্যজাল কোনও শিল্পী বুনিয়া যাইতেছেন, যেদিন সে এই অন্তরের তরঙ্গলীলার মাঝে লীলাময় শিল্পীর সহিত পরিচয় ঘটাইয়া আপনার তালে আপনি চলিতে পারিবে, সেইদিনেই তাহার পরামুক্তি। বাঙালীর অন্তরাত্মা এই পরামুক্তির জন্য বাঙালীর অজ্ঞান-ভাগবতে সদ্যপ্রসূত শিশুরূপে বাস করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার মূলে যদি পৌছিতে না পারা যায়, যন্ত্রণার একটা তীব্র তরঙ্গের অনুভূতি ধারণ করিয়া যদি অন্য একটা তরঙ্গের অনুভূতির সহিত কেবল তুলনা করিয়াই চলিতে হয়, তাহা হইলে সে যন্ত্রণার শেষ নাই। পাপের মধ্যে যে পুণ্য বিরাজ করিতেছে, যন্ত্রণার মধ্যে যন্ত্রণার অতিরিক্ত, সর্ব্বদুঃখহর যে পরাকল্যাণ সতত কলহাস্যে জগতের শাশ্বত আনন্দস্রোত সর্ব্ব সময়েই অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে, তাহার সন্ধান ইহাতে মিলিবে না, বরং একটা অনন্ত যন্ত্রণা কারায় চির কারারুদ্ধ হইয়া তাহাকে আত্মবিস্মৃতির ধ্যানেই মগ্ন থাকিতে হইবে।

বাঙালীকে এমন একটা অস্ত্র আবিষ্কার করিতে হইবে যদ্দ্বারা সে সম্যকরূপে অন্ধকারের গর্ভ ভেদ করিতে পারে। বাঙালীর বাঙালীত্ব স্বদেশী আন্দোলন হইতে। সেই বাঙালীত্বের উপর দাঁড়াইয়া নন-কো-অপারেশনে সাহায্য করা বা নূতন ভাবধারা গঠন করা সম্ভবপর। কিন্তু ভগবান সে পথ মুছিয়া দিয়াছেন, স্বদেশীর বাহ্য চিহ্ন সবই মুছিয়া গিয়াছে, স্বদেশীর যুগ বরিশালের গ্রামগুলিসমূহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আইস, অতি দুঃখে চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিবে, মহানন্দের সময়ে স্বদেশীর সম্ভাটী পর্যন্ত কোথায় যে উড়িয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান করিতে তোমাকে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হইবে। নন-কো-অপারেশনের প্রবাহের মধ্যে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, তাহাতে আরও দুঃখ—গঠনে পরিষ্কার ধারণা নাই, ধ্বংসনে তীব্র মাদকতা নাই, উপরের প্রাণশক্তি কোথাও বদ্ধ কোথাও বা রুদ্ধ হইয়া কেবল কোনরূপে উপর সাজাইয়া চালিতেছে, বরিশাল গুরু অশ্বিনীকুমার পুরাতন ও নূতনের বিচারে নিজের শ্রান্ত শরীরকে কিঞ্চিৎ উষ্ণ রাখিতেছেন। ইহাতে তোমার ভিতর দুঃখ প্রবাহ বাড়িবেই, স্বদেশপ্রেমের তীব্র ও অনাবিল স্রোতদর্শনের দুর্ব্বার আকাঙ্খা লইয়া বাংলার জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া একান্ত অবসাদের নিষ্ফল বোঝাটী লইয়া তোমাকে ফিরিতেই হইবে। এ দুঃখের চিত্র ছাড়িয়া দাও, স্বদেশী যুগের উজ্জ্বল চিত্রমালায় তুমি ভূষিত হও, না হয় মহাত্মার বিস্তৃত হৃদয়খানার উপরে পরম আদর্শ সমূহ সাজাইয়া বাংলার পল্লীমন্দির পূর্ণ করিয়া তুল, তথাপি স্বদেশীযুগের কিশোর স্বদেশপ্রাণের অসহ্য মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা ত তুমি ভুলিতে পারিবে না—সে যন্ত্রণায় আনন্দ ছিল, যন্ত্রণা হইতে যন্ত্রণাতিরিক্ত বিশ্বকল্যাণময় ভুবনে প্রবেশ করিবার বিপুল শক্তি তাহাতে অনুভূত হইত, কিন্তু তাহাতেও যন্ত্রণা! যন্ত্রণার ক্ষুণ্ণ ক্ষুণ্ণ ঝিল্লী ঝঙ্কারে ভিতরের শক্তির উৎসটী ও আনন্দের প্রবাহটী তুমি সম্যক দেখিতে পাও নাই—আর মহাত্মার বিশাল হৃদয়, তাহাও আজ কি বেদনা লইয়া অনন্ত হুঙ্কারে

বিশ্বভুবন পূর্ণ করিতেছে। হিমালয়োপরি অগণন মানব দেবতার হর্ষ গীতিধ্বনির ন্যায় মহা আর্ত্ত বেদনার ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর পূর্ণ করিতেছে বটে কিন্তু তাহাতেও এ এমন একটী মূর্চ্ছনার আন্তর ও অনির্দ্দেশ্য প্রবাহ বহিয়াছে, যাহাতে অন্তরের সত্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ঠিক ছাঁদটী আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

বর্ত্তমানের এ স্বদেশী যুগের পরম কল্যাণাশিখরে অধিরোহণ করিয়াও বাঙ্গালী জীবনের পরম তৃপ্তি পাইবে না, কিন্তু সে তৃপ্তি তাহাকে লাভ করিতে হইবে। বাঙ্গালীকে এমন একটা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে যেখানে সকল বৈচিত্র্য আনন্দের বটে, যেথায় বৈষম্যের প্রাণ ভরিয়া আনন্দের অমৃত নিজ মাথায় করিয়া তাহাকে ধন্য করিতে পারে। বিস্মৃতি ভুলিয়া স্মৃতি তুলিয়া সেই শাশ্বত জীবন স্রোতে যদি বাঙ্গালী চলিতে পারে, আর তাহার কোন ভাবনা নাই তত তত কঠিনও নহে। কিন্তু আমরা জীবনের মধ্যে নন কো অপারেশনের একটা জায়গা ঠিক করিয়া লইয়া স্বদেশী আন্দোলনের দিকে অবলোকন করি আবার স্বদেশীর কোঠায় দাঁড়াইয়া নন কো অপারেশনকে তুচ্ছ করি, যিনি আবার স্বামী বিবেকানন্দের সিংহ গর্জ্জন প্রথম শুনিয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সেইখানেই থাকিয়া সেবা পাবলো অন্যকে বলহীন ও অস্থির দেখেন, দু'একজন এমনও আছেন যাঁহারা শশধর তর্ক চূড়ামণি প্রমথদিগের বিচার বেড়ার মধ্যে সনাতন তুলসী মূলে একমনে জলসেচন করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনে শশধরী হিন্দুত্বের স্থানই একমাত্র স্থান। এইরূপে বাঙ্গালী, ব্রাহ্ম ও ইয়ংবঙ্গ আন্দোলন অতিক্রম করিয়া এই ইংরাজ আমলেই রামমোহনের নিকট অবহেলে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু দোষ তাহার, সে একটা বা অন্যটিকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করিয়া এমন এক খাপছাড়া অবস্থা সৃষ্টি করে যাহাতে পরম তৃপ্তি তাহার কখনও লভ্য হয় না।

বাঙ্গালী একবার তোমার মাথায় ঢুকিবে না কি, বিশ্বাত্মা স্বেচ্ছায় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বকে দেশে দেশে বিভক্ত করিয়াছে? বিশ্বাত্মার সহিত সত্যলীলা সম্পাদন করিতে দেশাত্মা বিভিন্ন দেশাত্মার সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি দেশবাসীকে তাহার প্রেমের পরিচয়ে সদাই উদ্বুদ্ধ করিতেছে?— উদ্বোধনের পূর্ব্বে তোমার যন্ত্রণাময় অবস্থিতি, উদ্বোধনের প্রেরণায় তুমি যন্ত্রণা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াও, চারিদিকে দেশাত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রেমমূর্ত্তির আলোকে অন্তর সিদ্ধ হইলে বেদনা টুটিয়া যাইবে, তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, কেবল দাঁড়াইয়া থাক, অনন্ত ধৈর্য্য দাঁড়াইয়া থাক, দেশাত্মার জ্যোতির্ম্ময় রূপ আলোকদানে তোমাকে অন্তরের পথ দেখাইয়া দিবে, শাশ্বত আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ তোমার খুলিয়া যাইবে। কিন্তু কই, বাঙ্গালী কই তুমি উঠিয়াছ? যদি উঠিয়াছ, একটা ভিত্তি স্থির করিয়া আবার অনন্ত শয়নে অভিভূত হইতেছ শুইয়া শুইয়া কেবল কল্পনা,— কেমন ভাবে শুইয়াছিলাম ঠিক সেইখানটি থাকিলাম না কেন? আবার এই যে যাহারা উঠিয়াছে, ঠিক তাহারা উঠিয়াছে, না কিছু বাকিয়া আছে, কাহারও পা টলিতেছে, কেহ গর্ত্তে পড়িয়া আছে।

যদি কোন কল্পনা করিতে হয়, তোমার জাগরণের কল্পনাতেই তুমি বিভোর থাক, ঐ স্মৃতি এরূপ ভাবে পরিশুদ্ধ হউক যাহাতে সকল জাগরণের সাড়ার মাঝে তোমার জাগরণই স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহা যদি সত্যে পরিণত হয়, উচ্চ প্রেরণায় যদি তুমি সদাই উদ্বুদ্ধ থাক, দেশাত্মার প্রেমলীলার আভাস তোমার বুদ্ধিই গ্রহণ করিতে থাকিবে। ইংরাজ আগমনের পরের কথাই ধর, রামমোহন, ইয়ংবঙ্গ, ব্রাহ্ম, শশধর, বিবেকানন্দ, স্বদেশী যুগ, নন-কো-অপারেশন— এই সকল আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশাত্মা একটা প্রেমের

সিদ্ধির জন্য যত কিছু গতি ও ক্রিয়া—সংস্কৃতবই মূল কেন্দ্রে এই দিব্য আকাঙ্খা (divine aspiration)

২। কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং
পেষী বিভর্ষি মহিষী জজান।
পূর্বীর্হি গর্ভঃ শরদো ববর্ধাপশ্যং
জাতং যদসূত মাতা॥

হে যুবতি, কে তোমার এই সন্তান, ক্ষুদ্র হইয়া যাহাকে তুমি ধারণ করিয়া রাখ (১)। যখন তুমি মহৎ হও, তখনই ইহাকে প্রসব কর (২)। বহুবর্ষ ধরিয়া সন্তান গর্ভে বর্ধিত হইতেছিল (৩)। যখন জননী ইহাকে প্রসব করিল, তখন জাত মাত্র আমি দেখিয়াছি।

(১) অবচেতনা (Subconscient) পরা চেতনাবহ (Superconscient) সঙ্কুচিত অবস্থা। মাতা যেন সংক্ষিপ্ত হইয়া সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া আছেন। (২) (৩) মহিষী—বৃহৎ হইয়া চেতনার ক্রম প্রসারিত দেবসত্তা চেতনায় জন্ম গ্রহণ করে। দীর্ঘ সাধনায় দেবভাব অন্তরে পুষ্ট ও বৃদ্ধিশীল হয়।

৩। হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণমারাৎ ক্ষেত্রাদ
পশ্যমায়ুধানি মিমানম্।
দদানো অস্মা অমৃতং বিপৃক্ক
কিং মামনিন্দ্রাঃ কৃণবন্ননুক্থাঃ॥

দূরে ক্ষেত্র মধ্যে হিরণ্যদন্ত শুচিবর্ণ এই শিশুকে তাহার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিতে দেখিয়াছি। আমি সর্বত্র সর্বতোভাবে তাহাকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। তাহারা আমার কি করিবে, যাহাদের ইন্দ্র (১) এবং শব্দমন্ত্র নাই (২)।

(১) ইন্দ্র—দিব্য মনঃ পতি। (২) উক্থা—শব্দমন্ত্র। বৈদিক ঋষি শব্দমন্ত্রকে চৈতন্যময় করিয়া অন্তরে দিব্য প্রতিষ্ঠা করিতেন। অগ্নি দিব্য মন ও দিব্য মন্ত্র সহযোগে অদেবী মায়ার সকল বাধা ও প্রাতিকূল্য অভিভব করেন। আনন্দ-রসেই অগ্নির পূর্ণ দীক্ষা ও অভিষেক।

৪। ক্ষেত্রাদপশ্যং সনুতশ্চরন্তং
সুমদ্যূথং ন পুরু শোভমানম্।
ন তা অগৃভ্রন্নজনিষ্ট হি ষঃ
পলিক্নীরিদ্যুবতয়ো ভবন্তি।

ক্ষেত্র মধ্যে (১) দীপ্তিমান ধেনুযূথকে (২) অনন্ত কাল ধরিয়া প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। তাহার (৩) দস্যুদিগকে অপহরণ করিতে পারে নাই, কারণ অগ্নি আবির্ভূত হইয়াছেন, স্থবিরাও নবযৌবন লাভ করিয়াছে (৪)।

(১) অন্তশ্চেতনায় ক্ষেত্র। (২) ধেনুযূথ সঞ্চরণশীল জ্ঞান রশ্মি। (৩) অপহারক=দস্যু, তস্কর, পণি প্রভৃতি পাপ বৃত্তিগুলি। (৪) অগ্নিই পাপপুরুষের সেনা বূহ হইতে সাধক চেতনাকে রক্ষা করেন। অগ্নিই তপঃ বীর্য সঞ্চারে জরা নাশ করেন সত্তায় নবযৌবন আনয়ন করেন।

৫। কে মে মর্যকং বিযবন্ত গোভির্ন
যেষাং গোপা অরণশ্চিদাস।
য ঈং জগৃভুরব তে সৃজন্ত্বা
জাতি পশ্ব উপনশ্চিকিত্বান্॥

কাহারা গাভীগণ হইতে আমার সৈন্য সমূহকে (১) বিযুক্ত করিয়াছিল—যাহাদের কোনই রক্ষক যোদ্ধা ছিল না। যাহারা অপহরণ করিয়াছে, তাহারাই ঐ মুক্ত করিয়া দিবে। অগ্নি জানেন এবং গাভীগণকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া দিবেন। (২)

(১) মর্যক সেনাবাহিনী। সাধনা যজ্ঞ, আবার সাধনা যুদ্ধও। অরক্ষিতাবস্থায় সাধকের জ্ঞানৈশ্বর্য্য পাপপুরুষগণ অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। অগ্নিই সর্বজ্ঞ রক্ষকরূপে আবির্ভূত হন। অগ্নির অব্যর্থ তপঃ সঙ্কল্পে, অপহৃত বন্দী জ্ঞান রশ্মিগুলিকে, শত্রুগণ বাধ্য হইয়া প্রত্যার্পণ করিয়া যায়।

৬। বসাং বাজান বসাতং

জনানামবাতয়ো নিদধুর্মতোসু।

বন্ধাণ্যত্রেববতং সৃজং তু

নিন্দিতারো নিন্দ্যাসো ভবন্তু॥

আমাদের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহাদের অভিপতিকে (১), আমরা যাহার মধ্যে বাস করি সেই আশ্রয়কে (২) শত্রুগণ মত্তারাশির অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্তরের মন্ত্রশক্তি তাঁহাকে মুক্ত করুক। নিন্দাকারীগণই নিজেরাই নিন্দিত হউক। বন্ধনকারীগণ নিজেরাই বদ্ধ হউক।) (৩)

(১) সেই অভিপতি সত্যপুরুষ। (২) সত্যই আবার আশ্রয়। সৎ রাজ্য। সত্যচিৎই আশ্রয়। (৩) সত্য মধ্যে মিথ্যা নিজেই লক্ষিত ও খণ্ডিত হইবে।

৭। শুনঃশেপং নিদিতং

সহস্রাদ্যূপাদমুঞ্চো অশমিষ্ট হি ষঃ।

এবাস্মদগ্নে বিমুমুগ্ধি পাশান্

হোতশ্চিকিত্ব ইহ তু নিষদ্য॥

শুনঃশেপ যখন বদ্ধ হইয়াছিল, তখন তুমিই তাহাকে সহস্র যূপবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলে - কেন না সে শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে হে অগ্নি, হে হোতা, হে সর্বজ্ঞ, এই স্থানে আসন পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সর্বপাপ হইতে মুক্ত কর।

৮। হৃণীয়মানো অপ হি মদৈযেঃ প্র মে

দেবানাং ব্রতপা উবাচ।

ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বাচচক্ষ তে

নাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্॥

ক্রুদ্ধ হইয়া তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পার—দেবতাগণের কর্ম্মবিধি যিনি রক্ষা করেন আমাকে তিনি এই কথা বলিয়াছেন। বিদ্বান ইন্দ্র তোমায় দেখিতে পাইয়াছিলেন—তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। (১)

(১) জ্ঞানময় মনঃ-পতি ইন্দ্র, তাঁহারই আলোকে আমরা জ্ঞান দিয়া তপঃশক্তির সমীপবর্ত্তী হই, জ্ঞানের মধ্যেই তাহাকে চিনিয়া তুলিয়া লই।

৯। বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্বিশ্বানি

কৃণুতে মহিত্বা।

প্রাদেবীর্মায়া সহতে দুরেবাঃ শিশীতে

শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে॥

অগ্নি বিশাল জ্যোতিতে সুদূর প্রসারিত হইয়া দীপ্ত পাইতেছেন এবং সৃষ্টি সমস্ত স্বমহিমায় প্রকাশ করিতেছেন। অদেবী মায়া (১) যত দুর্বৃত্ত প্রচেষ্টাকে তিনি পরাভব করেন। অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি শৃঙ্গ যুগল শাণিত করিতেছেন।

(১) মায়া ভাগবত ইচ্ছাশক্তি। ইহার দুই অঙ্গ - পরা ও অপরা, দেবী ও অদেবী। দৈবী মায়া যোগেই সত্য নাম রূপ সৃষ্ট ও বিধৃত। অদেবী মায়া সত্যের উপরে অনৃতের কজ্জল লেপন করে, উহার বহুত্বের মধ্যে খণ্ডত্ব ও বন্ধন কল্পনা করে। অহঙ্কারই অদেবী মায়ার মলগ্রন্থী। এই অসুর শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া সত্যের স্বপ্রকাশ দীপ্ত মহিমা ফুটাইয়া তোলাই অগ্নির কার্য্য। সাধকের অন্তর রাজ্যে তপঃমূর্ত্তি অগ্নি সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়াছেন। তপস্যারই স্তোমে ও শ্লোকে, মন্ত্র ও ছন্দে অসুরকে খণ্ড বিখণ্ড করিবেন।

১০। উত স্বানাসো দিবি সং ত্বগ্নেস্তিগ্মায়ুধা

রক্ষসে হন্তবা উ।

মদে চিদস্য প্ররুজন্তি ভামা ন বরন্তে

পরিবাধো অদেবীঃ॥

দ্যুলোকে অগ্নির গর্জন শাণিত অস্ত্রের মত রাক্ষসের প্রাণঘাতী হউক। আনন্দোন্মত্ত অগ্নির শিখা সমূহকে অজ্ঞানের শক্তি প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে না—সকল বিঘ্ন তাহারা বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

১১। ওঁ ত্বামগ্নে ত্বং বিজাতো বিদেয়া
বয়ং ন ধীরঃ স্বপা অতশ্বম।
দোদয়ে প্রতি ত্বং দেবতয়াঃ
স্বর্বতীরপ এনা জয়েম।

বর্ত্তমানে জাত(১) হে অগ্নি আমি আমার দিব্য জ্ঞান দিয়া দিব্য মতি দিয়া দিব্য বস্তু দিয়া তোমার জন্য এই মণ্ডপ গড়িয়া তুলিয়াছি। তুমি যদি আনন্দ লাভ কর তাহা হইলে ইহা দ্বারা আমরা স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রবাহ (২) জয় করিতে পারিব।

১। বিজাত বিবেকরূপে জাত, সত্তার সকল স্তরে সকল ক্ষেত্রে।

২। স্বঃ স্বর্যালোক। স্বর্বতীরপ স্বর্যালোক হইতে জ্যোতিঃ-প্রবাহ।

১২। ওঁ বিগ্রাবো বৃষভো বাবৃধানোঽস্তাৎ
শত্রোর্যঃ সমজাতি বেদঃ।
ইতা মনাগ্নিমম্ না অবোচদুর্হিশ্যাত
মনবে শং যং সন্ধাবয়তে মনবে শং যং সৎ ৪।

বহুগ্রীব বৃষভের (১) শক্তি যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন সে শত্রুগণের নিকট হইতে যে জ্ঞান জয় করিয়া আনিয়া দেয় তাহার আর বিনাশ নাই। অনবগণ এই মন্ত্রে অগ্নিকে আহ্বান করিয়াছিলেন— —যজ্ঞাসনে প্রতিষ্ঠিত মানবকে শান্তি দাও—আহুতি-প্রদানকারীকে শান্তি দাও।

(১) বৃষভ সৎ পুরুষের বিশিষ্ট বৈদিক সংজ্ঞা।

হিন্দু সমাজ

—:০:—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দু সমাজকে নষ্ট আর বর্ষ-নন্দনের চাবুক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, মনীষী রবীন্দ্র-নাথের নিকটও হিন্দু সমাজ জগদ্দল পাথর এবং একটী মস্ত অচল আয়তন। যাঁহারা মনে ও প্রাণে নিজেকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই এই কথার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহাদের নিকট ইহা একেবারেই তুচ্ছ কথা—তবুও তাঁহাদের প্রাণ এরূপ তিক্ত ও অগ্নিবর্ষী বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নয়, তাঁহারা যেন বলিতে চান, এ ভাব উপর দাঁড়ায় যা কেন? তাঁহারা যেন সেইরূপ লোকই চান, যিনি ইহাকে একেবারে নিজের করিয়া লইবেন—ইহার মধ্যে যাহা কিছু বিষ, নীলকণ্ঠের ন্যায় তাহা পান করিয়া ইহার মধ্যে যে সুধাটুকু আছে তাহাই কেবল তিনি সকলকে বিতরণ করিবেন, তাঁহাদের মতে বিষে বিষক্ষয় এ নীতি মানিয়া লইতেই হইবে, কিন্তু এমন সুধা কি আবিষ্কার করা যায় না, যাহা পান করিলে বিষ নীলকণ্ঠের ন্যায়ই অঙ্গের ভূষণ হইয়া থাকিবে?

এ খুব উচ্চ ভাব। এরূপ আশা ভগবান পূর্ণ করিবেন কি না জানি না। জাতীয়তায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, নানা জননার মর্ম্মন্তুদ দুঃখ ও শোক যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি প্রায়ই কঠিন হইতে পারেন না—কাহারও মন-ও-প্রাণে বিঁধিবে না, এমন কোন মোলায়েম নীতির প্রত্যাশায়ই তিনি তাকাইয়া থাকেন। হায়, যাঁরা কোনরূপে নিঃস্বার্থ পরদুঃখকাতরতার বলে জীবনে সুহৃত্তের স্পর্শ লাভ

করিয়াছেন, তাঁরা কিরূপেই বা সুদর্শন হস্তে পাষণ্ড-দলনে অগ্রসর হন। সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে একান্ত কঠোরভাষী প্রফুল্লচন্দ্র ও বজ্রনির্ঘোষী রবীন্দ্রনাথ হইতে তাঁহারা বুঝি পারিবেন না।

কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের একটা সার্থকতা আছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ দেখিলে আমাদের প্রাণে এমন ভরসাই হয় না, যে, অচল আবর্জ্জনাকে চূর্ণ না করিয়া আমরা অন্য কোন উপায়ে নিখিল হিন্দুসমাজে এক আত্মার নির্ম্মল প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। বাংলাদেশে নীরবে আমরা অনেক কাজই করিয়া যাইতে পারি। পারিবারিক গুরুকে একরূপ বাদ দিয়া বিভিন্নজাতি মিলিয়া এক গুরুর নিকট ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে স্মার্ত্তধর্ম্ম ও স্মৃতির নিগড়কে আমরা খুবই শিথিল করিয়া তুলিয়াছি, তথাপি স্পষ্টভাবে যাহা করিতে যাইব, বিশেষতঃ যদি স্পষ্ট ভাব-ও-কথায় উদার সমাজতত্ত্বের আলোচনা করি—অমনই রকম ও বে-রকমের প্রতিবাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাই হ'ক বাংলায় একটা জীবন আছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে হিন্দু ভাবিয়াও এমন স্পর্দ্ধা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়, যে, হিন্দু সমাজকে একেবারে নিঃশেষ না উঠাইয়াও আমরা একটা জীবন্ত হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিতে পারিব। কিন্তু একজন প্রফুল্লচন্দ্র ও একজন রবীন্দ্রনাথকে আমরা যদি দক্ষিণ ভারতে না পাঠাই এবং তাঁহারা যদি কোন দিক চূর্ণ করিয়া তথায় হিন্দু জাতিকে মুক্ত হইবার অবসর না দেন, তাহা হইলে কিরূপে যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নবীন ও প্রাণময় সমাজ গড়িয়া তুলিব তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। অথচ মাঝে মাঝে এমন এক এক জন লোক মিলিয়া যান যাঁহারা অন্তরকে বস্তুত করিতে জীবন দানেও অন্ততঃ অগ্রসর হন।

আমরা রাজনীতিক নেতাদিগের ভিতর হইতেই এমন লোক দেখিতে পাইতেছি। সমাজ বন্ধনটা যদি মিলনের চিহ্ন হয়, সমাজ যদি একাত্মবোধের ক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে সে সমাজ আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে গড়িয়া উঠে নাই; কিন্তু দ্বাদশটী রাজপুতের ত্রয়োদশটী চুলা ও পঞ্চাশ ঘর লোকের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান,—আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত প্রথা, অজ্ঞান ও সঙ্কীর্ণতার এমন জুলোজিক্যাল গার্ডেন হিন্দু সমাজ ভিন্ন আর কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অতএব মানবীয় অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া ভিতরে ভাগবত বোধ ফুটাইবার প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ প্রতিষেধ করিয়া সমাজে শারীর স্বাস্থ্যবিধানের প্রচলন—এই দুইটী, জাতিভেদ ও আহারের গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া রাজনীতিকদিগকে প্রচার করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ এখন আমরা যেটুকু মিলন দেখিতে পাইতেছি, তাহাকেই কোনরূপে সমর্থন করিয়া আমাদের নেতৃবর্গকে এক নূতন উপায়ে আমাদের সমাজে একপ্রাণতার প্রচার করিতে হইয়াছে। এ পথে খুবই 'আর্ট' বর্ত্তমান। আমার উপর সমাজের যাহা কিছু উৎপীড়ন, হীনতাব্যঞ্জক যত কিছু বাধানিষেধ আমার উপর আরোপ করা হইয়াছে, তাহার ভিতর একটা গভীর অর্থ আছে—ইহা যদি আমরা ধরিয়া লই, তাহা হইলে মজ্জাগতভাবে অত্যাচার ও শ্রেণী-বিদ্বেষ বলিয়া কোন একটা জিনিষ আসিতে পারে না। যখনই কোন অত্যাচার মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিবে, যখনই কোন উচ্চ শ্রেণী হীনতার বোঝা স্বরূপ বাধানিষেধের মধ্যে আমাকে চাপিতে আসিবে, আমি ধরিব উহা তাহারই অজ্ঞানতা; আমার নিকট ইহা কখনই প্রতিভাত হইবে না, যে, ইহা সমগ্র হিন্দু সমাজের বিধান, এমন কি ইহাই প্রতিভাত হইবে, যে, ঐ উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি, আমার নিকট যে উদ্ধত ব্যবহার করিতেছে সে তাঁহার শ্রেণীর প্রতিভূ হইয়া এ কার্য্য করিতেছে না—ঐ লোকটাই বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া

আমার উপর অবিচার করিতেছে।

কিন্তু এরূপ সামাজিক বাধানিষেধগুলা ত একান্ত বীভৎস দৃশ্য লইয়াই দেশের বক্ষে বিচরণ করিতেছে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুর সাধারণ মন্দিরেই অনেক অভাগা প্রবেশ করিতে পারে না, উচ্চ জাতি দেখিলে "আমি পারিয়া হু" বলিয়া উচ্চরবে হিন্দু অধম বা হিন্দু কলঙ্ক পারিয়াকে চীৎকার করিতে হয়, নায়ার জাতি নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের সন্নিকটস্থ হইতে পারিবেন কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না, কয় হাত দূরে থাকতে হইবে, ইত্যাকার বর্ণবিধ প্রথা ভেদের চরম উৎকর্ষ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া জাতির মন হইতে ভেদের, ঘৃণার, পাশবতার জঘন্য শাশ্বত বাণীটা যদি দূরে সরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে যেন হিন্দু-ঐক্যের একটা অদৃশ্য ভিত্তিও খুঁজিয়া তুলিতে পারা যায়। হিন্দু রাজনীতিক হিন্দু-ঐক্যের দাবীর জোরে তাঁহার বক্ষ স্ফীত করিয়া তুলেন, বা তাঁহার রাজনীতিক আদর্শই পণ্ড হইয়া যায় যদি এরূপ ভেদের শিলা অনবরত মাথায় পড়িয়া তাঁহাকে রক্তাক্ত কলেবরে রাজা ও দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হয়; সেই জন্যই না তাঁহাকে কত জোরে সামাজিক ভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হয়। যাই হ'ক তথাপি তাঁহাদিগকে কোন কোন ক্ষেত্রে আগে চলিবার হুকুম দিতে হয়। একদিন স্বদেশীর সময়ে বিপিনচন্দ্র নমঃশূদ্র ইত্যাদিকে হিন্দু ভদ্রলোকদের সহিত সামাজিক নিষ্পত্তির জন্য 'প্যাসিভ রেজিষ্টেন্স' অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতে মহাত্মা গান্ধী মন্দির প্রবেশ ব্যাপারে কোন হিন্দু জাতিকে 'সিভিল ডিস্ ওবিডিয়েন্স' অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন; ইহাতে হিন্দুর সর্ব্বক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের একটা দাবী তাহাদের অন্তরে জাগিতে থাকিবে। ইহার ফলে হিন্দু সমাজে ভীষণ অন্তর্বিদ্বেষ জন্মিতে পারে, কিন্তু সমাজ ত সকলেরই, সমাজের মধ্যেই যে একটা অধ্যাত্ম উদ্দেশ্য বর্ত্তমান, এইরূপ ভালমন্দের বিচারের সহিত সমাজ বিধ্বংসী একটা প্রচেষ্টা না আসিয়া সমাজ রাখিয়া একটা বৃহত্তর সমাজের আশায় সকলে কৃতযত্ন হইতে পারে।

রাজনীতিকরা সমাজ বিষয়ে যতটুকু ধ্বংসের পতাকা উড্ডীন করেন, তাহা কেবল সকলকে রাজনীতিক অধিকার সাম্যের মধ্যে আনিবার জন্য। ইহার অধিক ব্যাপকভাবে কোন কার্য্য করিলে তাঁহাদের অবলম্বিত মার্গে যথেষ্ট বিঘ্ন উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে, তজ্জন্য তাহা তাঁহারা করেন না; কিন্তু তাঁহাদের কৌশলে আমরা মানস রাজ্যে এক সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার আধ্যাত্মিক কথা শুনিতে পাইতেছি। অথবা সমাজের মধ্যে, হিন্দু সাধনার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আছে, রাজনীতিক সেই অধ্যাত্ম ভিত্তিকে একান্ত কাজ সারার মত ব্যবহার করিতে গিয়া কতকগুলি হাস্যাস্পদ মতও তাঁহারা সমর্থন করিয়া যান। যাই হ'ক তাঁহাদেরই চেষ্টায় ঐগুলি জাতীয় সমস্যা নিরসনের উপকরণ মধ্যে স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার যদি কোন ঋষি হিন্দু সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে উজ্জ্বল করিয়া জাতীয় সাধনায় স্থান দিতে পারেন, এইবার যদি কোন সুধী এই ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধক মণ্ডলীর সাথে সমাজের বক্ষে সুনিবিড় আত্মব্যূহ রচনায় সমর্থ হন, তাহা হইলে বোধহয়বা আমরা বর্ত্তমান অচল আয়তনের অপেক্ষাও অচল প্রতিষ্ঠ হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইব। এই শাশ্বত হিন্দু সমাজ, বর্ত্তমান সনাতনীদের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর প্রতি চাবুক হইয়া থাকিবে না, ইহার চারিদিকের মুক্ত বাতায়ন হইতে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া সকলেই আত্মার অপূর্ব্ব আনন্দে কালযাপন করিবেন। জানি না প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এইরূপ সমাজের জন্যই দুর্ব্বাসা

ক্রুত গ্রহণ করিয়াছেন, না তাঁহারা আমাদিগকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চান; কিন্তু তাঁহাদের টানাটানির মধ্যে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে, আমাদের মনের মধ্যে ময়লার পাহাড় কাটিয়া মনের মণিকোটায় আমরা হিন্দু সমাজ দেখিতে পাইতেছি— সেই হিন্দু সমাজকে আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। তাঁহাদের কথা শুনিয়া এইরূপে সকল সমাজের অন্তঃস্থলে পৌঁছিতে পারিলে আরও বৃহৎ বিশ্ব-সমাজ গড়া যায় কি না তাহা বুদ্ধির কথা, কিন্তু আমার এই হিন্দু সমাজও যে বিশ্বের সকল সমাজকেই স্থান দিতে পারে! তাহার সম্পূর্ণ চিত্র পরে দিব।

শিক্ষার কথা

[আমেরিকায় পরীক্ষা বিজ্ঞান (Experimental-Sciences) শিক্ষা-পদ্ধতি।]

(১) শক্তি-বিজ্ঞান (Physics) শিক্ষা।

ক্লাসে শিক্ষকরা শক্তিবিজ্ঞানের মূলীভূত আইন (law) গুলি পরীক্ষাসহায়ে প্রমাণ করে দেখান—অবশ্য এখানে '৪৫-মিনিটে-ঘণ্টার' মধ্যে 'চুল-চিরে—মেপে' সূক্ষ্ম পরীক্ষা করবার (quantitative experiment' এর) সময় থাকে না। পরীক্ষাগারে গিয়ে ছেলে নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে ক্লাসের পড়াটা যে ঠিক তা সপ্রমাণিত করে। অনেক সময় পরীক্ষাগারের করে'-জানা-জ্ঞানটা (Experiment) ক্লাসের শুনে-জানা-জ্ঞানের (Lecture) অনেক এগিয়ে থাকে। শক্তি-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারটা আমেরিকানদের বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যের একটী ঐশ্বর্য্য। ভূমধ্য ইউরোপের (Continental Europe) কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'করে'-করে'-শেখার' (learning by doing) উপর, আমেরিকার হাইস্কুলের মত, এত জোর দিতে দেখতে পাইনি। আমরা অন্ততঃ বিশটা বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে ছেলেদের কাজ করতে দেখেছি আর দিন দিন অধিকতর কৌতুহলাক্রান্ত হ'য়ে নতুন নতুন পরীক্ষাগারে গিয়ে এরকম শিক্ষা ও কর্ম্মের জীবন্ত একটা সামঞ্জস্য দেখে আনন্দে অভিভূত হয়েছি।

ক্রেন ম্যানুয়াল ট্রেনিংস্কুলের (Crane Manual Training School) পরীক্ষাগারে যখন আমরা প্রবেশ করলাম তখন ছেলে মেয়েরা পেণ্ডুলামের আইন গুলি (Laws on the Pendulum) পরীক্ষা করছিল। পাঠক একবার মনে করুন ছাত্রদের তখন কি আনন্দ, যখন তারা আপনার বুদ্ধি হাত, পা, চোখ খেলিয়ে, আবিষ্কার করে', তাদের খাতায় পাতায় লিখলে—"১ম পরীক্ষা—পেণ্ডুলামের আইন—Laws on the Pendulum (ক) পেণ্ডুলামের ছোট ছোট দোলাগুলি সম-ক্ষণ স্থায়ী—The Smaller oscillations of the Pendulum are isochronus. (খ) পেণ্ডুলামটা কতক্ষণ দুলবে, সেটা তার গুরুত্ব বা লঘুত্বের উপর একেবারেই নির্ভর করে না—The duration of the oscillations is independent of the mass কিন্তু (গ) এটা পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার-রুটের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে কমে—it is proportionnal the square-root of the length of the pendulum."

কর্ম্ম প্রকাশ (phenomenon) একদিকে, আর একদিকে ছেলে মেয়ের চোখ আর মস্তিষ্ক—এর মধ্যে বৃথা গোলমাল সৃষ্টি করবার জন্যে কথার ছড়া (Lecture)—নামের-সমস্যা (Termino-

logy) বা কট সংজ্ঞা ও সূত্রের (Definitions & formulae) অনধিকার প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। উলঙ্গ সহজ সত্যটা সোজাসুজী তাদের সামনে ফুটে উঠে—আর অবিলম্বেই সেটা ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে ঢুকে চিত্তের ভাঁড়ার ঘরে নিজস্ব সম্পত্তির মত গিয়ে শিকড় গেড়ে বসে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যন্ত্র-পাতিগুলো মোটামুটী ও সাদাসিদে রকমেই তৈরী। প্রায়ই এ সব পরীক্ষাগারে সত্যিকারের অনেক বড় বড় জিনিষ দেখা যায়—বড় বড় চাড়া দেবার খোঁটা (levers), দাঁড়ি পাল্লা, সাইফোন (Siphon), পাম্প (pumps) এমন কি হাইড্রলিক মটোর (hydrolic motors) ক্রেন, গড়ান তল (Inclined planes) এবং বিদ্যুত শক্তি পরীক্ষা ও প্রয়োগ জন্য (for experimental & applied electricity) নানারূপ সরঞ্জামেরও অভাব নাই। এর মধ্যে অধিকাংশ যন্ত্রাদি ছেলেরাই বিদ্যালয়ের কারখানায় বসে তৈরী করে। পাঠ্যপুস্তক বা সিলেবস্ (syllabus) থেকে পরীক্ষার বিষয়টা বুঝে নেওয়া হয়—কি পরীক্ষা করতে হবে, কোনখানে দৃষ্টির ভুল হবার সম্ভাবনা, কোথায় কি সাবধানতা গ্রহণ করতে হবে, কোন কোন যন্ত্র এই পরীক্ষায় দরকার হবে ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে ছেলেরা জেনে নেয়। তারপর 'চুলচিরে-ভাগ-করে' পরীক্ষার দ্বারা (Quantitative Experiment) বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ করে।

পরীক্ষাশেষে ছাত্র পরিষ্কার করে ফলটা নোটের খাতায় লিখে রাখে। শিক্ষকেরা ছেলেদের কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করেন—কিন্তু পরীক্ষার দায়িত্বটা সম্পূর্ণ ছেলেদের কাঁধেই থাকে, আর তার ফলাফলের দোষগুণের ভাগী ছাত্র ভিন্ন আর কেউ হয় না।

(২) রসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry) শিক্ষা। অতিক্ষুদ্র মাধ্যবিদ্যালয়েও একটী রসায়ন-বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার আছে। সেখানে ছেলেরা ভবিষ্যজীবনের জন্য, বা কলেজের প্রাবেশিক-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার জন্য, যে-সকল তথ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যক সেগুলি পরীক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করে। ক্লাসে বসে শিক্ষক যত ভাল করেই (experiment দেখিয়ে) পড়ান না কেন, রসায়ন-বিদ্যা ওরকম করে শিখানটা আমেরিকায় কেউই পছন্দ করে না। একটাও বিদ্যালয়ের কথা আমরা জানি না যেখানে ঐরকম পড়িয়েই কর্ত্তৃপক্ষগণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন। ঐরকম করে লেক্চার দিয়ে পড়া শেষ করলে শিক্ষক ৪৫ মিনিটের ২৫ মিনিটও ছেলেদের কাছে রাখতে পারবেন না। তারপর যে তারা তাঁর ক্লাসে আর যোগ দেবে না এটা নিশ্চয়ই। বাক্য-বিন্যাসের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তিটা আমেরিকানদের চরিত্রে খট্ খট্ করে ঠ্যাকে। আমাদের দেশের মত সেখানে বড় বড় গ্যালারী নেই যেথানে শত শত ছেলে মেয়ে বসে বিজ্ঞানের বর্ণনা শুনবে, যেথানে অসংখ্য যন্ত্র—গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল, পাম্প করে চাপা হাওয়া (air under pressure), vaccum (শূন্য) করা জার ইত্যাদিতে পূর্ণ হয়ে—চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত হয়ে থাকবে। সেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রের হয়ে পরীক্ষা করে দেন না—আর স্মৃতি থেকে বা দুএকটা যন্ত্রাদি নাড়া চাড়া করে রসায়নের সব কথা গুলো মুখস্ত বলে যান না। সকল পরীক্ষা—বিজ্ঞান বিশেষতঃ রসায়নের শিক্ষার কেন্দ্রটা সর্ব্ব সময়েই পরীক্ষাগারের ভিতরে—যেথানে ছেলেরা নিজে কাজ করে, ভাবে ও গড়ে।

অনেক বিদ্যালয়ে ক্লাসের পড়াটা (Lecture) একেবারেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—পরীক্ষাগারে সর্ব্বদা কাজকর্ম্ম ও চিন্তার মধ্যে থেকে ছেলেরাও আর মিছা ক্লাসে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না। যে যে বিদ্যালয়ে এই ক্লাসের পড়াটা এখনও বজায় আছে, সেখানেও, ৪৫ মিনিট করে ২৫ পিরিয়ডের

বেশী পড়া হয় না। অধিকাংশ সময়েই ছাত্র পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত সত্য গুলো শিক্ষক ও বন্ধুদের সামনে ভাষায় ভাল করে প্রকাশ করবার জন্যেই, ক্লাসে আসে।

আপনার শক্তির উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান, আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস এটা আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতির একটা বিশিষ্ট দান। আপনার উপর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে যখন ছোট ছোট ছেলেরা পরীক্ষাগারে আবিষ্কার করতে লেগে যায়, তখন তাদের ছোট্ট হাসিমুখে ছোট্ট গাম্ভীর্য্য, ছোট্ট চোখে ছোট্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আর ছোট ছোট হাত পায়ের ছুটাছুটী দেখলে কার মন না আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠে?

পরীক্ষা করে যে সত্যটাকে আবিষ্কার করতে হবে সেটা নয় বয়েতে লেখা থাকে, নয় সেটা সিলেবস (Syllabus) হিসাবে ছেলেদের হাতে দেওয়া হয়। নিম্ন 'ম্যাক কিনলে ম্যানুয়াল ট্রেনিং হাই স্কুল' (Mac Kinley Manual Training High School), 'চিকাগো,' সেখানে যে সকল সিলেবস্ আদি দেখেছিলুম, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃত অংশগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট, কোন টীকা টিপ্পনীরই বোধ হয় দরকার হবে না। আমরা যখন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাই তখন ছেলেরা সিলেবসের ৩য় পরীক্ষা আরম্ভ করেছে।—"পিত্তলের প্রাকৃত ও রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্ত্তন—The Physical & Chemical modifications of copper। সিলেবসে এই সকল নির্দ্দেশগুলি সন্নিবিষ্ট ছিল :—

(১) একটা ছোট পিত্তলের টুকরা নিয়ে পরীক্ষা কর। একটা পরীক্ষা পাত্রে (test-tube) পিত্তলের টুকরা দিয়া গরম কর। পিত্তলের টুকরাটির কোন পরিবর্ত্তন কি দেখিতে পাইতেছ? পিত্তল কি জলে গলে। পিত্তলের আর কি কি (গুণ) ধর্ম্ম আছে?

(২) একটা পরীক্ষা-পাত্রে গাঢ় (concentrated) নাইট্রিক এ্যাসিড্ দিয়া তাহার মধ্যে একটা খুব ছোট পিত্তলের টুকরা ফেলিয়া দাও। নিবিষ্ট ভাবে তার পর কি হয় দেখ। নাইট্রিক এ্যাসিডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে পরীক্ষা পাত্রের জলীয় পদার্থের একটু একটা পোরসিলনের ছোট খুরীতে ঢাল। বুন্‌সেন--বার্নার'এর উপর ট্রাপে এক খণ্ড তারের জাল রাখিয়া তাহার উপর খুরীটিকে রাখ ও যতক্ষণ না জলীয় পদার্থ টা উড়িয়া যায় ততক্ষণ গরম কর। ধীরে ধীরে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে থাক এবং খুরীটা শুখাইয়া আসিবার সময় খুব সাবধানে অল্পে অল্পে গরম কর।

(৩) সব ঠাণ্ডা হ'লে পর খুরীর তলায় অবশিষ্ট জিনিসটাকে নিয়া (১)'এর মত সব পরীক্ষা কর।

(৪) পরীক্ষা পাত্রে দুই তিন ফোঁটা নাইট্রিক এ্যাসিড্ গরম করে উড়িয়ে দিলে, ঠিক, নাইট্রিক এ্যাসিড্ ও পিত্তলকে এক সঙ্গে করে গরম করে শুকানর মত এক রকম জিনিষই কি অবশিষ্ট থাকে?

(৩ ও (১)'এর ফলের তুলনা করে এবং (৪)'এর ফলের কথা ধরে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পার? আপনার কর্ম্ম ও দর্শনের যথার্থতার উপর দাঁড়িয়ে তোমার সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা কর।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে অধিকতর জটিল বিষয়ের পরীক্ষা ছেলেরা নিজে হাতে করে আপনার চোখ দিয়ে দেখে।

যাঁরা ভাল করেই জানেন, আমাদের ছেলেরা এই রকম হাতে হেতড়ে খেটে খেটে রসায়ন শিক্ষাটাকে কত ডরায়, তাঁরা আমেরিকার ছেলেরা কত আনন্দ কোরে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এই অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষা কর্ম্ম আরম্ভ করে, তা দেখলে পুলকিত হবেন। আর এই রসায়ন শিক্ষায় যে শুধু শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হবে তা নয়, মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশ ও চরিত্র গঠনটাও এর ভিতর দিয়ে বেশ ভাল রকমেই হতে থাকে!

আমাদের দেশের ছেলেরা ক্লাসের রসায়ন পড়ার জিনিষটাকে পরীক্ষাগারের কর্ম্ম থেকে শেখা জিনিসটা থেকে একেবারেই বিভিন্ন একটা বিষয় বলে মনে করে—যেন একটা ইংরাজী পড়া আর একটা ছুতারের কাজ। তারা মনে করে ক্লাসের এই পড়াটার সঙ্গে প্রকৃত জীবনের কোন সম্বন্ধই নেই। তারা মনে করে রাসায়নিক মতগুলো (Theories) যেন বাহিরের দৃষ্ট সত্য থেকে অনুমান করে নেওয়া হয় নি। আমাদের দেশে রসায়ন পাঠ শেষে ছাত্রের এই দৃঢবদ্ধ ধারণা হয় যে মতবাদ আর আইন গুলোই (Theories and laws) হচ্ছে আসল সত্য ও গোড়ার কথা, আর পৃথিবীর সব ঘটনা (facts) গুলো বুঝি আমাদের (মনগড়া) মতবাদের 'মতন' হবার জন্যে ছট্ ফট্ করে মরছে, যেন পরমাণুবাদের উপরেই (atomic theory) বুঝি সব রসায়ন বিজ্ঞানটা দাঁড়িয়ে আছে, আর বোধ হয় এই মত বাদটা না থাকলে কোন আবিষ্কারও হত না আর বিশ্লেষণ ও (Analisis) সম্ভব হত না। নতুন ছেলেরা জলকে "H_2O" বলেই মনে করে "উঃ কত বড় একটা সত্য আবিষ্কার করলুম", কিন্তু আসলে বোধ হয় তারা জলকে কেন "H_2O" বলা হয় (অর্থাৎ সঙ্কেতের অর্থ) তা একেবারেই জানে না!

করে' করে' শিক্ষা করতে হয় বলে আমেরিকার ছেলেদের এ রকম ভুল ধারণা জন্মাতে পায় না। বরং এ পদ্ধতিতে একটা বাস্তব বস্তুতন্ত্র সত্য ধারণাই ছাত্রের মনে গড়ে ওঠে। নিয়মিত ভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করতে করতে নতুন নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করে, তার পর ব্যাপারগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের সময়ই যত আইন আর মতবাদ বেরিয়ে পড়ে —আবার তাই থেকে তখন নব নব ব্যাপার আবিষ্কারের প্রেরণা পাওয়া যায়। আমেরিকার ছেলেদের চোখে, আইন ও মত-টতগুলো প্রথম নয়, গোড়াটা হচ্ছে তাদের চোখে দেখা বস্তু ও ঘটনাটা। তাদের আইন কানুন সব তার উপর প্রতিষ্ঠিত।* এই মৌলিক সত্যটার জ্ঞানই তাদের জীবনের ও কর্ম্মের সাফল্যের ভিত্তি।

* জড়বিজ্ঞান চলেছে বস্তু, ঘটনা, প্রকাশ থেকে (from fact) সত্যে, ভাবে, dream'এ স্বপ্নে (to law and theory)।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান চলেছে সত্য, স্বপ্ন, ভাব, dream থেকে বস্তু, ঘটনা, প্রকাশে।

প্রকাশের পিছনে কি স্বপ্ন আছে তা জানবার জন্যে এবং তা দিয়ে জগৎ গড়বার জন্যে জড়বিজ্ঞান প্রকাশের স্তরকে ঠেলে ঠেলে সত্যের দিকে চলেছে।

স্বপ্ন কতটা বস্তুগত বা প্রকাশ হয়েছে, কতটাই বা আজ প্রকাশ করা যায় তার জন্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান স্বপ্নরাজ্য থেকে মিটমিট করে চেয়ে দেখছে।

মন, স্বপ্নের সত্যের যতটুকু দেখতে পায় সেটা এত সামান্য, এবং সাধারণতঃ এত সঙ্কীর্ণ, এত রঞ্জিত থাকে, যে জড়বিজ্ঞানের পক্ষে স্বপ্ন ও মতবাদ (dream and theory'র) উপর বেশী জোর না দিয়ে প্রকাশ (fact) এর, পরীক্ষার উপর জোর দেওয়াই স্বাভাবিক।

স্বপ্নরাজ্যের কথাও সাধারণতঃ এত স্বপ্নবিজড়িত যে প্রকাশের সঙ্গে তার বড় কম মিল হয়। তাই যারা স্বপ্ন দেখেন তাঁদের মাঝে মাঝে প্রকাশের সঙ্গে তাদের সত্যগুলো মিলিয়ে নেওয়া দরকার। তবে আসলে প্রকাশও (fact) সত্য এবং স্বপ্ন ও (dream) সত্য। এই প্রকাশ ও অপ্রকাশের সকল সত্য আছে একটা লোকে, মনের মন দিয়ে সেখানকার সত্য জানা যায়।

তা হলেও স্বপ্নের মাঝেও অনেক আশপাশের অবান্তর কথা এসে পড়ে—তখন স্বপ্ন ভুল হয়ে যায়। মানুষে সাধারণতঃ এই ভুল স্বপ্নই দেখে! ইতি—অনুবাদক।

আমাদের ছেলেরা শিক্ষকের সামনে নিষ্ক্রিয় হয়ে (passive) বসে পড়া শোনে আর মুখস্থ করে। আমেরিকার ছেলেরা প্রাণ মন আর শরীর এক করে শিক্ষার জন্য খাটে, পরীক্ষা করে। এই পদ্ধতিতে ছেলেদের যে কর্ম্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, পারদর্শিতা ও বিচারশক্তি জন্মায় তাতে যে তারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

সেখানে অনেক বিদ্যালয়েই রসায়নে 'চুল-চিরে-ভাগ-করে' পরীক্ষাটাকে (quantitative experiment) পছন্দ করে। এ রকম পরীক্ষা, সূক্ষ্ম মাপ জোপের ও দর্শনের, একটা রীতিমত কসরৎ। যে আইনগুলোকে আমাদের দেশে একটা স্বতঃসিদ্ধ মতের (Theory) মতন করে প্রকাশ করা হয় সেখানে সেইগুলোকে স্বীকার করবার আগে ছেলেরা একবার পরীক্ষা করে দেখে নেয়। এই সব আইন-গুলোকে পরীক্ষা করবার জন্যেই তাদের কর্ম্ম। এই রকম মাপজোপের কাজের (quantitative experiment) মধ্যে distillation, হাইড্রোজেনের equivalent বার করা, ionisation, the law of multiple proportions'কে প্রমাণ করা, the combination of a metal with oxigen তার proportion বার করা ইত্যাদি পরীক্ষা আছে। হাওয়াতে কত ভাগ অক্সিজেন আছে, KCLO2'তে (পটাশ ক্লোরাইড্'এ) কত ভাগ আছে, "একলিটার" হাওয়ায় বা কতটা আছে ; আর অক্সিজেনটা বিভিন্ন তরল পদার্থে কতটা মিশ খায়—এই সবগুলোও পরীক্ষা করে ঠিক ঠিক বার করতে হয়। শিক্ষায় এই রকম সূক্ষ্ম পরীক্ষার (quantitative experiment'এর) উপর সকলেই জোর দেন, তবে রাসায়নিক দাঁড়িপাল্লায় (chemical ballance) বা চোখে দেখে (অবশ্য যন্ত্র দিয়ে) যতদূর সূক্ষ্ম ফল পাওয়া যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। উচ্চ গণিত বা বীজগণিতকে আর সেখানে এসে গোলমাল করতে দেওয়া হয় না।

আমেরিকার সকলে অবশ্য স্বীকার করেন যে ক্লাসের পড়ায় বা শিক্ষকের পরীক্ষা দেখে ছেলেদের বিষয়টার মোটামুটী একটা ধারণা হয়ই, কিন্তু সত্য বিজ্ঞানটাকে শেখাতে হলে সুপরিচালিত ও যন্ত্রবহুল পরীক্ষাগারের আশ্রয় ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই, এটা তাঁদের একটা জন্মগত ধারণা।

(৩)

এই সব শিক্ষা-সাধনার মধ্য দিয়ে আমেরিকানরা এমন একটা পদ্ধতির উদ্ভাবন করবে বলে চলেছে, যাতে ছেলেমেয়েদের সব চাইতে বেশী কর্ম্মস্বাধীনতা দেওয়া যায়। শিক্ষকরা সর্ব্বদাই চিন্তিত, কেমন করে তাঁদের হস্তক্ষেপটা কমিয়ে এনে, ছেলেদের স্বাধীন-ইচ্ছা ও কর্ম্মৈষণা, দায়িত্ববোধ, আত্মাধিপত্য ও স্বাভাবিক সংযমটা বাড়িয়ে তুলবেন।

এই রকম একটা উচ্চ ধারণাবশে সকল বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিশেষতঃ সৃজনশিল্প শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ছেলেদের কর্ম্মঠ শক্তিমান ও সংকল্পপরায়ণ করে তোলেন। তারপর এই রকম শিক্ষাসাধনার ভিতর দিয়ে ছেলেরা বিষয়টা বা কাজটা সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানলাভ করে।

কোন একটা জিনিস তৈরি করবার আগে ছাত্ররা শিক্ষককে প্রথমে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায়—তারপর জিনিসটা সামনে রেখে তার সম্বন্ধে আলোচনা, প্রশ্ন, পর্য্যবেক্ষণাদি চলতে থাকে। একটা নতুন কোন যন্ত্র ব্যবহার করবার পূর্ব্বেও এই রকমে শিক্ষক ছেলেদের আপনার চতুর্দ্দিকে ডেকে যন্ত্রটাকে খুলে, অংশগুলো ভাল করে দেখিয়ে দেখিয়ে আবার বাঁটে যুড়ে দেন, তারপর সেটা নিয়ে কি রকম করে কাজ করতে হয় এবং যন্ত্রটা কি কি কাজে লাগে তা দেখান।

ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা

পরিশিষ্ট।

(৪)

ইউরোপে লোকে ছেলেকে স্কুলে পাঠায় "বাহ'ক কিছু শেখবার জন্যে"। আমেরিকানরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান তার সর্ব্বাঙ্গীন সাধনা করবার জন্য— শরীর, হৃদয়, বুদ্ধি এতে কিছুই বাদ পড়ে না।

শিক্ষার ভিতর দিয়ে যে একটা জাত গড়ে উঠতে পারে, শিক্ষালয়টাকে জীবন্ত জাতীয় সাধনকেন্দ্র করতে হলে যে বিদ্যালয় আর জাতির মধ্যে কি সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়, এ সকল চিন্তা আমাদের বিদ্যালয়ের পিছনে কতদূরে যে পড়ে আছে তা বলা যায় না! পড়াবার লোক আমাদের গোনাগুনতি, শিক্ষাপদ্ধতিটা কেবল সূক্ষ্ম অবান্তর তত্ত্বেরই আলোচনায় পর্য্যবসিত, পড়ার বিষয়গুলোকে যতদূর সম্ভব বস্তুতন্ত্র জীবন্ত সত্যের নিকট থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে কেবল নিছক ন্যায় আর যুক্তি দিয়ে সেগুলো প্রতিপন্ন করতেই শিক্ষকরা ব্যস্ত। শিক্ষকদের একটা খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়া, শিক্ষা বিষয়ক কোন কথাই বাহিরে আলোচিত হয় না। সাধারণে শিক্ষকদের কথা একেবারেই বুঝতে পারে না, তারা মনে করে ওসব কথায় থাকবারও বুঝি তাদের দরকার নেই—ওটা যেন শিক্ষা-ব্যবসায়ী ও শিক্ষা-সচিবের কর্ম্মচারীদের একচেটিয়া কাজ।

আমেরিকায় কিন্তু প্রত্যেক স্কুলেই একটা বিশেষ রকম স্পন্দন অনুভব করা যায়। শিক্ষার সাধারণ কথাগুলো নিয়ে সংবাদের কাগজে পত্রে পুস্তকে ও প্রকাণ্ড সভায় সদাই একটা আলোচনা চলেছে। এই সব থেকে যে সিদ্ধান্ত খাড়া হয় সেগুলোকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নোট করে, সে সব সিদ্ধান্ত নিজে ভাল করে পরীক্ষা করে এবং সুবিধা বুঝলে চালিয়ে দেয়। সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই ক্লাস বা পরীক্ষাগারে যাতায়াত করে এবং তারা নব নব সিদ্ধান্তের প্রয়োগ-ফল দেখে সন্তুষ্ট হয়েই চলে যায়। এই রকমে একদিকে যেমন জাতির আর্থিক ও সামাজিক জীবনটা বিদ্যালয়কে ভেদ করে চলেছে অপর দিকে সেই রকম বিদ্যালয়ের সব নব উদ্ভাবনী ও সাধনাটা (culture) সমাজ ও তার জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। এতে মন্দ ত কিছু হয় নি সবটা একটা সত্য ও স্বাভাবিক মূর্ত্তিই গ্রহণ করেছে। সব শিক্ষাটার মধ্যেই, ভাব এবং তার রূপ দেওয়া, এ দুটো অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে আছে। করে' করে' শিখতে হয় বলে ছেলেদের তাই এতটা ইচ্ছা আর সঙ্কল্পের জোর হয়।

আমেরিকানদের আর একটা বিশ্বাস যে জাতির ভবিষ্যতটা মেয়েদের উপরেই নির্ভর করে, কারণ মেয়েরা চিরদিনই জাতির সব পুঁজিপাটাগুলোকে বুকে করে ধরে রাখে, আর তার পরবর্ত্তী যুগে সেইগুলো সব জাতিটার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তাই ইউরোপে আমরা যেখানে মেয়েদের পাঁসিয়ন্ আদিতে (Boardings) রেখে অনাবশ্যক কতকগুলো শিক্ষা দিয়ে আনি বা দুএকজনকে মাত্র খাধ্য বিদ্যালয়ে একটু আধটু পড়িয়েই মনের আর বুদ্ধির শিক্ষাটা (Intellectual education) শেষ করি, সেখানে আমেরিকানরা দলে দলে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে মেয়েদের হাই স্কুলে পাঠায়, সেখান থেকে তারা সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চা করে মানসিক একটা গঠনকে পেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য [illegible] শিক্ষা বা সংসারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করে। স্কুলের রান্নাঘর আর সেলাই-ঘরগুলো সত্যই এক একটা বড় বড় পরীক্ষাগার বা কর্ম্মশালার মত- এখানে মেয়েরা 'স্বহস্তে' করে' করে' এবং methodically ভবিষ্যতে স্বাধীন জীবনযাপন বা সংসার গঠনোপযোগী জ্ঞান ও শিক্ষা গ্রহণ করে। এই রকম একটা শিক্ষা পেয়েই তবে তারা ঘরে বাইরে দেশের শরীর ও মনকে রক্ষা শুধু নয়, পুষ্ট, বর্দ্ধিত-শক্তি করে চলেছে।

দেশের মধ্যে "দয়া ধর্ম্মকে" রক্ষা করে হৃদয় তৃপ্ত-লাভ করবার জন্যে আমাদের দেশে অনেক সভা সমিতি স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকানরা ব্যক্তি-স্বতন্ত্র হলেও তাদের এদিকের প্রচেষ্টা বড় কম নয়। বরং আমাদের চাইতে তাদের কাজের ধারাটাই খুব ফল প্রদ। অসাধারণ বদান্যতা সহকারে লোকে ব্যক্তিগত বা নগরগত ভাবে বড় বড় পুস্তকাগার ও বিদ্যালয় স্থাপন করে। জাতির যাতে উন্নতি হয়, সাধারণের যাতে সুখ ও সুবিধা হয় এমন কোন প্রতিষ্ঠান করবার জন্যে পাশাপাশি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে রেশা-রেশিই পড়ে যায়—আর টাকাও তখন জলের মতন পড়তে থাকে। এমনি ভিখারীর টুপীর ভেতর একটা পয়সা ফেলে দেওয়ার চাইতে এই রকম সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করলে সত্যই দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন হয়।

এইরূপ একটা জাতিগত উচ্চাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেখানে শিক্ষা-সাধনাটা দাঁড়িয়েছে সেটা যে সত্যই স্বাভাবিক, জীবন্ত ও সকল লোকের হৃদয়ের ধন হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে?

কি উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, কি ব্যবসায় বা বিশেষ শিক্ষা—সব শিক্ষার ভিতরটা কিন্তু একটা পাকা, বিস্তৃত, শিক্ষা-সাধনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যে উচ্চ কি নিম্ন সব শিক্ষাই একটা আর একটার উপর, ধাপের পর ধাপ করে সাজান—কিন্তু আমাদের দেশে এগুলো মাঝে মাঝে ধাপছাড়া হয়ে আছে বলে' এক শিক্ষা থেকে আর এক শিক্ষায় যাবার সময় নয় একটা লাফ দিতে হয়, নয় অনেক কিছু বৃথা শেখা হয়েছে বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়। নিম্ন প্রাথমিক' প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, টেকনিক্যাল্ ইন্সটিটিউট্, শিক্ষকতা শিক্ষার বিদ্যালয়, এতগুলি শিক্ষাকেন্দ্র যেন একটি সূত্রে গাঁথা—এক ধাপ ছেড়ে অন্য ধাপে পা দেবার সময় কখন কোন শিক্ষার অভাবও বোধ হয় না, আর অমুক শিক্ষাটা বাজে গেল এটাও মনে হয় না।

ইউরোপীয় বিদ্যালয়ে শিশু ও-যুবক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানটার এত অভাব যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক রকম ছেলেদের পিটে পিটেই মানুষ করতে চান—এতে তাদের মনেও বাধে না আর লজ্জাও করে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল রকম বৈশিষ্ট্যকে 'বাজে নীতির মত' ধামা চাপা দেওয়া হয় আর যবে নূতন জীবনের অঙ্কুরটা বার হচ্চে তখন তাকে পড়া ও নিয়মের বা form'এর চাপে একেবারেই চিরকালের জন্য গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকানরা মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বড় ভালবাসে বিদ্যালয়ের প্রায় সব কাজই ছেলেদের পছন্দ, বিবেচনা ও দায়িত্বের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই সব শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলের বাড়টাই ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় এবং এইখান থেকেই ছেলের অভিজ্ঞতা ও শৃঙ্খলায় অমূল্য মূলধন সংগ্রহ করে—যার জন্যে তাদের আর স্কুল থেকে বেরিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে হয় না। কোনখানেই আমাদের দেশের মত শিক্ষকরা পাদ্রিদের ন্যায় গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে বক্তৃতা আরম্ভ করে না—যেখানে প্রশ্ন করাটা অবিশ্বাস বা ধৃষ্টতার কথাই হয়ে দাঁড়ায়। কোথাও শিক্ষকরা যন্ত্রতন্ত্রের বা বিজ্ঞান শাস্ত্রের শেষ সংজ্ঞাটি পর্য্যন্ত ছেলেদের কাণে ফুঁকে দিয়ে বাহোবা নিতে চান না। কোনখানেই দেখতে পাবেন না ছেলেরা মাষ্টারের মুখস্থ করা বুলিগুলো তাড়াতাড়ি থাতায় আর মাথায় টুকে রাখছে যাতে পরীক্ষার সময় তারা সব কথাগুলো একটুও ভুল না করে এবং একটুকুও না বাড়িয়ে মুখস্থ বলতে পারে। আমেরিকানরা ছেলের আপন চিন্তাধারার মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাটাকে এনে ফেলে এবং পরীক্ষার (experiment) মধ্য দিয়ে ছাত্রের শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলে। এতে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টার

সম্বন্ধেও বেশ একটা বস্তুতন্ত্র ধারণা জন্মায়।

ছেলেকে একমাত্র নিষ্ক্রিয় শ্রোতার আসনে বসিয়ে না রেখে তারা ছেলেদেরই শিক্ষা নাট্যের 'এ্যাক্‌টার' করে তোলে। ছেলেদের নিজের উপর নির্ভর করে নিজে গড়ে উঠবার জন্যে, স্বেচ্ছায় পরীক্ষাগারে উদ্ভাবন শক্তির চর্চ্চা করবার জন্যে, নিজের পছন্দমত বড় বড় কাজে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবার জন্যে, সর্ব্বদাই তারা উৎসাহ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এই থেকে আর একটা গুণ—যেটা আমেরিকানদের মত এত কার নেই—সেই "push" বা জীবনে এগিয়ে যাবার ক্ষমতাটা জন্মগ্রহণ করে। কচি কচি ছেলে মেয়েদের বাগান-চাষ থেকে আরম্ভ করে কলেজের পরীক্ষাগারের 'চুলচিরে ভাগ করার কাজ' পর্য্যন্ত সকল সময়েই আমেরিকার ছেলেরা আপনার ভেতর থেকে টেনে এনেই সব জিনিষকে ফোটায়। এই রকম স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে' করে' এবং আপনার উপর একমাত্র নির্ভর ক'রতে ক'রতে তাদের জীবনে এত সাম্ভাবনীয়তা জাগ্রত হয়, হৃদয় ও মস্তিষ্কে এত শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে যে তাদের স্কুলের বাইরের জীবনে তারা আপন ইচ্ছামত সেগুলোর ব্যবহার করে সহজেই জীবনে সাফল্য লাভ করে।

এই রকম জীবন্ত, সত্য, বস্তুতন্ত্র একটা শিক্ষা সাধনার ভেতর দিয়েই "যুবক আমেরিকার" মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলে এমন একটা বিদ্যুৎ-শক্তি নিহিত হয়ে যায় য তাদের চিন্তা আর কর্ম্মের মধ্যে বেশী সময় বৃথায় যায় না।

সমাপ্ত

(মঃ বুশার ফরাসী হইতে)

কর্ম্মযোগ

—:০:—

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" আত্মোপলব্ধির জন্য শক্তিমান পুরুষের আহ্বান আসিয়াছে, আপনাকে ক্ষুদ্র বা অসক্ত মনে করিয়া আত্মঘাতী হইও না, আমরা অহং চালিত হইয়া নিজেকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছি, সাধনা তাই বড় কঠিন, বড় শক্ত বলিয়া ক্ষুদ্রত্বকেই শ্রেয়ঃ মানিয়া লইয়াছি, বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ কর, শরীর মনের পশ্চাতে শুদ্ধ সত্তা, তাঁহাকে জানিবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় হও, শ্বাস প্রশ্বাসের মত সাধনা সহজ ও সরল হইয়া উঠিবে।

আজ আমি কর্ম্মযোগের কথা বলিব। যোগের দ্বারাই জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়। যে জীবন লইয়া আমরা আছি, উহা মাটীর বুকে ঐ সকল কৃমির মত অতি ঘৃণ্য। দিবসে আহারের চেষ্টা ও পরিবার পরিপোষণের চিন্তা করি, রাত্রে নিদ্রা মৈথুনেই জীবন ক্ষয় হইয়া যায়। চাই জীবনের জীবনকে জানা, তবেই তো দিব্য জীবন লাভ হইবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে, ইহার জন্য তপস্যা কর, সাধনা কর, যাহা আছে তাহাকে জাগ্রত কর, নিজ হস্তে মুখে চুনকালি মাখিয়া সং সাজিয়াছ, ইচ্ছা করিলেই তোমার স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পার, সং সাজার ইচ্ছা ছাড়িয়া, সত্য-যাহা, তাহা হইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগাইয়া তোল, ইহাইতো স্বাভাবিক, বিপরীত পথে চলিয়া তুমি বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছ।

কর্ম্ম তুমি করিয়া যাও, তাহাতে কোন আপত্তি

নাই, কিন্তু ফলের আকাঙ্খাটুকু একেবারেই রাখিও না, যাহা করিতেছ উহা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম চিত্তে কর কেবল কর্ম্মজনিত ভোগে ও ফলে তুমি নিরাসক্ত হও। এইটুকু করিতে পারিলেই কর্ম্মযোগের আর হইবে। শুধু নিরাসক্ত হইলেই চলিবে না, ধীরে ধীরে সুখে দুঃখে, জয়ে, পরাজয়ে, নির্দ্বন্দ্ব হইতে চেষ্টা কর, উচ্চ নীচ, সাধু অসাধু, শত্রু মিত্র প্রভৃতির প্রতি সমদৃষ্টি-পরায়ণ হও, একেবারেই ইহা সম্ভব না হইলে বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই, যতদিন সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি হীন হইতে না পার, পুনঃপুনঃ অন্তর দিয়া ইহা পর্য্যবেক্ষণ কর, শ্রদ্ধা সহকারে সকল পদার্থে, সকল প্রাণীতে তাঁহাকে অবস্থিত জানিয়া, কর্ম্মকে আহুতি স্বরূপ ভগবানে সমর্পণ করিতে থাক, সর্ব্ব জীবে, সর্ব্ব বিষয়ে ভগবানের অবস্থিতি বোধে, তাঁহাকে লক্ষ্য স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান, উহা ভক্তি সংমিশ্রিত, আর তিনি আমার মধ্যেও বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্ব কর্ম্ম উৎসর্গ করিতে করিতে অন্তর্য্যামীর সহিত সাধকের একত্ব অনুভূত হয়, এই অবস্থায় জ্ঞান আসিয়া ভক্তি ও কর্ম্মকে আলিঙ্গন করে। ত্রয়ী তখন জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে ভগবানের অখণ্ড অনুভূতি যত দৃঢ় হইবে, যত স্পষ্ট হইবে ততই আমরা সমতার অধিকারী হইব। সমতাই যোগের আসল প্রতিষ্ঠা। এই সমতা অর্থে শত্রু মিত্র প্রভৃতি বিরোধী সম্বন্ধের লোপ নহে। বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া বিষধর ভুজঙ্গমকে বুকে তুলিয়া সমতা সিদ্ধির পরিচয় দিতে হয় না। বৈচিত্র্য যতই বিষম হউক উহার সহিত অন্তরে ঐক্য সন্দর্শন করিতে হয়। ভগবান অদ্বিতীয়, সকল পদার্থ, সকল প্রাণীতে তিনি অখণ্ডভাবে নিত্য বিরাজিত, অন্তরে এই একত্বের অনুভূতি, এই অভেদ দৃষ্টি অটুট হইলে ইহার যাহা, জ্ঞান, কর্ম্ম, অনুভূতি, ইন্দ্রিয়বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রকৃতি [illegible] ত্বাধা আচরণ নিরূপণ করে, পরিদৃশ্যমান ভেদ হইতে আমরা যে কার্য্য করি, উহা সংস্কার ও রাগদ্বেষপ্রসূত

বিপরীত ও বৈদেশিক শিক্ষার আবর্ত্তনে আমরা বড়ই বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছি অহংকে প্রভুরূপে বরণ করিয়া চলাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, এইজন্য সাধনা গ্রহণ করাও একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রিয় বুদ্ধিই যেন আমাদের নিয়ামক—ইহা ছাড়াইয়া স্বতন্ত্র কিছুর নির্দ্দেশে চলার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না জানিয়া কেহ এ পথে অগ্রসর হইতে চাহেন না—এতদ্ব্যতীত পথও দুর্গম, জটীল সমস্যাপূর্ণ, যোগ গ্রহণ করিয়াও অনেক সময়, আমাদের ঘুরিয়া মরিতে হয়।

কর্ম্মযোগের প্রথম কথা নিরাসক্ত হওয়া। কোন বিষয়ে আসক্তি না রাখিয়া ভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। প্রথম প্রথম, যে ক্ষেত্রে আসক্তি থাকার সম্ভাবনা, যাহাদের হিতসাধনে নিজের স্বার্থ বিজড়িত, উহা [illegible] চলাই খুব স্বাভাবিক, সেইজন্য পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এমন কি নিজের দেশের কাজেও দ্বিধা আসিয়া উপস্থিত হয়, কেননা ইহাদের প্রীতির জন্য কার্য্য করিলে নিরাসক্ত হওয়া তো সম্ভব নহে, এই সকলের সহিত নিজে যে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া আছি। তারপর সর্ব্বভূতে ভগবানের ধারণা লইয়া কর্ম্ম করিলে, বৈচিত্র্যবোধ রাখাও চলে না, শত্রু মিত্র সাধু ভণ্ড, সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে হয়, আপনার পর বিচার চলে না, সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দের জ্ঞান পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে হয়, ব্যক্তিগত মুক্তি ও হৃদয় বিকাশের জন্য এরূপ সাধনা প্রযুক্ত হইলেও জাতিগত জীবনে ইহা একটি সমস্যা, হত্যাকারীর দণ্ড, তস্করের নির্য্যাতন, ব্যভিচারের শাস্তি, বিদ্যার আদর, সাধুর সম্মান, দাতার গৌরব না থাকিলে সমাজের সৌন্দর্য্য থাকে না।

ভগবান গীতায় যে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন উহাই সত্য সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতিগত সাধনা। খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে, সর্ব্বজীবে দয়া পরবশ, সেবা ও প্রেমকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। অশ্রু, শুশ্রূষা সান্ত্বনা ইহার উপচার। কিন্তু পার্থসারথি, অর্জ্জুনকে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য নর-রক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়া দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রেমধর্ম্মের, মানব হিতৈষণার ইহাও কি একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়? কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া অন্তঃশুদ্ধির দ্বারা তাঁহার সহিত সাংজ্ঞা লাভ করা। এই শুদ্ধি জাতিগত শুদ্ধি, অখণ্ড সত্তার, কিয়দংশ শুদ্ধ হইলে —পুষ্করিণীর কিঞ্চিৎ পানা তুলিয়া, কাজ সারা মাত্র, পানা যেমন তেমনই রহিল। কর্ম্মযোগী চাহে নিরঙ্কুশ মুক্তি, ব্যক্তিগত জীবনের নহে, মানবজাতির মুক্তি।

বন্ধনের মূল কথা কি? অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার নানা অভিব্যক্তি নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেবার দ্বারা ইহার কিঞ্চিৎ লাঘব হয় মাত্র, দুঃখী দুঃস্থ জনের সাময়িক কিছু সাহায্য করা যায় মাত্র, রণাঙ্গনে যে যোদ্ধা রক্তাক্ত কলেবরে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে তাহার মুখে সেবক বারিধারা সেচন করিয়া আহত সৈনিকের আপাতঃ যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ হ্রাস করে, নিজেও আত্মপ্রসাদ পায়, কিন্তু পৃথিবীর হাহাকার দূর করিতে পারে না, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে বিরত যাঁরা, তাঁরা আত্মমুক্তি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, ধরণীর ভার লাঘব করিতে আসে নাই, জগৎ বড় বিচিত্র, কর্ম্মের গতিও জটীল সমস্যাপূর্ণ, কোন বিশেষ ধারা ধরিয়া কাজ করিলে আমরা ক্ষুদ্র হইয়া পড়িব, জীবনের পূর্ণত্বে কোন দিন পৌঁছিব কিনা সন্দেহ— নিজেকে ছোট করিয়া দেখা অহংকারের প্ররোচনা বলিয়া জানিবে, অনন্ত শক্তির আধার তুমি, সত্য পথটি ধরিবার জন্য উদ্যত হও।

কোন কর্ম্ম শ্রেয়ঃ, কোন কর্ম্ম শ্রেয়ঃ নহে, কোন কর্ম্ম নিরাপদ স্পষ্ট, কোন কর্ম্ম বিপজ্জনক জটীল, এই সকল যুক্তিজাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সকল কর্ম্ম যজ্ঞস্বরূপ করিয়া যাও। কর্ম্মের মূলে যেন কোনরূপ বাসনা লুকাইয়া না থাকে, এই দিকে শ্যেনদৃষ্টি অবিরত রাখিবে, বাসনাহীন কর্ম্মপ্রবণতায়, ব্যক্তিগত সুবিধাজনক কর্ম্ম-নির্ব্বাচন কিছুতেই ঘটিয়া উঠিবে না, আসক্তির কোন চিহ্নই ইহাতে স্থান পাইবে না। তোমার যে কর্ম্ম উহা তো ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নয়, ব্যক্তিগত আদর্শের সুর যত উচ্চ গ্রামে বাঁধিয়া তুমি ঝঙ্কার দাও, উহার ভঙ্গী যত উন্নত ধরণের করিয়া তোল, মনে রাখিও, তোমার কর্ম্মোৎপত্তির কেন্দ্র আর তুমি নহ, উপর হইতে যে আহ্বান আসিয়া আজ তোমায় উন্মাদ করিয়াছে, সেই অনাহত সুর ধরিয়া উপরের দিকে উঠিয়া চল, তোমার জীবন-কেন্দ্র উপরে উঠাইয়া ধর, যে কঠোর সমস্যা নিরাকরণে কর্ম্মোদ্যত, যদি সার্থক হইতে চাও, অহং প্রসূত যত উচ্চ স্বাধীন অভিমত আবিষ্কার হউক, ঐ দিকে আর ফিরিয়া চাহিও না, উহাকে ছাড়িয়া চলিতেই যে তোমার ডাক আসিয়াছে।

কর্ম্ম সৃষ্টির মূল হইতে বাসনা যখন খসিয়া পড়িবে, তখন জানিও জীবনের সর্ব্ব কর্ম্ম কেবল আহুতির জন্যই সংগৃহীত হইতেছে। দেখিবে তপস্যার প্রবল অনল লক্ষ শিখা বিস্তার করিয়া তোমার সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত, আর তুমি অগ্নিময় হোতা কেবল ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা মন্ত্রে সর্ব্বস্ব অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছ। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্মফলে যে কেবল স্পৃহা থাকিবে না এরূপ নহে, কর্ম্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব নিয়ন্তা ভগবানের হস্ত হইতেই সম্পাদিত হইতেছে—এরূপ সন্দর্শন করিয়া পরম নির্ব্বেদ লাভ করিবে। এই অবস্থার কথা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে, বলিব, সে অবস্থায় তুমি আর ভগবান হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহ,

তাঁরই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃমণ্ডিত, তাঁরই পরম ইচ্ছা-সমুদ্রে নিমগ্ন—বিদ্যুৎময় মহাশক্তি তুমি, তোমার শরীর মন, হৃদয় বুদ্ধি সবই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাধীন যন্ত্র মাত্র, তখন কর্ম্ম নির্ব্বাচন করেন তিনি, সম্পাদনের ভারও তাঁর, অহংকার এখানে স্পর্শমণির পরশে—হিরণ্ময় ভাগবদ্ বিভূতি।

হায়রে, ইহা তো একেবারেই হওয়া সম্ভব নয়, একেবারেই এই সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া যাওয়া তো ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু ভাই, বিশ্বাসের ভেলায় চড়িয়া এই অকূলে ভাসিয়া আইস, আমি তোমায় পথের নির্দ্দেশ বলিয়া দিই।

তোমার ভিতরে ভাগবত সত্তা আছেন, সেই সত্তাকে যতদূর সম্ভব উপলব্ধি কর, যেরূপ প্রকারে তাঁহাকে ধরিয়া তোমার আনন্দ হয়, তুমি সেই ভাবেই উঁহাকে অবলম্বন কর। তিনি চৈতন্য স্বরূপ, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, বিশ্বাসের অগ্নিকুণ্ড, নীতিধর্ম্ম, আনন্দপূর্ণ কোন অবস্থা, স্বভাবের উৎকৃষ্ট ভঙ্গী, যাহাই হউক, এই ভাবের কাছে জীবনের সর্ব্বকর্ম্ম যজ্ঞস্বরূপ অনুষ্ঠান করিয়া যাও। মানুষ তোমায় ভণ্ড বলিবে ভ্রুক্ষেপ করিও না, তোমার যুক্তি তোমায় ছলনা করিবে কাণ দিও না, চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধু বান্ধবের উপদেশ তোমায় মিথ্যা পথ হইতে সত্যে আনিতে উদ্যত হইবে হাসিয়া উড়াইয়া দাও, যদি অনুভূতি তোমার সত্য হয়, বিশ্বাস যদি দৃঢ় হয়, কোনরূপ কাপট্য যদি না থাকে, কর্ম্মের মূলে যদি বাসনার গন্ধ না পাও, আর যজ্ঞস্বরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম যদি অনুষ্ঠান করিতে পার, যত বিঘ্ন, যত যুক্তি তোমার কার্য্য মিথ্যারূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করুক, জানিও তুমি সত্যপথে চলিয়াছ—কিছুতেই বিচলিত হইও না। বাহিরের বাধা যত প্রবল হইবে, অন্তর যমুনার তটে দাঁড়াইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনাহত বাঁশী বাজাইতেছেন, সে মোহন সঙ্গীত কাণ পাতিয়া শুনিও, যে উৎস হইতে কর্ম্মের অনাবিল ধারা নিঃসৃত হইতেছে উহা যে অব্যাহত, বাহিরের বাধায় উহা তো ক্ষুন্ন হইবে না—সত্যের আহ্বান বার বার শ্রবণ করিয়া—অন্তরের যজ্ঞকুণ্ড আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিও।

যখন অহংকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে, তখন দেখিবে ইহা নূতন কিছু নহে—যে সকল সামগ্রী নিজের বলিয়া দাবী করিতেছিলে, সে সমুদয় ভগবানের যন্ত্ররূপেই সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই অবস্থাই আমাদের সত্য অবস্থা—ভাগবত জীবনই আমাদের সত্য জীবন।

কর্ম্মযোগের এই চরম আদর্শ, প্রচলিত সাধনা হইতে পৃথক বস্তু—এই জন্য আমাদিগকে খুব সতর্ক হইয়াই গতানুগতিক প্রভাবকে এড়াইয়া চলিতে হইবে, এই বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে গভীর অনুশীলন করিতে হইবে, সেই জন্যই বলি, কে আছ শক্ত মানুষ—আত্ম-দর্শনে উদ্বুদ্ধ হও, দিব্য জীবন লাভের উত্তম পন্থা অবলম্বন কর।

সন্ন্যাসীর কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে জিনিষটী বা ভাবটী স্বতঃই ফুটিয়া উঠে সেইটেই খাঁটী, সেইটীই সত্য, সেই সত্যই আমার জীবনের শোভা, মাধুর্য্য! কড়া শাস্ত্রী প্রহরী দ্বারা বিধি নিষেধের দ্বারা সত্য ফুটাইবার চেষ্টা কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইবারই মত ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। জিনিষের বা ভাবের শোভাটী নষ্ট হইলে তাহাকে মানুষে চাহিবে

কেন? তাহাতে মায়ের সেই প্রাণচাপা ভালবাসা ও ভয়ের যে শোভা তাও নাই! তবু ধর্ম্মপ্রাণ ভারত সেই কৃত্রিমটাকে বরণ করিয়া আজ সহস্র সহস্র বৎসর শোভাহীন, শান্তিহীন জীবনভার বহন করিয়া আসিতেছে, সে কেবল এই "সন্ন্যাসীদের" দেখিয়া, তাহাদের অন্তরের ভার নহে, তাহাদের বাহিরের বেশ দেখিয়া! এখনও যে ভারতে পরোপকারের কথা শুনা যায়, সে কেবল এই সন্ন্যাসীদের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র!" পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ। সন্ন্যাসীর বা সাধুজনের বিভূতিই পরোপকারের জন্য। বর্ত্তমান স্কুলের বা কলেজের বালকেরা স্যর ফিলিপ সিডনির, নিজ প্রাণ দিয়া পরের তৃষ্ণা দূর করিবার কথা পাঠ করিয়া বাহবা বাহাদুরীর ছড়াছড়ি করেন, তাহার কারণ তাঁহারা যে ভারতের সন্ন্যাসীদের জানেন না—এই নিজের সর্ব্বস্ব দান করে পরের উপকার করাই যে সাধু ও সন্ন্যাসীর নিত্য কর্ম্ম—এই কাজটাই তাদের নগ্নদেহের আভরণ, এই কাজটাই তাহাদের স্বকৃত বা স্বেচ্ছা-বরিত দারিদ্র্যের শোভা!

সত্যটাকেই ফুটাইয়া তুলা জীবনের সার্থকতা ও সেই সত্যের জন্য জানিয়াই হউক, বিভ্রান্ত হইয়াই হউক, যাহারা পাশবভোগের পথ ত্যাগ করিয়া ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ত্যাগ-ভোগের সামঞ্জস্য করিয়া আসিতেছে তাহারা ভারতের সন্ন্যাসী। তাহারা শরীরকে অনিত্য জানিয়াই যে শরীরের ধর্ম্ম পালন করে না এ কথা যদি বুঝিয়া থাক তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, তাহারা শরীরকে যদি সত্যই "সব" বলিয়া মনে করিতে পারিত তাহা হইলে সন্ন্যাসের প্রথম পথপ্রদ্রষ্টা আচার্য্য শঙ্কর এই শরীরধারী মানবের জন্য পরিশ্রম করিয়া জীবনের কয়টা দিন কাটাইতেন না—হয়ত শঙ্করকে সম্যক বুঝিতে পারে নাই, তাই তাহার অনুচরবর্গরা ভারত সমাজের কাছে ভিন্নরূপ লইয়া উপস্থিত হইলেন! সত্যকেই তিনি, মানবের মঙ্গলের জন্য মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যে জাতি বর্ণ বিচার, এ সকল ছুত ছুয়ার ব্যাপার যে ভারতের শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল, সে গুলি যে সন্ন্যাসীরা আরও বৃদ্ধি করিতেছে, তাহাদের মানিয়া কি সুফল হইবে!

আমার কথা এই যে আমি সন্ন্যাসী, আমি সন্ন্যাসীদের হৃদয় জানি তাহারা সত্যের কাঙ্গাল, শ্রদ্ধা ও প্রেমের জন্যই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ও ভগবানের নাম গান করে! তাহাদের জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যই হচ্ছে, ভারতে আবার ভগবৎ বিশ্বাস, ভগবৎ প্রেম, সেই প্রাচীন শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা করা! যে শ্রদ্ধার ও বিশ্বাসের বলে প্রহ্লাদ সমস্ত পিতৃরাজ্যের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া এক ভগবৎ আনন্দে মগ্ন হইয়া জরা মৃত্যুর অতীত হইয়াছিল, যে শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইয়া, আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং ভগবান জড় স্তম্ভের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া ভক্তের দৈত্য পিতাকে অঙ্কে স্থান দিয়াছিলেন, যে শ্রদ্ধার উপর দাঁড়াইয়া বালক ধ্রুব মাতার আশীর্ব্বচন মাথায় লইয়া ভগবৎ দর্শনের জন্য সংসার ছাড়িয়া বনে তপস্যায় বসিয়াছিল, যে শ্রদ্ধায়, দরিদ্রা রমণী তাহার একমাত্র লজ্জা নিবারণের বস্ত্রখানি খুলিয়া বুদ্ধদেবের হস্তে দিয়া ধন্য হইয়াছিল, সেই শ্রদ্ধাকে আবার জাগ্রত করিতে চাহে সন্ন্যাসী! তাহাদের উপেক্ষা করিয়া না—তাহাদের সেই ত্যাগের আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া না—তাহারাই যে "ত্যাগের মধ্যে ভোগ" বাস্তবে পরিণত করিয়া তোমাদের সামনে আজও দণ্ডায়মান এ কথাটী ভুলিয়ো না।

যদি মনে কর তাহাদের মধ্যেও শাস্ত্রের বাঁধন নাই, তাহারাও যে প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা রুদ্ধগতি করিতেছে, তাহাদের দ্বারা বর্ত্তমানে কোন সুফলের আশা করা ভুল, তাহা হইলে ভুল করিবে—মহা ভুল করিবে! তাহারা শাস্ত্র মানে, কারণ

তাহারা শ্রদ্ধা জিনিষটা বড় বলে মনে করে। পথ-প্রদ্রষ্টা ও যে যাহা দান করিয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়িবার জিনিষ নহে, এই হইতেছে তাহার মূল যদি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদের বুঝাইতে পারে, যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যাহা তাহা এই বন্ধনে বর্ত্তমানে সত্য সম্পন্ন হইতেছে না—তাহা হইলে দেখিবে, সেই প্রাচীন শ্রদ্ধার উপরই নবীন সন্ন্যাস গড়িয়া উঠিবে।

যাহারা আজ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আসিয়া সংশয়ে নবীন জীবন সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেছেন যাঁহারা নিজেদের মধ্যে বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজ, মাধবাচার্য্য ও আধুনিক পথপ্রদ্রষ্টা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকেই দেখিতেছেন ও তাহাদের সহিত আপনাদের সত্যকেও উপলব্ধি করিতেছেন। সন্ন্যাসী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া বলিতেছে যে নবীন সাধকের দল সংসারের কক্ষে থাকিয়া অধ্যাত্ম জীবন ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় যদি ভ্রান্তির বশে আপনার সমাজের প্রাণ, ভারতের আত্মার একমাত্র রক্ষক এই সন্ন্যাসীর দলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও তাহা হইলে যাহা করিতে চাও তাহা সফল হইবে না। আমি ইহা সুস্পষ্ট দেখিতেছি ভিত্তি নষ্ট করিয়া যাহারা নবীন সংসার নির্ম্মাণ করিতে প্রস্তুত হইবে তাহাদের শ্রম পণ্ডই হইবে!

আজ ভারতে যেমন সমস্তই মৃতকথা, তেমনি, এই সন্ন্যাসও মৃতকথা কিন্তু তাহার মধ্যে এখনও জীবনস্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হয় নাই, "সত্যের" জন্য আজও সন্ন্যাসী ব্যাকুল, সেই সন্ন্যাসীর দলকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়ো না—কারণ 'সত্যের' উপেক্ষায় শক্তির হ্রাস হয়!

সত্যটাও নিতান্ত বাহিরের জিনিষ নহে। সত্যটা অন্তরের জিনিষ—বাহির দেখিয়া যাহারা বিচার করিতে যায় তাহারা নিজেদের প্রতিও অন্যায় করে ও বিচার্য্যের প্রতিও অন্যায় করে। আজ মুমূর্ষু ভারতে সেই 'সত্যটা'ও মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। সহস্র বৎসরের দাসত্বে সেই সত্যের পূজক হৃদয়সিংহাসনে নারায়ণের স্থানে পাশবভোগের এক উদ্দাম লালসাকে রাজা করিয়া বসিয়াছে। শ্রুতির কথাগুলা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছে। সন্ন্যাসীরাও তাহাই করিতেছেন তবে, শুকপাখীর মত এখনও প্রাতঃসন্ধ্যায় সেই সনাতন সত্য শ্রুতির মহাবাক্য গুলির আবৃত্তি করিয়া সুপ্ত সত্যকে জাগ্রত করিতে যত্ন করেন, কিন্তু হইলে হইবে কি যাহা বাস্তব শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা কি যথার্থ হইয়া এত অল্প সাধনায় ফুটিয়া উঠিবে। চাই তাই 'সাধনা'। সত্য যখন হৃদয় হইতে সত্যই বাহিরে আসিবে, তখন তাহা সজীব হইয়াই—দেখা দিবে। তখন দেখিবে, যে শাস্ত্র বন্ধন আপনিই শিথিল হইয়া পড়িবে। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিনা নিয়মেই স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে—তখন নীতির বাঁধনের আবশ্যক হইবে না— স্মৃতির আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে না তর্কের জন্য প্রমাণ খুঁজিতে হইবে না—ভেদের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অন্তর্য্যামীকে পুনরায় ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, [illegible] সত্য, অন্তর্যামী যখন বাস্তবিক সায় দিবেন, তখনই জানিবে "সত্য" আবার [illegible]। শুধু বাহিরের জিনিষ লইয়া নাড়া চাড়া করিলে যে জীবন্ত হয় না তাই অনিবার্য্য তাহা সন্ন্যাসী বুঝিয়াছে বলিয়াই এত কথার স্তূপ গাঁথিল। অন্তরের দেবতাকেই আবার জাগ্রত করাই বর্ত্তমানের মানব জগতের প্রয়োজন—সে দেবতা যখন সবার মধ্যে এক ভাবেই আছেন তখন জাগ্রতও এক ভাবেই হইবেন। যে কুম্ভকর্ণ তাহাকে [illegible] কাঁচা ঘুমে নাই জাগিলে। যাহারা সজাগ তাহারা সাম্যময় ভাবেই সাড়া দিবে, তাহারাই আজকের সন্ন্যাসী— তাহারা সংখ্যা [illegible] কম বেশী [illegible] কোন দেশে [illegible] কোন এত প্রস্তুত হয়ে বসে

আছে? তবু তাহাদিগকে তুচ্ছ যদি কর, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে!

সব কথা ত একেবারে বলা যায় না যদি এ কথা ভাল লাগে তাহা তখন আবার বলিব। তবে এই কথাটী মনে রেখ, যে মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে কোনদিন "সত্যের" প্রচার হতে পারে না।

ঢাকা জেলায় চরকা শিল্প

— :০: —

"চরকা শিল্পের প্রবর্ত্তন লাভজনক হইতে পারে কিনা এবং তদ্দ্বারা বস্ত্রসমস্যার সমাধান হইতে পারে কিনা এবিষয়ে অনেকের মনে এখনও সন্দেহ আছে বলিয়া বোধ হয়। এজন্য আমি এবিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা সাধারণকে জানাইতেছি।

"আমি নিজে ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, শ্রীনগর ও সিরাজদিখা—এই চারিটি থানায় কার্য্য করিয়াছি। সূতা প্রস্তুত বিষয়ে এ চারিটি থানার মধ্যে দোহারের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই এক থানাতেই মাসে ৫ হইতে ২২ নম্বরের এক মণ সূতা প্রস্তুত হয়। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে সেখানে গিয়াছিলাম, সেই সময়ের কথাই বলিলাম, এখন সূতার পরিমাণ সম্ভবতঃ বাড়িয়া থাকিবে। নবাবগঞ্জে মাসে দুই মণ এবং শ্রীনগর ও সিরাজদিখা এই দুই থানায় একত্রে দুই মণের কিছু অধিক সূতা প্রস্তুত হইতেছে। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল, উৎপন্ন সূতার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বেশী বই কম হইবে না, কারণ হিসাবে দুই একটি পরিবার বাদ যাওয়া অসম্ভব নহে।

"কোন্ প্রকারের চরকা প্রবর্ত্তিত করা উচিত এ প্রশ্নের উত্তরে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে আমাদের দেশীয় পুরাতন চরকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি নিজের ও সহকর্ম্মিগণের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে প্রত্যেক গ্রামেই এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত সূতা কাটা ভোলেন নাই। আমরা সাধারণতঃ ইঁহাদিগকেই সর্ব্বপ্রথম চরকা সরবরাহ করি। ইঁহাদের সহিত চুক্তি থাকে যে পীড়িত না হইলে অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণ না ঘটিলে প্রত্যেকে প্রতিমাসে অন্যূন এক সের সূতা দিবেন এবং তাঁহাদের পারিশ্রমিক হইতে চরকার দাম ক্রমে শোধ দিবেন। তুলাও আমরাই সরবরাহ করি। যাহাদিগকে চরকা ও তুলা দেওয়া হয় তাহাদের প্রত্যেকের নামের একটি পৃথক হিসাব থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে সূতা সংগ্রহ করা ও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কখনও বা সূতা আমাদের সেবকেরা গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনেন, আবার কখনও কংগ্রেস আফিসে সূতা পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এক সের তুলা হইতে সাধারণতঃ ১৫ ছটাক সূতা হয়। গড়ে ১৬নং সূতার জন্য প্রতিসেরে ২।০ দুই টাকা চারি আনা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য সূতার সূক্ষ্মতা অনুসারে পারিশ্রমিকও অধিক হইয়া থাকে। মোটা সূতাই বেশী প্রস্তুত হয়, এজন্য প্রতিসেরে পারিশ্রমিক অধিকাংশস্থলে পাঁচ সিকার অধিক হয় না। তবে আমার মনে আছে একবার একটি স্ত্রীলোক আমাদের নিকট হইতে মাসে ১০ দশ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া-

ছেন। তিনি সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া এবং বাটীর কাহারও নিকট তুলা পেঁজা ভিন্ন অন্য সাহায্য না লইয়াও প্রতিদিন ১৯২০ তোলা সূতা কাটিয়াছিলেন।

"দোহার থানায় এ পর্য্যন্ত ১৫০টি চরকা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক ছুতার পাড়া গ্রামেই ৬০টি চরকা আছে—এই গ্রাম হইতে মাসে ২॥০ ৩ মণ সূতা উৎপন্ন হয়। এই থানায় চরকা ও তুলায় ৫০০ পাঁচ শত টাকা খাটিতেছে। প্রতিসের সূতার পারিশ্রমিক ১।০ পাঁচ সিকা হিসাবে এখন ছুতার পাড়া গ্রামের লোকে মাসে ৯৫০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত পাইতেছে। চরকার আয় যে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই হয়, এ কথাটি মনে রাখিলে চরকাশিল্পের প্রসার দ্বারা যে অল্পদিনেই অসাধ্য সাধন হইতে পারে এবং এদিকে টাকা খাটান যে বিশেষ লাভজনক তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অতএব এখন চরকাশিল্পের সর্ব্বাধিক প্রচার করে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই নিজের উপার্জ্জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসীদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

"টাকু সমেত একটি চরকা ২৲ দুই টাকায় পাওয়া যায়। আমরা দোহার থানায় এইরূপ চরকার প্রচলন জন্য ৩০০৲ তিনশত টাকা খরচ করিয়া ইতি মধ্যেই ৫০৲ ফিরিয়া পাইয়াছি এখানে আরও দুইশত চরকা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইতেছে, আশা করি অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ঐ থানা হইতে প্রতি সপ্তাহে ২॥০ মণ সূতা পাওয়া যাইবে। অন্যান্য থানায়ও সমান উৎসাহের সহিত কাজ চলিতেছে।" এ বিষয়ে আরদি গ্রাম হইতে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ—উক্ত গ্রামে মাসে ৩৷০ মণ সূতা উৎপন্ন হইতেছে।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিভিন্ন কেন্দ্রের কংগ্রেস কমিটি আন্তরিক চেষ্টা করিলে নভেম্বর মাস হইতে এক ঢাকা জেলাতেই প্রতি মাসে ১০০৲ মণ সূতা উৎপন্ন হইতে পারিবে। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে সূতা কাটা বিষয়ে মুসলমান ভগিনীগণ যেরূপ তৎপরতা ও আগ্রহ দেখাইতেছেন, হিন্দু ভগিনীগণ তাহার অর্দ্ধেকও দেখাইতেছেন না।

"গড়ে প্রতি পরিবারে ৪।৫ জন লোক ধরা যাইতে পারে। একজন স্ত্রীলোক প্রত্যহ অবসর সময়টুকু সূতা কাটিলে তিন সপ্তাহে দশহাত লম্বা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের সূতা অনায়াসেই কাটিতে পারেন। এই হিসাবে একজনের কাটা সূতায় বৎসরে ৭ খানা দশহাত কাপড় হইতে পারে। সুতরাং যে পরিবারে ৫জন লোক, একজনের কাটা সূতার কাপড়ে তাহাদের প্রত্যেকের বৎসরে গড়ে ১॥ খানা কাপড় পড়ে। চরকার সূতার টেকসই কাপড়ের সাড়ে তিন খানায় দেশের এই সাধনার অবস্থায় একজন লোকের চলিতে পারে। তাহার উপর আবার পল্লীগ্রামে অধিকাংশ স্থলে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরও ১০ হাত কাপড় না হইলে চলিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে একজন স্ত্রীলোকের অবসর কালে কাটা সূতা হইতেই সাধারণতঃ একটি পরিবারের সংবৎসরের কাপড় অনায়াসেই হইতে পারে।" —বাঙ্গলার কথা।
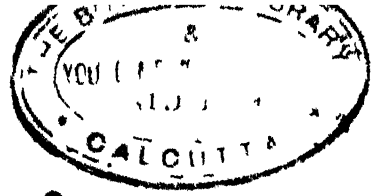
ষষ্ঠ বর্ষ] ৩০এ কার্ত্তিক, ১৩২৮ [একবিংশ সংখ্যা

প্রাণমন্ত্র

ভারতে নবসৃষ্টির যুগ আসিয়াছে। চারিদিকে যে ধ্বংসের বিভীষিকা দেখিতেছ উহা ভবিষ্যৎ বিপুল সৃষ্টির পূর্ব্ব সূচনা। পুরাতনের বনিয়াদ উপড়াইয়া না ফেলিলে, নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয় না। অন্তরে নির্ম্মাণের স্বপ্ন বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, বাহিরে তাই এত উত্তেজনা, এত উৎসাহের কলধ্বনি।

কত দীর্ঘদিন ধরিয়া ভাঙন আরম্ভ হইয়াছে বল দেখি। ভারত সভ্যতার গগনচুম্বী লক্ষ চূড়াসমন্বিত বিশাল তুঙ্গ প্রাসাদ কি দুই চারিশত বৎসরে ধরাশায়ী করা যায়। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভারতের বর্ণাশ্রম, ভারতের নীতি, ধর্ম্ম, সমাজতন্ত্র, শিক্ষা, বাণিজ্য, আচার অনুষ্ঠান এমন কত সহস্র সহস্র স্বর্ণচূড়া আজ ধূলাবিলুণ্ঠিত। গৌরব করিবার আর আমাদের কি আছে? ইতিহাসের জীর্ণপত্র বুকে রাখিয়া ব্যর্থ আস্ফালনে জগৎ মুগ্ধ হইবে না, তাহারা চায় নির্ম্মাণ, নব নব আবিষ্কার, জগতের হাটে গৌরবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

ভারতের প্রাচীন গৌরব গাথা, ভারতের প্রীতি-চিত্ত শ্রদ্ধার সামগ্রী, পুনরুত্থানের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বাহিরের জগতে উহার মূল্য কি? একটু আরাম, অবসর কালে উপভোগ্য বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতীতের নষ্ট গৌরব সম্মুখে ধরিলে জগতের হাটে আমাদের মূল্য বৃদ্ধি হইবে না, আমরা যদি মানুষ হইয়া উঠিতে পারি, আত্মগৌরবকে জাগ্রত করিয়া ধরিতে পারি, তবেই যোগ্য মূল্য দিয়া জগৎ আমাদের সাদরে মাথে তুলিয়া বসাইবে। এই জাগ্রত জীবন লাভের উপায় পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিলেও যেমন আসিবে না, আবার উহার সম্যক বর্জ্জনেও সুসিদ্ধ হইবে না। চাই অতীত বর্ত্তমানের একটি সামঞ্জস্য, ইহাই আজ নূতন বেশে ভারতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারতবর্ষকে উহা বরণ করিয়া লইতে হইবে।

দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় আমাদের চিত্ত অব্যবস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন স্বভাব হইতে আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সব আচার আচরণ অবলম্বন করিয়া-ছিলাম, জাতীয়তার নবানুরাগে মন মাতিয়া উঠিলে, উহা ত্যাগ করিতে আমাদের বিলম্ব হয়না। কোট

প্যাণ্টালুন ছাতার সঙ্গে মাথায় টিকি রাখিয়া স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়া গর্ব্ব বোধ করিয়াছিলাম। নিকম্প শালগ্রামশীলা তুলিয়া চণ্ডীমণ্ডপের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলাম, সত্য নারায়ণ, শুভচণ্ডীর পূজায় হিন্দুয়ানীর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলাম। এ যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ, জাতি বোধকে জাগ্রত করার সঙ্গে, জাতির সব কিছু শুভ ও সত্যরূপে গ্রহণ করা তখন যেন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই ধরা ও ছাড়ার মধ্যে আমাদের নিষ্ঠার পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়। জাতির সত্য স্বভাব আমরা আজও ধরিতে পারি নাই, নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য জাতির সবখানি আঁকড়াইয়া ধরার প্রয়োজন থাকিলেও, আমাদের মনে রাখা চাই, যে জাতি হাজার হাজার বৎসর অধঃপতনের দিকে ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে তাহাকে ঠাপ রাখিতে অনেক কিছু অবলম্বন করিতে হয়। ইহার সবগুলির স্থায়ী প্রয়োজন হয়তো আদৌ নাই, জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া এই সকল খুঁটিনাটি যদি মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আমরা আজ যে বিপজ্জালে জড়াইয়া পড়িয়াছি—তাহা হইতে কোন দিন মুক্তি পাইব কি না সন্দেহ। জাতিকে অনেক আচার আচরণ বর্জ্জন ও গ্রহণ করিতে হইবে, জাগরণের পথে ছুটিয়াছেন যাঁহারা তাঁহারা হয়তো হিন্দু সমাজের অনেক বিধিনিষেধ মান্য করিয়া চলিতে পারিবেন না, এইজন্য পতিত হিন্দু সমাজের এই বিপদের দিনে খুব ঔদার্য্য ও সাহস থাকা চাই, নতুবা, কর্ম্মীকে পদে পদে বাধা পাইতে হইবে, এইরূপ বাধায় সমাজের উন্নতি নাই, অবনতিই অবধারিত।

আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া এইরূপ অনেক বাধাই পাইতেছি, মাত্র একটি বাধার কথা এইক্ষেত্রে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনৈক্যে জাতির মেরুদণ্ড যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তখন ছত্রিশ জাতির একটা কাল্পনিক স্বাতন্ত্র্যকে দৃঢ়তর করিয়া রক্ষা করিতে চাহিলে দেশে যে বড় হইয়া উঠিবে এইজন্য পানাহারে জাতি বিচার মানিলে আমরা আর পারিব না। আমাদের হাওড়া সংঘে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া একরূপ পান ভোজনের ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, সমাজ মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল ছুঁৎমার্গের ধুয়া ধরিয়া। এইরূপ গণ্ডগোলের মূল্য আমরা বুঝি না। এইরূপ ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজের মধ্যে প্রতিবাসীর মধ্যে ছোট বড় বিচার লইয়া একত্র পান ভোজনের ব্যবধান যদি চিরদিন পাঁচিল তুলিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে দেশপ্রীতির মন্ত্র উচ্চারণ করাও পাপ বলিয়া জানা উচিত। শূদ্রের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া অন্নগ্রহণে ব্রাহ্মণের যদি শাস্ত্রমতে হানি হয় জানিতে ঘটে তবে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে অসহযোগ চালান উচিত। স্বেচ্ছায় গণ্ডী বাঁধিয়া ঐক্য সাধনা অসম্ভব। যে ঐক্য জাতির শক্তিরূপে আমরা দেখা বলিয়াছি উহা যদি অন্তরের সামগ্রী হয়, বাহ্যিক একাকার ঘটিবেই, জাতিকে বাঁচিতে হইলে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হিন্দুকে যদি স্ব স্ব জাতি রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তবে ঘরের দোর বন্ধ করিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইয়া তাহারা দিনপাত করুক, আর যদি ভারতের প্রাণ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে জাতিরূপে দাঁড়াইয়া উঠিতে হয়, তবে জাতিজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান, গঙ্গার জলে উপস্থিত ভাসাইয়া দিতে হইবে, দুই নৌকায় পা রাখিয়া চলার দিন ফুরাইয়াছে।

মিথ্যার আচরণে যে শক্তি লুকাইয়া আছে—তাহাকে জাগ্রত করিয়া ধরিবার জন্য মিথ্যার মস্তকে যে কুঠারাঘাত, উহা কালাপাহাড়ী কীর্ত্তি নহে, ধ্বংসের রুদ্রনীতিও নহে, উহা নিম্মাণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ। বর্ণবিচার, জাতিবিচারের অবসর কোথায়? ঐ যে সম্মুখে উদ্যতফণা ধরিয়া কাল সর্প গর্জ্জন করিতেছে, সমগ্র জাতির শক্তিকে একত্র

করিয়া তুলিতে না পারিলে, উহার ধ্বংস সাধন কি হইবে? বিচ্ছিন্ন বিভক্ত দেশপ্রাণকে কোন মতেই একত্র করিতে পারিবে না যদি পূত আধারটির ভিতর যে শাশ্বত প্রাণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার যোগ্য সম্মান দেখাইতে কৃপণতা কর। ঘৃণা যেখানে নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে বুদ্ধিকে সে বিমোহিত করিতে পারে কিন্তু হৃদয় তাহা শুনিবে কেন? সম্মুখে বিষম ভয়ঙ্কর—সে আমাদের অন্তরের অবস্থা শোচনীয় বলিয়া। অন্তরকে প্রেমে ভরাইয়া তোল, আচণ্ডালকে কোল দিবার মত সাধনা কর দেখিবে বাহিরে যে প্রবল শক্তি গর্জ্জন করিতেছে উহা কর্ণপটহ ছিন্ন করিবার মত শত কঠোর হইলেও, ভুজঙ্গ বিষহীন, নিষ্ফল আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছে মাত্র।

অপমান মৃত্যু অপেক্ষা কঠোর নির্ম্মম। মৃত্যু দেহের নাশ করে, অপমান অন্তরকে পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়। আজ দেখিতেছ না, অপমানের তীক্ষ্ণ শেল বুকে বাজিয়াছে বলিয়া সমগ্র ভারত ব্যথিত চিত্তে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে রাজশক্তির প্রবল প্রতাপ, কঠোর শাসন উপহাসে উড়াইয়া সমগ্র জাতি উন্মাদের ন্যায় আত্মবলিদানে ছুটিয়াছে। এই অপমানের নিদারুণ বেদনা জাতির মর্ম্ম হইতে যদি মুছিয়া ফেলিতে না পার, গৃহকলহে নিজেদের সর্ব্বনাশ, নিজেরাই করিয়া বসিবে।

জীবন বড় পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম রাজ্য এই জীবনের উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। জীবনের ধর্ম্মে চক্ষুহীন হইয়া, আমরা যখন আচার ও অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তখনই পরস্পরের মধ্যে ভেদের প্রাচীর তুলিয়া দিতে হয়, আত্মবিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়া, নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গেও কুণ্ঠা বোধ করি না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই তো আমাদের জীবন এমন জীর্ণ, বলহীন হইয়া পড়িয়াছে, জীবনের সঙ্গে আমাদের সমাজ ধর্ম্ম আত্মসম্মান সকলই যেন হীন হইয়া পড়িল। জীবন রক্ষার পবিত্র ধর্ম্মে জাতিকে আজ উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। কৃমি কীটের মত যে জীবন বলবানের পদতলে পিশিয়া মরিতেছে, পুকুরের পাঁক খাইয়া, গাছের কাঁচা খেজুর চিবাইয়া যে জীবন তিল তিল করিয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে, ঐ জীবন রক্ষার দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির হউক, ঐ জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে শক্তি ঢালিয়া দাও, ঐ জীবনের শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় প্রেম ও আনন্দের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া উহা বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে রঙিন করিয়া তোল, জীবন লইয়াই তো সাধনা, আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবনকে যদি দেখিয়া চলিতে না পার—সে স্বার্থপূর্ণ সাধনায় প্রয়োজন কি?

চলিতে চলিতে ভুলিয়া যাই কেন—কোথা হইতে আমাদের সাধনা আরম্ভ হইয়াছে। জীবনের জাগরণ মন্ত্র কি ছিল, কোথায় তার আরম্ভ, কোন্ প্রেরণা বলে হাজার হাজার ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালী মরণ নদী সাঁতরাইয়া পার হইতে সাহসী হইয়াছে—সে কথা ভুলিলে চলিবে না। সে স্বদেশ প্রেমের প্রথম মুরলী ধ্বান—আমাদের চিরদিন স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রেমের সে প্রথম আরতি, সে প্রথম দীক্ষা কি ভুলিবার? সে অনাহত প্রেমের আহ্বান, সে সমুদ্র গর্জ্জনের মত জাগরণ-মন্ত্র, মুমূর্ষ জীবনে অমৃতস্পর্শের বিপুল পুলক—সে তো আমরা ভুলিতে পারিব না! আজিকার এই জীবনভরা উৎসাহ, এই জ্বলন্ত অনলের মত প্রবল উদ্দীপনা, তার মূল কথাটি যে ঐ মাটীর প্রতি আমাদের সত্য আকর্ষণে একদিন গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল, ঐ মাটীর অপার্থিব প্রেমের সুমধুর মূর্চ্ছনা আমাদের মরমে যে বিঁধিয়া আছে, মরিয়াও বুঝি আমাদের দেশকে আমরা ভুলিতে পারিব না।

জাগরণের সত্য নির্দ্দেশ ঐ আমার মায়ের গৌরব-কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার করা। যে জীবন লইয়া উহা

করিতে হইবে— সেই জীবন সাধনার কথাই তো আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া চাই। যে জীবন জাগিয়াছে, উহা যে শতছিদ্র জীর্ণ তরীর মত উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল কালের বক্ষে ডুবু ডুবু, তালি তুলি দিয়া উহা যে রুদ্র তরঙ্গের বুকে টিকিবে না, কালসমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না—একথা আমরা যে নিত্য বুঝিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি। তাইতো চাহিতেছি নূতন জীবন, গঠনের উপযোগী উপাদান, গীতার মানুষ হইবার নূতন মন্ত্র।

সাধনা লইয়া তো গোল নাই, গোল যেখানে কথার খিচুরী পাকাইয়া বসে সেই খানে। সাধনা নীরব হউক, ক্রিয়াবহুল হউক, জীবন যে আমাদের অসাধারণ করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। এই মন প্রাণের আমূল পরিবর্ত্তন চাই, এত দ্বেষ, এত ক্ষুদ্রতা আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকিলে, জীবন সাধনায় এক পাও আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না, কেবল বুলি কাটিয়াই জীবন গোঁয়াইতে হইবে।

আজ আমরা কি দেখিতেছি, জীবন গঠনের নির্দ্দেশ লইয়া যে অতিথি আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উহা রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, যে কোন আদর্শই হউক না, কেহ যদি কিছু হইতে প্রাকৃতিক অনিবার্য্য নীতির তাড়নায় ছিট্‌কাইয়া পড়ে, নিজের নূতন স্থান করিয়া লইবার জন্য বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তোলাই যেন তার ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্ব সাধনকেন্দ্রের সবখানিই মিথ্যা, এই প্রমাণের জন্য সহস্র মিথ্যার আশ্রয় লইতেও সে কুণ্ঠাহীন। এ যেন তার বাহির হইয়া আসার Justification, দোষক্ষালনের যুক্তি প্রদর্শনের অনর্থক বিকট প্রচেষ্টা।

এই হীন মনকে প্রশ্রয় দেওয়া কি আজ শ্রেয়ঃ হইবে, এই হাজার বছরের সহস্র অপরাধজর্জ্জরিত দেশপ্রাণের বেঁচে উঠার ভঙ্গী খুঁটি নিখুঁত না হইতে পারে, কিন্তু এই সাধনার মূলে কি কুঠারাঘাত করিলে, নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করা হইবে না! আমরা পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বার বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, বাধার সৃষ্টি না করিয়া, জাগরণের ক্ষীণ ধারাগুলি যাহাতে মুক্তিপথে ধাবিত হইতে পারে, পরস্পর মিলিত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, তাহার দিকেই আত্মনিয়োগ করাই কি উদার ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় নয়? যেখানে আমরা মিলিতে না পারি, আঘাতের বেদনা না দিয়া মিলনের অভাবকে জাগাইয়া পরস্পরের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধরিলে, দেশের সংহত শক্তি যে অতি শীঘ্র গড়িয়া উঠিতে পারে, জাতিগত বিপদের দিনে এইরূপ মিলনের গানই কি ভাল শুনাইবে না? মঙ্গলের হেতু হইবে না?

আমাদের যে সাধনা উহা তো জীবনের জন্যই। এই জীবনের সেবা করিয়াই তো আমরা ধন্য হইতে চাই। অন্তরের এই ভাব অবিকৃত রক্ষা করিয়া চলিলে, আঘাতের মধ্যেও যে হিতৈষীর মঙ্গল স্পর্শ অনুভব করিতে পারিব। ভারতের মুমূর্ষ প্রাণ আজ আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—আমার জীবনভঙ্গী যেরূপই হউক, এই জাগরণের মূলে আমারও শুভ ইচ্ছা যে আছে ইহা অবধারিত জানিও, আমার সমস্ত তপঃশক্তি ইহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে, দেশাত্মসাধনার এই সনাতন পদ্ধতি একবার যদি ছাড়িয়া চল, ভারতের প্রাণ হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

জীবন সাধনার জন্য আজ যে তপস্যার কথা উঠিয়াছে উহার প্রথম মন্ত্র কি? ইচ্ছা ও সঙ্কল্প (will and determination)। এই ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের প্রত্যক্ষ পরিচয় কর্ম্মের মাঝেই তো মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে হইবে। জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় যদি ইহার সন্ধান না মিলে, তবে আর কোথাও ইহার সন্ধান মিলিবে না জানিও। ভারতে জীবন সাধনার যে নূতন মন্ত্র, নূতন পদ্ধতি

আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা তাহাদেরই পক্ষে সমধিক উপযোগী—যাহারা জীবনযুদ্ধে অন্তরে ইচ্ছা ও সঙ্কল্প শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়াছে। এই সিদ্ধ সঙ্কল্প ও ইচ্ছাকে ঘুরাইয়া, দেশাত্মার সহিত ব্যক্তিগত সকল স্বার্থ এক করিয়া, দেশের সহিত একাত্ম হইয়া সাধনা করিতে হইবে, সাধনার এই স্তরগুলিকে ডিঙাইয়া উপেক্ষা করিয়া, সস্তায় কিস্তিমাৎ করার চালাকি এক্ষেত্রে চলিবে না। সাধনার সত্য রূপটী অন্তরে যদি ফলিয়া না উঠে, বুদ্ধির মারপ্যাচ করিতে গিয়া দেশের বুকে অনর্থক বেদনার সৃষ্টি করা হইবে।

ভারতের সাধনা সনাতন। কোন উপযোগী যুগের জন্য ইহাকে শিকায় তুলিয়া রাখিতে হয় না। যে অজানিত তপঃশক্তির দ্বারা বাংলার বিপ্লবযুগ সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, আজ ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাংলাকে সেই তপঃবলের সাহায্যেই আরও অধিক উন্নত ও শক্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। আদর্শের তকাতকি লইয়া মল্লযুদ্ধ করার সময় তো আমাদের নাই, আর ভারতের বর্ত্তমান আদর্শ লইয়া কোন গোলযোগও তো দেখিতেছি না। জীবন আমাদের চাই, সে জীবন হইবে ভাগবত, জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে সত্যে, নিঃস্বার্থচিত্তে দেশজননীকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া আত্মদানের ফলেই উহা তো স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

আমাদের মূলধন বিশ্বাস। সেই অনন্ত বিশ্বাস আপনার উপর স্থাপন কর। যাহা করিতেছ তাহা দেশ হউক, ভগবান হউক, আদর্শ হউক, তোমাকে অতিক্রম করিয়া কোন শ্রেষ্ঠতর, মহত্তর কিছুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া যাও নিজের চরকায় তৈল সিঞ্চন করিতে থাকিলে, অপরের সাধনায় বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আসিবে না, দেশের সঙ্গে আত্ম-কল্যাণও ইহাতে সাধিত হইবে।

চূর্ণ বিচূর্ণ ভারতের প্রাণশক্তি, সংহতি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছে—সাহায্য করিতে না পার, দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা কর, ভারতের এই জাগরণ দিব্য নির্ম্মাণ সিদ্ধ করিয়া তুলিবে, ভারতের অখণ্ড মূর্ত্তি, এই দিব্য জগদ্ধাত্রীর চরণে মাথা নত করিয়া যদি ইহার চরণমূলে বিকাইতে অস্বীকার কর, তোমার চাতুরী অধিক দিন চলিবে না, জাতিগত আত্মসমর্পণের যুগে, তোমার অহঙ্কারকে দেশমাতার চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে।

ভারতের ঋষি যে শক্তি, যে আলোর মন্ত্র জাতির কর্ণে প্রদান করিয়াছে, উহা গৃহীত হইলে হৃদয় প্রসারিত হইবে, ভেদ তিরোহিত হইবে, দিব্য জীবন গড়িয়া উঠিবে—জাতির কর্ম্মরথ থামিবে না, মানুষ তো এ রথের সারথী নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছেন।

সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স

লিখতে বসলেই মহাত্মাজীর কথা কলমের আগায় এসে উপস্থিত হয়। দেশের সব আদর্শই তাঁর সত্যের প্রভাবে ম্লান হয়ে পড়েছে। আগুন কাপড় ঢাকা থাকে না। গুর্জ্জরকেশরীর ভৈরব বিষাণ আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে বেজে উঠেছে, এ বজ্র-আহ্বান বুঝি আর উপেক্ষা করা চলে না।

* * *

জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে হাওড়ায় গুলি চলা,

সবই শান্তিরক্ষার নামে দেশের উপর ঘোরতর অত্যাচার বলে প্রজার মনে দৃঢ় ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হয়ে উঠছে। সাধারণ শাসননীতি নিয়ে দেশ শাসন অসম্ভব হয়ে উঠলে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু এই শাসননীতির পরিবর্ত্তন কি রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল জনক নয়? অশান্তি উৎপত্তি হয় কিসে? অসন্তোষে নয় কি? দেশব্যাপী এই অসন্তোষের মূলে কি কোন সত্য নাই?

রাজশক্তি হয় তো ইহা অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মত তপস্বীর হৃদয়ও যে-শাসনে বিচলিত হয়ে উঠে, উহা সুশাসন নয়। ভারতবর্ষ নিরস্ত্র, কিন্তু অস্ত্রহীন বলে' তার মনুষ্যত্ব লুপ্ত হয় নি। ভারতের এই মনুষ্যত্ব বিকাশের স্বাধীন প্রচেষ্টা আজ অকারণ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে, সমস্ত জাতি তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে, ইহা যে খুবই স্বাভাবিক। ভারতের অসহযোগ আন্দোলন ইহারই প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি নয় কি? বাহিরে ঠাট বজায় রেখে অন্তরটি গুঁড়িয়ে চললে জাতি আর কদিন টিকবে? ঢাক ঢোল বাজিয়ে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হলো, কিন্তু ফলে আমরা কি দেখছি, ইহার পূর্ব্বে বরং ইংরাজের জেলে জীবন নিয়ে দিন গুজরাণ করা যেতো, এখন দিনে দুপুরে লাঠির গুতো আর বন্দুকের গুলির কত কাণ্ডই না দেখতে হচ্ছে কাণারও যে চোখ ফুটছে, শান্তিরক্ষার নামে অশান্তি সৃষ্টির মাত্রা যে ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

* * *

লর্ড সিংহ লাট হয়ে মসনদে বসুন, সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হোন, শাস্ত্রী মহাশয় জগতের শান্তি সভায় ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ সম্মান লাভ করুন—ইহা আমাদের গৌরবের কথা; কিন্তু জাতির বুকে যে পাষাণভার চাপিয়ে রাখা হয়েছে, তার সত্য প্রতীকার না হলে, ত্রিশ কোটী মানবের মরণ চীৎকারের মাঝে শান্তি স্থাপন কি সম্ভব? এত বড় একটা জাতিকে চিরদিন কবলিত করে রাখার ধমকি দেখিয়ে দেবে রাখা রাজার পক্ষে মহত্বের পরিচয় নয়, আর ইহা বিধাতার বিধানবিরুদ্ধ বলে মনে হয়।

* * *

যোগাযোগের মূল কথা কি? ভারতের প্রাণ জাগতে আরম্ভ করেছে, তারা ভোরের আলো দেখতে পেয়েছে, চাপড়ে চুপড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা আর বৃথা। রাজকর্ত্তৃপক্ষ এ কথা যে না বুঝেছেন এমন নয়, তবে এখনও হাত পা বেঁধে কিছুদিন চেপে রাখতে পারলে যদি আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তারই চেষ্টা চলেছে। তাদের এই জেদ যতই বেড়ে উঠবে ততই এই ব্যর্থ চেষ্টার নিষ্ঠুর চিহ্ন চারিদিকেই যে নৃশংস মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে, এই সহজ কথাটা কেন তাঁরা ভেবে দেখছেন না।

* * *

জাগরণ সত্য, আর ইহা স্বপ্ন নয়। তাই মৃত্যুপণ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। যেখানে সংশয় নেই, সেখানে ভয় টিকতে পারে না। ভারতের প্রাণ তাই স্পষ্ট দিনের মত আত্মপ্রকাশ করে বসেছে। দেশাত্মার প্রাণ নিয়ে মহাত্মা গান্ধী আজ যে মন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, সে সত্যবাণী এতদিন ঘুরিয়ে বলা হচ্ছিল। সে ছিল ভীরুতার যুগ; সে দিন আর নাই। 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে' আর দেশ থাকতে চায় না। তারা চায় স্বাধীনতা, তারা চায় স্বরাজ। অস্ত্রবল থাকলে যুদ্ধ করতো। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তা হলেও তারা নীরব থাকবে না, ভগবানের ডাক যখন এসেছে, তখন তো হিসাবের প্রয়োজন নেই, অস্ত্রবল তো সত্য প্রকাশের একমাত্র বল নয়, আত্মবিশ্বাসের উপর ষোলআনা ভর দিয়ে, রিক্তহস্তে তারা ম্যাক্সিমের সামনে এসে দাঁড়াবে, সত্যমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অসংখ্য জীবন ধরাশায়ী হবে। যুদ্ধেও

তে নরহত্যা হয় সেখানে তবু থাকে প্রতিপ্রতিঘাত, এখানে হিংসার কথা নাই, হিংসার দংশন বরণ করে নিয়ে হিংসককে মুক্তি দেওয়াই এখানে বড় কথা, এখানে আছে কেবল মরণ, আত্মবলি দিয়ে নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে ভগবানের দিব্যশক্তিকে জাগিয়ে তোলার কথা, বাঙ্গালীকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে আরও স্পষ্টতর করে তুলতে হবে। যদি আমরা ইহা সার্থক করে তুলতে পারি, জগতের সমস্যা ভারতের প্রাণ দিয়েই মীমাংসিত হবে।

*   *   *

সংশয় যাদের আছে মহাত্মাজীর অন্তরবাণায় ভগবদাত্মার যে মধুর মূর্চ্ছনা ঝঙ্কার দিচ্ছে তারা তা বুঝবে না, তাদের স্বতন্ত্র থাকাই বলি। ভগবানের আদেশ যে শুনেছে, আত্মবিশ্বাসে যার দ্বিধা নাই, তাহার সাহসের কূল কিনারা থাকে কি? কে জানে এই ভারতের তপস্যার ফলে কি শক্তি মাথা তুলে উঠে দাঁড়াবে? প্রহ্লাদের বিশ্বাসবলে স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করে' যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, ওগো ভারতের তপঃমূর্ত্তি গান্ধী বিশ্বের পাপ ক্ষালনের জন্য সেই বিরাট শক্তিকে কি আবার ধরায় নামিয়ে আনবে?

*   *   *

রাজনীতিক সাধনার সকল দোর বন্ধ দেখে, সমগ্র জাতি যখন মাথা ঠুকে হাহাকার তুলেছিল, তুমি তখন সেই অর্দ্ধ শতাব্দীর রাজনীতিক যজ্ঞকুণ্ডে নির্ব্বাপিত-প্রায় ক্ষীণ অগ্নিশিখার শিরে অজস্র হবিঃ বর্ষণে উহা সমুজ্জ্বল করে তুলেছ, শুধু ভারতের নয়, জগতের সর্ব্বত্রে তোমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তির আলোচনা চলেছে, বুঝি স্বর্গদ্বারে দেবগণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে তোমার জয়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে, আমরা নতজানু অবনত শিরে ভূয়ঃ ভূয়ঃ তোমায় নমস্কার করি।

*   *   *

রাজনীতিক সাধনার উদ্দেশ্য রাজনীতিক স্বার্থ-সিদ্ধি লাভ। ভাববিলাস সত্যকথা সোজাভাবে বাহির হয় না, তাই এ যাবৎ থেকে আজ ৩৭ বৎসর ভারতের জাতীয় মহাসভা অনেক শক্তি ও অর্থ অপচয় করেছে কিন্তু আজ ইহার সবখানিই সার্থক হয়েছে মহাত্মাজীর স্পর্শে সত্যকে এমন জ্বলন্তরূপ দেওয়া কারও সাহসে কুলাত কিনা সন্দেহ, সাহস থাকলেও, সাফল্যের নিখুঁত হিসাব নিকাশ ঠিক করতে বুদ্ধিকে পাক দিয়ে আরও নিরেট করে ফেলতে হতো। মহাত্মাজী ভারতের অনেক শ্রম, অনেক সময় ক্ষিপ্র করে' দিচ্ছেন, তাঁর কাজের উপর অন্ততঃ অন্তরে যারা স্বাধীনতার উপাসক, তাঁদের সংশয় থাকলেও নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। এই অসহযোগ নীতির দ্বারা পরহস্তগত ভারতের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব কিনা এ সংশয় অনেকেরই আছে, কিন্তু সংশয় নিয়ে কেবল পাক খেলেই চলবে না পথের সাধ ঘোলে মিটিয়ে, জাতিকে ভ্রান্ত পথের অনুসরণে আদেশ দিয়ে নেতৃত্ব করা আর পোষাবে না। মহাত্মাজীও দেশশুদ্ধ লোককে তাঁর পশ্চাদনুসরণে উদ্বুদ্ধ করছেন না, তিনিও তাঁর সত্যদৃষ্টির পথে খুব সতর্ক হয়ে খুব হিসাব করেই চলছেন। স্বদেশী মন্ত্রসাধনের পর তিনি সাধকদের বৈধ আইন ভঙ্গ নীতি নিয়ে যুদ্ধে অবতরণ করতে আদেশ দিচ্ছেন, ইহার পূর্ব্বে তিনি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্র নির্ব্বাচন করে নিয়েছেন, সর্ব্বাগ্রে মাথা দিতে আগেই ছুটেছেন। তাঁর জীবন দিয়ে যদি নূতন পথে সুফল ফলে, তখন ধীরে ধীরে দেশকে সেই পথেই অনুগমন করতে হবে, এমন সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ, এমন অসাধারণ ধৈর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এমন আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ, আজ পর্য্যন্ত কার জীবনে এমন পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে! ছাতার পাখীর মত দেশের কিচির মিচির চীৎকার আজ শুরু হোক, প্রশান্ত হৃদয়ে দেশের এই ভীষণ-অগ্নি-পরীক্ষায় দেশব্রতীদের

সাফল্য কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব।

ভারতমহাসভায় শান্তভাবে আইন ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা গ্রহণকালে, একজন প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেবল গুর্জ্জর প্রদেশে মহাত্মা গান্ধীর জীবন নিয়ে এই পরীক্ষা আরম্ভ করলে, রাজকর্ত্তৃপক্ষ সংবদ্ধশক্তি সহযোগে মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা অনায়াসেই ব্যর্থ করে' দেবে। যদি এই আগুন দেশব্যাপী করে' জ্বালিয়ে তোলা যায়, তা হ'লে ভারতজোড়া অশান্তি দমনে রাজশক্তি সমর্থ হবে না—এ প্রসঙ্গ গৃহীত হয় নি। আমাদের মনে হয়, মহাত্মাজীর সাধনরহস্য, সকল কর্ম্মীর এখনও তাদৃশ বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়নি। গান্ধী পশুবলের বিরুদ্ধে তো কেবল যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। দিব্য শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার তপস্যা আরম্ভ করেছেন। ভারত পশুবলহীন। অবধারিত ইহার কোন নিগূঢ় ভাগবত উদ্দেশ্য আছে, তপঃবলে সেই গোপন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন তিনি করতে চান। রাজসিক প্রকৃতির লোক, তাঁর পথ ধরে' চলতে পারবেন না, এইজন্য আমাদের মনে হয়, মহাত্মাজীর সাধনা গ্রহণ করতে হ'লে, ভারতকে তপঃশক্তি সঞ্চয় করতে হবে, দধীচির অস্থি দিয়ে যে মহাপ্রাণ গড়ে উঠেছে, ভারতের এই মহা বিপদের দিনে, তাঁর নির্দ্দেশ মান্য করতে হলে, অন্ততঃ যোদ্ধা যাঁরা তাঁদের, তাঁরই মত তপস্বী হতে হবে।

* * *

এই তপস্যা বারুদের আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে নিভে যাবে না, তুষের মত ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকবে। ভারতের অন্তরের তপঃশক্তি, বাহিরে দিব্যরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে—মহাত্মাজী সেই সনাতন সাধনার অগ্রদূত। ইহার পর শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সাধকের আবির্ভাব সম্ভব করতে হবে। মনে রেখো, আজিকার এই জাগরণের উদ্দেশ্য কেবল স্বরাজ পাওয়া নয়, মহাত্মাজীর মত অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি হ'লে, উপায় ও কর্ম্মনীতির বিচিত্র, বিভিন্ন ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে জাতির স্বরাজ লাভ হবেই, সে বিষয়ে দেশাত্মার সহিত সামান্য পরিচয়ও যাঁদের আছে, তাঁরা বিন্দুমাত্র সংশয় করেন না। কেবল আমাদের স্মরণ রাখা চাই, ভারতের আত্মা চায় বিশ্বে ধর্ম্মরাজ্য পুনঃপ্রবর্ত্তন করতে, মানুষের বর্ত্তমান মন প্রাণের আমূল পরিবর্ত্তন করে', ধরায় দেব জীবন সম্ভব করে' তুলতে। আজিকার এই প্রস্তুত হওয়ার মধ্যে সেই চরম সাফল্যের দিব্য মন্ত্রে বাঙ্গালীকে অভিষিক্ত হতে হবে, বাঙ্গালীর সাধনার মধ্যে জগদ্ধিতায় এই সত্যমন্ত্র সংগোপিত রাখতে হবে, বাঙ্গালীর স্বপ্ন যেন সীমাহীন সমুদ্রের মত বিপুল ও গভীর হয়ে আকাশের মত উদার ও উন্নত হয়, বাঙ্গালীর আদর্শ যেন দিক্‌চক্রবালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে না আসে। কাজের তরঙ্গ মন প্রাণে আবর্ত্তিত হোক, বুদ্ধি যেন তুরীয় জগতের জ্যোতির্ম্ময় কিরণে নিত্য আলোকিত থাকে, বাঙ্গালীকে আমরা আরও অধিক চিন্তাশীল দেখতে চাই, আরও গভীর আরও শক্ত মানুষ করে' তুলতে চাই—মহাত্মার ভবিষ্যৎ আশা বাঙ্গালীই যেন সত্য করে' তুলতে পারে।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

(শিক্ষা-সংস্কার অসম্ভব কেন ?)
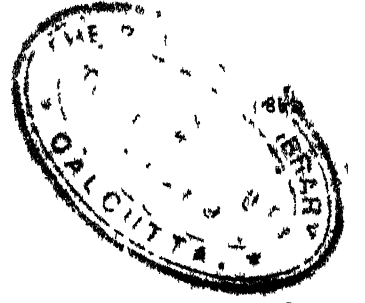
পাঠক বোধ হয় এবার একটু একটু বুঝতে পারছেন, শিক্ষার একটু ভেতরে গিয়ে সংস্কার করার সামনে কত বড় বড় বাধা লুকিয়ে আছে। তবুও আমরা এখন সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকটার কথা উত্থাপন করি নি। সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের অন্তঃকরণের কথা। কতবার রাজকীয় কমিশন বসেছে কিন্তু কেউ কখন এ প্রশ্নটা আমলেই আনেন নি—আর ওটা আমলে আনাটাও সত্যি তাঁদের ক্ষমতাতীত। শিক্ষকদের মুখস্ত বিদ্যের ছড়া আর উপাধির ছটা দেখে সাক্ষীরা কখনও ভাবতে পারেন নি যে এ রকম একটা প্রশ্ন উঠতে পারে বা শিক্ষকদের কি রকম করে গড়তে হবে এটা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে শিক্ষকদের মুখস্ত বিদ্যাটাই সর্বজ্ঞতার পরিচায়ক, আর ঐটাই একমাত্র গুণ যেটা শিক্ষকের দরকার হতে পারে। কিন্তু ঐখানেই সত্যি শিক্ষা-সংস্কারের একটা মারাত্মক গেরো আছে—যদিও তাঁরা সেটা দেখতে পান নি। কমিশনররা শিক্ষকদের উপর প্রশংসা পুষ্প বর্ষণ করে বিষয় তালিকাটাকে তিরস্কারজর্জ্জরিত করেছেন। কিন্তু এর প্রায় উল্টোটা করলেই তবে ঠিক কাজ হ'ত। মনে করুন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে হঠাৎ আজ যে সব (লোকমতের বা সমাজের) বাধার কথা বলেছি সব উড়ে গেল। পরিবারের সব কুসংস্কার মুছে গেল, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একটা বিষয়-তালিকা ঠিক হ'ল, আর অভিনব এক শিক্ষা-পদ্ধতিরও আবিষ্কার করা হ'ল। আপনারা কি মনে করেন তা হলেই সব বদলে যাবে ? মোটেই ত বদলাবেই না—এমন কি তার এক তিলার্দ্ধও নড়চড় হবে না !—কেন ? তার কারণ হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে শিক্ষিত শিক্ষকদের অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তনটা অসম্ভব। ঐ রকম শিক্ষায় গঠিত হয়ে তাঁদের পক্ষে নতুন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা অসাধ্য, এমন কি সেটাকে বুঝতে পারা সম্ভব কিনা সন্দেহ। সকলেই এমন একটা বয়সে এসে পড়েছেন যখন আর সব ভুলে নতুন করে শিক্ষা করা যায় না। তাঁরা অবশ্য লক্ষ্মী ছেলের মত সব স্বীকার করে নেবেন—যেমন করে তাঁরা নিত্য নব নব বিষয়-তালিকার পরিবর্ত্তনটাও স্বীকার করে নিয়েছেন—আর তাঁরা শিক্ষাসচিবের ইস্তাহারের সামনে সাষ্টাঙ্গেই প্রণাম করবেন, কিন্তু তাঁরা ঠিক যেমন করে শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন সেই রকম করেই শিক্ষা দিয়ে চলবেন, কারণ নতুন ভাবে শিক্ষা দেওয়া তাঁদের সাধ্যের অতীত।

কমিশনের সাক্ষীদের কথা থেকেই আমরা কিছু কিছু তুলে দোবো—সেই কথাগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আমাদের শিক্ষকরা আজ তাঁদের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করতে কতটা অসমর্থ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষা-সচিব লেয়্‌ বুর্জোয়া মনে করলেন, তিনি একলাই সব শিক্ষা-সংস্কারটা সমাপ্ত করবেন—আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রচার করবেন, আর একটা বিশেষ বাকালোরেয়ার সৃষ্টি করবেন, যেটার দাম পুরাতন বাকালোরেয়ার মতই হবে।—পুরাতন ভাষার পরিবর্ত্তে তখন প্রচলিত ভাষার প্রতিষ্ঠা করা হ'ল, বিজ্ঞান শিক্ষাটার উপর জোর দেওয়া হ'ল। প্রোগ্রামে আর একটুকুও খুঁত রইল না। কেবল সেই প্রোগ্রামটাকে রূপ দেবার শিক্ষক হ'লেই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তবে অপ্রচলিত ভাষার অজন

করেই প্রচলিত ভাষার শিক্ষা দিয়ে ফেললেন, আর "লক্ষ্য" মুখস্ত করে বিজ্ঞানটাকে শিখে নেওয়া হ'ল। ফলটাও হ'ল বেশ, খালি পুরাতন পদ্ধতির বিষফলের সঙ্গে তার একটুও তফাৎ রইল না।

তবে শিক্ষকদের বইপড়া বিদ্যের প্রশংসা কেহই না করে' থাকতে পারবেন না, যখন আপনারা শুনবেন যে তাঁরা পৃথিবীতে যা কিছু শিক্ষা করবার আছে সবই কণ্ঠস্থ করে রেখে দিয়েছেন। কেবল তাঁদের সেগুলো শিখাবার ক্ষমতা নেই—এই যা। কমিশনে কেউ কেউ ভয়ে ভয়ে এ কথাটার একটু সুর যে না দিয়েছেন এমন নয়। তবে কমিশনের বাইরেই আমরা দু'একটি স্বাধীনচেতা মানুষ দেখেছি, যাঁরা ঢাকা খুলে শিক্ষকদের ভেতরটা ভাল করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের আচার্য্যদের শিক্ষা দিবার অসমর্থতা, বিদেশ থেকে কেউ এসে দুএকটা ক্লাসের পড়া দেখলেই তখনি বুঝতে পারে। মঃ ম্যাক্স লেক্লার্ক রেভ্যু এ্যান্ত্যারনাশিয়নাল্ দে লাঁসেইমাঁ (আন্তর্জাতিক শিক্ষা সমালোচন) থেকে একটী প্রবন্ধের কথা উত্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটীতে একজন বৈদেশিক আচার্য্য লিখছেন—'আমি ফ্রান্সে অনেক শিক্ষিত লোক দেখেছি কিন্তু সত্যিকারের পণ্ডিত বা শিক্ষক অতিঅল্প আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে তাঁদের জ্ঞানটা সত্যই খুব অল্প, আর পাণ্ডিত্যের ভানটা খুব বেশী, কাজের তাঁরা না, আর মনটা তাঁদের ভারী ছোট।

আজকেই যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ রকম সমালোচনা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা' নয়, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলেজ দে ফ্রাঁসের আচার্য্য মঃ ব্রেয়াল্ ফ্রান্সের শিক্ষকবাহিনী সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখেছিলেন :—

"১৮১০ খৃঃ অব্দে শিক্ষক বাহিনীটা এক রকম সে সময়কার দেশের মনোভাবেরই মতন ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দেই সেটা এত পুরাতন হয়ে পড়ছিল যে একজন বৈদেশিক লিখেছিলেন—ফ্রান্সে শিক্ষকতা ও শিক্ষক বাহিনীটা এত বদ্ধ ও অনুন্নতিশীল হয়ে পড়েছে, যে, দেশে বোধ হয় এমন আর একটা দল খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা বিশেষতঃ এই বিশ্বজনীন উন্নতির দিনে গতানুগতিক পথটাকে এত জোরে জড়িয়ে ধরে' আছে, যারা এতটা ঘৃণা ও গর্ব্ব সহকারে নতুনকে পদাঘাতে দূরে ফেলে দেবে, যারা অতি অকিঞ্চিৎকর পরিবর্ত্তনেও বিপ্লবের সূচনা দেখবে।"

কি করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ দুরবস্থা হ'ল ? আমি আবার বলি, যে পদ্ধতিতে তাঁরা গঠিত হয়েছেন সেইটাই এর জন্য দায়ী। তাঁরা যা শিখেছেন এবং যেমন করে শিখেছেন তেমনি করেই শিখাচ্ছেন। ছেলেদের, যাঁরা একমাত্র বই মুখস্ত করে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁরা কি শিক্ষা দেবেন, কি সাধনা তাঁরা করাতে পারবেন ? "স্মৃতি"র পায়ে তাঁরা আত্মবলি দিয়েছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে গিয়ে বসবার আগুতে কখন কি বারেকের জন্যও তাঁরা বেঞ্চি ছাড়বার সময় পেয়েছেন ? পাঠশালের বেঞ্চি, স্কুলের বেঞ্চি, কলেজের বেঞ্চি—জীবনের ১৫ বৎসর তাঁরা কেবল পরীক্ষা পাশ করেছেন, আর (concours) প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। পাঠশালে তাঁদের কাজের সনাতন একটা ইস্তাহার জারী করা ছিল। রোজকে রোজ মাপা জোপা পড়া। আইনের চাকায় পড়ে তাঁদের মনটুম সব সুরকী হয়ে গেছে। পরীক্ষার পড়ার গদা পিঠে করে' তাঁরা এক মিনিটও পাশ ফিরতে পান নি। তাঁদের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুখস্ত করে' করে' ফুরিয়ে গেছে—তাও কেবল পরের ভাব, পরের ধারণা, পরের সিদ্ধান্ত গলাধঃকরণ করা। জীবনের তাঁদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই—তাঁরা ত কখন আপন ইচ্ছায়, আপন মনে, আপনার কর্তৃত্বে কাজ করেন নি। ছোট ছেলেদের মনস্তত্বটা কত জটিল,

কত সুকোমল ও ভঙ্গুর তাঁরা তার কিছুই জানেন না। নতুন সোয়ারীর মত নতুন ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা কি রকমে জীবটাকে তাঁদের কথা বোঝাবেন, কোথায় হাত দিলে জন্তুটা চলবে আর কখন কেমন করেই বা সেখানে হাত দিতে হয় তাঁরা তার কিছুই জানেন না। শিক্ষক হয়ে তাঁরা পড়াগুলো মুখস্ত বলে যান, ঠিক যেমন করে তাঁরা ছাত্রাবস্থায় বহুবার মুখস্থ বলে এসেছেন। তাঁদের চেয়ারে তাই একটা একটা গ্রামাফোন বসিয়ে দিলেও তো চলে—আর ব্যয়ও অল্প হয়।

শিক্ষকের পদ পাবার জন্য অনেক জটিল ও অবাস্তব অতিসূক্ষ্ম বিষয়ই তাঁদের কণ্ঠস্থ করতে হয়েছে। এই জটিল অতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোই তাঁরা ছাত্রদের কাছে বলে যান। জার্ম্মেনীতে এরকম অদ্ভুত concours নেই—সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বাছবার সময় শিক্ষক কি সৃষ্টি করেছেন, আবিষ্কার করেছেন, লিখেছেন ইত্যাদি তাঁর আপনার কাজ দেখেই প্রথমতঃ তাঁকে পছন্দ করা হয়। তার পর আবার তাঁকে কিছুদিন স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা করে একটা নাম কেনা চাই। সাধারণতঃ শিক্ষকরা আপনার পরীক্ষাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট শিক্ষাগার থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে এসে বসেন। ফ্রান্সে concours'এ (পরীক্ষা-প্রতিযোগীতায়) যে যত বেশী মুখস্থ বলতে পারে তার তত দর হয়। আর প্রতিযোগীর সংখ্যার ত অন্ত নেই—কিন্তু চাকরি খালি অতিই অল্প, তাই পরীক্ষাটা ততদূর সম্ভব শক্ত করা হয় যাতে অধিকাংশই বাদ পড়ে। যিনি একবারও না 'ঠেকে' সবচাইতে বেশী সংখ্যক ফর্ম্মুলা (আর্য্যা) মুখস্থ বলতে পারবেন, যিনি যত বেশী স্চীভেদ্য অবান্তর উল্টতত্ত্ব মাথায় ঠেসে রাখতে পারবেন—সে ব্যাকরণের কূটসূত্রই হ'ক, আর বিজ্ঞানের বাজে কথাই হ'ক—তিনি নিশ্চয়ই প্রতিযোগীদের পরাজিত করতে পারবেন। সেদিনকারও প্রতিযোগীতার একজন পরীক্ষক মঃ জুলিয়ঁা বলেছেন যে জুরীরা ছাত্রের স্মৃতির উপর এতে কতটা ভীষণ চাপ পড়ে দেখে ভীত হয়েই পড়েছিলেন। মঃ জুলিয়ঁা বলেন স্মৃতিটা কাজের একটা যন্ত্র বটে, কিন্তু এটা যন্ত্র মাত্র। শিক্ষকের বিচার স্পৃহা (critical spirit), তর্কশক্তি (Logic), শৃঙ্খলা (method), পরিমাপজ্ঞান (measure), শিল্প (tact), অন্তর্দৃষ্টি (penetration), প্রেরণা, দৃষ্টির প্রসারতা, ভাবপ্রকাশের স্পষ্ট সরল ভঙ্গী, আত্মদোষনির্ণয়শক্তি ও প্রাঞ্জল ভাষার স্মৃতিটা একটা সহায়ক মাত্র।

অবশ্য মাননীয় জুরীগণ অকারণ এইরূপ কথা বলেন নি—কিন্তু এ থেকে যে কিছু পরিবর্ত্তন হবে সেটা দুরাশা মাত্র। এখনও অনেক দিন এই রকম প্রতিযোগীতা-পরীক্ষায় যুবকরা স্মৃতিটাকেই একমাত্র আবশ্যকীয় সৎগুণ বলে হৃদয়ে গেঁথে রাখবে। তারা সময় বা শক্তি থাকলেও নিজে কিছু সৃষ্টি করার কাজ থেকে যতদূর সম্ভব তফাতে থাকবে—কারণ তারা খুব ভাল করেই জানে যে নিজের কথা বললে পরে পরীক্ষকরা যা চটে যান, তেমন বুঝি আর কিছুতেই তাঁদের অসন্তুষ্টি হয় না।

যখন একটা মানুষ এই রকম করে ১৫টা দীর্ঘ বৎসর মাথায় যত ঢোকে তা মুখস্থ করে কাটায়, আর এক মিনিটের জন্যও যদি সে এই বহির্জগৎটার দিকে চেয়ে না থাকে, যদি সে জীবনে একবারও আপন ইচ্ছায় আপন কর্ত্তৃত্বে একটা কুটোও না নেড়ে থাকে, তাহলে সমাজ তার থেকে কি আশা করতে পারে? কিছুই না—কেবল ও রকম লোকে তার সারা জীবনটা ধরে যে সব মাথা মুণ্ডু মুখস্থ করেছে, তার খানিকটা, হতভাগ্য ছাত্রদের মাথা খাবার জন্যে মুখস্থ বলে যেতে পারে। লোকে এর উত্তরে তাড়াতাড়ি

দু'একজন শিক্ষকের নাম বলবে যাঁরা এই সর্ব্বনাশে শিক্ষা পদ্ধতির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে সত্যই পণ্ডিত হয়েছেন। এটা মহামারীকে অস্বীকার করবার জন্যে দুএকজন অক্ষতস্বাস্থ্য চিকিৎসকের নজীর খাড়া করার মত। তাও এ রকম (অসাধারণ লোক) exception কটা দেখতে পাওয়া যায়?

বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এই রকম অসাধারণ লোকের (exception'এর) মান নিয়েই মানী হয়ে আছে। কিন্তু সব শিক্ষকদের একবার দেখলে ভাল করেই বুঝা যায় যে অতি অল্প সংখ্যকই এই পদ্ধতির 'ড্রব মুসের' হাত থেকে ছিট্‌কে বার হতে পেরেছেন। কত লোকের তাজা মাথাই না এতে চিরতরে খোয়া গেছে। এখন পাশকরে তাঁরা জেনেছেন জীবন, কোন দূর গ্রামে গিয়ে একক্ষুদ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়া, আর তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা তাঁদের সব শক্তিই নিঃশেষ করে' দিয়ে এসেছেন। তাঁদের চিত্তবিনোদনের আজ এক মাত্র উপায় তথাকথিত শিশুপাঠ প্রণয়ন—যথায় পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাঁদের শিক্ষা দিবার অক্ষমতার সহিত অনাবশ্যক, অবান্তর সূক্ষ্মতত্ত্বপ্রীতিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশ্য এ উদ্ভট প্রেম তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তেই অর্জ্জন করেছেন। সরল জিনিষকে জটিল করে,' সহজকে শক্ত করে'ই তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের পরিচয় দিতে চান। মঃ ফুইয়ে এই সব অদ্ভুত পাঠ্যপুস্তক গুলো খুব ভাল করে পড়ে দেখেছেন। তিনি যে সব অদ্ভুত তত্ত্বের উদ্ধার করেছেন, তা পড়লে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ছেলেরা বুঝতে পারুক আর নাই পারুক তাতে তাঁদের আসে যায় কি—তাঁদের লিখেই কি সুখ নয়? * * * (তারপর যে সব উদ্ভট তত্ত্বের উদাহরণ আছে তাহার বঙ্গানুবাদও অসম্ভব, ও ইংরাজী অনুবাদও অবোধগম্য—অনুবাদক) * * *

জার্ম্মেণীতে শিক্ষকপছন্দ (recruit) করবার পদ্ধতিটার জন্যই অনেকটা তাদের শিক্ষকতাটা এত ভাল হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীরা ভাল করেই জানেন, কোনখানে হাত দিলে শিক্ষকরা ছেলেদের ও শিক্ষার প্রতি অভিনিবিষ্ট হবেন। উপায়টা খুব সোজাই। ছেলেরাই শিক্ষকদের মাইনে দেয়। আর প্রতি বিষয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কলেজ ছাড়া অনেক বিদ্যাপীঠ আছে ব'লে ছেলেরা যেখানে ভাল শিক্ষা হয় সেইখানেই যায়। প্রতিযোগীতায়, আচার্য্যদের ছেলেদের সত্যিকার দরকারী শিক্ষা দেবার জন্য বাধ্য করে। অনেক ছাত্রকে আকর্ষণ করে, আপন আবিষ্কার বা স্পষ্ট বস্তু বা পুস্তক প্রকাশ করেই তাঁরা বড় একটা দান (aid) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেতে পারেন। ফ্রান্সে আচার্য্যরা গভর্ণমেন্টের চাকরি করেন—বাঁধাধরা তাঁদের মাহিনা—ছেলের শিক্ষা হ'ল না হ'ল—সে বুঝলে কি না বুঝলে তাতে তাঁদের কি আসে যায়। মনস্তত্ত্ববিদ্ হবার দরকার নেই, এমনি সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে ছেলেদের হাতে তাঁদের ভাতের হাঁড়িটা থাকলে তখনি তাঁদের 'স্বার্থ' চঞ্চল হবে উঠত, আর এই রকম একটা বলবান "সংস্কারের" "গুতায়" তাঁরা যত শীঘ্র পারেন তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করতে পথ পেতেন না। আর না পারলে, প্রতিযোগীরা শিক্ষাজগৎ থেকে শীঘ্রই তাদের অস্তিত্ব মুছে দিত।

দুঃখের কথা, এই পরিবর্ত্তন যেটা করলে সত্য আমাদের উচ্চ শিক্ষার এবং তৎপরে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্য্যন্ত সংস্কার সাধিত হ'ত, সেটা আমাদের এই লাতিন মনোবৃত্তি নিয়ে সম্ভব নয়। অন্য লোক যখনই এই রকম একটা প্রচেষ্টা করে একটু সফলকাম হয়েছে, অমনি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের পিছনে লেগেছে এবং তাঁদের অত্যাচারনিপীড়িত করেছে। যে প্র চেষ্টা গুলোর সফল হবার সম্ভাবনা নেই সেই গুলোকেই

বিশ্ববিদ্যালয় একটু থাকতে দিয়েছে। আমার মনে পড়ে প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার এফ * * * চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রদের জন্য শরীরতত্ত্বের (anatomy) একটী ক্লাস খুলেছিলেন। সেখানে ছেলেদের অনেক মাইনে দিয়ে anatomy শিখতে হ'ত। কিন্তু সেখানে তারা সত্যি anatomy শিখতে পারত। আর গভর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে অমনি anatomy শেখালেও ছেলেদের তাতে কিছুই লাভ হ'ত না। সাঁচ্চা জিনিস পেয়ে ছেলেরা সস্তার কিস্তি ছেড়ে দাম দিয়েই খাঁটি জিনিস কিনতে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এই দেখে ডাক্তার এফ্ * * * ও তাঁর ছাত্রবর্গের উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করলে যে বছর দশেক লড়ালড়ি করে' তাঁর ক্লাস বন্ধ করতে মাননীয় ডাক্তার বাধ্য হলেন।

বিষয়তালিকার তর্ক থেকে এখন বোধ হয় আমরা অনেক দূরেই এসে পড়েছি! পাঠক বোধহয় এখন ভাল করেই বুঝতে পারছেন যে এই প্রোগ্রাম বদলানর বক্তৃতাগুলো কত অসার, আর দিস্তা দিস্তা যে বইয়ে এই কথাই বিনিয়ে বিনিয়ে প্রকাশ হয়েছে সে গুলোতে কতটা অনাবশ্যক কাগজের অপচয় হয়েছে। প্রোগ্রামগুলো ঘরের কার্নিস জানালা, ওগুলোকে যতই বদলাও ভিত বা ভিতরের জিনিসটা কি তাতে বদ্‌লাবে? কার্ণিশ, জানালা ত সকলেই বদলাতে পারে—সেটাত চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়—তার পিছনে যা আছে সেইটা বদলানই ঠকঠকে ব্যাপার।—সেটাত বেশী স্থূল বুদ্ধি দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ

আমার সাহিত্য
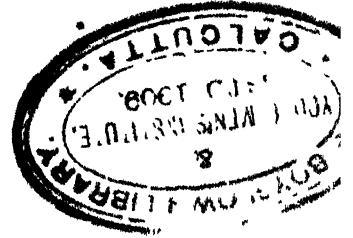
কিশোর বয়সে, যখন আমরা বিদ্যাভ্যাসে মত্ত, সাহিত্যের দ্বার তখন বহুদূরে—কিন্তু সাহিত্যের দ্বার বাহিয়া যে দু'একটা শব্দ আমাদের পাঠাবলীর মধ্যে আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, সেগুলি আমাদের নয়নকে এমন নিবিষ্টভাবে আকৃষ্ট করিত যে আমরা আর উহাদের নিকট হইতে চোখ আর মন দুইই তুলিয়া লইতে পারিতাম না; সেগুলির সহিত আমরা একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অনুভব করিতাম। বাধ্য হইয়া যখন মন ও চোখ তুলিয়া আমরা অন্য বিষয়ের অনুধ্যানে রত হইতাম, তখন একটা কিসের বিচ্ছেদ যেন আমাদের প্রাণে দুঃখের বাজনা বাজাইয়া দিত—আমরা কথঞ্চিৎ বিষাদিত হইতাম।

ইহা হইতে এখন আমরা মনে করিতে পারি, হয়ত তখন আমাদের ভিতর একটা শিশু-সাহিত্য আশ্রয় লইয়াছিল এবং উহা বিক্ষিপ্ত সাহিত্যশব্দগুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ছেলেখেলা করিবার জন্য একান্ত আনমনাভাবে আয় আয় করিয়া সেই শব্দগুলিকে আপনার চারিদিকে সাজাইতেছিল, আর বনমধ্যে বনবিলাসী হরিণের ন্যায় হৃদয় রঙ্গে বন-নাচান খেলায় স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া এমন নিবিড়ভাবে সেগুলিকে আলিঙ্গন করিত, যে, কেহ যদি অতি কোমল ও অতি সরস হৃদয় লইয়া ধীরে ধীরে আমাদের বাহুপাশ খসাইয়া দিত, আমা-

দিকে একান্ত আদরভরে আর একটী জিনিষের দিকে লইয়া যাইত—তাহা হইলেও তাহাতে একান্ত বিচ্ছেদ, সুখস্বপনঘোর ভাঙ্গা একটা স্পষ্ট বিরক্তি অনুভব করিতাম। কিশোর মন তখন যাহাকে পাইতে চাহিত, সে কে? আর যাহার বিচ্ছেদে আমাদের কিশোর-হৃদয় সুখতরঙ্গহিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া ধরিবার জন্য ছোট ছোট প্রতিজ্ঞাগুলি হৃদয়ের স্রোতে নাচাইয়া দিত—নাচাইয়া নাচাইয়া জলজল ছোট্ট তারকা দুটী দিয়া বিরক্তি দীপিয়া এদিকে ওদিকে যাহার সন্ধানে ফিরি ফিরি করিত, সেই বা কে? সাহিত্য বোধ হয়! এ প্রশ্ন সত্যই আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, এখন সহজ প্রেরণা লইয়া কিশোর-লোকে ভ্রমণ করিলে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

হৃদয়ের কিশোরত্ব এরূপ সুখস্বপ্নঘোরে যার কাটিয়া গিয়াছে, যৌবনের প্রথম বিকাশে সাহিত্যের কমনীয় স্পর্শ তাহার লাভ হওয়া উচিত ত! যৌবন প্রকাশের সাথে সাথে চাঁদ ছানিয়া যে কিশোরী-প্রতিমা প্রাণের আসন অধিকার করে, প্রাণের প্রাণত্বকে গলাইয়া গলাইয়া তুলিস্পর্শে যে কিশোরী নবযৌবনরাজকে হৃদয়-কলায় পূর্ণ করিয়া রূপে রসে প্রোজ্জ্বল পুষ্ট ও সুবলয়িত করিয়া আপনার হৃদয়-পটে সাজাইয়া রাখে, সেই কিশোর-কিশোরী—নব যৌবনোজ্জ্বল সেই কিশোর-কিশোরীর আবির্ভাব যুবকহৃদয়ে কে ঘটাইতে পারে? আমরা তাহারই কথা ভাবিতেছি, তিনিই আমাদের সর্ব্বস্ব, তিনিই আমাদের কিশোরের পুষ্পকোমল মনঃস্বপ্ন, আর যৌবনের চন্দ্রকিরণময়ীকে লইয়া আদরে মিষ্ট হাসি হাসিয়া থাকেন—আমাদের সেই সুখের সাহিত্য, প্রাণের সাহিত্য! তোমাকেই হৃদয়ে ধারণ করিব? না, তুমি যা'দিকে লইয়া হৃদয়ের ঘরে ঘরে রাস-কেলি ঘটাও, কামমোহমদমাৎসর্য্যপূর্ণ পশু প্রাণ ও মনকে চঞ্চলচাহনিদীপ্ত আগুনে পুড়াইয়া পুড়াইয়া ননিটি করিয়া সত্যের ও সত্তের কিশোর কিশোরী গড়িয়া তুল, সেই-সব ননি-গলা হৃদয়মাতুলিগুলি লইয়া তোমারই সহিত জোড়া মুখের হাসি হাসিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাই হ'ক তোমাকে আমি দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলাম।

কিশোরের মত আমার মন ত এখন নরম নয়, কিশোরের মত আমার পেশী ত এখন মাংসের তলে ডুবিয়া নাই, আমি তোমায় ছাড়িব না—হে পূর্ণশশী আমি তোমায় ছাড়িব না! তুমি হৃদে হৃদে যত রূপেই বিরাজ কর, তোমার পূর্ণরূপ দু'খানা করিয়া আমার হৃদয়ে স্থাপিয়া যত লীলাকেলি রসভোগই আমায় দেখাও, আমি তোমায় ছাড়িব না! হায় মূর্খ! এতটা জোরে ধরিতে গিয়াই ত অনর্থ ঘটাইলাম, কত রূপের পর রূপ দেখাইয়া তুমি আমায় এমন জায়গায় আনিয়া ফেলিয়াছ, তথায় তুমি আছ কি আমি আছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমা ছাড়া তুমি বা তোমা ছাড়া আমি এ বিচ্ছেদদ্বৈতরস যে প্রাণে আগুন ছড়াইয়া দেয়—আমাকে যে বেশ শক্ত করিয়াই বসাইয়া দিল।

হায়, হায়! সাহিত্য, প্রথমে শব্দের বান হানিয়া আমায় মোহিত করিয়াছ, শব্দের মধ্যে তোমার হৃদয়-দীপ্তি আমাকে কিশোরের কিশোর করিয়া তুলিয়াছিল, শব্দ দিয়া ত তোমাকে পাইব না—কিন্তু তা দিয়াই ত তুমি আমায় ভাসাইয়া দিয়াছিলে—তুমি এই আছ এই নাই এ রস-নাট্যের কিশোর-অনুভূতি তুমি যেরূপে শিখায়েছ প্রতিমার তলে বা গুরুর পাদমূলে বুঝি তাহা শিখিতে পারিতাম না।

কিন্তু তুমি এ কি করিলে? প্রকৃতি সজারুর কাঁটা হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল, আর তুমি কিশোরের প্রেমস্রোতটী ধরাইয়া আমায় কোন্ বৃন্দা-বনে লইয়া চলিতেছ! এ যে বিষম দ্বৈতরসে আমায়

অভিষিক্ত করিতে চাও—দূর বৃন্দাবনের গোপীহাস্য দীপিয়া দীপিয়া আমার হৃদয়স্রোতে কত আলোক বিকীরণ করিতেছে—এ কাহার আলো? তাঁহার জন্যই ত হৃদয় পাগল!—আবার গায়ের ওপর আজন্মের জন্মজন্মের মড়াগুলি আটকাইয়া রাখিয়া যন্ত্রগুলি থরে থরে সাজাইয়া আবার কোন রস তুমি আমাকে বুঝাইতে চাহ? দ্বৈতদ্বৈত তদধিক দ্বৈত এ রস, বিষের দাহগুলি আমায় দেখাইবে না কি!

না, আরও দৃঢ় করিয়া তোমায় ধরিতে হইল! যতকিছু কাঁটা খোঁচা তোমার গায়ে লেপিয়া দিই, যে আমাকে ভিতর-দিয়া ভাসাইয়া লইতেছে তাহাকে বাহিরে আনিয়া ফেলি, তুমি অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছ, অন্তঃকরণের মধ্যে অন্তঃকরণ দিয়া তোমাকে এমন পিষ্ট করিব, আর আমার সত্তাটীকে ভিতরের ভিতর দিয়া এমন আটকাইয়া রাখিব যে তোমাকে বাধ্য হইয়া হৃদয় মন প্রাণ ফুঁড়িয়া বাহির হইতে হইবে—খুব জোরেই তুমি আসিবে, আর আমার অঙ্গ কণ্টক মণ্ডন হইয়া যাইবে! এ আমার কল্পনা না সত্য? আমার বিশ্বাস হইয়াছে—কিশোর প্রাণে তুমিই না আমায় বিশ্বাসবান করিয়াছ, যে, তুমি শব্দে ছন্দে গ্রন্থকারের হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিয়া এইরূপে সকলকে শীতল করিয়া তুল, আবার প্রত্যেকের হৃদয়ে নববৃন্দাবন সৃজন করিয়া তাহাকে রাসনৃত্যে ভাসাইয়া ভাসাইয়া জগতে এক বিচিত্র প্রেমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।

(২)

হায়! ধিক! তোমার সমস্তই জুয়াচুরি! পাঠশালার বইয়ের মধ্যে পাখী ডাকাইয়া প্রভাত সৃষ্টি করিয়াছ? ভণ্ড! সে আমার এই বাইরের পৃথিবীর সকালের সূর্য্য-উঠা যে! আমার অন্তরে যে স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলে, তাহার প্রভাত হয় নাই কেন? রাধিকা সকল স্বনেই কৃষ্ণস্বন শোনে, কিন্তু শোনে না কেন সে সেই ত্রিভঙ্গমুরারীর মুরলীবিলাস অধরের দীপ্ত হাসিভাঙ্গা মধুর ধ্বনি? কেন? রাধিকার বিরহ-রস বোধহয় তোমার খুব মিষ্ট লাগে! বিরহের বিচিত্র অভিনব রসতরঙ্গ স্পর্শে স্পর্শে স্পর্শ তুলিয়া বুঝি তোমায় ধন্য করিবে? হায়, সাহিত্য! লুকোচুরির মধ্যে তুমি যে আমাকে রস দিতে চাও, যে মহা আকর্ষণ তুমি আমার মধ্যে জাগাইতে চাও, তাহার অচিরাৎ অনুভব-স্পর্শ ও দিব্য আবির্ভাব যদি আমার না হয়, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্ব এখনই বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—তোমার সহিত এতদিনের সুখজড়িমা আর আমাকে জড়াইয়া রাখিতে পারিবে না, সাবধান! তুমি অন্য সুরে গাহ।

অনেক কথা বাদ পড়িয়া যাইতেছে—বক্রাক্ষরে, অমৃত ছানিয়া, চাঁদ ছানিয়া, তুমি যে দিব্য রাজ্য সাজাইয়া রাখিয়াছ—আমাকে চুপে চুপে কত দিনই না বলিতে, আমার কচি হৃদয়টুকুর কাণে কাণে মিষ্ট কথায় কত প্রেমচিত্র যে আঁকিয়া দিতে তাহা কি আমি ভুলিতে পারি? লক্ষীছাড়া! কত উলটী পালটী দেখি আমি তোর বর্ণীর অক্ষরগুলা—না, পাই না, যাহা বলিয়াছ তাহা পাই না—বাংলার কাব্যে সে আছে, বৈষ্ণব কাব্যের ভিতরে অনন্ত প্রেমরূপে সে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু হেথায় আলো বিকীরণ করিলা যে স্বর্গের ছবি, যে প্রেমের ছবির কথা তুমি আমায় বলিয়াছিলে তাহাকে যে উদ্ধার করিতে পারি না! আমার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত—মনে হইতেছে শব্দগুলোকে গুঁড়াইয়া ধ্বনিগুলাকে মিশাইয়া বৈষ্ণবগুলাকে রসসাগরে ডুবাইয়া সব সাফ করিয়া দিই—সব একাকার হইয়া যাক, বৈষ্ণবের হৃদয়গুলা গলিয়া গলিয়া বিশাল সমুদ্র হইয়া যাক—অনন্ত উত্তালতরঙ্গে খচিত হইয়া সমুদ্র অপূর্ব্ব গালিচায় পরিণত হ'ক। আমি তাহার মধ্যে প্রথমেই চণ্ডীদাসকে বসাইয়া দিই, তার পরে যা করেন চণ্ডীদাস!

সেই আমার হাতেগড়া চণ্ডীদাসের হাতে নিজেকে বিকাইয়া দিয়া একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি তুমি দেখাবে আমায় দেখাবে, তোমার প্রেমস্বরূপচ্ছবি দেখাবে আমায় দেখাবে! এইরূপেই আমি আমার সাহিত্য গড়িয়া লইতে চাই-- বর্ত্তমান সাহিত্য বিচার করিয়া দেখ, আমি ঠিক পথ ধরিয়াছি কিনা।

জ্ঞানের উৎসর্গ

—:০:-

কর্ম্ম ও ভক্তির মত জ্ঞানও ভগবানে উৎসর্গ করিতে হয়। ইহাই জ্ঞানযোগ। জ্ঞানের প্রকৃতি দুই প্রকার। পরা এবং অপরা। পরা সেই "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" পরম সত্যকে আশ্রয় করিয়া কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া থাকে। অপরা আপনাকে প্রসারিত করিয়া সেই একের বহুধা সৃষ্টির মাঝে সাঁতরাইয়া বেড়ায়, উভয়েই সেই "অমৃতাক্ষরং হরঃ" এক দেবতার অঙ্কবিলাসিনী একজন গৌরীর মত হরকণ্ঠলগ্না, আর একজন ধূর্জ্জটীজটানিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহের মত মর্ত্তে ভাগবতমহিমা প্রচারনিরতা। উভয়ের মধ্যে স্বপত্নি বিরোধ নিত্য বিদ্যমান, ইহার সমাধান আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই।

পরা যেন গৌরীশৃঙ্গের উচ্চ চূড়ে আরোহণ করিয়া, ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের মনোহর অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, নিম্নে অপরার উদ্দেশ্য আদর্শ ও অনিত্য পদার্থের অনুসরণপ্রবৃত্তির প্রতি ঈষৎ অবজ্ঞা ও ঔদাসিন্য দৃষ্টিতে ভ্রুকুটী করিতেছে, প্রত্যুত্তর স্বরূপ, অপরা শিল্পে, বিজ্ঞানে, জীবনের অশেষ সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিতা হইয়া, পরার মিথ্যাস্বপ্নবিমোহিত, কুজ্ঝটিকাময় কাল্পনিক আনন্দ ও গর্ব্বের প্রতি সংশয় দেখাইয়া কলহাস্যে চঞ্চলনৃত্য করিতে করিতে ঠিক্‌রাইয়া দূর দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে, এই এক এবং অভিন্নের পরমানন্দময়ী যুগল প্রকৃতির [illegible] কি মিটিবে না? এই অবিভাজ্য পূর্ণত্বের দুইটী পরিদৃশ্যমান অন্তর শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য কি আসিবে না? পরা এবং অপরার মিলন চিত্র যে দিন জগতের জীবনে ফলিয়া উঠিবে, দ্বন্দ্বময় সংসার সে দিন বৈকুণ্ঠে পরিণত হইবে।

পরা অপরা উভয়েই অপরিত্যাজ্য। একেরই দুইটী দিক্। একের অভাবে অন্যটী অপূর্ণ। আর্ট, সায়েন্স, যত বড় করিয়াই মূর্ত্তি গ্রহণ করুক, বহির্বিজ্ঞানের সাধনা যতই প্রাণবন্ত হউক, ভাগবদ অনুভূতির সত্য আস্বাদ যদি ইহার ভিতর না থাকে, জানিবে আত্মকৃত নির্ম্মাণের পাষাণভারে একদিন জীবন চাপা পড়িয়া যাইবে। পরা বিদ্যাই জ্ঞান যজ্ঞের প্রদীপ্ত হুতাশন, ইহার অভাবে ভস্মে ঘৃতাহুতির মত জ্ঞান সাধনা পণ্ডশ্রম মাত্র, ভ্রান্ত পথে, ভ্রান্ত লক্ষ্যে ছুটাছুটী একপ্রকার আত্মঘাতী হওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

অন্যদিকে সবকে বেষ্টন করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া যে পরম শ্রদ্ধা যে পূর্ণ যোগ উহা তো জগতের কর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন করিবে না, মানুষের মস্তিষ্কে যে কল্পনা যে স্বপ্ন জাগিয়া উঠে, উহা অমূলক বলিয়া তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবে না, বহুমুখী জয়কে আয়ত্ত করিবার জন্য মানুষের যে প্রাণপাত পরিশ্রম উহাও তো সে উপেক্ষা করিতে পারে না, কেননা এই

সকলই যে মানুষের জীবন লইয়া সেই জ্ঞানাতীত অনির্ব্বচনীয় সত্তার প্রকাশভঙ্গী, তিনি যে নিজেকে জগতের জীবনে এই রূপেই আত্মদান করিয়াছেন। এই শুদ্ধ ভাব ও শুদ্ধ জ্ঞান লইয়া স্বচ্ছ ও মুক্ত আত্মা হইয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের নিকট উৎসর্গস্বরূপ বিলাইয়া চলাই আমাদের সাধনা। মন হইবে চন্দ্রের মত ভাস্বর, বুদ্ধি হইবে ব্রহ্মার মত সৃজনশক্তিক্ষম, অহঙ্কার রুদ্রতেজোদীপ্ত, চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আবাস হইবে, মূঢ় ভাবে প্রাকৃত জীবনযাপনের ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে এই দেবজন্ম সার্থক হইবে।

সকল যোগেরই দুইটা দিক্ আছে—অন্তর এবং বাহির। ভক্তিযোগের "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" বাহিরের দেওয়া হইতে অন্তরের প্রেম ঘৃণা ভাল মন্দ যাবতীয় বৃত্তি পর্য্যন্ত যেমন ভগবানে সমর্পণ করিতে হয়, কর্ম্মযোগে "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি" সমুদয় বাহিরের কর্ম্ম হইতে অন্তরের চিন্তাতরঙ্গটী পর্য্যন্ত যেমন শ্রীকৃষ্ণের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, তদ্রূপ জ্ঞানযোগেও এই পৃথিবীর সম্পর্কে থাকিয়া আমরা যে পার্থিব জ্ঞান আহরণ করি উহার সহিত অধ্যাত্ম জ্ঞানও সমান ভাবে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া যাইতে হয়। জ্ঞানের পূর্ণ উৎসর্গ ঘটিলেই আমরা তাঁর সহিত এক হইয়া যাই, সেই দীপ্ত সূর্য্যকরোজ্জ্বলস্নাত হইয়া "মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ" এই বোধে ভূমার আনন্দ ও ভাগবত প্রেমে আপনাকে দ্রব করিয়া দিই, জ্ঞান যোগের ইহাই চরম সিদ্ধি।

অধ্যাত্ম সাধনায় অন্তর্জ্ঞানের উদয় হয়—উহাই পরম জ্ঞান, কিন্তু যিনি তত্ত্বদর্শী পূর্ণ জ্ঞানের অভিলাষী, তিনি বহির্বিজ্ঞানের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করেন না, এবং জীবনে উহার যোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উহা সফল করিয়া তুলেন।

কোন মৌলিক উচ্চ তত্ত্ব, উহা দর্শন বিজ্ঞান চারুকলা যাহাই হউক, এবং ভাগবত লাভের কঠোর তপস্যা উভয়ই সমবেগে ভগবানের দ্বারে সাধককে পৌঁছাইয়া দেয়, চাই কেবল আন্তরিকতা, সাধ্য বিষয়ের উপর অবিচল নিষ্ঠা, কেননা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহাই হউক না, উহা যত বৃহৎ এবং বিস্তৃত হইয়া উঠিবে, ততই উহা রূপান্তরিত হইয়া ভাগবত ধর্ম্মে পরিণত হইবে। "যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব" সবই যে ভাগবত স্বরূপ। তাই জগতের কোন কিছু যখন মহত্ত্বপূর্ণ শক্তিপূর্ণ হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই দেখা যায়, উহার মূল উচ্চজগতের পরম ইচ্ছা হইতে প্রসর্পিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন সাধনায় ইহা যেমন সত্য, জাতিগত জীবনেও ইহার অন্যথা হয় না, কোন জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য যত উদার এবং বিশাল হইয়া উঠিবে, জানিও সে জাতি ভগবানের তত নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

আমরা যে পৃথিবীর উপর বাস করি, ইহাকে সম্যকরূপে মানুষের অধিকারে আনিতে হইলে, অথবা ইহাকে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে, যে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজন, তাহা জগতের প্রাকৃতিক নীতি ও ইহার উপাদানরাজির বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াই জানিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে। আর্ট, সায়েন্স, মনস্তত্ত্ব ব্যবহারিক জড়বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এই সমুদয় এই পরিশ্রমেরই ফল। বস্তুবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যে সব বিচিত্র বিজ্ঞানবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, উহা যুগপৎ জ্ঞান এবং কর্ম্মোপযোগী। কাব্যের মধুময় ঝঙ্কার, সে যে হৃদয়ের অব্যক্ত গোপন ছন্দের পুনরাবৃত্তি, অন্তরে যে রূপ, যে মূর্ত্তি ভাবের তুলি দিয়া ফুটিয়া উঠে, রংয়ের আঁচড়ে চিত্রকর তাহাই তো ফলাইয়া তোলে, মাটী পাথরের বুক চিরিয়া ভাস্কর যে ছবির সৃষ্টি করে, উহাও জ্ঞানরাজ্য হইতে টানিয়া আনিতে হয়, কত অব্যক্তকে

আর্ট ব্যক্ত করিতেছে, কত অজানাকে বিজ্ঞান জানার মধ্যে আনিয়া দিতেছে, জ্ঞানই যে এই ক্ষেত্রে কর্ম্মরূপে প্রকাশমান, জ্ঞানযজ্ঞের আসল উপাদান এইগুলিকে ভাবে ভাবে সংগ্রহ করিয়া, ভগবানের চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে।

জ্ঞানযোগীর দিব্য জীবন এইগুলি হইতে স্বতন্ত্র হইবে না, এইগুলিকে ছাড়িয়া চলিবে না। আমাদের মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের মূলতঃ লক্ষ্য হইবে ভগবান, সর্ব্বজীবে ও সর্ব্ববস্তুতে তাঁহাকেই জানা এবং পাওয়া। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞানতঃ দৃষ্টি থাকিবে, যাহাতে আমরা তাঁর পথেই চলিয়া, তাঁর দেওয়া উপাদান ও প্রণালীর সাহায্যে কর্ম্ম করিয়া মানবজাতির প্রাধান্য, আনন্দ এবং পূর্ণত্বকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে পারি। আমাদের আর্টের সাধনা হইবে সর্ব্বজীবে, সর্ব্বপদার্থে, সর্ব্বমানবে ভগবানকে মূর্ত্ত করিয়া ধরা, তাঁর সৃষ্টিপ্রণালীর মধ্যেই তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া তোলা, সেই গোপন পুরুষের লুকোচুরি ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া ফেলা, মূর্ত্তির মধ্যে শিল্পের মধ্যে, সমাজ, ব্যবসা, রাজনীতিক জীবনের সকল ভঙ্গী সকল প্রকাশের মধ্যে এই পরম তত্ত্বকে আবিষ্কার করিয়া তোলা। আমাদের অন্তর ও বহির্বিজ্ঞানের অনুশীলনতত্ত্বের মর্ম্মকথা হইবে ভাগবত, আমাদের শিক্ষা, সাধনা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলই তাঁহাকে লক্ষ্য স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

মানুষ যে দিন সত্যকে পাইবে, পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবে, সে দিনও তাহার জ্ঞানচর্চ্চার অবসান হইবে না। তখন ভগবান তাঁর সৃষ্টি রক্ষার জন্য অসংখ্য কর্ম্মের মাঝে থাকিয়াও যেমন তিনি নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, জ্ঞানযোগী তদ্রূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, অজ্ঞজনের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভগবানের অজস্র আনন্দ ধারাকে শিল্পে, বাণিজ্যে, স্থাপত্যে, বিচিত্র কারুকার্য্যে মূর্ত্তিদান করিবেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তি স্বভাবতঃই তমোগুণাচ্ছন্ন কর্ম্মবিমুখ, ইহাদের উচ্চপথ নির্দ্দেশের জন্য ভগবান জ্ঞানসিদ্ধ আধারের ভিতর দিয়াই আত্ম-প্রকাশ করেন, ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—হে পার্থ, ত্রিলোক মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত কিছু নাই, তবুও আমি কার্য্য করি, আলস্যবর্জ্জিত হইয়া শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিলে, মর্ত্ত্যজন আমারই অনুসরণ করিবে, এরূপ হইলে সকল লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিনষ্ট হইবে। জ্ঞানযোগী ভাগবত জীবন লাভ করিয়া জগদ্ধিতায় কর্ম্ম করিবেন। জ্ঞান, কর্ম্ম এবং আনন্দ তবেই জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

ভারতের প্রাচীন বেদান্তধর্ম্মের শিক্ষা ও সাধনা জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে না। জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করিবার জন্য অন্তর ও বহির্জগতের জ্ঞান রাশির সামঞ্জস্য বিধান করাই সনাতন ধর্ম্মের মূল কথা। আমাদের জীবন বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তামসিকতায়, রুদ্ধ হইয়াছে সঙ্কীর্ণতায়, এই সকল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হইতেছে জ্ঞান সাধনা, এই সাধন সাহায্যেই আমরা জীবনকে ভূমার আনন্দে মূর্ত্ত করিয়া তুলিব। অজস্র জ্ঞানে ও শক্তিতে ইহাকে দেবজীবনে পরিণত করিব, জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের ত্রিধারায় জীবন অভিষিক্ত করিয়াই আমরা ধন্য হইব, পূর্ণশক্তির আধার হইয়া ভগবানকেই জীবনে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিব।

সেই একেকে ধরিয়াই আমাদের বহুত্বের মাঝে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে, সেই একের উৎসর্গস্বরূপ যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্যই আমাদের পৃথিবী মথিত করিতে হইবে, সাগরগর্ভ ছেঁচিয়া মণি মুক্তা সঞ্চয় করিতে হইবে, পাথরের বুক চিরিয়া ধাতুদ্রব্যের আবিষ্কার করিতে হইবে, তাহার জন্যই আমাদের আর্ট, সায়েন্স, দর্শন, ইতিহাস, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য,

তাঁহাকে পাওয়ার আনন্দ লইয়াই আমাদের জীবন, জীবনের সাধনা, জ্ঞানযোগে—ভক্তি ও কর্ম্মের এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য অন্তরে রাখিয়াই—জ্ঞানযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে হইবে।

বর্ত্তমানের সমস্যা

(১)

জগতে যে এত রেষারেষি সে কেবল ঐ জানা আর পাওয়া নিয়ে। জানাটা যার যত বড় হয়, তার কথাটা ততটা ঠিক, আর যে যতটা জানে সেই ততটা পায়—নিখুঁত করে জানতে পারলে নিখুঁত ভাবেই পাওয়া যায়। তবে জানার আকাশটা এতটা চওড়া আর লম্বা যে কেউ যে ওটাকে পার হয়েছি বলে' সনাতন শাস্ত্র লিখতে বসবে তার যো নেই।

(২)

এত বড় একটা বীণা, যার তেত্রিশকোটী বড় বড় তার—আর ছোট তারের ত সংখ্যাই নেই—তার সুর বাঁধতে হ'লে প্রথমেই ত এক মহা সমস্যা—কার সঙ্গে সুর মিলাব? তাও যদি ঠিক হ'ল, সুর যদি কোথাও খুঁজে পেলুম, তারপর সেটাকে আমার তেত্রিশকোটী তারে বেঁধে নিতে হবে। কারণ জানলেই ত হল না, শুধু ত খোঁজ পাওয়াই শেষ নয়—ভগবানকে জাগিয়ে তুলে আবার সেটা আমার বীণায় বেঁধে নিতে হবে। যন্ত্রও আবার সব সমান নয়—কোনটাকে খুব একটু চড়িয়ে নিয়ে তারপর একটু একটু নামিয়ে তাকে সুরে আনতে হয়—আবার কাউকে নীচু থেকে আস্তে আস্তে সুরে নে যেতে হয়, কোন কোন যন্ত্রকে আবার উচুনীচু দু'রকমই করতে হয়। এই সুর-বাঁধবার একটা কায়দা আছে—অনেক অভিজ্ঞতার দরকার—বাজে লোক জোর করলে হয়ত তার ছিঁড়ে যেতে পারে—তাহ'লে সেদিনের মতই গান বন্ধ।

(৩)

যখন জোয়ার আসে, কোলকাতার তক্তা ঘাটে যে সব বাঁধা-জাহাজ থাকে তার একটার যদি শিকল কাটা যায়, তখন সে কোথায় কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, কোন জেটীতে লেগে চুরমার হয়, তার আর ঠিকানা থাকে না। এই একটু বেতাল যে সে হয়ে পড়ে, বাঁধা ছিল এইটাই তার কারণ। জীবনের পায়ে যখন বাসনার নিগড় থাকে আর যুগ যুগ কষ্টের পর মন যখন একদিন এক বিকট টানে সব ছিঁড়ে ফেলে, তখন মানুষ এমন ছুট দেয় যে হিমালয়ের গৌরীশঙ্করও তাকে থামাতে পারে কিনা সন্দেহ—তার কোমরে তখন বাস রাখাই দায় হয়ে উঠে। বিল্বমঙ্গল যখন চিন্তামণির কাছ থেকে ছুট দিলে তখনকার উলটো টানটা তার মড়া আর সাপ ধরে আসবার টানের চাইতে কম নয়। রাগ তার ঠিক চিন্তামণির উপর ছিল না—আর পালানটাও তার লক্ষ্য নয়—আপনাকে ভাল করে পাওয়াই তার লক্ষ্য ছিল। তাই যখন মানুষ অভিমানে সব ছেড়ে হিমালয়ে যায়, সেটা সংসার অসার বলে নয়—তার আপনাকেই সে মনের দীৎকারে খুঁজতে ছিটুকে বেরিয়ে পড়ে। জীবনটাকে

চেপে রাখলে সে যখন ফাঁক পায়, স্প্রীং'এর মতই সে লাফিয়ে উঠে—তাতে যদি তার মাথা ঠোকে কি কার দাঁত ভাঙ্গে ত উপায় কি ?

(৪)

এরকম একটা প্রতিক্রিয়া আসা স্বাভাবিকই, তবে প্রতিক্রিয়ার অবস্থাটা যে স্বাভাবিক নয়—এটা নিশ্চয়। আর একটা প্রতিক্রিয়ার অবস্থা কোন রকমে এনে ফেললেই যে সৃষ্টির অবস্থা ফিরে আসবে এটাও বলা যায় না। কারণটা এনে ফেললেই যে সত্যটা প্রকাশ হবে তার কোন মানে নেই। কারণ, প্রকাশের অনেক কারণই আমাদের জানা নেই—আর সময়, এবং একটা ইচ্ছা বলেও জিনিস আছে। তাই পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় আসতে হলে একটু "বেচাল্‌তা" আসতে পারে—এটা সহনীয়—কিন্তু কাপড় পোড়ালেই যে সেটা তৈরী করবার ক্ষমতা, উৎসাহ, ইচ্ছা বা সময় হবে তার কোন মানে নেই। মানুষ ত এক মাত্র দরকারের তাড়নায় চলে না।

(৫)

প্রতিক্রিয়ার অবস্থাটা অবশ্যম্ভাবী হলেও, সেটাকে বেশীদিন প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়—বিশেষতঃ যতক্ষণ না স্বাভাবিক অবস্থা একটা সৃষ্টি করে নিচ্ছি ততক্ষণ ত বিশ্বাস নেই—সংসারকারাগার থেকে পালিয়ে আবার পাহাড়ের গহ্বরে সংসারকারাগার ফাঁদতে আর কতক্ষণ! শুধু নারীর মোহ থেকে সরে গেলেই কি পরিত্রাণ—আবার বাউল সেজে আপনাকে প্রকৃতি বলে' দেখে তবে মানুষ বাঁচে!

(৬)

আর একবার না হয় লোকে বৈরাগ্যে সংসার ছাড়ে। বার বার প্রতিক্রিয়াকে ডাকলে শুধু যে নিন্দনীয় হতে হয় তা নয়, কাজও তাতে সব সময় এগোয় না।

(৭)

এসব কথা ত হল ; কিন্তু সুর বাঁধবার কায়দা নিয়ে শুধু লড়ালড়ি করলেই ত চলবে না—সুরটা ত পাওয়া চাই। চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহং'এর অন্তঃকরণ দিয়ে শুধু সৃষ্টি করলে কি হবে, যতক্ষণ 'আমি' আছি ততক্ষণ সব জঞ্জাল কি মিটবে ? আমাকে যেদিন তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারব, যেদিন তাঁর আলোকে আমার দেহ, অন্তঃকরণ সব নতুন হ'য়ে গড়ে উঠবে, তখনই ভাগবত সৃষ্টি প্রকাশ হবে। আজকের মানুষ জানার যত উঁচুতে উঠেছে, সেইখান থেকেই নির্ম্মাণ আরম্ভ করতে হবে—সে জ্ঞানটা অন্তঃকরণের জ্ঞানের উপরে—সেখানে বসে তিনি হিরণ্ময়পাত্রের আড়াল থেকে সব সৃষ্টি করছেন।

(৮)

এতদিন মানুষের ঘাড়ে অতীত মহাত্মাদের বিরাট ক্ষুধা চেপে তাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাই যেই সে আবেশটা চলে গেল অমনি সে যে মানুষ সেই মানুষ। বড় লোকের কথা ছেড়ে দিয়ে চোখের সামনেই ত বাসন্তী, বিপিনচন্দ্রের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। শুধু একটা প্রেরণার টানে কাজ করে গেলে চলবে না, প্রেরণাটাকে নিজের করেই নিতে হবে। আবার প্রেরণাটা—আবেশ না হ'য়ে—শুধু নিজের হ'লেই চলবে না, সেটাকে সত্য করে তুলতে গেলে আবার যে সব যন্ত্রের ভেতর দিয়ে সেটা ফুটবে সেগুলোকেও শুদ্ধ করতে হবে। নইলে শেষে ভূতাবিষ্টের মতনই প্রায় ফলটা দাঁড়াবে। প্রেরণার চাপে আপাততঃ প্রাণ মন কিছু না বললেও একদিন এমন লাফ দিয়ে ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত ঘাড়ে পড়বে যে, শুধু যে তোমার প্রাণ যাবে তা নয়—তোমার সোণার সৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে ধূলাশায়ী হবে। ঐ রকম করেই কাথলিক পৌরহিত্য পচে গিয়েছিল—ঐ রকম কারণেই আমাদের দেশে মঠ মজেছে। যতদিন শক্তিটা থাকে ততদিন এই পূতিগন্ধময় সমাজ চুপ করে থাকে, তারপর সুবিধা পেলেই ঘাড়ে চড়ে মন্দিরকে

সংসারের বেহদ্দ করে তোলে। তাই সমাজে শুদ্ধ জীবন লাভ করতে গেলে যেমন সব সমাজটা না শুদ্ধ করলে রক্ষা নেই, সেই রকম জীবনের ভেতর দিয়ে শুদ্ধ সৃষ্টি ফোটাতে গেলে সব জীবনটাকে শুদ্ধ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

(৯)

আমি আমার ভিতরের রাজা হতে পারি কিন্তু প্রাণ মন দেহ এরাও এক একটা লর্ড বিশেষ। শুধু আমি স্ব-কে, শুদ্ধিকে খুঁজে পেলেই হ'ল না—ঐ প্রাণ মনেরও পাওয়া চাই। নইলে একদিন আমার Paramount power যাবেই যাবে। যত দিন না আলো আর শান্তি দিয়ে এই মন-মানুষ আর প্রাণ-পশুটাকে শুদ্ধ আর বুদ্ধ করতে পাচ্ছি ততক্ষণ ভরসা নেই। এই mentality'টাকে না বদলে কাজে নামলে, সে সৃষ্টির শেষে অনেক বাদ দিতে হবে—আর পূর্ণতা যে পাব না এটা নিশ্চয়ই।

(১০)

ভারতের জীবনসত্যটা ত এতটুকু নয় যে এক গালেই তাকে পুরে ফেলব। শুধু ত মন নিয়েই ভারত নয়! এখানে আত্মা থেকে জড় দেহটা পর্য্যন্ত কিছুই উপেক্ষিত হয় নি। তবে মনের সত্য ও শুদ্ধিটাকেও ভারত বড় স্থানই দিয়েছে। এক দিকে তপোবনে বেদধ্বনি যেমন শুনেছি, ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য ও তেমনি দেখেছি। অযোধ্যার মনুষ্যত্বও আমরা ভুলি নি, আর কাশী কাঞ্চী মিথিলার জ্ঞান আর রাজগৃহের ত্যাগও আমরা মাথায় করেই ধরে রেখেছি। পৃথিবী আর ভগবানে একটা যোগ করব এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ভারত জেগেছিল। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যটা আমরা আমাদের মতন করে নিতে পারি, সেটাকে নাকচ করবার জন্যে আমাদের আজ ডাক পড়ে নি।

(১১)

পাশ্চাত্য যে ইঞ্জিন তৈয়ারী করেছে সেটা কিছুতেই মিথ্যা নয়—মানুষের বাসনা কামনারূপ Driverই ঐ বিজ্ঞানকে আমাদের সত্য স্বার্থের বিপরীত দিকে নিয়ে চলেছে। ইঞ্জিনটাকে ভাঙতে হবে না, ঐ বাসনা কামনাগুলোকেই বলি দেওয়া একান্ত দরকার হয়েছে।

(১২)

তা বলে' ইউরোপের দেখাদেখি আমরা কেবল অশান্ত ভাবে নতুনের দিকে দৌড়ব না—ও রকম একটা আদর্শ বড় হতে পারে, কিন্তু আমাদের ওটা নিজস্ব নয়। আমরা পরিপূর্ণকে আমাদের মধ্যে আছে স্বীকার করেই তাকে রূপ দিয়ে দিয়ে চলব। গোড়ায় আপনাকে অপূর্ণ বলে স্বীকার করলে পূর্ণের আনন্দ মিলে না—কারণ যতই যাই পূর্ণের কি শেষ আছে! আজ তাই আলো আর শান্তিরই বরণডালা মাথায় করে', পরিপূর্ণতার শাঁক ঘণ্টা বাজিয়েই আমাদের জগতের শোভাযাত্রায় বেরুতে হবে। এ সমন্বয় এ synthesis অধ্যাত্মক্ষেত্রেই সম্ভব—তাই ভারত কর্ম্মপ্রবেশে অধ্যাত্মকেই তার বড় সাধনা বলে' মেনে নিয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী

মানুষের অধঃপতন তখনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হয় যখন সে মহতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। দুঃখের বিষয় আমাদের চক্ষে বাঙ্গালীরই যেন এই দোষটা খুব প্রবল বলে মনে হয়। বাঙ্গালীর তদানীন্তন নেতা আজ কেবলই বড়াই করিতেছেন সে, কথা ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি বলিয়া রাখিয়াছি। সাধা রণ লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে, তা যদি বলেই থাক তাহা হইলে তোমাদের কথায় তেমন ভাবে বাঙ্গালী অথবা সমগ্র ভারতবর্ষ মত্ত হয় নাই কেন। আজ যাঁহারা ভারতের চিন্তা পয়সায় বিকাইতেছেন তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর দেন না কেন! নিজের প্রাণকে এই উত্তর প্রদান করুন তবেই সকল সুমীমাংসা হইতে পারিবে। আমরা কথাটা কি ভাবে ভাবিতেছি তাহাই বলিব; স্বদেশীযুগের নেতৃবর্গ যখন আন্দোলনটাকে জলখেলা ভাবিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন এমনই ভাবে 'মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে'—তারপর যখন তুফান উঠিল—বিদ্যুৎ চমকিল, কড় কড় কড়কাপাত আরম্ভ হইল তখন বাত্যাতাড়িত পত্রপত্রের মত কে কোথায় দৌড়িয়া সরিলেন। তখন সকলে চলিলেন বিদেশে—কেহ বা নাইট হইলেন—কেহ বা রিনাইটেড হইলেন। আর তাপ সহিল কাহারা, বালক বারীন্দ্র আর পুলিন! তাহারা ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে দেশের হিতকল্পে অর্থ চাহিয়া হতাশ হইল—তখন তাহারা কুপথ ধরিয়া চলিল। একজন তথাকথিত নেতা একটী কনিষ্ঠাঙ্গুলি উত্তোলন করিয়াও তাহাদিগকে মাভৈঃ বলিল না! আজ যাঁহারা সত্যের ডাকের দোহাই দিয়া তাহাদের চরণে কোটি নমস্কার করিতেছেন, তাঁহারা তখন ঘরে বাইরে কেবল নিন্দাই ছড়াইতেছিলেন। যাক সে কথা। তাঁহাদের নিন্দা করিবার জন্য একথা বলিতেছি না—আমরা ইতিহাস লিখিতেছি মাত্র। আজকার নেতা তেমন নহেন; আজ যিনি আপামর ভারতবাসীর হৃদয় সিংহাসনে আসন পাতিয়াছেন, তিনি "আপনি আচরি প্রেম শিখান অপরে"। তাই তাঁহার পদতলে ঐ সমস্ত নেতাগণের শত অহেতুকী নিষেধ সত্বেও স্বতঃই মস্তক অবনত হইয়া পড়িতেছে। সেদিনকার নেতৃবর্গ কলেজ স্কোয়ারে স্বদেশী বক্তৃতা প্রদান করিয়া বড় বাজার হইতে বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিয়া বাড়ী যাইতেন—আজকার নেতার কথায় কার্য্যে এমন সামঞ্জস্য নাই!! তাঁহারাও সেদিন জাতীয় ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহা আজও সরকারের ব্যাঙ্কে থাকিয়া বিলাতী বণিকের ব্যবসার আনুকূল্য করিতেছে। কাজেই সে সমস্ত নেতৃবর্গ আজকার ল্যাংটি পরা সন্ন্যাসী নেতাকে উপহাস করিতে সম্পূর্ণ যোগ্য!! যাক সে কথা—সেদিনকার আন্দোলন পরিণামে গুপ্ত আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল, মহাত্মা সে আন্দোলনকে গুপ্ত গুহার গভীর তামস হইতে প্রোজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ভাসমান করিয়াছেন। ' ১৯১৫ সনে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে মিঃ লায়ন সাহেবের সভাপতিত্বে বলিয়াছিলেন "ভগবানের বিরুদ্ধে, প্রকাশ্য রাজদ্রোহ করিতে পার, আর পারনা মানবীয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে? যদি পার তবে তাহাই কর!" সে আজ ছয় বৎসরের কথা। আজ তিনি নিজ জীবনে তাহা বাস্তবে পরিণত করিতেছেন আর সরকার এই আত্মবোধহীন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিতে সাহসী হইতেছেন না! সেদিন যে দুঃখে দেশপ্রাণ যুবকগণ বিপদসঙ্কুল পাপসঙ্কুল পথে অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন, আজ আর সেদিন নাই। আজ প্রকাশ্য

দিবালোকে জাগ্রত মানুষের নিকট হইতে কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। কেন যাইবে অপহরণ বা লুণ্ঠনে মাতৃ-সেবকের হস্ত কলুষিত করিতে? উপহাস করিতেছ—দেশবন্ধু বাঙ্গলায় মাত্র ৭ লক্ষ টাকা তুলিয়াছেন। লজ্জা করেনা বলিতে, সেদিন তোমরা যুবকগণকে কত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে আসিয়াছিলে? তাই বলিতেছিলাম আজকার ভারত-নেতার হৃদয় মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়। আজকার নেতা ফাঁকি দিয়া রাজনৈতিক চাল চালিতে ছেন না—He is to his own self true and it follows he can't be false to any man. তিনি নিজের নিকটে সত্যবাদী, তাই তিনি কাহারও নিকটে মিথ্যাবাদী নহেন। সেই জন্যই তিনি মহৎ। সেই মাহাত্ম্যের নিকট পাশ্চাত্য মনীষী আজ নতশির। তাইতো আমেরিকান, ফরাসী, ইংরেজ শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেছেন, বলিতেছেন এমন নেতা পৃথিবীতে মানব জাতির ইতিহাসে অদ্বিতীয়। ইনিই না নিরক্ষর কুটীরবাসী শ্রমজীবী হইতে কোটিপতি নরপতির বন্ধু! কর্ণেল ওয়েজউড সত্য সত্যই লিখিয়াছেন বুদ্ধদেবের পরে এমন লোক পৃথিবীতে জন্মে নাই। Towards Home Ruleএর লেখক, মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক আজ বলিতেছেন, হিন্দু মুসলমানের একতার কথাটা একটা চালাকি camouflage। উদারমত ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহা বলিতে পারেন, কারণ যাহারা চির জীবন বসিয়া একটী দিনের জন্যও ফাঁকি দিয়াও এমন একটা একতা দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারা বাস্তবিক সত্যের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া স্তিমিতনেত্র দিগভ্রান্ত হইবেন এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি! শত বৎসরের সমাজসাধনায় যাঁহারা একদিন বর্ণাশ্রম লঙ্ঘন করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দেন নাই—যাঁহারা অনুন্নত জাতির জন্য সাঁতার অশ্রুপাত করিয়া হাঁটু জলেও নামেন নাই—যাঁহারা বাড়ীতে চাকর রাখিতে হইলে খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ব্যতীত ধোপা, নাপিত, নর, ভুঁইমালী, নম প্রভৃতির খোঁজ লন না, তাঁহারা এই রাজনৈতিক মিলনটাকে চালাকি না বলিয়া পারিবেন কেন? তর্কস্থলে কথাটা স্বীকার করিলেও, বলি From a liar to a beliver-মিথ্যা বলিতে বলিতে সত্যবাদী হওয়ার ন্যায় এই মিলনসাধনাটা কি বাস্তবে পরিণত হইতে পারে না! স্বদেশীযুগের মুসলমান আর অসহযোগের মুসলমান কি এক? তাহা হইলে কি সরকারকে আজ নিরীহ কেরাণীবাহন হইয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতে হইত? দুঃখ হয়, একদা-সম্মানিত নেতাগুলি এমন ভাবে কষ্টিপাথর স্পর্শে ধরা পড়িয়া গেল।

যাক, যে যায় সে যাক—সত্য চিরসত্য। যিনি একদিনও এত কোটি কোটি লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন, তাঁহাকেই গীতার ভাষায় বিভূতিবৎ শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। রাহু হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে চাহিও না—সে মুক্ত হইয়া ভাস্বর হইবে—আপন হৃদয়-দর্পণে আপন চিত্র দেখ। বুঝিতে চেষ্টা কর, জাতিভেদছিন্ন, হিংসাদ্বেষমথিত, জড়তাপিষ্ট জাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া যিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যপতিকে কম্পান্বিত করিয়াছেন, ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি রাজনৈতিক চাতুরীকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করিয়া অকুতোভয়ে বীরের ন্যায় সমস্ত বজ্র বক্ষ পাতিয়া লইতেছেন, তিনি আমাদের নমস্য; যিনি সিংহপরাক্রম আলি ভ্রাতৃবর্গের সহিত সোদরোপম বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া রাজপুরুষ ও জগতে ত্রাস-বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি চাহিবা মাত্র ১ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, হুকুম দিবামাত্র লক্ষ লক্ষ চরকা প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন, যিনি হিংস্রপ্রবৃত্তি দমন করিয়া সমগ্র ভারতকে অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। যাঁহার দিকে সমগ্র ঐহিক সুখপরতন্ত্র শক্তিসেবক পাশ্চাত্য [illegible] সমস্তার

স্থমীমাংসার জন্য চাহিয়া আছেন, তাঁহাকে নমস্কার। হে স্তুতি নিন্দার অতীত পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।'

(বরিশাল হিতৈষী—বুধবার, ২৩এ কার্ত্তিক, ১৩২৮।)
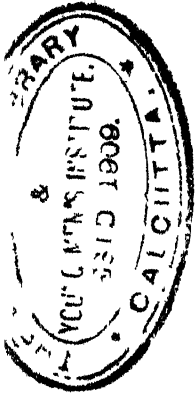
তুমি

আমার মাঝে প'ড়ে প'ড়ে চাইতাম্ তোমায় যবে,
আমার চাওয়া তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতাম তবে,
তাই ততদিন স্বরূপ তোমার পড়ে নাই ক চোখে,
তাই ত তোমার দিব্য আলোক পড়্‌ত না'ক মুখে।
জগৎ শুধু আনন্দহীন হ'ত আমার বোধ,
ভাব্‌তাম যত কাজ সকলই হচ্ছে কর্ম্মশোধ।
হঠাৎ একদিন চাওয়ার জোরে সোণার দ্বারটী খুলে,
নেমে এসে হৃদয় আমার আলোয় ভরিয়ে দিলে।
টুটে গেল 'আমার' 'আমার' হলাম তোমার আমি,
এখন থেকে আমার জীবন তুমিই চালাও স্বামী।
আমার চাওয়া রিক্ত করে' তোমার চাওয়া দিয়া,
তোমার রূপে তোমার ভাবে ভরাও আমার হিয়া।

ষষ্ঠ বর্ষ] ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ [দ্বাবিংশ সংখ্যা

যোগ ও জীবন

—:০:—

ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের, যোগের সহিত জীবনের সামঞ্জস্যবাদ এখনও আনুমানিক—ব্যবহারিক হইয়া উঠে নাই। কখন ধর্ম্ম বা যোগকে নীচে রাখিয়া কর্ম্ম ও জীবনকে বড় করিয়া তোলা হইতেছে, আবার কখন কর্ম্ম ও জীবনকে খর্ব্ব করিয়া ধর্ম্ম ও যোগ মুখ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। অঙ্গাঙ্গীভাবে ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের, যোগের সহিত জীবনের পূর্ণ মিলন যেন ঘটিয়া উঠিতেছে না। সাধনার অভ্রান্ত নির্দ্দেশ সূর্য্যের মত স্থির ও জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে নাই।

মানুষের জীবনে যে পথ নামিয়াছে—উহা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিলেই অব্যর্থ নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। যতদিন উহা সার্থক না হয় ততদিন পূর্ণ সমতা, পূর্ণ শান্তি অসম্ভব। কর্ম্মের মাঝে অথবা সাধনার নিরালা গিরি-গহ্বরে, সাধককে উঠা নামার সংশয়-দোলায় দুলিয়া দুলিয়া দিন গুজরান করিতে হইবে। ইহার মধ্যে যদি কেহ প্রকৃতির সহিত কোনরূপ আপোষ করিতে চাহেন, কিছুদিন স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপকে ঢাকিয়া চিরদিন মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; স্বর্গের স্বর্ণসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেও, সে আসন টলিবে; প্রকৃতির পিছনে যে পুরুষ আছেন, তাঁর অমোঘ ইচ্ছা, মন-গড়া সাধের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশ পাইবে। আমরা কোন অবস্থায়, কোন কালে, কোন আদর্শে, কোন মতেই জীবন ঢালিয়া তৃপ্ত হইব না, যতদিন না জীবনের আসল রূপটী ফুটিয়া উঠে। কর্ম্ম, নৈষ্কর্ম্ম্য; কোন অবস্থাই অনুকূল নয়, বিলাস ঐশ্বর্য্য, ত্যাগ ভোগ, এ সমস্তই সাময়িক বন্ধন। মুক্তির আসল ইচ্ছা কিছুরই উপর নির্ভর করে না।

মহম্মদের কর্ম্মবিশ্বাস, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধের ত্যাগ, চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম, কিছুই তো স্থায়ী নয়; সবই যেন কালস্রোতে ভাসিয়া দিনকতক বৃহতের আভাস দিয়া আবার অপসারিত হইল। আজও যে নূতনকে আমরা আহ্বান করিয়া আনিতেছি উহাও হয়তো একটা অবস্থা মাত্র; ভিতরের সত্যমানুষটীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ না পাইলে আনিও প্রতিষ্ঠাকাল দীর্ঘ হইলেও, উহা কোন কালের অতীত স্থায়ী অবস্থা নয়। প্রকৃতিকে কেহ তো অতিক্রম করিতে পারিতেছে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন ভারতের সাধনা সেই একই চক্রে পুনঃ

পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষের জ্ঞান অল্প ; সেই জ্ঞানের সীমারেখার বাহিরে নূতন কিছু দেখিলে, তাহার প্রলুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাই বলিয়া উহাই তো আসল বস্তু নয়। রেখা প্রসারিত করিয়া দাও, দেখিবে উহাও প্রকৃতির রাজ্য। এইরূপ রেখার পর রেখা কাটিয়া যতই আমরা অগ্রসর হইতেছি—আপনাকে ছাড়াইয়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া স্থান কালের কারাপ্রাচীর তো উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেছি না ; তাই মনে হয় সাধনা বুঝি স্বপ্ন, মরুময় জীবনে কেবল মরীচিকা।

আদর্শের পর আদর্শ আসিল, সংসারের অনুন্নত প্রাচীর ডিঙাইয়া পল্লী, গ্রাম, বাংলা, ভারত, পৃথিবী পর্য্যন্ত মনের দর্পণে আঁকিয়া উঠিল, পাঠশালার গুরুমহাশয় হইতে কত শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর পরিবর্ত্তন ঘটিল, আত্মা, পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা—অধ্যাত্ম জগতে এমন কত মহাত্মারই উদয় হইল, কিন্তু কালের নির্ম্মম পদাঘাতে সবই কি পরিত্যক্ত হইতেছে না, মনের ঝোঁকে যাহাই আঁকড়াইয়া ধর না, নিষ্ঠাকে যত বড় করিয়াই মূর্ত্ত কর না, সময়ের মাপ কম বেশী হইলেও, দুর্দ্দশা সকলেরই সমান, গতির তারতম্যে তুমি যাহা দ্বাদশ বর্ষে অতিক্রম করিতে পার, আমার হয় তো উহা অতিক্রম করিতে সারা জীবন লাগিতে পারে। মূল কথা, আমরা জগতের জানা অজানা কোন সত্তায় আপনাকে ফুরাইয়া নির্ব্বেদ লাভ করিতে পারি না, ইহার পথ বুঝি স্বতন্ত্র।

আত্মসমর্পণ মন্ত্রে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারি, বড় জোর প্রকৃতির দর্শন পর্য্যন্ত। কোন আদর্শে, কোন উচ্চ তত্ত্বে, কোন মানুষে, দেবতা বোধে, আপনাকে সরল অন্তঃকরণে বিলাইয়া যদি চলিতে পার, এই সাধনার চরম সিদ্ধি ঐ প্রকৃতিকে দর্শন করা পর্য্যন্ত। ইহা তো নূতন কিছু নহে, জ্ঞানের সীমা এই অবধি গিয়া আটক পড়িলে, জগৎ যে অধিক কিছু পাইল এমন কথা মনে করা ধৃষ্টতা মাত্র, এ দান অন্ততঃ ভারতে বহুবার বিনামূল্যে বিকাইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে, অবধারিত আজ যেরূপ একটানা জীবনে মাঝে মাঝে এক একটা পূর্ণচ্ছেদ দিয়া চলিতে হইয়াছে, ঐরূপ জীবনের উপরেই বড় ছেদ আসিয়া পড়িবে। অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া প্রকৃতি সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, মূলে সেই এক থাকিলেও, অনন্ত রূপে, অনন্ত সম্বন্ধে শত্রু মিত্র, পিতা পুত্র, জায়া কন্যা, নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, জগতের যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থ যেন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই শোভা পাইতেছে। স্থান কালের বৈশ্যে প্রকৃতি সেই পুরুষোত্তমকে লইয়া যখন এত রঙ্গ করিতে পারেন, তোমাকে যে অনন্ত কাল নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইবেন ইহা তো বড় কথা নহে, আশার কথা প্রকৃতির পশ্চাতে যে পরাৎপর পুরুষ অবস্থান করিতেছেন, প্রকৃতি তাঁরই ইচ্ছাধীন। ভগবানের ইচ্ছারূপিনী এই মহামায়াকে জানাই সাধনার প্রথম কথা—ইহারই জন্য আত্মসমর্পণ যোগ। এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী মহাশক্তি পথ ছাড়িয়া না দিলে সাধকের মুক্তি নাই ; তাই শক্তিসাধনার জন্য উৎসর্গ মন্ত্রে আমাদের দীক্ষা লইতে হয়।

কিন্তু ইহাই সবখানি নয়। প্রকৃতির সাক্ষাৎ আমরা যে-কোন সাধনায় লাভ করিতে পারি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া আমার স্বরূপকে পাওয়াই শক্ত কথা। পৃথিবীতে এরূপ 'থিয়োরি' বহুবার প্রচার হইয়াছে—কিন্তু জীবনে ইহা মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই। জীবনের আকর্ষণ কেন্দ্র এইখানে, সেইজন্য মানুষকে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আপনার মধ্যে সেই পুরুষোত্তমকে পাইয়া তাঁর দৈবী প্রকৃতি দিয়া শরীর, প্রাণ মন গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সাধকের চাঞ্চল্য কোন মতেই দূর হইবে না, সাধক কোন সাধনায় মুগ্ধ হইবে না। জীবন-তার ভাগবতময় হওয়া চাই।

রহস্ত এই, ইহার প্রশ্ন করার কিছু নাই। সাধনার সাহায্যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া যায় মাত্র। প্রকৃতিই এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত সহকারিণী, কিন্তু তিনি যখন দেখেন সাধক তাঁহার উপরেও অধিকার বিস্তারে প্রয়াসী, তখন তিনি ভীষণ মূর্ত্তিতে নিজের পায়ে নিজ পতিকে দলার মত মহাকালী মূর্ত্তিতে সাধকের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিতে উদ্যত হন। এই সময় স্বভাবের সহিত আপোষ করিয়াই পরিত্রাণ পাইতে হয়; প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দেবজীবন লাভের স্বপ্ন কার্য্যে আর পরিণত হইয়া উঠে না।

এই অবস্থায় সহায় কি? কেবল ইচ্ছা (aspiration)। নিজের অমরত্বে অটল আস্থা রাখিয়া প্রকৃতির ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া চলা। আজ বাংলার সাধক ঠিক এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; হয় আজ তাঁহাকে ফিরিতে হইবে, না হয়, প্রকৃতির সহিত আপোষ করিতে হইবে, নতুবা প্রকৃতিকে জয় করিয়া শরীর প্রাণ মনে, বিজ্ঞানযোগে সচ্চিদানন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ নামাইয়া আনিতে হইবে।

সাধক ফিরিবে না, প্রকৃতির সহিত আপোষ করিবে না, সে চাহে সচ্চিদানন্দের বিগ্রহ হইতে, ভাগবত জীবন লাভ করিতে, এই শরীরের পশ্চাতে যে নিত্য-সৎ, প্রাণের পশ্চাতে যে নিত্য চিৎ, মনের পশ্চাতে যে নিত্য আনন্দ, উহারই প্রত্যক্ষ রূপ শরীর প্রাণ মনে ফলাইয়া তুলিবে। শরীরকে অমর করিতে হইবে, প্রাণকে অজস্র শক্তিপূর্ণ করিতে হইবে, আর মন হইবে বিকশিত কমলের মত আনন্দের প্রতীক। ভারতের ভবিষ্যৎ দেবজীবনের স্বপ্ন সফল করিতেই সে জন্মিয়াছে।

জীবন লইয়া যাঁরা সংগ্রাম করিতেছেন, স্বপ্নলোকের এই সব মানুষগুলিকে তাঁরা উন্মাদ বলিয়া সমাজের বাহিরে থাকিতেই উপদেশ দেন। এই স্বপ্নের দায়ে ষাট লক্ষ ভারতবাসী বেকার হইয়াছেন, কত লক্ষ লোকের রক্ত চুষিয়া খাইতেছেন, জাগতিক সমষ্টিজীবনের দানের অনুপাতে কল্যাণ যাহা হইয়াছে তাহা খুবই সামান্ত আবার তুরীয় জীবনের নূতন রঙচঙে সংস্করণ দেখিয়া তাঁদের আতঙ্ক অমূলক নহে। কিন্তু আজিকার সাধনা যে জীবনের জন্যই—ভারতের নূতন তপস্তা তো জীবনের কোন স্তরকে উপেক্ষা করিয়া চলিবে না, গতানুগতিক জীবন-নীতি বরং ভাগবত ধর্ম্মকে অস্বীকার করিতেছে—বর্জ্জন-নীতি সাময়িক কল্যাণ সাধন করিলেও মূলতঃ উহা অকল্যাণকেই টানিয়া আনে। আজিকার নূতন যোগ যদি জীবনকে ছাড়িয়া চলে, তাহা হইলে উহাও পুরাতন পথ অনুসরণ করিয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের যে পরিশ্রম, উহার মাঝেও যেমন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সাধনার ভঙ্গী এরূপ হইতে পারে, সাময়িক ভাবে কিছু হইতে বিরত হওয়া; কিন্তু আসলে জীবনের ধর্ম্মকে ভারতের এই নূতন সাধনা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া চলিবে।

যেখানে আত্মসমর্পণ সার্থক হইয়াছে, সেইখানেই আজ প্রকৃতির তাড়া আসিয়াছে। এই তাড়া খাইয়া জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, উহা যদি অধ্যাত্ম স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত অসহিষ্ণুতা হেতু ঘটিতে থাকে, জানিবে ভারতের পুরাতন শক্তি অন্যরূপে তোমায় অধিকার করিতে বসিয়াছে। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি। যোগে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অনেকেই মনে করিতেছেন কর্ম্মের মধ্যে জীবন ক্ষয় হইবে পরন্তু পরম ধন মিলিবে না। ভারতের প্রাণ একদিন যেমন গৈরিকের সম্মোহনে অসি ত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডুল ধরিয়াছিল, হল ছাড়িয়া বনবাস শ্রেয়ঃ করিয়াছিল, শিল্প বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া অজিন পরিধান করিয়াছিল, আজ পরীক্ষাক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপ উদাসীনতা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে—জীবনের দিকে অধিক ঝোঁক দিয়া যাঁরা যোগকে দূরে দূরেই রাখিতে চান,

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তাঁদের ধারণা যে অধিক বদ্ধমূল হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সাধক যেন মনে করিতেছেন—জীবনধারণের উপযোগী ভোগের অভাব হইবে না; ভগবান তাহার প্রতীকার করিবেন। ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও আত্মমুক্তির জন্য দেশের সাধারণ জীবনের গায়ের রক্ত জল-করা উৎপন্ন শস্যে নিজেদের দাবী ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিদানে দেশ কি পাইয়াছে—জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্র যদি জীবনচর্চ্চার ক্ষেত্র হইতে পৃথক হয় আপত্তি নাই, কিন্তু জ্ঞান দিয়া কর্ম্মীর জীবন ভরাইয়া না তুলিলে একপক্ষের অতৃপ্তি যে বিপ্লব সৃষ্টিই করিবে ইহা অবধারিত।

আমাদের কথা কল্পনা নয়, কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়া জীবন বেদের কথাই আমরা বলিয়া থাকি, বুদ্ধিমান মানুষ হয়তো এই অন্তর-বাণী দুর্ব্বোধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁদের যোগ আজ জীবনের জন্য, তাঁরা এই সাধনার মধ্যে যে ছিদ্র আবিষ্কার করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের তাহা ভাল করিয়া জানিয়া সতর্ক হইতে হইবে। এই নূতন জীবন সার্থক করিতে আজ যারা মাঠে হাল চালনা আরম্ভ করিয়াছে, তাঁতে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে, সমুদ্রের বুকে পাড়ি মারিয়া বাণিজ্যবিস্তারে মনোযোগ দিয়াছে, তাদের জীবন যদি পুরুষোত্তমের স্পর্শে দিব্য হইয়া না উঠে, এরূপ কর্ম্মময় জীবনে ভগবান লাভ অসম্ভব—এই কথা বড় মুখ হইতে বাহির হউক না হউক, দুষ্ট লোকে প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তবে কি বুঝিতে হইবে না, নূতনের নামে, আবার আমরা নৈষ্কর্ম্মাকেই আহ্বান করিয়া আনিতেছি—জীবন যে ব্যক্তিও অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে বাকী কাহার আছে? আজ যদি ভারতের একটী জীবনেও সেই অনির্ব্বচনীয় সত্তার পরিপূর্ণ রূপটী প্রকাশ পাইত, সেই সর্ব্বান্তর্যামীর নির্দ্দেশ অভ্রান্ত হইয়া উঠিত, ভারতের এই অবনত অবস্থার কি পরিসমাপ্তি ঘটিত না? জীবন লইয়াই যখন সাধনা, তখন সাধকদের প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনের কাজে মগ্ন থাকিতে হইবে এবং অবস্থাভেদে ভগবান লাভ যদি অসম্ভব হয়, তবে সে সঙ্কীর্ণ ভগবানে জাতির প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমরা বলি, জীবনকে শক্তির বিদ্যুৎ বহ্নিতে রাঙা করিয়া ঐ মাটী চষিয়া পৃথিবীর ধন রত্ন ঐশ্বর্য্য সম্ভার আহরণ করিতে করিতেই ভগবানকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিব। যতদিন শ্বাস বহিবে, শিরায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে, আমরা যেন কর্ম্মবিমুখ না হই, কোন অবস্থার অধীনে আত্মতৃপ্তি লাভ না করি, অন্তরের মণিকোটায় আমার অমর সত্তার নির্দ্দেশ যেন ম্লান হইয়া না পড়ে।

বাংলার একদল সাধককে এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় আত্মদান করিতে হইবে। আমি অভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছি, ফুলের মত জীবন প্রকাশের ভঙ্গী অতি সহজ, শ্বাস প্রশ্বাসের মত সরল। চাই কেবল নিজের উপর অটুট বিশ্বাস, আর সমুদ্রের পথে চলার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। অবস্থা বিশেষের উপর ভাগবত জীবন নির্ভর করে না।

চিঠির টুক্‌রা

—:০:—

(১)

আমার প্রার্থনা—দেশের প্রতি অনুষ্ঠান বৃহৎ হউক, অনন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠুক, কোন ক্ষুদ্র আবেষ্টনে যেন দেশকর্ম্মী বাঁধা পড়িয়া না যায়।

*　　*　　*

আমি চাই ডায়নামোর মত ছড়াইয়া দিতে হাজার হাজার মানুষ বাংলার নানা স্থানে। উল্কার মত তারা ভগবানের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ছুটুক নূতন আলোয় দেশ ভরাইয়া দিক, নাম যশঃ, দলপুষ্টির চিন্তা যেন না থাকে পাওয়া মন্ত্র অবাধে দেশের হৃদয়ে রোপণ করাই যে এখন সাধকের সর্ব্বপ্রধান কাজ।

*　　*　　*

আজিকার সংগ্রাম যে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা লইয়া নহে, মানুষের মনকে যে উন্নত করিতে হইবে, তুরীয়ের সম্পদ ভারে ভারে নামাইয়া মনকে মহান ও গরীয়ান করিয়া তুলিতে হইবে। জীবনের পথ বিঘ্নহীন হোক্, ভাগবত জীবন লাভ কর এবং এই সমুচ্চের পথে জাতিকে লইয়া চলাই যে তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

*　　*　　*

(২)

নরনারীর শিক্ষার ভার আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে, ভারতের সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি আমাদেরই আবিষ্কার করিতে হইবে। অবস্থা মত সকল কাজেরই ব্যবস্থা করা চাই। টানাটানি করিয়া যে কাজ গড়িয়া উঠে, উহা নিশ্চয় তোমার প্রকৃতির বিপরীত কিছু জানিও। ভারতের নিজস্ব কর্ম্ম—উহা সিদ্ধ, আপনা আপনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তোমার কাজ কেবল উৎসর্গ, চেষ্টা করিয়া কিছু করিও না।

নূতন মন্ত্রে যার দীক্ষা হইয়াছে ভবিষ্যৎ তা'র নিকট স্পষ্ট দিবালোকের মতই উজ্জ্বল। কর্ম্ম যেমন মুক্ত, সাধনার সকল আয়োজনও তদ্রূপ হস্তগত হইয়াছে —এক্ষণে চাই সংঘ, যেখানে ভাবের অমর বীর্য্য অনাহত রহিতে পারে। মন্ত্র যদি সত্য হয়, তবে তোমরা আগাইয়া চল, গতির বেগেই জীবনের মলা মাটী খসিয়া পড়িবে, নূতন সৃষ্টি গড়িয়া উঠিবে। দীপ্ত বহ্নিশিখার মত, অন্ধকার দেশের বুক চিরিয়া অগ্রসর হও, পুণ্যময় দিব্য জীবনের অমল প্রভায় দশদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

*　　*　　*

সঙ্ঘ বা সংঘ যেন পাশ্চাত্যের অনুকরণে Institution হইয়া না উঠে, উহার গঠনকালে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভূত হয়, একবার উহা পাকিয়া বসিলে কর্ম্মীর আর তেমন উল্লাস থাকে না, জীবন যেন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। বাঁধন দিয়া কোন কাজ যেন গড়িয়া না উঠে, অন্তরের নিত্য সম্বন্ধে মানুষকে পাইয়াই এই সংঘ সত্য করিয়া তোল।

*　　*　　*

কাজে আগাইতে হইলে—অন্তরের নির্দ্দেশ বাহিরের অবস্থার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়, অন্তরে যে ভাব উদয় হয়, তাহার রূপ দিতে হইলে, স্থান কালের দিকেও দৃষ্টি রাখা চাই। অন্তরে উন্মাদ হইবে, বাহিরে কিন্তু সব দিক দেখিয়া পা বাড়াইবে, অব্যর্থ জীবন প্রকাশ করিতে হইলে, শুধুই উন্মাদ হইলে চলিবে না, বুদ্ধির দানও শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

*　　*　　*

অব্যর্থ যা—তার সকল উপকরণ ফুলের মত

স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে। ভগবানের ইচ্ছা সফল হইতে চেষ্টার প্রয়োজন নাই, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ধীরে ধীরে সহজ ভাবেই সব গড়িয়া উঠে, ভগবানের ইচ্ছাকেই ফুটাইয়া তোল, মানুষের ইচ্ছা শুখাইয়া যাক।

* * *

শিক্ষা বিভিন্ন কর্ম্মসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সার্থক হইবে। দেশের নূতন আজ যে অভিযানে ছুটিয়াছে, ক্রমে দলে দলে মানুষ ঐরূপ কর্ম্মের ঝাঁকা মাথায় লইয়া বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ফেরী করিয়া বেড়াইবে। একজন মানুষের সংস্পর্শে কত লোক আসিয়া থাকে, সকলেই যদি মানুষের ছোঁয়া পায়, আমি বলি আগুনের স্পর্শ পায়, তাহা হইলে কত দ্রুত গুণান্বিত ভাবে জীবনে আগুন ধরিবে বল দেখি? ঘরের এক কোণে আগুন ধরাইতে পারিলে সব ঘর পুড়িয়া ছাই হইবে। মশাল জ্বালিয়া ছুটিয়া যাও, দুই পার্শ্বে, সম্মুখে, যাহাকে পাও, আগুন ধরাইয়া দাও, বাংলার প্রাণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠুক, যা আছে ছাই না হইলে, মানুষ ভাগবত প্রেমে উন্মাদ হইবে না, উন্মাদ না হইলে নিজের মুক্তিও যে অসম্ভব, অন্যের মুক্তি কা কথা।

* * *

আমি কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা বলিতেছি না, তাঁর ইচ্ছায় জীবন মরণ পণ করিয়া দাঁড়াইতে বলিতেছি। জীবন হউক ভগবানের হাতে-ছোঁড়া তীরের মত, সে কেবল ছুটিবে আনন্দে, উল্লাসে, সবেগে, আর কিছু নয়। লক্ষ্য স্থির করার কর্ত্তা ভগবান।

* * *

তোমরা চারিদিকে যেরূপ ছোট ছোট বিদ্যাপীঠ গড়িয়া তুলিতেছ—ঐরূপ অসংখ্য বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া দাও, প্রত্যেকটীর প্রতিষ্ঠান অটল হউক; কোন বাধায় যেন উহা ভাঙ্গিয়া না পড়ে, শিক্ষক যাঁরা তাঁরা যেন মৃত্যুপণ করিয়া বিদ্যাপীঠের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রত্যেক যদি শুদ্ধ হয়, শক্তিমান হয়, শিক্ষা-সমস্যা দূর হইবে। সর্ব্বাগ্রে ছাত্র নয়, চাই শিক্ষক। আজ শিক্ষকের জীবন সাধনা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এক একটা স্তর ধরিয়া উহাকে নিখুঁত করিয়া তোল।

* * *

যোগের আগে চাই ক্ষেত্র প্রস্তুত। গোড়া হইতেই তাই চাই শিক্ষার আয়োজন। দেশকে শিক্ষা দিবার ভার এই মুহূর্ত্তে মাথায় তুলিয়া লও। জগতের অপরাপর দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা কি শোচনীয় বল দেখি! শিক্ষা না পাইলে যোগ নিষ্ফল হইবে।

* * *

যোগ দিবার ধারা ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভেদে ইহার ব্যবস্থা চাই। আজ তোমাদের মধ্যে যারা কাঁধে লাঙ্গল লইয়া মাঠে দাঁড়াইয়াছ, সহকর্ম্মী কৃষকের কাণে ভগবানের মন্ত্রটী ফুঁকিয়া দাও। তাহাদের বুঝাইয়া বল তাহারা ভগবানের যন্ত্র। যদি তুমি ইহাদের ভালবাসিতে পার, তোমার ভালবাসা যদি নিঃস্বার্থ হয়, তবে সে তোমায় বিশ্বাস করিবে, তোমার বাক্য বেদ বলিয়া সে মাথায় তুলিয়া লইবে। কাগজ লেখালিখি বুদ্ধির কসরৎ—আমরা যে যোগের কথা কহিয়াছি উহা জীবন দিয়াই সিদ্ধ করিতে হইবে।

* * *

সে কাজে তো জীবন তোমরা দিয়াছ, আজ আবার উত্তেজনার হাওয়ায় মুখ ফিরাইয়া অনর্থক শক্তি ও সময়ের অপব্যয় কর কেন! বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, ম্যালেরিয়া বিসূচিকার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভিতরের কথা কি জাতির কর্ণে ভাগবত নামের অব্যর্থ মন্ত্র প্রদান করা নয়? তোমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাগবত দান যদি সত্য সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে,

তোমরা উহাই প্রকাশ করিয়া চল। আমার জীবন-ভোর সাধনার এই অভ্রান্ত নির্দ্দেশ কি তোমাদের অন্তরে অগ্নি-অক্ষরে ক্ষোদিত হয় নাই? আজ আমার ভাষা নাই; যদি তোমাদের জীবন সাধনা ব্যর্থ হয়, তবে কি বুঝিব না আমারই জীবনে ভগবানের ছদ্মবেশে সয়তান বাসা করিয়াছিল?

* * *

(৩)

আজ এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তোমাদের নূতন করিয়া এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য গতবারে তোমাদের জীবনবীণায় যে সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে, সে সুর আমার হৃদয়বীণায় যেন কিছু বেসুরা ঠেকিয়াছে। হয়তো আজিও নিজেকে নিঃস্ব করিয়া দিতে পারি নাই—ইহাই তাহার লক্ষণ।

* * *

কিন্তু সত্যই কি তোমাদের স্বরূপ যাহা তাহাই প্রকাশ করিয়াছ—অথবা অতি বড় সুরজ্ঞ ব্যক্তি অসতর্ক হাতে ছড়ি গাছটী এস্‌রাজের তারে আঘাত করিয়া যে অর্থহীন ধ্বনির সৃষ্টি করে, ইহা তদ্রূপ অনবধানতার ব্যর্থ বাণী, অন্ধকারে হাতড়াইয়া বীণার তারে অসতর্ক হস্তক্ষেপ!

* * *

কিন্তু যে-ওস্তাদের মধুর মূর্চ্ছনায় বাংলার একদল মানুষ সকল ছাড়িয়া আজ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সেই স্বর্গের বীণাখানির উপর এরূপ অত্যাচার যে কেবল তোমাদের ঔদাসীন্যে বা অসাবধানে ঘটিয়াছে এমন বিশ্বাস আমি করি না। হইতে পারে—ইহার মধ্যে ছিটেফোঁটা চাঞ্চল্য ও আলস্য আছে, কিন্তু তবুও আমার মনে হয় জীবনের বন্ধন বুঝি কোথাও আলগা হইয়াছে অথবা আরও উর্দ্ধগ্রামে সুর বাঁধিয়া লইবার কালে খোলা তারে হাত পড়িয়াছে। যাই হউক, বেসুরা যে বাজিয়াছে ইহা অবধারিত।

* * * *

জীবন পর্দ্দায় পর্দ্দায় তুলিয়া ধরিবার কালে এরূপ হওয়া অসঙ্গত নয়; জীবন লইয়া যেখানে অগ্নিক্রীড়া চলিয়াছে, সেক্ষেত্রে প্রকৃতির আঘাত উপেক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে। অঙ্গে [illegible]লেও—লক্ষ্য যেন সম্মুখের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। দেশে কত বড় বড় অনুষ্ঠান বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়াই জীবন শেষ করিয়াছে! বাধাকে অতিক্রম করিবার কৌশল অবলম্বন করে নাই।

* * *

আমরা যেন বাধাকে ডাকিয়া না আনি। বিঘ্নহীন পথে চলিব এমন দুরাশা যে করে সে ভীরু। সহস্র বিঘ্ন পদতলে দলিয়াই আগাইব, কিন্তু তাই বলিয়া বিঘ্নকে বরণ করিয়া ঘরে আনিব কেন? দেশের প্রাণে এখনও যে পুঞ্জীকৃত জ্বালা জমাট বাঁধিয়া আছে, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগে তাহার নিরসন যে একেবারেই হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু ভারতের শুদ্ধি বুঝি ভিন্ন ভঙ্গীতে সাধিত হইবে। দেশের হাওয়ার মধ্যে আজ যে অশুদ্ধতা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অতৃপ্ত অশরীরী আত্মার যে বুভুক্ষু বহ্নি-নিশ্বাস ছুটাছুটি করিতেছে, নূতন সাধককে তাহা নিঃশেষে পরিপাক করিয়াই বাঙালীর তরুণ জীবনে নব জাতীয়তার অক্ষয় কর্ম্মের অমর বীর্য্য রোপণ করিতে হইবে।

ভারতের রাজনীতিক সাধনা মায়ার অপরূপ ফাঁদ। কত জীবন ইহার ঘূর্ণাবর্ত্তে চূর্ণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালী নূতন জীবন সাধনায় ব্রতী হইয়া যাহাতে নিকলুষ দেবজীবন লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যাপকভাবে কিছু করার প্রেরণায় যদি তোমরা উদ্বুদ্ধ হইয়া থাক, তাহা হইলে আর আমার বলিবার কিছু নাই। জাতির শ্বাসে শ্বাসে যে

হইয়াছে ওতঃপ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা গ্রাস করিয়া জাতিকে ভাগবত ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে হইবে। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি সকলই নূতন ভঙ্গীতে মোড় ফিরাইতে হইবে। এই বিপুল কর্ম্মের জন্য আমাদের জীবনকে আগুন-শক্তি ও নিষ্পাপ করিয়া তোল, এবং এই ভাবেই দেশকে উদ্বুদ্ধ কর, বর্ত্তমান রাজনৈতিক সাধনার সীমান্তে আর দাঁড়াইবার আবশ্যক কি?

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

শিক্ষাসংস্কার কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়।

শিক্ষাসংস্কার অত সহজ নয়। এখানে জীবন নিয়ে খেলা। জীবনের যত জটিলতা, যত সমস্যা সবই এর পিছনে লুকিয়ে আছে।* তাই এখন বোধ হয় পাঠক ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন, যে এ শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করতে গেলে কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে।

*

* Education is the realisation of life in a gradual process. Life is the realisation of education in a concentrated process.—শিক্ষাটা জীবনের 'জন্যে' শুধু নয়, শিক্ষাটাই জীবন। কেবল এই অবস্থায় মানুষ আস্তে আস্তে শেখে ও একটু একটু করে 'কর্ম্ম করে' এই মাত্র। জীবনের যাহা কিছু বিকাশ দরকার তার আরম্ভ শিক্ষাজীবনে। তাই দুই একটা শিক্ষার জন্য, শিক্ষালয়ের গণ্ডীটা একটু নিবদ্ধ থাকে সত্য, নইলে তাই কোন গণ্ডী টানা যায় না। তাই যেখানে সমাজ, ধর্ম্ম, আমোদ, উৎসব আদি নিয়ে, জাতি বিদ্যাপীঠ তৈরী করে চলেছে আর বিদ্যাপীঠও ঐ সবের অন্তস্তলে শিকড় গেড়ে তা'থেকে রস নিচ্ছে আর তার নব আবিষ্কারগুলাও ঐ জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেইখানেই বিদ্যালয় সার্থক হয়েছে।

জীবনে মানুষকে যেমন করে চলতে হবে, বা মানুষ চলে, তেমন পদ্ধতিতেই মানুষের শিক্ষাটা হওয়া দরকার। শিক্ষার অবস্থায় মানুষ একটু একটু ভাববে, গড়বে, চালাবে, হুকুম করবে, হুকুম শুনবে, বিচার করবে, যুদ্ধ করবে, বিশ্বাস করবে, তর্ক করবে, ধ্যান করবে, লিখবে পড়বে, আঁকবে, সাজবে, খেলবে, নাচবে, গাইবে, রাঁধবে, কষ্ট করবে, সুখ করবে বেড়াবে, ইত্যাদি ইত্যাদি—যাতে তার জীবনটা সব রস পেয়ে চারিদিকে ফ্যাঁকড়া বা'র করে' ফুটে উঠতে পারে। তবেই মানুষ জীবনে জীবন্ত প্রতিভা নিয়ে একটা কোন বিশেষ কর্ম্মে সফল হবে। শরীরের সামর্থ্য, প্রাণের সংযম ও তেজঃ, চিত্তের প্রেরণা, মনের স্থৈর্য্য, বুদ্ধির বিচারশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বোধশক্তি (Intuition) চরিত্রের দায়িত্ববোধ, কর্ম্মৈষণা, সাহস, প্রেম ইত্যাদির বিকাশসাধন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার সহিত একটু লেখা পড়া, কাজ কর্ম্মের আরম্ভ হলেই হল। জীবনে মানুষ দরকার মত ঐ সব শক্তি খাটিয়ে সব অর্জ্জন করে, বুঝে, শিখে আয়ত্ত করে নেবে। শিক্ষাজীবনে যে কর্ম্ম, যে অর্জ্জন, যে শিক্ষা আস্তে আস্তে আরম্ভ হয় ও ক্রমে ক্রমে তাড়াতাড়ি চলে, জীবনে সেগুলো দ্রুতবেগে (Concentrated process) চলে। সেইজন্য জীবন আর শিক্ষার মধ্যে আমরা কোনো ভেদরেখা টানিনি। সত্যই কোন ভেদরেখা নেই—কেবল তফাৎ যা সে ঐ Realisation' এর Speed' এর।—

ইতি-অনুবাদক।

আমরা অবশ্য বলি না যে এই পরিবর্ত্তন একেবারেই অসম্ভব। জাবনে যদি অদম্য উচ্ছাশা থাকে ত অসম্ভব কি আছে। কিন্তু খেয়ালবশে বৃথা সংস্কারপ্রচেষ্টা না করে' প্রথমে জানা দরকার কোনটাকে বদলাতে হবে, কেমন করে' বদলানই বা সম্ভব—আর তার পরিবর্ত্তে কোনটাকেই বা বসাতে হবে! একগুঁয়েমি করে' সেটা না জেনে না বুঝলে নামের পরিবর্ত্তন সাধন হতে পারে, কিন্তু জিনিষটা বদলাবে কিনা এটা সন্দেহ। ঐ রকম বৃথা লোকের মনে গোলমাল সৃষ্টি করবার দরকার নেই। তাতে শিক্ষার উৎকর্ষ ত হবেই না বরং অপকর্ষই হওয়া স্বাভাবিক।

শিক্ষা-কমিশনের লোকেরা ঐ জিনিষগুলোকে তলিয়ে দেখেন নি বলেই আমাদের সমস্যাগুলোর সত্য স্বরূপ নির্ণয় করবার দরকার আছে।

তবে এ কমিশন যে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা যায় না। এখানে অনেক কথাই বেরিয়ে পড়েছে, যে সব গোল আছে বলে' হয়ত আমরা সন্দেহ করতে পারতুম কিন্তু কখন প্রমাণ করতে পারতুম কি না সন্দেহ। এই সব বাক্ বিতণ্ডা থেকে মানুষের মনের অবস্থাটা ভাল করেই বোঝা গেছে, আর এখন দেখা যাচ্ছে যে বা'র থেকে ব্যাধিটা যত সামান্য বলে মনে হত, সত্যটা তার ঠিক উল্টো।

এই কমিশনের শেষে একটা সংস্কারপ্রস্তাব "ডেপুটী মেম্বরে" পেষ করা হয়েছিল, আর প্রায় নির্ব্বিবাদেই সেটা পাশ হয়ে গেছে। এই অর্থহীন প্রস্তাবগুলির সমর্থন করতে গিয়ে শিক্ষাসচিব অনেক অর্থপূর্ণ কথা বলেছেন। অবশ্যই তাঁর মতন আধ্যাত্মিক মস্তিষ্ক নিয়ে ঐ প্রস্তাবগুলোর বাস্তব অর্থশূন্যতা ভাল করে' বুঝে ওঠা শক্ত। তবে দুই একটা টিকাটিপ্পনি যে কাটা হয় নি এমন নয়। ডেপুটী মঃ মাসে বলেছেন—"এটা যে ভাঁড়াটের মন ভোলাবার জন্যে বাড়ীর বা'রটা বেশ করে চূণকাম করার বা রং করার মতন হল, ভেতরে যে ছুঁচোর কাণ্ড সেটা যে প্রায় সবটাই রয়ে গেল।"

সত্যই এ সব কমিশনের সংস্কারপ্রস্তাবাদি আমাদের একেবারেই লাগে না- আমাদের একেবারেই আকর্ষণ করতে পারে না। শিক্ষার ধরণটা, পদ্ধতিটা যদি না বদলান হয়, ত সব যেমন আছে তেমনই থাকবে। আমি আবার বলছি পরিবর্ত্তনটা সেদিনই একটু সম্ভব হবে যেদিন আমাদের—অন্য কিছুর নয়—শিক্ষার পদ্ধতিটার পরিবর্ত্তন না করলেই নয়, এই কথাটা ছেলেমেয়েদের বাপ মা, শিক্ষক ও গভর্ণমেণ্টের মস্তিষ্ক ভেদ করে ঢুকবে। এ রকম ঢের কমিশন আমাদের দেশে বসেছে, তাদের রিপোর্ট বোধ হয় এখন দপ্তরের চাপাচাপা পড়ে গেছে। একবার দপ্তরে ঢুকলে ও'সব রিপোর্ট আর সহজে বের হয় না। আমার মতন এ রকম বিকট অনুসন্ধিৎসা ও ধৈর্য্য না থাকলে মানুষ এই ছ'খানা বৃহদাকার গ্রন্থ পাঠ করতে পারে না। আমার মনে হয় আমাদের দেশে অতি অল্প লোকই ঐ রিপোর্টটা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সবটা পড়েছেন।

শিক্ষা ও সাধনার (education) কথাটা নিয়ে দেশের লোক উঠে পড়ে লেগেছে দেখেই আমি এই কথাস্তূপ থেকে দরকারী কথাগুলো মাত্র নিয়ে, প্রমাণগুলোকে পর পর সাজিয়ে, তাদের একটু আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। দেশে যত বড় বড় লোক ছিল তাদের কথাও আমি পুস্তকে উদ্ধৃত করেছি। এদের কথা শুনলে আমাদের মত "বড়র গোলামের" দেশে হয় ত বাপ মায়ের একটু মতপরিবর্ত্তন হতে পারে।

এই লোকমত পরিবর্ত্তনটাই শিক্ষাসংস্কারের প্রথম সংস্কার—আর এই সংস্কারটা এখনি আরম্ভ করা উচিত। যদি কখন এই লোকমতের পরিবর্ত্তন হয় তখনি শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে।

কাজটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন। তবে অসম্ভব নয় এটা ঠিক। যে সব বড় বড় ধর্ম্ম পৃথিবীটাকে ওলট পালট করে দিয়েছে সেগুলোর প্রতিষ্ঠা করতে বেশী লোকের দরকার হয় নি। কিন্তু দুশজন ত দরকার হয়েছিল।* এই যে এত শিক্ষা নিয়ে গোলমাল— যে গোলমালে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণটা পর্য্যন্ত যায় যায় হয়েছে—তার পেছনে আছেন একমাত্র "এক্সপ্লোরেটর" (explorator) ভাঁলো, যাঁর গালাগাল খেয়ে অস্থির হয়ে শিক্ষাসচিব কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছেন। উনিও সংস্কারের সত্য পথটা আমাদের দেখাতে পারেন নি কিন্তু তাহলেও শিক্ষার দোষগুলো তিনি খুব ভাল করেই দেখিয়ে দিয়েছেন। "পিয়ার এরমিতের" মতই তিনি দেশের লোকের উদাসানতাটা নির্ম্মম ভাবেই ভেঙ্গে দিয়েছেন—যার জন্যে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বড় বড় নামজাদা লোক ছিল সকলেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে' তাঁদের সাধের সাজান ঘর ভাঙ্গতে বসেছেন।

যে দিন দেশের লোকে ভাল করে' বুঝতে পারবে যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কি ক্ষতি করছে আর অন্যান্য দেশে এই শিক্ষার ভিতর দিয়েই কি সুফল ফলছে, সে দিনই একটা আঘাতে আমাদের মান্ধাতার আমলের শিক্ষাপদ্ধতি ভেঙ্গে গুঁড়োনাড়া হয়ে যাবে। তখন এটা, অন্তঃসারশূন্য সহস্র বৎসরের জীর্ণ প্রাসাদের মত, অতীত যুগের লুপ্ত কবরের আকৃতি-মাত্র-সম্বল নবদেহের মত, স্পর্শ মাত্রেই অন্তর্হিত হবে। সেই দিনই আমাদের শিক্ষাটার সার্থকতা আসবার সম্ভাবনা হবে।

একটা যথাযথ শিক্ষা পেলে এতদিনের অবনতি থেকেও লাতিন জাতটা এখনি উন্নতি পথে ধাবিত হতে পারে। জার্ম্মাণেরা যা করে সফলকাম হয়েছে আমাদের সেই প্রচেষ্টাটা করতেই হবে। 'লেবনিজ'এর এই কথাটা তারা গভীর ভাবেই চিন্তা করে দেখেছে —"আমার হাতে কেবল শিক্ষাটা ছেড়ে দাও আমি এক শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপটাকে বদলে দোবো।"

৬ষ্ঠ অধ্যায় †

[বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাধনা সম্বন্ধে ধারণার অনিশ্চয়তা]।

লিখতে পড়তে শেখার চাইতে শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে জীবন-সাধনাটা মানুষের হওয়া উচিত, সেটা ঢের বড়। বিত্তের চাইতে মানুষের 'চরিত্রটা' জীবনে

* শক্ত মানুষ, আত্মবিশ্বাসী মানুষ, একাত্ম হলে কোন কাজই আটকায় না। খৃষ্টের ১২ জন শিষ্যের ধাক্কা আজও সাহারার মরুভূমি পার হয়ে' হিমালয়ের জঙ্গল ভেদ করে' ভক্ত খুঁজতে চলেছে। ধন্য ছিল তাদের বিশ্বাস।
পঞ্চ পাণ্ডবে কুরুক্ষেত্রটা জিতে নিলে। ধন্য ছিল তাদের একাত্মতা।
পাঁচটি শিখের আত্ম-বলিদানে পঞ্চনদ জেগে উঠে ছিল। ধন্য তাদের ত্যাগ। ধন্য তাদের শক্তি।
একটী বীর আর একটী সাধক মিলে মহারাষ্ট্রকে জাগিয়ে তুলেছিল। ধন্য তাদের মিলন।
—ইতি অনুবাদক।

† সমগ্র তৃতীয় ভাগটা ও চতুর্থ ভাগের চারি অধ্যায়, প্রায় ১২৯ পাতা অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হল। এইখানে বস্তুতন্ত্র সত্য নিয়ে শিক্ষার দোষ গুণ বিচার করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় বাঙ্গালী পাঠক বস্তুতন্ত্র সত্যকে যতটা ঘৃণা করেন ও উপেক্ষা করেন তার চাইতে বুঝি কিছুতেই তাঁর অধিক বিতৃষ্ণা নাই। বিশেষতঃ একটী বিষয়ের সকল দিকের প্রমাণ নিয়ে বিচার করে' বুঝতে বললে তাঁর sea-sickness আসে। Detail'এ ত তিনি যেতেই চান না। আর অনুবাদকে তিনি চর্ব্বিত চর্ব্বণের মতই ঘৃণা করেন। এরূপ (সম্ভবতঃ ভ্রান্ত) ধারণাবশে সত্যি fact নিয়ে বিচার ছেড়ে দিয়ে একেবারে constructive কথার একটু আগু থেকে অনুবাদ আরম্ভ করলুম। আমার বাংলার পাঠক সম্বন্ধে উপরি উক্ত ধারণা একেবারেই ভুল হলে পরম কৃতার্থ হব।
—ইতি অনুবাদক।

সাফল্য লাভ করবার জন্যে বেশী দরকারী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় লেখা পড়া শেখাতেও যেমন মজবুত 'সাধনার' ভেতর দিয়ে চরিত্রটা গঠন করতেও তেমনি মজবুত।

এই 'সাধনার' পদ্ধতিটা ভাল কি মন্দ বিচার করাই বৃথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষাসাধনা' সম্বন্ধে কোন বিশেষ ধারণাই নেই। অনেককাল থেকেই তার বিশ্বাস যে সাধনা বা চরিত্র গঠনটা বইপড়ে আর নীতিকথা মুখস্থ করেই বুঝি ঠিক হয়। এই ভুলটা এখন ভাঙলেও সত্য মানুষ করবার পথটা কি তা এখনও সে জানে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শতমুখে শিক্ষাসাধনার গুণ গেয়েই তার কর্ত্তব্য এক রকম শেষ করছে।

'মানেভরিয়ে' সামান্য লোক হলেও কমিশনরদের ঠিক জবাবই দিয়েছেন—"শিক্ষাসচিবের ইস্তাহার থেকে আরম্ভ করে' পুরস্কার বিতরণের বক্তৃতায় পর্য্যন্ত "ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ" 'পাঠ'-পড়ার মতন সকলে এক বাক্যে মুখস্থ বলে যাচ্চেন 'যে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশে মানুষের মতন মানুষ এবং সংনাগরিক (citizen) তৈরি করা।' কিন্তু ঐ পাঠ পড়ার বাইরে এলে ত কিছুই দেখি না। দেশ যে মানুষ হয় নি তাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুধু কি বিশ্বাস করে' বসে থাকলেই মানুষ গাছ থেকে পড়বে? আমরা ঐ বিশ্বাস বশে করেছি কি?"

সত্যিই এই শিক্ষাসাধনার জন্যে আমরা কিছুই করি নি। কেবল এই সাধনা চাই, মানুষ চাই বলে' বক্তৃতা দিয়েছি আর বক্তৃতা শুনেছি। ফলটা যা হয়েছে তা পরবর্ত্তী কথাগুলো পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। "আমাদের ফ্রান্সে শিক্ষাসাধনা খারাপ বলেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে এত গোলযোগ।"

যা হ'ক এই 'স্বপনের রাজ্যের' আদর্শ শিক্ষা-সাধনার কথা অনেক করে' বলে' কমিশনররা হঠাৎ সেটা কি রকম করে' করতে হবে তা বলতে ভুলে গেছেন। অনেকেই মনে করেন শরীরের কসরৎ দিয়েই এই সাধনাটা ফুটে বেরুবে। তাঁরা সকলেই আমাদের 'জীমন্যাসটিক'টা বেশী নেই বলে' কেঁদে আকুল হয়েছেন। সত্য কথা বলিতে কি শিক্ষাসচিব এর জন্য সহস্র লম্বা লম্বা ইস্তাহার জারি করলেও, কাজে তার কিছুই কেউ করে নি। এই ইস্তাহারের চাকচিক্যে কেউ যেন সত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করবেন না।

দার্শনিক 'বুত্র' বলেছেন—"যদি আমার সময় থাকত ত একবার শরীর-কসরতের কথা একটু বলতুম। সত্যই এই শিক্ষাটা আমাদের দেশে নাই —এটা খুব অন্যায়। আমি চাই শরীরের কসরৎটার উপর লেখাপড়া শেখার মতন সমান জোর দেওয়া হ'ক। এমন কি প্রথম দুচার বৎসর লেখাপড়ার চাইতে এই কসরৎটা বেশী করালে বরং খুবই ভাল হয়। জার্ম্মেণীতে এই শিক্ষাটার কদর কম নয়। এটাকে গ্রীক, অঙ্ক আদি শিক্ষার সমস্তরে উন্নত করা হয়েছে। সেখানে এটা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি জার্ম্মেণীতে দেখেছি একই শিক্ষক গ্রীক এবং জীমন্যাষ্টিক শেখান। আমার মনে হয় এই রকম উদাহরণই আমাদের দরকার। শরীরের কসরৎটার অভাবে আমার মনে হয় আমাদের জাতি একদিন ভীষণ বিপদে পড়বে।

কথাগুলো খুবই সত্য, কিন্তু শরীরের কসরৎটা শিক্ষাসাধনার একটা ছোট অঙ্গ মাত্র। অবশ্য জীমন্যাসটিক করে জনে জনে 'বামমূর্ত্তি' হলেও হতে পারে, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না কেমন করে' এই রকম কসরতের ভিতর দিয়ে সাধনার সব গুণগুলো বিকশিত হবে,—কেমন করে' কর্ম্মেষণা, অধ্যবসায়, বিচারশক্তি, আত্মসংযম, ইচ্ছাশক্তি আদি এর ভেতর দিয়ে ফুটে

উঠবে। যতই কর্ম্ম কর, আর vocational training চালাও কর্ম্মপ্রতিভা বা কর্ম্মের প্রতি ভালবাসা কিছুতেই আসবে না। তা'হলে ক্রীতদাসেরও ঐ গুণগুলো ভাল করেই ফুটত। *

মীমাংসা

—:০:—

জগতের প্রত্যেক সমস্যাই যেন মীমাংসা মাথায় করিয়া মানুষকে ব্যস্ত করিয়া তুলে। মানুষের মনে যে প্রশ্ন জাগে, কতদিনে যে তাহার মীমাংসা হয় তাহা মানুষের প্রকৃতি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, তজ্জন্য মানবের অন্তর দেবতা ধীরপদবিক্ষেপে তাহার প্রকৃতির সাথে লীলারসে আগে আগে চলিতেছেন, কিন্তু মানুষের পোড়া মনে যদি একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠে ত তাহার প্রাণটা কেবল সেটাকে গিলিয়া খাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে থাকে।

কিন্তু পারে কি? প্রকৃতির মেজাজ বুঝিয়া মানুষ প্রাণের ক্ষুধা ঝালায় না—মানবের প্রাণ কেবল ক্ষুধা লয়ে 'ওম্ স্বাহা' 'ওম্ স্বাহা' করিয়া জগৎটা পর্য্যন্ত তাহাতে দোলাইতে চায়, কিন্তু তাহার শক্তি যে সে জানে না, কেবল তাথৈ তাথৈ নৃত্যে বালকের ন্যায় উদরপূরণের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। হায় প্রাণ! পেটটুকু লইয়া তুমি জগৎকে এত মাতাও কেন?

প্রাণের ঠাকুর যদি জাগিয়া থাকে—তোমার অন্তরের দেবতা যদি বিশ্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট হইতে তোমাকে আহ্বান করে, তবেই না তুষ্ট "ক্ষুধার" মধ্যেও যে ঠাকুরের চরম চরিতার্থতা

* অবশ্য জীমন্যাসটিকের দ্বারা মানসিক শক্তি খুব বিকশিত হয় বলে' মনে হয় না। কিন্তু এমন এমন খেলা আছে, যেখানে শরীর সঞ্চালনের সঙ্গে চরিত্র গঠিত হয়—সঙ্গেই অনেক মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন ও দুষ্ট সংস্কারের নিরসন হয়।

ফুটবলে—মানুষকে আপন কৃতিত্ব ভুলে' দলের জিতের দিকে লক্ষ্য দিতে হয়। এই থেকে মানুষ ব্যক্তিগত অহংকে একটু ছোট করে' সমষ্টির স্বার্থের জন্য ত্যাগ করতে শেখে। অবশ্য শুধু বল নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করলে কোন সৎগুণই লাভ হয় না এটা ঠিক।

হাডুডুতে—ফুটবলের উপরি উক্ত গুণ ত হয়ই, তার উপর রেখাবদ্ধ মাঠে একজন অধিনায়কের (Captainএর) কথা শুনে খেললে সেদলকে হারান বড় শক্ত। এখানে মাঠটা ছোট বলে বেশ একজন খেলোয়াড় খেলাটাকে আপন কৌশল (policy) মত গুছিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তা'ছাড়া এখানে একটা অদ্ভুত ধৈর্য্য চরিত্রে ফোটে। অধীর দলকে হারানর মত সোজা আর কিছু নেই। অবশ্য অনন্ত বিস্তৃত মাঠে ছুটাছুটি করলে ওসব কোন গুণই হয় না এটা নিশ্চয়। সেই রকম—নাম কাটাকাটি খেলায় Intuition বাড়ে। কানামাছিতে observation করতে বাধ্য হতে হয় আর instinct ও বিকশিত হয়। ইত্যাদি।

যেমন বই পড়লেই শিক্ষা হয় না, সে রকম খেললেই সৎগুণ লাভ হয় না। কিন্তু সত্য পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হলে, বই পড়েও জ্ঞানলাভ হয় এবং খেলেও চরিত্র গঠন হয়। —ইতি অনুবাদক।

আছে, তাহা তুমি পাইতে পার। প্রতিক্ষণে মানবের প্রাণ যদি একথা স্বীকার করিয়া না চলে, এই মহা আবির্ভাবের জন্য তাহার চঞ্চল প্রকৃতি যদি চপলতা ছাড়িয়া বিশ্বের ঔদার্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে মগ্ন হইয়া না যায়, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। মহা আদর্শের সাথে প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া আজ কত প্রাণই যে ধূলায় লুটাইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে! প্রাণের ঠাকুরকে না ধরিয়া প্রাণের ক্ষুধা ও উত্তেজনায় কত জাতই যে বিশ্বে মথিত হইয়া গেল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণে ইতিহাস ভারবহ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাণের দাপটে চমক লাগিয়া যায়। ভীরুতার মধ্যে বীরত্বের আস্বাদ গ্রহণে কাপুরুষের ধমনীও নাচিয়া উঠে। সারা শরীরে বীরত্বের কাড়ানাগারা ব্যক্তিকে, সঙ্ঘকে, জাতিকে কত ঘুরপাকই না খাওয়াইয়া দেয়। তজ্জন্য আর্য্যসভ্যতার উপাসক আজ উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের জাগ্রত প্রাণকে সংযত করিতে চাহিতেছেন, পূত প্রাণের স্বচ্ছ খেলাই তিনি চান। স্বচ্ছ সলিলে যেমন জলগর্ভের প্রত্যেক বালুকণা জলসিক্ত রূপের আভা লইয়া নয়ন সার্থক করে, তদ্রূপ সংযত ও বিশুদ্ধ প্রাণে ঠাকুরের রূপবিকাশে তোমার জন্ম সার্থক করিতে হইবে। তোমার প্রাণের ঠাকুর জাগিয়া—আত্মার পরমাত্মীয় তিনি—ভারতকে যে পরম কেন্দ্রে পরিণত করিতে চান, এ আহ্বান যে মুহুর্মুহু আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে! ভারতের প্রাণ স্থির হও, সমাহিত হও, আত্মপথ নির্ণয়ে তোমার অবলম্বিত পচা ও পুরাতন পথ ছাড়িয়া দাও—পূর্ব্ব দিকে তাকাও দেখি ?

(২)

দেখ দেখি উষারাণী গণ্ডদেশে কাহার রক্তিম আভা লইয়া পুলকে তোমার দিকে চাহিতেছে, প্রফুল্ল কপোল'পরে যে-সূর্য্য সোহাগের রাগ হানিয়া নববধূ উষাদেবীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, তোমার হৃদয়-'পরেও সেই সূর্য্য রক্তিম রাগে লীলা করিতে চায়! তুমি দূরে পড়িয়া আছ, সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধ হইতে কিরণ বিলাইয়া তোমাকে উপরে তুলিতে চান—আজ ধমনীতে যে উষ্ণতা অনুভব করিতেছ ও-যে ঐ সূর্য্য-রশ্মির অবহেলে বিতরিত কিরণমালারই তেজোচ্ছ্বাস—ঐ উচ্ছ্বাসে তোমার উচ্ছ্বাস মিলাইয়া লও, তুমি জগতের কার্য্য সারিয়া সুখে অস্তাচলে গমন করিবে, নচেৎ দিবা দ্বিপ্রহরের উত্তাপই তোমার মস্তিষ্কের পরম শত্রু হইয়া উঠিবে, তুমি পাগলের ন্যায় দিনদুপুরেই অস্তাচলের অভিনয়ে সকলকে মিছামিছি বেদনায় বিঁধিবে।

ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য জগতের সকল তেজঃ গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেছে, কিরণমালায় জগতের প্রাণ বাঁধা, জগতকে উদ্ধার করিতে হইলে সূর্য্যালোক হইতে রশ্মিকে আনিতে হইবে। ঊর্দ্ধ-রেতা হইয়া ঋষিকুল যেমন সহস্রদলে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মি ফেলিয়া অরবিন্দ ও রবীন্দ্রের বিপুল আনন্দসম্ভাষণে জগৎকে আনন্দে ও রসস্রোতে ভরাইয়া দিয়াছিলেন, আজও সত্য স্বাধীনতার রশ্মি ফেলিয়া জগৎকে ধন্য করিতে হইলে ভারতকে উপরে উঠিতে হইবে। সূর্য্য-মণ্ডলে ভারতরাণীর সমাবেশ যে চাই। আজ অন্ধকারের মধ্যে বাজ হানিয়া হানিয়া ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে—বক্ষ বিদীর্ণ হউক—বিদীর্ণ বক্ষ হইতে আত্মার অমরত্ব ফণা তুলিয়া ধরিতেছে, বক্ষপঞ্জর হইতে শত সাধনার লুক্কায়িত মাণিকে সর্পের মস্তক ভূষিত কর—মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি ডমরু ধ্বনির ন্যায়—সর্প ফণা তুলিয়াই থাকিবে, পারিবে না কি, উপরে বাজের চাহনির উপর চাহিয়া, পারিবে না কি, অন্ধকারের গর্ভ ভেদ করিয়া সূর্য্যালোকে গমন করিতে? তাহা যদি না পার ভারত উদ্ধার, বিশ্ব উদ্ধার তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। বজ্রপাতের নিষ্ঠুর শব্দের সহিত শব্দ মিলাইয়া নিশাচর জীবের ন্যায়

চীৎকার করিয়া কোন ফল হইবে না। জ্ঞানের দরজায় বিপুল ধাক্কা দিয়া মহাস্বর্গের আপন কোঠাতেই প্রবেশ কর, তাহার পরে যা করণীয় তাহার জন্য ভাবিও না। যাহা কিছু সবই উপর হইতে নামিয়া আসিবে।

(৩)

চীৎকার অনর্থক, শব্দ অনর্থক, বাক্য, ভাষা সবই অনর্থক। অনর্থককে অতিক্রম করিয়া সার্থককে লাভ করিতে হইবে। বোমা, রিভলভার, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব সকলকে অতিক্রম করিয়া মহাত্মা গান্ধী অহিংসা পরম ধন অর্জ্জন করিয়াছেন। আত্মবলে অটল ভক্তি রাখিয়া স্বার্থত্যাগ ও জীবপ্রেমের বিজয়মাল্যে আজ তিনি ভূষিত, ভারত ধন্য, জগৎ চমৎকৃত। তিনি যে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় আজ তিনি যুদ্ধঘোষণা করিতে উদ্যত। পূর্ব্ব পথ অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি আজ যে নূতন পথ ধরিয়াছেন, তাহাতেই না জগৎ দুলিয়া উঠিতেছে, ভারতবক্ষে মুহূর্মুহু পুলকের কম্পন অনুভূত হইতেছে? পুলক শিহরণে ভারতবাসীর বিমল হৃদয়ে আজ যে তরঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া উন্নত শিরে জগৎবক্ষে দাঁড়াইতে চায়, তাহা কি ঐ পূর্ব্ব প্রথা ধরিয়া চলিলে সম্ভবপর হইত? আজ এই সময়ই প্রাচীন মার্গাবলম্বীকেও বোধ হয় সুযোগ লাভের চিন্তায় ব্যস্ত করিতে পারে। কিন্তু ভারতের উদ্ধার যদি আমার সঙ্কল্প হয়, ভারতের অমানিশার অন্ধকারবিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ হইতে শঙ্কা, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কল্পের হোমানলে যদি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে পিছু হঠিবার ত কোন কথাই নাই—বর্ত্তমানকেও অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। পিছন গুছাইয়া সামনে চলা এ কখন, না যখন আমাদের "জমিন্" লাভ হইয়াছে। জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি আত্মবলে নীতি অবলম্বন করিয়া মহাত্মা যে স্থান দখল করিয়াছেন, সেই স্থানের উপরই আগু পিছু চলিতে পারে। পিছু গুছাইয়া আগে চলা সেই একস্থানেই হইতে পারে। নচেৎ উদ্যতবজ্র হইয়া অন্তঃকরণে ধ্বংসের কুণ্ড জ্বালাইয়া আমি যে জমি লাভ করিলাম তাহাতে যাহা পাইয়াছি, তাহার যে কীর্ত্তি, তাহা জাতির ইতিহাসে মিউজিয়মে রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে আর ইহাকে একস্থানে আনিয়া একটীকে আগা ও একটীকে পিছু ধরিয়া লইয়া জমিন্ ঠিক করিয়া লইলে তাহা বাতুলতার কার্য্য হইবে। বাতুলেরাই ঐরূপ বিভিন্ন প্রকারের রাশি রাশি বস্ত্রখণ্ডে গ্রন্থি দিয়া থাকে।

সোজা পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। আগে আগেই চলিতে হইবে। নেতি নেতি করিয়া নয়—সকলকে গ্রাস করিয়াই চলিতে হইবে। আবেদন নিবেদন গ্রাস করিতে হইবে, বিদেশীবহিষ্কারও গ্রাস করিতে হইবে, বিদেশীর প্রাণঘাতিনী অস্ত্রও উড়াইয়া দিতে হইবে, অহিংসা পরম ধর্ম্মের উপরে স্বার্থত্যাগ ও দেশপ্রেমের ঝাণ্ডা, ইচ্ছা হয়, তাহাও পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু আগে গিয়া। অগ্রে যাও, উর্দ্ধে যাও, স্বরাজ যে সূর্য্য-আলোক মালায় ভরিয়া আছে, সময়ে সময়ে এক একটী রশ্মি তুমি দেখিতে পাইয়াছ, সকল ভুলিয়া সকল ছাড়িয়া সেই রশ্মির পথে কেবল আগে চল, উর্দ্ধে চল। স্বরাজ-স্বর্গের দিব্য প্রকোষ্ঠে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়াই না তুমি সেই আলোক জগতে তুলিয়া ধরিবে, জগৎকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করিতে জ্যোতির্ম্ময়রূপে তুমি যদি না নামিয়া আইস, স্বল্প আলোকের দর্শনে মনে প্রাণে কতকি ভাবিয়া যদি উল্লম্ফনের পর উল্লম্ফন দিয়া যথায় খুসী চলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার আর্ত্তনাদ শিবার আর্ত্তনাদ অপেক্ষাও বীভৎস এবং সময়ে সময়ে করুণ রসোদ্দীপক হইবে। ভারতের অন্ধকার বক্ষে আরও অন্ধকারের

সাড়া দিয়া অনর্থক শব্দ ও শক্তির অপব্যয় করিবে।

ভারত সাবধান, কিছুতেই না জড়াইয়া জীবনটাকে খুব ঊর্দ্ধেই তুলিয়া ধর, ঊর্দ্ধের অমর শক্তি প্রবাহে-প্রবাহে তোমাকে মহাশক্তিতে পরিণত করিবে। তখন একটী ফুৎকারে জগতে প্রলয় ঘটিয়া যাইবে, সে-প্রলয় ভগবানেরই একান্ত অনুগামী, সে প্রলয় জগৎনাশী ক্ষুধার তরঙ্গ তুলিয়া আরও দাও, আরও দাও বলিয়া অসুরের কীর্ত্তি সম্ভব করিবে না, মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কঠিন পুচ্ছাঘাতে তাহাকে আবার বিদীর্ণ করিয়া মথিত করিয়া প্রলয়পয়োধিজল হইতে ধর্ম্ম জগৎকে উদ্ধার করিতে হইবে না, তাহা হইলে আমরা অবতাররূপী ভগবানকে সময়ে সময়ে লাভ না করিয়া চিরকাল ভগবানের রাজ্যেই বাস করিতে থাকিব। সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চল যথাস্থানে আমরা গমন করি। অগ্রসর হইয়াই যাইতে হইবে। পিছু তাকাইয়া নয়। নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তবে আগে পিছে করিব। এই যে মীমাংসা ইহাই আমাদের অবলম্বনেয় হউক।

ঋগ্বেদ

পঞ্চম মণ্ডল।

তৃতীয় সূক্ত।

১। ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্ত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
ত্বে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবা স্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্ত্যায়॥

হে অগ্নি, যখন তুমি জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি বরুণ (১), যখন তুমি পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত হও তখন তুমি মিত্র (২)। হে শক্তির সন্তান, সর্ব্বদেবতা তোমাতেই অবস্থিত (৩)। ইন্দ্ররূপে তুমি আহুতিপ্রদানকারী মর্ত্ত্যবাসীর নিকট প্রকাশ হও। (৩)

(১) বরুণ -বিজ্ঞান-জ্যোতির অনন্ত বিসার, ভূমার অনন্তত্ব। চেতনার অনন্ত সম্প্রসারণে বিজ্ঞান শক্তির প্রথম জন্ম বা জাগরণ।

(২) মিত্র = আলোক ও সামঞ্জস্যের দেবতা। উদার অনন্ত ব্রহ্মানুভূতির প্রকাশে এই মিত্রদেবতা হৃদয়কে প্রশস্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া প্রেমে ও আনন্দে পূর্ণ করেন।

(৩) অগ্নির মধ্যে সকল দেবশক্তিই সম্মিলিতভাবে অবস্থিত। দিব্য চিৎ-শক্তি ভাগবতাভিলাষ (divine aspiration) অন্তরে জাগাইয়া ধীরে ধীরে সকল দেব ভাবকেই সত্তার মধ্যে প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলেন। দিব্য মনও এই অগ্নিরই রূপাবিভাব, উহারই প্রকাশে সাধকের উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণ সুসম্পন্ন হয়।

২। ত্বমর্য্যমা ভবসি যৎ কনীনাং
নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি।
অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভি
র্যদ্দম্পতী সমনসা কৃণোষি॥

তুমি অর্য্যমা যখন তুমি প্রকৃতির ধর্ম্ম ও প্রেরণা সমূহের (স্বধা) (১) ধারয়িতা, জ্যোতিঃ-কন্যার গুপ্ত নাম (বিজ্ঞানের জ্যোতি-শক্তি সমূহকে) গূঢ়ভাবে ধারণ কর। যখন তুমি দম্পতির মন এক কর (২), তখন তোমার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত মিত্ররূপকে দেবতারা

জ্ঞানের কিরণে উজ্জ্বল করে।

(১) স্বধা = স্বভাব + স্বধর্ম্ম। প্রকৃতির স্বভাব ও স্বধর্ম্ম যাহাতে বিধৃত ও নিয়মিত—তাহা ভাগবত ইচ্ছাই—যাহা অগ্নি, চিৎ-শক্তি। অর্য্যমা—বিজ্ঞান-সূর্য্যের এই শক্তি-রূপ। অপর তিনরূপ, যথা, বরুণ যিনি অনন্ত, মিত্র যিনি প্রেমালোক-মূর্ত্তি, ভগ যিনি ভোগমূর্ত্তি।

(২) দম্পতি = প্রকৃতি ও পুরুষ। এই স্ত্রী ও পুংভাব যখন পূর্ণ মিলন লাভ করে, ভাগবত ইচ্ছায় উহাদের অখণ্ড যোগযুক্ত অনুভূতি সুসিদ্ধ হয়, তখনই প্রেমমূর্ত্তির অচল প্রতিষ্ঠা—জ্ঞানপ্রকাশে তখনই প্রেম দীপ্ত ও উজ্জ্বল।

৩। তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জয়ন্ত রুদ্র
যত্তে জনিম চারু চিত্রং।
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন
পাসি গুহ্যং নাম গোনাং॥

তুমি রুদ্র, (১) মরুদ্গণ (২) তোমার শ্রীবর্দ্ধনের জন্য যে রূপ তোমার চারু এবং বিচিত্র জ্যোতিঃ-সম্পন্ন, তাহাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তোলে। বিষ্ণুর যে পরম পদ অন্তরে স্থাপিত তাহা দ্বারা জ্যোতিঃ-রাশির গুপ্ত নাম (৩) তুমি রক্ষা কর।

(১) রুদ্র = বিশ্বপ্রকৃতির বিবর্ত্তনেরই প্রভু—যিনি সংহার-মূর্ত্তিতে পুরাতনের ধ্বংস পূর্ব্বক নূতনের প্রতিষ্ঠা করেন। রুদ্র মরুৎ-গণেরই পিতা।

(২) মরুৎগণ = তেজঃ-সম্পন্ন প্রাণশক্তি বা প্রাণময় চিন্তা-শক্তি রাজি, ঝঞ্ঝার মত যাহারা জীবনের গতানুগতিক অভ্যাস ও সংস্কারপুঞ্জ চূর্ণ করে, যাহারা আবার নূতন অভ্যাস সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) নাম = শক্তি।

৪। তব শ্রিয়া সুদৃশো দেবদেবাঃ
পুরু দধানা অমৃতং সপন্ত।
হোতারমগ্নিং মনুষো নিষেদুর্দশস্যন্ত
উশিজঃ শংসমায়োঃ॥

তোমারই শ্রীতে দেবগণ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ও বহুবৈচিত্র্য ধারণ করিয়া অমৃতত্ব উপভোগ করিতেছে। মানুষেরা হোতা অগ্নির শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা প্রাণের পূর্ণপ্রেরণায় আত্মসত্তার প্রকাশকে উৎসর্গ করিতেছে।

৫। ন ত্বদ্ধোতা পূর্ব্বো অগ্নে যজীয়ান্
ন কাব্যৈঃ পরো অস্তি স্বধাবঃ।
বিশশ্চ যস্যা অতিথির্ভবাসি স
যজ্ঞেন বনবদ্দেব মর্ত্তান্॥

হে অগ্নি, তোমাপেক্ষা সুদক্ষ সনাতন হোতা আর নাই। হে প্রকৃতির ধর্ম্ম ধারয়িতা, তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্যদর্শী আর কেহ নাই। তুমি যে মানবের অতিথি হও, হে দেব, সে যজ্ঞের দ্বারা মর্ত্ত্য শত্রুদিগকে পরাভব করে।

৬। বয়মগ্নে বনুয়াম ত্বোতা বসূয়বো
হবিষা বুধ্যমানাঃ।
বয়ং সমর্য্যে বিদথেষহ্নাং বয়ং
রায়া সহসস্পুত্র মর্ত্ত্যান্॥

হে অগ্নি, তোমার শক্তিতে পরিপুষ্ট, দিব্য সম্পদের অভিলাষী, হবিঃ দ্বারা (১) প্রবুদ্ধ আমরা যেন সমস্ত মর্ত্ত্য শত্রুদিগকে জয় করিতে পারি। হে শক্তির সন্তান, আমরা যেন আমাদের সংগ্রামে, দিবসের আলোকে (২) আমাদের প্রতি জ্ঞান আহরণে, আমাদের দ্বারা জয় করিতে পারি।

(১) হবিঃ = উৎসর্গ। উৎসর্গ মন্ত্রেই স্বরূপের জাগরণ হয়।

(২) দিবসের আলোকে = জ্ঞানপ্রকাশে।

৭। যো নঁ আগো অভ্যেনো
ভরাত্যধীদঘমঘশংসে দধাত।
জহী চিকিত্বো অভিশস্তিমেতামগ্নে
যো নো মর্চয়তি দ্বয়েন॥

আমাদের মধ্যে পাপ এবং দুষ্প্রবৃত্তি আনয়ন করে,